সূচীপত্র

যোগতন্ত্র ঃ

বৌদ্ধাগম ঃ

বৈষ্ণবাগম ঃ

শাক্তাগম ও কাশ্মীর শৈবাগম

ভারতীয় সংস্কৃতি

বাংলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি আমরা ইংরাজী 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন ইণ্ডিয়ান কালচারকে বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু-কালচারকে হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদি। অনেক সময় আমরা 'সংস্কৃতি'র পরিবর্তে 'কৃষ্টি' শব্দও ব্যবহার করি। সংস্কৃতি শব্দটি একেবারেই অর্বাচীন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ ছিল না। সেখানে সংস্কৃতির পরিবর্তে যে শব্দটি ব্যবহার হইত তাহা হইল 'ধর্ম'। ইংরাজী 'রিলিজন' বলিতে যাহা বুঝায়, 'ধর্ম' বলিতে তাহা বুঝায় না। ইংরাজদের নিকট 'রিলিজন' হইল শুধু বিশ্বাস বা উপাসনা পদ্ধতির ব্যাপার মাত্র। যদিও 'ধর্ম' শব্দটির সংজ্ঞার মধ্যেও বিশ্বাস ও উপাসনার ব্যাপার আছে, তাহা হইলেও হিন্দুর নিকট 'ধর্ম' হইল একটি অতিব্যাপক অর্থবিশিষ্ট শব্দ। ইহার দ্বারা হিন্দুর সমগ্র জীবনচর্যাকে বুঝায়।

পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবপর। কেন না, এখানে যে সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হইয়াছে জগতের অন্য কোন দেশে তাহার তুলনা হয় না। মিশর, ফিনিশীয়, ক্রীট, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-প্রান্তভূমি, গ্রীস, এমন কি সুপ্রাচীন চীন—এই সমস্ত দেশের কোন সংস্কৃতিই গভীরতায়, ব্যাপকতায়, বিরোধ-সমন্বয়-সামর্থ্যে ও সর্বতোমুখ বিকাশ-সাধনে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, সমষ্টির সহিত মহাসমষ্টির এবং মহাসমষ্টির সহিত সর্বাতীত মূলসত্তার এমন অদ্ভুত সমন্বয় ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভারতীয সংস্কৃতির স্বরূপ পর্যালোচনা যথাযথভাবে না হওয়ার জন্য আমার মনে হয় ইহার প্রকৃত পরিচয় অনেকের নিকটই অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি ভারতীয় মূল সংস্কৃতির একদেশমাত্র। এই মূল সংস্কৃতি হইতেই ক্রমিক সঙ্কোচ বিকাশের ফলে নানা সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। অনার্য সংস্কৃতি, দ্রাবিড় সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি এই মূল সংস্কৃতিরই ক্রমাবিবর্তমান অবস্থা মাত্র।

গ্রহণ এবং বর্জন—এই উভয় ব্যাপার জীবনীশক্তির নিদর্শন। যে নিগূঢ় শক্তি ব্যক্তির কায়াকে সংরক্ষণ করিবার জন্য বাহির হইতে পুষ্টিসাধক উপাদান

গ্রহণ করিয়া উহাকে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া শরীরকে পোষণ করে, সেই একই শক্তি সেই একই প্রয়োজন সাধনের জন্য আবার শরীর হইতে অনাবশ্যক হানিকারক মলমূত্রাদি দূষিত বস্তু অপসারণ করিয়া থাকে। এই উভয় কার্যের দ্বারাই জীবনধারা অব্যাহত থাকে। সমষ্টিগত সামাজিক দেহ এবং মহাসমষ্টিগত বিশ্ব দেহ সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম, যে কোন সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষার ইহাই রহস্য।

একটি প্রদীপ হইতে যেমন সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যায় তেমনই একটি জীবন্ত সংস্কৃতির প্রভাবে সহস্র উপসংস্কৃতির বিকাশ হয়। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত, চীন, নেপাল, মধ্য এসিয়া, গান্ধার, জাপান, মহাচীন, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ (সুবর্ণদ্বীপ, বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ ইত্যাদি), প্রাচ্য উপদ্বীপ, সিংহল, ইরাণ প্রভৃতি নানাদেশে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

অন্যান্য ধর্মের যেমন নাম আছে, ভারতীয় মূল ধর্মের তেমন কোন নাম নাই। থাকিতেও পারে না। কারণ যাহা নিত্য, ব্যাপক ও সনাতন—তাহা পরিচ্ছিন্ন নামের দ্বারা পরিচিত হইবার যোগ্য নহে। তাই উহাকে সনাতন ধর্ম বলে। তবে ব্যবহার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি নামকরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেইজন্য আর্য বা হিন্দু প্রভৃতি নাম দিয়া ঐ সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়।

এইবার আমরা এ-যুগের ঋষিকল্প মহাপুরুষ আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ জীর দৃষ্টিভঙ্গি (outlook) অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবিবঃ—

ভারতীয় সংস্কৃতিব প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইলে তাহাকে দুই দিক হইতে বিচার করিবার চেষ্টা কবিতে হইবে। একজন মনুষ্যকে বুঝিতে হইলে যেমন একদিকে তাহার ব্যক্তিগত নিত্য সত্তাটি ধরিতে হয়, তেমনি অপরদিকে তাহার আবির্ভাব ক্ষেত্র, বংশাবলীর তত্ত্ব জানা আবশ্যক হয়। তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা—শিক্ষা, সংসগ ইত্যাদি কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সত্তাটি নিত্য ও স্থির হইলেও তাহাব অভিব্যক্তি স্বানুরূপ দেহেই হইতে পারে। কিন্তু দেহটি রজোবীর্য মিশ্রণের ফল বা বিশিষ্ট কুলজাত। তাই পিতা মাতার প্রকৃতি নির্ণয় আবশ্যক হয়। প্রতি সমাজ বা সমষ্টিগত সংস্কৃতি সম্বন্ধেও এই একই নীতি প্রযোজ্য।

প্রত্যেকটি সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট আত্মা আছে—ইহাই তাহার বীজ। বীজ অবিনশ্বর—প্রবাহরূপে নিত্য। জাতির আত্মা বলিতে বিশিষ্ট কতকগুলি সংস্কারের সংঘাত ও সমন্বয় বুঝায়। প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু, ভূমি, সূক্ষ্ম বাতাবরণ

প্রভৃতির কারণে তাহার একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে। সেই দেশে দীর্ঘকাল বাস করিতে করিতে সেই প্রকৃতির ছাপ লাগিয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে এই ভারতীয় ছাপবিশিষ্ট সংস্কৃতি বুঝিতে হইবে। তাই ইহাতে আর্য, দ্রাবিড়, কিরাত, শক, হূন, পহ্লব, প্রতিহার প্রভৃতি বহু ভাবাপন্ন বিভিন্ন ধারার লোকসমূহ থাকিলেও সকলেই অল্পাধিক ভারতীয় প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত বলিয়া গণনা কবার যোগ্য। তা ছাড়া, দেশজ প্রকৃতির ন্যায় কালভেদে একটা নৈমিত্তিক পবিবর্তন ঘটে, তাহাকে যুগ-প্রকৃতি বলা চলে। এই সকলের মধ্য দিয়াই বীজের অর্থাৎ জাতীয় আত্মার আত্মবিকাশ সম্পন্ন হয়। আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থারও একটা প্রভাব আছে।

এইরূপ সূক্ষ্ম প্রণালীতে আলোচনা করিলে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান একটি সুন্দর সমন্বয়ের প্রয়াসের ফলশ্রুতি বলিয়া উপলব্ধি হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয়ের সমন্বয়ের জন্য 'পুরুষোত্তম' তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন, যেমন কামনা ও নিষ্ক্রিয়তার সমন্বয়ের জন্য নিষ্কাম কর্মরূপ মহাযোগের অবতারণা করিয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্যও তেমনি যুগ যুগ ধরিয়া সমন্বয় পথেই মীমাংসিত হইয়া আসিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি অখণ্ড সত্যের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া খণ্ড সত্যকে আদর করিতে জানে। এই দেশের প্রতি বিদ্যা, প্রতি কলা, প্রতি শাস্ত্র একই মহা উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রহ্ম বা আত্মলাভই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য—ইহাই ছিল ভারতের মূল সাধনা। "যং লব্ধা নাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—অর্থাৎ ভারত জানিত যে আত্মাকে লাভ করিতে পারিলে আর অধিক কিছু লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'—আত্মাই ভূমা বা অনন্ত—তাহাই আনন্দ। যাহা আনাত্মা তাহা সীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে সুখ নাই। যে আনন্দ নিত্য নির্মল চিরস্থায়ী, যে আনন্দ পাইলে জীবনের সকল অভাব অনন্তকালের জন্য মিটিয়া যায়, মনুষ্য আপ্তকাম হইয়া ধন্য হয়, তাহাই প্রকৃত আনন্দ। তাহা বাহিরে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থিরভাবে প্রবেশ করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়—অন্তর্মুখ হইলে তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়। ঋষিগণ এই পরম বস্তুর সংবাদ জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রণালী, কর্তব্য-নির্ণয় এমন ভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন যে আপামর সকলেই ঠিকভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অনুশাসন বাক্য পালন করিয়া চলিলেই এই পরম বস্তু লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে। তাঁহাদের অনুশাসন বাক্যগুলির তাৎপর্য কি এক একটি করিয়া বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ঋষিগণ জীবনের প্রতি কার্যে প্রতি পদক্ষেপে ভগবদ্-ভাব রক্ষার মাহাত্ম্য

উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—'ব্রহ্মবিদ্যাই পরম বিদ্যা'। অন্য বিদ্যাও উপাদেয় হইতে পারে যদি তাহা দ্বারা প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যার অনুকূলে কার্য করান যায়। এই দৃষ্টিতে ব্যাকরণ শুধু Grammar নয়, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা। বাক্‌শুদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য। শব্দকে শুদ্ধ করিতে পারিলে উহা 'প্রণবে' পরিণত হয় ও অন্তঃকরণের গ্রন্থি ছেদন করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারে সহায়ক হয়। বাকের ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত অবস্থা ব্যাকরণ হইতেই অধিগত হয়। 'পরা বাক্' অব্যাকৃত। বাক্‌শুদ্ধির ফলে 'পশ্যন্তী' বাক্ পর্যন্ত আয়ত্ত হইলে ঋষিত্ব লাভ হয়, দিব্যজ্ঞান জন্মে।

ছন্দঃ-শাস্ত্র শুধু Prosody নহে, ইহাও ব্রহ্মবিদ্যা। ছন্দঃ হইতেই জগতের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অতীত পরমপদে যাইতে হইলেও ছন্দই অবলম্বন। 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'—দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইলে ছন্দঃ তাঁহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ছন্দঃ ও বেদ অভিন্নস্বরূপ। ছন্দঃ হইতে যে শুদ্ধ সৃষ্টি হয় তাহাই ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। যাহাতে ছন্দঃ নাই বা যাহা বিকৃত ছন্দোময় তাহা জ্যোতির রাজ্যে যাইতে পারে না। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের ইহাই রহস্য। যিনি সদ্‌গুরুর কৃপায় অনুসন্ধান করিবেন তিনি নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। ছন্দোভঙ্গ হইলেই রোগ, শোক, তাপ জন্মে। স্বচ্ছন্দ অবস্থাই মুক্তিপদ, তাহা প্রাপ্ত করাই ছন্দোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

কাব্য ও সাহিত্য কি? কাব্য শুধু Poetry নয়। ভারতবর্ষে কবি বলিতে ব্রহ্মবিৎকে বুঝাইত। 'কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ'—ইহাই প্রাচীন দৃষ্টি। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্" ইত্যাদি স্থলেও কবি বলিতে জ্ঞানী বুঝায়। বাক্ (শব্দ) ও অর্থের সহিত ভাব হইতেই সাহিত্য উদ্‌ভূত। বাক্ ও অর্থ যথাক্রমে শক্তি ও শিবস্বরূপ। উভয়ের সামরস্যই সাহিত্য। ইহাই রসশাস্ত্র (Poetics)। 'রসো বৈ সঃ'—রস ব্রহ্ম তত্ত্বেরই নামান্তর।

সঙ্গীত শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র—ইহাও ব্রহ্মবিদ্যা। নাদ হইতেই সৃষ্টি, নাদেই লয়। নাদের বিজ্ঞানই সঙ্গীত। নৃত্য বিজ্ঞানও ব্রহ্ম বিজ্ঞান। নটরাজ শঙ্কর অথবা নটবর শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য হইতেই জগতের উদ্‌ভব ও তাহাতেই পর্য্যবসান।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের রহস্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মূলে ইহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। বেদিতত্ত্ব, কুণ্ডতত্ত্ব, বিভিন্ন প্রকার অগ্নিতত্ত্ব, অগ্নিচয়ন, অগ্নিমন্থন প্রভৃতি ব্যাপার ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গীভূত।

কামশাস্ত্র পর্যন্তও ব্রহ্মবিজ্ঞান ছিল। ইহা শুধু Sexual Science নহে। 'কামকলা' তত্ত্বের অভিব্যক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি নায়ক ও নায়িকা কি প্রকারে মিলিত হইলে উভয়ের অর্দ্ধাঙ্গ মিলিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতের বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ উভয়ের মূলে ঐ একই মহান্ লক্ষ্য রহিয়াছে। যতক্ষণ দিব্যজন্ম না হয়, যতক্ষণ প্রাকৃত জন্মের পর অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম না হয়, যতক্ষণ ছন্দে প্রবেশ না হয় ততক্ষণ সেই পরম পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই ছন্দোলাভ সাধন বলে হইতে পারে। দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইলে তদুচিত কর্মসম্পাদন সম্ভবপর হয়। কর্ম করিতে করিতে স্বভাবের নিয়মে শক্তির বিকাশ হয়। তখন যাবতীয় অন্তরায় দূর হয় ও তত্ত্বদৃষ্টি খুলিয়া যায়। জন্ম, কর্ম ও বিদ্যা—ক্রমশঃ এই তিন ভিত্তির উপর পরম জ্ঞানের সৌধ রচিত হয়। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় বর্ণাগ্রজ ব্রাহ্মণত্ব লাভেই বর্ণের পর্য্যবসান। তদ্রুপ আশ্রম বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসেই সকল আশ্রমের পর্য্যবসান। প্রথম আশ্রমে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ। ব্রহ্মচর্য সাধনার উদ্দেশ্য বিন্দু-প্রতিষ্ঠা বা বীর্যলাভ। নাভিচক্র হইতে বিন্দু স্খলিত হইয়া নিম্নবর্তী পথে না যাইয়া যেন স্থৈর্য্যলাভ করে—ইহাই ব্রহ্মচর্য সাধনার উদ্দেশ্য। বিন্দুর নির্মলতা সিদ্ধ হইলে তাহার স্থিরতা অবশ্যই আসিবে। বিন্দু স্থির হইলে তাহার স্বাভাবিক অধোগতি রুদ্ধ হয়। তখন প্রকৃতির সংযোগের সময় উপস্থিত হয়। আর যে জন বিন্দু স্থির রাখিয়া অক্ষর ব্রহ্মের ধারা ধরিয়া নৈষ্ঠিক পথ অবলম্বন করিবে, তাহার পক্ষে প্রকৃতিসঙ্গ নিষিদ্ধ। অন্যের পক্ষে প্রকৃতি সঙ্গ আবশ্যক। ইহার জন্যই বিবাহ বিধি এবং সংসারাশ্রমে প্রবেশ। পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ, প্রকৃতিও তদ্রূপ। উভয়ের মিলনে পূর্ণ ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। স বৈ নৈব রেমে; তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীযমৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং।" অর্থাৎ তিনি প্রথমে একাকী ছিলেন। তাই আনন্দ ছিল না। কারণ একাকী অবস্থায় আনন্দ থাকে না। তাই তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারী হইলেন। আবার কৌশলে এই দুইটিকে মিলাইতে পারিলে পূর্ণ বস্তু বা আনন্দ লাভ হইতে পারে। বৈধ ভোগের জন্য বিবাহ। ব্রহ্মচর্য উহার ভিত্তিস্বরূপ। বৈধ ভোগান্তে চাই ত্যাগ, তাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের পূর্বে বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থ সন্ন্যাসের প্রস্তুতি পর্ব। সন্ন্যাসের মূলে জ্ঞান। জ্ঞানের উদয় হইলে প্রকৃত সন্ন্যাস হয়, তৎপূর্বে নহে। কিন্তু যাহার ভোগতৃষ্ণা মিটে নাই, যাহার বৈরাগ্য জন্মে নাই, তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজে বহির্মুখ চিত্তের জন্য ভোগ, অন্তর্মুখ বিরক্ত চিত্তের জন্য ত্যাগ, দুই-ই আবশ্যক। পূর্ণত্ব লাভ হইলে, ভোগ ও ত্যাগ সমান হইয়া যায়। তখন বন্ধন থাকে না। এখানেও দেখা যাইতেছে যে আশ্রম বিভাগেরও পরিসমাপ্তি ব্রহ্মজ্ঞানে।

ভারতীয় সংস্কৃতি কর্মবাদমূলক। তাই ইহার লক্ষ্য অখণ্ড বিশ্বের দিকে। প্রাক্তন কর্ম অনুসারে জীব জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করে—নানা যোনিতে

গমনাগমন করে। ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, আবার অন্য দেশেও করিতে পারে। কিন্তু যেজন যোগ-প্রভাবে জাতিস্মর হয় সে পূর্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে অনাদিকাল হইতেই সে ঘুরিতেছে—শুধু এই কয়েক বৎসরের জীবন নহে। কোটি কোটি দেশে সে ভ্রমণ করিয়াছে—কোটি কোটি প্রকার দেহ গ্রহণ করিয়াছে। সে তখন বুঝে ৮৪ লক্ষ যোনির সকল জীবই তাহার আপন, সমগ্র জগৎই তাহার সঞ্চারক্ষেত্র, অনাদি মহাকালই তাহার সময় পরিমাণ, কোন দেশ, কোন কাল, কোন জীব তাহার অপরিচিত নহে, সকলেই তাহার নিজ জন। যখন পূর্ণ জ্ঞানের উদয়ে মায়া ভেদ করিতে সে সমর্থ হইবে, তখন দেশ, কাল, জীবভাব, দেহ, অশুদ্ধ অহং-অভিমান—কিছুই তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। সে তখন অসঙ্গ হইয়া বিশ্বাতীত ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বিশ্বাস, যুক্তি বা বিচার ও স্বয়ং-প্রত্যক্ষ—এই তিনটির উপর ভারতীয় সংস্কৃতি গঠিত। ঋষিগণ বলেন যে অধ্যাত্ম্য জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্বপ্রথম আবশ্যক—বিশ্বাস। অতীন্দ্রিয় সত্য প্রথমেই নিজে অনুভব করা চলে না। যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে চলিতে হয়। ইহা অন্ধ বিশ্বাস নহে। কারণ কর্মদ্বারা এই বিশ্বাস ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়। বিশ্বাসকে শক্তি যোগায় যুক্তি। মহাজনের বাক্যকে যুক্তি দ্বারা শোধন করিলে তাহার অসম্ভাবনা দোষ নিবৃত্ত হয়। তারপর যোগাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়। তখন আর যুক্তি বিচারেব আবশ্যকতা থাকে না। আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষ এই তিনটিরই উপযোগিতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিচার-স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য কোন-না-কোন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধেরা বেদবাক্য না মানিলেও বুদ্ধবচন মানে। বৈষ্ণবগণ শৈবাগম না মানিলেও পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত বচন মানে। বৈদিক সাধকগণও ত্রিপিটক বা তন্ত্রশাস্ত্র না মানিলেও বৈদিক প্রমাণ মানে। শব্দ-প্রমাণের প্রাধান্য মানিতে হইলেই যুক্তিকে গৌণ স্থান দিতেই হয়। যে Rationalist, সে যুক্তি বা বিচারই প্রধান মনে করে, তাহার নিকট ধর্ম যুক্তি বিরুদ্ধ মনে হইলে মহাজনবাক্যও গ্রহণ করে না। ঋষিগণ তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন—গুরুবাক্য বা আপ্তবাক্য বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বুঝিতে পারিলে মানিব, না পারিলে মানিব না—এ ভাবটি যুক্তিবাদীর। ইহা ঠিক নহে। পক্ষান্তরে যুক্তির প্রয়োগ বর্জনীয় নহে। কিন্তু সত্যের প্রত্যক্ষের জন্য ইহাই যথেষ্ট নহে। যথা নিয়মে গৃহীত ও যুক্তিসিদ্ধ সত্য যোগবলে

প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির মূলে এই মহাসত্যই রহিয়াছে।

ভগবৎপ্রাপ্তির পথে মুনি-ঋষিগণ সমন্বয়বাদী ছিলেন। বিচারপ্রবণ চিত্ত শুষ্ক বিচার পথে চলে। ভাবপ্রধান মনুষ্য ভক্তিপথ শ্রেষ্ঠ মনে করে। কর্মী কর্মকেই আশ্রয় করে। আন্তর ও বাহ্যভেদে কর্মের ভেদ আছে। তদ্রূপ জ্ঞান ও ভক্তিরও ভেদ আছে। প্রত্যেক পথেই তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে পারে—হয়ও। কিন্তু সকলের জন্য সকল পথ নহে, অধিকার ভেদ আছেই। ইহা বুঝিতে পারিলে কাহারও সঙ্গে বিরোধের অবসর থাকে না। তবে ইহা সত্য যে প্রতি পথেই সমগ্র পথটি প্রচ্ছন্ন আছে। জ্ঞানের পথে কর্ম ও বিশ্বাস আবশ্যক হয়। কর্মের পথেও বিশ্বাস ও জ্ঞানবিচার আবশ্যক। ভক্তির বা বিশ্বাসের পথেও কর্ম ও বিচার ব্যতীত কার্য চলে না।

একই পরম আত্মা যে সৃষ্টিমুখে বহু আত্মারূপে ব্যক্ত হইয়াছেন—ইহা সিদ্ধান্ত। তাই চিত্ত সংস্কারের জন্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মূলে সকলেই এক ও অভিন্ন। যাইবেও সেই একই স্থানে। যতদিন না যাইতে পারিতেছে ততদিন অন্ততঃ ভাবনা দ্বারাও সেই একতার ধারণা করা উচিত। ঠিকভাবে ইহা করিতে পারিলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে জাতির, সমাজের সহিত সমাজের বা ধর্মের সহিত ধর্মান্তরের বিরোধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

অজ্ঞান ভূমিতে ভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইহা মানিয়া লইতে হইবে। জোর করিয়া অভেদ স্থাপন চলে না। যখন ভেদ আছে তখন তাহা মানিয়া লইয়া অভেদ দর্শনের চেষ্টা করিতে হইবে, ভেদকে অস্বীকার করিয়া নহে। সেইজন্য অধিকারভেদ অঙ্গীকার করা আবশ্যক। যাহার যতটা যোগ্যতা, যাহার আধার যতটা বলবান, সে ততটা ধারণ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে ততটাই দিতে হইবে—এইরূপ করিতে করিতে যখন তাহার আধারের বিকাশ হইবে তখন অধিক দেওয়া চলিবে, তৎপূর্বে নহে। অপাত্রে দান হানিকর হয়, পাত্রের যোগ্যতা যাহাতে বাড়ে তাহাই বিধেয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক ও নানার অদ্ভুত সমন্বয় আছে। তাই কোথাও বিরোধ নাই। ব্রহ্ম এক—ইহা সত্য, কিন্তু তার শক্তি নানা, শক্তির বৈচিত্র্য অনন্ত। এইজন্যই এককে প্রাপ্ত হইয়াও, এক হইয়াও নানা লইয়া খেলা করা চলে। অভেদ-জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এককে প্রত্যক্ষ করা যায় না। শক্তি-বর্জিত ভাবে অভেদ জ্ঞানের উদয় হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মে লয় অবশ্যম্ভাবী হয়। স্থিতিলাভ হয় না, বৈচিত্র্যের আস্বাদন পাওয়া যায় না। সেই জন্য শক্তি জাগ্রৎ থাকা চাই। মহাকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে, নির্বাণেও জাগিয়া থাকা যায়, মৃত্যুতেও অমরত্ব লাভ করা যায়,

একের মধ্যে সর্বতোভাবে এক হইয়াও—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ-রহিত হইয়াও—অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলার অভিনয় অনুভব করা চলে।

এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে—'আত্মানাং সর্বভূতেষু সর্বভূতানি চাত্মনি'। সর্বভূতে আত্মদর্শন হইলে পূর্ণতা লাভের একটা দিক সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু অন্য একটা দিক তখনও অজানা থাকিয়া যায়। তাই আত্মাতে সর্বভূতের দর্শণও আবশ্যক। নানাতে এককে দেখা চাই, আবার একের মধ্যেও নানাকে দেখা চাই। ইহাতেই আত্মার অনন্ত করুণার স্ফূরণ হয়।

প্রজ্ঞাপারমিতার পর করুণাপুণ্ডরীক ফোটা চাই, ইহাই ক্রম। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু ভিতরের দিকে আকর্ষণ করে, একের মধ্যে নানাকে ডুবাইয়া দেয়, আত্মার আলোচনাতে জগৎকে বিস্মৃত হয়—তাঁহারা একদেশদর্শী। প্রথমটা এইরূপই মনে হয় বটে। কিন্তু ইহার পর আবার ভিতর হইতে বাহিরে আসা আছে, আবার এক হইতে অথচ একের মধ্যেই নানার স্ফূরণ আছে, আবার আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শণ আছে। ইহাই চরম দর্শণ। এটা দ্বিতীয় দিক। মাযা যেমন ব্রহ্মের এক দিক, যোগমাযা তেমনি অপর দিক। অশুদ্ধ কারণদেহ যেমন আছে, তেমনি বিশুদ্ধ মহাকারণ দেহও আছে। স্বার্থ যেমন কর্মশক্তির উদ্দীপক, পরার্থও তেমনি।

নিজে মুক্ত হইয়া অন্যকে মুক্ত করিতে না পারিলে, নিজের মুক্তির সার্থকতা কোথায়? যদি বস্তুতঃ একই আত্মা সত্য হন, তবে ইহাও কি সত্য নহে যে যতদিন সকল আত্মা পূর্ণত্ব লাভ না করিতেছে ততদিন কোন আত্মাই প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না? ভারতের প্রতি মহাপুরুষ এই মহাসত্যই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত বিশ্বকল্যাণ ও আত্মকল্যাণ অভিন্ন। এই মহাসত্যের উপলব্ধির মধ্যেই ভাবতীয সংস্কৃতির তাৎপর্য নিহিত।

আমার এই গ্রন্থটির নাম 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের অবদান'। সুতবাং উপর্যুক্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায় হইতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁহার অবদান সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

তন্ত্র ও কাশ্মীরাগম

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল রূপ লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা হিমালয়ের ন্যায় মহান ও গম্ভীর। এই বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই বিভিন্ন সময়ে নানা কৃষ্টির ধারা আসিয়া মিলিত হইয়া ইহাকে নব নব রূপে বিবর্তিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈদিক ধারাই প্রধান। বৈদিকধারা প্রধান হইলেও ইহাতে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে জানিতে পারি যে এই সমস্ত ধারার মধ্যে তন্ত্রের ধারাই প্রথম এবং প্রধান। তন্ত্রও আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। ইহার এক ভাগ বৈদিক ধারার অনুকূল ছিল। বৈদিকধারার উপাসনা-অংশের অনেক বিষয়ের সঙ্গে তান্ত্রিক ধারার যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়, আর সেই সমস্ত তান্ত্রিক বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। মনে হয়, উপনিষদাদিতে যে সকল 'বিদ্যা'র পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—সংবর্গ, উদ্গীথ, ভূমা, দহর, পর্যঙ্ক প্রভৃতি সেই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যাগুলি তান্ত্রিকধারার অন্তর্গত। বেদের রহস্য অংশেও এই সব রহস্য বিদ্যার আভাস পাওয়া যায়। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অধ্যাত্মবিদ্যারই বাহ্য রূপ। যদি এই সব অধ্যাত্ম বিদ্যার রহস্য-জ্ঞান কখন উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্থাৎ আগমিক জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই। কারণ বেদ ও তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ একই প্রকার। উভয়ই অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক জ্ঞানবিশেষ। বেদ ও তন্ত্র জ্ঞানের প্রকারভেদ মাত্র, বলা বাহুল্য এই জ্ঞান লৌকিক নহে, ইহা দিব্য এবং অপৌরুষেয় জ্ঞান। মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞ হইতেন এবং চরম স্থিতিতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবন সফল করিতেন। বস্তুতঃ বেদের স্বরূপ হইল অতীন্দ্রিয় শব্দাত্মক সূক্ষ্ম জ্ঞানবিশেষ। মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে বেদের স্বরূপ প্রকট হইতে পারে না। উহা বোধাত্মক, কিন্তু অভিব্যক্তির সময়ে বাগাত্মক হইয়া শব্দক্রমে প্রকাশিত হয়। বাগাত্মক জ্ঞান শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। বোধাত্মক জ্ঞান বাগাত্মক শব্দকে আশ্রয় করিয়া অর্থ প্রকাশ করে। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকাশ এই প্রকারে হইয়া থাকে।

বেদের ন্যায় তন্ত্রজ্ঞানও বোধাত্মক ও বাগাত্মক। তন্ত্রানুসারে যে জ্ঞানের

দ্বারা জীবের তত্ত্ব জানা যাইতে পারে অথবা মায়িক জগতের অর্থবোধ হইতে পারে উহার নাম বাগাত্মক জ্ঞান বা অপর জ্ঞান। ভগবৎতত্ত্বের প্রকাশক জ্ঞানই বোধাত্মক জ্ঞান বা পরজ্ঞান।

ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা কাহারও উপদেশ শ্রবণ করিয়া ঋষিত্বলাভ করিতেন না ; তাঁহারা স্বয়ং বেদার্থ দর্শন করিতেন। এইরূপ মন্ত্রার্থজ্ঞানের নামান্তর 'প্রাতিভ' অথবা 'অনৌপদেশিক' জ্ঞান। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানাং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ। এখানে গুরু শব্দের তাৎপর্য্য অন্তর্গুরু অথবা অন্তর্যামী। এই প্রকার উত্তম অধিকারিগণকে প্রাচীনকালে 'দৃষ্টর্ষি' বলা হইত। শক্তির মন্দতাবশতঃ মধ্যম অধিকারিগণ দৃষ্টর্ষি হইতে ন্যূন ছিলেন। ইঁহারা 'শ্রুতর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উত্তম অধিকারী উপদেশ-নিরপেক্ষভাবে দর্শন লাভ করিতেন, কিন্তু মধ্যম অধিকারী উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতেন। প্রথম জ্ঞানের নাম 'আর্ষজ্ঞান', দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম 'ঔপদেশিক জ্ঞান'।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে তন্ত্রের মূল আধার কোন পুস্তক নহে। উহা অপৌরুষেয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানকেই আগম বলে। এই জ্ঞানরূপ আগম শব্দরূপে অবতরণ করে। তন্ত্রমতে 'পরাবাক্'ই অখণ্ড আগম। পশ্যন্তী অবস্থাতে ইহা স্বয়ং বেদ্যরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা স্বয়ং প্রকাশরূপ। ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের অবস্থা। এখানে দ্বিতীয় বা অপরের মধ্যে জ্ঞান-সঞ্চারের কোন প্রশ্ন থাকে না। এই জ্ঞান মধ্যমাতে অবতীর্ণ হইয়া শব্দের আকার ধারণ করে। এই ভূমিতে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার ফলে জ্ঞান এক আধার হইতে অন্য আধারে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে মধ্যমা ভূমিতে বিভিন্ন শাস্ত্র এবং বিভিন্ন গুরু পরম্পরার প্রকট হইয়া থাকে। বৈখরীতে ঐ জ্ঞান শব্দের স্থূলরূপ ধারণ করিয়া শাস্ত্রার্থের আকারে প্রকাশ পায় এবং অন্যের গোচরীভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে বাক্তত্ত্ব বা জ্ঞানের অবতরণক্রম্ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। পরে ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

শাক্তমতে পরাবাক্ আত্মার অথবা পরমশিবের পরাশক্তিস্বরূপ। যখন আত্মস্বরূপে নিজের স্বরূপদর্শন করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তখন প্রকাশাংশ ও বিমর্শাংশ অর্থাৎ পরমশিব ও পরাশক্তি উভয়ের মধ্যে সামরস্য ঘটে।
পরাশক্তিরই নাম পরাবাক, অথবা পরামাতৃকা : যাহার মধ্যে ছত্রিশ তত্ত্বসমন্বিত বিশ্ব বীজস্থিত বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত হয়।

অদ্বৈতাগমের মতানুসারে জ্ঞানের অবতরণক্রম এই প্রকার ঃ---পরাবাক্ সকলের

মূল। ইহা বোধস্বরূপ ও পূর্ণস্থিতি। যাবতীয়ভাব এই পরাবাক্ স্থিতিতে পূর্ণ থাকে। ইহাকেই পরমপরামর্শ বলে। অনন্ত শাস্ত্র বোধরূপী পরাবাকে অবস্থিত থাকে। সৃষ্টির উন্মেষকালে পরাস্থিত শাস্ত্রাদি ক্রমশঃ পশ্যন্তী, মধ্যমাদি নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়।

অদ্বৈত আগমের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল শাস্ত্রের প্রকাশ জগতে হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের প্রকাশ এখনও হয় নাই এবং যাহারা প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সবাই পরাবাকে 'বোধ'রূপে নিত্য বর্তমান রহিয়াছে। উহাই তন্ত্রের পরম স্বরূপ। পশ্যন্তী ভূমিতে বোধাত্মক শাস্ত্রসমূহ আপন আপন বৈশিষ্ট্য সহ অভিব্যক্ত হয়। মধ্যমা ভূমিতে পরমেশ্বর আপন স্বরূপকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া স্বয়ংই গুরু ও শিষ্যরূপ ধারণ করেন। অর্থাৎ পরমার্থসত্তারূপ সংবিদই গুরু-শিষ্যে বিভক্ত হইয়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শাস্ত্রজ্ঞান প্রকট করেন। প্রশ্নকর্তা শিষ্য এবং উত্তরদাতা গুরু বস্তুতঃ মধ্যমা ভূমিতে অভিন্ন—উভয়েই সংবিন্মাত্র। এখানে গুরু সদাশিব। গুরুরূপী সদাশিবে পরমেশ্বর নিজের পঞ্চশক্তি অর্থাৎ চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া পঞ্চমুখ রূপে প্রকট করিয়া থাকেন। সদাশিবের এই পঞ্চমুখের শাস্ত্রীয় নাম—ঈশান, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব এবং অঘোর। সদাশিবের এই পঞ্চমুখ হইতে বৈচিত্র্যময় নিখিলশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আবির্ভূত হইলেও মধ্যমা অবস্থায় এই সকল অস্ফুট থাকিয়া যায়। বৈখরী অবস্থায় আসিবার পর এই সকল পরিস্ফুত হইয়া শাস্ত্রের রূপ এবং আকার ধারণ করে।

পরাবাকে নিত্যরূপে বর্তমান 'বোধ' ক্রমশঃ যে প্রণালীতে পশ্যন্তীভূমি হইতে নিম্নতমভূমি পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হয় তাহা হইল এইরূপ—প্রথমে এই বোধরূপ মহাজ্ঞান সর্বাত্মক অহংজ্ঞানের রূপ ধারণ করিয়া পশ্যন্তীভূমিতে স্ফুরিত হয়। এই অবস্থায় বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ পরস্পর পৃথকরূপে ভাসমান হয় না। এই অবস্থাতে ইদংরূপে বাচ্যার্থের ভান হয় না। ইহার পর ঐ মহাজ্ঞানে বাচ্য-বাচক ভাবের আবির্ভাব হয়, কিন্তু ইহা হয় অন্তরে, বাহিরে নহে। এই ভূমিটি মধ্যমা পদবাচ্য। এই সময় বিশ্বগুরু পরমেশ্বর হইতে অনন্ত শাস্ত্রের স্পষ্ট অবতরণ ঘটিয়া থাকে।

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তন্ত্রের বা আগমের মূল স্বরূপ 'পরাবাক্'। ইহাই ভগবানের পরাশক্তি। অবতরণক্রমে পরাবাকই অখণ্ড মহাজ্ঞানরূপে পশ্যন্তীভূমিতে স্ফুরিত হয়। এই অবস্থায় কালগত অতীত, অনাগত ও বর্তমানের ভেদ থাকে না। বস্তুতঃ এইটি আত্মবোধের অবস্থা। এখানে বাচক শব্দের অস্তিত্ব নাই এবং বাচ্য অর্থেরও অস্তিত্ব নাই। মধ্যমা ভূমিতে অর্থ ইদংরূপে প্রতীত হয়। এই স্তরে অর্থ ও শব্দ অর্থাৎ বাচ্য ও বাচক ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এই স্তরে সূক্ষ্মরূপে যাবতীয় শাস্ত্র বাচক

শব্দের আশ্রয়ে আবির্ভূত হয়। আত্মা স্বয়ংই বক্তা গুরু ও শ্রোতা শিষ্যরূপে প্রকট হন। এইটি মধ্যমা ভূমির ব্যাপার। এই ভূমিতে সর্বশাস্ত্র নিত্য প্রকাশমান। ইহার অল্প অংশ বৈখরীরূপে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া আমাদের নিকট প্রকট হয়। অবশিষ্ট শাস্ত্র মধ্যমা ভূমিতেই থাকিয়া যায়। এই মধ্যমাভূমিতে অনেকপ্রকার অপরিমেয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগী এবং জ্ঞানী প্রয়োজন অনুসারে ঐ ভূমি হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব প্রদর্শিত ক্রমে পশ্যন্তীভূমিতে প্রকটিত মহাজ্ঞানকে বলা হয় প্রাতিভজ্ঞান। প্রাতিভজ্ঞানকে 'অনৌপদেশিক' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কারণ বাচ্য-বাচক বিভাগশূন্য এই পশ্যন্তীভূমিতে উপদেষ্টা ও উপদেশ্যে ভেদ থাকে না। অনৌপদেশিক জ্ঞানের মূলে আছে পরাবাক্ অর্থাৎ আগম। পরাবাক্ অথবা আগমই পশ্যন্তীর মূল কারণ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বেদ ও তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক এবং তান্ত্রিক সাধনধারা সমূহের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। অবশ্য ইহাও সত্য যে উভয় ধারার সাধনার মধ্যে পার্থক্যও ছিল এবং পার্থক্য ছিল বলিয়াই বৈদিক হইতে স্বতন্ত্র তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে শিষ্ট ব্যক্তিগণ যে তন্ত্রের সমাদর করিতেন তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক সাধনার পরম আদর্শ হইল শক্তি সাধনা অর্থাৎ মহাশক্তি জগদম্বাকে মাতৃরূপে উপাসনা অথবা শিবোপাসনা। প্রসিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক ছিলেন, এমন কি কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্তকও ছিলেন। 'ব্রহ্মযামল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বহু সংখ্যক ঋষি শিবোপাসনার প্রবর্তক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উশনা, বৃহস্পতি, দধীচি, সনৎকুমার, নকুলীশ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'জয়দ্রথযামল' গ্রন্থের মঙ্গলাষ্টক প্রকরণে তন্ত্র-প্রবর্তক অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায় যেমন—দুর্বাসা, সনক, কশ্যপ, সংবর্ত, বিশ্বামিত্র, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, ভৃগু ইত্যাদি।

সর্বপ্রথমে দুর্বাসা ঋষির নাম করিতে হয়। তান্ত্রিক সাহিত্যে 'ক্রোধভট্টারক' নামে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ত্রিপুর-সুন্দরী (দেবী) মহিম্ন স্তোত্র' টীকায় নিত্যানন্দনাথ বলিয়াছেন—

"সকলাগমাচার্য চক্রবর্তী সাক্ষাৎ শিব এব অনসূয়াগর্ভসম্ভূতঃ
ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাসা মহামুনিঃ"।

প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি শ্রীকৃষ্ণকে ৬৪ প্রকার অদ্বৈতাগমের শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তীও আছে যে কলিযুগে দুর্বাসা ঋষিই আগমকে প্রকট করেন। নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত 'মহিম্নঃ স্তোত্রে'র এক পুঁথিতে ইঁহার

সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—'সর্বাসামুপনিষদাং দুর্বাসা জয়তি দেশিকঃ প্রথমঃ'। 'জয়দ্রথযামল' নামক আগম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে তন্ত্রপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে দুর্বাসাই প্রথম।

দুর্বাসা শ্রীবিদ্যা তথা পরমশিবের উপাসক ছিলেন। শুনা যায় যে ষড়ক্ষরী বিদ্যা তাঁহার উপাস্য দেবী ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি ত্রয়োদশাক্ষরী বিদ্যার উপাসনা করিতেন।

এই প্রসঙ্গে শিবভক্ত নন্দিকেশ্বরের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে। ইঁনিও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'কাশিকা'। ইহা একটি ক্ষুদ্র কারিকাত্মক গ্রন্থ। ইহার উপব উপমন্যু এক টীকা রচনা করেন। নন্দিকেশ্বর পরম শিবকে তত্ত্বাতীত এবং বিশ্বকে ৩৬ তত্ত্বে নির্মিত বলিয়া মনে করিতেন। কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে দুর্বাসা মুনি নন্দিকেশ্বরের শিষ্য ছিলেন।

এখানে দত্তাত্রেয় মুনিবও নাম করা যাইতে পারে। ইঁনিও শ্রীবিদ্যার একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি তাঁহার শিষ্যদের শ্রীবিদ্যা-উপাসনার পদ্ধতির সহিত পবিচিত করাইয়া দিবার জন্য 'শ্রীদত্ত সংহিতা' নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পরশুরাম ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত এক সূত্র-গ্রন্থ রচনা করেন। শুনা যায়, ইঁহারও পরে সুমেধা নামে এক শিষ্য 'দত্ত-সংহিতা' এবং পরশুরামের সূত্রের সারাংশ অবলম্বন করিয়া 'ত্রিপুবা রহস্য' রচনা করেন। ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে দত্তাত্রেয মহাবিদ্যা মহাকালীরও উপাসক ছিলেন।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে বৈদিক ও তান্ত্রিক—এই দুইটি ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিযাছে। তন্মধ্যে কোন্ ধারাটি সুপ্রাচীন এবং কালক্রমে একের মধ্যে অপরের কতটা অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহা বিশেষভাবে গবেষণা সাপেক্ষ। শুধু তাহাই নহে, ভারতবর্ষে তন্ত্রসাধনা কবে কোথায কিভাবে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায বিভক্ত হইয়া নানা দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহারও সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা আবশ্যক।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির সহিত সম্যগ্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বৈদিক সাধনামূলক শাস্ত্রের আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে তান্ত্রিক সাধন-শাস্ত্রেব আলোচনা বিশেষ কিছু হয় নাই। তান্ত্রিক সাধনাব নিগূঢ় রহস্য তো বহু দূরের কথা, সাধারণ তত্ত্বও এমন কিছু আলোচনা হয় নাই যাহাতে কিনা জনসাধারণ সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। পবম শ্রদ্ধেয় ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বরচিত 'তন্ত্রতত্ত্ব'

গ্রন্থে তন্ত্রের আলোচনা করিয়া প্রথম তন্ত্রের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তীকালে তাঁহার প্রেরণা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য উচ্চ ন্যায়ালয়াধীশ স্যার জন্ জর্জ উডরফ (Sir John George Woodroffe) মহোদয় তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিভিন্ন গ্রন্থের রচনা, কয়েকটি মূল গ্রন্থের প্রকাশন এবং ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরের দ্বারা লোকশিক্ষা কার্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ যাঁহার সেই সময়ে নাম ছিল প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, উড্রফের ঐরূপ মহান প্রচেষ্টায় যেরূপ সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সমস্ত মহান্ বিদগ্ধ জনদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহির্মুখই হইয়াছে। যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতে তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উপর আলোকপাত হয় নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি অথবা হিন্দু সংস্কৃতিতে তান্ত্রিক সাধনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাহারো কাহারো মতে আর্য সংস্কৃতিমূলক প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসে যত প্রকার স্তর আছে সেই সমস্ত স্তরের ক্রমবিকাশের ফলেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের মতানুসারে আর্যসংস্কৃতিতে বৈদিক ভাবনার ন্যায় অবৈদিক ভাবনারও স্থান আছে। এতদ্ব্যতীত আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাবও আর্যসংস্কৃতির উপর পড়িতে থাকে। এইজন্য পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বৈদিক, অবৈদিক তথা অনার্য সংস্কৃতিরও প্রভাব পড়ে।

বৈদিক ধর্মে চৈতন্যের উদ্বোধনের কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যের লক্ষ্য হইল এক অখণ্ড সত্তার অনুভূতি জাগানো। তন্ত্রের কথা হইল জড়কে পরিত্যাগ করিয়া নয়, চিৎ ও জড় উভয়ে সম্মিলিত হইয়াই সেই অখণ্ড সত্তার পূর্ণ অনুভূতি জাগাইতে সক্ষম। এ সম্বন্ধে অনির্বাণজী যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য— "যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রে এই প্রকার সাধনার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে... বেদবাদের প্রথম স্বরূপ হইল অলৌকিক। ইহা সীমার ভিতর পুষ্ট হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় রূপ হইল লৌকিক, যাহার ভাবধারা সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। এইজন্য শ্রুতি শব্দের দ্বারা বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় শ্রুতিই বোঝায়। উভয় শ্রুতিই প্রামাণিক এবং অপৌরুষেয়"। (বেদমীমাংসা, খণ্ড ১)।

অতএব ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার ভালরূপে আলোচনা করিতে হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত সমান্তরালভাবে তান্ত্রিক সাহিত্যেরও পূর্ণরূপে আলোচনা আবশ্যক। গভীরভাবে অনুধাবন করিলে জানিতে পারা যায় যে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সাধনারই এক অনন্য বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে।

পার্জিটর (Pargiter) মহোদয়ের সময় হইতে পৌরাণিক সাহিত্যের দিকে বিদ্বৎ-সমাজের দৃষ্টি অল্পাধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে

এই ক্ষেত্রে কিছু গবেষণার কাজও হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধনাব বিষয়েও ঐ প্রকার আলোচনার সূত্রপাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা সহজ সাধ্য নয়। তান্ত্রিক সাধনার যথার্থ স্বরূপ অত্যন্ত গুহ্য। যদিও আধুনিক কালে ভারতবর্ষে সর্বত্রই তান্ত্রিক সাধনার অল্পাধিক প্রসার আছে এবং ইহাতে বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন প্রকরণ পদ্ধতিও পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে, তথাপি গুহ্য তত্ত্বের বিষয়ে প্রকৃষ্ট চর্চা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক কালে এ বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ হইলেন আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়। তিনি শৈবাগম, শাক্তাগম, বৌদ্ধাগম, বৈষ্ণবাগম এবং তান্ত্রিক যোগসাধনা সম্পর্কে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজীতে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়া অপরের গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক সাহিত্যের নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ মৃগেন্দ্র তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে জীবের 'পর' ও 'অপর' মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পঞ্চ স্রোতে বিভক্ত নির্মল জ্ঞান প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঊর্ধ্ব, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম—এই পাঁচ স্রোত প্রসিদ্ধ।

প্রচলিত তন্ত্রসাহিত্যেব অনেক গ্রন্থ উপাস্য দেবতাদের ভেদ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য অতি বিশাল; জৈন-তন্ত্র-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত অল্প। তন্ত্র-সাহিত্যে উপাস্য দেবীব প্রকার ভেদ অনুসারে যে যে বিভাগ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে মহাবিদ্যানুসারী বিভাগ অধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্ররূপে কাশীর বিশিষ্ট স্থান আছে। বুদ্ধদেবের সময় হইতে অথবা তাহারও পূর্ব হইতে বিদ্যাক্ষেত্ররূপে কাশী সুপ্রসিদ্ধ। মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ কারিলে জানা যায় যে এই সময়েও বহু সংখ্যক বিশিষ্ট তান্ত্রিক, সাধক, দার্শনিক ও গ্রন্থকার কাশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন সাধকের নাম করা যাইতে পারে; যেমন—(১) সরস্বতীতীর্থ, (২) রাঘবভট্ট, (৩) সর্বানন্দ পরমহংস, (৪) বিদ্যানন্দনাথ, (৫) মহীধর, (৬) নীলকণ্ঠ চতুর্ধর, (৭) প্রেমনিধি পন্থ, (৮) ভাস্কর রায়, (৯) শঙ্করানন্দ নাথ, (১০) মাধবানন্দ নাথ, (১১) ক্ষেমানন্দ, (১২) সুভগানন্দ নাথ, (১৩) কাশীনাথ ভট্ট, (১৪) শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব ও (১৫) তাঁহার অন্যতম শিষ্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি। এই সমস্ত সাধক-মনীষিগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে কাশীতে আসিয়া বসবাস করেন এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাধনা, মৌল তন্ত্র-গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়া কাশীর সাংস্কৃতিক জীবনকে উজ্জীবিত করিয়া তোলেন।

তান্ত্রিক সম্প্রদায় ভেদ

তান্ত্রিক সংস্কৃতিতে মূলগত ভেদ না থাকিলেও উহাতে দেশকাল ও ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদভব হইয়াছিল। এই প্রকার ভেদ সাধকগণের প্রকৃতিগত ভেদ বশতঃই হইয়া থাকে। উপাস্য দেবতাভেদে উপাসনা প্রক্রিয়াতে এবং আচারাদিতেও ভেদ হয়। সাধারণতঃ পার্থক্যের ইহাই কারণ।

তান্ত্রিক সম্প্রদায় বলিতে আমরা প্রধানতঃ শাক্ত সম্প্রদায়ই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের অভিমত অনুসারে শিব ও শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার দরুণ শৈব সম্প্রদায়ও প্রাচীনকাল হইতেই তন্ত্র-সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কালক্রমে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধন ও সিদ্ধান্তগত কিছু বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণববাদি-সম্প্রদায়সমূহেও লক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। এইজন্য পঞ্চরাত্র ও সাত্বত সম্প্রদায়ও তান্ত্রিক নামে পরিচিত। বৈষ্ণবাচার্য যামুন মুনি 'আগমপ্রামাণ্য' গ্রন্থ লিখিয়া আগমসমূহের বৈদিকত্ব প্রদর্শন করিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের রচনাবলী হইতে জানিতে পারি যে, লক্ষ্মীধর 'সনৎকুমার সংহিতা' হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে মধ্যযুগে যে সমস্ত বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রসার ছিল তাহাদের মধ্যে একমাত্র সময়াচারনিষ্ঠ শুভাগম-তত্ত্ববেদী ব্রহ্মবাদীগণই বৈদিক ছিলেন। তাঁহারা ভগবতীর আভ্যন্তরিক পূজা করিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাঁচ 'শুভাগমে'র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচটি গ্রন্থ বেদের গুহ্য অর্থ প্রকাশিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহারা বেদের ব্যাখ্যা বা টীকামাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের বহু পূর্ব হইতে প্রসিদ্ধ ছিল। সায়ণাচার্য নিজে বেদভাষ্যের বিভিন্ন জায়গায় উহাদের নাম নির্দেশপূর্বক উহাদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের মতানুসারে প্রাচিন সময়ে শাক্তগণের মধ্যে 'সময়াচার' ও 'কৌলাচারের' ভেদ ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে সময়াচার বৈদিকমার্গের সমকালীন এবং বৈদিকমার্গের সহিত উহার যোগ ছিল। গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সময়াচারের উপাসক ছিলেন। লক্ষ্মীধর সৌন্দর্যলহরীর টীকায় ৩১ নং শ্লোকে সময়াচার যে বৈদিক মতানুসারী ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত 'শুভাগম পঞ্চ'কেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পঞ্চকে বশিষ্ঠ সংহিতা, সনকসংহিতা, শুকসংহিতা, সুনন্দসংহিতা এবং সনৎকুমার-

সংহিতা—এই পাঁচ সংহিতা আছে। এই সব সংহিতা অবলম্বন করিয়া যে আচার প্রচলিত তাহাকে 'সময়াচার' বলে। সৌন্দর্যলহরীতে যে চতুঃষষ্টি (৬৪) তন্ত্রের উল্লেখ আছে, উহারা ঐ সব সংহিতা হইতে ভিন্ন। এই চতুঃষষ্টি (৬৪) তন্ত্র অবৈদিক; কারণ উহারা কৌল, কাপালিক ও বামমার্গের অন্তর্গত।

অতএব দেখা যাইতেছে, সময়াচার ব্যতীত অন্য আচারসম্পন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই অবৈদিক ছিলেন। সনৎকুমারসংহিতায় এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সম্প্রদায়গুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন—

(১) 'কৌল'। লক্ষ্মীধবের মতে ইঁহারা আধার চক্রে পূজা করেন।

(২) 'ক্ষপণক'। প্রসিদ্ধি আছে যে ইঁহারা প্রত্যক্ষ ত্রিকোণে পূজা করেন। এই সম্প্রদায় দিগম্বর সম্প্রদায়ের এক শাখা।

(৩) 'কাপালিক'। ইঁহারা প্রত্যক্ষ ত্রিকোণ এবং আধার চক্র—এই দুয়েরই পূজা করেন।

(৪) 'দিগম্বর'। ইঁহারাও কাপালিকদের ন্যায় প্রত্যক্ষ ত্রিকোণ এবং আধার চক্রের পূজা করেন। এই সম্প্রদায় কাপালিক সম্প্রদায়েরই প্রকার ভেদ।

(৫) 'ইতিহাসক'। ইঁহারা ভৈরবযামল অনুসারে উপাসনা করেন।

(৬) 'বামক'। এই সম্প্রদায়ের লোক বামকেশ্বর তন্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলে। লক্ষ্মীধরের মতে উপযুক্ত সম্প্রদায়ের সকলে চক্রপূজা এবং বাহ্য পূজায় অনুরক্ত অবৈদিক সাধক।

শৈবাগম—শৈবাগম যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতের মোক্ষপর্বে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যুর নিকট শৈবাগম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কোন কোন শৈবাগমে বর্ণিত আছে যে শিবের পাঁচটি মুখ হইতে বিভিন্ন আগমের নির্গম হইয়াছে। এই পাঁচটি মুখের নাম—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, ঈশান ও তৎপুরুষ।

শিবের 'সদ্যোজাত' ও 'বামদেব' মুখদ্বয় হইতে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া মোট দশটি শিবাগম এবং তাঁহার 'অঘোর' ও 'ঈশান' মুখদ্বয় হইতে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া দশটি এবং 'তৎপুরুষ' মুখ হইতে আটটি মোট আঠারোটি রুদ্রাগম নির্গত হইয়াছিল।

ভগবান শঙ্করাচার্যকৃত 'আনন্দলহরী' স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্রৈঃ সকলমনুসন্ধায় ভুবনং
স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধি প্রসভপরতন্ত্রং পশুপতিঃ।
পুনস্ত্বান্নির্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্। (শ্লোক ৩১)

এই শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে, পশুপতি সকল ভুবনকে তত্তৎসিদ্ধিপ্রদর্শক চতুঃষষ্ঠি তন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। প্রতি তন্ত্রই কোন-না-কোন পুরুষার্থপ্রদ উপাসনার প্রদর্শক। পরে তিনি জগদম্বার অনুরোধে সকল পুরুষার্থসাধক একটি তন্ত্র রচনা করেন। ইহাই মুখ্যভাবে ভগবতীর তন্ত্র। এই চতুঃষষ্ঠি তন্ত্রের নাম 'চতুঃশতী'তে আছে। এই নামগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাস্কর রায়ের 'সেতুবন্ধ' টীকাতে প্রকাশিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্যঃ আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'নিত্যাষোড়শি-কার্ণব')। এই সকল তন্ত্রের বক্তা শিব ও শ্রোত্রী পার্বতী। শৈবাগমের দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

শৈবমতাবলম্বীদের মধ্যে পাশুপত, কালামুখ প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রাচীনকালে ছিল। সোমসিদ্ধান্ত শৈব, বীর বা জঙ্গম শৈব, ভৈরব, রৌদ্র, বাম প্রভৃতি বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। কাপালিকের নাম পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের শৈবাগমের মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ, মহার্থ, সহস প্রভৃতি ভাবধারার পরিচয় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের শৈবাগমে অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠিত।

পাশুপত—কোন সময়ে ভারতবর্ষে পাশুপতমতের খুব বিস্তার হইয়াছিল। ন্যায়ভূষণকার ভাসর্বজ্ঞ পাশুপত ছিলেন। ইঁহার রচিত 'গণকারিকা' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পাশুপতদর্শনের একটি প্রধান গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। লাকুলীশ পাশুপতমতও এক সময়ে প্রবল ছিল। বর্তমান সময়ে দক্ষিণ ভারত হইতে পাশুপতসূত্রের উপর 'কৌণ্ডিণ্য' ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'শ্রীকরভাষ্য' হইতে জানা যায় যে পাশুপতমতাবলম্বী সবাই যে তান্ত্রিক ছিলেন, তাহা নহে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক ছিলেন। বৈদিকগণ লিঙ্গ, রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিতেন।

'রৌদ্র' সম্প্রদায়ের সব উপাসক হাতে ত্রিশূল ধারণ করিতেন। 'জঙ্গম' সম্প্রদায়ের লোক হৃদয়ে ত্রিশূল এবং মস্তকে লিঙ্গ ধারণ করিতেন।

কাপালিকমত ও সোমসিদ্ধান্তমত—কবিরাজ মহাশয়ের মতে কাপালিক সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। কারণ, মৈত্রী উপনিষদে কাপালিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মালতীমাধব, কর্পূরমঞ্জরী, প্রবোধচন্দ্রোদয়, চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি গ্রন্থে কাপালিকের অল্প-বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। কালামুখ বা কালানল সম্প্রদায়ের সহিত কাপালিকদের সম্বন্ধ ছিল। বিভিন্ন পুরাণে এই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যামুন মুনিকৃত 'আগমপ্রামাণ্য' গ্রন্থের মতে চারিটি শৈবমতের মধ্যে কাপালিকমত অন্যতম। শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতার মতও তাহাই। বামনপুরাণও এই মত সমর্থন করে, তবে সেখানে 'কাপালিক' শব্দের পরিবর্তে 'কপালী' শব্দ পাওয়া যায়। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র কাপালিকমতকে চারিটি মাহেশ্বর মতের অন্যতম বলিয়াছেন। ইহার প্রাচীন নাম 'সোমসিদ্ধান্ত'।

শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিতে' (১০,৮৮) 'সোমসিদ্ধান্ত' নামে যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা যে কাপালিক সিদ্ধান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাপালিক অর্থে 'সোমসিদ্ধান্ত' শব্দের প্রয়োগ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'ও পাওয়া যায়। রুচিকর স্বরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় টীকাতে বলিয়াছেন যে 'সোম' শব্দের অর্থ 'উমাসহিত' অর্থাৎ পার্বতী সহিত শিবের যে সিদ্ধান্ত, তাহাই সোমসিদ্ধান্ত—"সহ উময়া বর্ততে ইতি সোমঃ, তস্য সিদ্ধান্তঃ" (তৃতীয় অঙ্ক)। 'অকুলবীর' তন্ত্রেও এবিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

কাপালিক নামের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন যে অনেকে মনে করেন এই সম্প্রদায়ের সাধক নরকপাল ধারণ করিত বলিয়া কাপালিক নামের উদ্‌ভব হইয়াছে। বস্তুত ইহা বহিরঙ্গ ব্যাখ্যা। ইহার অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 'প্রকাশ' নাম্নী টীকায় প্রকট করা হইয়াছে। তদনুসারে এই সম্প্রদায়ের সাধক কপালস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র উপলক্ষিত নরকপালস্থ অমৃত অথবা চান্দ্রী পান করিত। কাপালিক নামের ইহাই রহস্য। ইহারা এই পানের দ্বারাই মহাব্রতের সমাপ্তি করে। ইহাই ব্রতপারণা। বৌদ্ধ আচার্য হরিবর্মা ও অসঙ্গের সময়েও কাপালিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শাবরতন্ত্রে বারোজন কাপালিক গুরুর ও তাঁহাদের বারোজন শিষ্যের নামসহ বর্ণনা পাওয়া যায়। গুরুবর্গের নাম—আদিনাথ, অনাদি, কাল, অমিতাভ, করাল, বিকরাল ইত্যাদি। শিষ্যবর্গের নাম—নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, চর্পটি ইত্যাদি। এই সকল শিষ্য তন্ত্রমার্গের প্রবর্তক ছিলেন।

কৌলমত—কৌলদের মধ্যে পূর্বকৌল ও উত্তরকৌল নামে দুইটি বিভাগ ছিল। পূর্বকৌলদের মতে শিব ও শক্তি আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবী নামে পরিচিত। ভৈরব ও ভৈরবীর সমরস হইল 'পরানন্দ'। এই মতে ভৈরব ও ভৈরবীর মধ্যে 'শেষশেষিভাব' স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ভৈরব হয় শেষি এবং ভৈরবী বা শক্তি হয় শেষ; অথবা ভৈরবী হয় শেষি আর ভৈরব হয় শেষ। এই শেষশেষিভাব বিশেষ বিচারযোগ্য তত্ত্ব। আনন্দভৈরব এবং আনন্দভৈরবীর যখন তাদাত্ম্য অবস্থা, তখন সেই স্থিতিতে শেষশেষিভাব আপেক্ষিক। সৃষ্টির আদিতে ভৈরবীর প্রাধান্যের জন্য তিনি মহাভৈরবী এবং প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন। তাঁহার এই প্রাধান্যই শেষিত্ব। আনন্দভৈরব তখন অপ্রধান, গৌণ বা 'শেষ' হইয়া যায়। উপসংহারকালে প্রকৃতি তন্মাত্রাতে অবস্থিত হয় এবং ভৈরবী স্বাত্মাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তখন ভৈরব হয় 'শেষি' এবং ভৈরবী হয় 'শেষ'। এরূপ অবস্থায় একমাত্র ভৈরব কারণরূপে অবস্থান করেন। পূর্বকৌল মতের ইহাই সারাংশ।

কিন্তু উত্তরকৌলগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে সর্বদা শক্তিরই প্রাধান্য থাকে, তাই শক্তি কখনও শেষ হয় না। শিব পঞ্চতত্ত্বরূপে

পরিণত হইয়া যান, কিন্তু শক্তি সর্বদাই তত্ত্বাতীত থাকেন। শক্তি যখন কার্যরূপ সমগ্র প্রপঞ্চকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া কারণরূপে অবস্থান করেন, তখন উহার নাম হয় "আধার কুণ্ডলিনী"। ইহাই সংক্ষেপে পূর্বকৌল মত হইতে উত্তরকৌল মতের পার্থক্য।

কৌলমতের উপাসনা সম্পর্কে আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"কৌলমতে বিন্দুর স্থান ত্রিকোণ অর্থাৎ আধারচক্র। ঐখানেই বিন্দুর আরাধনা কর্তব্য। কৌলগণ ত্রিকোণ নিত্য বিন্দুর অর্চনা করেন। ...তাই কৌলদের আধারচক্রই এবং ঐ চক্রে স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিই পূজার বিষয়। এই কুণ্ডলিনী শক্তি বিন্দুরূপা। ইহা স্বভাবতঃ সর্বদাই নিদ্রামগ্ন থাকে। ইহার 'জাগরণ-ক্ষণ'ই কৌলদের পরিভাষাতে 'মোক্ষপদ'-বাচ্য। এইজন্য কৌলদিগকে 'ক্ষণমুক্ত' বলে।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' (১/২৩) হইতে জানা যায় যে ভৈরবী বা ভৈরবচক্রে কৌলগণ শক্তি উপাসনার জন্য একত্র হইতেন। ঐ সময় তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকিত না। প্রত্যেক উপাসককে তৎকালস্থায়ী বিবাহ করিতে হইত এবং কুলাঙ্গনারূপে যাহাদিগকে গ্রহণ করা হইত, তাহারা অধিকাংশস্থলে সমাজের নিম্নস্তরের জাতিভুক্ত হইত, যেমন—ধোপানী, নাপিতানী, নর্তকী ইত্যাদি।

'গুহ্যসমাজে' (৩০০–৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রজ্ঞাভিষেকের কথা আছে। তাহাতেও আছে যে অভিষেক-কর্তা গুরুই শিষ্যের তৎকালোচিত বিবাহের জন্য ঘটকের কার্য করিতেন। তিনি যোগাভ্যাসরতা শক্তিকে হাতে করিয়া লইয়া শিষ্যের হাতে স্থাপন করিতেন। এই বিবাহে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্যতীত চণ্ডালী, ধোপানী, নটী প্রভৃতি-জাতীয় কন্যারও সমুচিত স্থান ছিল।

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে কুলপ্রক্রিয়ায় দূতী ব্যতীত কোন কর্মে অধিকার জন্মে না। প্রসিদ্ধি আছে, পুরুষের পক্ষে যে সিদ্ধি লাভ করিতে এক বৎসর লাগে, তত্ত্বনিষ্ঠা স্ত্রীদের পক্ষে তাহা লাভ করিতে বারোদিনের অধিক সময় আবশ্যক হয় না। তাই নিয়ম আছে—

অতঃ সুরূপাং সুভগাং সরূপাং ভাবিতাশয়াম্।
আদায় যোষিতং কুর্যাদর্চনং যজনং হুতম্।। (তন্ত্রালোকটীকা, ১/১৩)

কুলপ্রক্রিয়ার দ্বারা জড় দেহও চিদেকরস হইয়া যায়। অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডকে অগ্নিময় করে তদ্রূপ কৌলিক সিদ্ধিপ্রাপ্ত দেহকে চিন্ময় করে। কৌলমতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'কুলনায়িকা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে কুণ্ডলিনী শক্তি 'কুল' বা দেহের নায়িকা। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবেই চিত্তের সহিত দেহের একাত্মতা সিদ্ধ হয়।"

(তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্দর্শন, পৃ ৩৯/৪৩)

প্রাচীনকাল হইতেই কৌলমতের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কৌল উপাসনা চরম ভূমি। ইহার অধিকারী একান্তই দুর্লভ। তাই অধিকারসম্পন্ন না হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে বিরুদ্ধাচার অবশ্যম্ভাবী। তপস্যা, মন্ত্রসাধনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই কৌলজ্ঞান ধারণ কবিবার যোগ্যতা লাভ হয়।

নব বূ্যহ—নব ব্যূহের বিশ্লেষণ করিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, আনন্দ-ভৈরবের (শিবের) স্বরূপে নব ব্যূহ একীভূত হইয়া বিদ্যমান্। নব ব্যূহ বলিতে বুঝায়—(১) কালব্যূহ অর্থাৎ নিমেষাদি কল্পান্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন কাল। সূর্য ও চন্দ্র কালাবচ্ছেদক হওয়াব দরুণ কালব্যূহের অন্তর্গত। (২) কুল ব্যূহ অর্থাৎ নীলাদি রূপব্যূহ। (৩) নামব্যূহ অর্থাৎ সংজ্ঞাস্কন্ধ। (৪) জ্ঞানব্যূহ অর্থাৎ বিজ্ঞানস্কন্ধং সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে ইহার দুই ভাগ। (৫) চিত্তব্যূহ—অহঙ্কার, চিত্ত, বুদ্ধি, মহৎ ও মন; ইহারা পঞ্চ স্কন্ধের নামান্তর। (৬) নাদব্যূহ—রাগ, ইচ্ছা, কৃতি ও প্রযত্ন-স্কন্ধ। (৭) বিন্দুব্যূহ—ইহা ষট্চক্রসংঘেরই নামান্তর। (৮) কলাব্যূহ—ইহা বর্ণাত্মক পঞ্চাশ কলার সমষ্টি। (৯) জীবব্যূহ—ইহা ভোক্তৃবর্গের নামান্তর। কৌলগণ বলেন—

নবব্যূহাত্মাকা দেবঃ পরানন্দপরাত্মকঃ।
নবাত্মা ভৈরবো দেবো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥
পরানন্দ পরাশক্তিশ্চিদ্রূপানন্দ ভৈরবী।
তয়োর্যদা সামরস্যং সৃষ্টিরূপৎপদ্যতে তদা॥

'নাদব্যূহ' সম্পর্কে কবিরাজ মহাশয় যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এস্থলে উহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী ভেদে মাতৃকাশক্তির চার রূপ নাদব্যূহের অন্তর্গত। পরাশক্তি অন্তঃকরণে স্ফুরিত হয়। যোগীরা কেবল যুক্তাবস্থায় ইহার পরিচয় পায়। কামকলা বিদ্যায় ইহাকেই পরা মাহেশ্বরী বলা হয়। এই পরাবাক্ যখন অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে প্রতিভাসমান হয়, তখন উহার নাম হয় পশ্যন্তী। তখন ইহা ত্রিমাতৃকাত্মক হইয়া চক্ররূপ ধারণ করে—"স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাদিমাতৃকাত্মা চক্রতাং যাতা।" ত্রিমাতৃকা শব্দেব অর্থ ত্রিখণ্ডযুক্তা পঞ্চদশাক্ষরী মাতৃকা। ইহাই চক্ররূপে পরিণত হয়। এই পশ্যন্তী বাক্‌কে যুক্তাবস্থায় অতিসূক্ষ্মরূপে অনুভব করা যায়। পরা ও পশ্যন্তী এই দুই বাক্ হইতে মধ্যমা বাকের উদয় হয়। ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভেদ। বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকা এই চার শক্তির সমষ্টি অবস্থার নাম সূক্ষ্ম মধ্যমা; ইহাদের ব্যষ্টি অবস্থাই স্থূল মধ্যমা।

কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শক্তি ও শিবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপমাচ্ছলে বাক্ বা শব্দ এবং অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি প্রসঙ্গে শব্দই যে অর্থরূপে বিবর্তিত হয় ইহা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনশাস্ত্রে সর্বত্র এই শব্দ ও অর্থের নিগূঢ় সম্পর্কের

কথা কীর্তিত হইয়াছে। 'সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

কুলমার্গের প্রবর্তন—ভৈরবী হইতে মহাজ্ঞান অবতীর্ণ হইয়া ভৈরব অথবা স্বচ্ছন্দে স্থিত হয়। তাহার পর অবরোহক্রমে মৎস্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত নামিয়া আসে। এই মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কুলমার্গের গুরু ছিলেন। কুলমার্গের আদি স্থান কামরূপ মহাপীঠ। মীননাথ কামরূপ পীঠের অধীশ্বর ছিলেন এবং তুর্যনাথ নামে তান্ত্রিক মণ্ডলে পরিচিত ছিলেন। কৌলাচার্য মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য পরম্পরাতে দীর্ঘকাল পরে সুমতিনাথ নামে দক্ষিণ পীঠের একজন সিদ্ধপুরুষ গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুমতিনাথের শিষ্য সোমদেব কুলমার্গের উপদেষ্টা ছিলেন। সোমদেবের শিষ্য ছিলেন শম্ভুনাথ। ইনি জালন্ধর পীঠ হইতে খ্যাতি লাভ করেন। শম্ভুনাথের শিষ্য জগৎপ্রসিদ্ধ মহামহেশ্বরাচার্য অভিনবগুপ্ত। ইনি তন্ত্রপ্রক্রিয়া ও কুলপ্রক্রিয়া উভয়েই সিদ্ধ ছিলেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার কৌলগুরু শম্ভুনাথের মত সম্বন্ধে স্বীয় গ্রন্থে বহুস্থানে অসীম শ্রদ্ধাসহকারে বহু কথা বলিযাছেন। শম্ভুনাথের দূতী ছিলেন ভগবতী নাম্নী কোন সিদ্ধা রমণী। অভিনবগুপ্ত দূতীসহ স্বীয় কৌলগুরুকে 'তন্ত্রালোকে' নমস্কার করিয়াছেন (তন্ত্রালোক, ১/৩১)। প্রত্যভিজ্ঞা ও ক্রমবিজ্ঞানের গুরু ছিলেন লক্ষ্মণগুপ্ত (তন্ত্রালোকটীকা, ১/২১৩)

কবিরাজ মহাশয়ের অনুসরণে কৌল সিদ্ধান্ত তথা আচারের প্রতিপাদক কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল; যথা—কুলার্ণব, কুলচূড়ামণি, রুদ্রযামল, দেবীযামল, কুলপঞ্চামৃত, কুলতন্ত্র, কুলামৃত, কুলকমল, কুলগহ্বর, কুলতত্ত্বসার, কুলদীপিনী, কুলপঞ্চাশিকা, কুলপ্রকাশ, কুলমত, কুলমূলাবতার, কুলরত্নমালা, কুলরত্নাবলী, কুলশাসন, কুলসংগ্রহ, কুলসর্বস্ব, কুলসার, কুলেশ্বর, কুলাবতার, কুলার্চনতন্ত্র, কুলাম্নায়, কুলানন্দসংহিতা, কুলাগম, কৌলতন্ত্র, কুলোত্তম, কুলোড্ডীশ, কৌলিকার্চনদীপিকা, আগমসাব, বামকেশ্বরতন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র, পরমানন্দতন্ত্র, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, কুলপ্রদীপ (শিবানন্দ কৃত), রহস্যার্ণব ইত্যাদি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্যাপ্রেমিকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, আর্থর এবেলন, ঢাকার (অধুনা বাংলাদেশ) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, সুলভতন্ত্রের প্রকাশক শরৎকুমার সেন, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, আগমানুসন্ধান সমিতি, কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজের অমূল্য গ্রন্থরত্ন, ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজের কতিপয় গ্রন্থ, গায়কয়াড় সংস্কৃত সিরিজ (বরোদা) এবং চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ (কাশী), গণেশ কম্পানী (মাদ্রাস), এশিয়াটিক সোসাইটি (কালিকাতা), মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়, পীতাম্বরপীঠ, কল্যাণ মন্দির (প্রয়াগ), বাণী-বিলাস প্রেস (শ্রীরঙ্গম্), বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগতন্ত্র বিভাগ প্রভৃতি সংস্থা এবং ব্যক্তির নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য।

তান্ত্রিক ধর্ম-প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্য

সাধারণ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যে মত প্রচলিত এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত-প্রস্থানের গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে, আজকাল উহাকেই একমাত্র শঙ্করমত বলিযা ধরা হয়। আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে শ্রীশঙ্করাচার্য একদিকে যেমন বৈদিক ধর্মের সংস্থাপক ছিলেন, অপরদিকে তেমনি তান্ত্রিক ধর্মের প্রচারক ও উপদেষ্টা ছিলেন। আগম এবং নিগম উভয় মার্গের সম্প্রদায়-প্রবর্তক হিসাবেই শঙ্করাচার্য জগদ্‌গুরু পদের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মেতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্যের শুধু আগম শাস্ত্রের সহিত পরিচয় ছিল তাহা নহে, অনেক আগম গ্রন্থের রচনা ও ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করের তান্ত্রিক রচনাবলী মধ্যে 'প্রপঞ্চসার' প্রধান। ইহার পরই 'সৌন্দর্যলহরী'।

"কাশ্মীর শৈবাগম প্রতিপাদক প্রত্যভিজ্ঞা মতের সহিত ত্রিপুরা সিদ্ধান্তের অথবা শ্রীবিদ্যার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শঙ্করাচার্য শ্রীবিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। শৃঙ্গেরীমঠে আজও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীচক্র বিরাজিত, আজও সেখানে উহার উপাসনা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ বেদান্তী ছিলেন, অপরদিকে তেমনি আগম সিদ্ধান্তেরও পূর্ণ জ্ঞাতা ছিলেন। আগম মার্গে তিনি সময়াচাব অনুসরণ করিতেন। 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' তাঁহারই রচনা। ইহা ছাড়া গৌড়পাদাচার্য শ্রীবিদ্যার প্রতিপাদনার্থে 'সুভগোদয়' নামক একটি স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে শঙ্করাচার্য ইহার উপর এক টীকা লিখিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহার অনুকরণে তিনি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ 'সৌন্দর্যলহরী' নামক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ সৌন্দর্যলহরীকে শঙ্করাচার্যের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করে না। কিন্তু আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে ইহা শঙ্করাচার্যের রচনা। এ বিষয়ে কবিরাজ মহাশয় পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীর মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন—

"The fact that Shri Sankaracharya was a reformer in his days of the Shakta cult as a various others, the very important part still played by Shakti Worship in all the Advait Mutts, the identity of the soul and the Goddess spoken of in verse 22, the reference to Vedanta

in verse 84, the peculiar style of the hymn, and an impartial reference to, and an attempt to unify the peculiar doctrines of, the mutually opposed sects of Samayamarga and Koulamarga, and lastly, the unanimous testimony of such writers as Lakshmidhara and Bhaskararaj all these incline me to believe that hymn is a genuine work of Shri Sankaracharya."

(Perface to Soundaryalahari P. VII, Mysore Oriental Series)

সৌন্দর্যলহরীর উপর সুরেশ্বরাচার্যের রচিত টীকা আছে; শৃঙ্গেরী মঠে এই টীকার এক অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বর্তমান আছে।[১] প্রপঞ্চসার-গ্রন্থ শঙ্কর রচিত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার উপর পদ্মপাদাচার্যের টীকা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন সময়ে লিখিত এই টীকার দুইটি হস্তলিখিত পুঁথি আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সূতসংহিতা ও পরাশরসংহিতার টীকায় মাধবাচার্য প্রপঞ্চসারকে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্টও ইহা বলিয়াছিলেন। সম্মোহন-তন্ত্রে শঙ্করাচার্য ও তাঁহার চার শিষ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিচার কবিয়া শঙ্করাচার্যকে শাক্তাগমের, বিশেষতঃ ত্রিপুরাগমের, এক প্রধান আচার্য বলিয়া মানিতে হয়।

শঙ্করাচার্যের 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র' এবং ইহার উপর সুরেশ্বরাচার্য-কৃত 'বার্ত্তিক' দেখিয়া একথা আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, 'দক্ষিণামূর্ত্তি' ত্রিপুরা-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী। 'দক্ষিণামূর্তি-সংহিতা', 'দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ' প্রভৃতি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মতকে প্রতিপাদন করিবার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গুরুতত্ত্ব কিংবা স্বাত্মদেবতা দক্ষিণামূর্তির আকারে বর্ণনা করায় শঙ্করাচার্যের আগমানুরাগ প্রমাণিত হয়। এই স্তোত্রেব প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্ব স্বাত্মগত তথা দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায়। অর্থাৎ, বস্তুতঃ এই বিশ্ব আপনার মধ্যে অন্তর্গত, কিন্তু মায়ার ক্রিয়ায় বহির্বৎ মনে হয়। 'প্রবুদ্ধ' অবস্থায় মায়ার প্রভাব নষ্ট হইলে, পুনরায় এই বিশ্ব আপন অদ্বয় আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎকার হয়। এখানে বিশ্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এ বিশ্ব চিন্ময়, নিজ স্বাতন্ত্র্যের বিলাস এবং আত্মভিত্তিস্থ চিত্ররূপে অঙ্গীকৃত, জড়রূপে নহে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আবির্ভাবের

[১] "কাশীবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী দীর্ঘকাল ধরিয়া শৃঙ্গেরি মঠে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন উনি সুরেশ্বরাচার্যের টীকা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে এই টীকার বিষয়ে আমি (আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ) শুনিয়াছিলাম।"

পূর্বে নির্বিকল্পাবস্থায় বর্তমান থাকে—ইহা স্বগতাদি ভেদ-কল্পনাবিহীন শক্তিমাত্র। অঙ্কুর উদগমের পূর্বে বীজ-রূপে যেমন থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। পরে মাযার দ্বারা দেশ ও কাল কল্পিত হইয়া উহা নানাপ্রকার বিচিত্র আকারে প্রতিভাত হয়। যিনি মহাযোগীর ন্যায় কেবল স্বেচ্ছায় এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের বিজৃম্ভণ করেন, তিনিই আত্মদেব, গুরুদেব। এখানে যে মহাযোগীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইযাছে, প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিপুরা-দর্শনেও ঠিক এই দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় এবং জগতের সৃষ্টি যে ইচ্ছাশক্তিমূলক—উপাদাননিরপেক্ষ—ইহার বিচার করা হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞা-কারিকায় উৎপলদেব বলিয়াছেন—

চিদাত্মৈব হি দেবোঽন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।
যোগীব নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ॥

অর্থাৎ, সৃষ্টি-শব্দের অর্থ হইল অন্তঃস্থিত পদার্থের বহিঃপ্রকাশ। সকল পদার্থ চিদাত্মার অন্তঃস্থিত, কেবল ইচ্ছাবশে কখন কখন কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই বহিঃপ্রকাশনই সৃষ্টিশব্দের অর্থ। সুতরাং, বলা বাহুল্য এই প্রকার সৃষ্টিতে উপাদানের অপেক্ষা থাকে না। ইচ্ছাশক্তির অবলম্বনে যখন বস্তু-নির্মাণ হয়, তখন পূর্বসিদ্ধ পরমাণুর প্রয়োজন থাকে না। যিনি যোগীর সৃষ্টি-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি এই দৃষ্টান্তের সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন, যোগীর সৃষ্টিও পরমাণুসাপেক্ষ—যোগী যখন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন, তখন উহারই প্রেরণায় সমস্ত পরমাণু স্বয়ং আসিয়া একত্রিত হয়। কিন্তু অভিনব গুপ্ত উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই প্রকার কল্পনার কোন ভিত্তি নাই—

নহি এবং বক্তুং শক্যম্—পরমাণবো যোগীচ্ছয়া ঝটিতি সংঙ্ঘটিতাঃ কার্যমারভ্যন্তে ইতি (ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, পৃষ্ঠা ১৩৮)

ইহার কারণ এই যে পরমাণুবাদী সাক্ষাৎভাবে পরমাণু পুঞ্জের দ্বারা স্থূল বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা বলেন যে মধ্যে অবান্তর অবয়ব সমূহের ব্যবধান হয়। ঘট-নির্মাণকালে কেবল পরমাণু সমূহের বিশিষ্ট সংস্থানে অর্থাৎ ঘটাকারে সন্নিবেশিত করা সাক্ষাৎভাবে সম্ভব নয়। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকের সম্মিলন হইতে এসরেণু—এই প্রকার ক্রমশঃ স্থূলতর কার্যের উৎপত্তি হয়। পুনরায় কপাল নির্মিত হইবার পর দুই কপালের পরস্পর সংযোগ হইতে ঘট সৃষ্টি হয়। শুধু তাহাই নহে। লৌকিক সৃষ্টিতে অথবা উপাদান সাপেক্ষ সৃষ্টিতে সহকারীর সাহায্য আবশ্যক এবং শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রকর্ষতা সাধন প্রয়োজন। নতুবা বস্তু নির্মাণ হয় না। কিন্তু যোগীর সৃষ্টিতে এ-সবের কিছুই অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যোগীও পূর্বসিদ্ধ পরমাণু অবলম্বন করিয়া

সৃষ্টি করেন---এরূপ কল্পনা অমূলক। যোগীর জ্ঞানের এইরূপ মহিমা যে আভাস-বৈচিত্র্যময় পদার্থসমূহ ইচ্ছামাত্রেই প্রকাশিত হয়। আসল কথা হইল এই যে সংবিদ্ স্বাতন্ত্র্যময়ী (free), যখন উহাতে ইচ্ছার উদয় হয়, তখন তাঁহার অপ্রতিহত ইচ্ছার দরুণ অন্তঃস্থিত, অর্থাৎ জ্ঞানরূপে অথবা আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থিত পদার্থসমূহ জ্ঞেয়রূপে অবভাসিত হয়। যাহা 'অহং' রূপে দ্রষ্টার সহিত একাকার ছিল, তাহা 'ইদং' রূপে পৃথকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কল্পিত প্রমাতা, অর্থাৎ দেহাদিতে তাদাত্ম্যবোধযুক্ত দ্রষ্টার সমীপে—পরিচ্ছিন্ন সংবিদের সামনে---এই পদার্থ বাহ্য বলিয়া প্রতীত হয়।" ইত্যাদি। (উদ্ধৃত অংশটি কবিরাজজীর 'শঙ্কর অউর আগম-সম্প্রদায়' হিন্দী প্রবন্ধের সারাংশ। বাংলায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।)

অতএব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন ও ত্রিপুরা-দর্শনের সিদ্ধান্ত এক, কোন ভেদ নাই। এইসব বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে শঙ্করাচার্য ও সুরেশ্বরাচার্য এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে আগমেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত ছাডাও তান্ত্রিকাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের শক্তির প্রাধান্য স্বীকারের ব্যাপারে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিযাছেন। নিম্নে সেই ঘটনার কথাটি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হইল।

"বেদান্ত দর্শনের প্রচারকর্তা দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান্ শঙ্করাচার্য যখন দিগ্দিগন্ত জয় করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়েন, তাঁহার সেই প্রখরতর বিচার-শরে জর্জরিত হইয়া অন্যান্য দার্শনিকমণ্ডলী যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, কি জানি জগদম্বার কেমন লীলা, সেই সময়েই তিনি শৈব-সম্প্রদায়ের উল্লাস-তরঙ্গ সম্বর্দ্ধিত করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নির্ঘাত বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছিলেন। শিব হইতে অতিরিক্ত 'শক্তির অস্তিত্বই নাই' ইহাই প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাক্তগণ তাঁহার এই ঘোর অত্যাচারে, বহির্বিচারে পরাস্ত হইলেও অন্তর্বিচারে পরাস্ত হয়েন নাই। কিন্তু উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে এই নাস্তিকবাদ ঘোষণা দেখিয়া নিতান্তই মর্মাহত হইয়াছিলেন। সাধকের সে মর্মবেদনা বুঝিতে অন্তর্যামিনী ভিন্ন আর কে আছে? কিন্তু শঙ্করাচার্য তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কারণ 'শিবের কাশী' এই পর্যন্তই তাঁহার ধারণা। কাশীর আবার অধীশ্বরী কেহ আছেন, ইহা তাঁহার তখনও অবিদিত; তাই ভক্তের হৃদয়-বেদনা দূর করিবার জন্য, ভক্তাবতার শঙ্করাচার্যের ভ্রান্তিপট উত্তোলিত করিবার জন্য, শক্তিরূপিনীর সিংহাসন টলিল। একদিন মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অশ্রান্ত বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য ক্লান্তকলেবরে মণিকর্ণিকাব ঘাটে শয়ন করিয়া বিশ্রাম এবং শক্তিবাদ খণ্ডনের বিজয়ানন্দ অনুভব করিতেছেন, এই সময় দেখিলেন একটি ক্ষুদ্র

কুম্ভ কক্ষে করিয়া একটি সৌম্যমূর্ত্তি বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘাটের দিকেই আসিতেছেন। শঙ্করাচার্য দক্ষিণদিকে শীর্ষ-স্থাপন এবং উত্তরদিকে চরণ-বিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাহাতে গমন-পথটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়াছে। বালিকা তাঁহার নিকট আসিয়া অতি বিনীত বচনে বলিলেন, ভগবন্! চরণ উত্তোলন করুন আমি কলসীটি জলপূর্ণ করিযা লইয়া যাই। শঙ্করাচার্য বলিলেন, যাও মা! আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যাও, তাহাতে দোষ নাই। বালিকা বলিলেন, সে কি? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিব কি করিয়া? জ্ঞান-গর্বিত শঙ্করাচার্য হাসিয়া বলিলেন, মা, তুমি একে অজ্ঞান স্ত্রী-জাতি, তায় আবার বালিকা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, এ সকল ভেদ কেবল অজ্ঞান-বিজৃম্ভন, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমার্থতঃ সমস্তই ব্রহ্মময়। তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, তাহাতে পাপ হইবে না। বালিকা তখন অতি কাতরা হইয়া বলিলেন, প্রভো! আপনিই তো বলিতেছেন, আমি অজ্ঞান স্ত্রীজাতি, ওরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার তো আমার নাই। আমি কিছুতেই ব্রাহ্মণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার চরণ উত্তোলন করুন, আমি চলিয়া যাই। শঙ্করাচার্য তখন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, মা! তোমাকে বারংবার বলিতেছি তথাপি শুনিতেছ না? আমার শরীর বড়ই পরিশ্রান্ত, আবার কি জানি অকস্মাৎ কি হইল, আর যেন পা উঠাইবার শক্তি নাই। বালিকা একটু ভীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনার শক্তি নাই ইহা জানিলে আমি চরণ উত্তোলন করিতে বলিতাম না। আপনার তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবার অনুপযুক্ত পাত্রী আমি, তাই ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘন-ভয়ে বড়ই ভীত হইয়া বারংবার আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলিয়া 'শক্তি নাই' এই কথাটি প্রথমে খুলিয়া বলিলে আমি নিজেই আপনার চরণ উত্তোলন করিয়া জলে নামিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে অনুমতি হয় তো আমিই চরণ উত্তোলন করিয়া দেই। শঙ্করাচার্য বালিকার বাক্যে বিশেষ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, যাহা তোমার ইচ্ছা করিতে পার। বালিকা তখন স্বহস্তে তাঁহার পদদ্বয় উত্তোলিত এবং পথ হইতে অপসারিত করিয়া জলে অবতীর্ণা হইলেন এবং কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল হইতে সোপান-পরম্পরায় উত্তীর্ণা হইলেন। শঙ্করাচার্য তখন নিতান্তই অবসন্ন দেহে কাতরকণ্ঠে বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা! অনেকক্ষণ হইতে পিপাসায় কাতর হইয়া আছি, আমায় একটু জল দিয়া যাও। বালিকা তখন হাসিয়া বলিলেন, কেন? আপনি ত জলের তীরেই রহিয়াছেন, তবে পিপাসায় এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? শঙ্করাচার্য আবার বলিলেন, আর কতবার বলিব? আমার উঠিবার শক্তি নাই। বালিকা তখন নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া গম্ভীর রবে গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত

করিয়া বলিলেন—শঙ্কর! তুমি না শক্তি মান না? সেই মর্মভেদী গম্ভীরধ্বনির প্রতিধ্বনিতে আহত হইয়া শঙ্করাচার্য বিদ্যুচ্চকিত সুপ্ত শিশুর ন্যায় একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনর্বার সভয়ে যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন অমনি দেখিলেন, বালিকার আরক্ত লোচনপ্রান্তে শত শত চন্দ্র সূর্যের জ্যোতিস্তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে, অমনি মা! বলিযা উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া দুটি চরণ জড়াইয়া ধরিবার জন্য যেমন দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ লীলাময়ীর লীলাভঙ্গ হইয়া গেল। জ্যোতির্ময়ীব বালিকারূপ-মহাজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইলেন। সেই জ্যোতিঃ হারাইয়া শঙ্করাচার্য যে অন্ধকারে ডুবিলেন তাহা ব্যথার ব্যথিত ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ব-পর্বত-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মময়ী পবতরাজনন্দিনীর একটি কটাক্ষ বজ্র-ক্ষেপে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। তখন অধঃপতিত অন্ধের ন্যায় মাতৃহারা শিশুর ন্যায় 'মা আমার'! কোথায় গেলে? বলিযা প্রমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে অন্নপূর্ণার মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ মায়ের সন্তান মায়ের হইয়া মা বলিয়া মায়ের মন্দিরে আসিতেছেন, ইহা আশ্চর্য না হইলেও শক্তি-নাস্তিক শঙ্করাচার্যের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখিযা শাক্তগণ মায়ের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পডিলেন। তাঁহাদিগের 'জয় জগদম্বা' রবে মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য সেই শাক্তভক্ত-কদম্ব সম্বেষ্টিত হইযা কাশীশ্বরের অধীশ্বরী ত্রৈলোক্য-রাজরাজেশ্বরীর মন্দির দ্বারে আসিয়া ঘোরাপরাধভয়-কম্পিত কলেরবে আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর সেই সুরাসুর মুকুট-তট-বিঘৃষ্ট চরণ-পীঠে মস্তক স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

(সৌন্দর্যলহরী)

মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন তবেই তিনি নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্যথা (শক্তি বিরহিত হইলে) প্রভুত্ব দূরে থাক, আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে নিজ নয়ন স্পন্দনেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে, তন্ত্রমতে শক্তি শব্দের ইকার—শিব যতক্ষণ শক্তিযুক্ত—ইকার বিশিষ্ট ততক্ষণই শিব, শক্তি বিরহিত (ইকারবিহীন) হইলেই শিব আর তখন শিব নাই, নিস্পন্দ শব। অতএব তুমি জগদারাধ্য হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধ্যা আদ্যাশক্তি, মা! তোমার যে ত্রৈলোক্যদুর্লভ চরণাম্বুজে ব্রহ্মাদির মস্তক লুণ্ঠিত হয় সেই চরণে মস্তক প্রণত করিতে বা স্তব করিতে অকৃতপুণ্য আমি কিরূপে সমর্থ হইব? অর্থাৎ

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যে শক্তি-তত্ত্বের আংশিক মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তোমার সেই স্ব-স্বরূপ শক্তি-তত্ত্ব তুমি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া না দিলে কাহার সাধ্য তাহা অবগত হইতে পারে? জন্ম-জন্মান্তরের সাধন-জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকিলে সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় না—তাই অবাঙ্মনোসগোচরা তারার তত্ত্ব জীবের আয়ত্ত নহে, তাই জীব তোমার ক্রোড়ে থাকিয়াও মা! তোমায় চিনিতে পারে না। মা! আমার আজ সেই দশা। কৃত অপরাধ-ভয়ে তোমার স্তব করিতে প্রণাম করিতে কিছুতেই আর সাহস হয় না। শঙ্করাচার্য এইরূপ একশত শ্লোকে জগদম্বার রূপ গুণ মহিমাত্মক স্তব করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

প্রদীপজ্বালাভি র্দিবসকর-নীরাজনবিধিঃ,
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপল-জললবৈবর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলঃ নিধিসৌহিত্য করণং,
ত্বদীয়াভির্বাগ্‌ভি-স্তব জননি! বাচাং স্তুতিরিয়ম্‌॥
(সৌন্দর্যলহরী)

অন্তর্যামিনী জগদম্বে! প্রদীপের তেজে সূর্য্যদেবের নীরাজন-বিধি (আরাত্রিক ক্রিয়া) চন্দ্রকান্ত মণির জলকণাদ্বারা চন্দ্রের জন্য অর্ঘ্য-রচনা, সমুদ্রের জলদ্বারা সমুদ্রেব তর্পণ-বাসনা ইহাও যাহা, তোমাব প্রসাদে উচ্চারিত বাক্যাবলী দ্বারা তোমার স্তব করাও তাহাই। ভগবান শঙ্করাচার্য এইরূপে কৃতার্থ হইয়া নিজ শিষ্যানুশিষ্য সূত্র-পরম্পরাতেও যাহাতে আর কেহ কখনও শক্তিসাধন সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হন, বৈদিক মতে সন্ন্যাসী হইলেও যাহাতে তান্ত্রিক-দীক্ষাচ্যুত না হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তাই শঙ্করাচার্যের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় দণ্ডিমণ্ডলী মধ্যে যত স্থানে তাঁহাদের মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সর্বত্রই শ্রীযন্ত্র স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ত বর্তমান সময়েও নিত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তবে কোথাও বা ব্যক্ত, কোথায় বা গুপ্ত।.....তাঁহার যে স্বকৃত স্তবের আদ্যন্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল, এই স্তবেই তিনি শক্তিতত্ত্বের, শক্তি সাধনার এবং তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের যেরূপ গুরুগম্ভীর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তিনি কখনও শক্তি মানিতেন না, জানিতেন না বা উপাসনা করিতেন না—ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিবার উপায় নাই" (শক্তিতত্ত্ব, তন্ত্রতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-২৭১—২৭৫)।

উপরে উদ্ধৃত দুই মনীষীর আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদী আচার্য শঙ্কর 'সৌন্দর্যলহরী'রও স্রষ্টা। সৌন্দর্যলহরীর স্তবে ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনাই আলোচিত হইয়াছে। তান্ত্রিক উপাসনা প্রধানতঃ 'সময়াচার' এবং 'কৌলাচার' নামে প্রসিদ্ধ। হৃদয়াকাশে মূলাধারাদি বা মণিপুরাদি চক্রে ভাবনাত্মক মানস উপাসনাকেই সময়াচার বলে। সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—"ইহ খলু শঙ্করভগবৎ পূজ্যপাদাঃ সময়মত বেদিনঃ সময়াখ্যাং

চন্দ্রকলাং শ্লোকশতেন প্রস্তুবন্তি"। হৃদয়াকাশে ভাবনাত্মক মানস-উপাসনার পদ্ধতিই আচার্য শঙ্কর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠাদিতে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর কেনোপনিষদের ভাষ্যে 'হৈমবতী' শব্দটির দুই রকম অর্থ করিয়াছেন ; যথা—"হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ, অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেন সহ বর্ত্ততঃ।" অর্থাৎ হৈমবতীর এক অর্থ হইল, 'হেমাবরণ-সম্পন্না' ; অথবা অন্য অর্থ হইল, 'সর্বজ্ঞ শিবের সহিত নিত্যযুক্তা হিমালয়সুতা উমা'। হৈমবতী উমা শিবের সঙ্গে নিত্যযুক্তা অর্থাৎ অভিন্না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি যে অভিন্ন, শিব এবং উমা যে এক—ইহাই আচার্য শঙ্কর এই ভাষ্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শিবশক্ত্যাত্মক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান—এই কথাই সৌন্দর্যলহরীতে পরিস্ফুট। অতএব এই ভাষ্যই প্রমাণ করে যে সৌন্দর্যলহরী আচার্য শঙ্করেরই রচিত। সুতরাং সৌন্দর্যলহরীকে বাদ দিলে আচার্য শঙ্করকে ঠিকমত বুঝা যাইবে না।

সময়াচারপরায়ণ সাধকগণের মতে শিরঃস্থিত চন্দ্রমণ্ডলই শ্রীচক্র। আচার্য শঙ্করও সময়াচারী ছিলেন। যোগমার্গের সঙ্গে সময়াচারের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। শরীরের বহির্ভাগে যে আকাশ তাহার নাম বাহ্যাকাশ আর শরীরের মধ্যবর্তী হৃদয়াকাশের নাম দহরাকাশ। সময়াচারী সাধকগণের মতে, ত্রিকোণাদি ষট্‌চক্রই দেহস্থিত মূলাধারাদি ষট্‌চক্ররূপে এবং বিন্দুস্থান শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মের অন্তর্গত চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিণত হইয়াছে। সময়াচার রীতিতে মস্তকস্থ চন্দ্রমণ্ডলেই বিন্দুর উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর এই স্থানেই শ্রীচক্রের উপাসনা বা ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আচার্য শঙ্করকে যদি সময়াচারী শাক্ত আখ্যা দেওয়া হয়, তবে তাহা মোটেই অসঙ্গত হইবে না। কারণ তিনি শুধু নির্গুণ ব্রহ্মের মহিমার কথাই প্রচার করেন নাই ; সৌন্দর্যলহরী রচনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মশক্তির মহিমাও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের জীবনে আগম ও নিগমের দুইটি ধারাই সম্মিলিত হইয়াছিল। সময়াচার মতে শ্রীচক্রের উপাসনা যিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তিনি কেবল শক্তি-বিরহিত অদ্বৈত জ্ঞানেরই পূজারী ছিলেন, ইহা বলিলে সম্পূর্ণ ভুল বলা হইবে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শঙ্করাচার্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া শুধু ধর্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পরন্ত উহার রক্ষণেরও একটি স্থায়ী সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার মানসে ভারতের চারিটি প্রান্তে—দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন-মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় শারদামঠ, এবং উত্তরে বদরিকাশ্রমের নিকট জ্যোতির্মঠ—চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিজন সুযোগ্য শিষ্যের উপর মঠগুলি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই চারিজন মঠাধীশের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদের চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভারতের চারি অংশে তাহাদের কর্মক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সব সন্ন্যাসীরা 'পুরী, গিরি, ভারতী, তীর্থ, বন, অরণ্য, পর্বত, আশ্রম, সাগর ও সরস্বতী'—এই দশনামী সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। শিষ্যদের প্রতি শঙ্করাচার্য নির্দেশ দিয়াছিলেন, "দ্বারকাধাম, পুরীধাম, জ্যোতির্ধাম ও রামেশ্বর ধামের চার মঠের নাম হবে যথাক্রমে শারদামঠ, গোবর্ধনমঠ, জ্যোতির্মঠ ও শৃঙ্গেরীমঠ; আর শারদা মঠের অধীন তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, গোবর্ধনমঠের অধীন বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্মঠের অধীন গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরীমঠের অধীন সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকিবে। সন্ন্যাসীদের এই দশ সম্প্রদায় চার মঠের অধীন থেকে এই সকল মঠের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে ধর্মানুষ্ঠান ও প্রচার করবে।" (স্বামী অপূর্বানন্দ, আচার্য শঙ্কর পৃ-২৩৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগুরু ছিলেন পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরী। তোতাপুরী ছিলেন দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত 'পুরী'। সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা গুরুপরম্পরাক্রমে পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরী-সম্প্রদায়ের মূল মঠ শৃঙ্গেরীতে। শৃঙ্গেরী মঠের তথা পুরী-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষী বা ষোড়শী। আচার্য শঙ্কর যে দেবী ষোড়শী মূর্ত্তিকে কামাক্ষী নামে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুরমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শৃঙ্গেরী মঠে সেই দেবী ষোড়শই বিরাজমানা শ্রীযন্ত্রে মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। দক্ষিণ ভাবতে শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত, যেমন প্রচলিত বাংলাদেশে কালীর উপাসনা।

৫ জুন, ১৮৭২ (২৪শে, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) অমাবস্যা, তিথিতে ফলহারিনী কালিকাপূজার রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে পূজা করিয়াছিলেন। ইহা ষোড়শী পূজা নামে খ্যাত। আলিম্পন শোভিত পীঠে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা দেবী ষোড়শীর (একই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম) ঘট-পট-যন্ত্র বা মূর্তির বদলে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে বসাইয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে শ্রী শঙ্করাচার্য শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের সাথে সাথে তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। শুধু তাহাই নহে, নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গও শঙ্করাচার্যের শিষ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। শঙ্করাচার্যের শিষ্যানুশিষ্য স্বামী কেশব ভারতী তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু। ভারতী সম্প্রদায়ও শৃঙ্গেরী মঠের অধীন অর্থাৎ শক্তির উপাসক। তাই শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াও 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে'র সঙ্গে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাকে যুক্ত করিয়া ভক্তিভরে যুগলমূর্তির উপাসনা প্রবর্তন করিয়া যান। সুতরাং এই সমস্ত বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রী শঙ্করাচার্যের 'জগদ্গুরু' নাম প্রকৃতই সার্থক। (প্রবন্ধটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর লিখিত 'শাঙ্কর বেদান্ত ও অদ্বৈত প্রস্থানে'র সার নিষ্কাসন করিয়া রচিত)॥

কাশ্মীর শৈবাগম দর্শন

কাশ্মীর শৈবাগম দর্শন সাধারণতঃ 'প্রত্যভিজ্ঞা' দর্শন নামে অভিহিত হয়। 'প্রত্যভিজ্ঞা' দর্শন নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে কোন নূতন দর্শন-প্রণালীর অবতারণা করা হইতেছে। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন অভিনব তো নহেই, পরন্তু উহা ভারতীয় দর্শনের বিচার-ভাণ্ডারে এক অতি প্রাচীন দুর্লভ সম্পদ। এই দর্শন আজ প্রায় সাধারণের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। ম. ম. শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আজীবন ধর্মচর্চা, অধ্যাত্মোপদেশ দ্বারা এবং হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজীতে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করিয়া উক্ত দর্শনের মর্মগত ভাবধারার সহিত আমাদের পবিচয করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। যে কোন সজ্জন ব্যক্তি যদি তাঁহার গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তিনি প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। নিগম ও আগম অর্থাৎ বেদ ও তন্ত্রের তাৎপর্য কি এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি, এখানে ইহার বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে এই নিগম আর আগমের অভ্যন্তরে ভাবতবর্ষের সর্বপ্রকার সাধনার বীজ নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতকে 'নিগম কল্পতরুর গলিত ফল' বলা হইয়া থাকে। ম. ম. শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে "এই উক্তি আংশিকরূপে সত্য; কারণ শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ নিগমের, সেইরূপ 'আগমকল্পতরু'রও 'গলিত ফল'। পাঞ্চরাত্র আগমে যাহা কুসুমিত হইয়াছে তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে রসে ভরপুর পরিপক্ক ফলে পরিণত হইয়াছে। এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধান্তও শৈবাগমের সারভূত রসের পূর্ণতম বিকাশ।"

বাস্তবিকপক্ষে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' রূপ অপূর্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, সেই প্রকার 'স্বচ্ছন্দ', 'মালিনীবিজয়' প্রভৃতি আগম এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি নিগম-সমুদ্র মন্থন করিয়া কাশ্মীরীয় শৈবগণ 'ঈশ্বরাদ্বয়বাদ'-রূপ রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। উভয় দার্শনিক সিদ্ধান্তই ভারতীয় সাধনার গৌরব স্তম্ভ-স্বরূপ।

১। **নামকরণ**—'প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন' নাম বহু প্রাচীন নহে। মাধবাচার্য তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' এই নাম প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পর হইতে এই নামই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিযাছে। অবশ্য কাশ্মীরের শৈবাগম-সিদ্ধান্তমূলক 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়', 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী' প্রভৃতি প্রাচীন

গ্রন্থসমূহের নামকরণের মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। 'ন্যায়', 'বৈশেষিক' প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় 'প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন' কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষকে নির্দেশ করেনা। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে কাশ্মীর শৈবাগম দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম 'স্পন্দ'-শাস্ত্র আর দ্বিতীয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'-শাস্ত্র। স্পন্দ-শাস্ত্রের প্রচারক বসুগুপ্ত এবং প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্রের প্রবর্তক সোমানন্দ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এইরূপ বিভাগ কিছু অংশে সত্য হইলেও বিচারের দ্বারা প্রতীয়মান্ হয় যে ঐরূপ নির্দিষ্ট বিভাগ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা-প্রতিপাদক গ্রন্থ সমূহে অবান্তর বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদের আভাস থাকিলেও উভয় শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা-প্রণালীতে কোন ভেদ নাই। সুতরাং 'প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন' শব্দটি স্পন্দ এবং প্রত্যভিজ্ঞা উভয় মতেরই নির্দেশক। প্রাচীন সাহিত্যে 'ত্রিকদর্শন', 'মাহেশ্বর-দর্শন' প্রভৃতি নামই প্রথমে প্রচলিত ছিল কিন্তু মাধবাচার্যের অনুসরণে প্রত্যভিজ্ঞা নামের প্রচার বর্তমানে অধিকতর।

২। **প্রত্যভিজ্ঞাসম্মত অদ্বৈতবাদ**—যদিও আগম ও উপনিষদগুলির মধ্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সর্বপ্রকার দার্শনিক মতের সমর্থক মূল সূত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি অধিকার-ভেদ এবং রুচি-বৈচিত্র্য হেতু কোন কোন প্রস্থান কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণ উপনিষদ ও গীতার উপর যে সমস্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, উহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা নিরূপিত হয়। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যান্য দেশের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই প্রকার, আগমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাশ্মীর শৈবাচার্যগণ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য এক অভিনব দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত 'ঈশ্বরবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হইলেন আচার্য অভিনবগুপ্ত।

৩। **অদ্বৈতবাদের প্রকারভেদ**—আচার্য গৌড়পাদ 'মাণ্ডুক্যকারিকা'য় এবং আচার্য শঙ্কর 'শারীরক সূত্র' ও উপনিষদাদির ভাষ্যে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের যেরূপ ব্যাখা করিয়াছেন, আজকাল সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ শব্দের একমাত্র অর্থরূপে উহাই গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অদ্বৈত-প্রস্থানের অনেক প্রকার ভেদ আছে। 'ব্রহ্মবাদ' উহাদের অন্তর্গত এক মতবিশেষ-মাত্র। শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি আচার্যদের সিদ্ধান্ত শুদ্ধ অদ্বৈতমত নহে। আবার ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদেরও কখন অভাব ছিল না।

বৌদ্ধেরা অদ্বৈতবাদী। বুদ্ধদেবের এক নামই ছিল 'অদ্বয়বাদী'—ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় অমরকোষে। যদিও 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থে অনেক প্রকারের, বিশেষতঃ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের, দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় মত সমূহের বর্ণনা আছে এবং এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী মত কালক্রমে সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক—এই চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি এই সমস্ত মতের তাৎপর্য মাধ্যমিক প্রদর্শিত শূন্যবাদের মধ্যেই পর্যবসিত। ইহা বোধিচিত্ত-বিবরণকার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন—

"ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা"।

এই শূন্যবাদ নিঃসন্দেহে কঠোর অদ্বয়বাদ। সৎ, অসৎ প্রভৃতি কোটি-চতুষ্টয় হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে নাগার্জুনাদি আচার্যগণ এই শূন্য তত্ত্বকে দ্বৈত-বিকল্প হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব প্রকারে প্রয়াস করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য স্বয়ং ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বিজ্ঞানাদ্বৈত অথবা শূন্যাদ্বৈত সিদ্ধান্ত হইতে অনেকাংশে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।—ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বৌদ্ধাগমের 'সংবৃতি' শঙ্কর-দর্শনে 'মায়া' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্করের 'মায়া' প্রাচীন আর্য-ঋষিদের মায়া হইতে কিছু অংশে পৃথক। ফ্রান্স দেশের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পূসেঁ (Poussin) বেদান্ত এবং বৌদ্ধমতের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে 'গৌড়পাদকারিকা'য় বৌদ্ধভাবের প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও শঙ্করাচার্য যোগাচার আর মাধ্যমিক মত খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি অনেক স্থলে তিনি নিজে উহাদের উদ্ভাবিত যুক্তি, এমন কি ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। বৌদ্ধমত এবং শঙ্কর মতের মধ্যে প্রভেদ যৎসামান্য। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত কোন নূতন উদ্ভাবিত মত নহে। যিনি ইহা মনে করেন যে, শূন্যবাদ নাগার্জুনের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে, পূর্বে এরূপ কোন মত ছিল না, তিনি যদি মহাসংঘিক মত এবং উপনিষদাদির আলোচনা করেন এবং আগমের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, নাগার্জুন কোন নূতন সিদ্ধান্তের প্রবর্তন করেন নাই। পূর্বে যাহা অস্পষ্ট এবং আভাস রূপে ছিল, তাহাই তিনি স্পষ্ট এবং প্রণালীবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

বৈয়াকরণও অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বাক্যপদীয়কার ব্যাকরণের সিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদ-মূলক বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যাকরণের মতানুসারে অখণ্ড চিন্ময় শব্দ-তত্ত্বই জগতের মূল কারণ—উহা এক এবং অভিন্ন। ত্রিপুরা-সম্প্রদায়ও অত্যন্ত কট্টর অদ্বৈতবাদী। এই সম্প্রদায়ের মতে মহাশক্তিই একমাত্র মূলতত্ত্ব এবং অদ্বিতীয়। এই সব অদ্বয়বাদীদের বিশেষত্ব এবং ইহাদের

পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হয় যে, প্রাচীনকালে অদ্বৈতবাদের অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত ছিল। ব্রহ্মাদ্বৈতের সাথে-সাথ শূন্যাদ্বৈত, শব্দাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত, ঈশ্বরাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল।

৪। **নিগম আর আগম**—বেদ আর তন্ত্র উভয়ের মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ দুই-ই ছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই। বৈদিক সিদ্ধান্তের মূল উৎস হইল প্রধানতঃ উপনিষদ্ এবং তদবলম্বী দার্শনিক সূত্র-গ্রন্থ—বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্র। আর তান্ত্রিক বা আগম সিদ্ধান্তের আকর গ্রন্থ হিসাবে প্রাচীন শিবসূত্র, শক্তিসূত্র, পরশুরাম-কল্পসূত্র প্রভৃতি সূত্রমালা গণ্য। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তাদি ভেদে আগম আবার নানা প্রকারের। পাঞ্চরাত্র আর ভাগবতমত বৈষ্ণবাগম-মূলক। প্রত্যভিজ্ঞা আর স্পন্দশাস্ত্র অর্থাৎ কাশ্মীরীয় ত্রিকদর্শন, দক্ষিণ দেশের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র প্রভৃতি এবং ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত শৈবাগম হইতে উদ্ভূত। ত্রিপুরাদি সিদ্ধান্ত শাক্তাগমমূলক। অবশ্যই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আগমের ভিতরেও অনেক প্রকার বিভাগ আছে।

৫। **ব্রহ্মবাদ আর ঈশ্বরাদ্বয়বাদের মধ্যে ভেদ**—আচার্য গৌড়পাদ ও শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ এবং কাশ্মীর শৈবাচার্য অভিনবগুপ্তাদি কর্তৃক ব্যাখ্যাত পরমেশ্বরাদ্বয়বাদ ঠিক এক প্রকার নহে। ব্রহ্মবাদ মায়াকে সৎ এবং অসৎ উভয় হইতে পৃথক এবং অনির্বচনীয় বলিয়া মানে। পরমার্থ দৃষ্টিতে মায়া যখন তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ব্যবহার ভূমির সত্যতা ব্রহ্মের অদ্বৈত-তত্ত্বকে স্পর্শ করে না—একথা ঠিক; কিন্তু উহা হইতে অদ্বৈত-তত্ত্বে যে সঙ্কীর্ণতা আসে, সেই সঙ্কীর্ণতার হেতু কি? এই জীব-জড়াত্মক বিশ্ব-বৈচিত্রের হেতু কি? মূলে যখন একই অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, তখন এই দ্বৈতের স্ফুরণ কেন হয় এবং কাহার নিকট হয়? অজ্ঞানের আশ্রয় কে এবং দ্রষ্টাই বা কে? কি প্রকারে ব্রহ্মা হইতে জীবভাব উৎপন্ন হয়? এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তব অদ্বয় ব্রহ্মবাদ হইতে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। জীবভাব রূপ প্রবাহ অনাদিকাল হইতে বর্তমান। শুধু ইহা বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। জীবের অজ্ঞান-প্রবৃত্তি কোথা হইতে, কেন আসে, ইহারও কোন উত্তর নাই। স্বপ্রকাশ চিরভাস্বর জ্ঞান-সূর্যকে অকস্মাৎ অজ্ঞানান্ধকার কোথা হইতে আসিয়া আবৃত করে? স্বপ্রকাশ জ্ঞান কি প্রকারে অজ্ঞানের অধীন হইয়া জীবে পরিণত হয়? ইহাও উপলব্ধিতে আসে না। অজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব কিরূপে হয়, তাহাই যখন উপলব্ধিতে আসে না, তখন জীবত্বের বীজ কালের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। শৈবাচার্যগণ বলেন, মায়াকে স্বীকারের দ্বারাই ঈশ্বরাদ্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরাদ্বয়বাদেও

অজ্ঞান আছে, মায়া আছে, কিন্তু উহা আকস্মিক নহে। উহা আত্মার স্বাতন্ত্র্যমূলক, অর্থাৎ আত্মার স্বেচ্ছা-পরিগৃহীত রূপ। নট যেরূপ জানিয়া-শুনিয়া নানাপ্রকার অভিনয় করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ আপন ইচ্ছামাত্রেই নানাপ্রকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরমেশ্বরের এই ইচ্ছাশক্তি স্বতন্ত্র; ইহার আপন স্বরূপকে আবৃত করিবারও যেমন সামর্থ আছে, তেমনি প্রকট করিবারও সামর্থ আছে। যখন ইহা আপন স্বরূপকে আবৃত করে, তখনও পরমেশ্বর আপন অনাবৃত স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। অজ্ঞান তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-শক্তির বিজৃম্ভন মাত্র। যেরূপ সূর্যদেব আপনার দ্বারা নির্মিত মেঘের আবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত করে এবং আচ্ছাদিত হইয়াও সূর্য যেরূপ অনাচ্ছাদিত থাকে (কারণ তাহা না হইলে মেঘকে কে প্রকাশিত করে?) উহাও সেইপ্রকার। বিশ্ব-বৈচিত্র্য পরমেশ্বরের আপন স্বরূপেরই বিমর্শমূলক অভিব্যক্তি। ক্রীডা-পরায়ণ মহেশ্বর এইরূপেই লীলাভিনয় করেন। আত্মারামের ক্রীড়া করিবার স্পৃহা জাগে কেন? কারণ ইহা তাঁহার স্বভাব। ব্রহ্মবাদীরা যে স্বভাবকে একেবারেই মানেন না, তাহা নহে। অজ্ঞান যে আত্মারই শক্তি—একথা তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরাদ্বয়বাদী যাঁহারা তাঁহারা আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যমূলক, স্বাতন্ত্র্যাত্মক কর্তৃত্বস্বরূপ বলেন; আর ব্রহ্মবাদী যাঁহারা, তাঁহারা ইহাকে শুদ্ধ সাক্ষী অথবা অধিষ্ঠান-চৈতন্যাত্মক বলিয়া অভিহিত করেন—ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। অর্থাৎ শঙ্কর বেদান্তে আত্মা বিশ্বোত্তীর্ণ, সচ্চিদানন্দ, এক, সত্য, নির্মল, নিরহঙ্কার, অনাদি, অনন্ত, শান্ত, সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের হেতু, ভাবাভাববিহীন, স্বপ্রকাশ, নিত্যমুক্ত; কিন্তু উহাতে কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু কাশ্মীরীয় শৈবাগম-সম্মত অদ্বৈত মতে বিমর্শই আত্মার স্বভাব। জ্ঞান এবং ক্রিয়া আত্মারই ধর্ম। আত্মার ক্রিয়াই জ্ঞান, কারণ উহা জ্ঞাতার ধর্ম এবং উহার কর্তৃ-স্বভাবের জন্য উহার জ্ঞানই ক্রিয়া। এই জ্ঞান ও ক্রিয়ার উন্মুখতার নাম ইচ্ছা। এই জন্যই তিনি ইচ্ছাময় অথবা ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তিত্রয়ের সহিত যুক্ত স্বাতন্ত্র্যময় তিনি। ঐশ্বর্য, বিমর্শ, পূর্ণাহন্তা প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যেরই নামান্তর।

আগমসম্মত আত্মা সর্বদাই পঞ্চকৃত্যকারী। উহাই তাহার অসাধারণ স্বভাব (দ্রঃ প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়সূত্র ১০)। পঞ্চকৃত্য বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ বা বিলয় বুঝায়। শঙ্করবেদান্ত মতে ব্রহ্ম এই প্রকার স্বভাব-সম্পন্ন নহে। এই জন্য ব্রহ্মবাদে আত্মার আত্মস্ফুরণ ঐরূপ না হওয়ার দরুণ মহার্থমঞ্জরী টীকাকার মহেশ্বরানন্দ বলিয়াছেন, শঙ্কর-বেদান্তের আত্মা সত্য হইয়াও অসৎকল্প।

মনে হয়, শঙ্কর-বেদান্ত যেন দ্বৈত হইতে ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তিনি দ্বৈতকে অদ্বৈত হইতে পৃথক করিয়াছেন। কাশ্মীর শৈবাগমের মতে অদ্বৈত শব্দের অর্থ হইল—দুই-এর নিত্য সামরস্য। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকে

সত্য ও মায়াকে অনির্বচনীয় বলিয়াছেন। সেইজন্য, বাক্য প্রয়োগে যতই অদ্বৈতভাবের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইযাছে, ততই পূর্ণভাবের প্রকাশে বাধা পড়িয়াছে। মায়াকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহার অদ্বৈতভাব ব্যাবৃত্তিমূলক (exclusive), সন্ন্যাসমূলক (based on renunciation or elimination) হইয়াছে, অনুবৃত্তি কিংবা গ্রহণমূলক (all embracing) হয় নাই। ব্রহ্ম সত্য এবং মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্মাশ্রিত হইয়াও বিচার-দৃষ্টিতে মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু মায়াকে স্বীকার করিয়া উহাকে ব্রহ্মময়ী, নিত্যা এবং সত্যস্বরূপা মানিলে ব্রহ্ম ও মায়ার একরসতা সাধিত হয়। মায়াকে ত্যাগ না করিয়া বা তুচ্ছ না ভাবিয়া উহাকে ব্রহ্মেরই নিজ শক্তি মানিলে ঐ একরসতা সিদ্ধ হয়। মেঘের দ্বারা দৃষ্টি-শক্তি অবরুদ্ধ হইলে আমরা বলিয়া থাকি, মেঘ সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ঐ মেঘ স্বয়ং কি সূর্য হইতে উৎপন্ন হয় না? মেঘ কি সূর্যেরই মহিমা নহে? সুতরাং সূর্যও যাহা, মেঘও তাহাই; কারণ মেঘ সূর্যেরই শক্তি। মায়ামেঘও ঐ প্রকার ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়, উহারই আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং উহাতেই বিশ্রাম লাভ করে। যাহা মায়া, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বয়ং যেন নিজেকে নিজের দ্বারা অর্থাৎ আপন শক্তি মায়ার দ্বারা ঢাকিয়া লয়; পরন্তু আবৃত হইলেও পূর্ণতঃ আবৃত হয় না; কারণ, উহা অনাবৃতরূপে নিত্য বর্তমান থাকে। অতএব, বলিতে হয়, ব্রহ্ম নিজেই নিজের আবরক আবার নিজেই নিজের উন্মীলক। কারণ ব্রহ্ম ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। ব্রহ্ম এবং মায়া একই বস্তু। ব্রহ্ম সত্য, মায়া মিথ্যা বলিলে প্রকারান্তরে দ্বৈতাভাসই আসিয়া যায়। যে অবস্থায় মায়া মিথ্যা, সেই অবস্থায় ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া যায়; কারণ, মায়াকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিলেও মায়ার সত্ত্বাকে স্বীকার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, আর মায়াকে স্বীকার করিলেই ঐ অবস্থায় যে ব্রহ্মবোধ হয়, উহাকে মায়াকল্পিত বস্তু বলিতে হয়—ইহা বেদান্তিকে কোন-না কোন প্রকারে স্বীকার করিতেই হইবে। অপরদিকে মায়াকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলে ব্রহ্মেরও সত্যতা প্রতিপাদিত হয়। মায়ার বিচিত্রতা অনুসারে ব্রহ্মবোধও বিচিত্র হইবে আর ঐ সমস্ত বোধ সমানরূপে সত্য হইবে। ঐরূপ অবস্থায় জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে। সবই সত্য, সবই চিন্ময় এবং আনন্দময়, এই তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', উপনিষদের এই বাণী ঐ সময় সার্থক হইবে। মায়া অথবা তৎপ্রসূত জগতকে ত্যাগ করিয়া নহে, বরং উহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি ও উহার বিকাশরূপ অনুভবের দ্বারা, গ্রহণের দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্ভব হয়। শক্তি সত্য, সুতরাং জীব জগৎও সত্য—মিথ্যা নহে, এইজন্য সবই বস্তুতঃ শিবময়। এই যে বৈচিত্র্য,

ইহা 'একে'রই বিলাস; ভেদ যাহা, তাহা অভেদেরই আত্মপ্রকাশ; শক্তি-রূপ কিরণ-রাশি শিব-রূপ সূর্যেরই স্ফুরণ-মাত্র, অন্য কিছু নহে।

স্পন্দশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

ইতি বা যস্য সংবিত্তিঃ ক্রীড়াত্বেনাখিলং জগৎ।
স পশ্যন্ সততং যুক্তো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।।

ইহার তাৎপর্য এই, যে জীবন্মুক্ত অখিল জগতকে আত্মক্রীড়া, অর্থাৎ আত্মশক্তিরই বিলাসরূপে দেখেন, তাঁহার যোগাবস্থা কখন ভগ্ন হয় না। ভেদ ও অভেদ, ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয়ের মধ্যে সাম্যদর্শন হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কারণ, ভেদ ও অভেদ, ব্যুত্থান ও নিরোধ 'একে'রই দুইটি দিক। ইহাকেই শিবশক্তির সামরস্য বা চিদানন্দ প্রাপ্তি বলে। ইহাই ঈশ্বরাদ্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য।

৬। **প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য**—এই অদ্বয়বাদের আর এক বিশেষত্ব হইল যে, ইহা শুষ্ক জ্ঞানমার্গও নয় এবং জ্ঞানহীন ভক্তি মার্গও নয়; ইহাতে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের দ্বারা প্রবর্তিত অদ্বয়বাদের চরমাবস্থায় ভক্তির কোন স্থান নাই। শঙ্কর-বেদান্তের মতে ভক্তি দ্বৈতমূলক, এই কারণে অদ্বৈতাবস্থায় জ্ঞানের আবির্ভাবে দ্বৈতভাব বা ভক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু, অদ্বৈত অবস্থাতেও যে ভক্তির উপলব্ধি হয়, তাহা শাস্ত্র আর মহাত্মাদের অনুভব হইতে জানা যাইতে পারে। ঐ ভক্তি নিত্যবস্তু। ত্রিকদর্শনে ইহাকে চিদানন্দলাভ অথবা 'পূর্ণাহন্তা চমৎকার' রূপে অভিহিত করিয়াছে। চিদংশ হইল জ্ঞানভাব আর আনন্দাংশ ভক্তিভাব। পরম তত্ত্ব স্বাতন্ত্র্যময়, স্বতন্ত্রতাই পূর্ণ শক্তি; এইজন্য এই মতে চরমাবস্থাতে শিবশক্তির সামরস্যকেই মানিয়াছে। শক্তির অভাব অথবা উহার অবাস্তবতার কল্পনা কখন করে নাই। শিব ও শক্তি অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই এবং ভেদ হইতে পারে না। পরন্তু বিশ্বদৃষ্টিতে সৃষ্টি ও সংহার, কিংবা উন্মেষ ও নিমেষের প্রতি লক্ষ্য করিলে, একবার শক্তিপ্রধান আর একবার শিবপ্রধান রূপে কেবল 'একে'রই পরম তত্ত্বের নির্দেশ করিতেছে জানা যাইবে। কারণ, শক্তিপ্রধান অবস্থাতেও শিবভাব থাকে, এবং প্রকাশময় শিবভাবে বিমর্শাত্মক শক্তির বিকাশ-স্বরূপ বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়, আবার শিবপ্রধান অবস্থাতেও শক্তিভাব থাকে, বিশ্ববীজ-শক্তি ঐ সময় প্রকাশে বিলীন থাকে; আর এই দুই-এর সামরস্য অবস্থাকে, যেখানে শিব এবং শক্তি উভয়ে সাম্য লাভ করিয়াছে, শিবও বলা যায় না এবং শক্তিও বলা যায় না, তথাপি দুই-এর ভাব ওখানে একাকার রূপে বিদ্যমান্ থাকে। ইহাই পরমভাব। আমাদের দর্শনসমূহ ইহাকে সর্বভাবের প্রতিষ্ঠা রূপে বর্ণনা করিয়াছে। যেখানে চিদংশ শিবভাব আর আনন্দাংশ

শক্তিভাব পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেখানে জ্ঞান-ভক্তির সামঞ্জস্য-অবস্থা বুঝিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত শিব আর শক্তি তথা ঐ সামরস্য দুই-ই নিত্য, কেবল একই বস্তুর দুইটি দিক। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ব্রহ্মও যা, আমার মাও তাই। শুধু এপিঠ আর ওপিঠ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।

ষট্পঞ্জরিকাস্তোত্র যে শঙ্করাচার্যের রচনা—এরূপ প্রবাদ আছে। উহাতে আছে—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

অর্থাৎ—"Even when the difference disappears, O Lord, I am thine, but you are not mine; the wave belongs to the sea, but the sea does not belong to the wave."

যদি এই শ্লোক বস্তুতঃ শঙ্করাচার্যের রচনা হয়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে তিনি অদ্বৈত-ভক্তির প্রচার করিয়াছেন। 'সত্যপি ভেদাপগমে' এই বাক্যাংশ যোজনা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় হইল, ভেদ দূর হইয়া যাইবার পরও অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষের পরেও 'আমি তোমারই', সুতরাং অভেদ-অবস্থাতেও 'আমি তোমারই' এই ভাব থাকিতে পারে। বলিতে হইবে না যে, ইহা ভক্তিভাব। যদিও জ্ঞানের দ্বারা 'তুমি-আমি'র ভেদ বাস্তবিক মিটিয়া যায়, তথাপি পরাভক্তির প্রভাবে ঐ অদ্বৈত-সমুদ্রে কল্পিত ভাব দ্বৈতের লহরী উত্থিত হয়। এই দ্বৈত বস্তুতঃ দ্বৈত নহে, এইজন্য এইরূপ অবস্থায় উদ্রিক্ত ভক্তিতে অদ্বৈত-ভক্তি বলা অসংগত নহে। ইহা নিত্যভাব।

অদ্বৈত-ভক্তি কি এবং উহার স্বরূপ-প্রাপ্তি কিরূপে হয়—এই সব বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। 'বৈষ্ণবধর্ম ও উহার সহিত আগমের সম্পর্ক' অংশে বিশদভাবে তাহা আলোচনা করা যাইবে। নারায়ণতীর্থ 'ভক্তি-চন্দ্রিকা' নামক শাণ্ডিল্য-সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ অদ্বৈত ভক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিপুরারহস্য জ্ঞানখণ্ডে (২০ অধ্যায়, শ্লোক ৩৩-৩৪) আছে—প্রকাশসার পরমতত্ত্বকে অপরোক্ষ রূপে আত্মাভিন্ন-ভাবে সাক্ষাৎকার করিবার পরও কোন কোন পরমভক্ত প্রেমপূর্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। সেবা করিবার নিমিত্ত সেব্য-সেবকভাব হওয়া আবশ্যক, অদ্বয়াবস্থায় এই ভাব কি প্রকারে হওয়া সম্ভব? সেইজন্য বলা হইয়াছে, ভেদভাব অবলম্বন করিয়া সেবা করা যায়। অবশ্যই ইহা 'আহার্য-ভেদ', বাস্তবিক ভেদ নহে। যেখানে পরম তত্ত্বের সাম্য-স্বরূপ, সেখানে তো ভেদ নাই-ই, উহা তো সব অবস্থার সন্ধি-স্থল। তথাপি এই ভেদকে আহরণ করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আর কিছু নয়, কেবল রুচিভেদ, 'স্বভাবের স্বরস'—

যৎ (অর্থাৎ পরং পদং প্রতিভাত্মকম্) সুভক্তেরতিশয় প্রীত্যা কৈতববর্জনাৎ॥ (৩৩)॥

স্বভাবস্য স্বরসতো জ্ঞাত্বাঽপি স্বাদ্বযং পদম্।
বিভেদভাবমাহৃত্য সেব্যতেঽত্যন্ততৎ পরৈঃ॥
(ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞানখণ্ড, ২০ অ., ৩৩।৩৪ শ্লোক)

ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জ্ঞানের পরও ভক্তি থাকিতে পারে। ইহা কৈতবশূন্য হওয়ার দরুণ 'সুভক্তি'। অদ্বৈত-ভক্তির পক্ষেও এক ভেদ আবশ্যক হয়, ইহা কল্পিত এবং জ্ঞানপূর্বক হয়। কিন্তু একটা কথা আছে, জ্ঞানের পর অদ্বৈত-ভক্তি যে সকলেরই হইবে, এমন নহে। যাহার হৃদয় স্বভাবতঃ ভক্তি-প্রবণ, তাহারই মধ্যে কেবল অদ্বৈত-ভক্তির উদয় হয়, শুধুমাত্র জ্ঞানার্থীর ঐরূপ হয় না।

অদ্বৈত ভক্তিরও চরমাবস্থায় জ্ঞান এবং ভক্তি একাকার হইয়া যায়। যাহাকে পূর্ণাহন্তা বা স্বাত্ম-চমৎকার বলা হইয়া থাকে, উহা জ্ঞানেরও সীমা এবং প্রেমেরও পরাকাষ্ঠা। এইজন্য ইহাকে সমন্বয়-ভূমি বলে। ইহা হইতেই দুইটি স্রোত প্রবাহিত হয়।

ত্রিকদর্শনে দাস্যাত্মক ভক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ প্রভু, পিতা অথবা গুরু; আর ভক্ত দাস, পুত্র অথবা শিষ্য। শুধু ত্রিকদর্শন নয়, শৈবাগম মাত্রেই এই ভাবের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বীর শৈবাদি মতেও এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত।[১] শাক্তাগমেও মূলতঃ এই বিষয়ে কোন ভেদ দেখা যায় না। শাক্তাগমের বৈশিষ্ট্য হইল উহাতে পিতৃভাবের জায়গায় মাতৃভাব কল্পনা করা হইয়াছে। পরন্তু, এই ভাবত্রয়ে দাস্যভাবই অনুস্যূত। বলা বাহুল্য, ভক্তির মূলতত্ত্বই দাস্যভাবাশ্রিত। শান্ত-ভক্তি, ভক্তির এক স্ফুরণ-অবস্থা মাত্র। কিঞ্চিৎ বিকশিত শান্ত-ভাবের উপর দাস্য-ভাবের রঙ চড়ে। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতের তরঙ্গ দাস্য-ভাব হইতে উত্থিত হয়। ভাবের যতই বিকাশ হোক্ না কেন, দাস্য-ভাবের অনুভূতি সব সময়েই ক্রিয়া করে। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দাস্য ছাড়া সখ্য, বাৎসল্য আর মাধুর্য ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ইহা সত্য যে, সর্বভাবের মূলে দাস্যভাব অনুস্যূত। বেদান্তের অনুসারে ভূত-সৃষ্টিতে যেমন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রম অনুসারে পৃথ্বীর আবির্ভাব হয়, রস-বিকাশেও তেমনি শান্ত হইতে দাস্য, দাস্য হইতে সখ্য ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর রসপুষ্টি হয়। আকাশের নিজস্ব গুণ শব্দ; বায়ু উৎপন্ন হইবার পর শব্দগুণ তো লাভ করেই, ইহার নিজস্ব গুণ স্পর্শও বিকশিত হইয়া ওঠে। এই প্রকার, ক্রমশঃ এক এক গুণ বাড়িতে থাকে

[১] মায়িদেবকৃত 'অনুভবসূত্র' দ্রষ্টব্য।

আর পূর্ব গুণ ক্রমশঃ অনুবৃত্ত হইতে থাকে। এই জন্য পৃথিবীতে পঞ্চগুণের সমাবেশ; উহাতে সমাগত শব্দাদি চার সামান্য গুণ, গন্ধ উহার বিশেষ গুণ। ভাবের ক্রমবিকাশও ঐ একই প্রকারে হইয়া থাকে।

শান্তভাবের বিশেষ গুণ নিষ্ঠা, দাস্যভাবে অনুবৃত্ত হয় আর উহার নিজস্ব গুণ সেবা, ঐ সময় বিকশিত হইয়া ওঠে। সখ্যে শান্ত ও দাস্য উভয়ের গুণ অনুবৃত্ত থাকিয়া নিজস্ব গুণ অসঙ্কোচের বিকাশ হয়। এই ভাবে, মাধুর্যে সব রসের গুণ অর্থাৎ নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, লালন বর্তমান থাকে এবং অতিরিক্ত উহার বিশেষ গুণ আত্ম-সমর্পণও স্ফূর্ত হইয়া ওঠে।

ত্রিকদর্শন দাস্যাত্মক ভক্তিকে মর্যাদা দিয়া ভক্তির মূল-তত্ত্বকেই মানিয়া লইয়াছে। কেবল মূল নহে, ভক্তির চরম ফল মাধুর্য-প্রেমকেও আভাসরূপে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এই ভক্তি অজ্ঞানমূলক দ্বৈতভাব হইতে উৎপন্ন হয় না। ইহা পরিস্ফুটিত অদ্বৈত অবস্থা, আর এক হিসাবে ইহা পরিস্ফুটিত দ্বৈত-অবস্থাও—পরন্তু ইহা অলৌকিক 'দ্বৈত', ইহাই বৈশিষ্ট্য। এইজন্য, এই অবস্থায় একই সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তি, চিৎ ও আনন্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম শিবশক্তির সামরস্য। এই রসতত্ত্ব ঐক্য এবং বৈচিত্রের পূর্ণ সামঞ্জস্যের পরিচায়ক। এই রস 'ব্রহ্মানন্দ' হইতে পৃথক এবং বিশিষ্ট। ব্রহ্মানন্দে আস্বাদন নাই, চর্বণ নাই, অহংভাব (individuality) নাই, পরন্তু রসে সবই আছে, তবে এ-রস অলৌকিক। পূর্ণাহন্তার চমৎকারিত্বই রসবোধ—ইহাতে অভেদেও অলৌকিক ভেদ আছে, তাহা না হইলে, আস্বাদন কিরূপে হইবে। এই ভেদকে লৌকিক ভেদের সহিত তুলনা করা যায় না। অভিনবগুপ্তাচার্য নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' নামক টীকায় রসতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনানুসারে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে রসের স্বরূপ বিষয়ে অনেক কিছু পরিস্কৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই রস কেবল শান্তরস, না দাস্যও? পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই এই প্রশ্নের সমাধান মিলিবে। ভক্তির মূলে দাস্যভাব থাকিবেই। শান্তভাব ভক্তির বীজভাব বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা পরিস্ফুট ভক্তি নয়। দাস্যভাব যতক্ষণ না উৎপন্ন হইতেছে, নিজেকে এক অনন্ত বস্তুর সহিত অভিন্ন জানিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আশ্রিত বলিয়া বোধ না জন্মায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিরাজ্যের আরম্ভই হয় না। শান্তভাব ইহারই সূত্রপাত করে। যে ব্রহ্মভাব হইতে শান্তরস এবং তদনন্তর দাস্যাদির আবির্ভাব হয়, শান্তদাস্যাদিতে ঐ ব্রহ্মভাব অনুবৃত্ত থাকে; পরন্তু উহার উপর শুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বের বা রসের লহর ক্রীড়া করে। এ যেন, আলোকের বক্ষঃস্থলের উপর আলোকেরই তরঙ্গ সকল নাচিতে থাকে। এই তরঙ্গই 'উল্লাস' বা রস।

ইহার বৈচিত্র্যই লীলা-বিস্তার। এই তরঙ্গ শুদ্ধ স্বরূপে সদা বর্তমান থাকে, এইজন্য বৈষ্ণবদের ন্যায় শৈবও নিত্যলীলাকে মানে। এইজন্য ক্ষেমরাজ তাঁহার 'স্তবচিন্তামণি-টীকা'য় (পৃ. ৬০-৬১) শিবকে—'কৈলাসাদিষু নিত্যপ্রবর্ত্তমান প্রমোদনির্ভরক্রীড়াময়ং লোকত্তরপ্রভাবং বিস্তারয়িত্রে' বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি, বিশেষতঃ আলংকারিকগণ ভক্তিকে রস-স্বরূপ মনে করে না। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট, রসগঙ্গাধরের কর্ত্তা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি আলংকারিকগণ ভক্তিকে ভাবকোটিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরন্তু ইহাতে কোন বিরোধ আসে না। সাহিত্যসারকর্তা অচ্যুত রায় দেখাইয়াছেন যে, গীতার 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' হইতে 'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ' পর্যন্ত বাক্যসমূহ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে মুখ্য ভক্তি জীবন্মুক্তিরই নামান্তর। 'জীবন্মুক্তি বিবেকে' বিদ্যারণ্যস্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন—

'জীবন্মুক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞো বিষ্ণুভক্তশ্চ কথ্যতে'।

এইরূপ দৃষ্টিতে ভক্তি কিছু পরিমাণে শান্তরসের অন্তর্গত হইয়া যায়। এইজন্য আলংকারিকরা ভক্তিকে স্বতন্ত্র রস বলিয়া মানিতে চাহে না। অর্থাৎ মুখ্য ভক্তিকে রস মানিতে আলংকারিকদের অসম্মতি নাই, কিন্তু উহাকে শান্তরস হইতে পৃথক মানিবার কোন কারণ তাঁহারা দেখিতে পান না। অপর পক্ষে ভক্তগণ যাহা বলেন, তাহাও সত্য। তাঁহারা বলেন, ভক্তি যখন অদ্বৈত-আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বৃত্তি-বিশেষ, তখন উহার রসত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে না। সাহিত্যসারের টীকাকার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, ভক্তি মুখ্য ও গৌণ, অথবা পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকার। অলংকার শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তি শান্তরসের অন্তর্গত আর গৌণভক্তি ভাবমাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে শান্তরস স্বয়ং ভক্তিবিশেষ এবং মুখ্যভক্তি রসস্বরূপ।

শাণ্ডিল্য এবং নারদ তাঁহাদের আপন আপন 'ভক্তি-সূত্রে', মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তি-রসায়নে' এবং শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে' ভক্তির রসত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ঐ সকল আলোচনার অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের আচার্যগণ ভক্তিকে রস-রূপে স্বীকার করিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে এক মাধুর্যময় তত্ত্ব প্রকট করিয়া দিয়াছেন। উৎপলাচার্য তাঁহার 'শিবস্তোত্রাবলী'র প্রথম স্তোত্রে বলিয়াছেন—

জয়ন্তি ভক্তিপীযূষরসাসব বরোন্মদাঃ।
অদ্বিতীয়া অপি সদা ত্বদ্দ্বিতীয়া অপি প্রভো॥

পরাভক্তির ইহাই বিশেষত্ব যে, এই অবস্থায় বাস্তবিক দ্বিতীয় না হইতে হইয়াও দ্বিতীয় থাকে। নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইজন্য অচিন্ত্য-

ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভাবেন যে 'দুই' হইলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে, তিনি পূর্ণ সত্যের কেবল একদেশ-মাত্র দেখেন। অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবার পর ঐক্যস্ফুরণ হইলেও, ঐ ঐক্যের অঙ্কে 'দুই' থাকিতে পারে এবং এই 'দুই' একেরই শুদ্ধ ভাবের আত্মপ্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাশ্মীর শৈবাগম মতে যিনি বিশ্বাতীত, তিনিই বিশ্বাত্মক এবং উভয়ই সমকালে অবস্থান করে। এইজন্য জ্ঞান ও ভক্তির যেখানে সমরস, সেখানে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক সমভাবে প্রকাশমান। দ্বৈতাদ্বৈতের সামঞ্জস্য ইহাকেই বলে। ইহাই ঈশ্বরাদ্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য।

আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত 'ব্রহ্মবাদে'র সঙ্গে কাশ্মীর-শৈবাগম 'ঈশ্বরাদ্বয়বাদে'র যে প্রভেদ প্রদর্শিত হইল তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে শঙ্করাচার্য আগম মতকে মানিতেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আগম ও নিগম এই উভয় মার্গের সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে শঙ্করাচার্যের 'জগৎগুরু' নাম সার্থক। জ্ঞান এবং উপাসনা—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য—উভয় দিকেই তাঁহার প্রচার অব্যাহত ছিল। ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা পূর্বপ্রবন্ধে ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে যে ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্য আগমশাস্ত্রে সুপরিচিত ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি অনেক আগম গ্রন্থের রচনা ও ব্যাখা করিয়াছিলেন।

প্রত্যভিজ্ঞা মতের সহিত ত্রিপুরা-সিদ্ধান্তের অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আচার্য শঙ্কর শ্রীবিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। শৃঙ্গেরীমঠে তিনি শ্রীচক্র স্থাপন করিয়াছিলেন, আজও সেখানে দেবীর উপাসনা অব্যাহত আছে। শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য শ্রীবিদ্যার মহিমা বর্ণনা করিয়া 'সুভগোদয়' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপর শঙ্করাচার্য টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আর 'সুভগোদয়ে'র অনুসরণে তিনি 'সৌন্দর্যলহরী' নামে এক অপূর্ব স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'প্রপঞ্চসার' নামক তন্ত্র-গ্রন্থও যে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের লেখা—এই অভিমত 'সূত-সংহিতা' ও 'পরাশর সংহিতা'র টীকায় মাধবাচার্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সব বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হয় যে, শঙ্করাচার্য শাক্তাগম, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরাগমের একজন প্রধান আচার্য ছিলেন। তাঁহার রচিত 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র' এবং ইহার উপর সুরেশ্বরাচার্য-কৃত 'বর্তিকা' দেখিলে এই মত আরও দৃঢ়ীভূত হয়। 'দক্ষিণামূর্তি' শব্দটি ত্রিপুরা-সম্প্রদায়েরই চয়ন। 'দক্ষিণামূর্তি-সংহিতা', 'দক্ষিণামূর্তি-উপনিষদ্' প্রভৃতি উক্ত সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। সুতরাং দক্ষিণামূর্তির আকারে গুরুতত্ত্ব কিংবা স্বাত্মদেবতার বর্ণনা করিয়া শঙ্করাচার্য আগম-অনুরাগেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রের সহিত ত্রিপুরা

এবং স্পন্দ-মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীন আচার্যগণ ত্রিপুরা-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখিবার সময় 'শিবসূত্র', 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়', 'ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী', 'তন্ত্রালোক' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শৈবগ্রন্থগুলি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর দিকে উৎপলদেব, ক্ষেমরাজ, অভিনবগুপ্ত, মহেশ্বরানন্দ প্রভৃতি শৈবাচার্যগণ প্রয়োজন অনুসারে 'যোগিনীহৃদয়', 'কামকলা-বিলাস', 'ত্রিপুরাসুন্দরী-মন্দির' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ঐ সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ পর্যালোচনা করিলে ভালভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের সহিত ত্রিপুরা-সিদ্ধান্তের দার্শনিক অংশের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের কোনই পার্থক্য নাই।

(ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের কাশ্মীর শৈবাগম ও অন্যান্য আগম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও গ্রন্থ অনুসরণে প্রবন্ধটি রচিত।)

শৈবাগম ও শাক্তাগম সিদ্ধান্তের দিগ্‌দর্শন

এইবার ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর বিভিন্ন বচনার অনুসরণে শৈবাগম ও শাক্তাগম সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যাইতেছে। কোন প্রকার সাধনায় লিপ্ত হইবার পূর্বে উহার সাধন-প্রণালী ও তত্ত্বাদর্শের সহিত পরিচয় করিয়া লওয়া আবশ্যক। তত্ত্বের বিচার হইতেই লক্ষ্য স্থির হয়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সাধনার প্রয়াস অর্থহীন। কারণ, লক্ষ্য এবং উহার প্রাপ্তির উপায় জানিয়া উহার যথাবিধি অনুশীলন করার নামই সাধনা। সুতরাং তান্ত্রিক সাধনাকে জানিবার জন্য তান্ত্রিক দৃষ্টির সহিত পবিচিত হইবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ণ ও অপূর্ণ বা দ্বৈত ও অদ্বৈত ভেদে দৃষ্টি দুই প্রকার। অপূর্ণ বা দ্বৈত দৃষ্টিতে যে লক্ষ্য জানা যায়, পূর্ণ বা অদ্বৈত দৃষ্টি লাভ হইবার পর তাহা সাধ্য বলিয়া গণ্য হয় না ; তখন তাহা প্রকৃত লক্ষ্যের এক অংশ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আলোচনার জন্য এই উভয় দৃষ্টির প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ, তবেই প্রকৃত লক্ষ্য স্থির হইতে পারে।

শাক্তগণ প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদী। শৈব সম্প্রদায়ে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই প্রকার দৃষ্টিভেদ আছে। 'কামিকাগমে' আছে যে, শিবের সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান—এই পঞ্চমুখ হইতে সমস্ত মূল তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ভেদপ্রধান 'শিবতন্ত্র' দশ, ভেদাভেদ প্রধান 'রুদ্রতন্ত্র' আঠারো এবং অভেদপ্রধান 'ভৈরবতন্ত্র' চৌষট্টি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্যকৃত 'আনন্দলহরী' স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

> চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমনুসন্ধায় ভুবনং
> স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধিপ্রসভপরতন্ত্রং পশুপতিঃ।
> পুনস্তন্নির্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা
> স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্। (শ্লোক ৩১)

'সৌভাগ্যবর্ধনী' টীকা মতে এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, দেবী শিবকে বলিয়াছিলেন—"তুমি চৌষট্টিখানা তন্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহার সবগুলি সকলপ্রকার পুরুষার্থসাধক-সাধনার প্রকাশক নহে। তুমি এমন একটি তন্ত্র রচনা কর যাহা এক হইলেও তাহারই মধ্যে সকল পুরুষার্থসাধনের উপায় প্রদর্শিত হইবে।" দেবীর এই অনুরোধ শুনিয়া শিব 'কাদি' মতাখ্য একটি স্বতন্ত্র তন্ত্র প্রকাশ

করেন। অন্যান্য তন্ত্র পরস্পরসাপেক্ষ, কিন্তু এই তন্ত্রখানি অন্যনিরপেক্ষ। সেইজন্য ইহাকে অনাদি তন্ত্ররূপে তান্ত্রিক সমাজে গণনা করা হয়। এই সকল তন্ত্রের বক্তা শম্ভু ও শ্রোত্রী পার্বতী।

এক অখণ্ড পূর্ণবস্তুর স্বরূপ

তান্ত্রিক রহস্য বিশ্লেষণের পূর্বে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এক অখণ্ড পূর্ণবস্তুর স্বরূপ যে ভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। কারণ এক অখণ্ড পূর্ণবস্তুর সম্যক ধারণা জন্মিলে তাঁহার বর্ণিত তন্ত্ররহস্যের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। তিনি এক অখণ্ড পূর্ণবস্তুর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতির এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

তিনি বলিয়াছেন, "এই শ্লোকটিতে পূর্ণবস্তুর স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ণের স্বরূপ জাগতিক জ্ঞানের পক্ষে ধারণার অগোচর। নানাপ্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিলেও মানবীয় বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ণবস্তু চিরপূর্ণ, তাহাতে কখনই অপূর্ণতা আসে না। উহার হ্রাসও হয়না, বৃদ্ধিও হয় না, উপচয়ও হয় না, অপচয়ও হয় না। এই পূর্ণই নিত্য স্থিতিরূপে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তারূপে সর্বদা ও সর্বত্র অখণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহাকে আশ্রয় করিয়া শক্তির খেলারূপে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ণবস্তু শক্তির ক্রীড়াতে শক্তিমানের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও নিত্যই লীলাতীত স্বরূপে অবস্থিত থাকে। উদ্ধৃত শ্লোকটির 'অদঃ' ও 'ইদং' এই দুইটি পদের দ্বারা দুই প্রকার সত্তা বুঝাইতেছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই 'ইদং' পদার্থ এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তাহাই 'অদঃ' পদার্থ। সাধারণরূপে ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমবিকাশের প্রভাবে যাহা এক সময় অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে বর্তমান থাকে তাহাও ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ইহা শক্তির ক্রিয়ার ফল। তদ্রূপ শক্তির বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা যাহা এক সময়ে ইন্দ্রিয়গোচর ছিল তাহাও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে ইন্দ্রিয়গোচর সত্তার অতীন্দ্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশ এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার ইন্দ্রিয়গোচররূপে স্ফুরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের অন্তরালে স্বরূপ একই থাকে। এই স্বরূপটি পূর্ণবস্তু। ইহা

নির্বিকার। এই অখণ্ড পূর্ণবস্তুই অপরিচ্ছিন্নরূপে সদা বিদ্যমান রহিয়াছে—উহাই পূর্ণতত্ত্ব। উহা এক হইয়াও অনন্ত, কারণ যদিও কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই তথাপি অনন্ত দেশের, প্রতি দেশেই পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাসমান অথচ পৃথক পৃথক প্রতিভাসমান হইয়া তাহা খণ্ডিত হয় না। তাহা যেমন তেমনই থাকে। পূর্ণের বিজ্ঞান এই ভাবেই আয়ত্ত করিতে হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পূর্ণ সত্য সর্বত্রই সমরূপে বিরাজমান।

'পূর্ণমিদং' বলিতে ইহাই বুঝায় যে, পূর্ণই ইদংরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচররূপে বিদ্যমান। তদ্রূপ 'পূর্ণমদঃ' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য, এই পূর্ণই ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ একই পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের গোচরও বটে, আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচরও বটে—উভয়ই যুগপৎ সত্য। উহা একই সময়ে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, নিকটে ও দূরে, বিশ্বরূপে ও বিশ্বাতীতরূপে বিদ্যমান। পূর্ণ অদ্বয় অনন্ত অখণ্ড—উহা একই—দুই নহে। এই পূর্ণ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাও পূর্ণই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ণ এক ভিন্ন দুই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাহা হইতে নিঃসরণ হয় এবং যাহার নিঃসরণ, তাহা একই সত্ত্বা এবং সমরূপেই পূর্ণ। গণিত-শাস্ত্রে যেমন অনন্ত হইতে কোন পরিমিত বা অপরিমিত সংখ্যার বিয়োগ করিলে বিয়োগের পর অনন্তই অবশিষ্ট থাকে ইহাও ঠিক তেমনি। পূর্ণ হইতে ধারা নির্গত হয় এবং যাহা নির্গত হয় তাহা পূর্ণই, তথাপি পূর্ণের হ্রাস হয় না, কারণ পূর্ণ নির্বিকার। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই—ইহাই একের অনন্ত হওয়ার লীলা। যেমন একই চন্দ্র সহস্র দর্পণে সহস্র চন্দ্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অথচ চন্দ্রের মৌলিক একত্ব অখণ্ডই থাকিয়া যায়—ইহাও সেইরূপ। চন্দ্র সহস্র হইয়াও একই থাকে। সহস্র হওয়া একটা খেলা মাত্র। সহস্র চন্দ্রের প্রত্যেকটি চন্দ্রও সেই একই চন্দ্র। কারণ সহস্র 'এক' ব্যতীত অপর কিছু নয়। একই সহস্র, গুণিত হইয়া সহস্ররূপে প্রকাশিত হয়। গুণের মধ্যে একের আবির্ভাব হইলে অনন্ত এক ফুটিয়া উঠে। ইহাই সৃষ্টিলীলা। মূল একও যেমন, এক-গুণস্থ একও তেমনি এক—পার্থক্য কিছু নাই। তবে ইহা জ্ঞানীর নিকট, অজ্ঞানী ইহা বুঝিতে পারে না। ঠিক সেইপ্রকার পূর্ণমধ্যে, অপূর্ণতা দূরের কথা, পূর্ণ আসিয়া মিলিত হইলেও পূর্ণের স্বরূপগত বৃদ্ধি হয় না। অনন্তের সঙ্গে কোন পরিমিত সংখ্যা যোগ করিলে এমনকি অনন্ত যোগ করিলেও যোগফল অনন্তই হয়, ইহাও তদ্রূপ। বাহিরেও পূর্ণ ভিতরেও পূর্ণ। বাহির হইতে পূর্ণকে ভিতরে লইয়া গেলে ভিতরের পূর্ণের বৃদ্ধি হয় না, অথচ বাহিরের পূর্ণেরও হ্রাস হয় না। তদ্রূপ ভিতর হইতে পূর্ণকে বাহিরে লইয়া আসিলে ভিতরের পূর্ণের হ্রাস হয় না এবং বাহিরের পূর্ণেরও বৃদ্ধি হয় না। অন্তর

পূর্ণ যেমন ছিল তেমনি থাকে, বহিঃপূর্ণও যেমন ছিল তেমনি থাকে। ইহার রহস্য এই—পূর্ণ দুটি নহে, একই পূর্ণ উভয়ত্র বিরাজমান রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে পূর্ণবস্তু সর্বদেশের অতীত হইলেও প্রতি দেশেই নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান। তদ্রূপ উহা অতীত, অনাগত ও বর্তমান ত্রিবিধকালের অতীত হইলেও প্রতিকালেই সমরূপে বর্তমান। কালে পূর্ণের বিকাশ নাই। যাহা অনাগত অবস্থায় অপূর্ণ থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান ভেদপূর্বক অতীতের দিকে ধারারূপে প্রবাহিত হয়—তাহা পূর্ণ নহে। বস্তুতঃ পূর্ণের ক্রমবিকাশ নাই—It is beyond Evolution, এই প্রকার যাবতীয় আধার বা উপাধি—কোনটিই পূর্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ প্রতি আধারের সহিত অভিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া পূর্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। এই পূর্ণই আত্মা বা ব্রহ্ম। (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৪৮) মনে হয়, এই পূর্ণব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম, পবপ্রমাতা, পরমেশ্বর, পরশিব, গীতায় পুরুষোত্তম প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে।

সৃষ্টির মূল ব্রহ্মবিন্দু-অর্দ্ধনারীশ্বর-কামকলাদেবী নামান্তরে পরাবাক্

আগম মতে সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মবিন্দু। ইনিই পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মবিন্দু এক, যখন তাহা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নিজেকে নিজে উন্মীলিত করে তখন একাংশে শিবরূপে এবং অপরাংশে শক্তিরূপে প্রকটিত হয়। পরব্রহ্মাবস্থায় শিব ও শক্তিতে সাম্যাবস্থা ছিল, তাই তখন শিব ও শক্তি কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সৃষ্টির উন্মেষের আদ্যাবস্থায় বৈষম্যভাবের সূচনা হয়। তখন শিবভাবে ও শক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ব্যবধান আসে। যদিও শিবভাবে শক্তিভাব নিহিত থাকে, শক্তিভাবেও শিবভাব নিহিত থাকে। ইহার পর শিব প্রতিবিম্বরূপে শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিন্দুরূপে বহির্গত হন। তদ্রূপ শক্তিও শিবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাদরূপে বহির্গত হন। বিন্দুটি মূল পুরুষভাব এবং নাদটি মূল প্রকৃতি-ভাব। বিন্দু ও নাদে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বিন্দুবিরহিত নাদ এবং নাদবিরহিত বিন্দু থাকিতে পারে না। এটিকে একপ্রকার যুগল অবস্থার আদি বলা যাইতে পারে। উহাই অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব। বস্তুতঃ ইহা দুইটি বিন্দু নহে— একই বিন্দুতে উভয় ভাবের সমাবেশ। ইহার নামান্তর কাম। ইহা সূর্যমণ্ডলরূপে পরিচিত। পক্ষান্তরে, বিন্দু শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ। শ্বেতবিন্দু পুরুষের শুক্র এবং রক্তবিন্দু প্রকৃতির শোণিত। এই উভয় বিন্দু মিথুনাবস্থাতে সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে উহাদের মধ্য হইতে কলারূপে শক্তির নির্গম হয়। ইহাকে চিৎকলা বলে। ইহার নামান্তর

হার্দ্ধকলা। পূর্ববর্ণিত কাম এবং এই শুক্ল এবং রক্ত বিন্দুদ্বয় এবং তদুদ্ভূত কলা মিলিত হইয়া কামকলার আবির্ভাব হয়। কামনামক বিন্দুকে সূর্যমণ্ডল পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্বেতবিন্দুটি চন্দ্রমণ্ডল—রক্তবিন্দুটি অগ্নিমণ্ডল। কামকলা শব্দে মূল কামিনীতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ইহাই সৃষ্টির আদি। ইহা ব্যতিরেকে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই যে কামকলা দেবী ইহা হইতেই যাবতীয় শব্দ এবং যাবতীয় অর্থ আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনিই পরাবাক্, এমনকি পরাবাকেরও আদ্যাবস্থা। ইনি কে? বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'অ' এবং অন্তিম অক্ষর 'হ'। এই উভয়ের সমাহারে সমগ্র বর্ণমালাই সমাহৃত বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাবতীয় শব্দরাশি ইহার অন্তর্গত, কারণ সকল শব্দই বর্ণঘটিত। বিন্দুরূপে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া এই অনন্ত শব্দরাশিই 'অহং'-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই কামকলার স্বরূপ। কামকলাই 'অহং'রূপ। কামকলার ক্রিয়া ভিন্ন অহংভাব বা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। এই অহংভাবের পূর্ণতাই 'পূর্ণাহন্তা'—যাহা পরমেশ্বরের অনাদিসিদ্ধ ঐশ্বর্যরূপ।

পরমপদ—পরমপদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কবিরাজজী বলিয়াছেন, "সিদ্ধিমা (দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎসঙ্গ, ২য় খণ্ড) যাহাকে পরমপদ বলেন, অনেক মহাপুরুষ তাহাকে দ্বন্দ্বাতীত বিকল্পহীন স্বরূপাবস্থা বলিয়া থাকেন।" "মা, আনন্দময়ীও (দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড) জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত এমন কি অদ্বৈত ভাবেরও অতীত অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায় ঐ অবস্থাকে বিভিন্ন নামে অঙ্গীকার করিয়াছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় এবং তুরীয়াতীত উহারই অঙ্গভেদ মাত্র। উহাকে নিরাকার বলিলেও ঠিক ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ঐ অবস্থায় সাকার ও নিরাকারের ভেদবুদ্ধি থাকে না। বস্তুতঃ উহা অব্যক্ত অবস্থা। শ্রীভগবানের উহাই পরমধাম। কিন্তু অনেক সাধক প্রাকৃত সাকার সাধনার পরেই একটি শূন্যবৎ বৈচিত্র্যহীন অবস্থার উপলব্ধি করেন এবং উহাকেই অব্যক্তের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ উহাকে নির্বিকল্প বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। প্রাকৃত অবস্থা ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এবং চিণ্ময় অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত নিরাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ জড় প্রকৃতি লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য শক্তির সাহায্য না পাইলে নিরাকার সত্ত্বা সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর নহে। বলা বাহুল্য, এই নিরাকার সত্ত্বাও প্রকৃত নির্বিকল্প সত্ত্বা নহে। কারণ সাকার ভাবও যেমন কল্পনা তেমনি নিরাকার ভাবও এক হিসাবে কল্পনা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আকারের বিকল্প সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইয়া গেলে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ,

জড় ও চেতন এই প্রকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য উপশমপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত নির্বিকল্পভাবে স্থিতি হয়। সাকারের মধ্যেই নিরাকারের প্রকাশ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নিরাকার ভাবের উদয় হয। তাহার পর নিরাকার সত্তাসমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে তাহার মধ্যে অচিন্তনীয ভাবে অখণ্ড সাকার সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার পর সাকার নিরাকার এক হইয়া গেলে বিকল্পহীন অবস্থার উন্মেষ হয় বলিয়া পরমপদের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (দ্রঃ পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৮)

সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ভগবতী মা

'ভগবতী মা' বলিতে সেই পরাশক্তিকে বুঝায যিনি সমগ্র সৃষ্টি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, ব্যষ্টিভাবেও আছেন, সমষ্টিভাবেও আছেন এবং এসবের অতীতভাবেও আছেন। এই পরাশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি এবং বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। শ্রীভগবান্ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি তাঁহার শক্তিও সচ্চিদানন্দময়ী।

স্বরূপতঃ ইনি এক ও অভিন্ন। ভগবান্ যেমন এক, তাঁহার শক্তিও তেমনি এক। এই মূলীভূত শক্তি অব্যক্ত ও নিরাকার। ইনি ব্যক্তিভাবাপন্ন (impersonal) নহেন। এই মূলশক্তি বিশ্বাতীত চিৎশক্তি। ইহার সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ অদ্ভুত। শক্তি হইতেই সৃষ্টি হয়—তাই অনন্ত, সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অতীত অবস্থায় ইনি অবস্থিত। সৃষ্টি ইঁহারই অভিব্যক্তি। সেইজন্য ইনি অব্যক্ত হইলেও অংশতঃ ব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত, পরম রহস্যময় (ever unmainfested mystery of the Supreme)। শ্রীভগবানের সহিত সৃষ্টি জগতের সম্বন্ধের দ্বার হইল এই পরাশক্তি। চিৎশক্তি মধ্যস্থ না থাকিলে শ্রীভগবানের সঙ্গে জগতের কোনই সম্বন্ধ থাকিত না। অর্থাৎ ইঁহার নিত্য চৈতন্যের (eternal consciousness) মধ্যেই শ্রীভগবান্ বিধৃত আছেন। সুতরাং এই পরাশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। পরাশক্তিরূপিনী মা পরমেশ্বরেরই স্বীয় জ্ঞান ও শক্তিভূতা।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্ণের মধ্যে একটি দিক আছে তাহা স্বপ্রকাশময়, আর একটি দিক আছে যাহা পরমাব্যক্ত রহস্যময়। পূর্ণ অখণ্ড, তাই এই দুইটি দিক্ও আমাদের বুঝিবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃ সেখানে ভেদকল্পনা চলে না। যেটি রহস্যময় ও অপ্রকাশ—তাহাই অব্যক্ত ভগবান্, যেটি স্বপ্রকাশময় তাহাই ভগবৎ-শক্তি। এই অপ্রকাশ দিকটাও শক্তি, তবে চিরাব্যক্ত ও পরিপূর্ণ (Absolute power); এই দিকটা সত্তাও বটে, তবে

চিরাব্যক্ত সত্তা (ineffable presence)। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে 'ভগবতী মা'-ই শক্তি বা পরাশক্তি—ভগবান্ শক্তি নহেন। তিনি শক্তিমান। বস্তুতঃ ভগবানও শক্তি—তবে পরিপূর্ণ ও নিত্য অব্যক্ত শক্তি। তাই সাধারণতঃ তাঁহাকে শক্তি বলা হয় না। শক্তি কার্যানুমেয়। তাঁহার সাক্ষাৎ কোন কার্য নাই। ভগবান ও ভগবতী একই বস্তু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে হইতে পারে 'ভগবতী মা'-ই সত্তা, কারণ 'ভগবতী মা'-তেই নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রকাশমানতা রহিয়াছে। ভগবান্ সত্তাতীত। অতএব 'অসৎ'। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভগবানও সত্তাস্বরূপ। শূন্য নহেন, অসৎ নহেন—ineffable presence, তিনি নিত্য অব্যক্ত। পরাশক্তিরূপিনী সত্তা প্রকাশময়ী, তিনি চির অপ্রকাশাত্মক। এই চির অব্যক্ত শক্তি ও সত্তার সন্ধান একমাত্র 'ভগবতী মা'-ই জানেন—মহারহস্য শুধু 'ভগবতী মা'ই জ্ঞাত আছেন। গুপ্তভাবে নিহিত (hidden) সৃষ্টি ব্যাপারটি হইল, রহস্যময় মহাসত্তা হইতে অনন্ত খণ্ড সত্তার আবির্ভাব। এই অনন্ত খণ্ডসত্তা 'ভগবতী মা'-তেই আছে বা ভগবানেই আছে—উভয়ই বলা চলে। বাস্তবিক পক্ষে দুই-ই এক। কিন্তু আবির্ভাবের কারণ 'ভগবতী মা'। কারণ গুপ্ত অবস্থা হইতে বাহির করা 'ভগবতী মা'-র কার্য। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ খণ্ড সত্তাগুলি পরাশক্তির অনন্ত আলোকে, চৈতন্যের শুদ্ধ প্রকাশে, সুষ্ঠুরূপে ভাসিয়া উঠে—চেতনভাবে, ব্যক্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এই সময়ে এই সত্তাগুলি শক্তির আকার ধারণ করে। পরাশক্তির প্রভাবে ঐরূপ হয়। অনন্ত চৈতন্য পাইয়া এরা চেতন হয়। এই পর্যন্ত পাওয়া গেল সত্তাগুলির শক্তি ও চৈতন্যময়তা। তারপর হয় সাকার—দেহবিশিষ্ট। এটা বিশ্বের অগ্রবর্তী দশা।

খণ্ড সত্তাগুলির তিনটি অবস্থা পাওয়া গেল—

(১) গুপ্ত, অব্যক্ত। এই অবস্থায় খণ্ড সত্তা মহাসত্তায় প্রচ্ছন্ন থাকে। এই মহাসত্তা = ভগবান্ বা ভগবতী।

(২) প্রকট, চিদালোকে আলোকিত। এই অবস্থায় খণ্ড সত্তাগুলি চৈতন্যময় ও শক্তিময়রূপে বর্তমান। এইগুলি অনন্ত চিন্ময় রশ্মি, যাহাকে তান্ত্রিকগণ বলেন 'চিন্মরীচি'। ইহা পরাশক্তির ভূমিতে। বস্তুতঃ এই সকল শক্তিপুঞ্জ নিরাকার।

(৩) সাকার। ইহা বিশ্ব বা সৃষ্টি মধ্যে প্রকটিত রূপ।

পরাশক্তির হৃদয়ে পরভগবান নিত্যই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশমান। এই প্রকাশমানতা স্বভাবসিদ্ধ। পরাশক্তিরও অতীত স্বরূপ যেটি, তাহা রহস্যময় চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, পরমাব্যক্ত।

পরাশক্তি ভগবানকে লইয়া খেলা করেন। তিনি তাঁহাকে ব্যক্ত করেন ও আকার দান করেন। সৃষ্টিতে ভগবানকে ব্যক্ত করেন—

(ক) ঈশ্বর ও শক্তিরূপে। এটা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। এক হইয়াও যুগলরূপে প্রকাশিত।

(খ) পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে। ইহারা ভিন্ন স্বরূপ। দ্বৈতভাবে স্থিত। তখনও উভয়ই নিরাকার। আবার আকার দান করেন—অনন্তরূপে, কোটি ব্রহ্মাণ্ড রূপে, তদন্তঃপাতী লোক, লোকান্তররূপে, তদন্তঃস্থ দেবতা ও তৎশক্তিরূপে।

এইভাবে পরাশক্তিরই প্রভাবে জ্ঞাত অজ্ঞাত অনন্ত জগতে যাহা কিছু আছে "সবই যে ভগবান" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইহা পরাশক্তিরই মহিমা। যেখানে যা কিছু আছে সবই শক্তি কর্তৃক অনন্তের রহস্য উদ্‌ঘাটন মাত্র।

বস্তুতঃ সমস্ত বিশ্বই চিৎশক্তির অংশ। চিৎশক্তিই জীব ও জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার তিনটি দিক আছে—

(১) বিশ্বাতীত পরাশক্তি। ইনি সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টির সঙ্গে অব্যক্ত ভগবানের যোজিকা।

(২) বিশ্বাত্মিকা-মহাশক্তি বা মহামায়া। বিশ্বমাতা। ইনি বিশ্বের আত্মা। ইনি জীব সকলের সৃষ্টি করেন আর অনন্ত শক্তির ধারণ, অনুপ্রবেশ ও চালনা করেন।

(৩) ব্যষ্টিরূপা—খণ্ডশক্তি (জীবহৃদয়বাসিনী)। ইনি মনুষ্য ও ভগবৎ শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করেন।

এবার মহাশক্তির বা মহামায়ার কার্য ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। মহাশক্তির বা মহামায়ার কার্য ততক্ষণ আরব্ধই হয় না, যতক্ষণ পরাশক্তি কার্য না করেন। পরাশক্তি মহাশক্তির 'অব্যক্ত চৈতন্য' মাত্র। পরাশক্তি ভগবৎ সত্তা হইতে "সত্তা" আকর্ষণ করিয়া মহাশক্তির মধ্যে সঞ্চার করিলে মহাশক্তি তাহা ধারণ করেন ও তাহাকে কার্যে পরিণত করেন, গঠন করেন। এই যে কার্যরূপে পরিণাম, ইহাই কোটি কোটি অণ্ডের রচনা। ইহার পর ঐ সকল অণ্ডে তিনি অনুপ্রবেশ করেন—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। এই অনুপ্রবেশের ফলে সকল অণ্ডেই ভাগবতী সত্তা (Divine Spirit), সর্বধারিণী ভাগবতী শক্তি এবং ভাগবত আনন্দ পরিব্যাপ্ত হয়। সৃষ্টিতে এই আনন্দ-প্রাচুর্য না থাকিলে কোন পদার্থ বাঁচিতে পারিত না, কিছুরই সত্তা থাকিত না—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"।

মহাশক্তির দুইটি রূপ—

(১) আন্তর। চৈতন্যাত্মকরূপা। ইহা "শক্তি"।

(২) বাহ্য। ক্রিয়াত্মকরূপা। ইহারই নাম "প্রকৃতি"। মহাশক্তিই প্রকৃতিকে চালনা করেন এবং প্রকৃতির প্রতি প্রক্রিয়াতে প্রকট বা গুপ্তরূপে খেলা করেন। সকল শক্তি ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য মহাশক্তিই করেন।

পরাশক্তি চিন্ময়ী। তাই তিনি চিৎশক্তি।

মহাশক্তি জ্ঞানক্রিয়াময়ী। সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বের মিলিত অবস্থাই মহাশক্তি। আমাদের এই পৃথিবী অজ্ঞান জগতের একটি কেন্দ্র। অজ্ঞানরাজ্যটি সোপানময়। চৈতন্যের স্তর ক্রমশঃ অবরোহণ করিয়াছে—চরমে জড়ের অচৈতন্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই অজ্ঞান জগতের উর্ধ্বে আছেন মহাশক্তি। এই অজ্ঞানজগতের ঘটনাপুঞ্জ ও অভিব্যক্তি বা বিকাশের নিয়ামিকা এই মহাশক্তি। এই কার্য সাধনের জন্য তিনি নিজের যাবতীয় শক্তি ও রূপ বা মূর্তি (powers and personalities) প্রকট করেন।

(উদ্ধৃত প্রবন্ধটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত রচনার সংগ্রহে রচিত)

সৃষ্টিতত্ত্ব—প্রকাশ ও বিমর্শ

সৃষ্টিতত্ত্ব এক গভীর রহস্যে আবৃত। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বিষয়টিকে নানাস্থানে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার বিশ্লেষিত যুক্তিধারার একত্র সঙ্কলন করিয়া বিষয়টিকে সহজবোধ্যের জন্য নানাভাবে উত্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু সজ্জন পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে ইহা ছাড়া উপায় নাই। সেইজন্য পুনরাবৃত্তিজনিত ত্রুটি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সৃষ্টির মূলে আছে 'প্রকাশ' ও 'বিমর্শ'। সৃষ্টির ক্রম অনুসারে প্রথম 'প্রকাশ', তারপর 'জ্যোতি'। আবার বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ নাদ-সাধনার অগ্রগতিতে প্রথম জ্যোতির আবির্ভাব, তারপর প্রকাশ। অতএব জ্যোতির অতীত প্রকাশ। যাঁহারা আগমোক্ত সাধনায় অগ্রসর হন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন এই প্রকাশের মধ্যেও দুইটি জিনিসের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। অদ্বৈত শৈবাগমবাদিগণ এই দুইটি জিনিসকে 'প্রকাশ' এবং 'বিমর্শ' বলিয়া থাকেন অর্থাৎ বিমর্শের সহিত যোগেই প্রকাশের প্রকাশত্ব। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ অপ্রকাশতুল্য। বস্তুতঃ প্রকাশ কখন বিমর্শশূন্য হন না, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাভাবে যুক্ত। এই জন্যই প্রকাশ নিত্যই স্বপ্রকাশ। প্রকাশ শিব, বিমর্শ শক্তি। উভয়েই চিৎস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবও চিৎ,

বিমর্শও চিৎ। তথাপি ইহা সত্য যে শক্তি ব্যতিরেকে শিব শিবপদবাচ্য হন না, শুধু শব মাত্র থাকেন। প্রকাশের প্রকাশময়তা বিমর্শসাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রকাশ বিমর্শবশতঃ নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন।

অতএব প্রকাশের স্বরূপভূতা শক্তিই বিমর্শ। এই বিমর্শই পরাবাক্, যাহার মহিমা অদ্বৈতাগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"বাগ্রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী। ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবিমর্শিনী"।

অর্থাৎ 'প্রকাশ বা বোধের বাগ্রূপতা নিত্যসিদ্ধ এবং প্রকাশ স্বভাবতই বিমর্শময়'। যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে প্রকাশ স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান্ হইতে পারিত না। এই প্রকাশ ও বিমর্শই বৈদিকগণের পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে পরব্রহ্মের স্বরূপসত্তা সিদ্ধ হয় না। পরব্রহ্মের স্বয়ং প্রকাশতার মূলেই নিত্যসিদ্ধ শব্দব্রহ্মের এই মহিমা রহিয়াছে।

অদ্বৈত শৈবাগমবিদ্গণ বলেন, প্রকাশরূপী শিব ও বিমর্শরূপিনী শক্তি—এই উভযের সংঘর্ষ ব্যতীত সৃষ্টির উন্মেষ হইতে পারে না। এই যে শিব ও শক্তি ইঁহারা নিত্য অবিভক্ত। এইজন্য শৈবধর্মে শিব ও শক্তির মিলিত রূপকে 'যামলরূপ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কারণ শিব কখনও শক্তিহীন হন না এবং শক্তিও কখনো শিবহীন হন না। কিন্তু স্বরূপতঃ এই অবিভাগ সত্ত্বেও ব্যবহারদৃষ্টিতে ইঁহাদের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার কথা বলা সম্ভবপর। পূর্ণত্বের অবস্থা অদ্বয় স্থিতি। তখন শিব ও শক্তি নিত্য সমরস—তখন শিব শক্ত্যাত্মক এবং শক্তিও শিবাত্মক। একই বস্তু—তাহাই 'স্বাতন্ত্র্যময় বোধ' বা 'বোধময় স্বাতন্ত্র্য'। শৈবদৃষ্টিতে তাহাকে 'স্বাতন্ত্র্যময় বোধ' বুঝিয়া পরমশিব বলা চলে এবং শাক্তদৃষ্টিতে 'বোধময় স্বাতন্ত্র্য' বুঝিয়া পরাশক্তি বলা চলে। বস্তুতঃ উভয় নাম একই পরম অদ্বয় তত্ত্বের বোধক। ইহাই হইল পূর্ণাবস্থার কথা।

কিন্তু অপরাবস্থায় দুই প্রকার স্থিতি লক্ষিত হয়ঃ—(ক) একটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শিব ও শক্তির নিত্য অবিভক্ততা ও অবিভাজ্যতা সত্ত্বেও দ্রষ্টার দিদৃক্ষাদি ভেদে এক-একটির প্রাধান্য ঘটিয়া হয় শিবভাবের প্রাধান্য, নতুবা শক্তিভাবের প্রাধান্য। শিবপ্রাধান্য স্থলেও শক্তি থাকেন, তবে আত্মবিশ্রান্তভাবে, শক্তিপ্রাধান্য স্থলেও শিব থাকেন ঐরূপ আত্মবিশ্রান্তভাবে। এইরূপ অবস্থায় শিব শক্তির দিকে উন্মুখ থাকেন না, শক্তিও শিবের দিকে উন্মুখ থাকেন না। এটি নিরপেক্ষ স্থিতি।

(খ) দ্বিতীয় স্থিতিটি যামলরূপে অবস্থান। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এই অবস্থা আবশ্যক। এই অবস্থায় শিব ও শক্তি পরস্পরের প্রতি উন্মুখ থাকেন—শিব শক্ত্যুন্মুখ এবং শক্তিও শিবোন্মুখ। এই যামলরূপ হইতেই সৃষ্টির উন্মেষ ঘটে। শিব

ও শক্তির পরস্পর ঔন্মুখ্যবশতঃ আনন্দশক্তির উদয় হয়—ইহা আত্মার উচ্ছলনাবস্থা (overflow)। মূলে কিন্তু প্রকাশরূপ শিব এবং বিমর্শরূপা পরাসংবিদ্, উভয়ই অনুত্তর বা বিশ্বাতীত অথচ উভয়ই নিত্যোদিত অর্থাৎ উহাদের উদয়াস্ত নাই—"নোদেতি নাস্তমেতি সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা"। শিব ও শক্তির পরস্পরের প্রতি উন্মুখতাবশতঃ আনন্দের উদয় হইলে 'বিসর্গ' বা বিসর্জন হয়। বিসর্গের প্রক্রিয়াটি পরে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে।

গীতাতে বলা হইয়াছে—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা॥ (১৪/৩-৪)

শ্লোক দুইটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। সত্যই সৃষ্টির আদিতে আছে গর্ভাধান ব্যাপার। যাহার মূল 'বীজ' ও 'যোনি'। বীজ ও যোনি, শিব ও শক্তিরই নামান্তর। শাস্ত্রে আছে ক্ষোভকতাই বীজত্ব এবং ক্ষোভের আধারভাবই যোনিত্ব। সংবিদের স্বভাবই এই যে ইহা ক্ষুব্ধ করে। সংবিদের ভিতরে সব জ্ঞেয়ার্থ অভিন্নভাবে সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় বর্তমান থাকে—তাহাদের বাহিরুন্মুখ করিয়া ধারণ করাই ক্ষোভ। ইহাই সংবিদদের সবীজদশা। ক্ষোভহীন দশা নির্বীজ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রকাশরূপ পরমশিবের সহিত একাত্মকভাবে বিদ্যমান যে বিশ্ব তাহা অন্তঃস্থ—তাহা সংবিদ্‌রূপ বলিয়া তাহাতে কোন বিশেষ ভাবের উন্মেষ হয় না। উহা নির্বিশেষ সংবিদ—এক ও অদ্বিতীয়। উহা সর্বভাবপূর্ণ বলিয়া বিশ্বের আবির্ভাবক। সেইজন্য উহাই বীজাংশ। উহাকে ভিন্নরূপে অবভাসন করাব ইচ্ছাই 'ক্ষোভ'। আর ঔদাসীন্যবশতঃ বহির্ভাবে অনুন্মুখ ভাবসমূহকে উহাদের ঔদাসীন্য ভাঙ্গাইয়া বহির্ভাবের দিক উন্মুখ করার নাম 'ক্ষোভনা'। ইহা একপ্রকার বলাৎকার। যেমন পুরুষ বীজ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে স্বয়ং ক্ষোভপ্রাপ্ত হয় ও প্রমদাকে ক্ষোভিত করে অর্থাৎ বীজ গ্রহণে উন্মুখ করে, ইহাও সেইরূপ। তাই বলা হয় যে যাহার সঙ্গে সামরস্য লাভ করিলে আত্মার ইচ্ছা কৃতার্থ হয় তাহাই যোনিপদবাচ্য। ইহা ক্ষোভাধার।

এই ক্ষোভাধার কি? ইহা সংবিদের স্বাতন্ত্র্যরূপ যে ক্ষোভ তাহার আধার বা বিষয়। ইহা ইদন্তাবিমৃশ্য ভাবসমূহ। আত্মার ইচ্ছা তখনই পূর্ণ হয়, যখন ইহা ইদংরূপে বিমর্শনীয় ভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। ইচ্ছার কৃতার্থতা কি? স্বাত্মমাত্রে বিশ্রাম লাভই ইচ্ছার পূর্ণতা। তখন বুঝা যায়, "মমৈব ভৈরবস্যৈতা বিশ্বভঙ্গো বিনির্গতাঃ"।

'অহং'-এর সঙ্গে 'ইদং' রূপে বিমৃশ্যমান ভাবের সামরস্য না হইলে এই

অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্য যে আমা হইতে নির্গত আমারই বিচিত্র শক্তির বিলাস অর্থাৎ আমিই যে ভৈরব, বিশ্ব যে আমারই আত্মস্ফুরণ তাহা বোধে আসে না। বীজ কাহাকে বলে? যখন সংবিদসকলের ইচ্ছাদিরূপে বিভাগ বা বৈশিষ্ট্য জাগে নাই, কেবল অনবিচ্ছন্ন পারমার্থিক জ্ঞেয়মাত্ররূপে থাকে, তাহাই বীজপদবাচ্য। ইহা জ্ঞেয় বা অবশ্য জ্ঞাতব্য। উৎপলাচার্য ইহাকেই অন্তঃস্থিত 'নিরুপাদান অর্থজাত' বলিয়াছেন, যাহাকে আত্মা ইচ্ছাবশতঃ বহিঃপ্রকাশ করেন। মুখ্য কারণ বলিয়া ইহাকে বীজ বলে। ইহাই কারণ জগৎ। এই বীজ বিসর্জনের ইচ্ছাই ক্ষোভ। ইহার ফলে বিজ্ঞাত্মা হইতে অভিন্ন গ্রাহ্য ভাবরাশি ভিন্নবৎ প্রতীত হয়।

কাশ্মীর শৈবাগমদর্শন 'স্পন্দ কারিকা'য় এই একই বিষয়কে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের শ্রীমুখ হইতে 'স্পন্দ কারিকা'র বিশ্লেষণ শুনিয়া আমার যে ধারণা হয় সেই ধারণাকে আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উহাই এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

পরমশিবাবস্থা অখণ্ড মহাপ্রকাশ। এখানে শিবও আছে, শক্তিও আছে, অর্থাৎ অস্পন্দও আছে, স্পন্দও আছে এবং সমগ্র বিশ্বের ভানও ইহার মধ্যে আছে। যেমন সিনেমায় focus বা আলোতে অগ্নি আছে, জল আছে, পর্বত আছে, সাগর আছে, জীব-জন্তু মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সবই আছে—পরমশিব অবস্থাও তদ্রূপ। শিব ও শক্তির সামরস্য জনিত অদ্বয় অবস্থা। তারপর শিব ও শক্তিতে দ্বিধা বিভক্ত অবস্থা—একদিকে শুদ্ধ প্রকাশ অপরদিকে বিমর্শ। স্পন্দাত্মিকা বিমর্শ-শক্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। বিশ্ব ক্রিয়াত্মক। জগদম্বার 'ক্রিয়াশক্তি' হইতে কিভাবে বিশ্বের উৎপত্তি হয় তাহা পরে বর্ণনা করা হইবে। এখানে এইটুকু বলা যাইতেছে যে, শক্তি, শিবে ডুবে থাকার জন্য বিশ্বেরও আভাসন আছে শিবের মধ্যে। শিবের, শক্তির প্রতি আভিমুখ্য এবং শক্তির, শিবের প্রতি আভিমুখ্য—এইরূপ পরস্পরের প্রতি আভিমুখ্য হইলেই বিশ্বসৃষ্টি হয়। শিব যদি শক্তির অভিমুখী হয় অথচ শক্তির শিবের প্রতি আভিমুখীনতা নাই, বা বিপরীতভাব শক্তির আভিমুখ্য থাকিলেও শিবের যদি না থাকে তবে বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না।

শিব অস্পন্দাত্মক, শক্তি স্পন্দাত্মক এবং শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশ্ব ক্রিয়াত্মক। অতএব একদিকে স্পন্দরূপা শক্তি অস্পন্দরূপ শিবের সহিত অভিন্ন, আবার অপরদিক থেকে স্পন্দরূপা শক্তি ক্রিয়াত্মক বিশ্বের সহিত অভিন্ন।

স্পন্দরূপা শক্তি হইতে যে বিশ্বের উৎপত্তি, উহা চিন্ময় সৃষ্টি—সম্বিদরূপা সৃষ্টি; উহা শাক্ত আকারবিশিষ্ট, সেইজন্য বলা হয় শাক্তাণ্ড। সম্বিদরূপা সৃষ্টিতে স্থূল কালের কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা নিত্য। পরবর্তী অবস্থায় মায়ার সংস্পর্শে

আসিয়া বা মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা কালকবলিত স্থূল বিশ্বের আবির্ভাব হয়। স্থূল বিশ্বের আবির্ভাবের পূর্বেই যে স্পন্দরূপা শক্তি হইতে চিন্ময় বিশ্বের স্ফূরণ—উহা যেন রামের জন্মের পূর্বেই বাল্মীকির রামায়ণ রচনার ন্যায়।

স্পন্দরূপা শক্তি হইতে বিশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'জ্ঞাতা'রও আবির্ভাব হয়। প্রশ্ন হইল এই বিশ্বই বা কি দিয়ে তৈরী, আর জ্ঞাতাই বা কে? উত্তর হইল, পরমশিবের 'সৎ' অংশ হইতে এই চিন্ময় বিশ্বের সৃষ্টি, অতএব ইহা 'সন্মাত্র'। আর তাঁহার 'চিৎ' অংশই জ্ঞাতা, অতএব এখানে পরমশিব নিজেকেই নিজে দেখেন। অর্থাৎ জ্ঞাতাই এখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয় হন। এখানে যে জ্ঞান, উহা নিত্যজ্ঞান। 'একে'রই যে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপে অবস্থান, উহাকেই বলে 'প্রমিতৃ'—বৌদ্ধমতে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। প্রমিতৃতে যে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের ত্রিপুটি, উহাই প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়। প্রমাতা হইল অগ্নিচক্র, প্রমাণ—সূর্যচক্র, প্রমেয়—সোমচক্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই প্রমিতৃতে স্থূল কালের কোন সম্বন্ধ নাই। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়েরূপ ত্রিপুটির সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

প্রমৃতি (পরপ্রমাতা) অবস্থা থেকে প্রাণ-প্রমাতা (অপর প্রমাতা) অবস্থায় যখন আসে, তখন কাল-সম্বন্ধ আসে। এরূপ প্রমাতা থেকে প্রমাণ এবং প্রমাণ থেকে প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞাতা থেকে জ্ঞান এবং মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞান থেকে জ্ঞেয় উৎপত্তি হয়। এই যে স্থূল জ্ঞেয়ের উৎপত্তি, তাহা এখানে শরীরে 'অহং' প্রতীতি বা অনাত্মায় আত্মবোধরূপী জ্ঞাতার উৎপত্তি। এরূপ জ্ঞাতার যে জ্ঞান তাহা স্থূল শব্দাত্মক জ্ঞান এবং জ্ঞেয় অর্থাত্মক স্থূল বস্তু।

প্রাণ (অপর) প্রমাতার যে জ্ঞান, উহার দুই ভাগঃ— (১) সাকার জ্ঞান এবং (২) নিরাকার জ্ঞান। নিরাকার জ্ঞানে কোন ভান নেই, কেবলই আলো। সাকার জ্ঞানে বৈচিত্র্য আছে, অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই দর্শন জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন স্থূল বস্তু নহে, জ্ঞানেরই প্রকাশরূপে "সাভাস-জ্ঞান"। পরন্তু নিরাকার জ্ঞানে কোন জ্ঞেয় নেই অর্থাৎ কোন ভান নেই—নিরাভাস, কেবলই আলো। জ্ঞান জ্ঞেয়শূন্য হইলেই নিরাভাস হইয়া যায়। তখন জ্ঞান নিরালম্ব হইয়া থাকিতে পারে না—জ্ঞাতার মধ্যে চলিয়া যায়। এরূপ জ্ঞাতারূপ প্রমাতাই হইল 'কেবলই আত্মা'—পাতঞ্জল যোগে যে আত্মার 'দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থানে'র কথা উল্লেখ আছে, ইহা সেই আত্মা যাহার চারিদিকে 'নিরাকার-জ্ঞান'-রূপ আলো একটা ঘের তৈরী করে।

জ্ঞাতা-জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক—উপরি-উদ্ধৃত বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক এখানে আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতেছে। যদিও এই বিষয়টি যোগভূমির অন্তর্গত এবং সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তথাপি পরোক্ষ যোগ থাকার জন্য আগেভাগেই ইহার আলোচনার অবতারণা করা হইল।

জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই তত্ত্ব, তবে প্রকারভেদ; যেমন জলের তিন অবস্থা—জল, বাষ্প ও বরফ। তিনটি একই বস্তু, তবে প্রকার ভেদ। জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে জ্ঞান মিলিত থাকে, আবার জ্ঞানকে জ্ঞেয় বস্তু থেকে পৃথকও করা যায়; যেমন বরফ জলে ভাসিতে থাকে, আবার জল থেকে বিচ্ছিন্নও করা যায়।

বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই জ্ঞেয় বস্তু—জ্ঞানের বিষয়। ব্যবহারিক জগতে জ্ঞেয় বস্তুসমূহ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগে এসে জ্ঞানগোচর হয়। জ্ঞান আছে বলেই জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি। জ্ঞানরূপ সত্তা আছে বলেই জ্ঞেয়বস্তুর অবস্থিতি বা উহা জ্ঞানগোচরক্ষম। কিন্তু জ্ঞান না থাকলে শুদ্ধ জ্ঞেয়বস্তুর অস্তিত্ব বা অবস্থিতি অলীকতায় পর্যবসিত হয়। জ্ঞানের আধারে জ্ঞেয়বস্তু সন্নিবিষ্ট বা বিরাজিত। অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় অবিনাভাবে সংশ্লিষ্ট। জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয়ের পৃথক অস্তিত্ব নেই। মূর্চ্ছিত অবস্থায় কি কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে? থাকে না। অতএব জ্ঞান না থাকলে জ্ঞেয়ও থাকে না। কিন্তু জ্ঞেয়বস্তু থেকে জ্ঞান পৃথক থাকতে পারে। বস্তুতঃ জ্ঞান, জ্ঞেয় নিরপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞেয় জ্ঞানসাপেক্ষ। বাহ্য বিষয়বস্তু হতে সম্যগ্ সমাহৃত হয়েও জ্ঞান আপন স্বরূপে বিরাজমান থাকে। বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে না এসেও জ্ঞান যে থাকতে পারে তাহার একটি বড় প্রমাণ হল স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নে যে-সমস্ত বিষয়ের অনুভব হয়, সে সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না; কারণ, তখন বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে, তথাপি সে-সমস্ত বিষয়ের ধারণা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাক। জ্ঞান একটি আভা ব্যতীত কিছুই নয়। জ্ঞানের আভায় সমস্ত কিছু জ্ঞেয় ভাসমান। যেমন ধরা যাক সিনেমা। একটি পর্দার উপরে বিচিত্র দৃশ্য ফুটে উঠছে। পর্বত, সমুদ্র, আরণ্যানী, জল, স্থল, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি কতই না দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে জল ও অগ্নি পাশাপাশি বিরাজ করছে। কিন্তু এ সমস্ত হচ্ছে কিসের দ্বারা? আলোর (focus) দ্বারা। একই আলোয় আগুন, জল, স্থল, পর্বত, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্য চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে। কিন্তু পর্দায় প্রতিফলিত জল-স্থল প্রভৃতির কি প্রকৃত সত্ত্বা আছে? না। এক আলোর দ্বারা এই সমস্ত সংঘটিত হচ্ছে। আলো যদি না থাকে, ঐ বিচিত্র দৃশ্যাবলীও অন্তর্হিত হয়। সেইরূপ জ্ঞানই ঐ আলো বা আভা। তারই আভায় আভাসিত হচ্ছে জাগতিক সমস্ত বস্তু—"ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" অতএব জ্ঞেয় জ্ঞান-সাপেক্ষ—জ্ঞানের আভায় প্রকাশিত। কিন্তু জ্ঞান জ্ঞেয় বা বাহ্য বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ, আপন আলোকে সমুজ্জ্বল। এরও উর্দ্ধভূমির অবস্থায় জ্ঞানও নেই, আছেন শুধু জ্ঞাতা। সেই একমাত্র বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান সাধনাই সাধকের লক্ষ্য—যে এক-বিজ্ঞানে সকল-বিজ্ঞান লাভ হয়।

এখানে যোগ-সাধনার কথাও সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। সাধককে প্রথমে জ্ঞানের

সাধনা করতে হবে। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্রভূমিতে উন্নত করতে হবে। অর্থাৎ যে বাহ্য বিষয়সমূহের আকর্ষণে চিত্ত শতধা বিভক্ত—শতধারে বিক্ষিপ্ত হেতু যা থেকে চিত্ত-চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়, যে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান হতে পৃথক ও সত্য বলে মূঢ় চিত্ত ধারণা করে এবং সেই সমস্ত অলীক বিষয়বস্তুর সম্ভোগ-বাসনায় ভ্রান্ত জীব যে সমস্ত কর্মের বিপাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিঘূর্ণিত হতে থাকে, সেই সমস্ত আপাত মধুর বলে প্রতীয়মান্ চিত্ত-বিভ্রান্তকারী বিষয় সমূহের আকর্ষণ হতে বিক্ষিপ্ত চিত্তের গতিকে সংহরণ করে অন্তর্মুখী করতে হবে। বাহিরের শতধা বিচ্ছিন্ন অভিনিবেশ হতে মনকে প্রত্যাহৃত করে অন্তরাত্মার ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হতে হবে। অন্তরস্থিত সেই পুরুষ যিনি আমাদের অন্তরে অবস্থান করেন, আমাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপ, চিন্তা, অনুভবকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই অন্তর্যামীর একনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণায় তন্ময়-চিত্ত হতে পারলেই 'বিবেক-খ্যাতি' জাগ্রত হবে। এবং পরিশেষে আত্মবিজ্ঞানের উপলব্ধির দ্বারা চিত্ত চিন্ময় জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠবে। পরে জ্ঞানও থাকবে না, শুধু জ্ঞাতামাত্রের অস্তিত্ব থাকবে। অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞাতাই আছেন আর কিছু নাই—সেরূপ অবস্থা হল নির্বিশেষ অদ্বয় তত্ত্ব।

আত্মা থেকেই সব চেতনা জেগে ওঠে। মনের মাধ্যমে চেতনা কাজ করে। মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয় সম্পর্কে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান মনেতে ভাসমান হয়। এক-কথায় আত্মা হতে উত্থিত চেতনা মনের মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযোগ হেতু বিষয়-জ্ঞানের উৎপত্তি করে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন মালিন্য বা বিকল্প নেই। কিন্তু যেই বিষয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়-বাহিত হয়ে মনের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই মনের হাজার সংস্কার সেই জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হয়ে বিকল্প জ্ঞানের সৃষ্টি করে। আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে (in subconscious mind) অসংখ্য সংস্কার জমা হয়ে রয়েছে। মনকে সর্বপ্রকাব সংস্কারমুক্ত অর্থাৎ বিকল্পশূন্য করতে হবে। মন শুদ্ধ অর্থাৎ চিত্ত মালিন্যমুক্ত হলে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মাঝখানে কোন বিকল্প এসে জ্ঞানকে দূষিত করতে পারবে না। শব্দ, শব্দই। শব্দের অর্থ আমাদের মনের সহিত এমনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে (associated) সংস্কারের জাল রচনা করেছে যে, শব্দ কানের মধ্যে প্রবেশমাত্রই সেই শব্দের অর্থ পূর্বের ধারণা বা সংস্কার অনুযায়ী মনে জাগ্রত হয়ে বিকল্পের তরঙ্গ বা স্পন্দন উত্থিত হয়ে মনকে আচ্ছাদিত করে। যোগ সাধনার দ্বারা সাধক যদি এমন অবস্থায় উপনীত হতে পারে যে যখন শব্দ কর্ণে প্রবেশ করেও শব্দরূপেই বিরাজ করে অর্থাৎ মনের মধ্যে সেই শব্দ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, অর্থাৎ কোন প্রকার সংস্কার ক্রিয়া করতে পারে না, তখনই সাধক নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হতে পারেন। এইরূপ নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় জ্ঞেয় জ্ঞানের মধ্যে লয় হয়ে যায় এবং

জ্ঞান সাধকের হৃদযাকাশে এক অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতিতে ভাসমান হয়। শুদ্ধ চিন্ময় বিজ্ঞানে, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। এরও পরের অবস্থায় জ্ঞানও থাকে না; জ্ঞান, জ্ঞাতার মধ্যে প্রবেশ করে। সাধক যখন ঐ ভূমিতে উপনীত হন, তখন তাহার সদাশিব অবস্থা। একপ অবস্থা স্বাতন্ত্র্যহীন শুদ্ধ প্রজ্ঞা—ইহাকে বৌদ্ধদেব 'প্রজ্ঞা'র ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান হেতু এখানে পরম শান্তির অনুভব হয়। স্বাতন্ত্র্য শক্তিসমন্বিত পরমশিবাবস্থা (যাহার সন্ধান শৈবাগমে পাওয়া যায়) ইহারও উপরে।

[ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একদিন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি তা শুনে বাড়ীতে এসে নোট করে রাখি। বর্তমান প্রবন্ধটি তারই ফলশ্রুতি।]

আবার আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য বিশ্লেষণে ফিরিয়া আসা যাক। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বোধে তাঁহার এই নানামুখী বিশ্লেষণটাই আমি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। একই বিষযের বার বার উল্লেখের জন্য হয়ত পুনরুক্তি দোষ ঘটিতে পারে, তথাপি বিষযটির দুরূহতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা করিতে হইতেছে। জ্ঞান লাভেচ্ছু জিজ্ঞাসুদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ কবিরাজ মহাশয় নিজেই তাহা করিয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব
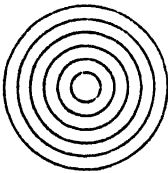
শৈব-সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমেশ্বর তত্ত্বাতীত; শাক্ত সিদ্ধান্তে তত্ত্বাতীত হইল পরা-সম্বিদ্। আমরা এখানে শৈব সিদ্ধান্ত মতেরই বিশ্লেষণ করিতেছি। এই মতে পরমেশ্বর বা পরমশিব তত্ত্বাতীত, তিনি বর্ণনার অতীত। তাঁহার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্যশক্তি। তাঁহার অপ্রতিহত 'ইচ্ছাই' স্বাতন্ত্র্যশক্তির পরিচয়। ইহারই অপর নাম চিৎ-শক্তি বা পরাশক্তি। ইহা তত্ত্বাতীত পরমেশ্বরকে ঘিরিয়া আছে। পরমেশ্বরেব মধ্যে ইচ্ছার উদয় হইলে চিৎ-শক্তি উহাকে গ্রহণ করে। পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয়, চিৎ-শক্তিও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু পরমেশ্বররের ইচ্ছাকে গ্রহণ করিয়া চিৎ-শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। চিৎ-শক্তিকে ঘিরিয়া আছে 'বিন্দু'রূপ গোলোক। বিন্দু বিশুদ্ধ অচিৎ। বিন্দু প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ অবস্থায় বিরাজ করে। যখন চিৎ-শক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তখন বিন্দুর প্রশান্ততা ভঙ্গ হইয়া উহার মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন

হয়। ক্রিয়াশীল চিৎ-শক্তি যেন বায়ুর সঞ্চালন, বায়ুর তাড়নায় বিন্দু-সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। এই তরঙ্গ-সমষ্টিই বিন্দুর ক্ষোভ। বিন্দুর মধ্যে যাহা ক্ষোভ, তাহাই 'নাদ'। নাদের প্রকাশ হইল 'জ্যোতি'। সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গ যেন নাদ, তরঙ্গ-মালার শীর্ষদেশে যে শুভ্র ফেনা দৃষ্ট হয়, তাহাই যেন জ্যোতি। নাদ 'শব্দ', জ্যোতি শব্দের 'অর্থ'। ইহাই মূল শব্দার্থ। বৈষ্ণব-ধর্মে ইহাকে বলা হয় 'নামরূপ'।

বিন্দুর ক্ষোভ হইতে উত্থিত নাদ-জ্যোতির প্রসারে যে জগৎ সৃষ্টি হয়, শাক্ত-তন্ত্রে উহাকে বলা হয় 'শুদ্ধ-অধ্বা'। ইহা শুদ্ধ জগৎ বা জ্যোতির্ম্ময় জগৎ বা বৈন্দব জগৎ। এই জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন মহামায়া। যেহেতু মহামায়ার এই বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় জগৎ বিন্দুর প্রসারণের ফলে সৃষ্টি হয়, সেইহেতু ইহাকে তন্ত্রে 'বৈন্দব জগৎ'ও বলা হয়।

এইরূপ আলোর জগত উদ্ভাসিত হইলে, সেই গোলাকৃত জ্যোতির্মণ্ডলকে ঘিরিয়া একটি ছায়ার রেখা (border) পড়ে। এই ছায়ার রেখাটি জ্যোতির্মণ্ডলের শেষপ্রান্ত ঘিরিয়া আলোর ছায়ার ন্যায় বিরাজ করে। এই ছায়া হইল মায়া, সেইজন্য মায়া অন্ধকার। অন্ধকার বলিতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অন্ধকার। এই অবিদ্যারূপী মায়ার অধিষ্ঠাতা হইলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর শুদ্ধ-অধ্বার শেষ স্তরে অবস্থান করেন। তিনিই মায়ার অন্ধকার গর্ভে পার্থিব বস্তু-জগতের বীজ নিক্ষেপ করেন। ফলে মায়ার মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। মায়ার ক্ষোভের ফলে মায়াকে বেষ্টন করিয়া যে প্রকৃতি বিরাজ করে, সেই প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। মায়া ক্ষুব্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সাম্য অবস্থায় থাকে। মায়ার ক্ষোভের ফলে প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইলে প্রকৃতির তিন গুণ সাম্য হারাইয়া ফেলে এবং বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। গুণ-বৈষম্যের ফলে পঞ্চভূতের উদ্ভব হইয়া প্রকৃতিকে ঘিরিয়া থাকে। পঞ্চভূত হইতে ভৌতিক স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মায়া পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও মায়িক জগতের অবতারণায় পরমেশ্বরের কোন যোগ নাই। কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছার উদ্রেক হইতে চিৎশক্তি ও বিন্দুর মধ্যেই ক্ষোভ উৎপন্ন হওয়ায় চিৎশক্তি ও বিন্দুর উপরই পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। মায়ার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই তখন থাকে না। বিন্দুর প্রসারণের ফলে মহামায়ার আলোর রাজ্যের উদ্ভব হইবার পর আলোর ছায়ারূপে মায়ার কালো রেখা দেখা দেয়। মায়া-রাজ্যের এখনও সৃষ্টি হয় নাই, সবে মায়ার কালো রেখাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র। মায়ার অধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বরই মায়িক জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ। মায়িক জগতের অবতারণায় ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব। মায়িক জগতের সহিত ঈশ্বরেরই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মায়িক জগতের সহিত পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ কোন যোগ না থাকিলেও পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়াই বিন্দুর প্রসারণ হইতে ভৌতিক

জগতের আবির্ভাব পর্যন্ত সমস্তই মালার ন্যায় পরমেশ্বরে বিরাজ আবার পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই মহাপ্রলয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সঙ্কুচিত হইয়া বীজাকারে বিন্দুর মধ্যে সমাহিত হইবে। ইহাই পরমেশ্বরের পঞ্চ কৃত্যকারিত্বের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ তিনটি কৃত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পূর্ব বর্ণিত বিষয়টিকে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নিজের হাতে আঁকিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেভাবে আঁকিয়াছিলেন নিম্নে সেইভাবেই অঙ্কিত করিয়া দিলাম—
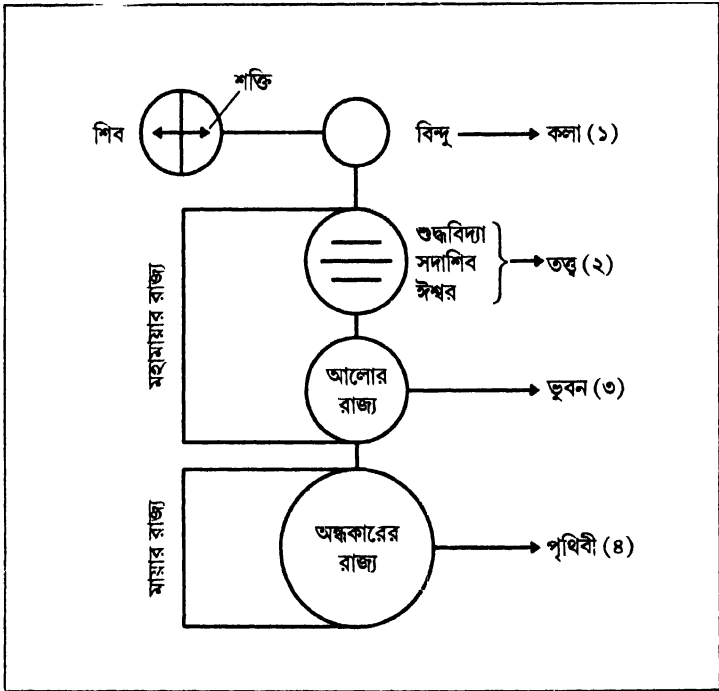
ইহা শিব ও শক্তির সাম্যভাব এবং বিন্দুর অস্পন্দ অবস্থা। শিবের সহিত বিন্দুর সম্পর্ক 'পরিগ্রহ'রূপা। শিব, শক্তি ও বিন্দু—এই তিনটি বস্তু নিত্য, কোন কালেই ইহাদের বিনাশ নাই। মহাপ্রলয়েও এই তিন বস্তু থাকে। শিবের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছার উদগম হইলে শিবের বহির্মুখ গতি হয়। শিবের ইচ্ছাই শিবের স্বাতন্ত্র্যশক্তি। সাম্যাবস্থায় শিবও নিষ্ক্রিয়, শক্তিও নিষ্ক্রিয় এবং বিন্দুও অস্পন্দ থাকে। শিবের মধ্যে শক্তি এবং শক্তির মধ্যে শিব সবসময় সমাবিষ্ট থাকে। শিব ও শক্তি কোন সময়েই বা কোন অবস্থাতেই পৃথক হয় না, যুক্ত থাকে। শিবের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা বা বহু হইবার ইচ্ছা উৎপন্ন

হইলে শিবের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। শিবের মধ্যে যতক্ষণ না ইচ্ছার উদয় হয়, ততক্ষণ শক্তি জড়ের মতই নিশ্চল হইয়া থাকে। শিবও চিৎ, শক্তিও চিৎ। শিবের মধ্যে ইচ্ছা বা কামনা জাগ্রত হয় মাত্র, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, শিব নিষ্ক্রিয়, অবস্থাতেই থাকে। শিবের ইচ্ছা, শক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে। শক্তি সক্রিয় হইলে বিন্দুর মধ্যে স্পন্দন উত্থিত হয। যেমন বাতাস সঞ্চালিত হইলে সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি শিবের ইচ্ছা হইল বাতাস, শক্তির ক্রিয়া হইল সেই ইচ্ছাকে সঞ্চালন করা, বিন্দু হইল চিন্ময় উপাদানে পূর্ণ অনন্ত সমুদ্র। শক্তির দ্বারা শিবের ইচ্ছার সঞ্চালনে বিন্দু-সমুদ্রে স্পন্দন উত্থিত হয়। নিমিত্ত-কারণ হইল শিবের ইচ্ছা, উপাদান-কারণ হইল বিন্দু। শক্তির মধ্যে ইচ্ছা ও বিন্দুর সংযোগ সাধন হয় এবং তাহা হইতে সৃষ্টির বিকাশ হয। সেইজন্যই শক্তি হইতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়, বলা হয়। পার্থিব উদাহরণস্বরূপ, শিব পুরুষ, শক্তি প্রকৃতি। পুরুষের মধ্যে কামভাব জাগ্রত হলে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। প্রকৃতি বীজকে ধারণ করে এবং তাহার মধ্যে শিশুর গঠন হইতে থাকে এবং যথাসময়ে প্রকৃতি শিশুকে প্রসব করে। শিশুর গঠন ও প্রসব ইত্যাদি কার্য প্রকৃতিরই, পুরুষের নয়। পুরুষ এই সব ব্যাপারে নিষ্ক্রিয। শিবও তদ্রূপ কামনা ব্যতীত বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয়।

বিন্দুর স্পন্দনই কলা। কলা পাঁচ প্রকার; যথা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যাতীত কলা। কলার পরে তত্ত্ব, তত্ত্বের পরে ভুবন, ভুবনের পরে মায়িক জগৎ। বিন্দু স্পন্দিত হলে 'নাদ' ও 'জ্যোতি' উত্থিত হয়। নাদ শব্দরূপ, জ্যোতি অর্থরূপ। কলা হইতে তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তত্ত্ব হইল নাদের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর। অর্থাৎ নাদের সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতার দিকে ক্রম প্রসারণের প্রথম ধাপ। তত্ত্বের তিনটি ক্রমশঃ অবরোহ স্তর—প্রথম শুদ্ধবিদ্যা, দ্বিতীয় সদাশিব, তৃতীয় ঈশ্বর। তত্ত্বের প্রসারই 'ভুবন'। এই ভুবন চিন্ময় ভুবন—আলোর রাজ্য—মহামায়ার অধিকারভুক্ত। এই চিন্ময় ভুবন 'নাদ' ও 'জ্যোতির'ই শব্দ ও অর্থরূপে পরিণতি। মহামায়ার প্রতিভূরূপে ঈশ্বর ভুবনের কর্মসচিব অর্থাৎ নিয়ন্তা বা পরিচালক। রাজ্য পরিচালনার জন্য যেমন 'কেবিনেট' তৈরী হয়, তেমনি ভুবনের সঞ্চালক অধিকারীরূপে ভুবনের কেন্দ্রে থাকে ঈশ্বর এবং তার কার্যের সহায়করূপে থাকে আটজন সিদ্ধ-পুরুষ। সুতরাং ভুবনের নিয়ন্ত্রণে শক্তির প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই।

নাদ যেন গলিত সোনা। গলিত সোনাকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া যেমন বিভিন্ন আকার দেওয়া হয়। তেমনি নাদও ৩৬টি মাতৃকা-শক্তি অর্থাৎ ৩৬টি অক্ষর মালায় পরিণত হয়। অক্ষর সমষ্টির বিভিন্ন প্রকার বিন্যাসের (permutation, combination) দ্বারা শব্দ ও অর্থ তৈরী হয়। এইরূপ শব্দার্থ যুক্ত ভুবনই চিন্ময় সৃষ্টি। চিন্ময় ভুবনে শব্দার্থ সূক্ষ্মাকারে থাকে। সূক্ষ্ম শব্দার্থই মায়ার মলিন

স্পর্শে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া মায়িক স্থূল-জগত উৎপাদন করে। "মহাকাশ হইতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ ও বন্ধনের হেতু। ইহাই বিকল্প জাল। মাতৃকাচক্ররূপে এই বর্ণমালা অনন্ত বিকল্পময়ী বৃত্তি, আকার ধারণ করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে।" (পত্রাবলী, পৃ-২)। ইহা মায়ার অন্তর্ভুক্ত, অন্ধকার ও অজ্ঞানের রাজ্য। জগতের নিয়ন্তা মায়া বা অবিদ্যা। কলা, তত্ত্ব ও ভুবন নিয়ে যে মহামায়ার রাজ্য—তাহা আলোর রাজ্য—শুদ্ধ বিদ্যার রাজ্য। সেখানে মায়ার অন্ধকার নাই। তেমনি মায়ার রাজ্যে মহামায়ার কোন প্রভাব নাই। সেইজন্য মায়িক জগতে জীবের মধ্যে বিন্দু স্বরূপা মহামায়া কুণ্ডলিনীরূপে নিদ্রিতা থাকে। জীব যখন মায়ার জগতের অতীত হইবার সাধনায় সিদ্ধ হয়, তখন কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণের অর্থই হইল মহামায়ার অন্তর্ভুক্ত চিন্ময় ভুবনে সাধকের প্রবেশলাভ। সাধক চিন্ময় জগতে জাগিয়া উঠিলে অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইলে নাদ-ধ্বনি শুনিতে পায়। নাদ সবসময় ঊর্দ্ধগতি। নাদকে আশ্রয় করিয়া সাধক ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে থাকে। নাদের ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃকাচক্ররূপে যে বর্ণমালা বিকল্পময়ী বৃত্তি আকার ধারণ করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা বিগলিত হইতে থাকে। অবশেষে শুদ্ধ নাদ থাকে। শুদ্ধ নাদ বিন্দুতে প্রত্যাহৃত হইলে মন বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিন্দুর ক্ষোভ বা স্পন্দন থামিয়া যায়। অক্ষুব্ধ বিন্দুই চিৎশক্তি বা চিৎকলা। বিন্দুর অক্ষোভের সাথে সাথে মন চিৎশক্তিতে স্থিতিলাভ করতঃ চিৎকলাত্মক হইয়া যায় অর্থাৎ মন আর তখন মন থাকে না, কলাতে পরিণত হয়। ইহাই শৈবাগম মতে 'উন্মনা' অবস্থা।

পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে—

(১) **পরমশিব**—পরমশিব নিষ্ক্রিয়। তবে তাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যশক্তি অভিন্নরূপে যুক্ত। পরমেশ্বরের ইচ্ছাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যশক্তি। পরমেশ্বরের মধ্যে যখন সৃষ্টির উদয় হয়, তখন সেই ইচ্ছাকে প্রতিহত করিবার মত অন্য কোন শক্তি নাই।

(২) **পরাশক্তি**—পরাশক্তিও নিষ্ক্রিয়। পরমশিব বা পরমেশ্বরের মধ্যে যখন সৃষ্টির ইচ্ছার উদয় হয়, তখন পরাশক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ (receive) করে এবং তখনই পরাশক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে।

(৩) **বিন্দু**—বিন্দুও স্থির, অচঞ্চল এবং অচিৎ, কিন্তু শুদ্ধ অচিৎ। শুদ্ধ অচিৎ-ই বৈন্দব জগতের উপাদান। পরাশক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করিবার পর ক্রিয়াশীল হইলে বিন্দুর মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। পরাশক্তি যেন বায়ু। বায়ুর প্রবাহে সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি পরাশক্তি সক্রিয় হইলে

তাহার প্রভাবে বিন্দু-সমুদ্রের মধ্যে জ্যোতির তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। উত্থিত জ্যোতির তরঙ্গ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে এবং যে পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সেই পর্যন্ত বৈন্দব জগৎ। এই বৈন্দব জগৎ চিন্ময় জ্যোতির্ময় জগৎ। এই বৈন্দব জগৎ অসীম এবং নানা স্তরে বিভক্ত। এই বৈন্দব জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন মহামায়া বা শুদ্ধ বিদ্যা। ক্রমপ্রসারিত বৈন্দব জগতের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠান। স্তরের বিন্যাস অনুসারে শিব, সদাশিব, ঈশ্বর প্রভৃতি দেবতারা স্ব স্ব মহিমানুযায়ী সর্বোচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্ন স্তর পর্যন্ত অবস্থান করেন। সর্বনিম্ন স্তরের অধিষ্ঠাতা হইলেন ঈশ্বর।

(৪) মায়া—জ্যোতির্ময় বৈন্দব-জগৎ আলোর রাজ্য। বৈন্দব-জগতের প্রসার যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে আলোর ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়া বৈন্দব-জগতেরই প্রতিচ্ছায়া। ইহা অন্ধকারময়। এই অন্ধকারময় জগৎ-ই হইল পৃথিবী বা বিশ্ব-জগৎ। এই অন্ধকার জগতের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন মায়া। বৈন্দব-জগতের শেষ স্তরে অবস্থিত ঈশ্বরই মায়া জগতের নিয়ন্তা। তিনিই মায়ার গর্ভে বিশ্ব-জগতের বীজ নিক্ষেপ করেন এবং মায়া এই বিশ্ব-জগৎ প্রসব করেন। যেহেতু মায়ার জগৎ বৈন্দব-জগৎ বা মহামায়ার আলোর রাজ্যের ছায়ামাত্র, সেই হেতু মায়ার জগৎ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহা অলীক—সত্যবস্তু নহে। মহামায়ার আলোর রাজ্যে ভগবানের জীবাংশে যে অসংখ্য জীবাত্মা সম্ভূত হইয়া তটস্থ অবস্থায় বিরাজ করে, সেই অসংখ্য জীবাত্মাই বহির্মুখ বশতঃ মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মায়িক জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। মায়ার প্রভাবে বা ক্রিয়ায় জীব তাহার চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত হয় এবং তাহার জাগতিক বুদ্ধিতে পঞ্চভূতে গঠিত পার্থিব স্থূল দেহের উপর অহং অভিমান জাগ্রত হয়। এই ভ্রান্ত দেহাত্মাভিমানে জাগতিক সকল বস্তুই সত্য বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় এবং জাগতিক ব্যবহারে ও সকল বস্তুতে মমতাযুক্ত আকর্ষণ অনুভব করে। মায়ার যে আর একটি শক্তি আছে যাহা বিক্ষেপিকা শক্তি নামে পরিচিত, সেই বিক্ষেপিকা শক্তির প্রভাবে অবিদ্যামোহগ্রস্ত চিত্ত নানা বিষয়ে ধাবিত বা বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ততার ফলেই চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং নিয়ত এই চিত্তচাঞ্চল্যতা হেতু কাল আসিয়া মানব-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষ জরা-বার্দ্ধক্য-মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কালের শিকারী হয়। পার্থিব আকর্ষণ কাটাইয়া, বিষয়-বিমুখ হইয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহার করিলে এবং অন্তর্মুখ হইয়া একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে মানুষের জীবনের উপর কালের প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া লুপ্ত হয় এবং মানুষ মায়ার অন্ধকার রাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মহামায়ার আলোর বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ

করে এবং স্ব-স্বরূপে বা সত্য-স্বরূপে বা অবিনশ্বর- স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৈন্দব জগতে জাগ্রত মানুষের মধ্যে মহামায়া চিৎ-শক্তিরূপে জাগ্রতা থাকেন। আর মানুষ যখন আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মায়াভিভূত হইয়া পার্থিব স্থূল দেহ গ্রহণ করে, তখন সেই চিৎ-শক্তিই নিদ্রিতা হইয়া মূলাধারে অচিৎ-বৎ সুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। চিৎ-শক্তির এরূপ সুপ্তাবস্থারই নাম 'কুণ্ডলিনী'। অর্থাৎ চিৎ-শক্তি তখন কুণ্ডলাকৃত। কিন্তু যে মুহূর্তে জীব বৈন্দব জগতে জাগিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্তে কুণ্ডলিনী তাঁহার কুণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া সরল সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং সুষুম্না পথে সরল গতিতে ঊর্দ্ধে পরমেশ্বরের দিকে মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইবে।

ত্রিরত্ন—পরমশিবই পরমতত্ত্ব। পরমশিবের মধ্যে যখন সৃষ্টির সঙ্কল্প বা ইচ্ছার উদয় হয়, তখন সেই ইচ্ছাই শক্তিরূপে প্রকট হয়—ইহা চিৎ-শক্তি। পরমশিবের ইচ্ছাই চিদ্‌রূপা পরাশক্তি। এই চিদ্‌রূপা পরাশক্তি পরমশিবের সহিত অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় অভিন্নরূপে যুক্ত থাকে। শক্তি দুই প্রকার:—(১) 'সমবায়িকা' শক্তি এবং (২) 'পরিগ্রহ' শক্তি। পরমশিবের চিদ্‌রূপা শক্তিই 'সমবায়িকা' শক্তি; যেহেতু পরমশিব ও পরাশক্তি একই অদ্বয়বস্তুর অভিন্ন অঙ্গ। ইহাই আলিঙ্গিত 'যামল'-রূপ।

যেহেতু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরমশিবের সৃষ্টি-ইচ্ছা (সিসৃক্ষা) চিদ্‌রূপা পরাশক্তির মাধ্যমে বিন্দুতে সংক্রমিত হয়, সেইহেতু বিন্দু বা মহামায়াকে 'পরিগ্রহ' শক্তি বলা হয়। বিন্দু বিশুদ্ধ অচিৎ বা বিশুদ্ধ উপাদান। সৃষ্টির নিমিত্ত এই বিশুদ্ধ উপাদান গৃহীত হয় বলিয়া শাক্ত পরিভাষায় ইহাকে 'পরিগ্রহ' শক্তি বলা হয়।

পরমশিব অনন্ত জ্যোতিরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁহার সৃষ্টির 'ইচ্ছা'ই পরাশক্তির রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরাশক্তির মধ্যে সৃষ্টির ক্রিয়া চলিতে থাকে, সেইজন্য তিনি সক্রিয়। পরাশক্তি হইতে পরমশিবের ইচ্ছা বিন্দুতে সংক্রামিত (transmitted) হয় এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। অতএব পরমশিবের সহিত বিন্দুর পরোক্ষ যোগ; বিন্দুর সহিত অপরোক্ষ যোগ হইল পরাশক্তির।

পরাশক্তি হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা, বিন্দুতে সংক্রামিত (transmitted) হইলে বিন্দুতে তরঙ্গ-বিক্ষোভ উত্থিত হয। যতক্ষণ না পরাশক্তি হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বিন্দুতে নিপতিত হয়, ততক্ষণ বিন্দু প্রশান্ত থাকে; ইচ্ছার সংস্পর্শে আসিলেই উহার প্রশান্ত বক্ষে বায়ুর সঞ্চালনে সমুদ্রে তরঙ্গ-বিক্ষোভের ন্যায় অনন্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এইরূপে বিক্ষুব্ধ বিন্দু প্রসাবিত হইয়া মহামায়ার অসীম রাজ্য বা জ্যোতির্লোক গড়িয়া ওঠে, ইহাকে বৈন্দব-জগৎ বলা হয়। মহামায়ার বৈন্দব জগতের বহির্ভাগে অশুদ্ধ মলিন মায়িক জগতের সৃষ্টি হয়।

পরমশিব, পরাশক্তি ও বিন্দু—এই তিন লইয়া ভগবৎ-তত্ত্ব। শাক্তে পরিভাষায় উক্ত তিনকে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়। খ্রীষ্টধর্মের 'God the father', 'God the son' and 'the Holy Ghost' কিম্বা বৌদ্ধধর্মের 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ'কে শাক্তধর্মের 'ত্রিরত্নে'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মহামায়া বা বিন্দুর বিশুদ্ধ (অচিৎ) সত্ত্বায় গঠিত হইয়া 'সদাশিব', 'ঈশ্বর' ও 'শুদ্ধ বিদ্যা'র আবির্ভাব হয়। অতএব ঈশ্বরের স্বরূপ হইল 'বৈন্দব' শরীর। ইনি অধিকারী পুরুষ এবং অশুদ্ধ মায়ার অধিষ্ঠাতা। মায়িক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের অধিকারী পুরুষ তিনি।

ঈশ্বরের ঈক্ষণ হইতে মায়া ক্ষুব্ধ হয় এবং মায়া-গর্ভে অশুদ্ধ জগৎ-সৃষ্টির বীজ নিহিত হয়, এবং মায়া হইতে প্রকৃতিতে তাহা সংক্রামিত হয়। তখন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া উহার মধ্যে অসাম্য আসে এবং পঞ্চভূত গঠিত হয়। এইরূপে সাংখ্যের নির্ণীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পার্থিব লৌকিক জগতের সৃষ্টি হয়।

ভেদবাদী তান্ত্রিক আচার্যগণও শিব, শক্তি ও বিন্দু—এই তিন রত্ন মানেন। কামিক, রৌরব, স্বায়ম্ভুব, মৃগেন্দ্র আদি আগমসমূহে এবং অঘোরশিব, সদ্যোজাত, রামকণ্ঠ, নারায়ণকণ্ঠ আদি আচার্যদের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। শিব, শক্তি ও বিন্দু—ইহারাই সমস্ত তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা এবং উপাদানরূপে প্রকাশমান। শুদ্ধ তত্ত্বময় শুদ্ধ জগতের উপাদান হইল বিন্দু, শিব হইলেন কর্তা এবং শক্তি করণ। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যাতীত কলাসমূহের আধার হয় বিন্দু। বিন্দুর অপর নাম মহামায়া। ইহাই ক্ষুব্ধ হইয়া বিচিত্র সুখময় ভুবন ও ভোগ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া শুদ্ধ বৈন্দব জগৎ উৎপন্ন করে। ভোগার্থী সাধক ভৌতিক দীক্ষার প্রভাবে এই আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। কিন্তু যে সাধক প্রথম হইতেই মহামায়ার রাজ্যের সুখভোগের ইচ্ছা করেন না, তিনি নৈষ্টিক দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শক্তির সহিত নিত্য মিলিত শিব-স্বরূপ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপলব্ধি করেন।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া যেরূপ একদিকে শুদ্ধ দেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ ও ভুবন রূপে পরিণত হয়—যাহাকে 'শুদ্ধ অধ্বা' বলে, সেইরূপ অন্যদিকে শব্দেরও উৎপত্তি করে। শব্দ সূক্ষ্মনাদ, অক্ষরবিন্দু ও বর্ণভেদে তিন প্রকার। সূক্ষ্মনাদ হইল অভিধেয় বুদ্ধির কারণ—ইহা বিন্দুর প্রথম প্রসার এবং চিন্তাশূন্য। অক্ষরবিন্দু সূক্ষ্মনাদের কার্য এবং 'পরামর্শ' জ্ঞানস্বরূপ। ইহা 'ময়ূরাণ্ডরসে'র ন্যায় অনির্বচনীয়। যেরূপ ময়ূরের অণ্ডের রসে উহার পেখমের বিচিত্র রঙ অভিন্নভাবে অব্যক্তরূপে থাকে, ঐরূপ অক্ষরবিন্দুতে স্থূল বাণীর সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য অব্যক্তরূপে অভিন্ন

হইয়া থাকে। ইহাকেই 'ময়ূরাণ্ডরস-ন্যায়' বলে। আকাশ ও বায়ু হইতে শ্রবণগ্রাহ্য বর্ণাত্মক স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়। কালোত্তর তন্ত্রে লিখিত আছে—

স্থূলং শব্দ ইতি প্রোক্তং সূক্ষ্মং চিন্তাময়ং ভবেৎ।
চিন্তয়া রহিতং যত্তু তৎপরং পরিকীর্তিতম্।।

অর্থাৎ স্থূলবিন্দুকে শব্দ বলা হয়, সূক্ষ্মবিন্দুকে বলা হয় 'চিন্তাময়' এবং যাহা চিন্তারহিত উহা 'পরবিন্দু' নামে কথিত।

বিন্দু জড় হইলেও শুদ্ধ। পাঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণব আগমে 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিতে যাহা কিছু বোঝায়, তাহাই বিন্দু। পরমেশ্বরের সহিত বিন্দু অথবা মহামায়ার সম্বন্ধ বিষয়ে দুই প্রকার মত প্রচলিত—

(ক) একমতে শিবের দুই শক্তি—সমবায়িনী ও পরিগ্রহরূপা। সমবায়িনী শক্তি চিদ্রূপা, অপরিণামিনী, নির্বিকারা ও স্বাভাবিকী। ইহা শক্তি-তত্ত্ব। শিবে এই শক্তি নিত্য সমবেত থাকে। শিব-শক্তি উভয়ের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। পরিগ্রহ শক্তি অচেতন ও পরিণামশীলা। ইহার নাম বিন্দু। বিন্দুর শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুই রূপ। সাধারণতঃ শুদ্ধ রূপকে বিন্দু বা মহামায়া বলা হইয়া থাকে। অশুদ্ধ রূপের নাম মায়া। উভয়েই নিত্য। অশুদ্ধ অধ্বার উপাদানকারণ মায়া আর শুদ্ধ অধ্বার উপাদান মহামায়া। উভয়ের প্রভেদ ইহাই। সাংখ্য-সম্মত তত্ত্ব এবং কলাদি-কঞ্চুক অশুদ্ধ অধ্বারই অন্তর্গত। এ সমস্তই মায়ার কার্য। অবশ্য পুরুষ বা আত্মা নিত্য এবং মায়া হইতে পৃথক, পরন্তু উহাতে মায়ার আবরণ থাকে বলিয়া আত্মবিস্মৃত। মায়ার বহির্ভূত উপরের তত্ত্ব শুদ্ধ অধ্বার অন্তর্গত।

(খ) অপর মত হইল যে একমাত্র বিন্দুই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অধ্বার উপাদান। এই মতে মায়া নিত্য নয়, কিন্তু কার্যরূপা। মহামায়া বা বিন্দুর তিন অবস্থা—পরা, সূক্ষ্মা ও স্থূলা। পরা অবস্থাকে মহামায়া, পরামায়া, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইহা পরম কারণ ও নিত্য। সূক্ষ্ম ও স্থূল—এই দুই অবস্থা কার্য হওয়ার জন্য অনিত্য। মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইবার পর উহা হইতে শুদ্ধ ধামসমূহ এবং তথায় অবস্থানকারী মন্ত্রসমূহের (বিদ্যাসমূহ) ও মন্ত্রেশ্বর সমূহের (বিদ্যেশ্বর সমূহ) শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি রচিত হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ অধ্বার অধিবাসী সকলের সংস্থান ও দেহাদি সমস্তই সাক্ষাৎ মহামায়ার কার্য। এই সমস্তই শুদ্ধ, মায়াতীত ও উজ্জ্বলবর্ণ। মহামায়ার সূক্ষ্ম বা অপর অবস্থার নাম মায়া। কলাদি তত্ত্ব-সমূহের অবিভক্ত স্বরূপই মায়া। কলাদির সম্বন্ধ হেতু দ্রষ্টা আত্মা ভোক্তা পুরুষরূপে পরিণত হয়। মায়া হইতে তত্ত্ব এবং ভুবনাত্মক কলাদি তথা প্রকৃত্যাদি সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা ক্রমে উৎপন্ন

হয়। সারা অশুদ্ধ অধ্বার মূল কারণ এই মায়া। আগমে ইহাকে যেমন 'জননী' বলা হইয়াছে, তেমনি 'মোহিনী'-ও বলা হইয়াছে। মহামায়ার স্থূল বা তৃতীয় অবস্থার নাম প্রকৃতি। ইনি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ক্রমে ভোক্তা পুরুষের বুদ্ধি প্রভৃতি ভোগসাধনোপায় এবং সমস্ত ভোগ্য বিষয়কে উৎপন্ন করে। কলাদির সম্বন্ধ হেতু পুরুষ বা আত্মা ভোক্তা বনিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাহার ভোগ্য তথা ভোগ সাধন সমূহের সৃষ্টির জন্য মহামায়া নিজে প্রকৃতিরূপ স্থূল অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

বিন্দু শিবে সমবেত থাকে না—ইহা প্রচলিত মত। এই মতে বিন্দু পরিণামী বলিয়া জড়। এইজন্য চিদাত্মক পরমেশ্বরের সহিত ইহার সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। শিবের সহিত বিন্দুর সমবায় স্বীকার করিলে শিবের অচেতন তত্ত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। শ্রী কণ্ঠাচার্য্য বলিয়াছেন—

স হি তাদাত্ম্যসম্বন্ধো জড়েন জড়িমাবহঃ।
শিবস্যানুপমাখণ্ডচিদ্‌ঘনৈকস্বরূপিণঃ ॥

অর্থাৎ জড়ের সহিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ অনুপম ও অখণ্ড চিদ্‌ঘন-স্বরূপ শিবের জড়ত্বের কারণ হইবে।

কিন্তু তান্ত্রিক ভেদবাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দুসমবায়বাদীও ছিলেন। তাঁহাদের মতানুসারে শিবের সমবায়িনী শক্তি দুই প্রকার—এক দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানশক্তি, অপর ক্রিয়াশক্তি বা কুণ্ডলিনী। ক্রিয়াশক্তির অপর নাম বিন্দু। মায়া অবশ্যই বিন্দু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মায়া শিবে কখন সমবেত হয় না। শিবের মধ্যে সমবেত জ্ঞানশক্তির দ্বারা তাঁহার জগদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা তাঁহার জগদ্‌-রচনা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানশক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আভাসন হয়। আর ক্রিয়াশক্তিদ্বারা আভাসিত পদার্থসমূহ বস্তুতে পরিণত হয়। এই জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপা দুই শক্তি শিবে বা পরমেশ্বরে অবিনাভূতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

যেরূপ বিন্দুর ক্ষোভ হইতে শুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়, ঐরূপ মায়ার ক্ষোভ হইতে অশুদ্ধ জগতের আবির্ভাব হয়। শিবের মধ্যে সমবেত শক্তি দ্বারা বিন্দু স্পর্শিত হইলে বিন্দুর মধ্যে ক্ষোভ হইয়া বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। অতএব, একমাত্র সাক্ষাৎ শিবের বা পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই শুদ্ধ জগতের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু, মায়ার ক্ষোভ এই প্রকার সাক্ষাৎরূপে পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা হয় না।

তন্ত্রমতে সৃষ্টি, পালন, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—এই পাঁচ প্রকার কার্যের মুখ্যকর্তা একমাত্র পরমেশ্বর। এইজন্য সর্বত্র তাঁহাকে 'পঞ্চকৃত্যকারী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত কৃত্যের সম্পাদন করিবার জন্য শুদ্ধ অধ্বার

আবশ্যক। সেইজন্য, বিন্দুর ক্ষোভের প্রয়োজন। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় হইলেও এবং তাঁহার শক্তিও এইরূপ হইলেও, উপাধিভেদ হেতু তাঁহাতে আরোপিত ভেদও অবশ্য আছে। যে সময় তাঁহার শক্তি অব্যক্ত থাকে, সেই সময় তিনি নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ ও সংবিদ্‌রূপে অবস্থান করেন। ঐ সময় বিন্দুও স্থির ও অক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে; কারণ শক্তির সক্রিয় অবস্থা বিনা বিন্দু ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। ইহা পরমেশ্বরের লয়াবস্থা। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি কথা বলিয়া লওয়া উচিত। প্রচলিত মতে শক্তি এক হওয়ার দরুণ উহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়ায় কোন ভেদ থাকিতে পারে না। যে ভেদ প্রতীত হয়, উহা ঔপাধিক। অতএব জ্ঞানও সর্বদা ক্রিয়ারূপ। এইজন্য ক্রিয়া বলিতে প্রায়ই শক্তিকে বুঝায়। যে সময় এই শক্তি সারা সৃষ্টি ব্যাপার সমাপ্ত করিয়া স্বরূপমাত্রে স্থিত হয়, সেই সময় শিবকে শক্তিমান্ বলা হয়। ক্রিয়ারূপা শক্তি ঐ সময় মুকুলিতবৎ হইয়া শিবে অবস্থান করে। ইহাই শিবের পূর্বোক্ত লয়াবস্থা। যখন এই শক্তি উন্মেষিত হইয়া উদ্যোগপূর্বক বিন্দুকে কার্যোৎপাদনের অভিমুখ করে এবং কার্যোৎপাদনের দ্বারা শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সমৃদ্ধি করে, তখন শিব ভোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিবের ভোগাবস্থায় যেহেতু শক্তি সক্রিয় থাকে, সেইহেতু উহার সহিত শিবকেও সক্রিয় বলা হইয়া থাকে।

স তয়া রমতে নিত্যং সমুদ্যুক্তঃ সদাশিবঃ।
পঞ্চমন্ত্রতনুঃ শ্রীমান্ দেবঃ সকলনিষ্কলঃ।।

অর্থাৎ পঞ্চমন্ত্রতনু সকল-নিষ্কল ভগবান্ সদাশিব উদ্যুক্ত হইয়া সর্বদা ঐ শক্তির সহিত ক্রীড়া করে।

লয়াবস্থায় শিবকে 'নিষ্কল' এবং ভোগাবস্থায় 'সকল-নিষ্কল' বলা হয়। কিন্তু, এতদুভয়ের অতিরিক্ত তাঁহার অধিকারাবস্থা নামে আরও এক অবস্থা আছে। শক্তি বা কলার অবিকাশ দশা, বিকাশোন্মুখ দশা এবং পূর্ণবিকাশ দশা অনুসারে শিবের এই অবস্থাভেদ কল্পনা করা হয়।

বিন্দুর বিস্তার—শিব ও শক্তির এই অবস্থাভেদের মূলে রহিয়াছে বিন্দুর অবস্থাভেদ। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি তথা শান্ত্যতীত—এই সমস্ত কলা বিন্দুরই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা। উহাদের মধ্যে শান্ত্যতীত কলাবিন্দুর স্বরূপ মানা যাইতে পারে। উহা অক্ষুব্ধ বিন্দু বা লয়াবস্থা। শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ যত ভোগাধিষ্ঠান আছে, তাহারা সব শান্তি আদি চার কলারই পরিণামস্বরূপ। বস্তুতঃ ভোগাধিষ্ঠান্ বলিতে শান্তি আদি চার কলার ভুবনকেই বোঝায়। শান্ত্যতীত-রূপ বা পরবিন্দু সমস্ত কলার কারণাবস্থা বা লয়াবস্থা। অতএব, শান্ত্যতীত ভুবন ঠিক ভোগস্থান নয়। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভেই উৎপন্ন হওয়ার জন্য কোন কোন আচার্য ইহাকেও ভোগ-স্থানের মধ্যে গণনা করেন। ইহা ভোগের বীজাবস্থা।

কলাত্মক শক্তিই শিবের দেহ-রূপে গণ্য হয়। অতএব, লয়াবস্থায় বিন্দুর বিক্ষোভ না থাকার ফলে কলার উদ্ভব না হওয়ার জন্য নিষ্কল শিবকে অশরীর বলে। ভোগাবস্থায় শিব সকল-নিষ্কল থাকেন—তখন তাঁহার দেহ পঞ্চমন্ত্রাত্মক হয়। তন্ত্রমতে শক্তিই মন্ত্র, অতএব উহা পঞ্চশক্তিময় হয়—

মননাৎসর্বভাবানাং ত্রাণাৎসংসারসাগরাৎ।
মন্ত্ররূপা হি তচ্ছক্তির্মননত্রাণরূপিনী॥

অর্থাৎ সমস্ত ভাবের মনন এবং সম্পূর্ণ সংসার হইতে ত্রাণের কারণ ঐ মনন-ত্রাণরূপিনী শক্তি মন্ত্ররূপা হন।

এই মন্ত্ররূপা শক্তি মূলে একটিই। কিন্তু উপাধিবশতঃ নানা হয়। অধিষ্ঠান হেতু কার্যভেদের ফলে একই শক্তি পাঁচরূপে প্রতীত হয। তদনুসারে বিন্দু-ভুবনের বা শান্ত্যতীত কলা-ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে ঈশান মন্ত্র এবং শান্তি আদি চার ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিগুলিকে ক্রমশঃ তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব এবং অঘোর মন্ত্র বলা হয়। এই সমস্ত ভুবনগুলি ভোগস্থান। ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা শক্তি দেহের কার্য করে। এইজন্য উহাকে 'শিবতনু' বলে। বস্তুতঃ ইহা পারমার্থিক দেহ নয়। এই পঞ্চমূর্তি পরমেশ্বরের পঞ্চকৃত্যের উপযোগী। বিন্দুর সমস্ত কলা কারণাবস্থায় লীন থাকা কালে বিন্দুর কোন বিভাগ থাকে না। ইহা শিবের লয়াবস্থার কথা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শিবকে অশরীর বলা হয়। ঐ সময় শক্তি শিবে লীন থাকে এবং বিন্দু অক্ষুব্ধ অর্থাৎ অসৎকল্প হইয়া অবস্থান করে। একমাত্র শিবই ঐ সময় আপন মহিমায় বিরাজমান থাকেন। যে সময় বিন্দুর কলাসমূহ কার্যাবস্থায় থাকে, সেই সময় উহাদের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে শিবের অপরামূর্ত্তি বলে। ভোগস্থান-রূপে যে সমস্ত কলা ও ভুবন সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে—উহাদের মধ্যে নিবৃত্তি-ভুবন সকলের অপেক্ষা নিম্ন কোটির। এই নিবৃত্তি-ভুবনের অধোবর্ত্তী ভুবনের নাম সদাশিব-ভুবন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি শিবের অপরামূর্তি অথবা 'সদাশিবতনু'। 'সদাশিবতনু' নাম ঔপচারিক—সদাশিব-ভুবনের অধিষ্ঠানের জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

সদাশিব—অধিকার-অবস্থাপন্ন শিব 'সকল' হন। তিনি বিন্দু হইতে অবতীর্ণ ও সদাশিব-সমূহের দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত সদাশিব বস্তুতঃ পশু-আত্মা, শিবাত্মা নয়। ইঁহাদের মধ্যে কিছু 'আণব-মল' যুক্ত হইয়া যায়। এইজন্য সেইসময় ইঁহাদের জ্ঞান-ক্রিয়ারূপা শক্তির কিছু সঙ্কোচ হয়। ইঁহারা পূর্ণস্বরূপ শিবের সমান অনাবৃত শক্তি-সম্পন্ন হন না। যাঁহারা সাধনার দ্বারা এই সদাশিব অবস্থায় উন্নীত হন, যদিও তাঁহারা মুক্ত-পুরুষ, তথাপি সর্বতোভাবে মলহীন না হওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত তাঁহারা পরামুক্তি বা শিবসাম্য প্রাপ্ত হন না।

সদাশিব-ভুবনের অধিষ্ঠাতা হওয়ার জন্য পরমেশ্বরকেও সদাশিব বলা হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংশিব, এবং তিনিই পূর্বোক্ত সদাশিবগণকে আপন আপন ভুবনের ভোগে নিয়োজিত করেন। এইরূপ বিদ্যেশ্বর এবং মন্ত্রেশ্বরগণকে আপন আপন সামর্থ অনুসারে অশুদ্ধ অধ্বাব অধিকারে নিযুক্ত করেন। এই দুই প্রকার নিয়োজন ব্যাপারই অধিকারাবস্থায় 'সকল'-শিবের কার্য। এই 'সকল'-শিবই সমস্ত জগতেব প্রভুরূপে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ সমস্ত অধ্বার মূর্দ্ধদেশে বিরাজমান। মায়ার ঊর্দ্ধে শুদ্ধ অধ্বায় অনেক ভুবন আছে। প্রত্যেক ভুবনে তদনুরূপ দেহ এবং করণ আদি তথা ভোগ্যাদিও আছে। এ-সকলই বিশুদ্ধ বৈন্দব উপাদানে রচিত হয়। ইহাদের মধ্যেও ভুবনের ঊর্দ্ধ এবং অধোভাব অনুসারে ক্রমিক উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণীত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শুদ্ধ বিদ্যাতে যে বামা এবং জ্যেষ্ঠাদি ভুবন আছে, তাহাদের মধ্যে বামার ভুবন অপেক্ষা জ্যেষ্ঠার ভুবন উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকার জ্যেষ্ঠার ভুবন অপেক্ষা রৌদ্রীর ভুবন উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। এই বিদ্যা-তত্ত্বে সাত কোটি মন্ত্র তথা উহাদের অধিশ্বরী সাত বিদ্যারাজ্ঞী অবস্থিত। ঈশ্বর-তত্ত্বে আট বিদ্যেশ্বর নিজ নিজ ভুবনে বিরাজিত। ইঁহাদের মধ্যে শিখণ্ডী সকলের নীচে আর অখণ্ড সকলের উপরে। ইঁহাদের মধ্যেও পূর্ববৎ ক্রমোৎকর্ষতা আছে। সদাশিব-তত্ত্বেও ঠিক এইরূপ বিভাগ আছে।

পশু-আত্মা—এখানে প্রসঙ্গতঃ পশু-আত্মা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। এই সব আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, বিভু, চৈতন্য প্রভৃতি শিবধর্মময় হইলেও সংসারাবস্থায় এই সমস্ত ধর্মের বিকাশ অনুভব করিতে পারে না। সর্বজ্ঞান-ক্রিয়ারূপা চৈতন্য-শক্তি যেমন শিবের আছে, তেমনি জীব বা পশু-আত্মা মাত্রেরই তাহা আছে। কিন্তু, প্রভেদ হইল এই যে শিবের স্বরূপে এই সর্বজ্ঞত্ব সর্বকর্তৃত্বরূপা শক্তি সর্বদা অনাবৃত থাকে। পশুর মধ্যেও ইহা সর্বদাই আছে, তথাপি অনাদিকাল হইতে আণবমল, মায়ামল ও কর্মমলরূপ পাশসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আণব, কর্ম ও মায়া—এই তিন মল বা পাশের মধ্যে কোন আত্মা এক, কোন আত্মা দুই এবং কোন আত্মা তিন পাশের দ্বারা আবদ্ধ। যে সমস্ত আত্মা তিনটি পাশে বদ্ধ, তাহাদিগকে 'সকল' বলা হয়। যাঁহার মায়িক কলাদি প্রলয় অবস্থায় উপসংহৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আণবমল ও কর্মমল ক্ষীণ হয় নাই, তাঁহার শাস্ত্রীয় নাম 'প্রলয়াকল'। বিজ্ঞানাদি উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষয় হইয়া যাইবার পর যখন কেবল 'আণবমল' নামক একটি মাত্র পাশ থাকিয়া যায়, তখন এই অবস্থায় আত্মাকে 'বিজ্ঞানাকল' বলে। এই সমস্ত বিজ্ঞানাকল বা বিজ্ঞানকৈবলী আত্মাও মলের পরিপাকগত

তারতম্য অনুসারে তিন প্রকারের হয়। ইঁহারা সকলেই মায়াতীত, সকলেরই কর্ম-বাসনাসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিকার-মল থাকিয়া যাওয়ায় তাঁহারা শিবসাম্যরূপ পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত হন না।

উত্তীর্ণমায়াম্বুধয়ো ভগ্নকর্মমহার্গলাঃ।
অপ্রাপ্তশিবধামানঃ ত্রিধা বিজ্ঞানকেবলাঃ॥

অর্থাৎ, যাঁহারা মায়ারূপ সমুদ্র পার হইয়াছেন, কর্মময় বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু শিবের পরমধাম প্রাপ্ত হন নাই, সেইসমস্ত বিজ্ঞানাকলগণ তিন প্রকারের। এই তিন প্রকারের বিজ্ঞানাকল আত্মাসকলের নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে—

(ক) বিদ্যাতত্ত্বনিবাসী মন্ত্র ও বিদ্যা—মন্ত্র ও বিদ্যা সংখ্যায় সাত কোটি। ইহারা সকলেই বিদ্যেশ্বরবর্গের আজ্ঞার অধীন। ইহাদের বাসস্থান বা ভুবন বিদ্যা-তত্ত্বের মধ্যে। বিদ্যেশ্বরগণ পাশবদ্ধ 'সকল' জীবগণের উদ্ধারের সময় এই সমস্ত মন্ত্র ও বিদ্যাসংজ্ঞক বিজ্ঞানাকল আত্মা বা দেবতাদিগকে নিজ নিজ অনুগ্রহ-কার্যের করণ-রূপে ব্যবহার করেন। পঞ্চকৃত্যকারী হওয়ার দরুণ বিদ্যেশ্বরগণের মধ্যেও অনুগ্রাহকত্ব অর্থাৎ অনুগ্রহ করার শক্তি আছে। জ্ঞান, যোগ এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি উপায়-সমূহের দ্বারা অথবা ভোগের দ্বারা কর্মরাশির ক্ষয় হইবার পর মায়িক সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভোগায়তন শরীরের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া যায়। ঐ সময় আত্মা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া মায়ার ঊর্দ্ধে শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া 'অণু'রূপে অবস্থান করে। কৈবল্যপ্রাপ্ত অণু-আত্মার কর্ম ও মায়া-পাশ শিথিল হইয়া যাইবার পরও আণবমলরূপ পাশ থাকিয়া যায়। এই আণবমলের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত আত্মার পশুত্ব নষ্ট হয় না এবং পশুত্ব নষ্ট না হইলে আত্মার শিবত্বলাভের সম্ভাবনা হয় না। আণবমল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত পশুত্বের নিবৃত্তি অসম্ভব। অতএব এই আত্মা মায়াতীত এবং কেবলীভাব প্রাপ্ত হইলেও অপরামুক্তি পর্যন্ত যাইতে পারে না—পরামুক্তি তো অনেক দূরের কথা। প্রলয়কালে যে সমস্ত অণু-আত্মার আণবমল ন্যূনাধিক রূপে পরিপক্ক হইয়া যায়, নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহাদের উপর ভগবান স্বয়ং কৃপা করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের আপন আপন আণবমল পাকের অনুরূপ তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানক্রিয়াশক্তি উন্মীলিত করিয়া দেন এবং মন্ত্র ও মন্ত্রেশ্বর প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুদ্ধ অধ্বায় ভোগ তথা অধিকার কার্যে নিয়োজিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার আত্মা পূর্ণরূপে মলপাকের দরুণ অত্যন্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিবতত্ত্বে সংযোজিত হন। কিন্তু অবশিষ্ট যে সমস্ত আত্মার মলপাক হয় না, তাঁহাদের আবরণ অত্যন্ত ঘনীভূত থাকে। তাঁহারা বিজ্ঞান কৈবল্য অবস্থাতেই বিদ্যমান্ থাকেন। আত্মার স্বাভাবিকী চৈতন্যরূপা সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তি এই অবস্থায় সুপ্ত থাকে। এইজন্য 'কৈবল্য' লাভ হইলেও

তাঁহাদের পশুত্ব নিবৃত্ত হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। এই সমস্ত কেবলী আত্মা কর্মশূন্য হওয়ার জন্য মায়ার কার্য বা মায়িক জগতকে অতিক্রম করে, কিন্তু মহামায়া বা বিন্দুর কার্যরূপ বিশুদ্ধ অধ্বা বা জগতে তখনও পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পায় না; তাঁহারা উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। সেইজন্য তন্ত্র 'কৈবল্যকে' মুক্তি বলিয়া গণ্যই করে না।

(খ) **ঈশ্বরতত্ত্ববাসী বিদ্যেশ্বর বা মন্ত্রেশ্বর**—বিদ্যেশ্বর বা মন্ত্রেশ্বর সংখ্যায় আট। তাঁহাদের মধ্যে 'অনন্ত' প্রধান। ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে তাঁহাদের আটটি ভুবন অবস্থিত। তাঁহাদের ভিতরেও উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যেশ্বরদের মধ্যে 'অনন্ত' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর পদবাচ্য। তাঁহার মল সর্বতঃভাবে শান্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল অধিকার বাসনার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিদ্যেশ্বর সকলেই শিব কর্তৃক অনুগৃহীত হন। এই সমস্ত বিদ্যেশ্বরগণের বিষয়ে রৌরবাগমে লিখিত আছে—

সৃষ্টিসংরক্ষণাদান ভাবানুগ্রহকারিণঃ। [১]

'শিবার্ককরসম্পর্কবিকাসাত্মীয়শক্তয়ঃ' এই বাক্য অনুসারে তাঁহাদের আত্মশক্তি শিবের অনুগ্রহাত্মক সংসর্গ হইতে বিকশিত হইয়া গিয়াছে।

(গ) সদাশিবতত্ত্বের অন্তর্গত ভুবনবাসী পশু-আত্মা যাঁরা তাঁরা সদাশিব অথবা অধিকারাবস্থ শিবের ন্যায় পঞ্চকৃত্যকারী হন—সদাশিব-তত্ত্বে আশ্রিত হইবাব কারণে ইঁহারা সকলেই সদাশিব নামে পরিচিত। ইঁহারা পরমেশ্বরের কৃপায় শুদ্ধ অধ্বার উপরে স্থিত হন।

শুদ্ধ অধ্বাতে বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব—এই তিন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তৃবর্গের সহিত আঠারোটি মুখ্য ভুবন অবস্থিত। প্রত্যেক ভুবনে ঐ ভুবনের অধীশ্বর থাকেন। এই সমস্ত ভুবনের পশু-আত্মাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই সেই ভুবনের অধিষ্ঠাতাকে আরাধনার দ্বারা এবং কেহ দীক্ষার প্রভাবে ঐ সমস্ত ভুবনে স্থান লাভ করে। সূক্ষ্ম স্বায়ম্ভুব আগমে বলিয়াছে—

যো যত্রাভিলষেদ্ভোগান্ স তত্রৈব নিয়োজিতঃ।
সিদ্ধিভাঙ্ মন্ত্র সামর্থ্যাৎ॥ [২]

এ বিষয়ে স্বচ্ছন্দ তন্ত্রেও বহু আলোচনা করা হইয়াছে।

এখন 'প্রলয়াকল' ও 'সকল' নামক পশু-আত্মাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রলযের সময় ঈশ্বর মায়িক কার্যের উপসংহার করিয়া অবস্থান করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করায়

---

[১] অর্থাৎ, ইঁহারা সৃষ্টি সংরক্ষণ, সংহাব, নিগ্রহ (তিবোধান) ও অনুগ্রহ করিবার অধিকারী।

[২] অর্থাৎ, যে যেরূপ ভুবনের ভোগের ইচ্ছা করে সে গুরু কর্তৃক সেই ভুবনে নিয়োজিত হইয়া মন্ত্রেব শক্তিতে সিদ্ধি লাভ কবে।

ক্লান্ত আত্মাসমূহের বিশ্রাম দেওয়া, উহাদের কর্মের পরিপাক করা এবং অসংখ্য কার্যপরম্পরার উৎপত্তির দ্বারা যাহার শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা প্রলয়ের উদ্দেশ্য। যে সমস্ত আত্মা বিষয়-ভোগ করিতে সমর্থ থাকে, তাহারা প্রলয়কালে বিলীন হইয়া যায়, এইজন্য ঐ সময় সেইসব আত্মা কর্মমল ও আণবমল—এই দুই পাশে বদ্ধ হইয়া নবীন সৃষ্টির আরম্ভকাল পর্যন্ত মায়ার ভিতরে থাকে। ইহাদিগকে 'প্রলয়াকল বা প্রলয়কেবল জীব' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদিও প্রলয়াবস্থায় ইহাদের কর্মক্ষয় হইতে পারে না, তথাপি ইহারা প্রলয়ের প্রভাবে কলাদি শূন্য হইয়া এক প্রকার কৈবল্যাবস্থায় থাকে।

যে সমস্ত জীবের মল (আণব), কর্ম এবং মায়া পরিপক্ক হইতে পায় না, তাহারা নবীন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রলয়কালে মুগ্ধের ন্যায় বিশ্রাম করিতে থাকে। পরে যখন তাহারা ভোগ-যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন পরমেশ্বর 'অনন্ত' নামক বিদ্যেশ্বরের মধ্যে নিজ শক্তি সন্নিবেশ করিয়া তাহার দ্বারা মায়া-তত্ত্বকে ক্ষোভিত করায় এবং অশুদ্ধ জগৎ রচনা করায়। এই নূতন সৃষ্টিতে অপক্কপাশ জীবসকল সমস্ত ভোগসাধনাকে প্রাপ্ত হইয়া 'সকল' পশুরূপে আবির্ভূত হয়। তাহাদের মধ্যে তিন প্রকারের পাশ থাকে।

এই সমস্ত পশু-জীবেরা ছাড়া আর এক প্রকার 'সকল' জীবও আছে। ইহাদের মল ও কর্ম পরিপক্ক হইয়া যাইবার পর ইহারা সৃষ্টির আরম্ভে সাক্ষাৎ পবমেশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া সেই শক্তির দ্বারা পুষ্ট হইয়া মায়ার গর্ভে স্থিত জগতের অধিকার পাইবার জন্য 'অপর মন্ত্রেশ্বরের' পদে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনন্তের কৃপায় 'আতিবাহিক' দেহ গ্রহণ করিয়া 'সকল' নামে পরিচিত হয়। আতিবাহিক দেহও যে মায়িক দেহ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে মায়ার ঊর্দ্ধে শুদ্ধ জগতের যে সমস্ত আধিকারিদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের দেহ বৈন্দব (বিন্দু-জনিত) অর্থাৎ, মহামায়ার উপাদানে গঠিত। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত 'সকল' অপর মন্ত্রেশ্বররূপ আধিকারিকগণও বৈন্দব দেহ লাভ করে। কিন্তু তাহাদের বৈন্দব দেহ এত সূক্ষ্ম যে তাহা দ্বারা মায়িক জগতের অধিকার বা শাসন-কার্য হইতে পারে না। এইজন্য এই বৈন্দব দেহের অধিকরণ-রূপে মায়িক দেহের আবশ্যক হয়। এই মায়িক দেহ এবং পূর্বোক্ত বৈন্দব দেহ অভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। বৈন্দব দেহ যেহেতু শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ, সেইহেতু বোধময়; আর মায়িক দেহ আতিবাহিক হইয়াও বস্তুতঃ মোহময়। তথাপি ইহা বৈন্দব দেহের সম্বন্ধের ফলে আপন স্বাভাবিক মোহময়তা পরিত্যাগ করিয়া বোধময় রূপে ভাসমান হয়।

পাশ—পশু-আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর এখন পাশ সম্বন্ধে কিছু

বলা আবশ্যক। কারণ পাশের সহিত সম্বন্ধের ফলে আত্মার পশুভাব প্রাপ্তি ও সংসারের অনুভব হয়। পাশ, চৈতন্যের প্রতিবন্ধক। আণব, কর্ম ও মায়া—সাধারণতঃ এই তিন প্রকার মল বা পাশের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আণব-মল প্রধান।

যতদিন না মলের নিবৃত্তি হইবে, ততদিন পশুত্ব দূর হইবে না আর শিবত্বের অভিব্যক্তিও হইবে না। কেবল জ্ঞানেরই দ্বারা মলের নাশ হওয়া সম্ভব নয়। দ্বৈতমতে মল দ্রব্যাত্মক। অতএব, যেইরূপ চক্ষুর ছানি চিকিৎসকের অস্ত্রোপচাররূপ ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র ঈশ্বরের দীক্ষা ব্যাপারের দ্বারা মলের নিবৃত্তি হইতে পারে। ইহা ছাড়া মলের নিবৃত্তির আর কোন উপায় নাই। স্বায়ম্ভুব আগমে বলা হইয়াছে—'দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবং ধাম নয়ত্যপি' অর্থাৎ দীক্ষাই মলকে মোচন করে এবং ঊর্দ্ধে শিবলোকে লইয়া যায়। মল হইতে চিৎ এবং অচিতের অবিবেক উৎপন্ন হয়, অতএব ঐ মলের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ বিবেক প্রাপ্তি হইতে পারে না। এই অবিবেক হইতে বিবর্তের (অধ্যাস) উদয় হয়।

আণব মলই আণব পাশ। যদি আত্মার নিত্য ও ব্যাপক চিৎশক্তি এই আণব পাশের দ্বারা অবরুদ্ধ না হইত, তবে মোক্ষের জন্য পরমেশ্বরের কৃপা বা শক্তিপাতের কোন প্রয়োজন থাকিত না। আণব মল এক হইলেও উহার শক্তি অনেক। এই সমষ্টি শক্তি হইতে এক এক শক্তির দ্বারা এক এক আত্মার চিৎ-ক্রিয়ার নিরোধ হয়। এইজন্য আণব মল এক হইলেও একজন পুরুষের আণব-মল নিবৃত্তির সঙ্গে সকলের আণব মল-নিবৃত্তির প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। সুতরাং একজন পুরুষের মোক্ষলাভ হইতে সকলের মোক্ষলাভ হয় না।

আণব মলের শক্তিসমূহ আপন আপন অধিকারের সময় চৈতন্যকে রোধ করিয়া থাকে। আণব মলের অধিকার-কাল সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি আসিতে পারে না। মলের এই অধিকার-সমাপ্তি মলেরই পরিণামের অপেক্ষা রাখে। মলের মধ্যে পরিণত হইবার যোগ্যতা থাকিলেও উহা নিজে নিজে পরিণত হইতে সমর্থ হয় না; কারণ অচেতন হওয়ার দরুণ উহা সর্বদা সর্বপ্রকারে চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হয়। অতএব, পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই মলের পরিণাম হয়।

কর্ম নামক পাশের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কর্ম ধর্মাত্মক এবং অধর্মাত্মক দুইই। কর্ম 'অদৃষ্ট' এবং 'বীজ' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। কর্মপ্রবাহ অনাদি এবং সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে বুদ্ধি তত্ত্বে আশ্রিত।

মায়া নামক যে পাশের কথা বলা হইয়াছে, উহা মায়া-তত্ত্ব হইতে ভিন্ন।

সৃষ্টির আরম্ভে যে সময়ে মন্ত্রেশ্বরের দ্বারা মায়াতত্ত্ব ক্ষোভিত হয়, সেই সময় উহা কলা এবং বিদ্যা প্রভৃতি তত্ত্বরূপ হইতে সাক্ষাৎ এবং পরম্পরাক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তিরিশটি তত্ত্বের সমষ্টিই মায়ার স্বরূপ। পুর্যষ্টক এবং সূক্ষ্মদেহ আদি এই মায়ারই নামান্তর।[১] প্রত্যেক আত্মার জন্য মায়া পৃথক পৃথক হয় এবং মোক্ষকাল পর্যন্ত আত্মার ভোগসাধন-রূপে কর্মানুসারে সম্পূর্ণ নিম্নবর্তী ভুবনগুলিতে পর্যটন করিতে থাকে। মায়া-তত্ত্ব বা মায়া-সংজ্ঞক পাশ একটি নয়। কলাদি তত্ত্ব-সমূহের সমষ্টিরূপা মায়া সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুই প্রকার। সাধারণ মায়া অত্যন্ত বিস্তৃত এবং সমস্ত আত্মার ভোগ্যারূপা ভুবন সকলের আধারভূতা। বিন্দুর বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি নামক কলাসমূহের মধ্যে এই মায়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। এই সাধারণ মায়ার বিশাল রাজ্যে প্রত্যেক আত্মার ভোগসাধনের জন্য সংকোচ বিকাশশীল সূক্ষ্মদেহময় অসংখ্য তত্ত্বের সমষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চারমান থাকে। ইহাদিগকে অসাধারণ মায়া বা পুর্যষ্টক বলে। সাধারণ মায়ার অন্তর্গত পৃথক পৃথক ভুবন হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহগুলির সহিত যখন এই সমস্ত সূক্ষ্ম দেহগুলি সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে নিজ নিজ কর্ম-সমূহ ভোগ করিবার যোগ্যতা উৎপন্ন হয়।

মায়া-তত্ত্ব নিত্য, বিভু ও এক। কিন্তু ইহার মধ্যে বিচিত্র শক্তির সমাবেশ আছে। সৃষ্টির আরম্ভ মুহূর্তে ইহা 'অনন্ত' নামক ঈশ্বর-শক্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া কলা, কাল ও নিয়তি—এই তত্ত্বগুলি উৎপন্ন করে।

'অনন্ত' নামক বিদ্যেশ্বরের দ্বারাই মায়ার ক্ষোভ হয়—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক আচার্যগণ মায়ার ক্ষোভে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার প্রয়োজকত্ব অবশ্যই মানেন; কারণ তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া বিনা অনন্তের কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। কিরণাগমে লেখা আছে—

"শুদ্ধেহধ্বনি শিবঃ কর্তা প্রোক্তোহনন্তোহসিতে প্রভুঃ।"

অর্থাৎ শুদ্ধ অধ্বাতে 'শিব' কর্তা এবং অশুদ্ধতে 'অনন্ত' কর্তা এই কথা বলা হইয়া থাকে।

মায়া যে এই প্রকার বিচিত্র ভুবনাদি এবং নানা প্রকারের দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে অর্থাৎ কর্মফল-ভোগের সাধন-রূপে পরিণত হয়, তাহা শুধু বিবিধ বন্ধনযুক্ত 'সকল'-সংজ্ঞক পশু আত্মার নিমিত্ত। এই সমস্ত পশু-আত্মার আত্মাভিমান-রূপ

---

[১] সাংখ্য ও বেদান্তসম্মত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর এবং তান্ত্রিকদের সূক্ষ্মশরীর ঠিক এক নহে। তন্ত্র-প্রতিপাদিত কলাদি তত্ত্ব-সমূহের স্থান সাংখ্য বা বেদান্তে না থাকার কারণে সূক্ষ্ম শরীরের লক্ষণগুলির নির্দেশে ভেদ আসিয়া গিয়াছে।

মায়াময় বন্ধন, সুখ-দুঃখ এবং মোহের হেতুভূত কর্মময় বন্ধন এবং পশুত্ব প্রাপ্তির কারণভূত আণব বন্ধন থাকে। তন্ত্রমতে শরীরী ও অশরীরী আত্মার কর্তৃত্বে কিছু ভেদ আছে, এইজন্য পরমেশ্বরের আপন শক্তির দ্বারা উৎপন্ন বিন্দু বা মহামায়ার বিক্ষোভ এবং অনন্তের নিজ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন মায়ার বিক্ষোভ সর্বতঃরূপে এক প্রকার ব্যাপার নয়। শিবের আপন শক্তি হইল শুদ্ধা সংবিৎ অর্থাৎ, বিশুদ্ধ নির্বিকল্পক জ্ঞান। কিন্তু, অনন্তের নিজ শক্তি সবিকল্পক জ্ঞান, অর্থাৎ বিকল্প-বিজ্ঞান্। শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ না হইলে যে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না—এরূপ কোন কথা নাই; কারণ, অশরীর আত্মাদের নিজদেহের স্পন্দনাদিতে কর্তৃত্ব দেখা যায়। আত্মার সহিত মল প্রভৃতির সম্বন্ধ হইবার পরই শরীরাদির আবশ্যক হয়। শিব নিজে মলহীন, অতএব তাঁহার কর্তৃত্বে শরীরাদির অপেক্ষা নাই। মায়াপতি 'অনন্ত' সর্বতোরূপে নির্মল নয়, কারণ তাঁহার মধ্যে অধিকার-মল থাকে। তাঁহার শরীর বৈন্দব বা মহামায়ার উপাদানে রচিত হয়—ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অনন্তের সবিকল্পক জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে বিচার্য বিষয়। তন্ত্রের মতে 'ইহা 'ঘট', 'ইহা 'পট', এই প্রকার শব্দের উল্লেখ হইতে আত্মার সবিকল্পক জ্ঞান হয়—সবিকল্পক-বিজ্ঞানং চিতেঃ শব্দানুবেধতঃ।[১] অর্থাৎ শব্দানুবেধ হইতে চেতনায় সবিকল্পক জ্ঞান হয়। অতএব, 'অনন্তে'র বিকল্প-বিজ্ঞানেও শব্দোল্লেখ অবশ্য থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই শব্দোল্লেখ কি প্রকারে তখন সম্ভব হয়? কারণ, আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি, সেই সময় অশুদ্ধ জগতের তো উৎপত্তিই হয় নাই; কারণ মায়ার ক্ষোভ হইবার পরই উহার পরিণামে এই জগতের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য তান্ত্রিক লোক স্থূল আকাশকে এই শব্দের অভিব্যঞ্জক রূপে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথা হইল, পরমেশ্বর-জনিত মহামায়া বা বিন্দুর ক্ষোভ হইবার পরই শব্দের উৎপত্তি হয়। মহামায়াই কুণ্ডলিনী বা পরব্যোম-স্বরূপা হন। ইহারই পরিণাম শব্দ।

বিন্দু পরা-পশ্যন্তী প্রভৃতি নিজ শব্দাত্মিকা বৃত্তিগুলির দ্বারা 'এই ঘট লাল' এই প্রকারের বিকল্পের উল্লেখ করতঃ সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। জাত্যাদিবিশেষণ বিশিষ্ট সবিকল্পক জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ (conceptual) হইয়াই উৎপন্ন হয়। এই

---

[১] চিন্তার (thinking) সহিত ভাষার (language) সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার কবিয়াছেন। শব্দোল্লেখকে অতিক্রম না কবিলে চিন্তারাজ্য (thought) বা বিকল্প-ভূমিকে ভেদ কবা যায় না। এইজন্য যোগী 'স্মৃতিপরিশুদ্ধি'ব অনুশীলন করেন। বৌদ্ধেরাও শব্দাত্মক জ্ঞানকে 'কল্পনা' বলেন। উহাকে প্রত্যক্ষ মানেন না।

জ্ঞান প্রত্যক্ষ-অনুভব হইতে জাত। ইহাকে পূর্বানুভূত বাসনাত্মক সংস্কার অথবা ভাবনা-রূপে গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই। অধ্যবসায় বুদ্ধির কার্য। এইজন্য কেহ কেহ এই সবিকল্পক অনুভবকেও বুদ্ধিরই কার্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু তান্ত্রিক দৃষ্টিতে অধ্যবসায় বুদ্ধির পরিণাম হইলেও বিন্দুর ক্রিয়ারূপ শব্দের সাহায্যেই বিকল্প জ্ঞানের উদ্ভব হয়। বুদ্ধি মায়ার উপর নয়—একথা সত্য, এবং বিদ্যেশ্বর প্রভৃতি শুদ্ধ জগৎ-বাসীদের বিকল্পানুভব বুদ্ধি জনিত নয়, উহার একমাত্র নিমিত্ত হইল বাক্‌শক্তি। সুতরাং 'অনন্ত' কি প্রকারে বিকল্প-জ্ঞানের দ্বারা মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে—এই বর্ণনা হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অতএব তন্ত্রমতে বিন্দুর ক্ষোভ হইতেই শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিন্দুই পরব্যোমস্বরূপা। শব্দ ইহারই পরিণাম-স্বরূপ। বিন্দুর শব্দাত্মিকা বৃত্তি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী এবং পরা ভেদে চার প্রকারের—চারিটি বৃত্তির প্রকারভেদ এইরূপঃ—

(ক) বৈখরী—ইহা শ্রবণগ্রাহ্য অর্থবাচক স্থূল শব্দ। তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া বায়ু বর্ণের আকার ধারণ করে। সাধারণতঃ এই শব্দ প্রাণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত হয়। এইজন্য আকাশ এবং বায়ু উভয় হইতেই ইহার উদ্ভব মানা হয়।

(খ) মধ্যমা—ইহা প্রাণবৃত্তির অতীত শোত্রের অগোচর তথা অন্তঃ সংকল্পরূপ অর্থাৎ চিন্তারূপে ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত। ইহাকে 'পরামর্শজ্ঞান' বলে। ইহা শুদ্ধ বুদ্ধির পরিণাম ও ক্রমবিশিষ্ট। ইহাই স্থূল শব্দের কারণ।

(গ) পশ্যন্তী—ইহার নামান্তর হইল অক্ষর বিন্দু। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ এবং বর্ণ-সমূহের অবিভাগ হেতু ক্রমহীন।

(ঘ) পরা অথবা সূক্ষ্মা—ইহাকে কোথাও কোথাও 'নাদ' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা অভিধেয় বুদ্ধির বীজ। ইহার স্বরূপ জ্যোতির্ময় এবং প্রত্যেক পুরুষ বা আত্মা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুষুপ্তি অবস্থাতেও ইহার নিবৃত্তি হয় না। পরা-বাকের স্বরূপ হইতে আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ পৃথকরূপে সাক্ষাৎ করিতে পাবিলেই পুরুষের ভোগাধিকার নিবৃত্ত হয়। ইহাই মুখ্য বিবেক জ্ঞান। যতদিন না ইহার উদয় হয়, ততদিন শব্দানুবিদ্ধ জ্ঞানের অতীত বিশুদ্ধ নির্বিকল্পক জ্ঞান লাভ করিবার কোন উপায় নাই। সাংখ্যসম্মত 'সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি' অথবা 'বিবেকখ্যাতি' হইতে আত্মার যে স্বরূপ-স্থিতি তাহা হইতে তন্ত্র-প্রসিদ্ধ আত্মার স্বরূপ-স্থিতি অনেক উর্দ্ধে। সেইজন্য সাংখ্যোক্ত কৈবল্যকে আগমে' কোথাও মোক্ষরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ সাংখ্যোক্ত কৈবল্যে, না

হয় আত্মার পশুত্ব নিবৃত্তি অথবা না হয় উহাতে শিবত্বের অভিব্যক্তি। তান্ত্রিক দীক্ষার প্রভাবে আণব মল নিবৃত্ত হইলে আত্মার স্বরূপগত অবিবেক দূর হইয়া যায় এবং শিবত্ব লাভ হয়।

জীবমাত্রেরই এই বৃত্তিগুলির সত্তা আছে। এই বৃত্তিগুলির ভেদের ফলে কাহারও জ্ঞান উৎকৃষ্ট, কাহারও মধ্যম এবং কাহারও অপকৃষ্ট বলিয়া গণনা করা হয়। সকল বৃত্তিকে অতিক্রমণের দ্বারাই জীব শিবত্ব-লাভ করিতে পারে অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার পূর্বে নয়। অদ্বৈত শৈব বা শক্তি সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা চিৎ, অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। উহার বিমর্শরূপা শক্তি, উহা হইতে অভিন্ন। এই শক্তি বাক্-রূপা।[১] ইহার পরাবস্থাকে 'পূর্ণাহন্তা' নামে বর্ণনা করা হয়। ইহার স্বরূপ সর্বদা প্রকাশময় মহামন্ত্রাত্মক, যাহার গর্ভে 'অ'-কার হইতে 'ক্ষ'-কার পর্যন্ত সমস্ত শক্তি-চক্র নিহিত থাকে। পরাবাক্ পশ্যন্তী আদি ক্রমানুসারে উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকে প্রকাশিত করে। বস্তুতঃ আত্মা নিজ শক্তির দ্বারাই বিমোহিত হইয়া আপন পঞ্চকৃত্যকারিত্বকে যেন ভুলিয়া থাকেন।[২] পুনরায়, যখন শক্তিপাতের প্রভাবে আত্মার আত্মশক্তি উন্মীলিত হয়, তখন সে পূর্ণ সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বাদি রূপ নিজ পারমেশ্বরিক স্বভাবে নিত্য কালের জন্য স্থিত হইয়া যায়।

আণবাদি তিন প্রকার মলই জ্ঞানকে সংকুচিত করে। ইহার দ্বারা যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞেয় পদার্থের ভান হয়, উহাও বস্তুতঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত মাতৃকা বা বর্ণ-সমূহ হইতে এই সব জ্ঞান অধিষ্ঠিত হয়। বর্ণসমূহ হইতেই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য তন্ত্রে ইহাদিগকে বিশ্বজননী মাতৃকারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় ইহারা সকল বন্ধনের কারণ হয়, পরন্তু সম্যক প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইলে পরে ইহাদেরই নিকট হইতে পরাসিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।

অম্বা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও বামা—এই চার শক্তি সমস্ত শক্তিগুলির কারণ।

---

১ দ্বৈতমতে পরাবাক্ বিন্দুর বৃত্তিবিশেষ। ইহাকে অতিক্রম করিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিন্দু শুদ্ধ হইলেও জড়। পরন্তু অদ্বৈতমতে পরাবাক্ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র শক্তিরই নামান্তর এবং চিদ্রূপা। ইনি পূর্ণাবস্থায় আত্মা বা পরমেশ্বরে অভিন্ন রূপে বিরাজিত থাকেন।

২ বস্তুতঃ, মায়িক দশাতেও আত্মার পঞ্চকৃত্যকারিত্ব সর্বতোরূপে আবৃত হয় না। যে পুরুষ ভক্তিপূর্বক আপন পঞ্চকৃত্যকারিত্ব-রূপ স্বভাবকে দৃঢ় ভাবনার সহিত সর্বদা পরিশীলন করিতে সক্ষম হয়, তাহার পরমেশ্বর-ভাব খুলিয়া যায়। সে জগতকে নিজ স্বরূপের বিকাশ জানিয়া জীবন্মুক্ত পদে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। ঐ সময় বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নিজ আত্মার সহিত অভিন্ন রূপে প্রতীত হয় এবং তাহার সব বন্ধন কাটিয়া যায়।

'অ'-কারাদি মাতৃকাই কলা, দেবী, রশ্মি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। ইহারা সব স্থূল বর্ণরূপে তথা পদ ও বাক্যের যোজনা হইতে অনেক প্রকারের লৌকিক এবং অলৌকিক শব্দরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই সমস্ত কলার প্রভাবে পশুআত্মাদের জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ হওয়ার জন্য বলা হইয়া থাকে যে পশু-আত্মা, কলাসমূহের অধীন অথবা উহাদের ভোগ্য। উহাদের প্রভাব হইতে যে জ্ঞানাভাস অথবা আণব, মায়ীয় এবং কার্য-মল উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা পশু-আত্মার নিজ বিভব অর্থাৎ ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া যায়। 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' এই প্রকারের অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ জ্ঞানাভাসকে 'মায়ামল' বলে। এইরূপ অনাত্মাতে আত্মাভিমান-যুক্ত হইযা আমি যাবতীয় কর্মের কর্তা—এই প্রকার জ্ঞানাভাসকে 'কর্মফল' বলা হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন অনাবৃত প্রকাশই আত্মার স্বভাব, তখন বন্ধনের আবির্ভাব কোথা হইতে হয়? কারণ, অদ্বৈত মতে চিৎপ্রকাশকে ছাড়িয়া তো দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই? এই প্রশ্নের সমাধানে তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে, পরমেশ্বর আপন স্বাতন্ত্র্য-শক্তি হইতে সর্বপ্রথমে আপন স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিবার কর্ত্রীস্বরূপিনী মহামায়ার শক্তিকে অভিব্যক্ত করেন। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যশক্তি হইতে উদ্ভূত মহামায়া পরমেশ্বরের স্বরূপকে আবৃত করায় আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ আত্মায় সঙ্কোচের আবির্ভাব হয়, যে সঙ্কোচ 'অনাশ্রিত শিবতত্ত্ব' হইতে 'মায়াপ্রমাতা' পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপক। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-হানিই এই সঙ্কোচের স্বরূপ। বস্তুতঃ ইহা পরমেশ্বরভাবের অস্ফুরণ। ইহার নাম অপূর্ণম্মন্যতা বা আণব-মল। ইহাকে অজ্ঞানও[১] বলা যায়। আগমের পরিভাষায় ইহাকে 'অখ্যাতি'ও বলে, যাহার স্বরূপ হইল আত্মায়, অনাত্মভাবের অভিমান। এই অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান বন্ধন তো বটেই, পরন্তু অনাত্মায় আত্মাভিমান-রূপ অজ্ঞান-মূলক জ্ঞানও বন্ধনের কারণ হয়। এইজন্য আণব মল দুই প্রকার—

(১) চিদাত্মাতে স্বাতন্ত্র্যের অপ্রকাশ হেতু অপূর্ণম্মন্যতা। এই মল 'বিজ্ঞানাকল পশু'র মধ্যে থাকে।

(২) স্বাতন্ত্র্য থাকিতেও দেহাদি অনাত্মায় অবোধাত্মক আত্মাভিমান।

বিশ্বের কারণ হইল মায়া, যাহার নামান্তর যোনি। যোনি হইতে কলাদি পৃথিবী-পর্যন্ত তত্ত্বসমূহ আবির্ভূত হয়। এই সকল তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন ভুবন দেহ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রচিত হয়। এইগুলিকে মায়ামল বলে। মায়ামলকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই কর্ম-মল। কলাদি তত্ত্ব আণব মলের সহিত যুক্ত হইয়াই পুরুষকে আচ্ছাদন করে; এইজন্য এইগুলি মলপদবাচ্য হয়।

---

[১] পৌরুষ অজ্ঞান এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান ভেদে অজ্ঞান দুই প্রকারেব।

মলত্রয় ও কলাসমূহের অধিষ্ঠাত্রী যে মাতৃকাশক্তি—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মাতৃকাশক্তিতে অভেদজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হইল অঘোরশক্তি যাহার প্রভাবে ভিতরে বাহিরে আত্মভাবের স্ফূর্তি হয় এবং ভেদজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হইল ঘোরাশক্তি, যাহা হইতে বহিরুন্মুখভাব ও স্বরূপের আবরণ হয়।

পরাবাক্ প্রসারিত হইয়া প্রথমে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে মাতৃকারূপে পরিণাম হয়। মাতৃকাই বর্ণমালা। মাতৃকার অন্তর্গত স্বরবর্ণে বীজ অথবা শিবাংশ এবং ব্যঞ্জনবর্ণে যোনি অথবা শক্ত্যাংশ প্রবল থাকে। মহাঘোরা মাতৃকা-শক্তিগুলি ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করে। পশু-আত্মাদের অধঃপতনের মূল কারণ ইহারাই। তত্ত্বলাভ কবিবার পবও যতদিন পুরুষ সম্যকরূপে প্রমাদহীন না হইতেছে, ততদিন এই সব শক্তির দ্বারা শব্দানুবেধপূর্বক মোহ-গর্তে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিয়াই যায়।[১]

প্রকাশ ও বিমর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে আরও দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। বামকেশ্বর তন্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃষ্টির যেটি প্রথম দশা সেটি 'তত্ত্বাতীত অবস্থা'। তত্ত্বাতীত হইতে তত্ত্বপ্রধান 'শিবতত্ত্ব' ও 'শক্তিতত্ত্ব'—এই দ্বৈতভাবের আর্বিভাব। তত্ত্বাতীত অবস্থায় প্রকাশ-রূপ শিব ও বিমর্শরূপা শক্তি—এই উভয়ের সামরস্য থাকে। বিশ্ব তখন শক্তিগর্ভে শক্তির সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। কিন্তু যখন পরাশক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ নিজের স্ফুরত্তা দর্শন করেন তখনই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। সতত এই স্ফুরত্তাদর্শনই বিশ্বদর্শন এবং বিশ্বদর্শনই বিশ্বসৃষ্টি। এই অবস্থায় দৃষ্টিই সৃষ্টি। পরা-শক্তিই বিশ্বদর্শন বা সৃষ্টি করেন, পর-শিব তটস্থ থাকেন।

পরা-শক্তির স্ফুরত্তার রহস্য শাক্ত ও শৈবতন্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। পরা-শক্তি অন্তর্লীন অবস্থা হইতে যখন অভিব্যক্তি বা পরিস্ফুটতা লাভ করে, তখনই বিশ্বচক্রের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ অভিব্যক্তি, পরাশক্তিরই হয়। পরাশক্তির স্ফুরত্তা হইতে প্রথম শিবতত্ত্ব (প্রকাশ) এবং শক্তিতত্ত্ব (বিমর্শ)—এই দুই তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। সুতরাং তত্ত্বের বিচারে প্রকাশ-রূপ শিব এবং বিমর্শ-রূপা শক্তি উভয়ই শক্ত্যাত্মক। তাই শিবতত্ত্বও শক্তি মধ্যেই পরিগণিত।

বামকেশ্বরতন্ত্র মতে প্রকাশের চার অংশ এবং উহার সহিত অবিনাভূত বিমর্শেরও চার অংশ। প্রকাশ অংশগুলির নাম অম্বিকা, বামা, জোষ্ঠা ও রৌদ্রী এবং বিমর্শ অংশগুলির নাম শান্তা, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া। অম্বিকা

---

[১] "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"
অর্থাৎ, ঐ দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিদিগেব চিওকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে 'নক্ষেপ কবে।

এবং শান্তার সামরস্যাবস্থায় শান্তাভাবাপন্না পরাশক্তি পরাবাক্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আত্মস্ফুরণের অবস্থা।

'আত্মনঃ স্ফুরণং পশ্যেদ্যদা সা পরমা কলা।
অম্বিকারূপমাপন্না পরাবাক্ সমুদীরিতা।।'[১]

এই আত্মস্ফুরণের অবস্থায় সমগ্র বিশ্ব বীজরূপে, অর্থাৎ অস্ফুটরূপে আত্মসত্ত্বায় বর্তমান থাকে। ইহার পর শান্তা হইতে ইচ্ছার উদয় হইয়া উহা অব্যক্ত শিবশক্তির গর্ভ হইতে বহির্গত হয়। ইচ্ছাশক্তি ঐ সময় বামাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-লাভ করে এবং পশ্যন্তী বাক্ নামে পরিচিত হয়। ইহার পর জ্ঞান-শক্তির আবির্ভাব হয়। জ্ঞানশক্তি জ্যেষ্ঠার সহিত অভিন্ন এবং মধ্যমা বাক্ নামে পরিচিত। এই শক্তি সৃষ্ট বিশ্বের স্থিতির কাবণ। জ্ঞানের পর ক্রিয়াশক্তি রৌদ্রীর সহিত এক হইয়া বৈখরী নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চাত্মক বাক্-বৈচিত্র্য বৈখরীরই স্বরূপ।

এই চার প্রকারের বাক্ পরস্পর মিলিত হইয়া মূলত্রিকোণ অথবা মহাযোনি-রূপে পরিণত হয়। শান্তা ও অম্বিকার সামরস্য, অর্থাৎ পরাবাক্ই এই ত্রিকোণের বিন্দু বা কেন্দ্র। ইহা নিত্য স্পন্দময়। পশ্যন্তী ইহার বাম রেখা, বৈখরী দক্ষিণ রেখা আর মধ্যমা সরল অগ্ররেখা (Base)। মধ্যস্থ মহাবিন্দুই অভিন্ন-বিগ্রহ শিব ও শক্তির আসন। এই ত্রিকোণ মণ্ডল চিৎ-কলার প্রভাবে উজ্জ্বল। ইহার বহির্ভাগে ক্রমবিন্যস্ত রূপে শান্তাতীত, শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি—এই পাঁচ কলার আভাময় স্তর বিদ্যমান। এই স্তরগুলির সমষ্টিই জগতের রূপ। অতএব, ভূপুর হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত[২] বিস্তৃত সমস্ত বিশ্বচক্রই ঐ মহাশক্তির বিকাশ। মধ্যত্রিকোণ বিন্দুবিসর্গময়—ইহার প্রত্যেক রেখাই পঞ্চস্বরময়। অতএব পঞ্চদশস্বরাত্মক এই ত্রিকোণমণ্ডলের বিন্দুস্থান বিসর্গ (অঃ) কলা-সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ত্রিকোণের স্পন্দন হইতে অষ্টকোণ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা রৌদ্রী শক্তির রূপ এবং শান্ত্যতীত কলার দ্বারা উজ্জ্বল থাকে। ইহার প্রত্যেক স্তরই প্রকাশ এবং বিমর্শময় অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থময়। সমস্ত চক্রে 'অ'-কার হইতে 'ক্ষ'-কার পর্যন্ত বর্ণমালা তথা শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্ব-সমূহ অভিব্যক্ত হয়। সাধক যে সময় কুণ্ডলিনীর জাগরণের পরে উত্তরোত্তর

---

[১] যে সময় ঐ পরাশক্তি নিজ স্ফুরণকে দেখে, ঐ সময় উহা অম্বিকা-রূপ প্রাপ্ত হইয়া 'পবাবাক্' নামে কথিত হয়।

[২] তান্ত্রিক সাহিত্যে দেবতামাত্রের যান্ত্রিক-রূপ বাসনা ভেদে জগতেরই রূপ। প্রত্যেক যন্ত্রে সকলের বাহিরে যে চতুষ্কোণ অঙ্কিত করা হয়, উহার নাম 'ভূপুর'। উহা বিশ্বনগবের প্রাকার-স্বরূপ। পূর্বাদি যে কোনও মার্গ দিয়া উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ভিতরেব দিকে অগ্রসব হওয়াই সাধন-মার্গের উৎকর্ষ বুঝায়। প্রত্যেক যন্ত্রেই মধ্য, অর্থাৎ কেন্দ্রে যে বিন্দু থাকে, উহা অন্তিম ভূমির সূচক। এই ভূমিতে সর্বশক্তি-সমন্বিত পরমেশ্বরের অপরোক্ষ অনুভব অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

উপরের দিকে উঠিতে থাকে, অথবা ইষ্টদেবতার স্বরূপভূত চক্রের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে, সেইসময় বস্তুতঃ এই বিশ্বচক্রেই উহার যাত্রা চলিতে থাকে। অকুল হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত মহামার্গের ভিতর যত অবান্তর চক্র আছে, তাহাদের সমষ্টিই বিশ্বচক্র। ইহাতে অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত অংশ 'সকল'। এই অংশ সুষুম্না মার্গে নিম্নতম অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ্ঞা চক্রের উপরে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত অংশ 'সকল-নিষ্কল'। বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত ভূমির নাম যথাক্রমে—বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। এই পর্যন্ত যে মার্গ তাহা 'সকল-নিষ্কল'। বিন্দু ভেদ করিবার পর অর্দ্ধচন্দ্রাদি কলা ক্রমশঃ সাধকের গোচরে আসে। উন্মনা পর্যন্ত পৌঁছিবার পর, কালের কলা, তত্ত্ব, দেবতা ও মন সর্বথা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই অন্তিমভূমি নিরাকার, শব্দহীন, শূন্যময় ও বিশ্বাতীত।

উন্মনার উপরে মহাবিন্দু অংশ নিষ্কল। বস্তুতঃ এই মহাবিন্দুই বিশ্বের হৃদয়—ইহা বিশ্বাতীত পরমেশ্বর অথবা শিব-শক্তির আবির্ভাব স্থান বা আসন।

বস্তুতঃ মহাবিন্দুই সদাশিব, যাহার উপর চিৎকলা অথবা চিচ্ছক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী হইয়া খেলা করে। এই খেলা পরাবাক্ বা পরামাত্রার বিলাস। শুক্ল তথা রক্ত বিন্দুরূপ প্রকাশ বিমর্শাত্মক কাম-কলাক্ষরের পরস্পর সংঘট্ট হইতে চিৎকলার অভিব্যক্তি হয়।[১] মহাবিন্দুর স্পন্দন হইতে তিনটি বিলীন বিন্দু আলাদা আলাদা হইয়া রেখা রূপে পরিণত হইয়া 'মহাত্রিকোণের' আকার ধারণ করে। ইহা হইতে শিব থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ছত্রিশ তত্ত্বের দ্বারা রচিত সমস্ত বিশ্বের আবির্ভাব হয়।

---

[১] তত্ত্বাতীত অবস্থায শিব ও শক্তিব সাম্যবস্য থাকে। ঐ সময বিশ্বশক্তির গর্ভে অন্তঃসংহৃত ভাবে, অর্থাৎ শক্তিব সহিত অভিন্ন-রূপে বিদ্যমান থাকে। পরন্তু যখন পরাশক্তি সেচ্ছায আপন স্ফুরণকে নিজেই দেখে, তখনই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ এই স্ফুবণেব দর্শনই বিশ্বদর্শন এবং বিশ্বদর্শনই বিশ্বেব সৃষ্টি। এই অবস্থায দৃষ্টিই সৃষ্টি। অনুত্তব দশাতে স্বরূপে অভিন্নরূপে থাকিলেও বিশ্ব দেখা যায না। সেই হেতু ঐ অবস্থা সৃষ্টি-ব্যাপারেব অতীত। এই দৃষ্টি বা সৃষ্টি-ব্যাপারে শিব তটস্থ থাকেন। তাঁহাব স্বরূপভূতা স্বাতন্ত্র্য-শক্তিই সব কিছু করে। শিব অগ্নিস্বরূপ হন, ইহা সম্বর্ত্তানল অথবা প্রলযানল স্বরূপ। শক্তি সোমস্বরূপ হন, বিবর্ত্তচন্দ্রস্বরূপা। উভযেব সাম্যই তান্ত্রিক ভাষায় 'বিন্দু' নামে অভিহিত। এই বিন্দুরই অপর নাম রবি অথবা কাম। ইহাব ক্ষোভ, অর্থাৎ সাম্যেব ভঙ্গ হইলেই সৃষ্টিব সূচনা হয়। সাম্যাবস্থায় অগ্নি ও চন্দ্ররূপী বক্ত এবং শুক্ল বিন্দু (অ-হ) সূর্যরূপে অভিন্ন থাকে। ক্ষুব্ধ হইলেই চিৎকলাব আবির্ভাব হয। অগ্নিব তাপে যেমন ঘৃত তরল হইয়া প্রবাহিত হয। সেইরূপ প্রকাশ-স্বরূপ অগ্নির সান্নিধ্য হেতু বিমর্শরূপা শক্তিব স্রোত বহিতে থাকে। এই প্রকাব, শ্বেত ও রক্ত বিন্দুর মধ্য হইতে চিৎকলার নিঃসবণ হয। চৈতন্যের অভিব্যক্তিব ইহাই রহস্য।

তান্ত্রিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্যের বিশ্লেষণ

পরমশিবাবস্থাই পূর্ণত্বের প্রতিপাদক চরম অবস্থা বলিয়া আগমশাস্ত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ, এই অবস্থায় শিব ও শক্তিভাবের সামরস্য বা সাম্য থাকে। শিবভাব অভিব্যক্ত প্রকাশের ভাব—ইহাই চরম প্রকাশ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন কিছুই থাকে না তখন পরমপ্রকাশ স্বপ্রকাশ বলিয়া নিরন্তর নিজের মধ্যেই নিজে প্রকাশমান থাকে। এই প্রকাশের যেটি অহংরূপে বিমর্শন তাহাই শক্তি। এই বিমর্শনরূপ শক্তির স্ফুরণ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি—শুধু তাহাই নহে বিশ্বের স্থিতি এবং লয়ও এই শক্তির স্ফুরণ সাপেক্ষ। সুতরাং শক্তির উন্মেষ অবস্থায় সমগ্র প্রকাশের মধ্যে বিশ্বের আভাস দৃষ্টিগোচর হয়। এই আভাসের সত্তাই মহাপ্রকাশকে সাভাস প্রকাশরূপে নির্দেশ করে। আভাস না থাকিলে ঐ প্রকাশ নিরাভাসরূপে প্রকাশমান হয়। যাহাকে সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা এই মহাপ্রকাশরূপী পূর্ণ অহং-এর স্বাতন্ত্র্যকল্পিত ইদংরূপী বাহ্য সত্তা মাত্র। এই বাহ্য সত্তা সর্বপ্রথম শূন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অনন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই হইল বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পূর্ণ পরমশিবসত্তার পরিচয়।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এ কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের পৃষ্ঠভূমিতে আছে পরব্রহ্ম, যাহা অব্যক্ত। অব্যক্তকে ব্যক্ত করা যায় না। ব্যক্ত করিবার যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, অব্যক্ত অব্যক্তই থাকিয়া যায়—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" কারণ পূর্ণতত্ত্বের যেটি অব্যক্ত স্থিতি, সেখানে সৎ, চিৎ ও আনন্দ কল্পিত হইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি ভাব অভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি একটি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক। সৎভাব, অসৎভাব বা অব্যক্ত হইতে পৃথক হইয়া সন্মাত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সন্মাত্র স্থিতি হইতে ইহারই আত্মপ্রকাশরূপে একটি কলা বা শক্তি নির্গত হয়, যাহাকে তান্ত্রিকগণ 'চিৎ' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাহিত্যে এই চিৎ-ভাবকে 'অনুত্তর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সৎ হইতে নিজ সত্তা চিদ্রূপে বহির্গত হইলে চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সন্মাত্রের বহির্মুখ স্পন্দনের ফলে যে চিৎ-ভাবের প্রকাশ, সেই চিদ্ভাবের মধ্যেও বহির্মুখ স্পন্দন কার্য করিতে থাকে। তাহার ফলে চিৎ নিজে সত্তা হইতে আংশিকভাবে বহির্গত হইয়া আনন্দরূপে স্থিতিলাভ

করে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যাহা শুদ্ধ সন্মাত্র তাহা একপক্ষে নিঃস্পন্দ, অপর পক্ষে স্পন্দিত। সন্মাত্রের এই স্পন্দন বহিঃস্পন্দন—যাহার প্রভাবে সৎ চিদ্রূপে প্রকাশিত হয়। চিৎ-স্থিতির মধ্যে অন্তঃস্পন্দন ও বহিঃস্পন্দন দুই-ই সমভাবে বিদ্যমান থাকে। সেজন্য চিৎ যেমন বহির্মুখ, স্পন্দনবশতঃ আনন্দের অভিমুখ, তেমনি অন্যদিকে অন্তর্মুখ স্পন্দনবশতঃ উহা সৎ-এরও অভিমুখ। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই দুইটি বৃত্তি মানব চিত্তের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি। মানব-চিত্ত অন্তর্মুখ হইলে ঈশ্বরাভিমুখী হয়, বহির্মুখ হইলে বিষয়াভিমুখী হয়।

চিৎ হইতে বহিঃস্পন্দনের ফলে যখন দ্বিতীয় চিৎ আবির্ভূত হয়, তখন প্রথম চিৎ ঐ দ্বিতীয় চিতের মধ্যে নিজেকে অর্থাৎ নিজের প্রতিবিম্বকে দেখিতে পায় এবং দেখিয়া উহা নিজ সত্তা বলিয়া চিনিতে পারে। উহারই শাস্ত্রীয় নাম 'আনন্দ'। দর্পণে যেমন নিজের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা পৃথক্ মনে হইলেও নিজ সত্তা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়—সেইরূপ প্রথম চিৎ হইতে বিশ্লিষ্ট দ্বিতীয় চিৎ সত্তাতে প্রথম চিৎ যখন নিজেকে দেখিতে পায় তখন উহাকে আনন্দ বলিয়া অনুভব করে। বস্তুতঃ উহা পৃথক কিছু নহে। নিজেরই সত্তা মাত্র। সৎ হইতে যেমন চিৎ পৃথক নহে, কিন্তু তথাপি পৃথক, সেইরূপ চিৎ হইতে আনন্দ পৃথক্ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও আলোচনার সুবিধার্থে তাহাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চিৎ-এর শাস্ত্রীয় নাম 'অনুত্তর'। ইহা বর্ণমালার প্রতীক 'অ'। সর্ববর্ণের অগ্রে স্থিত 'অ' বর্ণের দ্বারা অনুত্তর চিৎকেই লক্ষ্য করা হয়। সেইরূপ 'আ' এই বর্ণটি আনন্দের প্রতীক। এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ অখণ্ডভাবে গৃহীত হইলে এক অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে নিজের নিকট নিজে প্রকাশিত হয়। সন্মাত্র পূর্ণব্রহ্মের অব্যক্ত গভীরতম স্থিতি। উহাকেই আশ্রয় করিয়া উহার প্রকাশ 'চিদ্রূপে' বিরাজমান—এই চিৎ বস্তুতঃ, চিৎশক্তির স্বরূপ এবং ইহা যখন নিজের অভিমুখ হয় এবং অনুকূল সংবেদনরূপে প্রকাশমান হয় তখন ইহা আনন্দ নামে পবিচিত হয়। এই আনন্দ, হ্লাদিনী শক্তি-স্বরূপা। ব্রহ্মের চিৎ অবস্থা ভাববর্জিত, কিন্তু আনন্দ অবস্থা নিত্য ভাবময়। চিৎ সত্তাতে একই এক, দ্বিতীয় কেহ নাই। কিন্তু আনন্দ সত্তাতে একই দ্বিতীয় সাজিয়া নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করিতেছে। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা, সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রীর অভিব্যক্তির পূর্বাবস্থা। এই আনন্দ হইতেই আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রুতি বলেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। যুগলভাব ভিন্ন আনন্দ হয় না এবং আনন্দভাব ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'স

একাকী ন রমতে। তদাত্মানং দ্বিধা অকরোৎ' ইত্যাদি। 'অ' হইতে 'আ' অভিব্যক্ত হওয়া আর 'এক' হইতে 'দুই' অভিব্যক্ত হওয়া—একই কথা। ইহাই আত্মরমণ—আত্মারাম অবস্থা যাহার আস্বাদন ব্রহ্মবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন।

ফোয়ারা হইতে যেমন জলকণিকা নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্গত হইয়া থাকে তেমনি এই আনন্দরূপ প্রস্রবণ হইতে নিরন্তর আনন্দের কণিকা সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া বহির্মুখে ধাবমান হইতেছে। আনন্দের প্রতিটি সূক্ষ্মকণা, আনন্দের মূল প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইলেই উহা একটি আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, নিজের অন্তঃস্থিত আনন্দসত্তাকে আর অনুভব করিতে পারে না। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে ইহাই ইচ্ছার বিকাশ। ইহার প্রতীক 'ই'। ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাকেই 'ইষ্ট' বলা হয়—ইহা অপর কিছু নহে, আনন্দই। কারণ, ইচ্ছামাত্রই আনন্দকে চায় এবং আনন্দকে প্রাপ্ত হইলে, ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়া আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া যায়। ইচ্ছা বস্তুতঃ আনন্দকে অন্বেষণ করিবার অথবা খুঁজিয়া বাহির করিবার শক্তি। বলা বাহুল্য, পরব্রহ্মের ইচ্ছা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্যই সমগ্র জগতের অন্তঃস্থলে সর্বত্র একটা অন্বেষণের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অণু পরমাণু হইতে সূর্যমণ্ডল অথবা নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত, স্থূল হইতে কারণ জগৎ পর্যন্ত, সর্বত্রই প্রকটভাবে হোক্ আর গুপ্তভাবেই হোক্ একটা অদৃশ্য আকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অপর কিছুই নহে, একটি হারাধন ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্তরিক বাসনা। এই হারাধন, ইচ্ছার বিষয়ীভূত আনন্দ ছাড়া অপর কিছুই নহে। আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত অন্বেষণের বিরাম নাই, তাই ইচ্ছারও তৃপ্তি নাই।

এই আনন্দরূপ ইষ্টবস্তু এখনও অমূর্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি যখন ঘনীভূত হয় অথবা সংবেগে স্পন্দিত হয়, তখন ঈশন-শক্তির উদয় হয়। ইহার প্রতীক 'ঈ'। এই ঈশনশক্তিই ইচ্ছাশক্তির প্রাণ। বস্তুতঃ ইহা ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছু নহে। 'ইষ্টবস্তু' এখন এষণীয়। ইহার পরের অবস্থায় যখন এই গুপ্তধন 'ইষ্টবস্তু' প্রকট হইয়া উঠে তখন উহা জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির আকার ধারণ করে। এই জ্ঞানশক্তির নামান্তর উন্মেষ, যাহার প্রতীক 'উ'।

উন্মেষরূপা জ্ঞানশক্তি নিজের বিষয় জ্ঞেয় সত্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইচ্ছা এবং এষণীয় যেমন পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানশক্তি 'উ'-কারের দ্বারা বর্ণিত হয় এবং উহার বিষয় জ্ঞেয় 'ঊ' কারের দ্বারা বর্ণমালাতে গ্রথিত হইয়া থাকে। এই 'ঊ' বস্তুতঃ 'উ'-রই ঘনীভূত অবস্থা। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে উহাকে ঊনতা বা ঊর্মি বলে।

জল হইতে বরফ যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন তদ্রূপ 'উ'-কার হইতে 'ঊ'-কার অভিন্ন এবং জল যেমন ঘনীভূত হইয়া বরফ আকার ধারণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তিও ঘনীভূত হইয়া জ্ঞেয়রূপ ধারণ করে। কিন্তু বরফ ঘনীভূত হওয়ার দরুণ জল হইতে পৃথক মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা জলই এবং জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান থাকে। ঠিক সেইপ্রকার যাহাকে আমরা জ্ঞেয় বলি অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের বিষয়, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান হইতে পৃথক নহে—তাহা জ্ঞানেরই মূর্ত অবস্থা এবং জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান হইতে পৃথক নহে—অবিদ্যা বশতঃ পৃথক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে উহাকে জ্ঞান হইতে পৃথক মনে হয় না। কিন্তু যে অবিদ্যার কথা এখানে বলা হইল, যাহার প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়কে পৃথক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া শক্তির নামান্তর। এই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক হইয়া যায়। জল হইতে উৎপন্ন জমাট বরফ যতক্ষণ জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু যখন ঐ জমাট বরফ জল হইতে পৃথক করা হয় অর্থাৎ যখন জল হইতে বরফ পৃথকরূপে প্রতীত হয়, তখন অবিদ্যারূপা ক্রিয়াশক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বর্ণমালাতে এই ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক বর্ণ চারিটি—এ, ঐ, ও, ঔ। ক্রিয়াশক্তির অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর, স্ফুটতম—এই চারিটি অবস্থা ঐ চারিটি স্বরবর্ণের দ্বারা দ্যোতিত হয়।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে স্পন্দনের বহির্মুখ সংবেগবশতঃ পর পর বিভিন্ন শক্তির অর্থাৎ কলার অভিব্যক্তি হইতেছে। এই শক্তি বা কলাগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। প্রাচীন মহাজনগণ শিব অথবা পরমেশ্বরের পঞ্চমুখ কল্পনা করিয়া এই পঞ্চশক্তিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশক্তির মধ্যে চিৎ ও আনন্দ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত। ইহারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত এবং আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি বহিরঙ্গা শক্তিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এই বহিরঙ্গা শক্তি বিশ্বযোনি বা মহামায়া।

এই যে শক্তিপ্রবাহ ইহা স্পন্দনের বহিঃপ্রবাহ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রতি স্থিতিতেই একটা অন্তঃপ্রবাহ আছে—যেমন সৃষ্টিমুখী গতি বহির্মুখ ও প্রলয়ের গতি অন্তর্মুখ, যেমন বস্তুর দিকে ঈক্ষণ বহির্মুখ কিন্তু স্বরূপের প্রতি ঈক্ষণ অন্তর্মুখ। অতএব 'অ' হইতে 'ঊ' পর্যন্ত যে ধারা, যাহাকে প্রবৃত্তি-ধারা বলা হয় তাহা শক্তির বহির্মুখ ধারা, কিন্তু ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির পূর্ণতার

সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখ ধারার অবসান হয় এবং ঐ সময় স্বভাবতঃই অন্তর্মুখ ধারার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। প্রবৃত্তির ধারা এবার নিবৃত্তির ধারায় পরিণত হইল। তখন ঐ সকল পৃথক পৃথক অবভাসমান শক্তি বা কলা অন্তর্মুখ স্পন্দনের ফলে একীভূত হইয়া সমষ্টি-ভাবাপন্ন হয়, যাহার নাম দেওয়া হয় বিন্দু। এই বিন্দু যাবতীয় কলার বা শক্তির একীভূত অবস্থার নামান্তর। বিন্দুর অভিব্যক্তি হইলে ইহা স্বভাবতঃই অনুত্তর অথবা 'অ'-কারকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। কারণ 'অ'-কারই চিৎশক্তি বা অনুত্তর। উহাকে আশ্রয় করিয়াই অর্থাৎ উহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া সব কিছু প্রকাশিত হয়।

ইহারই নাম 'অংকার' অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত অনুত্তর। প্রথমে বহিঃস্পন্দনের বেগে যাহা আবির্ভাব হয় তাহা সন্মাত্র বা অব্যক্ত হইতে হইয়া থাকে। তাহার পর যে বহির্মুখ ধারার নির্গম হয় তাহা চিৎ বা 'অ'-কার হইতে হইয়া থাকে। উহার অবসান 'ঔ'-কারে, অর্থাৎ চিৎশক্তি হইতে ক্রিয়াশক্তি পর্যন্ত পঞ্চশক্তির আবির্ভাব সম্পূর্ণ হয়। এইবার চিৎ পঞ্চশক্তিসমন্বিত অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইবার যে সৃষ্টি হইবে তাহা এই 'অং' হইতে, 'অ' হইতে নহে। প্রথম সৃষ্টি ছিল বৈন্দব সৃষ্টি। এইবার ঐ একবিন্দুই বিভক্ত হইয়া নিজেকে দুই বিন্দুতে পরিণত করে। ইহারই নামান্তর বিসর্গ—এখন যে সৃষ্টি হইবে তাহা বিসর্গ হইতে সৃষ্টি। এই বিসর্গ-সৃষ্টি বস্তুতঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি—তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই তত্ত্বসৃষ্টি। 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন তত্ত্বের দ্যোতক। বলা বাহুল্য, এইগুলিও প্রতীক মাত্র। যখন এই তত্ত্বগুলি অভিব্যক্ত হইয়া তত্ত্বসৃষ্টির অবসান হয়, তখন বুঝিতে হইবে 'হ'-কার পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

বৈন্দব সৃষ্টির সময়ে যেমন কলা বা শক্তিগুলি বহির্মুখ বৃত্তির পর অন্তর্মুখ গতিতে বিন্দুরূপ ধারণ করিয়া 'অ'-কারে সংযুক্ত হয়, এই স্থলেও সেইরূপ 'অ'-কার হইতে 'হ'-কার পর্যন্ত সৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করিয়া 'অহং'-ভাবে পর্যবসিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কলাসৃষ্টি ও তত্ত্বসৃষ্টির সমষ্টি দ্বারা 'অহং' ভাবের অভিব্যক্তি হয়। বলা বাহুল্য, ইহাই 'পূর্ণঅহং', কারণ ইহার প্রতিযোগী অন্য অহং আর নাই। সন্মাত্র অবস্থায় অহং নাই, চিদানন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ অবস্থাতেও অহং নাই এবং কলাসৃষ্টি যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে সেখানেও অহং নাই। তত্ত্বসৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পর অর্থাৎ 'অ'-কার হইতে 'হ'-কার পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার পর চিৎ-কলাতত্ত্বের সমষ্টির ফলে অহং-এর প্রথম অভিব্যক্তি। এই 'পূর্ণাহং'-এর অন্তরালে সমস্ত তত্ত্ব রহিয়াছে, সমস্ত শক্তিবর্গ রহিয়াছে অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শক্তিবর্গ এবং পরম অব্যক্ত গূঢ় সত্তাও রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূর্ণাহং পরম শিবাবস্থা, যাহার সঙ্গে অভিন্নভাবে পরমাশক্তি বিরাজ করিতেছে।

উপরে উদ্ধৃত সৃষ্টি-রহস্যের বিষয়টি লইয়া ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একদিন আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাঁর সেই বিশ্লেষণটি স্মৃতিপটে ধারণ করিযা সেইদিন রাত্রেই আমি উহা লিখিযা রাখি। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল—

'পরমপিতা পরমেশ্বর বর্ণনাতীত, মনের অগোচর। অনুভূতির অগম পারে তিনি নিত্য অবস্থান করেন। সেই অবস্থায় একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই একক অদ্বয় অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কারণ, তাহাতে তাঁহাব নিজের পরিচয় জানা হয় না। তাই তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। পরমেশ্বরের এই ইচ্ছার উদগম হইতেই অবরোহ ক্রমে সৃষ্টির ধারা নামিয়া আসিল।

প্রথমে তিনি 'সৎ' হইলেন অর্থাৎ নিজেকে সংকুচিত করিলেন এবং মহাশূন্যের অবতারণা করিলেন। সেই মহাশূন্যে সেই 'সৎ' প্রশান্ত মহাপ্রকাশরূপে ভাসমান হইলেন। ইহা পরব্রহ্মের 'নিষ্কল' অবস্থা। আগমে বলা হয় ইহাই বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'অ'-এর উদ্ভব। অর্থাৎ 'অ' হইল সেই নিষ্কল, নিস্তব্ধ নিশ্চল মহাপ্রকাশরূপী 'সৎ'। তারপর সেই মহাপ্রকাশের মধ্যে 'কলন' বা স্পন্দন আরম্ভ হইল অর্থাৎ অনন্ত প্রকাশসমুদ্রে আলোর তরঙ্গমালা উত্থিত হইল। আলোর রেখার সমষ্টিই কলা। ইহাকেই বলা হয় চিৎ-কলা। ইহা 'সকল-'অ'। আলোর তবঙ্গমালা অর্থাৎ চিৎকলারূপ 'সকল-অ' একবার 'নিষ্কল-অ'-এর বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে প্রসারিত হয়, আবার সঙ্কুচিত হইয়া 'নিষ্কল-অ'-এর বক্ষে ফিরিয়া আসে, যেন সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার খেলা। ইহা 'সকল-অ'এর প্রসারণ-সঙ্কোচন লীলা—নিজেকে নিজের মধ্যে যেন কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না—ইহা 'সকল-অ'এর উচ্ছলন। নৃত্যের বংশ একবাব সম্মুখে প্রসারিত হয়, কিন্তু সম্মুখপানে বিরাট শূন্যতা ছাড়া আর কিছু দেখিতে না পাইয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া 'নিষ্কল-অ'এর বক্ষে ফিরিয়া আসিয়া 'নিষ্কল-অ'কে দেখিয়া আনন্দ পায়—এ যেন কৌতূহলী রমণীর দর্পণে নিজের রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে আনন্দের অনুভব হওয়া। চিৎকলার এরূপ আনন্দের মধ্যে 'আ' বর্ণের উৎপত্তি। এইরূপে উপাধিরহিত পরমপুরুষ পরব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ গুণে বিভূষিত হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হন। এখানে 'আনন্দ' হইলেও আনন্দের আস্বাদন নাই। সাধনার দ্বারা আরোহক্রমে যোগী 'নিষ্কল-সৎ'এর সহিত নিত্য যুক্ত হইয়া এক সত্তায পরিণত হয়। এক সত্তায পরিণত হইলেও যোগীর স্ব-ভাব উত্থিত রসাস্বাদনের ইচ্ছা নিত্য জাগরূক থাকিলে, সেই ইচ্ছার প্রভাবে সেই মিলিত এক সত্তার মধ্যে রস আস্বাদনের ইচ্ছার উদ্গম হয় এবং ইচ্ছার প্রাবল্যে 'নিষ্কল-অ' দুই চিৎকলায় বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ দুই 'সকল-অ'

হইয়া লীলাবিলাসে মগ্ন হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময় আনন্দরস আস্বাদন করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই একই সত্তার দ্বিধা বিভক্ত দুই চিৎকলাকে 'রাধাকৃষ্ণ' নামে অভিহিত করিয়া 'যুগলরূপে'র উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং উভয়ের প্রেম-বিলাসের ক্ষেত্রকে গোলোকের অন্তর্গত 'নিত্য বৃন্দাবন ধাম' নাম দিয়াছেন।

অবরোহ-ক্রমে 'আ' বর্ণের উৎপত্তির পর 'সকল-অ' সরলরেখায় একবার 'নিষ্কল-অ'এর বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অতলান্ত শূন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া 'নিষ্কল-অ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন 'সকল-অ'এর মধ্যে একটা বিরাট অভাব বোধ হয়। তখন উহার মধ্যে ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই ইচ্ছাই হইল 'ই' বর্ণ। এই ইচ্ছা হইতেই যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব হয় এবং ইহা হয় 'সকল-অ' হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া। কারণ 'সকল-অ' চিৎকলাবিশিষ্ট। সুতরাং সৃষ্টির মূলে চিৎকলা উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হইল চিৎকলাবিশিষ্ট 'সকল-অ'এর ইচ্ছা। অতএব চিৎকলাই নিমিত্ত ও উপাদান দুই-ই। যে কোন ইচ্ছাই যখন আবেগে স্পন্দিত হয় তখন 'ঈ'-কার ধারণ করে। ইহার পরে ইচ্ছাই জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়—উহার প্রতীক 'উ'। ইচ্ছার বিষয়ই যখন জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা হয় 'ঊ'। জ্ঞেয় জ্ঞান-সমুদ্রে এক হইয়া ভাসিতে থাকে। পরে ক্রিয়াশক্তির দ্বারা জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং 'ইদং'-রূপে প্রতিভাত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে, ইচ্ছা হইল একটি গোলাপ ফুল পাইতে। অমনি একটি পলকের মধ্যে চিৎকলা হইতে উপাদান আহৃত হইয়া গোলাপ ফুল আকার ধারণ করিল। তান্ত্রিক যোগী যদি সাধনার বলে এই স্তরে উপনীত হইয়া ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়, তবে তিনি ইচ্ছামাত্র মুহূর্তের মধ্যে যে কোন জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় উপদেশ দান কালে প্রায়ই তাঁহার পরম পূজনীয় গুরুদেব শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের ঐরূপ ইচ্ছাশক্তির নানা দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আমাদের বলিতেন যে তাঁহার গুরুদেবের ঐরূপ ঐশীশক্তির দ্বারা মুহূর্তমধ্যে সৃষ্ট নানাবস্তু স্বচক্ষে দর্শন ও স্পর্শ করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে ইহা স্বাতন্ত্র্যময়ী ইচ্ছাশক্তি—বিভূতি নহে। এ যুগের একজন অসাধারণ জ্ঞানী সাধক ও যোগী পুরুষ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যাহা বলিতেছিলাম, ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্ট বস্তু প্রথমে অস্ফুট, পরে স্ফুট, স্ফুটতর, স্ফুটতম হইতে হইতে এ, ঐ, ও, ঔ বর্ণমালা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঋ ও ঌ বর্ণ দুইটি সৃষ্টির মধ্যে গণ্য হয় না। 'অ' হইতে 'ঊ' পর্যন্ত

চিৎকলা প্রসারিত হইয়া আবার 'অ'-তে ফিরিয়া আসে। এইরূপে অ হইতে ঔ পর্যন্ত প্রসারিত চিৎকলার সমষ্টি 'বিন্দু'তে পরিণত হইয়া হয় 'অং'। এইবার বিন্দু হইতে বৈন্দব জগতের আরম্ভ হয়। 'সকল-অ' হইতে ঔ পর্যন্ত প্রসারণ ছিল 'কলা'র জগৎ। কলা হইতে তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তত্ত্ব দুই প্রকার—শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব। উভয় তত্ত্বের সংযোগে বিন্দু হইতে বৈন্দব জগতের প্রসারণ হয়। এই প্রসারণ হয় 'ক'-বর্ণ হইতে 'হ'-বর্ণ পর্যন্ত। পুনরায় 'হ' হইতে 'ক'-এ বিন্দুর সংকোচন। বিন্দুর এই সংকোচন রূপটি 'কলা'র সহিত যুক্ত হইয়া হয় 'অহং'। ইহা শুদ্ধ অহং-জ্ঞান এবং ইহা শক্তি-সমন্বিত অহন্তা-বোধ। আরোহক্রমে যোগীর মধ্যে শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া এই বিশুদ্ধ 'অহং'-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ 'শিবোহহং' বোধ হয়। ইহাকেই বলা হয় আত্মায়, অনাত্মবোধ বিনষ্ট হইয়া আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত হওয়া অর্থাৎ পশু-আত্মার আণবমল দূরীভূত হইয়া শিবত্বের উদ্বোধন হওয়া। তখন সেই শিবত্বপ্রাপ্ত যোগী দেখিতে পায় সমগ্র বিশ্বই তাঁহাব শরীর। তিনিই সবকিছু হইয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তপন্থী অবিমিশ্র জ্ঞান-তপস্বীর মধ্যে শক্তির বিকাশ হয় না বলিয়া সমগ্র বিশ্ব এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই অনাত্ম বা ইদং বলিয়া মনে হয় এবং মরীচিকার ন্যায় ভ্রম উৎপাদনকারী মায়ার উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া মহাপ্রকাশরূপ ব্রহ্মের মধ্যে আত্মসত্তা হারাইয়া বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃত আত্মস্বরূপের বা বিশুদ্ধ অহন্তার পরিচয় এরূপ জ্ঞানবাদীর হয় না।

চিৎকলার সহিত তত্ত্বের যোগ আছে বলিয়াই তত্ত্ব ও কলার সংযোগে 'ভুবনে'র সৃষ্টি হয়। এই ভুবন 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত বিস্তৃত। যেহেতু কলার আরম্ভ 'অ' হইতে এবং উহা 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত অনুস্যূত থাকে, সেইহেতু 'অ' দিয়া বর্ণমালার আরম্ভ হয এবং উহা সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে। যেমন ক-এর উচ্চারণ ক্+অ, খ=খ্+অ, গ=গ্+অ ইত্যাদি।

শক্তির প্রসারণই ভুবন। এই শক্তি মহামায়া বা শুদ্ধ বিদ্যা। ভুবন যেন একটা বিরাট ভাণ্ডার। ধরা যাক্ ইহা যেন একটি কেন্দ্রীয ভাণ্ডার। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে বস্তু সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন দোকানদার যেমন বিভিন্ন স্থানে দোকান সাজাইয়া বসে, সেইরূপ ভুবনরূপ কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হন ব্রহ্মা। আমাদের এই পৃথিবী ঐরূপ একটি ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং আমরা উহার অন্তর্গত নগণ্য মানুষ। তথাপি ভগবানের এমনি কৃপা যে এই নগণ্য মানুষই সাধনবলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিযা শ্রীভগবানের চরণকমলে শরণাপন্ন

হইলে তিনি সেই যোগীভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া আপন করিয়া নেন। আবার যোগীভক্তের মধ্যে যদি ভগবানের মাধুর্যরস আস্বাদনের প্রবণতা থাকে তবে ভগবান লীলাবিলাসের দ্বারা তাহাকে তাঁহার বিশিষ্ট স্বভাব অনুসারে মাধুর্যসুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। এই অধিকার ভগবান একমাত্র মানুষকেই দিয়াছেন, আর কাহাকেও দেন নাই, এমন কি দেবতাদেরও না। দেবতারা তাঁহার ঐশ্বর্যের ভোক্তা, তাঁহার রাজদরবারে তাহাদের আসন দিয়াছেন; কিন্তু মানুষকে তিনি তাঁহার অন্দরমহলে স্থান দিয়াছেন। সেখানে মানুষ তাঁহার অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাষায় জীবজীবনের চরম সার্থকতারূপ পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করে। এতখানি অধিকার তিনি মানুষকেই দিয়াছেন, সেইজন্য তিনি নরবপু ধারণ করিয়া মানুষের সাথে তাঁহার সর্বোত্তম লীলা—নরলীলার অনুষ্ঠান করেন। মানুষেব এই সর্বোত্তম সহজ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সহজ-সাধক চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

শুন রে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

সৃষ্টির যেমন একটি সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, তেমনি একটি স্থূল অবস্থাও আছে। আমরা যে অনন্ত ভুবনরাজিকে বা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া থাকি—অহংভাব হইতে ইদংভাবের উদয় না হওয়া পর্যন্ত তাহা পাওয়া যায় না। যখন এই পূর্ণাহং হইতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ ইদংভাবের প্রথম বিকাশ হয় তখনই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই ইদংভাবের আবির্ভাবের পূর্বে এক অহং-ই অনন্ত অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা ঘটিয়া থাকে। ইহার পর ইদংভাবের স্ফুরণ হইলে সর্বপ্রথম সর্বশূন্যরূপ পরমাকাশের আবির্ভাব হয় এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত অহং দ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা ইদং সৃষ্টি। কিন্তু ইহা মহাসমষ্টিরূপ। এখনও কালের আবির্ভাব হয় নাই। কালের পূর্বাভাস মহাকালের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই সৃষ্টিতেও প্রকৃত ক্রম নাই। একটা আন্তরক্রম আছে বটে—তাহা বস্তুতঃ ক্রম নহে; সুতরাং তখন অতীত অনাগত ও বর্তমান এই তিনকালের ক্রিয়া থাকে না, প্রচলিত কার্যকারণ ভাবও থাকে না। অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে বটে, কিন্তু সকল সত্তার মধ্যেই সকল সত্তা অনুস্যূত থাকে। দেশগত ভেদও থাকে না, অথচ একটা ভেদের প্রতীতি প্রতিভাসমান হয় মাত্র। ইহার পর এই মহাসৃষ্টি হইতে খণ্ডসৃষ্টির আবির্ভাব হয়। সেইগুলি ঐশ্বরিক সৃষ্টি—তাহাতে কালগত, দেশগত, স্বরূপগত

অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। মহাসমষ্টি সৃষ্টি এই সমষ্টি সৃষ্টি হইতে পৃথক। মহাসমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টি সৃষ্টির ন্যায় কর্ম-জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয় প্রভৃতির ব্যাপার নাই।'

পাতঞ্জল যোগদর্শনে অবস্থা-পরিণাম, ধর্ম-পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ক্রিয়ার আরম্ভ যে অনাগত কালের মধ্যে সাধিত হইতে দৃষ্ট হয়, তাহা লক্ষণ পরিণাম। অনাগত কালের মধ্যে যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই, অথচ আরম্ভ হইবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু লক্ষণ-পরিণামে তাহা দৃষ্ট নয় অর্থাৎ অনাগত কালেরও যাহা পূর্বাবস্থা তাহাকে বলে ধর্ম-পরিণাম। ধর্মপরিণামেও যাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই অথচ হইবার অপেক্ষায় আছে অর্থাৎ ধর্মপরিণামেও যাহা দৃষ্ট নহে, কিন্তু ফলিবার জন্য যে-কালের মধ্যে তাহা উন্মুখ হইয়া আছে, তাহা অবস্থা পরিণাম। পাতঞ্জল দর্শনে এইখানেই সমাপ্তির রেখা টানা হইয়াছে। ইহা প্রকৃতি রাজ্যের অর্থাৎ সমষ্টি ও খণ্ড সৃষ্টির অন্তর্গত। কিন্তু আগম ইহারও ঊর্দ্ধে 'তত্ত্ব' ও আরও ঊর্দ্ধে 'কলা'র সন্ধান দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের লিখিত 'যোগমার্গে ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টিরহস্য' প্রবন্ধটি নিম্নে যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পূর্ববর্তী প্রবন্ধটির উপলব্ধিতে সহায়ক হইবে।

"যোগমার্গে চলনশীল যোগীর অধ্যাত্মজীবনে ইচ্ছাশক্তির স্থান অতি উচ্চ। নিজের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি-প্রপঞ্চ শক্তিপঞ্চকের অন্তর্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পাঁচটি শক্তি অনন্ত শক্তির প্রতীক হইলেও সামরস্য-ভূমিতে একাকার। কিন্তু তথাপি আন্তর ও বাহ্য বিভাগ ক্রমে কোনও কোনটি অন্তরঙ্গ, কোনও কোনটি বহিরঙ্গরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। বহিরঙ্গ শক্তি তিনটি। ইহারা ত্রিকোণাকারে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয় এবং অন্তরঙ্গা শক্তি দুটি চিৎ ও আনন্দারূপে স্বরূপশক্তি নামে সর্বত্র পরিচিত।

স্বরূপটি হইল সত্য, সুতরাং সৎ। সত্যস্বরূপের আন্তরঙ্গা শক্তি হইল চিৎ ও আনন্দ অথবা সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী। বহিরঙ্গা শক্তির নাম ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া।

আত্মার স্বরূপটি ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। (১) আত্মা শিবরূপী, কারণ ইহা চিদ্রূপ অর্থাৎ চিৎ ও আনন্দ ইহাতে সর্বদা স্ফুরিত থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাতে ইচ্ছার প্রসার কখনই নিরুদ্ধ হয় না। এতদ্‌ব্যতীত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির প্রসরণও ইহার স্বাভাবিক। আত্মার পরাবস্থা, পরাপরাবস্থা ও অপরাবস্থা ভেদে তিনটি অবস্থার কল্পিতরূপ আছে। পরাবস্থায় আত্মা অখণ্ড, একরস। পরাপরাবস্থায় আত্মা

চিদানন্দস্বরূপ। অপরাবস্থায় ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার ব্যাপার অনুভূত হয়। পরাবস্থাতেই পূর্ণাহন্তার প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

আত্মার স্বরূপশক্তির মধ্যে যদিও কোনও প্রকার বিভাগ করা চলে না, তথাপি চিৎ-কে আন্তর ও আনন্দকে বাহ্য বলা কোনও কোনও দৃষ্টিতে সম্ভবপর হয়। এই দৃষ্টি অনুসারে চিৎ-এরই প্রসর আনন্দ। কারণ মূল চিৎশক্তির স্ফুরণ না থাকিলে আনন্দের স্ফুরণ হইতে পারে না। কিন্তু আনন্দের স্ফুরণ না থাকিলেও চিৎস্ফূর্ত্তি অনিবার্য।

তদ্রূপ মূলে আনন্দ না থাকিলে, ইচ্ছার উদয় ঘটিতেই পারে না। কারণ আনন্দের ক্ষোভ হইতেই ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। যেখানে আনন্দ ক্ষুব্ধ নহে, সেখানে কোনও প্রকারে ইচ্ছা প্রকট হইতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইচ্ছা না থাকিলেও আনন্দ থাকিতে পারে। তবে ইচ্ছার নিবৃত্তিরূপ আনন্দ হইতে, ইচ্ছার অনুদয়রূপ আনন্দের বৈলক্ষণ্য আছে। ইচ্ছার উন্মেষ হইলেই সৃষ্টির উদয় হয় অর্থাৎ বিশ্বের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহা কাহার ইচছা? বস্তুতঃ ইহা আত্মারই ইচ্ছা। ইচ্ছার দুইটি রূপ আছে—সামান্য ও বিশেষ। 'সামান্য ইচ্ছা' নির্বিষয়ক ইচ্ছার নামান্তর। ইহা ইচ্ছা হইলেও, পদার্থবিশেষের ইচ্ছা নহে। এক দৃষ্টিতে ইহাকে অহমিকা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। 'সামান্য ইচ্ছা'র উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার দৃষ্টি বহির্মুখী হয়। আনন্দ দশাতে দৃষ্টি অন্তর্মুখী থাকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিবিষ্ট থাকে। দৃষ্টি বহির্মুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সম্মুখে একটি নির্বিশেষ সামান্যরূপ সত্তা ভাসিয়া উঠে। ইহাকে চিদাকাশ বা চিদব্যোম্ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা চিদাকাশও নহে! ইহা আনন্দেরও প্রাক্তন অবস্থার অভিব্যক্তি মাত্র। বস্তুতঃ চিৎ অবস্থাতে আকাশ আছে, আনন্দাবস্থাতেও আকাশ আছে এবং ইচ্ছা অবস্থাতেও থাকে। কিন্তু তিনটিতে পার্থক্য আছে। এই বাহ্য সত্তারূপ আকাশ ব্যাপক সত্তা বটে, ইচ্ছার বিষয়রূপ অর্থ ঐ ব্যাপক সত্তাতে গুপ্তভাবে বিলীন থাকে। ইচ্ছার বিশেষ স্ফুরণে উহা বাহ্য অর্থরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাকেই সৃষ্টি বলে। আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিঃ"। ইহা খুবই সত্য কথা।

সৃষ্টি বলিতে কি বুঝায়? বিন্দু হইতে বিসর্গই সৃষ্টি এবং বিসর্গ হইতে বিন্দুই সংহার। প্রকারান্তরে বলা যায়, অর্থের আবির্ভাবই সৃষ্টি (অর্থ বলিতে পদার্থ বুঝিতে হইবে)। অর্থসমষ্টি বিশ্ব; চিদাত্মস্বরূপে এই অর্থ অর্থাৎ বিশ্ব চিদাত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে বর্তমান আছে। অর্থ অনন্ত—সবই চিদাত্মার

অন্তঃস্থিত। কিন্তু যখন তিনি ইচ্ছা করেন অথবা তাঁহাতে ইচ্ছার উদয় হয়, তখন এই অন্তঃস্থিত অর্থ বাহিরে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম সৃষ্টি।

অর্থের বহিঃপ্রকাশের ন্যায়, অর্থের একটা অন্তঃপ্রকাশও আছে এবং অন্তঃপ্রকাশেরও ঊর্ধ্বে উহার যে স্থিতি তাহাই অর্থের চিদাত্মরূপে অবস্থান। ঐ অবস্থায় অর্থ শক্তিরূপে আত্মাতে অবস্থিত থাকে।

অর্থের বহিঃপ্রকাশকে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অর্থের অন্তঃপ্রকাশও সৃষ্টিরই আদি পর্বের অন্তর্গত। যোগীগণ এই প্রকাশকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্তঃসৃষ্টি জ্ঞানের খেলা, বাহ্যসৃষ্টি ক্রিয়ার খেলা। উভয়ের মূলে আছে ইচ্ছার উদয়। ইচ্ছাকে সৃষ্টির বীজ বলা যাইতে পারে। ইচ্ছার অতীত অবস্থা আনন্দ। সেখানে ইচ্ছারূপ বীজ নাই। আনন্দ ক্ষুব্ধ হইলে ইচ্ছার উদয় হয়। পক্ষান্তরে ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। তাই চরমদৃষ্টিতে আনন্দই সৃষ্টির মূল। শ্রুতি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে"। ইচ্ছাভূমিতে যে বীজসত্তার কথা বলিলাম, আনন্দ অবস্থায় ইহা নিরবয়ব। আনন্দ অবস্থায় ইহা নির্বীজও বটে। ইচ্ছা অবস্থায় ইহাই বীজরূপীভাব। জ্ঞানের ভূমিতে ইহার অন্তঃপ্রকাশ হয (Ideal Projection), তখন জ্ঞান হয় সাকার। কিন্তু জ্ঞান হইতে পৃথক জ্ঞেয় থাকে না। জ্ঞানই একাধারে জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়েই। অর্থাৎ সাকার জ্ঞান নিজেই নিজের জ্ঞেয়। বিষয়টি স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য একটি গোলাপফুলের দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতেছে। বীজ অবস্থায় ইচ্ছাভূমিতে এই গোলাপটি ভাবমাত্র। ইহার আকার তখন অব্যক্ত। জ্ঞানভূমিতে এই আকারটি অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ ভাসিয়া উঠে, তবে নিজের কাছে মাত্র। তখন ইহার কোনও objective reality বা ইহার বাহ্য সত্তা নাই। ধ্যানজদর্শন এই জাতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। এই জ্ঞানময় আকারের প্রাকট্যই পূর্ব বর্ণিত অর্থের অন্তঃপ্রকাশ। অন্তঃপ্রকাশ বা জ্ঞানাকারে যে প্রকাশ, তাহা যেমন ইচ্ছার প্রাথমিক ফল, তেমনই ভৌতিকরূপে যে বাহ্যপ্রকাশ তাহাও উহারই অন্তিমফল।

এই যে সাকার জ্ঞানরূপী (Idea) অর্থের প্রকাশ, ইহাকে যোগীর সৃষ্টি বলা হয় না। জ্ঞানভূমির সৃষ্টি প্রাতিভাসিক, কিন্তু ক্রিয়াভূমির সৃষ্টি ব্যবহারিক। অবশ্য ঐ জ্ঞানাকারা সৃষ্টিই পরে বাহ্য অর্থ আকারে প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, জাগতিক সৃষ্টি ব্যাপারে আমরা নিমিত্ত ও উপাদানের কার্যকারিতা দেখিতে পাই। ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিতেও পূর্ণাবস্থায় এই দুইটিই আবশ্যক হয়। কারণ, তাহা না হইলে, বাহ্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। তবে যে বলা হয়,

"যোগী বা নিরুপাদানং অর্থজাতং প্রকাশয়েৎ"—তাহার তাৎপর্য এই যে, শাক্তযোগী পরতত্ত্বে বিশ্রান্ত ও অদ্বয়ভূমিতে নিবিষ্ট বলিয়া বাহ্য সৃষ্টিকালেও নিজসত্তা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া লন, বাহ্যপ্রকৃতি হইতে নহে। (ইহাই যোগীর সৃষ্টি)

শঙ্কা হইতে পারে, তবে কি বাহ্য প্রকৃতি হইতেও উপাদান গ্রহণ করা যায়? ইহার উত্তর এই, অবশ্যই গ্রহণ করা যায়। তবে ঐ সৃষ্টি ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি বা যোগীর সৃষ্টিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। আমার শ্রীগুরুদেব উহাকে বিজ্ঞানসৃষ্টি বলিতেন। প্রকৃতিবশী যোগী প্রকৃতি হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া অর্থ সৃষ্টি করেন—অবশ্য নিজের ইচ্ছাপ্রভাবে। ইহা ঈশ্বরিক সৃষ্টি বটে কিন্তু এখানে নিমিত্ত ও উপাদান পরস্পর পৃথক। নিমিত্তটি হইল ঐশী ইচ্ছা এবং উপাদান হইল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। যেখানে আত্মা হইতে প্রকৃতির পৃথক সত্তা থাকে না, একই অভিন্ন-সত্তা থাকে, সেখানে নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদ থাকে না। চিদাত্মার স্বরূপ হইতে ইচ্ছারূপা শক্তি যেমন অভিন্না, তেমনই অপেক্ষিত উপাদানও অভিন্ন। অবশ্য ইহা পরমযোগীর অবস্থা। পরমযোগী যদি ফুল সৃষ্টি করেন, তবে ঐ ফুল তাঁহার দৃষ্টিতে স্বরূপ হইতে অভিন্ন। বিজ্ঞানবিৎ সিদ্ধপুরুষ যদি ফুল সৃষ্টি করেন তবে উহা তাঁহার দৃষ্টিতে স্বরূপ হইতে পৃথক! ইচ্ছাপ্রভাবে ক্রিয়ার আশ্রয়ে, প্রকৃতির একটি পরিণাম মাত্র। পূর্ব বর্ণিত দৃষ্টি অনুসারে, ঐ ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি নহে এবং ক্রিয়াও ক্রিয়াশক্তি নহে।

বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। জ্ঞানভূমিতে যে ফুল, তাহা জ্ঞানাকার স্বয়ংবেদ্য; বাহ্য অর্থরূপ ভৌতিক সত্তা নহে। উহা জ্ঞানময় ফুল। আকারটা যেন জ্ঞানেরই। জ্ঞানের বহির্দেশেই অজ্ঞান। যখন ঐ ফুলটিকে জ্ঞান হইতে স্খলিত করিয়া অজ্ঞান ভূমিতে প্রক্ষেপ করা যায়, তখন উহা ক্রিয়ারূপী মায়া রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভৌতিক আকার ধারণ করে। অর্থাৎ তখন উহা বাহ্য অর্থরূপে প্রকাশিত হয়। পঞ্চীকরণের ক্রিয়া স্বভাব হইতে ঘটিয়া যায়। তখন ঐ ভৌতিক সত্ত্বার উপাদান, ঐ জ্ঞানময় সত্তা, নিজেই আকর্ষণ করিয়া স্থূল রূপে পরিণত হয়। গর্ভাধানের পরে মাতৃগর্ভে পতিত পিতৃবিন্দু যেমন মাতৃবিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বিশিষ্ট ভৌতিক আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা কতকটা সেই প্রকারের অবস্থা। বস্তুতঃ ইহা যোনিতত্ত্বের রহস্য। মায়ারই নামান্তর যোনি। জ্ঞানরূপ ফুলটিতে ক্রিয়া অথবা মায়ারূপ যোনিতে প্রক্ষেপ করিতে পারিলে, স্বভাবতঃই ঐ জ্ঞানের আকারটি ভৌতিক আকারে পরিণত হয়। বেদান্ত সূত্রে আছে, "যোনেঃ শরীরম্"—উহার এই তাৎপর্য।

ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি অর্থাৎ যোগীর সৃষ্টি ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি—এই দুটির মধ্যে

একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানের সৃষ্টি বলিতে ইহাই বুঝায় যে, ঈশিত্ব বা প্রকৃতিবশিত্ব-সম্পন্ন যোগীর ইচ্ছাতে প্রকৃতিরূপ উপাদানকে ক্রিয়া কৌশল দ্বারা ইচ্ছারূপে পরিণত করা। বিজ্ঞানবিৎ সিদ্ধ-মহাত্মা অদ্বৈত যোগী ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন নাও হইতে পারেন। তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যোগী পুরুষ বিজ্ঞানবিৎ নাও হইতে পারেন। এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অবশ্য হইতেও পারেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে মনে রাখিতে হইবে, এই উভয় প্রক্রিয়াতে পার্থক্য আছে। যোগীর সৃষ্টিতে বাহ্য উপাদান অপেক্ষিত হয়। চিদাত্মা স্বয়ংই অহং হইয়াও নিজেকে ইদংরূপে প্রকট করেন। সেজন্য তাঁহাকে প্রকৃতি বা বাহ্যসত্তা হইতে উপাদান গ্রহণ কবিতে হয় না। আত্মসত্তাই স্বাতন্ত্র্যমূলক সঙ্কোচ পরিগ্রহ পূর্বক বাহ্য সত্তারূপে স্ফুরিত হইয়া উপাদানের কার্য কবিয়া থাকে। যোগীব সৃষ্টিতে অহংরূপী আত্মাই অহং থাকিযাও ইদংরূপে ফুলের আকার ধারণ করেন।

ইহা শুধু জ্ঞানের ভূমিতে নহে, অথবা মনোগ্রাহ্য অন্তব আভাস মাত্র নহে; কিন্তু ক্রিযার ভূমিতে ইহা ইন্দ্রিয গ্রাহ্য, বাহ্যসৃষ্টিরূপেও প্রকাশ পায় যাহা সকলে স্ব স্ব ইন্দ্রিয দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হয। প্রকারান্তরে তাহা প্রতিভাসিক সত্তামাত্র না হইয়া ইন্দ্রিয়গোচর ব্যবহারযোগ্য ত্রিকালস্থায়ী বাহ্য অর্থরূপে সৃষ্টি হয। ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিতে জ্ঞানভূমিতে যে পুষ্পের প্রকাশ হয়, তাহা পুষ্পাকার হইলেও জ্ঞানময, আন্তর, উহা তখন ভৌতিক বা বাহ্য নহে। এই জ্ঞানাকার পুষ্প বস্তুতঃ জ্ঞাতা যোগীব জ্ঞানাত্মক স্ব-সত্তারই পুষ্পরূপে স্ফুরণ, যাহা শুধু নিজের মনোগ্রাহ্য অথবা বশীকৃত পরকীয় মনের গ্রাহ্য (যেমন—Hypnotism এ হয়)। এই জ্ঞানাকার পুষ্প বস্তুতঃ যোগীর অহং-এরই আকার মাত্র, সাকার জ্ঞান বিশেষ। স্মরণ বাখিতে হইবে, সাকার হইলেও নিরবয়ব, কতকটা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুষ্প যেমন পুষ্পাকার হইলেও আলোক মাত্র। আবার আলোক হইলেও পুষ্পের আকাব বিশিষ্ট পুষ্প। অহং হইযাও ইদংরূপে ভাসমান হয়। যোগী এস্থলে দেহভিমানী নহেন তাহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু ঐ যোগী যখন জ্ঞানভূমি হইতে অবতরণ কবিযা ক্রিয়া ভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন ঐ আভাসরূপী পুষ্পটি বাহ্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহাব জগতের পুষ্পরূপে পরিণত হয। ইহাই মায়িক সৃষ্টি।

ইচ্ছাতে যাহা অহং ছিল, জ্ঞানে যাহা অহং হইয়াও ইদং ছিল, এখন তাহা অহং হইতে অর্থাৎ যোগীর দেহরূপ অহং হইতে পৃথক হইয়া, তদ্ভিন্ন পুষ্প নামক পদার্থরূপে প্রকট হয়। ইহাই মায়িক সৃষ্টি। ইচ্ছাতে অভেদ, জ্ঞানে ভেদাভেদ এবং ক্রিয়াতে ভেদ—ইহাই বৈশিষ্ট্য। আমি ফুল চাই, এই

ইচ্ছা যোগীর নিজসত্তা বীজভূত পুষ্পাত্মক। তারপর জ্ঞানভূমিতে ঐ বীজ বা বীজাত্মক পুষ্পটি জ্ঞানের আকারে ফুটিয়া উঠে। সেখানে নিজেই জ্ঞাতা, নিজেই জ্ঞান—এই প্রকার ভাব। ইচ্ছাযুক্ত যোগী—জ্ঞাতারূপে আছেন ও নিজ জ্ঞানরূপ পুষ্পরূপে আছেন, নিজেই যেন নিজেকে পুষ্পরূপে দেখিতেছেন। কতকটা এই প্রকারের ভাব। তারপর ঐ পুষ্পরূপী নিজেকে নিজ হইতে বেগের সহিত বাহিরে নিক্ষেপ করা হয়। তখন ঐ জ্ঞানরূপী পুষ্প প্রক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া বাহ্যপদার্থরূপে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানাকার আন্তর সত্তা যখনই জ্ঞানের বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয়, তখনই কি প্রয়োজনানুসারে ভৌতিক উপাদান আকর্ষণ করিয়া স্থূলত্ব গ্রহণ করে? ইহার মধ্যেও ক্রম আছে, গভীর রহস্যও আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গর্ভাধান ফলে পিতৃবীর্য মাতৃগর্ভে নিষিক্ত হয়। এই নিষেকের পর, প্রসবের সময় পর্যন্ত, গর্ভোদকে দেহরচিত হইতে থাকে। প্রসব হইলেই ঠিক ঠিক বাহ্যভাবের উদয় হয় বলা চলে। ক্রিয়াশক্তির মধ্যে অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর ও স্ফুটতম—এই চারিটি অবস্থা আছে। তদনুসারে প্রথম তিনটি অবস্থা যদিও বাহ্য দশারূপে পরিগণিত, তথাপি ঐগুলি ঠিক বাহ্যদশা নহে। ঐ গুলির কোনটিই প্রসবের তুল্য বলা যায় না। চতুর্থ অবস্থাটি স্ফুটতম অবস্থা—তাহাই প্রসব বলা চলে। ঐ অবস্থাটি সকলের ইন্দ্রিয়গোচর। পূর্বের অবস্থাগুলি বাহ্য হইলেও সকলের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অত্যন্ত রহস্যময় বিজ্ঞান।”

সৃষ্টি প্রণালীতে কলা, নাদ ও বিন্দুর ভূমিকা

তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কলা, নাদ ও বিন্দু এই তিনটি শব্দের সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকে। কুণ্ডলিনী জাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল নাদের স্ফুরণ। নাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে বিন্দু ও কলাতত্ত্ব। জগতের সৃষ্টি-প্রণালীর বিবরণ-প্রসঙ্গে সারদাতিলকে লিখিত হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীৎ শক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ।। ইত্যাদি

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে 'স-কল' পরমেশ্বর হইতেই সৃষ্টির বিকাশ হইয়া থাকে। 'স-কল' বলিতে কলাসহিত বুঝায়। 'কলা' শব্দের অর্থ শক্তি। পরমেশ্বর একদিকে নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত এবং অন্যদিকে স-কল অর্থাৎ অখণ্ড কলা-সম্পন্ন। তাঁহার এই 'স-কল' অবস্থা হইতেই সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়। এই 'স-কল' পরমেশ্বর অবস্থা হইতে অবতরণক্রমে শক্তি-তত্ত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। 'স-কল' পরমেশ্বরে যে সমস্ত শক্তি একাত্মকভাবে কলারূপে তাঁহার অঙ্গীভূত ছিল, সেই সমস্ত শক্তিরই সমষ্টিনাম শক্তিতত্ত্ব। শক্তি হইতে পরনাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং পরনাদ হইতে পরবিন্দু প্রকটিত হয়। পরনাদ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করে। যেমন বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার পরনাদ ঘনীভূত হইয়া আদি সৃষ্টি বা পরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। পরনাদ বর্ণাত্মক নহে। বর্ণের অভিব্যক্তি আরও পরবর্তী।

উপর্যুক্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে শক্তি, নাদ ও বিন্দু, ইহাই ক্রম। শক্তির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং নিষ্ক্রিয়াবস্থা কলা। শক্তি স্বরূপনিষ্ঠ ক্রিয়া দ্বারা কার্যোন্মুখ হইয়া নাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই যে নাদের কথা বলা হইল ইহা ব্যাপক নাদ। যখন এই ব্যাপক নাদসত্তা বিন্দুরূপে স্থূলভাব গ্রহণ করে, তখন সৃষ্টির প্রাথমিক ক্রম পরিসমাপ্ত হয়। সৃষ্টির পরবর্তী ক্রম ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে আত্মপ্রকাশ করে।

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) আছে যে সৃষ্টির আদিতে শক্তির আবির্ভাব তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তির ন্যায়। ঐ সময়ে পরাশক্তি অব্যক্তাবস্থায়

শিবতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন শিবের ইচ্ছার উন্মেষ হয় তখন উহার প্রভাবে ঐ শক্তি শিব হইতে পৃথগ্‌বৎ স্ফুরিত হয়—

শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব॥

পরমেশ্বরের স্বরূপে যে অনন্ত কলা বিদ্যমান থাকে তাহা চিদাত্মক বলিয়া পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে অভিন্ন। সুতরাং ঐ কলা চিৎকলারই নামান্তর। এইজন্য পরমেশ্বরের 'স-কল' অবস্থা চৈতন্য-শক্তিবিশিষ্ট চিৎ-স্বরূপকে বুঝায়। বস্তুতঃ এই অবস্থা শিবেরই অবস্থা—ইহাই পূর্ণত্ব। যখন নবীন সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানের ঈক্ষণশক্তি স্বকার্য সাধনের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন ঐ চিৎকলা 'শক্তি' নাম ধারণ করিয়া স্বরূপ হইতে পৃথক না হইলেও পৃথগ্‌বৎ অবস্থা লাভ করে। পূর্বোক্ত সৃষ্টি ক্রমের মধ্যে শক্তির আবির্ভাবের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। শক্তি ইচ্ছারূপা। ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে একটি তীব্র অভাববোধ জাগিয়া উঠে। অভাব না থাকিলে ইচ্ছার উদয় হয় না। যাহা নাই তাহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে ইচ্ছা তাহাই অভাব-বোধের নামান্তর। এই অভাবটিই বস্তুতঃ মহাশূন্য। ইচ্ছার অভাব-বোধের প্রভাবে মহাশূন্যের আবির্ভাব হয়। মহাশূন্য আকাশেরই নামান্তর। পূর্ণাবস্থায় আত্মা পরিপূর্ণ অহংভাবে বিশ্রান্ত থাকে। কিন্তু এই সময় অর্থাৎ মহাশূন্যের আবির্ভাবের সময় পূর্ণ অহংভাব থাকে না। তাহা খণ্ডিত হইয়া একদিকে পরিচ্ছিন্ন 'অহং' ও অপরদিকে উহার প্রতিযোগী 'ইদং' ভাসিয়া উঠে। অহংটি দ্রষ্টা এবং ইদংটি দৃশ্য। দ্রষ্টার সম্মুখে দৃশ্যরূপে মহাশূন্যের আবির্ভাব হওয়াই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার বিষয়রূপী অব্যক্ত-বিশ্বও জাগ্রত হইবার উপক্রম করে। বিশ্বের আধার মহাশূন্য। সুতরাং বিশ্ব আবির্ভূত হইবার পূর্বে উহার আধাররূপী মহাশূন্য আবির্ভূত হয়। দ্রষ্টার লক্ষ্য দৃশ্যরূপী মহাশূন্যের উপর পতিত হইলে সেই মহাশূন্য হইতে একটি অব্যক্ত নাদধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। এই নাদ, আদিনাদ অথবা পরনাদরূপে প্রসিদ্ধ। ইহার বিকাশ আর চৈতন্যের আত্মস্ফুরণ একই কথা। পরনাদের স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরও বিকাশ হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এই নাদ এবং জ্যোতিঃ একই মহাসত্যের দুইটি অবতরণশীল অবস্থা মাত্র। অর্থাৎ এই নাদ ও জ্যোতিঃ একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্। যে ব্যাপক রশ্মিমালা এই নাদ-জ্যোতিঃ-স্বরূপে মহাশূন্যে প্রকাশ পায়, তাহার ঘনীভূত অবস্থাই পরবিন্দু। এইরূপে পরনাদ ঘনীভূত হইয়া সাম্যাবস্থায় পরবিন্দুরূপে প্রকাশিত হয়। তখন শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি আঘাতের দ্বারা পরবিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া থাকে। ঐ সময় পরবিন্দুর ক্ষোভের ফলস্বরূপ উহা হইতে বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটি অবস্থার উদ্রেক হয়। এই বিন্দু, অপরবিন্দু এবং এই নাদ, অপরনাদ।

শিব-শক্তিময় বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে বিশ্বরচনা হইয়া থাকে। বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ—এই চারিটি স্তর আছে। সৃষ্টির সময় এইগুলি পর পর আবির্ভূত হয় অর্থাৎ সর্বপ্রথম মহাকারণ স্তর প্রকটিত হয় এবং তাহার পর ঐ মহাকারণ সত্তা হইতে কারণ সত্তা আবির্ভূত হয়। উত্তরোত্তর স্থূলতার দিকে গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরম অবস্থা পর্যন্ত অভিব্যক্ত হইলে সৃষ্টির ধারা নিবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যখন মহাসুষুপ্তির পর ইচ্ছাশক্তির প্রথম উন্মেষ হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই মহাশূন্যই সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীর গাত্রে যেমন চিত্র অঙ্কিত হয় তেমনি মহাশূন্যকে অবলম্বন করিয়া জগতের বিরাট চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইজন্য মহাকারণ শরীর আবির্ভূত হইবার পূর্বে মহাশূন্যের আবির্ভাব অপরিহার্য। এই মহাশূন্যই মহামায়াস্বরূপা। যতক্ষণ মহাশূন্য ভেদ না হয়, ততক্ষণ যোগীর যথার্থ বিবেকজ্ঞান হয় না। মহাশূন্য ভেদ হওয়ার অর্থ, মহামায়া অতিক্রম করিয়া চৈতন্যময় শিবশক্তির চরণতলে পৌঁছান।

মহাশূন্য আবির্ভূত হওয়ার পর যখন দ্রষ্টা দৃক্‌শক্তির দ্বারা তাহাকে অনুবিদ্ধ করিতে থাকে তখন নাদ ও জ্যোতির স্পন্দন সেই মহাশূন্য সাগরে তরঙ্গাকারে আন্দোলিত হইতে থাকে। এই জ্যোতির্ময় নাদ অথবা নাদাত্মক জ্যোতিঃ যে ভূমি হইতে স্ফুরিত হইয়া দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তাহাই বিসর্গমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। নরদেহে ইহা ব্রহ্মরন্ধ্রেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইচ্ছাশক্তি বিসর্গরূপা বলিয়া তাহার মণ্ডলটি বিসর্গমণ্ডল নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিরচনার মূল সূত্রগুলি এইখান হইতেই উপলব্ধ হয়। পরনাদ ও পরবিন্দুরূপ ক্রমবদ্ধ যে দুইটি অবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বিশ্বসৃষ্টির গোড়ার বস্তু। ইহাকে জগৎরূপী বৃক্ষের অঙ্কুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ ইহা বৃক্ষের একটি অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকেই মহাকারণ অবস্থা বলে। ইহার মূল উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিসর্গমণ্ডলেই বিদ্যমান থাকে। অনন্ত সৃষ্টি এই বিসর্গ হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। বিসর্গ অন্তর্মুখ হইলে সমগ্র সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়।

পরনাদ ও পরবিন্দু মহাকারণ শরীর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরবিন্দু ক্রিয়াশক্তিরূপী কালের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে একটি অস্পষ্ট মহাধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ইহা শব্দব্রহ্ম বা মহানাদ নামে পরিচিত। এই অব্যক্তধ্বনি বা শব্দব্রহ্ম বা মহানাদ পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ। পরনাদ ও পরবিন্দুকে মহাকারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে পরবিন্দুর ক্ষোভ হইতে উৎপন্ন বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটিকে কারণ বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। মহাকারণ দেহের মূল যেমন বিসর্গমণ্ডলে নিহিত থাকে, তদ্রূপ কারণ দেহের মূল শব্দব্রহ্মে নিহিত থাকে। এইজন্য শব্দব্রহ্ম ভেদ না হওয়া পর্যন্ত কারণদেহ অস্তমিত

হয় না। সৃষ্টির মূলে শিবশক্তি থাকিবার দরুণ সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি স্থিতিতেই শিবশক্তির স্বরূপ অনুভব করা যায়। পরবিন্দুতে একদিকে যেমন গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, অপরদিকে সেইরূপ উহা শিবশক্তিরও সাম্যাবস্থা। শুধু তাহাই নহে, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি আদি শক্তিরও সাম্যাবস্থা পরবিন্দু। কিন্তু যখন কালের দৃষ্টিতে পববিন্দু ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া বৈষম্য অবস্থায় উপনীত হইল, তখন তাহা হইতে অপরবিন্দুরূপ যে কার্য উৎপন্ন হইল তাহাতে শিবাংশের এবং বীজরূপ যে কার্য উৎপন্ন হইল তাহাতে শক্ত্যংশের প্রাধান্য রহিয়া গেল; অর্থাৎ অপরবিন্দু প্রধানতঃ শিবভাবময় এবং বীজ প্রধানতঃ শক্তিভাবময়। এই বিন্দু ও বীজ পরস্পর সম্মিলিত হইলে যে মহানাদের অভিব্যক্তি হয় তাহাতে শিব ও শক্তি উভয়ের মিশ্রণভাব থাকে। পরনাদ এবং মহানাদে যেমন ভেদ আছে, ঠিক সেইপ্রকার মহানাদ এবং নাদেও ভেদ আছে। বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটি লইয়া কুণ্ডলযন্ত্র আবির্ভূত হয়। সমষ্টিভাবে এই তিনটিই কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ। এই তিনটি সম্মিলিতভাবে ত্রিকোণাত্মক যোনিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা হইতেই সমগ্র জগতের সূক্ষ্ম উপাদানগুলি প্রয়োজন অনুসারে নির্গত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণই বস্তুতঃ কারণদেহের নামান্তর। বিন্দু ও বীজ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইযাই কার্য করিয়া থাকে। পরবিন্দু মহানাদের মধ্য দিয়া অপরবিন্দুতে অবতীর্ণ হইলে এই অপর-বিন্দু যখন বীজকে স্পর্শ করে তখন বীজসকল অপরবিন্দুতে যুক্ত হইয়া গুঞ্জন করিতে থাকে। ইহাই নাদ।

সংক্ষেপে, পরবিন্দুই গুরুর আসন। তাহাতে প্রকাশমান গুরুমূর্তি অর্দ্ধনারীশ্বররূপে নিজেকে প্রকট করিয়া থাকেন। উহা একাধারে শিবশক্তি উভযাত্মক। পরবিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে যে মহনাদ উৎপন্ন হয় তাহার দুইটি প্রবাহ আছে—একটি ঊর্দ্ধমুখ এবং অপরটি অধোমুখ। ঊর্দ্ধমুখ প্রবাহটি আদি বা পরনাদে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। এই আদি বা পরনাদের জগৎ সৃষ্টির অভিমুখে ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আর যেটি অধঃপ্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করা হইল তাহা বীজকে গর্ভে ধারণ করিয়া বীজের কার্যস্বরূপ নাদ পর্যন্ত বিকশিত করিয়া কুণ্ডলিনী যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হয়।

মনুষ্যহৃদয়ে অস্ফুটভাবে যে সকল চিন্তারাশি ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহা নাদেরই খেলা। জ্ঞানরূপে বা ভাবরূপে কিংবা তদ্ভিন্ন অপর কোন বৃত্তিরূপে অন্তঃকরণের যে পরিণাম হয় তাহা নাদের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইজন্যই উহা বর্ণাবলীর অতীত নহে। কিন্তু মহানাদরূপে যে চৈতন্যশক্তির খেলা উপলব্ধি করা যায় তাহা সর্বপ্রকার বিকল্পের অতীত।

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—“অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ত-তেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।” অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত অক্ষরব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অর্থরূপে বিবর্তিত হন। তাহা হইতে জগতের প্রক্রিয়া আরব্ধ

হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সর্বপ্রকার জাগতিক প্রক্রিয়ার মূলে অর্থরূপে শব্দের বিবর্ত রহিযাছে। অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতে জগতের খেলা নিষ্পন্ন হয়।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা যে ধারা অবলম্বন করিয়া বিশ্লেষণ করিতেছি তাহাতে পরবিন্দু ও অপরবিন্দুর মধ্যাবস্থাতে শব্দব্রহ্মের স্থিতি বুঝিতে পারা যায়। পরবিন্দুর ক্ষোভক হইল 'মহাকাল'। মহাকালের দ্বারা পরবিন্দুর ভেদ হইলে যে অস্ফুট মহানাদ অভিব্যক্ত হয় তাহাই শব্দব্রহ্ম। পরবিন্দু ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। সুতরাং ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হইতেই শব্দব্রহ্মের স্ফুরণ বুঝিতে হইবে। শব্দব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয় সত্য, কিন্তু কি প্রণালীতে শব্দব্রহ্ম অথবা মহানাদ এই সকল তত্ত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, যে সকল তত্ত্ব জগৎসৃষ্টির মূলীভূত উপাদান, তাহারা বীজশক্তি হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং মহানাদ বীজরূপে এবং বীজসকল তত্ত্বরূপে ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। ইহাই ক্রিয়াশক্তির বিকাশের ক্রম। পরবিন্দু বিভক্ত হইয়া যাওয়ার পর উহা হইতে যে দুইটি অংশ প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে শক্তিপ্রধান অংশটির নাম বীজ এবং শিবপ্রধান অংশটির নাম বিন্দু। শিবশক্তি পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া শিবাংশে শক্তি এবং শক্ত্যংশে শিবভাব বিদ্যমান থাকে। শক্তিপ্রধান বীজগুলি সেইজন্যই শিবপ্রধান বিন্দু দ্বারা নিত্য জড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই সকল বীজ বস্তুতঃ বর্ণসমষ্টিরই নামান্তর। যতক্ষণ বর্ণরাশি কুণ্ডলিনী মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ততক্ষণ তাহারা জ্যোতির কণারূপে প্রকাশিত হয়।

মহানাদ হইতে একটি ধারা ঊর্দ্ধমুখে এবং অপর একটি ধারা অধোমুখে প্রবাহিত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধমুখের ধারাটি যে শক্তির দ্বারা বিধৃত তাহার নাম ঊর্দ্ধশক্তি এবং যে ধারাটি অধোদিকে প্রসারিত তাহার ধারিকা শক্তির নাম অধঃশক্তি। যখন অধঃশক্তি অবতীর্ণ হইয়া আজ্ঞাচক্র ভেদপূর্বক অধোদিকে প্রসারিত হয় এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ শূন্যপথে সঞ্চরণ করে তখন বিভিন্ন চক্র ও যন্ত্রাদি অবলম্বনপূর্বক ঐ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

যে সকল বর্ণ ভ্রু-মধ্যের ঊর্দ্ধপ্রদেশে পরম অব্যক্ত পদে বিরাজ করে তাহারাই শক্তির অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু-মধ্য ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের পথে ষট্‌চক্রে ছড়াইয়া পড়ে। ষট্‌চক্রের বিভিন্ন দলে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ রহিয়াছে। ইহারা সূক্ষ্ম সৃষ্টি তত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ। মহানাদে বা শব্দব্রহ্মে যে বিশাল নাদ ও জ্যোতিঃ প্রকাশমান তাহারা আংশিকভাবে এই সকল বর্ণের মধ্যেও প্রকাশমান। অতএব, প্রত্যেকটি বর্ণ শুধু বর্ণ নহে, উহাতে নাদ এবং জ্যোতিও রহিয়াছে। এইগুলি কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বিন্যস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছু নহে। কুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কুণ্ডলিনী শক্তিই ভাব-বিকাশের মূল বলিয়া জগৎ-সৃষ্টির মূল উপাদান।

জ্যোতির কণিকারূপে কুণ্ডলিনী মধ্যে বর্ণসকল প্রথম বিদ্যমান থাকে। তাহার পর সুষুম্নাপথে নাভিপদ্মে বর্ণসকল উদিত হইয়া ওখানকার তেজস্তত্ত্বে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় বর্ণসকল পশ্যন্তী নামে অভিহিত হয়। ইহাও জ্যোতিঃপ্রধান অবস্থা। যোগী ভিন্ন এই অবস্থার অথবা ইহার পূর্ববর্তী অবস্থার সন্ধান কেহ পাইতে পারে না। ইহার পরবর্তী অবস্থায় হৃদ্‌পদ্মে বর্ণের উদয় হয়। এই সময় আন্তরনাদের প্রাচুর্য বর্ণমধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রাণবৃত্তির সহিত বর্ণসকলের সম্বন্ধ হয়। ইহা অন্তঃসংকল্প দশা বলিয়া পরিচিত। বহির্মুখ অবস্থায় বর্ণসকল কণ্ঠাদি স্থানসকলে বায়ুর আঘাতে উচ্চারিত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করে এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে বাহ্য শব্দের আকারে পরিণত হয়।

আমরা পূর্বে যে মহানাদের কথা বলিয়াছি তাহা পরপ্রণবের নামান্তর। যখন পরবিন্দু মহাকালের প্রভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে তখন এই মহানাদ ঐ বিভাগের প্রত্যেকটিতে অনুস্যূত হইয়া থাকে। মহানাদের দুইটি বৃত্তি বা শক্তি প্রধানরূপে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একটি মহানাদ হইতে পরনাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এবং অপরটি অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। বর্ণমালার চারিটি স্থিতি লক্ষিত হয়। প্রথমটি পরা, যাহাতে বর্ণমালার প্রথম আবির্ভাব হইয়া থাকে অথচ তাহা অভিব্যক্ত হয় না। ইহার পর উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত বর্ণরাশির উদয় হয়। সমগ্র সৃষ্টির মূলে বর্ণমালা বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই বর্ণমালাই সৃষ্টির বীজস্বরূপ। বর্ণসকল যেখানে পরস্পরের ভেদ বিগলিত করিয়া ধ্বনিরূপে ঊর্দ্ধগামী হয় তাহাই মহানাদের ঊর্দ্ধশক্তির ব্যাপার। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে এক পক্ষে মহানাদই সৃষ্টির মূল কারণ। কারণ, মহানাদ হইতেই বীজসকল আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিব্যাপার প্রবর্তিত হয়। অপর পক্ষে, মহানাদই মুক্তিরও কারণ। কারণ, ঐ সকল বীজ পরস্পরে মিলিত হইয়া এবং পরস্পর ভেদ পরিহারপূর্বক ঊর্দ্ধগামী অখণ্ড ধ্বনিরূপে যখন পরিণত হয় তখনই উহা ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, যাহার প্রভাবে জীব বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পরবিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও বিসর্গের সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে বিন্দু এক ও অভিন্ন। ইহার নামান্তর ব্রহ্মবিন্দু। বিসর্গ দুইটি বিন্দু, যাহার একটিকে বিষ্ণুবিন্দু ও অপরটিকে রুদ্রবিন্দু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বিন্দু হইতে বিসর্গমণ্ডল পর্যন্ত যে প্রবাহ তাহা 'হংস' প্রবাহ নামে পরিচিত। এই হংসধারা মহানাদের অধঃশক্তির অন্তর্গত। আর বিসর্গ হইতে বিন্দু পর্যন্ত 'সোহং' ধারা—নাদের ঊর্দ্ধগতি। 'হং'-আকাশ বীজ ও শিবময় এবং 'সঃ'-প্রকৃতি বীজ ও শক্তিময়।

(বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর বিভিন্ন রচনার অনুসরণে রচিত।)

আগমসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপক বিশ্লেষণ

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব অসীম। সেইজন্য বিষয়টিকে বুঝিবার সুবিধার্থে নিম্নে ইহার কতকগুলি জ্ঞাতব্য দিক লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। আলোচনাগুলি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের মুখে শুনিয়া এবং তাঁহার রচনা পড়িয়া প্রবন্ধাকারে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

(ক) ষট্-চক্র—চক্র হল বন্ধন। শক্তির বন্ধন। শক্তি যেখানে মুক্ত, সেখানে উহা চিৎশক্তি। মুক্ত শক্তিই খেচরী, ভূচরী আদি শক্তিরূপে চার প্রকার। জড়দেহে চিৎশক্তির প্রকাশ ঘটাতে হবে—চিৎশক্তির বন্ধন খুলে দিতে হবে। ষট্চক্রের প্রত্যেক চক্রই বন্ধন। প্রত্যেক চক্রের বন্ধন খুলে আজ্ঞাচক্রে মহাবিন্দুর প্রকাশ ঘটানোই ষট্চক্র ভেদ। ষট্চক্র ভেদের অবলম্বন হল কুণ্ডলিনী-শক্তি। অতএব কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ চাই। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটাবে কে? গুরুদত্ত মন্ত্র। মন্ত্র অক্ষরের সমষ্টি। চক্রাকারে বন্ধনের হেতু হল 'অ' হতে 'হ' পর্যন্ত সমস্ত বিকল্পাত্মক অক্ষর। চক্রাকারে আবদ্ধ শক্তিই হল মায়া। মায়াশক্তির প্রভাবে অক্ষরে ভাসমান্ নামরূপাত্মক প্রাকৃত জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুর জ্ঞান বিকল্প। মায়া-প্রভাবিত বিকল্প জ্ঞানকে শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা শোধন করতে হবে। শুদ্ধ বিদ্যা হল সদ্গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি। এই মন্ত্রশক্তি চিন্ময়। অক্ষরের সমষ্টি মন্ত্র। অবিদ্যাকল্পিত অক্ষর শুদ্ধবিদ্যা বা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধবিদ্যারূপ মন্ত্রজপে ও সাধনায় নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। ব্যুত্থিত কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বে পরিচালনার দ্বারা ষট্চক্রের ভেদ হয়। ব্যুত্থিত কুণ্ডলিনীই হল বাক্, ইনি অগ্নিস্বরূপা। ইহার সহিত যুক্ত হয় মন ও প্রাণ। প্রাণ হল সূর্য, মন হল চন্দ্র, বাক্ হল অগ্নি—এই তিনের মিলনে ঊর্ধ্বগমনের ফলে চক্রের মধ্যে যে সমস্ত বিকল্পাত্মক অক্ষরের সমাবেশ দেখা যায়, কুণ্ডলিনীশক্তিরূপ হুতাশনে সে অক্ষরগুলি বিগলিত হতে থাকে। পূর্ণ বিগলিত হবার পর থাকে নাদ। নাদই বিন্দু। এই পরিশুদ্ধ বিন্দু তখন সুষুম্নায় প্রবেশ করে। এমনি করে যোগী শুদ্ধ বিদ্যায় জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তিকে তন্ত্র-সাধনার দ্বারা প্রত্যেক চক্রের বিন্দুকে শোধন করে আজ্ঞাচক্রে পরিচালিত করে মহাবিন্দুর সহিত সামরস্য ঘটায়। আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত শিবই মহাবিন্দু বা মহানাদ। এই শিবের সহিত শুদ্ধ বিদ্যায় পরিশোধিত পূর্ণ চিন্ময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্য

বশতঃ যে অমৃত নিঃসরিত হয় তাহা পান করে অমরত্ব লাভ করাই হল জীবের পুরুষার্থ। এই অবস্থায় উপনীত জীবই পার্বতী। পার্বতী পরমশিবের পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তি। পরমব্রহ্ম বা পরমশিবের চিন্ময় শক্তির পরাকাষ্ঠা হলেন পার্বতী। বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তাঁব স্বরূপশক্তির বা অন্তরঙ্গা শক্তিব পরাকাষ্ঠা হলেন শ্রীবাধা। অতএব জীব যতক্ষণ না আরোহের ক্রম ধরে পার্বতী বা শ্রীরাধার অবস্থায় বা স্থিতিতে এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের পরমশিবের অমৃতরস বা শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লাসজাত আনন্দরস আস্বাদন করা সম্ভবপর নয়। জীব শুদ্ধবিদ্যার সাধনার বলে পার্বতী বা শ্রীরাধায় পরিণত হয়ে শিবের সহিত পার্বতীর বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার অর্থাৎ শক্তিমানের সহিত শক্তির অভেদাত্মক মিলন বা সামরস্য জনিত অমৃত বা রস আস্বাদনে পরমপুরুষার্থ লাভ করে সার্থক হয়।

অনাত্মায় আত্মবোধ হইতে জীবের মধ্যে 'জড়-অহং' বা অশুদ্ধ অহং জাগ্রত হয়। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে এই 'জড়-অহং' বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জগতসম্বন্ধে বিকল্প ধারণা হয়। প্রাকৃত জগতের বিকল্প বিষয়সুখে উন্মত্ত 'জড়-অহং' স্ফীত হয়ে আপন সত্যস্বরূপ বিস্মৃত হয়। ফলে জরা-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথায়-বেদনায় ভরা সংসার আবর্ত্তে বা জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তনে ঘূর্নিত হয়। কিন্তু শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে যখন জীবের মধ্যে 'আত্মায় আত্মবোধ' জেগে ওঠে তখন 'চিন্ময় অহং'-এর প্রকাশ ঘটে—নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পায়! অধ্যাত্ম সাধনায় এই চিন্ময় 'অহংবোধ' সর্বদা জাগরুক থাকা দরকার—'প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ'। তা না হলে অধ্যাত্মসাধনার চরমশিখরে, আরোহের সর্বোচ্চ ক্রমে পৌঁছে পরমাত্মা বা পরমস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ বা স্থিতি হয় বটে, কিন্তু নিজ পরমস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। আমি নিজেকে জানবো, পরমস্বরূপের মুখোমুখী হয়ে তাঁকে জানবো এবং পরমস্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সোহংজ্ঞানের মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবো—অধ্যাত্মসাধনায় এরূপ ইচ্ছা সদা জাগ্রত না থাকলে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এই ইচ্ছাই চিন্ময় 'অহংবোধ', এই ইচ্ছাই আত্মশক্তি। এই ইচ্ছার সংবেগেই চিন্ময়ী আত্মশক্তির সম্যগ্ বিকাশ বা পরিস্ফুরণ হয়। আত্মশক্তির স্ফুরণের দ্বারা নিজেকে ও পরমব্রহ্মকে জানা—এই সম্যগ্ জ্ঞান নিয়ে এবং এরূপ বিজ্ঞানজনিত পরমানন্দের অনুভূতি নিয়ে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যে পরমপদ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আণবমলের দ্বারা আবৃত হয়ে স্বরূপজ্ঞান হারিয়েছিলেম, এবার অনন্ত জীবনপথ পরিক্রম করে নিজ স্বরূপের সম্যগ্ বিজ্ঞাতা হয়ে তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যাওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অন্যথায় চিত্তকে নিরুদ্ধ করে, প্রকৃতির শক্তিকে পাশ কাটিয়ে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও জীব মিথ্যা—এই

বলে জগৎকে পরিহার করে, জীবনকেও মিথ্যা জেনে জীবনের ক্রিয়াকে অবহেলা করে যে অবস্থায় অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভ হয়, সেরূপ অবস্থা হল কৈবল্যমুক্তি বা আরও এক ধাপ উপরে ব্রাহ্মস্থিতি। কৈবল্যমুক্তিতে বা ব্রাহ্মস্থিতিতে জীবের আত্মস্বরূপে স্থিতি হয় বটে কিন্তু আত্মস্বরূপের উপলব্ধি থাকে না। যে পরমপদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীব অজ্ঞান অবস্থায় জীবজন্মে নেমে এসেছিল, স্বরূপজ্ঞানে সচেতন না থেকে সেই পরমপদে ফিরে গেলে জীবজন্মের পরম লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না। সৃষ্টির উন্মেষে যেমন একদিন এসেছিল অজ্ঞান অবস্থায়, তেমনি আণবমলের সঙ্কোচ না কাটিয়েই আপন পূর্ণস্বরূপের পরিচয় না পেয়েই স্বরূপস্থিতি হলে—মধ্যে এই অসংখ্য জীবন-পরিক্রমা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই বৈষ্ণব বা শাক্তসাধক কৈবল্য মুক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

(খ) জাগরণের লক্ষণ—তান্ত্রিক সাধনায় যখন প্রকৃত জাগরণ হয় অর্থাৎ সুপ্ত চিৎশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয় তখন সমগ্র বিশ্ব নিজের অঙ্গ বলিয়া সাধকের অনুভব হয়; যেমন হাত-পা আদি নিজের অঙ্গীভূত, ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্ব নিজান্তর্ভুক্তরূপে প্রত্যক্ষগোচর হয়। সমগ্র বিশ্ব আমারই অন্তর্ভুক্ত, আমার বাহিরে আমাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই—এই প্রতীতি, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এই বোধ বা অনুভব যদিও সাধকের হৃদয়ে ক্ষণকাল স্থায়ী হয়, তথাপি এই প্রত্যয়লব্ধ অভিজ্ঞতা একবার উদিত হইলে আর অস্তমিত হয় না। সাধক বারংবার উন্মুখ হইয়া এই প্রত্যক্ষলব্ধ উপলব্ধির সহিত যোগযুক্ত হইবার অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ উহার স্থিতিকাল দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া একসময় স্থায়ী হইয়া যায়। সাধক তখন উন্মুখ হইবামাত্র সমগ্র বিশ্বের সহিত এই অপার্থিব তাদাত্ম্যতা অনুভব করিতে পারে। এইরূপ যোগযুক্ত অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করিতে পারে যে, যাহা তাহার অন্তর্গত সেই প্রপঞ্চময় দৃশ্যজগৎ মায়ার ক্রিয়ায় বাহিরে জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চক্ষুর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র মণিতেই দর্পণে প্রতিফলনের ন্যায় যেমন জগৎ ভাসিতেছে, তেমনি সাধক প্রত্যক্ষ করে অন্তরাকাশে বা দহর-আকাশে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে এবং মায়াশক্তির প্রভাবে উহা নিজ স্বরূপের বাহিরে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বস্তুত বহির্বিশ্ব সাধকের আপন সত্তার বা আত্মসত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র; আত্মসত্তার অতিরিক্ত বহির্বিশ্বের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। স্বরূপ বিস্মৃত মায়াভিভূত জীবের ইহা উপলব্ধি-গোচর হয় না। কারণ, সে সুপ্ত; সুপ্তিতে কি জাগরণের চেতনা বা ক্রিয়া থাকে? কিন্তু যিনি মায়াকে অভিভূত করিয়া আপন প্রকাশময় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া 'আমি কে', 'আমার প্রকৃত পরিচয় কি'----এই আত্মচৈতন্যে জাগিয়া উঠিয়াছেন—তন্ত্রমতে যাহার মধ্যে

কুণ্ডলিনীশক্তি পূর্ণ জাগ্রত হইয়াছে, সেই যোগী-সাধকই একমাত্র পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। উপনিষদে পরমপ্রকাশ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, "ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্, তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি"—সেই 'ত্বম্' কে?—আত্মাই তো। সেই একমাত্র 'জ্ঞাতা-আত্মা' আত্মসঙ্কোচ করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বহু জীবে পরিণত হইয়াছেন। সেই এক বিভু-আত্মাই তো সঙ্কোচের দ্বারা অণু হইয়া আত্ম-মায়ায় আবরিত হইয়া পশু-জীবে রূপান্তরিত হইয়াছেন! আর সেই অনাবৃত মহাপ্রকাশ আত্মা নিজ পরাশক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়াই না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে? বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বিশ্ব তাঁহারই মহাপ্রকাশের অন্তর্ভূক্ত ছিল, সৃষ্টিতে পরাশক্তির ক্রিয়ায় বা যোগমায়াব প্রভাবে বিশ্বের বহির্প্রকাশ হইয়াছে মাত্র। এক আত্মাই নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তির বশে জীব ও জগৎ হইয়াছেন অথচ আত্মস্বরূপে অবিকৃতই আছেন বা মহাপ্রকাশ-স্বভাবে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার এই নিত্য মহাপ্রকাশের একাংশে জগৎ অবস্থিত—'একাংশে স্থিতোহজগৎ'। অতএব এক আত্মাই বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত যুগপৎ 'ভাবে'ই নিত্য 'সৎ'। এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন তত্ত্ব বা বস্তু নাই। জগৎ, জীব ও জগতাতীত সমগ্রকে লইয়াই তিনি অদ্বিতীয়। জীব ঈশ্বরের প্রতিরূপ। পরমাত্মাই আণব মলের দ্বারা আবৃত স্বরূপবিস্মৃত হইয়া জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন। মলাবৃত আত্মাবিস্মৃত শিবই পশু জীব। আণবমল ছিন্ন হইলে পশু জীবই শক্তিমান্ শিবস্বরূপ হন বা স্বরূপ উপলব্ধিতে আত্মসঙ্কোচনের আবরণ উন্মোচিত হইয়া জীবাত্মাই নিরাবরণ 'জ্ঞাতা-ব্রহ্ম' বা 'জ্ঞাতা-আত্মা'র সাযুজ্য লাভ করে অর্থাৎ নিজ স্ব-ভাব বা সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। 'নিমেষ'কালে যে পরাশক্তি বা যোগমায়ার আবরণে আত্মা নিজেকে ভুলিয়া পশু জীব হইয়া অশুদ্ধ মায়ায় মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া তাহারই তাড়নায় দেহাত্মাভিমানে কর্ম করিয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া কর্মফল বা সাংসারিক সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়, 'উন্মেষ'কালে একমাত্র সেই পরাশক্তিরই অনুগ্রহ লাভ করিলে আণবমলের আবরণ উন্মোচিত হইয়া সহজ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উন্মেষ এক কথায় হয় না। প্রথম অন্তরাবৃত্ত হইতে পারিলে উন্মেষের সূচনা হয়। ইহার একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম আছে। বাহিরে যে বিশ্ব জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাসিত হয় এবং উহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ লইয়া জীবচিত্তের বিক্ষেপের কারণ হয়, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তরাবৃত্ত হইয়া অন্তরের তলদেশে নিজেকে বা আত্মাকে খুঁজিতে হইবে। নিজ আত্মার সহিত অপরোক্ষ পরিচয় ঘটিলে দেখিতে পাইবে নিজ আত্মাই সর্বঘটে বিরাজমান্—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—বাহির বিশ্ব নিজ

অঙ্গ বলিয়াই বোধ হইবে—শুদ্ধ 'জ্ঞান'ই মায়ার ক্রিয়ায় 'জ্ঞেয়'রূপে বাহির বিশ্বব্যাপিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। তন্ত্রসাধনার আরও উপরে উঠিলে জ্ঞেয় অর্থাৎ বাহির বিশ্ব জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া মিশিয়া যাইবে। তখন বহির্বিশ্বের যাবতীয় বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইয়া চরাচর ব্যাপী এক শুভ্র জ্যোতি যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক, বিরাজ করিতে থাকিবে অর্থাৎ সমস্ত আকার নিরাকার নিরঞ্জনের মধ্যে ডুবিযা যাইবে। এইরূপে তান্ত্রিক সাধক বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হইলে ঈশ্বরত্ব লাভ করে, তাহার মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তি'র বিকাশ হয়। কোন ইচ্ছার উদয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ হয়। মায়াবদ্ধ জীবের ইচ্ছা হইলেও ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, কারণ তাহার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই বলিয়া; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিসমন্বিত সাধকের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না; এমন কি, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওযার জন্য নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও তাহার অধিগত হয। এই ক্ষমতার অধিকারও এক বড বন্ধন—ইহাতেই যে সাধক তৃপ্ত থাকিতে চায, তাহার ইহা অপেক্ষাও বড ও মহৎ পূর্ণবস্তু বা পরমতত্ত্ব লাভ হয় না। তাহা পাইতে হইলে পরাশক্তিময়ী মহামাযের চরণে সেই ইচ্ছাকে সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ ইচ্ছার ত্যাগে যোগীর হৃদযে অপার শুদ্ধ আনন্দের উদয হয়, যে আনন্দের সঙ্গে জাগতিক কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। তথাপি এ আনন্দ পরমানন্দ বা পূর্ণানন্দ নহে। ইহারও ত্যাগে লাভ হয় পরাসংবিদ্ বা সম্যক সম্বোধি যাহা পরাশক্তিময়ী মাযের কৃপায় সাধিত হয়। এইখানেই আণবমলের উন্মোচন হইয়া পশুজীব তাহার হারানো সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপ বা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে অবস্থানে আত্মা বা ব্রহ্ম বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক এবং একই সঙ্গে যুগ্মভাবে বিরাজমান। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়াই পূর্ণত্ব—জীবের চরম পুরুষার্থ, যেখানে শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদে মিলিয়া এক হইয়া আছে।

কিন্তু যাঁহারা অবিমিশ্র জ্ঞান বা বিবেকের পথে চলেন তাঁহারা আত্মা ও বিশ্বকে চিৎ ও অচিৎ রূপে বিভক্ত করিয়া বিশ্বকে অচিৎ জ্ঞানে ক্রমশঃ পরিহার করিতে কবিতে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবলি চিদাত্মায় নিমজ্জিত হইয়া যান। তাঁহারা বিশুদ্ধ চিদাত্মক হইলেও মায়ার অতীত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বিমল আনন্দে ডুবিযা থাকিলেও তাঁহারা পশুই থাকিযা যান, কারণ তাঁহাদেব আণবমল উন্মোচিত হয় না। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদে যিনি এক অদ্বয় ব্রহ্ম, তিনি আত্ম-মায়ায় নিজেকে সঙ্কুচিত করিযা নিজ পূর্ণস্বরূপের উপর আবরণ টানিয়া দিয়া চিৎ ও অচিতে দ্বিধা বিভক্ত হইযা উভয় কোটিতে অপূর্ণ হইয়া রহিলেন। তাঁহার চরম চিৎ-কোটিতে শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপে শক্তিশূন্য হইয়া তিনি অসাড়ের ন্যায় পড়িয়া আছেন, আর চরম অচিৎ কোটিতে চিৎ-শূন্য জড-জগৎ বা প্রকৃতি-জগৎ সৃষ্টি কারিলেন;

আর তটস্থ অবস্থায় চিতের উপর অবিবেকের বা অবিদ্যা-মায়ার পর্দা দিয়া ঢাকিয়া আত্মবিস্মৃত মোহাভিভূত দেহাত্মাভিমানী জীবে পরিণত হইলেন। প্রকৃতি-জগৎ অচিৎ হইলেও প্রাণশক্তি উহার মধ্যে নিগূঢ় রূপে অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, সেই একই প্রাণশক্তি মানুষের মধ্যেও স্পন্দিত হইতেছে। অতএব প্রাণ-ধর্মে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রভেদ নাই। প্রকৃতির বিবর্তন মনোময় মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক পরিণতির দ্বারা মানুষের মধ্যে সেই প্রকৃতি চিন্ময় রূপান্তরের অপেক্ষা করিতেছে। চিদাত্মা ও অচিৎ প্রকৃতি মানুষের দেহ অবলম্বনে একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল নির্দিষ্ট বিবেক মার্গে চলিয়া যে যোগী নিজ প্রকৃতিবে অচিৎ জ্ঞানে পরিহাব করিয়া শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন বা আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিদাত্মায় মিলিয়া যান, তিনি নিরঞ্জন ব্রহ্মেই নিমজ্জিত থাকেন। তিনি নিষ্ক্রিয ব্রহ্মের এক কোটিতে গিয়া উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ব্রহ্মের সক্রিয় শক্তির অপর কোটির রহস্য তাঁহার নিকট অনুন্মোচিতই থাকিয়া যায়। অতএব চিৎ ও অচিৎ উভয়ের মিলিত যুগল সত্তার অধিষ্ঠাতা যে পূর্ণব্রহ্ম, সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি তাঁহার হয় না। অতএব তিনি অপূর্ণই থাকিয়া যান। সৃষ্টির ইচ্ছায পূর্ণব্রহ্মের আত্মসঙ্কোচের ফলে যে আণবমল ব্রহ্মকে প্রথম আবৃত করে, শুদ্ধ বিবেকপন্থী যোগী ব্রহ্মস্বরূপতা পাইলেও সেই আণবমল তাঁহার থাকিয়া যায। অতএব তিনি পশুই থাকিযা যান। কারণ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সাধক সর্বদা 'প্রবুদ্ধ' না থাকিলে পশুত্ব ঘোচে না বা অন্য অর্থে জাগরণই হয় না—আমিই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সব কিছু হইয়াছি, আমাতেই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আমারই শক্তির প্রকাশ, সবকিছুকেই যে আমি চালনা করি এবং সবকিছুকেই যে আমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমি একক ও অদ্বিতীয়—এ বোধ জাগে না। আর এ বোধ না জাগিলে বুঝিতে হইবে জীব চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেও শক্তিহীন শবের ন্যায় অসাড়ের মত পড়িয়া থাকে।

(গ) **হার্দ্ধকলা**—শিব ও শক্তির বা প্রকাশ ও বিমর্শের অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সামরস্যরূপ হইল যুগলরূপ। যুগল বলিতে দুই বুঝায় না, কিন্তু দুইয়ের মিলিতকে বুঝায়। ইহারই অপর নাম হার্দ্ধকলা বা চিৎকলা। এই অর্দ্ধতত্ত্ব পরম রহস্যময়। এই অর্দ্ধ ছাড়া সৃষ্টি হয় না, আবার লয়ের ক্রমে শেষে এই অর্দ্ধতেই সব পর্যবসিত হয়।

কামকলা তত্ত্ব অনুসারে সামরস্যাত্মক রূপটি দুই বিন্দুর মিশ্রণে গঠিত: একটি সোম, অপরটি অগ্নি; একটি শক্তি, অপরটি শিব। শিব হইলেন

'প্রকাশমাত্রতনু', আর শক্তি হইলেন 'নিজসুখময়নিত্যনিরূপমাকারা'। মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ প্রকাশ বা চিৎ নিরাকার। কারণ, আনন্দ ছাড়া কোথাও আকার হয় না। এই আনন্দেরই অপর নাম বিমর্শ। প্রকাশ হইলেন শুদ্ধ নির্মল চিৎস্বরূপমাত্র, আর বিমর্শ হইলেন তাঁর দর্পণস্থানীয়। চক্ষু যেমন সব দেখিতে পাইলেও নিজের মুখ দেখিতে পায় না, নিজের মুখ যেমন নিজে দেখা যায় না, তেমনি প্রকাশ স্বয়ং প্রকাশ হইয়া সবকিছু প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও নিজের প্রকাশত্ব অনুভব করিতে পারে না। তাই নিজেকে দেখিতে হইলে সম্মুখে একটি স্বচ্ছ দর্পণ আনা প্রয়োজন হয়। সেই দর্পণে প্রকাশ নিজের মহিমা অনুভব করিতে পারে অর্থাৎ সে যে প্রকাশস্বরূপ তাহা তখন তাহার উপলব্ধি হয়। এই যে প্রকাশের প্রকাশত্ব জ্ঞাপন, ইহা বিমর্শের দ্বারা সংঘটিত হয়। বিমর্শ না থাকিলে প্রকাশ অপ্রকাশতুল্য, না থাকার মত। কারণ সে প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহা তাহার বোধ নাই।

প্রকাশ কিন্তু নিত্য আছেই, তাহার অবস্থান্তর হয় না। অপরপক্ষে বিমর্শের দুই অবস্থা—একটি অভিব্যক্ত (manifest), অপরটি অনভিব্যক্ত (unmanifest)। একটি তার সক্রিয়রূপ, অপরটি নিষ্ক্রিয়রূপ। নিষ্ক্রিয়রূপে সে প্রকাশেই অন্তর্লীন থাকে। কারণ, প্রকাশ ব্যতীত কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় বা অব্যক্ত বিমর্শ দর্পণ হয় না। সক্রিয় বিমর্শেই প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হয়। তখন প্রকাশের সঙ্গে বিমর্শের সংযোগ হয়। এই সংযোগের সঙ্গে পূর্বোক্ত অব্যক্তাবস্থার সংযোগের অনেক প্রভেদ। নিষ্ক্রিয়রূপে বিমর্শ প্রকাশে অন্তর্লীন থাকিলে সৃষ্টির স্ফুরণ হয় না, কিন্তু সক্রিয় বিমর্শ প্রকাশের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়।

শিব ও শক্তির কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্মিলিত রূপই 'সবিতা' (সূর্য)। শিব হইলেন 'অগ্নি' এবং শক্তি হইলেন 'সোম'। অগ্নি ও সোমের একত্র মিলনেই 'সবিতা'। অগ্নি তেজোময়ী, সোম স্নিগ্ধ। অগ্নির সংস্পর্শে যেমন ঘৃত গলিত হয়, তেমনি অগ্নির সংস্পর্শে সোম বিগলিত হয়। কিন্তু যেখানে শিব ও শক্তি সম্মিলিত বা শিব ও শক্তির সামরস্য অবস্থা অর্থাৎ অগ্নি ও সোমের পরস্পর সম্মিলিত অবস্থা সেখানে সোম বিগলিত হয় না। ইহার কারণ, সেখানে শিব ও শক্তি তুল্য বলশালী। অর্থাৎ শিব ও শক্তি কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েই ষোড়শ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ পূর্ণ কলাবিশিষ্ট। অগ্নি অপেক্ষা সোম কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে সোম বিগলিত হইতে থাকে। তাই জীব সাধনার দ্বারা পূর্ণ শক্তিশালী না হইলে অর্থাৎ ষোড়শ কলায় উত্তীর্ণ না হইলে শিবের বা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ স্বরূপের সহিত অভেদে মিলিত হইতে পারে না। জীব অপূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণ সোমকলায়

উত্তীর্ণ না হইয়াই পূর্ণত্বের সহিত মিলিত হইতে যাইলেই পূর্ণের প্রভাবে বিগলিত হইয়া যাইবে অর্থাৎ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শ্রীরাধার অষ্টসখীও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ন্যায় মিলিত হইতে পারে না। কারণ, শ্রীরাধার অষ্ট সখী এক একটি ভাবের প্রতীকমাত্র আর শ্রীরাধা 'মহাভাবময়ী'। মঞ্জরীদের কথা তো অনেক দূরের।

পূর্ণ শিব 'অ' অর্থাৎ আদি কলা। 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত কলার বিস্তার। 'অ' ও 'হ'-এর সমাবেশে পূর্ণ বিশুদ্ধ অহন্তাস্বরূপ 'শিব'। এই বিশুদ্ধ পূর্ণ অহন্তা 'সংবিদ'। 'হ' হইতে প্রাণের উৎপত্তি। সেইজন্য কাশ্মীর শৈবাগমে বলা হইয়াছে—"প্রাক্ সংবিদ্ প্রাণে পরিণতা।" পূর্ণ কলার বিস্তারের শেষ স্তর 'হ'। সেইজন্য 'হ'কে বলা হয় 'সার্দ্ধ কলা'। এই সার্দ্ধকলার অব্যবহিত নিম্নভাগ হইতে সৃষ্টির অর্থাৎ অসংখ্য ভুবন, লোক-লোকান্তর এবং যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

(ঘ) কাশ্মীর শৈবদর্শনে পরব্রহ্মের জীবে অবরোহ ক্রম এবং জীবের পরব্রহ্মে আরোহ ক্রম বর্ণন—পরব্রহ্মই পরতত্ত্ব; উহার স্বরূপ অননুমেয়, অতএব অবর্ণনীয়। পরা-সংবিদে যেন তিনি অনুভব করিলেন 'আমি আছি, আমি বহু হব'। এই বহু হইবার ইচ্ছায় তিনি নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা নিজেকে আবৃত করিলেন অর্থাৎ যেন নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইলেন—ইহাই হইল আত্মায় অনাত্মবোধ। এইরূপে সৃষ্টির প্রথম ধাপে তিনি যেন নিজেকে সঙ্কুচিত করিলেন অর্থাৎ আণবমলে আবৃত হইয়া পশুত্ব লাভ করিলেন। নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া তিনি শিবরূপ অখণ্ড প্রকাশ এবং স্বাতন্ত্র্যরূপ বিমর্শশক্তি—যেন এইরূপ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকটিত হইলেন। পূর্ণ-স্বরূপের দ্বিখণ্ডিত সত্ত্বার এক ভাগে বিরাজিত শিবরূপ 'বোধ'—তিনি স্বাতন্ত্র্যশক্তিশূন্য বা স্বাতন্ত্র্যশক্তি তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন, অস্ফুট। অপর ভাগে স্বাতন্ত্র্যরূপা বিমর্শিনীশক্তি—তিনি বোধহীন বা 'বোধ' তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন। এই যে স্বাতন্ত্র্যহীন বোধরূপ শিব, ইহাকে বলা হয় 'অনাশ্রিত শিব'; যেহেতু ইনি স্বাতন্ত্র্যহীন, সেইহেতু অপূর্ণ। আর বোধহীন স্বাতন্ত্র্যশক্তিকে বলা হয় 'সোমনা'শক্তি; যেহেতু ইনি বোধহীন, সেইহেতু ইনিও অপূর্ণ। অনাশ্রিত শিবেরই corresponding শক্তি হইল 'সোমনা' শক্তি। উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ, তবে পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ নহে—পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপের সঙ্কোচের ফলে সূক্ষ্ম আণবমলের আবরণযুক্ত পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। উভয়ের সংযোগে 'সদাশিবে'র উৎপত্তি। সদাশিব তত্ত্বের মধ্যেই প্রথম শুদ্ধ (চিন্ময়) অহন্তার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'ইদন্তা' মল যুক্ত হল। ইদন্তার বৃদ্ধি আর শুদ্ধ চিন্ময় অহন্তার হ্রাস হতে হতে এক সময় পূর্ণ ইদন্তার মধ্যে শুদ্ধ অহন্তার বিলুপ্তি

ঘটে। তখন পশু জীবের অশুদ্ধ মায়িক জগতে প্রবেশ। মায়িক দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধ অহন্তার উন্মেষ। ইহাই দেহাত্মাভিমানী অহঙ্কার বা অনাত্মায় আত্মবোধ। ইহাই অবরোহের ক্রম।

আরোহক্রম:—মন্ত্র বা শব্দ হইতে অর্থের স্ফুরণ—ইহাই আরোহের নিয়ম। দৃষ্টান্তরূপে 'প্রণব'কে লওয়া যাইতেছে। অ, উ, ম—মন্ত্রের এই তিন বর্ণ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিন অবস্থার দ্যোতক। এই তিন অবস্থার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

'অ', 'উ' হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল অর্থের প্রকাশ হইবার পর 'ম'-তে সমগ্র বিশ্বের লয় লইয়া যায়। এইজন্য 'ম' সুযুপ্তির বাচক। যতদিন সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ বা মন্ত্রচৈতন্য না হয় ততদিন সুযুপ্তি ভেদ হয় না। সাধককে সুযুপ্তি হইতে জাগ্রতে এবং জাগ্রত হইতে সুযুপ্তিতে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে হয়। এই আবর্ত্তনের নাশ তখনই সম্ভব যখন গুরুদত্ত শক্তির দ্বারা সুযুপ্তিকে ভেদ করিয়া উহাকে অতিক্রম করা যায়। সুযুপ্তিরূপ অন্ধকারের মধ্যে মন্ত্রের তেজ প্রকাশিত হইতে হইতে যখন মন্ত্র-জগৎ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া যায়, দৃষ্টির সামনে সমগ্র সত্ত্বা জ্যোতির্ময় হইয়া স্ফুরিত হয়—সেই অবস্থাতে স্থিতির নাম 'বিন্দু'-স্থিতি। বিন্দুস্থিতিতে ত্রিকাল, সমগ্র দেশ, অনন্ত আকার সমষ্টি সব এক হইয়া মিলিযা গিয়া জ্যোতিঃরূপে বিদ্যমান থাকে। এই পর্যন্ত পরিমিত যোগীর উত্থান সম্ভব। সমাধিতে যোগী এই পর্যন্ত উঠে, ব্যুত্থানে আবার নামিয়া আসে। এইখানে পৌঁছাইলে সর্বজ্ঞত্ব হওযা যায়। ইহার পর মার্গ অত্যন্ত দুর্গম। বিন্দু অর্থাৎ মহামায়ার রাজ্য অতি বিশাল, একপ্রকার অনন্ত বলা চলে। কিন্তু এখানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রেষ্ঠ যোগী বিন্দু অতিক্রম করিয়া মহানাদ ও পরণাদ-ভূমিতে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ পরমেশ্বর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পাবে। বিন্দু ও নাদের মধ্যস্থলে 'নিরোধিকা' নামে এক শক্তি বিদ্যমান। এই শক্তি বিন্দুরাজ্য বা দিব্যরাজ্য থেকে নাদভূমিতে প্রবেশ করিবার বাধক হয়। এই বাধা অতিক্রম করিয়া নাদভূমিতে প্রবেশ করিলে স্বভাবতঃই ব্রহ্ম-মার্গ খুলিয়া যায়। এই মার্গ হইতে চৈতন্য শক্তির ধারা ব্রহ্মরন্ধ্র পথ বাহিয়া উর্ধ্ব ভূমিতে যাইতে সুরু করে। এই অবস্থায় কলা বা কুণ্ডলিনীশক্তির বিকাশ সুরু হয়। এতদূর পথ অতিক্রম হইবার পর ভাবাত্মক জগতের অবসান হইয়া যায় এবং মহাশূন্যেব আবির্ভাব হয়। ইহার নাম 'ব্যাপিনী'। ইহার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অবভাস হয়। মহাশূন্য ভেদ হইবার পরও আণবপাশ ছিন্ন হয় না। কারণ, মনরূপ 'সমনা' শক্তি বিশ্বের আবরণরূপে তখনও থাকে। এই ভূমিতে থাকিয়া পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বকে শাসন করে। ইহাই অধিকার ভূমির সমাপ্তি। অর্থাৎ পশুত্বরূপ আণবমল এই স্থানে পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

কিন্তু যতদিন না পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় ততদিন এই মল দুই প্রকার কার্য করে। আত্মা এই মলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পশু নামে অভিহিত হয়। পশুর দুই প্রকার স্থিতি—এক, অধিকৃত প্রজার ন্যায়; অপর, অধিকারী রাজার সদৃশ। প্রথম স্থিতিতে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পশু বদ্ধ জীব হয়। এখানে পশুত্ব গাঢ় হয়। পরন্তু ভগবৎ অনুগ্রহে (শক্তিপাতের প্রভাবে) নিয়ম্য পশুভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর শিবভাবের উদয় হয়, কিন্তু সাপেক্ষরূপে। আর দ্বিতীয় স্থিতির পশুগণ উচ্চভূমির অধিকারী। ইঁহারা অধিকারী পুরুষ বা দেবতা রূপে পরিচিত। ইঁহারা সংখ্যায় অনেক হইলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও অনাশ্রিত শিব—এই ছয় প্রকারের মধ্যে কোন না কোন একটিতে পরিগণিত হন। এই অধিকারী পুরুষগণ সাধারণ পশু ও পরমশিবের মধ্যবর্ত্তী থাকে। ইঁহারা পরমশিব বা পরমেশ্বরের অধীন, অথচ সাধারণ পশুর অধিষ্ঠাতা। এই সব অধিকারী পুরুষ আপন আপন সাঙ্গ-পাঙ্গ দ্বারা সমগ্র বিশ্বের শাসন করে। আত্মা যতক্ষণ 'সমনা' ভেদ না করিতে পাবে ততক্ষণ হয় অধিকৃতরূপে, না হয় অধিকারীরূপে বিশ্ব শাসনের ভিতর থাকিতে বাধ্য হয়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধ বাসনা, করুণা, পরোপকারবৃত্তি প্রভৃতি থাকে, তিনি অধিকারী পুরুষরূপেই থাকেন। সাধারণ পশু ভগবৎ অনুগ্রহ লাভ করিবার পরও অধিকারী পুরুষের অধীন থাকে। 'সমনা' ভেদের পর এই শাসক-শাসিত ভেদ আর থাকে না; আত্মা তখন অত্যন্ত শুদ্ধ বা নির্মল অবস্থা পায—ইহা মহামায়ার উর্দ্ধ অবস্থা। ইহা মনেরও ঊর্ধ্ব, সমষ্টি মনের সম্বন্ধ ইহার সঙ্গে থাকে না। ইহাও সাভাস অবস্থা। বহু লোক এই অবস্থায় স্থিত আত্মাকে শিব বলিয়া ভ্রম করে, কিন্তু ইহা শিব নহে। ইহার পাশমুক্তি হইয়াছে, কিন্তু শিবত্ব যোজন হয় নাই। শৈবী শক্তির উন্মেষ না হওয়ার জন্য ইহা কেবলমাত্র আত্মভূমিতে থাকে। ইহার পর 'উন্মনা' শক্তির উন্মেষ হইলে এই আত্মাতে শিবত্বের আবেশ হইতে সুরু করে। কিন্তু তবু এই অবস্থাও সাভাসই। ইহা নিরাভাস পরমতত্ত্ব নহে। ইহার পর 'উন্মনী'শক্তির নিরোধ হইয়া যায়, তখন পূর্ণত্বের আবির্ভাব হয়। পূর্ণত্বই পরাসংবিদ্ বা পূর্ণ শিবভাব। উন্মনী অবস্থাতে পূর্ণত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক প্রতীতির উদয় হয়, পরন্তু তাহার স্থিতি হয় পরমশিব অবস্থায়—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

বিষয়টিকে এই ভাবেও বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। মন্ত্রচৈতন্যের দ্বারা দেহাত্মাভিমান বা অনাত্মায় আত্মবোধ ছুটিয়া গেলে অশুদ্ধ মায়ার ভেদ হয়। শুদ্ধ বিদ্যার উদয়ে অর্থাৎ চৈতন্য লাভে আত্মায় আত্মজ্ঞান জাগ্রত হয়। মায়া-সংস্রবমুক্ত চৈতন্যলাভে শিবত্ব প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু 'শিবোহহং'-বোধ স্ফুরিত হয় না। অনেকের মতে চৈতন্য-উন্মেষ মানেই মোক্ষ-লাভ। মোক্ষপ্রাপ্তি

ঠিকই, কিন্তু উহা 'কৈবল্য'মুক্তি—অনাশ্রিত শিবাবস্থা পর্যন্তও গতি হয়, কিন্তু উহারও উর্ধ্বে পূর্ণস্বরূপ প্রাপ্তি হয় না। এইরূপ অবস্থায় 'শুদ্ধ অহন্তা'র উদয় হয়, অর্থাৎ জগতাতীত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 'অস্মিতা'-বোধের উদয় হয় না, অর্থাৎ আমিই যে সবকিছু হইয়াছি অথবা আমিই যে যুগপৎ জগতাতীত এবং জগতাত্মক—এই উভয়ের পূর্ণতাতেই যে পরিপূর্ণ স্বরূপ, তাহা প্রাপ্ত হয় না। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশে বিশ্বাতীত অস্পন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মের যে স্পন্দিত বিশ্বাত্মক আর একটা দিক আছে, কৈবল্য মুক্তি অবস্থায় সেই দিকটা অপরিচয়েই থাকিয়া যায়। এইজন্য আত্মার কৈবল্যমুক্তি অপূর্ণ—পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের একদেশ মাত্র। তাই অনেকের কাছে কৈবল্যমুক্তি উপেক্ষিত।

শুদ্ধ বিদ্যা লাভের দ্বারা আত্মায় আত্মজ্ঞান জন্মে। শুদ্ধ বিদ্যার দুইটি পরস্পর পরিপূরক অংশ—একটি বিদ্যাংশ, অপরটি ক্রিয়াংশ। বিদ্যাংশ বা জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় লাভ হয়, কিন্তু বোধ থাকে না। ক্রিয়ার দ্বারা আত্মজ্ঞান-বোধের ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে 'ইদন্তা' সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। ইদন্তার লেশমাত্র যখন থাকে, তখন সদাশিব অবস্থা। শুদ্ধ বিদ্যার পূর্ণ উদয়ে ইদন্তা একেবারে লোপ পাইয়া যায়, তখন অনাশ্রিত শিবাবস্থা, তখন 'সোমনা' ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মায় অনাত্মবোধরূপ যে সূক্ষ্ম আবরণটুকু তখনও থাকে, তাহাও অপসারিত হয়। তখন আত্মা সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া পড়ে। এই অনাবৃত আত্মার সহিত পরমাত্মার যোজনা করে 'উন্মনা' শক্তি। এরূপ অবস্থা হল সাভাস অর্থাৎ নিজের অনাবৃত আত্মার ন্যায় ঐরূপ বহু অনাবৃত আত্মার একসঙ্গে সমাবেশ দেখিতে পায়। সাভাস অবস্থার পর নিরাভাস। এই অবস্থায় উন্মনাশক্তিরও নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখন থাকে শুধু পরাসংবিদ্ বা পরব্রহ্ম, তখন অহং-ই অহং—একাধারে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে 'দেহাত্মবোধ' এবং 'আত্মায় অনাত্মবোধ' সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

(১) দেহাত্মবোধ—ইহা দেহেতেই আত্মবোধরূপ ভ্রান্তি। কারণ দেহ অনাত্ম। প্রকৃত গ্রাহক হইলেন আত্মা এবং গ্রাহ্য দেহ। সুতরাং দেহেতেই আত্মবোধ হইল গ্রাহ্যতেই গ্রাহকবোধ বা অনাত্মায় আত্মবোধ। দেহ অন্যান্য গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় একটি গ্রাহ্য বস্তু।

ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা বা কর্ম-মায়া-আণবমলযুক্ত পরিচ্ছিন্ন শিবই হইল জীব। দেহধারী জীব যখন দেহকে আমি বলিয়া জ্ঞান করে, মায়ার মোহ উৎপাদনকারী ভ্রান্তিতে আপন স্বরূপ অপরিজ্ঞাত থাকিয়া অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি

স্থাপন করে, তখন তাহার মধ্যে যে 'অহংজ্ঞান' জন্মায় তাহা ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ অহংজ্ঞান।

(২) আত্মায় অনাত্মবোধ—অনাত্মায় আত্মবোধ যেমন দোষের, তেমনি আত্মায় অনাত্মবোধও দোষের। অদ্বৈত বেদান্তের ধারণায় ব্রহ্ম নিরুপাধিক, নির্গুণ, নির্বিকল্প। সৃষ্টির অবরোহ ক্রমে এই মতে ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত। নিরুপাধিক ব্রহ্ম মায়া উপাধির দ্বারা উপহৃত (ভূষিত) হইয়া সগুণ ঈশ্বর হন। অদ্বৈত বেদান্তে বা আগমে সর্বত্রই অনাত্মায় আত্মবোধকে দূরীভূত করিয়া চিত্ত শুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তে, পাতঞ্জল দর্শনে আত্মার সহিত যুক্ত অচিৎকে বা প্রকৃতিকে পৃথকীকরণের উপদেশ দেয়। পাতঞ্জল যোগে বলে আত্মা হইতে শুধু অচিৎ বা প্রকৃতিকে বিযুক্ত করিলে মুক্ত আত্মা 'স্ব-স্বরূপে' অবস্থান করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে মায়া-উপাধিভূষিত আত্মাকে মায়া উপাধি হইতে অর্থাৎ অচিৎ-জড় হইতে বিমুক্ত করিতে উপদেশ দেয়। তাঁহাদের মতে, সাধনায় অগ্রসর হইয়া জীবরূপী আত্মা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া আত্মার ও তাহার সহিত যুক্ত মায়ার উভয়েরই দর্শন লাভ করে এবং মায়ার স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় মায়াকে অবগত হইলেই আত্মা হইতে মায়ার আবরণ অপসারিত হয় এবং আত্মা নির্গুণ ব্রহ্মে বা মহাপ্রকাশে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনায় আত্মা অচিৎ মায়ামুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে বটে কিন্তু ইহাতে আত্মায় আত্মবোধ বা 'শুদ্ধ অহং'-এর বিকাশ হয় না। ইহাতে আত্মা মায়াকে অচিৎ জ্ঞানে অনাত্মবোধে পরিহার করিয়া অর্থাৎ মায়া-উপাধি রহিত হইয়া ব্রহ্মের অতলতায় ডুবিয়া যায়, কিন্তু আত্মায় আত্মবোধের বা 'আমি'র স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। শক্তিমানের শক্তিমত্তার পরিচয়েই তাহার আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের তথা শক্তিমত্তার কোন পরিচয় নাই, যেহেতু তাঁহার মধ্যে শক্তিবিকাশের কোন সম্ভাবনাই নাই। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জ্ঞান-তপস্বীর ঈশ্বরত্ব লাভের পর অতলান্ত মহাপ্রকাশের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়াই হয়, আমি কে—এই আমিত্ববোধ অর্থাৎ আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত হয় না। আগমের সহিত অদ্বৈত বেদান্তের এইখানেই প্রভেদ।

আগমের দৃষ্টিতে পরব্রহ্মের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যশক্তি অনুস্যূত থাকে। অগ্নি ও ইহার দাহিকাশক্তির, সূর্য ও সূর্যরশ্মির ন্যায় পরব্রহ্মের সহিত স্ব-শক্তি অবিনাভাবে নিত্য যুক্ত থাকে। অবরোহক্রমে পরব্রহ্মই সঙ্কুচিত হইয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তি বা আবরণাত্মিকা শক্তির (যাহার অপর নাম যোগমায়া) দ্বারা আবৃত হন। আগম মতে এই আবরণাত্মিকা শক্তি চিৎ, অচিৎ নহে। কারণ, ইহা চিৎরূপ পরব্রহ্মেরই নিজ শক্তি। আগমে পরব্রহ্মেরই অপর নাম শক্তিসমন্বিতা পরমশিব।

সৃষ্টির ইচ্ছার উদ্‌গম হেতু পরমশিবের আত্মসঙ্কোচনের ফলে তাঁহারই শক্তি তাঁহাকে আবৃত করিয়া পূর্ণ স্বরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—আগমে ইহাকেই বলে 'আণবমল'। পরমশিব সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় আণবমলে আবৃত হইয়া নিজ পূর্ণ স্বরূপ বিস্মৃত হন; তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্বে পরম অদ্বৈত অবস্থায় 'আমি আছি' এই বোধ থাকে না বা 'আমি'র স্বরূপ জানা হয় না বা আপনাকে আপনি জানা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া।

* * *

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।

* * *

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।। (বলাকা)

সঙ্কুচিত পরমশিবের মধ্যে আণবমল যুক্ত হইয়া দুইটি তত্ত্বের উদ্‌ভব হইল—একটি শিবতত্ত্ব, অপরটি শক্তিতত্ত্ব। অর্থাৎ এক অদ্বয় পরমশিবই সৃষ্ট্যোন্মুখ হইয়া দুই হইলেন। কিন্তু এই অবস্থায় শিব ও শক্তি পৃথক নহে, পরস্পর সংযুক্ত। শিব প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর চিদ্‌রূপী শিবের সহিত নিত্য যুক্ত শক্তিও চিদ্‌রূপী। ইহার পরের অবস্থায় শিব ও শক্তি সংযুক্ত নহে, পৃথক। পৃথক হইলেও শিবের মধ্যে শক্তি অনুস্যূত থাকে এবং শক্তির মধ্যে শিব অনুস্যূত থাকে। কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না—যেহেতু শক্তিহীন শিব জড়। শক্তিশূন্য শিবের ক্রিয়াশক্তি নাই, প্রকাশরূপে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। শক্তি ক্রিয়াশীল; কিন্তু শক্তি সম্পূর্ণ শিবহীন হইলে স্পন্দনহীন অচিৎ জড়ে পরিণত হইত। উভয়েই ক্রিয়া-রহিত হইয়া জড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। তাই শিবের মধ্যে শক্তি অনুস্যূত থাকিয়া শিবকে সক্রিয় করে এবং এই সক্রিয়তার ফলে সৃষ্টি-সঙ্কল্পরূপ শিব-বীজ শক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং শক্তি তখন স্পন্দনশীল হইয়া অর্থাৎ সক্রিয় হইয়া সৃষ্টিকার্য সাধন করে।

আরোহক্রমে যোগী নিজের মধ্যে চিৎ-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সাধনবলে সেই শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়া 'স্বামী' হয়। তখন সেই যোগী ঈশ্বরত্ব

লাভ করে। যেহেতু তান্ত্রিক যোগীর মধ্যে শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং সেই শক্তি স্ব-শক্তিতে পরিণত হয়, সেইহেতু যোগী দেখিতে প্রায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শরীর—তিনিই সবকিছু হইয়াছেন। আগমে ইহাকেই বলা হয় 'বিশুদ্ধ অহং'-এর বিকাশ। তিনিই (যোগী) সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক হইয়া 'অহং' রূপে বিরাজ করিতেছেন। তখন তাঁহার নিকট অনাত্মক অচিৎ বলিয়া কিছুই নাই। ইহাকেই বলা হয় আত্মায় প্রকৃত আত্মবোধ জাগিয়া উঠা। যোগীর এই আত্মবোধের বা জাগ্রত চৈতন্যের মূলে রহিয়াছে শক্তির বিকাশ। তিনি সর্বশক্তিমান্, আর বিশ্ব ও বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত যাবতীয় বস্তুই তাঁহার শক্তির বিকাশ। অতএব আগমের ঈশ্বরত্ব এবং অদ্বৈত বেদান্তের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। শক্তির বিকাশ হেতু একের মধ্যে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়, আর শক্তিকে প্রথমাবধি পরিহার করিয়া চলায় অপরের মধ্যে শক্তির বিকাশ হয় না। তাই শুদ্ধ বিবেকমার্গী রিক্ত বৈরাগী যোগীর নিকট আত্মস্বরূপের পরিচয় চিরঅজ্ঞাত থাকিয়া যায়। আগমমার্গী যোগীর নিকট কোন বস্তুই অচিৎ নয়। অচিৎ বলিয়া যাহা প্রতীয়মান্ হয় তাহা মায়ামল ও কর্মমলের দ্বারা আবৃত আত্মবিস্মৃত পশু জীবের নিকট। কিন্তু জাগ্রত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত আগম-যোগীর নিকট তাহা বস্তুতঃ চিৎ-ই। কিন্তু বৈদান্তিকের নিকট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সব কিছুই অচিৎ জড়—আত্মা হইতে পৃথক অনাত্ম। বৈদান্তিক তপস্বী ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মার সহিত যুক্ত এই অনাত্মকে দেখিতে পায় এবং অনাত্মার সংস্রবমুক্ত হইয়া নির্মলত্ব প্রাপ্ত হইলে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণে পরব্রহ্মের মহাজ্যোতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া একাকার হইয়া যায়।

কিন্তু আগমে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ যোগী সশক্তক ঈশ্বরত্ব পদ লাভ করিলে তাঁহার মধ্যে 'শুদ্ধ অহং'-এর বিকাশ হয়। এই 'অহং'ও যখন পরমশিবে সমর্পিত হইয়া শিবরূপী যোগী পরমপিতার চরণে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে, তখন পরমপিতার কৃপায় বা অনুগ্রহে শিবরূপী যোগী এবং পরমপিতার মধ্যে আণবমলের যে সূক্ষ্ম আবরণটুকু তখনও থাকে তাহা অপসৃত হইয়া যায় এবং পরম আকাঙ্ক্ষিত পরমপদ লাভ হয়। তখন আর দ্বৈতের ভাণ থাকে না, একেবারে পূর্ণ অদ্বয় অবস্থা।

ইহারই সঙ্গে যুক্ত 'ইচ্ছা-জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি' সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। আত্মাতেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বর্তমান। এখানে ক্রিয়াশক্তি হইল মায়া। ক্রিয়াশক্তির পরিণাম অচিৎ জগত (materialised form)। ক্রিয়াশক্তির ঊর্ধ্বাবস্থায় জ্ঞানশক্তি। জ্ঞান হইল জ্যোতির্ময় আলো (light)। জ্ঞানের ঊর্ধ্বভূমি ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সাধকের সৃষ্টিক্ষমতা আয়ত্ত হয়। ইচ্ছারও ঊর্ধ্বে আনন্দ, আনন্দের ঊর্ধ্বে চিৎ বা শুদ্ধ প্রকাশ। শুদ্ধ চিৎ হইতে

কিছু সৃষ্টি হয় না। আনন্দ হইতে সবকিছু জাত হয়। আনন্দের বহির্মুখ অবস্থায় সৃষ্টির ক্রম উৎপন্ন হয়; আনন্দের অন্তর্মুখ অবস্থায় শুদ্ধ-চিৎ বা স্বপ্রকাশ। আনন্দের বহির্মুখ অবস্থা হইল অভাববোধ। শুদ্ধ-চিৎ অবস্থায় কোন ভাবও নাই, অভাবও নাই, সংবেদনও নাই, প্রতিবেদনও নাই। আনন্দের বহির্মুখ অবস্থায় যখন অভাববোধ জাগে অর্থাৎ কি যেন ছিল, হারিয়ে গিয়েছে—এই ভাব থেকে আকাঙ্ক্ষা জাগে। অভাববোধ বা আকাঙ্ক্ষা থেকে ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের উদ্রেক হয়। সঙ্কল্প উদিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির বীজ উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা হইতে জ্ঞানভূমিতে আসিয়া বীজ আকার গ্রহণ কবে। জ্ঞান জ্যোতির্মণ্ডল। ইচ্ছা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতির্মণ্ডলে স্পন্দন আরম্ভ হয়। যে বিষয়ে ইচ্ছা হয়, সেই বিষয় বা বস্তুটি স্পন্দিত জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্ফুরিত হইতে থাকে। বস্তুর সম্পূর্ণ স্ফুরণ হইলে উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্যোতির্মণ্ডল অবলুপ্ত হইয়া বস্তুটি জ্যোতির্ময় আকারে (luminous bodyরূপে)প্রকাশিত হয়। ঐ জ্যোতির্ময় বস্তুটি অন্তর্লোকে বা ভাবলোকে ideal form-এ বিরাজ করে। এই পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অন্তর্বাসী ভাব-বস্তুটি বহির্জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল অবয়ব গ্রহণ করে। অতএব ইচ্ছাতে যে বস্তু অব্যক্ত বা অনোন্মেষিত, জ্ঞানে উহা ভাবাকারে (ideal form) উন্মেষিত, ক্রিয়াতে তাহাই সাধারণভাবে ব্যক্ত(manifested in a concrete form or materialised)। ইহাই হইল সৃষ্টির অবরোহ ক্রম। আবার আরোহ ক্রমে ক্রিয়াশক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশক্তিতে এবং জ্ঞানশক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তিতে, ইচ্ছাকেও পবিত্যাগ করিয়া বা অতিক্রম করিয়া আনন্দভূমিতে এবং আনন্দ হইতে চিৎলোকে শুদ্ধ প্রকাশরূপী অবস্থায় স্ব-স্বরূপে অবস্থান পর্যন্ত জীবাত্মার উত্তরণ। আরোহ ক্রমে জ্ঞান-ক্রিয়া মিলিত (identified) অবস্থায় শুদ্ধ বিদ্যার উদয় হইলে শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শঙ্কর-বেদান্ত অনুসারে কেবল জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ সেখানে ব্রহ্ম হওয়া যায় বা শিব হওয়া যায়, চিদানন্দেরও অনুভব থাকে, কিন্তু উহাতে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্বের উন্মেষ হয় না। কারণ, শিবত্ব হইল শক্তি-সমন্বিত শিবাবস্থা। উহাতে সৃষ্টিক্ষমতা থাকে। কিন্তু কেবল জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা অদ্বয় ব্রহ্ম-সাধনায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিরোধ। ক্রিয়াকে পরিহার করিয়াই শুষ্ক জ্ঞানের সাধনা—এখানে শক্তিকে বর্জন। কিন্তু শাক্তমতে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব। সুতরাং শক্তিকে অর্থাৎ সৃষ্ট্যোন্মুখ অবস্থায় পরব্রহ্মের দ্বিধাবিভক্ত দুটি অংশের একটিকে বাদ দিয়া কখন পূর্ণত্ব আসিতে পারে না। অতএব শুষ্ক জ্ঞান সাধনায় যে ব্রহ্মাবস্থা লাভ হয়, উহা 'সোমনা' অবস্থা। এরূপ ব্রহ্মাবস্থাপ্রাপ্ত সাধক 'উন্মনা' অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

শৈব বা শাক্তাগম পন্থানুসারে যখন সাধক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তুরীয় অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন স্থিতি লাভ করে, তখন সেই সাধক জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়। তাঁহার ইচ্ছা করা মাত্র ক্ষণিকের মধ্যে যে কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে। এই সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানেই কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যশক্তির অধিকারী হওয়া। জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক ইচ্ছাশক্তিতেই সেই ঈষৎ স্বাতন্ত্র্যশক্তির উন্মেষ। এখানে ইচ্ছার দ্বারাই বস্তুর অভিব্যক্তি (materialisation)। আত্মাতেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আছে।

পরব্রহ্মের 'ত্রিপদ'—সৃষ্টি অর্থাৎ ভাবোন্মুখ, স্থিতি অর্থাৎ ভাব-অভিসঙ্গ (অবস্থান) এবং লয় অর্থাৎ ভাব-সংহার। ভাবোন্মুখ্য হইতে সৃষ্টি। পরব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইতে ভাববস্তুর (ideal form) অভ্যুদয়। ভাববস্তু যখন ক্রিয়াশক্তি যোগে বাহিরে স্থূলরূপে (materialised form) আবির্ভূত হয়, তখন আবির্ভূত বস্তুর সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধই স্থিতি বা অভিসঙ্গ। আর অন্তর্মুখী-গতিতে সংহার বা লয়। এই তিনের প্রধান ইচ্ছাসমন্বিত 'তুরীয়'। এই মতে তুরীয় হইল আনন্দঘন অবস্থা। সৎ ও চিৎ-এর ক্ষোভের দ্বারা আনন্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তুরীয় অবস্থা হইল যে-অবস্থায় সাধক-চিত্তে সচ্চিদানন্দের স্ফুরণ হয়।

শৈবমতে 'ভৈরব' অবস্থা হইল যেখানে লক্ষ্য এক। অর্থাৎ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দৃষ্টি একই লক্ষ্যে আবদ্ধ। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'—এ অবস্থা নয়। এরূপ অবস্থায় যা কিছু দেখে সাধকের অন্তর্মুখী লক্ষ্য থাকায় সবকিছুর মধ্যেই সেই এক 'আত্মা' দেখে—ইহাই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' দৃষ্টি। ইহাকেই বলে 'অন্তর্লক্ষ্য, বহির্দৃষ্টি।

সৃষ্টি বা ভাবোন্মুখ অবস্থার সূচনা কিরূপে হয়? পরব্রহ্মের ভাবোন্মুখতার পূর্ববর্তী অবস্থা হইল 'ভাবাতীত'। সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম ভাবাতীত অবস্থায় তাঁহার বিশুদ্ধ চিৎ তাঁহার 'সন্মাত্র'কে বা সৎ-সত্তাকে অর্থাৎ নিজ সত্তাকে দেখে। এই দেখাটা কিরূপে সংঘটিত হয়? অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎ এবং বিশুদ্ধ সত্তার মধ্যে সংযোগ সাধন করে কে? সেই সংযোগ-সাধনকারিণী হইলেন পরব্রহ্মের বিমর্শ-শক্তি। এই বিমর্শিনী শক্তি দ্বারাই বিশুদ্ধ চিৎ বিশুদ্ধ সৎ বস্তুকে দেখে—ইহাকেই বলে নাদন (নাদ)। বিশুদ্ধ চিৎ হইলেন 'শিবরূপী' (শুদ্ধ প্রকাশ) আত্মা—তিনিই দ্রষ্টা, সৎ-বস্তুই দৃশ্য, আর বিমর্শিনী-শক্তি করণ। এইরূপেই 'ত্রিকোণে'র উদ্ভব। অর্থাৎ পরব্রহ্মই একাধারে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও করণ কিম্বা কর্তা, কর্ম ও করণ। সৎ ও চিৎ-এর মিলনে আনন্দের উদ্ভব—'আনন্দেন খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে...।'

পরব্রহ্মের নির্বিশেষ (Universal) অবস্থানকে 'পর-সামান্য' বলে। নির্বিশেষ

অবস্থা নিস্তরঙ্গ। নিস্তরঙ্গ হেতু নিরুপাধিক। তাঁহার 'বিশেষ' অবস্থা হইল তরঙ্গ উপাধিযুক্ত। সৎ ও চিৎ-এর মিলনে আনন্দের উদ্‌ভব। আনন্দ যখন অন্তর্মুখী, তখন বিশুদ্ধ চিৎ। আর যখন বহির্মুখী, তখন ইচ্ছার উদয় হয়। আনন্দের যখন বহির্মুখীভাব, তখন অভাববোধ জাগে। কিসের জন্য অভাব-বোধ জানে না। তাই আকাঙ্ক্ষা আসে। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইচ্ছা উদিত হয়। ইচ্ছা নিস্তরঙ্গে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং 'ভাব' বিশেষ রূপে বা উপাধিরূপে স্ফুরিত হয়। ইচ্ছা creates disturbance in the equilibrium and ভাব comes into existence বিশেষরূপে বা উপাধিরূপে। ইহাকেই বলে ভাবোন্মুখ বা সৃষ্ট্যোন্মুখ অবস্থা।

অতএব পরব্রহ্ম ভাবাতীত এবং ভাবাত্মক অর্থাৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক যুগপৎ। ভাবাতীত বা বিশ্বাতীত 'পরসামান্য' (Universal) অবস্থাতেও সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং এক-বিজ্ঞানের দ্বারা যে সকল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় তাহা ঠিকই। 'পরসামান্য' জ্ঞান জন্মিলে সকল বস্তুকেই জানা যায়। 'পর সামান্য' জ্ঞান উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে না।

(ঙ) আত্মনিগ্রহ ও আত্মানুগ্রহ—পরমেশ্বর পরশিব নামে তান্ত্রিক গ্রন্থে অভিহিত হন। তন্ত্রমতে পরমেশ্বর বা পরশিব পঞ্চকৃত্যকারী—সৃষ্টি, পালন (স্থিতি), সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, এই পাঁচটি কৃত্যের মুখ্য কর্তা একমাত্র তিনি।

অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা শিব স্বেচ্ছাবশতঃ ন্যূনতা বা সঙ্কোচ গ্রহণ করেন। ইহাই অনুত্ব বা পশুভাবের উদ্‌ভব। তাঁহার স্বরূপ নিত্য পূর্ণ—তাহাতে (স্বরূপে) সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অভিনয় ছলে সঙ্কোচ গ্রহণ করিয়া নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করেন, অর্থাৎ অণু বা পশু সাজেন। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অভিনয়ে তিনি পরিমিত পশুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও বস্তুতঃ তিনি অপরিমিত শিবস্বরূপেই বিদ্যমান্ থাকেন।

বোধ ও স্বাতন্ত্র্যের অভিন্ন স্বরূপই পূর্ণত্ব। ইহাই শিবশক্তির সামরস্য। ইহা নিত্য। পূর্ণ যখন স্বেচ্ছায় অপূর্ণ সাজেন তখন বোধ ও স্বাতন্ত্র্য, যাহা স্বরূপে অভিন্ন ও এক, তাহা অপৃথক্ থাকিয়া যেন পৃথক্ হইয়া যায়। তখন বোধ শুধু বোধই থাকে। তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বা ক্রিয়াশক্তি জাগ্রত থাকে না। পক্ষান্তরে স্বাতন্ত্র্য বা ক্রিয়াশক্তি বোধহীন হইয়া অণুত্ব প্রাপ্ত হয়—একটি হয় পুরুষ, অপরটি হয় প্রকৃতি। পুরুষ শুদ্ধ বোধরূপ কিন্তু ক্রিয়াহীন। প্রকৃতি নিত্য পরিণামী বলিয়া ক্রিয়ারূপা, কিন্তু বোধহীন। দুইই অপূর্ণ। 'অণু'ভাব

আসার পর শুদ্ধ বোধক্ষেত্রে বিকল্পের উদয় হয়। তখন বিন্দু বা মহামায়ার ক্ষোভজনিত মাতৃকামণ্ডল তাহাকে আক্রমণ করে। বাসনাদির অভিব্যক্তির মূল কারণ ইহাই। ইহাকে শব্দজাল বলা চলে। বস্তুতঃ ইহাই কর্মবীজ বা কার্মমল। ইহার পর মায়া ক্ষুব্ধ হইলে মায়িক তত্ত্বের দ্বারা একটি আচ্ছাদন জন্মে। তখন সংসারে প্রবেশ হয় এবং কর্মানুষ্ঠান ও কৃতকর্মের ফলভোগ হয়।

পশু আত্মার যে সংসারানুভব হইয়া থাকে তাহার একমাত্র কারণ ত্রিবিধ মল বা পাশের সহিত সম্বন্ধ। পশু আত্মা আণবমল, কার্মমল ও মায়ামল এই ত্রিবিধ পাশ দ্বারা আবদ্ধ। ত্রিবিধ মল নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর এই পশু-আত্মাকে মায়াখ্য অশুদ্ধ অধ্বায় কর্মভোগাত্মক সংসার প্রাপ্ত করাইয়া নিগ্রহ করেন। ইহাই তাঁহার নিগ্রহ বা তিরোধান নামক কৃত্য যাহা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিন কৃত্যেরই অনুগত। তিরোধানের নামান্তর রোধ। সেইজন্য মলকে চৈতন্যের রোধক বা প্রতিবন্ধক বলা হয়।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা শিবই ক্রমশঃ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া সংসারী সাজেন। ইহাই তাঁহার আত্মনিগ্রহ। তদ্রূপ সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে সীমাতীত অবস্থাতে যাওয়াও তাঁহার স্বেচ্ছাবশতঃ জানিতে হইবে। কারণ তিনি স্বতন্ত্র ও অন্যনিরপেক্ষ। ইহাই তাঁহার অনুগ্রহ ব্যাপার। অনুগ্রহের ফলে সংকোচ কাটিয়া যায় এবং ক্রমশঃ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণতা উন্মীলিত হয়। কৈবল্যাবস্থাতে কর্ম ও মায়া কাটিয়া গেলেও আণবমলরূপ সংকোচ কাটে না। অণুভাব থাকিয়া যায়। তাই এই অবস্থায় নিষ্কল বিজ্ঞানস্বরূপে স্থিতি হইলেও, মায়া অতিক্রান্ত হইলেও, স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয় না, ক্রিয়াশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয় না। আত্মা তখন মায়াতীত চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, নিষ্ক্রিয় এবং কেবলী কিন্তু তথাপি পশু। বৈরাগ্য, বিবেকখ্যাতি, তত্ত্বভেদ প্রভৃতির ফলে মায়াতীত অবস্থা লাভ হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ ঊর্ধ্বশক্তির সঞ্চার না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ আণব মল পক্ব হইয়া ভগবদনুগ্রহের অবতীর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কার না করে, ততক্ষণ প্রকৃত ভগবত্তালাভ হয় না। যাহা ঊর্ধ্বশক্তির সঞ্চার বা ভগবদনুগ্রহ, তাহাই আত্মানুগ্রহ।

নিগ্রহ যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছার বিলাস, অনুগ্রহও তেমনি তাঁহার স্বেচ্ছারই বিলাস। 'স্বেচ্ছা' না বলিয়া শব্দান্তর দ্বারা ঐ ভাবটিকে 'স্বভাব' বা 'খেয়াল' বলা হইয়া থাকে। বস্তু একই, শুধু ক্রমটি বিপরীত। এক হইতে বহু হওয়ার মূলে যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছা রহিয়াছে, তেমনিই বহু হইতে পুনর্বার এক হওয়ার মূলেও সেই একই স্বেচ্ছা রহিয়াছে। শুধু ক্রমটি বিপরীত। একটি, এক হইতে বহুর দিকে, অন্তর হইতে বাহিরের দিকে; এবং অপরটি, বহু হইতে একের দিকে, বাহির হইতে অন্তরের দিকে। ক্রিয়ার বা গতির দিকটি মাত্র বিপরীত। এইজন্য 'বিপরীত ক্রম' বলা হইয়াছে।

যিনি অভিনয়ের মধ্যেও 'দ্রষ্টা' হইয়া আছেন, নিজের বাহিরে আসা ও ভিতরে যাওয়া নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টারূপে নিজেই দেখিতেছেন, তিনি কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে সমরস, তাঁহার ভিতর-বাহিরের কোন ভেদ নাই। তিনি এক হইয়াও নানা এবং নানা হইয়াও এক। তিনি স্থিতিস্বরূপ। এক হইতে বহু হওয়া = সৃষ্টি। বহু হইতে এক হওয়া = সংহার।

সকল পশু-আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, বিভু ও চেতন। কিন্তু সংসারাবস্থায় পশু-আত্মা তাহার ঐ সকল ধর্মের বিকাশ অনুভব করিতে পারে না। ইহার কারণ, অনাদিকাল হইতে পশু-আত্মা আণবমল, কার্মমল ও মায়ামল এই তিন প্রকার পাশের দ্বারা আবদ্ধ। এই তিন প্রকার পাশে আবদ্ধ আত্মাগুলিকে শৈবাগমে 'স-কল' আত্মা বলে। ইহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান। দেহ ভোগায়তন—পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল ভোগের জন্য স্থূল ভোগায়তন দেহ গঠিত হয়। প্রারব্ধ কর্মের ভোগান্তে দেহ নাশ হয়।

আর এক প্রকার উন্নত আত্মা আছে—ইঁহাদের বলা হয় 'বিজ্ঞানাকল'। ইঁহারা বিদেহ। বিদেহ অবস্থা-প্রাপ্তির মূল কারণ হইল বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ চিদাত্মা যখন নিজেকে অচিৎ হইতে বিবিক্ত বা পৃথক বলিয়া বুঝে তখন চিরদিনের জন্য অচিৎ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্ময় নিজ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। এই সকল জীবকে বিজ্ঞানাকল বলে।

বিজ্ঞানাকল জীব তিন প্রকার—(১) প্রকৃতি হইতে চিৎ বিবিক্ত হইলে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নিম্নতম বিজ্ঞানকৈবল্য; (২) মায়া হইতে বিবেক সংঘটিত হইলে মধ্যম বা দ্বিতীয় প্রকার বিজ্ঞানকৈবল্যের উদয় হয়; (৩) এইরূপ মহামায়া হইতে বিবেক ঘটিলে উচ্চ স্তরের বিজ্ঞানকৈবল্য লাভ হয়। এই তিন প্রকার বিজ্ঞানাকল অবস্থায় কার্মমল, মায়ামল না থাকিলেও আণবমল থাকে। এই আণবমল অপগত না হইলে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই পশুত্ব। পশুত্বের বা আণবমলের নিবৃত্তির একমাত্র উপায় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার এবং তাহার জন্য চাই দীক্ষারূপা ক্রিয়া। দীক্ষাই পরমেশ্বরের প্রাথমিক অনুগ্রহ। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে ইহা সম্পন্ন হয়। সদ্‌গুরু প্রদত্ত দীক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবের সাধনার প্রভাবে কার্মমল ও মায়ামল সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় এবং আণবমলও ক্ষীণ হইয়া আসে অর্থাৎ পরিপক্কতা লাভ করে। তখন পরমেশ্বর অনুকম্পাবশতঃ আণবমল-রূপ পাশের বন্ধন মোচন করিয়া পশু-আত্মাকে নিজের মত করিয়া লন। ইহাই পশুর শিবসাধর্ম্যাভিব্যক্তি রূপ অনুগ্রহ বা মোক্ষ। সেইজন্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—এই পঞ্চবিধ কৃত্যকারী পরমকারুণিক পরমেশ্বরই উপাস্য; আর দীক্ষা শুদ্ধ আত্মাই তাঁহার উপাসক।

দীক্ষার পর সাধনার দ্বারা শুদ্ধ বিদ্যার উদয় হইলে শিবত্বলাভের মার্গ প্রাপ্তি ঘটে। এই মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রম অবলম্বনপূর্বক ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে

হয়। শুদ্ধ বিদ্যার উদয়ে বিশুদ্ধ অহন্তার অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। মায়ার আবরণে আবৃত জীব যে অহং-এর সহিত পরিচিত, তাহার স্বরূপ অনাত্মাতে আত্মবোধমাত্র। বস্তুতঃ ইহা অজ্ঞানেরই বিলাস। অদ্বৈতাগমে অজ্ঞানের আরও একটি রূপ আছে, তাহা আত্মাতে অনাত্মবোধ, কিন্তু উহা অনেক উপরের অবস্থা। এ সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই উভয় প্রকার অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে আত্মা নিজেকে শিবরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। উহাই আত্মার বিশুদ্ধতম রূপ।

পূর্বোক্ত তিন প্রকার বিজ্ঞানাকল পশু বা জীবের সকলেরই আণবমল বা আত্মসংকোচ থাকে। পরমশিবের আত্মসংকোচের ফলে যে শিবতত্ত্ব ও শক্তি তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এই দুই তত্ত্বই আণবমলে আবৃত। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের সংযোগে ও বিয়োগে (combination and permutation) যে জীব-সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়, সেই সকল জীবই অনাদিকাল হইতে আগত আণবমলের দ্বারা আবৃত থাকে। তারপর মায়ামল যুক্ত হয় এবং সংসারে প্রবেশ হয়। মায়ামলে আবৃত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় সংসার জীবনে অশুদ্ধ অহং-অভিমানে জীব যে সকল কর্ম করে তাহাই কর্মসংস্কাররূপে কার্মমলের সৃষ্টি করে। এইরূপে মায়ামল ও কার্মমলের দ্বারা আবৃত হইয়া জীব ঘোর পশু অবস্থায় সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হইতে থাকে। সেজন্য জীবকে প্রথমে কার্মমল ও মায়ামল হইতে মুক্ত হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ ও সাধনা করিতে হয়। দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার ফলে জাগতিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ এবং পরে চিৎস্বরূপ কৈবল্যে স্থিতিরূপ অপবর্গ সম্ভব হয়, কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ সম্ভব নয়। কারণ তখনও আণবমল থাকিয়া যায়। এই আণবমল দূর করিবার জন্য পরমশিবের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার আবশ্যক হয়। এই অনুগ্রহ-সঞ্চার বা শক্তিপাত পূর্ণত্ব লাভের প্রাক্ সর্ত (pre-condition)।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনবচ্ছিন্ন শিব আণবমলের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব সাজেন। আবার পরিচ্ছিন্ন জীবকে অনুগ্রহের দ্বারা অর্থাৎ কৃপা বর্ষণ করিয়া উদ্ধার করেন। এক কথায় শিবও তিনি, জীবও তিনি, আবার উদ্ধার কর্তাও তিনি।

কোনো জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা জাগে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে এই ইচ্ছা জাগে কখন? তিনি কি আপন খেয়ালখুশি মত অনুগ্রহ করেন? তাহা হইতে পারে না। তিনিও তাঁহারই তৈরী নীতি বা নিয়ম মানিয়া চলেন। যখন কোনো জীবের মল পরিপক্ক হয় অর্থাৎ জীবের আধার প্রস্তুত হয়—তাহা সৃষ্টিকালের মধ্যেই হউক বা প্রলয়কালের মধ্যেই হউক—তিনি তাহাকে অনুগ্রহ করেন।

জীবের মল পরিপক্ক হয় কিসের দ্বারা? কালের দ্বারা। কাঁচা আমকে

কালই যেমন পরিপক্ক করে, তেমনি জীবের মলকে কালই পরিপক্ক করে। জীব যদি ভাল কিম্বা মন্দ কোনরূপ কার্য না করে, তাহা হইলে কালের স্বাভাবিক গতি অনুসারে যথা সময়ে সেই জীবের মল আপনা হইতে পক্ক হইবে। কিন্তু জীবের যদি সাধনায় তীব্র 'সংবেগ' থাকে তাহা হইলে তাহার মল পরিপক্ক হইতে কালের স্বাভাবিক গতি অনুসারে যত সময় লাগিত, তীব্র সংবেগের ফলে তাহা অনেক আগেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সংবেগের তীব্রতা অনুসারে মলের পরিপক্কতার সময়কাল দ্রুত বা ত্বরান্বিত বা সংক্ষিপ্ত হয়। ইহার বিপরীত যাহারা অধর্মাচরণ করে, তাহাদের মল পরিপক্ক হইতে স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা বিলম্বিত হয়।

সংবেগেরও তিনটি রূপ আছে; যেমন—তীব্র, মধ্য ও মৃদু। আবার এই তিনের মধ্যেও নয়টি ভেদ আছে; যেমন—তীব্র-তীব্র, তীব্র-মধ্য, এবং তীব্র-মৃদু; মধ্য-তীব্র, মধ্য-মধ্য, মধ্য-মৃদু; এবং মৃদু-তীব্র, মৃদু-মধ্য ও মৃদু-মৃদু। সংবেগের এইরূপ নয়টি বিভাগ অনুসারে জীবের মল পরিপাকের সময়কালেরও তারতম্য ঘটে। জীবের মধ্যে সংবেগ তীব্র-তীব্র হইলে মল-পরিপাক সর্বাপেক্ষা দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

দীক্ষা—জীবের মল পরিপক্ক হইলে শিবের অনুগ্রহ-শক্তি বর্ষিত হয় বা অধ্যাত্ম জ্ঞান-বীজ তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে বা দহরাকাশে রোপিত হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত দীক্ষা। আবার দীক্ষারও প্রকারভেদ আছে। জীবের আধার অনুসারে দীক্ষার প্রকারভেদ ঘটে। যাহার মধ্যে মল পরিপক্ক হইয়াছে এবং দেহাত্মবোধ নাই বা দেহাভিমান নষ্ট হইয়া গিযাছে, তাহার উপর শিবের অনুগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু যাহার মধ্যে মল পরিপক্ক হইলেও দেহাভিমান থাকে, তাহার উপর শিবের অনুগ্রহ প্রত্যক্ষরূপে বর্ষিত হয় না। কোন সিদ্ধাচার্য সদ্গুরুর মাধ্যমে তাঁহার কৃপা তাহাব হৃদযে সঞ্চারিত হয়। এইজন্য দীক্ষার তিনটি স্তব নির্ণীত হইয়াছে। সেই তিনটি স্তর হইল তিন 'ওঘ'; যেমন—দেবৌঘ (দেব+ওঘ), সিদ্ধৌঘ (সিদ্ধ+ওঘ) এবং মানবৌঘ (মানব+ওঘ)। বৌদ্ধধর্মে যেমন ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়—এই তিন ভেদ। খ্রীষ্টধর্মে যেমন 'Trinity'- God the father, God the son and the holy ghost; 'ওঘের'ও সেইরূপ তিন ভেদ।

যাহার উপর প্রত্যক্ষরূপে শিবের ইচ্ছারূপা কৃপাশক্তি বর্ষিত হয়, তাহার দেহাভিমান না থাকায় কৃপা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-চক্ষুর উন্মিলন হয়; তাহার আর ক্রিয়ার (সাধনার বা জপের) দ্বারা জ্ঞানবীজকে প্রস্ফুটিত করিতে হয় না। ইহাব প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'শুকদেব'। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম-জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেহেতু তিনি জন্মাবধি দেহাভিমানশূন্য ছিলেন। তথাপি তাঁহার মধ্যে বিশ্বাস না আসায় তাঁহার পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে রাজর্ষি

জনকের নিকট শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। কবিরাজজীর মুখ থেকে শোনা যে শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু 'গৌড়পাদ' অনুরূপভাবে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। 'মা আনন্দময়ী'ও অনুরূপ প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহার দেহাভিমান আছে, মল পরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও সে প্রত্যক্ষভাবে (direct) পরমশিবের নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হয় না। পরমশিবেরই জ্ঞানরূপা ইচ্ছাশক্তি সিদ্ধগুরুর মাধ্যমে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত (transmitted) হয়। তাহার মধ্যে গুরুর দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চারিত হইলেও সে-সম্বন্ধে সে অচেতন থাকে। সেইজন্য জপাদি ক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে হয়।

যাহার মধ্যে পাতঞ্জল যোগ অনুসারে 'বিবেকখ্যাতি' উদয়ের ফলে দেহাভিমান হইতে বিচ্যুত হয় এবং আণবমলও পরিপক্ক হইয়া যায় অথবা প্রলয়কালে যে জীবের আণবমল পরিপাক হইয়া যায়—উভয় ক্ষেত্রেই শিবের কৃপা প্রত্যক্ষভাবে বর্ষিত হয়।

সাধারণ জীব মল পরিপাকের কালকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য 'মানবৌঘ'রূপ সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীক্ষা-মন্ত্র জপের দ্বারা এবং সদ্ভাবে জীবনযাত্রার দ্বারা পরবর্তীকালে সিদ্ধাচার্যরূপ (সিদ্ধৌঘ) সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শিবের কৃপা বা অনুগ্রহ লাভের জন্য আধার প্রস্তুত করিতে থাকে।

মল পাকের মাত্রানুসারে দীক্ষাও তিন প্রকার; যথা, 'সময়-দীক্ষা', 'বিশেষ-দীক্ষা' এবং 'নির্বাণদীক্ষা'। জন্মজন্মান্তরের পুণ্য কর্মানুষ্ঠান ও সদাচারের ফলে 'আধার' কিঞ্চিৎ তৈরী হলে প্রথম দীক্ষার অবসর আসে। জন্ম-জন্মান্তরের অশুদ্ধ দেহাত্মাভিমানে কৃত-কর্মের সঞ্চিত সংস্কার-বীজ ধ্বংস করাই এই দীক্ষার উদ্দেশ্য। তন্ত্রে ইহাকে 'সময়দীক্ষা' বলে। ইহাই প্রাথমিক কৃপা বা অনুগ্রহ। তন্ত্রে ইহাকেই 'শক্তিপাত' বলে। প্রাথমিক দীক্ষায় কিঞ্চিৎ মাত্রাতে শক্তিপাত হয়। মল পাকের অর্থাৎ আধার তৈরীর মাত্রানুসারে শক্তিপাতের তারতম্য ঘটে। শক্তিপাতের মাত্রানুসারে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধানিষ্ঠাদি তদনুরূপ মাত্রাতে বৃদ্ধি পায়।

মল আরও পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ শিষ্যের আধার আরও উচ্চ হইলে 'বিশেষ-দীক্ষা' নামক দ্বিতীয় দীক্ষার অবসর ঘটে। এই দীক্ষাতে দ্বিতীয় জন্ম নিষ্পন্ন হয়। চিন্ময় মন্ত্রের সাধনে সাধকের শুদ্ধ সত্তায় গঠিত বৈন্দব দেহের ক্রমশ বিকাশ হয়। বৈন্দব দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত চিৎ-শক্তিরও উন্মেষ হয় এবং শাক্ত-সাধক শুদ্ধ অধ্বায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃথিবী হইতে কলাতত্ত্ব পর্যন্ত মায়ার অন্তর্গত। ইহাই সংসারমণ্ডল। ইহার পর শুদ্ধবিদ্যার রাজ্য। শুদ্ধবিদ্যাই বাগীশ্বরী। এই বাগীশ্বরীর গর্ভে জন্ম হইলেই শুদ্ধ ধামে অবস্থানের অধিকার জন্মে। ইহাই বস্তুতঃ দ্বিতীয় জন্ম। গুরু বা

আচার্যই এই জন্মের দাতা বা পিতা। এই জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে মায়ারাজ্য অতিক্রম করিবার 'উপায়' অধিগত হয়। আগমমতে এই তিন প্রকার দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত তিন 'উপায়' সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে দ্বিতীয় জন্ম বস্তুতঃ বৈন্দব দেহ লাভেরই নামান্তর।

দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া শুধু শুদ্ধ বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত হইলেই শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না, যেহেতু আণবমল তখনও বিদ্যমান থাকে। ইহার জন্য তৃতীয় দীক্ষার প্রয়োজন। দ্বিতীয় দীক্ষার পর একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মলপাক বিশিষ্টভাবে সম্পন্ন হইলে তীব্রতর ভগবৎ-শক্তির সঞ্চার হয়। তদনুসারে 'নির্বাণদীক্ষা' নামক তৃতীয় দীক্ষার অবসর ঘটে। এই প্রকার দীক্ষাপ্রাপ্ত আত্মাতেই পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হইতে পারে। প্রথম দীক্ষা ও দ্বিতীয় দীক্ষার ফলে আণবমল বা পশুত্বের অপগম হয় না।

দীক্ষা সম্বন্ধে তান্ত্রিক দর্শনে আরও বলা হইয়াছে যে প্রাথমিক দীক্ষার ও সাধনার প্রভাবে জীবের ঈশ্বরত্ব লাভেরও যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ও ভোক্তা হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে সাধক-স্তরে উন্নীত যোগী 'বুভুক্ষ' ও 'মুমুক্ষ' ভেদে দুই প্রকার। তদনুসারে তাঁহাদের দ্বিতীয় দীক্ষাও দুই প্রকার। বুভুক্ষ সাধক ভোগার্থী বলিয়া 'ভৌতিক দীক্ষা'র অধিকারী। তাঁহারা এই দীক্ষার প্রভাবে শুদ্ধ জগতে বিচিত্র ভুবন ও ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হন। এই দীক্ষার প্রভাবে কোনো কোনো সাধক মন্ত্রেশ্বর পদও লাভ করেন। দীক্ষিত ভোগার্থী সাধক অণিমাদি ঐশ্বর্য ভোগের জন্য গুরু কর্তৃক ঊর্ধ্বলোকে চালিত হন। ভোগের অন্তে ভোগের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইলে ঐ স্থান হইতেই পরমেশ্বরের নিষ্কল-স্বরূপে যোজিত হন।

কিন্তু যাঁহারা 'মুমুক্ষ' অর্থাৎ মোক্ষার্থী, তাঁহারা বৈন্দব রাজ্যের ভোগে বীতস্পৃহ। এই সকল সাধক 'নৈষ্ঠিক দীক্ষা'র অধিকারী। এই দীক্ষার প্রভাবে শিবশক্তিময় সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার জন্মে।

উপায়—সময়দীক্ষা, বিশেষদীক্ষা ও নির্বাণদীক্ষার সহিত সম্পৃক্ত তিন 'উপায়ের' কথা শৈবাগমে বলা হইয়াছে। এই তিন উপায় হইল—(১) আণব উপায়, (২) শাক্ত উপায় এবং (৩) শাম্ভব উপায়।

মায়ার দ্বারা অভিভূত জীবের মূলাধারে জীবের চৈতন্যশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকে। মায়ার দ্বারা চৈতন্যশক্তি অভিভূত থাকে বলিয়াই জীবের মধ্যে বিকার বা বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয়। বিকার বা বিকল্প জ্ঞান ছুটিয়া গেলেই কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ হয়। বিকার বা বিকল্পের ছুটিয়া যাইবার জন্য যে জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, তাহাই আণব উপায়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিত্যকাল ধরিয়া একটি ভগবৎমুখী ধারা আছে।

কুণ্ডলিনী সুপ্ত থাকার ফলে সেই ধারা রুদ্ধ থাকে। আণব উপায়ের দ্বারা সেই রুদ্ধমুখ একবার উন্মোচিত করিতে পারিলে ভগবৎমুখী স্রোত অবারিত ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই স্রোতের মুখে সাধক নিজেকে পতিত করিতে পারিলে স্রোতের মুখে পতিত পুষ্পের ন্যায় উহা সাধককে আপনার গতিতে ভগবৎ-ধামে (শিব-ধামে) লইয়া যায়। তখন আর জপ-তপ, ধ্যান-ধারণার কোন আবশ্যকতা থাকে না। ইহাই শাক্ত-উপায়। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে বা সুষুম্না পথে সহস্রারে শিবের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হয়। কুণ্ডলিনীর এই ঊর্ধ্বগতির পথে ষট্চক্রের ভেদ হয়। চক্রভেদ মানেই এক একটি চক্রে যে যে বর্ণ থাকে সেই সেই বর্ণ বিগলিত হইয়া ধ্বনিতে পরিণত হয়। সমস্ত চক্র ভেদ হইলে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই 'পরাবাক' বা পরাশক্তি।

কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা বাহিত হইয়া শিবধামে অর্থাৎ সহস্রারে শিবের সহিত সাধকের মিলন হইলে সাধকের মধ্যে শিবত্বের সংযোজন হয়। কিন্তু তখনো 'শিবোঽহং' এই বোধ সাধকের হয় না। শাম্ভব উপায়ে সেই বোধ জাগ্রত হয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধকের মধ্যে উন্মনা শক্তির বিকাশ হয়। শাম্ভব উপায়ে পূর্ণ জাগ্রত চৈতন্যই হইল স্বাতন্ত্র্যশক্তি। তখনই শুদ্ধ বোধময় বা প্রকাশময় শিবের সহিত স্বাতন্ত্র্যশক্তির যোগযুক্ত অবস্থার উপলব্ধিই হইল সাধকের পরম প্রাপ্তি।

অতএব শৈবধর্মে আত্মব্যাপ্তি, বিদ্যাব্যাপ্তি ও শিবব্যাপ্তি—আত্মার এই তিন অবস্থা লক্ষ্য করি। আত্মব্যাপ্তি হইল কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মায়া-ভেদ ও বিকল্প জ্ঞানের বা দ্বৈত জ্ঞানের অবলুপ্তি। বিদ্যাব্যাপ্তি হইল জাগ্রতা কুণ্ডলিনীর সুষুম্না পথে শিবধামের দিকে ঊর্ধ্বগতি—ইহাই শুদ্ধ বিদ্যা। শিবব্যাপ্তি হইল সহস্রারে শক্তির মিলন----পরমশিবপদ প্রাপ্তি।

পরমপদে অনুপ্রবেশের পর স্ফুরণ বা প্রসারণ ধর্মবশতঃ সাধক পরমপদ হইতে বাহির হইয়া যে দৃষ্টি লাভ করে তাহা সমদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি। অনন্ত সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে পরব্রহ্মেরই বিচিত্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়; আবার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক পরমব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব একই কালে যুগপৎ হইতে থাকে। এই উভয় কোটি—জগতাত্মক ও জগতাতীত—পরব্রহ্মের এই দুই বিরুদ্ধ যুগ্ম রূপের সমাবেশ একই কালে সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। যেমন—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জ্ঞানের সাথে সাথেই ভারতবাসী অর্থে সকলের সম্বন্ধে 'এক' জ্ঞান যুগপৎ উদিত হয়। পরব্রহ্মের জগতাত্মক রূপটিই পরব্রহ্মের প্রসারণ (পঞ্চদশ কলার পূরণে পূর্ণিমা-রূপ), আর তাঁর জগতাতীত রূপটি তার সঙ্কোচন বা

একটি কলায় স্থিতি 'অমাকলা'। তাঁর এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম-রূপটি যুগপৎ তাঁর মধ্যে সমাবিষ্ট থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে। এটা সম্ভব তাঁর স্বাতন্ত্র্য শক্তির জন্য।

ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই যাবতীয় সৃষ্টি—প্রথমে উহা জ্ঞানের মধ্যে ভাবরূপে, পরে ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ মায়াশক্তির দ্বারা জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূল জ্ঞেয়রূপে পরিণত হয়। ইচ্ছাশক্তির পূর্বেও সৃষ্টি আছে আভাসরূপে। তাহা না হইলে যাহা নাই তাহা ইচ্ছাশক্তি কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ইচ্ছার দ্বারা বহির্মুখী সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ পরমস্বরূপে একীভূত অবস্থায় থাকে। স্বাতন্ত্র্যযুক্ত বোধরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণ অবস্থায় নিমিলন বা আকুঞ্চন ধর্ম বশতঃ সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ-স্বরূপে বীজরূপে অবস্থান করে। প্রসারণ ধর্ম বশতঃ সমগ্র বিশ্ব পরব্রহ্মে জ্ঞান শক্তি দ্বাবা আভাসিত হইয়া উঠে এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ সত্তা হইতে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ বাহিরে স্ফুরিত করে। ইহাতে পরব্রহ্মের কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সমুদ্র হইতে এক ঘটি জল লইলে যেমন সমুদ্রের কিছুমাত্র আসে যায় না।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিন ধর্ম তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত। সাধক প্রথমে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপে প্রবেশ করে। স্বভাবের অনুকূল আনন্দ, প্রতিকূল দুঃখ। সুতরাং আনন্দস্বরূপে আনন্দ ও দুঃখ দুইই আছে। সাধক তখন আনন্দেরও উপরে উঠিতে চায়। সাধক তখন অনুকূলও চায় না, প্রতিকূলও চায় না। সাধকের এরূপ ভাবাবস্থায় শুদ্ধ চিত্তের স্ফুরণ ঘটে। সাধক ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপে প্রবেশ করে। চিৎ-এর মধ্যে সৎ-এর আভাস। সৎ-ই হইল Supreme Truth। সৎ-এর স্ফুরণের দ্বারাই চিৎ-এর কার্যকারিতা শেষ হইয়া যায়। তখন চিৎ লুপ্ত হইয়া যায়, আর চিৎ-এর লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সৎও নিরাভাস হইয়া যায়। যেমন যতক্ষণ উপকরণ থাকে ততক্ষণই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। উপকরণের নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিও আর থাকে না, আপনা হইতে নির্বাপিত হইয়া যায়। সৎও সেইরূপ চিৎ-এর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করে। তখন যা থাকে তাকে বর্ণনা করা যায় না—সমস্ত কিছুর অতীত এমন একটা কিছু যাকে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন 'শূন্য'।

শৈবমতের আণব, শাক্ত ও শাম্ভব উপায়ের সহিত বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ অবস্থার তুলনাঃ—শৈবধর্মের যে principle, বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মেরও সেই principle, এমন কি বৌদ্ধধর্মেরও সেই একই principle। সকলেরই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ্যে পৌঁছাইবার প্রণালীও প্রায় একরকম। তবে বিভিন্ন ধর্মে প্রণালীর বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে এবং বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাধনগত উপলব্ধির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। কাশ্মীরী শৈবদর্শনে লক্ষ্যে পৌঁছাইবার মৌল উপায় তিনটিঃ যথা, আণব-শাক্ত-শাম্ভব উপায়। প্রাথমিক উপায় হইল আণব-উপায়। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র, যাহা পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া আব কিছু নয়, কোন সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজের পুরুষকার দ্বারা অর্থাৎ জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা-আসন-প্রাণায়াম প্রভৃতির দ্বারা সেই সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটায়। কারণ, ভৌতিক বা মায়িক মল যুক্ত দেহবন্ধন-জন্য সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও সেই দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকে। জপতপ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা মলমুক্ত হইলে তাহার নিকট জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে থাকে। জপতপ প্রভৃতি ক্রিয়া হইল আণব-উপায়। আণব-উপায়ের সাধনার দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ না হওযা পর্যন্ত মানুষ অচিৎ-ধর্মী, গাঢ় সুষুপ্তিতে অচৈতন্য, অজ্ঞানী। এই অবিবেক-অজ্ঞান অবস্থায় কখন প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধনা হইতে পারে না। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র লাভ করিয়া জপতপ প্রভৃতি নিজস্ব চেষ্টার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হইলে, সেই জাগ্রতা-শক্তির আপন স্বভাবে ঊর্ধ্বগতি হয। তখন আর কোন জপতপ প্রভৃতি বাহ্য সাধনার প্রয়োজন হয় না। ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি সাধককে আপন ক্রোড়ে লইয়া অগ্রসর হয়। ইহাই শাক্ত-উপায়। শক্তির ক্রোড়ে থাকিয়া সাধকের এই ঊর্ধ্বগতির ফলে সাধক-দেহও transformed অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। দীক্ষার ইহাই ফলশ্রুতি। দীক্ষার প্রকৃত অর্থ ইহাই। অর্থাৎ মায়িকমলযুক্ত দেহের মায়িকমল-শূন্য হইয়া শুদ্ধ সত্ত্ব শরীর বা বৈন্দব শরীর লাভ। শিবধামে শিবের সহিত শক্তির মিলনে সাধক-জীবও শিবত্বে উন্নীত হয় অর্থাৎ সাধক-জীবই তখন শিব হইয়া যায়। এরপরও পরমশিবের সহিত এক হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে পরমশিবত্ব যোজক যে শক্তি, সেই উন্মনা শক্তির উন্মেষ হয়—ইহাই শাম্ভব উপায়।

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে সেই একই প্রণালী—সম্প্রদায়গত বিশিষ্ট পন্থানুসারে অনুসৃত হইয়া পৃথক নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই ধর্মে প্রবর্ত্ত-সাধক-সিদ্ধ এই তিন অবস্থা। প্রবর্ত্ত অবস্থায় সাধনভক্তি। সাধনভক্তির আচরণ দুই প্রকার: এক নামসাধনা, অপর সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রসাধনা। অতএব প্রবর্তকের আশ্রয় দুই প্রকার: প্রথম নামাশ্রয়, পরে মন্ত্রাশ্রয়—ইহা আণব উপায়ের সহিত তুলনীয়। নামসাধনার দ্বারা প্রবর্তকের আধার তৈরী হইলে দীক্ষাগুরু তাহার হৃদয়ে বীজমন্ত্র বপন করেন। দীক্ষার মাধ্যমেই ভগবদ্‌ অনুগ্রহ বা করুণা শিষ্যের উপর বর্ষিত হয়। আগমের পরিভাষায় ইহাকে 'শক্তিপাত' বলে।

মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইলে প্রবর্তক সাধক-দশায় উন্নীত হয় এবং কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়। শক্তির জাগরণে সহজিয়া সাধক আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্ত্রসিদ্ধির আবও একটি সুফল হইল এই যে মন্ত্রের স্ফুরণে অনাত্মায় আত্মবোধ বিনষ্ট হইয়া আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সহজিয়া ভক্ত-সাধকের আত্মার সহিত নিত্যযুক্ত ও নিত্য সিদ্ধ স্ব-ভাবের স্ফূর্তি হয় এবং শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভাবভক্তির উদয় হয়। এইজন্য এই সময়ে সহজিয়া সাধকের সাধনা হইল ভাবাশ্রিত হইয়া রাগের অনুশীলন করা। তখন আর বৈধীভক্তি আচরণের প্রযোজন হয় না। এই ধর্মে বৈধীভক্তি অনুশীলনের ফল হইল মন্ত্রচৈতন্যের বিকাশ। আর বিকশিত মন্ত্রচৈতন্যের পরিণতি হইল ভাবদেহের নির্মাণ। সহজিয়া সাধকের ভাবসাধনা বা রাগসাধনা একমাত্র ভাবদেহেই নিষ্পন্ন হয়। ভাবদেহে যে রাগ-ভক্তির সাধনা, তাহা মায়ামল উন্মোচিত সাধক-প্রকৃতির স্বভাবেরই সাধনা। সাধক তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় পরমাত্মার দিকে পরম অনুরাগে ধাবিত হয়। এইখানেই রাগানুগামার্গে ভগবদ্-ভক্তির প্রকৃত আরম্ভ। ভাবদেহের বিকাশের পূর্বে প্রবর্তদশায় যে ভাব-সাধনা তাহা কৃত্রিম সাধনা। ভাবদেহে রাগানুগামার্গে ভাবসাধনাই স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম।

ভাবসাধনার পূর্তিতে সহজিয়া সাধক সিদ্ধ অবস্থা লাভ করে। সিদ্ধ অবস্থায় প্রেমাশ্রয় এবং সিদ্ধের সিদ্ধিতে রসাশ্রয়—"সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয আর।" ভাবদেহে ভাবসাধনা পরিপক্কতা লাভ করিলে ভাবের ঘনীভূত অবস্থায় প্রেমের উদয় হয়। ইহা সিদ্ধের প্রেমাবস্থা। ভাবসাধনার ন্যায় প্রেমসাধনারও পূর্ণতা আবশ্যক। প্রেমের চরমোৎকর্ষতা সম্পাদনই সহজিযা রাগসাধনার পরম লক্ষ্য।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের বিচারে প্রবর্ত অবস্থায় যথাবিহিত ধর্মাচরণের দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণবিশিষ্ট গুণমায়ার অতীত হইলে ভক্তযোগী শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের অভিমতে কুণ্ডলিনীর জাগরণেই শুদ্ধ সত্ত্বের বিকাশ হয়। শুদ্ধ সত্ত্বের বিকাশ অর্থে আত্মজ্ঞানের উন্মেষ—"আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে।" সহজবস্তু হইলেন পরমাত্মা—"সহজবস্তু পরমাত্মা জানিহ নিশ্চয।" বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে জীবাত্মা হইল প্রকৃতি এবং পরমাত্মা পুরুষ—"পরমাত্মা পুরুষ জীবাত্মা প্রকৃতি।" রাগানুগামার্গে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সাধন করাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনার দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য। সাধনার এই দ্বিতীয় স্তরকে বৈষ্ণব সহজিয়াচার্যগণ 'সাধক' অবস্থা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। রাগসাধনার দ্বারা প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি যতই ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে থাকে, রাগমার্গে আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ ততই নিকটতর হইতে থাকে। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী-শক্তি চন্দ্রের বৃদ্ধির ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া যখন ষোলকলায় পূর্ণত্ব লাভ করে, তখন ষোলকলায় পূর্ণ শক্তির

সহিত পরমাত্মার মিলন হইলে সাধক-আত্মা বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণত হয় এবং বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে—

"সত্ত্ব রজঃ তমঃ পরে শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
তৎপরে বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রেমের আখ্যান॥"

ভক্ত যোগীর বিশুদ্ধ সত্তাকে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ 'সিদ্ধ' অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া বৈষ্ণব সহজিয়া সিদ্ধ যোগী রাধাভাবে ভাবিত হইয়া প্রেমময় ভগবানের সহিত প্রেমে মিলিত হইবার জন্য প্রেমের সাধনা করেন। ইহাই পূর্বরাগের সাধনা। প্রেমসাধনার পূর্তিতে ভক্ত ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। তখন পরস্পর পরস্পরের রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া রসে বিগলিত হইতে থাকেন—"প্রেমে পরিপূর্ণ দোঁহার রসের সংযোগ।" উভয়ের রস-সংযোগে এক অদ্বয় অবস্থার উদ্ভব হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ইহাকেই 'পরতত্ত্ব' নাম দিয়াছেন। পরতত্ত্বের মধ্যে রসাস্বাদনের ইচ্ছার উদ্গম হয়। এক অদ্বয় অবস্থায় রসাস্বাদন হয় না। শৃঙ্গার ব্যতীত রসের সম্ভোগ হয না। শৃঙ্গারে ব্যাপৃত হওয়া দুই-এর সাপেক্ষ। তাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের আনন্দাংশ হইতে হ্লাদিনীশক্তিরূপিণী সিদ্ধ ভক্তের স্বরূপ-প্রকৃতিই শ্রীরাধার ভাব-কান্তি গ্রহণ করিয়া প্রেমের 'আশ্রয়' হন আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হন প্রেমের 'বিষয়'। অর্থাৎ একই আত্মা দুই রসময় তনু ধারণ করিয়া লীলারস আস্বাদন করেন—

"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

বৈষ্ণব সহজিয়াচার্যদের মতে ইহাই অদ্বয় প্রেমভক্তি—রাগসাধনার চরমোৎকর্ষ ফল—একের মধ্যে দুই-এর অনন্ত বিলাস—

"স্বয়ং পরতত্ত্ব কহি শুন নিবেদন।
যাহার আশ্রয় রাধা কৃষ্ণ দুইজন॥

* * *

দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥"

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মমতে প্রতিটি জীবাত্মাই স্বরূপে রাধা অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি-স্বরূপা। কারণ বৈষ্ণবের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর রাগ-সাধক মাত্রই তাঁর প্রকৃতি। কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণের সাথেই রাগ-সাধকের অন্তরে বিশুদ্ধ চিন্ময় স্বভাবেরও বিকাশ হয়। স্বভাবে ও ধর্মে সে যে প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পুরুষ, তাহা রাগ-সাধকের গোচরীভূত হয়। এইরূপে জীব তাহার শুদ্ধ স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া রমনীসুলভ রাগে পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসক্তি অনুভব করে। রাগ-সাধনায়

জীবাত্মা আরও পরিশুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণত হয়। তখন জীবাত্মার মধ্যে প্রকৃত রাধাপ্রেমের উদয হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভিমান জাগ্রত হয়। তখন প্রেমে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্ব জীবাত্মার অন্তরে ব্যাকুলতা জাগে, তাহাই জীবাত্মা-রূপী শ্রীরাধার পূর্বরাগের সাধনা। প্রেমের প্রগাঢতায় রসের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে শ্রীরাধা অধ্যাত্মকোটির চরমতম অবস্থা যাহা একমাত্র মানুষই প্রেমভক্তির সাধনবলে লাভ করিতে পারে। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যের অধিকারী ও ভোক্তা ঈশ্বর বা অন্য কোন দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা-শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাঁহার মাধুর্যরসের আস্বাদ পাইতে পারে না—

"ঈশ্বর মানুষ ভাব কভু নাহি পায়।
পুনঃ পুনঃ ফুকারিয়া গ্রন্থকার কয়।" (রত্নসার, পৃ: ৫)

চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

বৈষ্ণব সহজিয়াচার্যগণ আগমের অদ্বৈত তত্ত্বকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শৈবাগমে বলা হয়—কার্মমল, মায়ামল ও আণবমল এই তিন মল বিদূরিত হইলে জীবই শিব হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে জীবাত্মাই স্বভাব-ধর্মে শ্রীরাধা। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হয়। মায়ার অতীত হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বায় অভিষিক্ত হইয়া চিন্ময় স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং সাধনার সিদ্ধিতে বিশুদ্ধ সত্তায় সত্তাবান হইয়া শ্রীরাধায় পরিণত হয়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা শক্তি। তন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যখন অভেদে যুক্ত হইয়া রসস্বরূপতা লাভ করে, তখন সেই রসবস্তুকে বৈষ্ণব সহজিয়াচার্যগণ পরতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। পরতত্ত্ব এক অদ্বয় তত্ত্ব। এই এক অদ্বয় তত্ত্বের মধ্যেই পরতত্ত্ব আবার প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় রূপে দুই রসতনু গ্রহণ করিয়া লীলা বিলাসের দ্বারা মাধুর্যের আস্বাদন করেন। প্রেমের বিষয় হন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় হন প্রেমসিদ্ধা জীবাত্মা। 'একে'র অন্তর্ভুক্ত 'দুই'এর এই ভেদতত্ত্বকে প্রকৃত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব বলিয়া বৈষ্ণব সহজিয়াগণ মনে করেন (এই সম্বন্ধে আমার 'সহজিয়া ও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও নির্বাণকায়—তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে ঐ একই প্রণালী লক্ষিত হয়। এই ধর্মে তিনটি কায়, যথা—নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় এবং নির্বাণকায়। তন্ত্র-প্রভাব-পুষ্ট বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক নিজ দেহে সুপ্ত

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া 'বোধি' (জ্ঞান) লাভ করেন। ইহাই নির্মাণকায়। এই নির্মাণকায় লাভ করিবার জন্য বৌদ্ধ সহজিয়াদের অষ্ট মার্গে বিচরণ, দশশীল আচরণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাথমিক ধর্মাচবণ। কুণ্ডলিনীর প্রবুদ্ধ অবস্থায় বোধি লাভের পর বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক বোধিসত্ত্ব ভূমিতে আরূঢ় হইবার জন্য সাধনা করেন। বোধির সঞ্চারেব পর বোধিসত্ত্ব ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে 'দশভূমি' অতিক্রম করিতে হয়। এই দশভূমি অতিক্রম করিবার প্রণালীকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ 'উপায়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইবার পর বোধি হইতে বোধিসত্ত্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাধন-প্রণালীকে তাঁহারা তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। এই তিনটি স্তর কুণ্ডলিনীর তিন ক্রমোন্নত স্তর বুঝায়। প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর তিন অবস্থাকে বৌদ্ধাচার্যগণ তিনটি পারিভাষিক নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথা—অবধূতী, চণ্ডালী ও ডোম্বী। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তিকে নিজ গৃহিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। জাগ্রতা কুণ্ডলিনীই নিজ গৃহিনী 'অবধূতী'। সাধনমার্গে কুণ্ডলিনীশক্তিকে 'মধ্যপথ' (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের 'মধ্যপথ' হইল সুষুম্না নাড়ী, যাহা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত) দিয়া ঊর্ধ্বগামী করাইযা যখন যোগী দশভূমি পার হইয়া বোধিসত্ত্ব লাভ করে, তখন বৌদ্ধ সহজিয়া যোগী নিজ গৃহিনীকে 'চণ্ডালী' নামে অভিহিত করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা যাহাকে বোধিসত্ত্ব বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাহাকেই বলিয়াছেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং আগমবাদীগণ বলিয়াছেন শাক্তদেহ। সাধনোপায়ের দ্বারা আরও অগ্রসর হইয়া যখন পূর্ণ প্রজ্ঞ বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজ গৃহিনী 'ডোম্বী' আখ্যা লাভ করে।

বোধিসত্ত্ব হইতে পূর্ণ প্রজ্ঞ বুদ্ধত্বে আরূঢ় হইবার জন্য বৌদ্ধ সহজিয়াগণ সাধনোপায়কেই অবলম্বন করিয়াছেন। উপায়-স্বরূপা চণ্ডালী সাধন-প্রক্রিয়ার দ্বারা উন্নত পর্যায়ে ডোম্বী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্ঞাস্বরূপ বুদ্ধের ধর্মকায়ে বা পারমার্থিক সত্তায় যুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন হয়। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনই 'যুগনদ্ধ' রূপ। ইহা সাধিত হইলেই সহজানন্দের অনুভব হয়—"যুগনদ্ধরূপং সহজানন্দফলং"। যাহাতে এইরূপ অনুভব হয়, তাহা হইল 'বোধিচিত্ত'। বোধিচিত্তই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 'সম্ভোগকায়'। ইহারও ঊর্ধ্বে সাধকের বোধিচিত্ত যখন শূন্যতায় লীন হইয়া যায়, তখনই পরম নির্বাণ লাভ হয়। ইহাকেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বলিয়াছেন 'নির্বাণকায়'। তাঁহাদের সাধনায় এইরূপ নির্বাণকায় লাভই পরম কাম্য।

(চ) পঞ্চকৃত্যকারিত্বে ক্রম, অক্রম এবং ক্রমাক্রম স্থিতি—আত্মস্বরূপে পঞ্চকৃত্যকারিত্ব সর্বদাই রহিয়াছে। সুতরাং তিরোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া অনুগ্রহ পর্যন্ত পাঁচটি কৃত্য নিরন্তর চলিতেছে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ,

এই আত্মা সর্বদাই শক্তিসম্পন্ন বলিয়া এবং এই শক্তি সর্বশক্তির সামরস্য রূপ বলিয়া সর্বশক্তির ক্রিয়াই আত্মাতে নিত্য বিদ্যমান্। প্রতিক্ষণেই পাঁচটি কৃত্য চলিতেছে—এই দৃষ্টিতে পঞ্চকৃত্যযুগপৎ, কিন্তু তাহা হইলেও কৃত্যগুলির মধ্যে একটা বৌদ্ধ ক্রম আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ক্রম দুই প্রকার—(১) একটি ক্রম কালগত এবং অপরটি (২) বোধগত ক্রম। মায়ার উদয়ের পূর্বে কালগত ক্রমের সম্ভাবনা থাকে না। কেননা কাল মায়া হইতে উদ্ভূত হয়। সুতরাং কালগত ক্রম সেখানে না থাকিলেও বোধগত বা সত্তার অন্তরঙ্গ ভাবাপন্ন একটি ক্রম সেখানে আছে। ইহার কারণ, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি মাযার আবিভার্বের পূর্বেও কার্য করিয়া থাকে। কাশ্মীর শৈবাগমে যেমন বলা হয় শিবের পর শক্তি, শক্তির পর সদাশিব, সদাশিবের পর ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পর শুদ্ধ বিদ্যা—এই যে ক্রম, ইহা কালগত ক্রম নহে মনে রাখিতে হইবে। কেননা তখন মায়ার আবির্ভাব হয় না বলিয়া কালের ক্রম হইতে পারে না। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে স্থূলভাবে কাল তখন প্রকট না হইলেও ক্রিয়াশক্তিরূপ কাল জ্ঞানের সঙ্গে অবিনাভূতরূপে তখনও আছে (insceperably associated)। তাহা না থাকিলে শিব হইতে শুদ্ধ বিদ্যা পর্যন্ত পরপর তত্ত্বের বিকাশই হইতে পারিত না। জ্ঞানের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত এই কাল মহাকালেরই একটি আভাসমাত্র। সুতরাং এই ক্রম temporal succession নহে, কিন্তু logical succession—ইহা কালগত ক্রম নহে, ভাবগত ক্রম।

ক্রম শব্দ সাপেক্ষতা দ্যোতনা করে। একাধিক বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধের উপর সাপেক্ষতা নির্ভর করে। এক দিক থেকে পূর্ণস্বরূপে যাহাকে অখণ্ড বলে, ক্রমের কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, যেখানে একাধিক ভাবের প্রশ্ন নাই, সেখানে উহাতে কোন প্রকার সম্বন্ধের প্রশ্ন নাই—ওখানে ক্রম নাই, যুগপত্ব নাই। যখন ক্রম নাই, তখন অক্রমও নাই। এইজন্য বলা হয়, 'ক্রমাক্রম যথা নাস্তি'। না উহাতে ক্রম হয়, না অক্রম—যাহা হয়, তাহা হয়। ইহাই প্রকাশের শিবাত্মক স্বরূপ। পরন্তু যখন অপর দৃষ্টিতে দেখি, তখন প্রতীত হয় ইহাতে সমগ্র বিশ্বই আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, দূর, নিকট, পূর্ব, পশ্চাৎ সব। অর্থাৎ যা কিছু বিশ্বে আছে, সব ওখানে নিত্য বিদ্যমান্। ওখানে ক্রম আছে, যুগপৎ অক্রমও আছে। এ ক্রম দেশগত এবং কালগত ক্রম নহে বুঝিতে হইবে। উভয় দৃষ্টি আপাত-প্রতীতিতে পৃথক মনে হইলেও অন্তে একই, উহাকেই অখণ্ড বলে। আগম শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে সৃষ্টির মূল আধারস্বরূপ চিৎসত্তায় ক্রম দেখা যায় না। ক্ষোভের পর আনন্দভাবের প্রাকট্য হইবার পর যখন ইচ্ছার উদয় হয়, তখন অতি সূক্ষ্মরূপে ক্রমের আভাস দৃষ্ট হয়। এ ক্রম কিরূপ? না, যেরূপ বীজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দেখা, যেমন মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে পরিপূর্ণ দেহের সব অবয়ব দেখা, সেইরূপই হইল ইচ্ছাশক্তির স্বরূপে

ক্রমের রহস্য। অধ্যাত্মজ্ঞানে এই ক্রম স্পষ্ট অনুভব হয়। স্থূল দৃষ্টিতে ওখানে ক্রম মনে হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ক্রমের ভান হয। যেমন দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বাত্মক সমস্ত নগরেব বিভিন্ন বস্তুর ক্রমবদ্ধ ভাব বা নিকট দূরত্বাদির অনুভব হয়। ঠিক সেইরূপ একই স্বচ্ছ অধ্যাত্ম জ্ঞানদর্পণে দূর-নিকট অগ্র-পশ্চাৎ সবের অনুভব হয়। জ্ঞানীর পক্ষেই এই ক্রম অনুভবগম্য, অজ্ঞানীর পক্ষে নহে। অজ্ঞানীর পক্ষে ক্রম উপলব্ধি হয় তখন যখন ওই জ্ঞানগত দৃশ্য ক্রিয়াশক্তির ক্ষেত্রে অর্থাৎ মায়িক জগতে গতিশীল স্থূল বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানীর জগৎ ক্রিয়াপ্রধান। ওখানে স্থূল ক্রম। জ্ঞানীর জগৎ সূক্ষ্ম। ওখানে স্থূল ক্রিয়া বা ক্রম নাই। পরন্তু জ্ঞানগত বা বোধগত ক্রম আছে। কারণ-জগতে যেখানে ইচ্ছাশক্তির স্থান, সেখানে জ্ঞানগত ক্রমও নাই, পরন্তু বীজরূপে উহা অব্যক্ত থাকে। এই বীজই হয় আনন্দ। আনন্দের অনুকূল প্রতিকূল ভাব দূর হইলে উহাই হয নির্বীজ চিৎশক্তি—ইহা বিশুদ্ধ চিৎরূপ। ওখানে অনুকূল প্রতিকূল ভাবও নাই, সমগ্র বিশ্বের উহাই অর্থাৎ চিৎ-ই আধার। কারণ, ওখানে সবই প্রকাশমান্—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। সর্বমিদং—বিশ্ব, ভাসা—চিৎশক্তি। ইহার উপর যাহা, তাহা সৎ। উহাই পূর্ণসত্তা।

(ছ) প্রতি আত্মার বৈশিষ্ট্য (individuality)- অনাদি সিদ্ধ পূর্ণ শিব নিরন্তর পঞ্চকৃত্য করে। স্পন্দময়ী শক্তি হইতে ইহা হইতেছে। অস্পন্দ দ্রষ্টারূপে শিব উহার সাক্ষীমাত্র হয়। অথচ দুই একই। স্বরূপে যাহা নিত্য প্রকাশমান্—সবই সেই একই। সমগ্র বিশ্ব তাঁহা হইতে অভিন্ন। কোন আত্মা ওখানে পশুভাবাপন্ন নহে, পরন্তু প্রতি আত্মা ওখানে পরমাত্মার সহিত একই থাকে। পরমশিব পঞ্চকৃত্য লীলা করিতে থাকিলেও নিরন্তর অহংরূপে স্ফুরিত হইতেছে। ইহা পরিমিত 'অহং'। ইহার সহিত অবিনাভাবে সংশ্লিষ্ট 'ইদং'ও হয়। এ ব্যাপার নিরন্তর হইতেছে ইহা পূর্বেই বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই পরিমিত আত্মাই পশু। প্রত্যেক পরিমিত আত্মা পরস্পর ভিন্ন। কারণ, অনন্ত বৈচিত্র্যময় ইদং-ভাব ইহার সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, প্রতিযোগী ইদং-এর অনন্ত বৈচিত্র্য হইতে পরিমিত আত্মা অনন্ত বিচিত্ররূপে প্রকাশমান্ হয়। মূলে পরপ্রমাতারূপে এক পরমশিবই আছেন—অপর প্রমাতৃভাব বা পশুভাব উপাধিমাত্র। এইজন্য বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক আত্মার আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনাদিকাল থেকেই আছে, পরন্তু উহার প্রকাশ ছিল না। কারণ, অভিব্যক্তির পূর্বে উহা পরপ্রমাতার সহিত অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ শিবরূপে পরমশিবের সহিত অভিন্ন ছিলাম, কিন্তু আমি যে পরমশিব এ বোধ ছিল না, পূর্ণাহং বোধ ছিল না। এজন্য আণবমলে আবৃত হইয়া ক্রমশঃ সৃষ্টিচক্রে আসি (ইহা তিরোভাব)। আবার ফিরিবার সময় যখন আণবমল অপসারিত হইয়া যায় তখন আমি

পূর্ণ এই বোধ জাগে (ইহা অনুগ্রহ)। পশু অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যশক্তি স্তিমিত থাকে। আণবমল হইল আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি। বিস্মৃতি কাটিয়া গেলে পূর্ণাহং বোধ জাগ্রত হয় এবং স্বাতন্ত্র্যশক্তির উন্মেষ হয়। পরমশিবে অভেদ জ্ঞান (বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত যুক্ত থাকে)। আণবমলে পূর্ণতার অভাব—আপ্তকাম নহে—কিসের একটা অভাববোধ। যখন অভাববোধ আসে তখন মায়া স্পর্শ করে।

এক দৃষ্টিতে প্রতি আত্মাই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হওয়ার কারণে অনাদিসিদ্ধ। তখন পশু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। পরন্তু যখন পশুভাবের আবির্ভাব হয়, তখন উহার সহিত কালের সম্বন্ধ আসিয়া যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টির বিচারে, সঙ্কোচের কারণ পশুভাব আসিবাব পরই বুঝিতে হইবে মাতৃকাচক্রের আবির্ভাব হইয়াছে। মহাশক্তির অংশ ও প্রত্যংশ শক্তিগুলি অনন্ত রশ্মিরূপে কার্যোন্মুখ থাকে। এই শক্তিগুলির পরিসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় পরিগণিত। পরন্তু শক্তি অনন্ত। প্রত্যেক আত্মসত্তায় শক্তিরূপে সবই শক্তি থাকে। পরন্তু শক্তিগুলির সন্নিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রাধান্যতেও তারতম্য হয়। কারণ, কোন কোন সত্তাতে কোন কোন শক্তির প্রাধান্য। শক্তির এই সন্নিবেশগত বৈচিত্র্য হইতে পরিচ্ছিন্ন আত্মাতে প্রকৃতিগত ভেদ হয়। অন্তে শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে পশুভাব কাটিয়া যাইবার পর এই সঙ্কোচের বৈষম্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। পরন্তু বৈচিত্র্য তবুও থাকে। উহার কারণ, প্রতি আত্মাতে 'বিশেষ' লক্ষিত হয়। ইহাই ব্যক্তিত্বের মূল (individuality)। অন্তে উহাও থাকে না। কারণ, ঐ সময় মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশে সমস্ত বৈচিত্র্য লুপ্ত হয়।

(জ) একজীব ও নানাজীব এবং দৃষ্টিই সৃষ্টি—পূর্ণ আত্মা পরিমিত নহেন। তিনি অপরিমিত অপরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টৃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপই চৈতন্য। তিনি দ্রষ্টা, তিনি কখনো দৃশ্য হন না। অর্থাৎ তাঁহাকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় কোন দ্রষ্টা নাই বলিয়া তিনি সর্বদাই দ্রষ্টা থাকেন, দ্বিতীয় কোন দ্রষ্টার দৃশ্য হন না। ইহাই তাঁহার পরম স্বরূপ। কিন্তু দৃশ্য না হইলেও তিনি যে দৃশ্য না হন, তাহাও নহে। যদি তিনি দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য না হইতেন, তাহা হইলে দৃশ্যত্বের অভাববশতঃ তিনি অপূর্ণ থাকিতেন। বলিতে হয় যে পূর্ণ অবস্থায় তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য। দ্বিতীয় দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছু নাই। অর্থাৎ তিনি সর্বদা নিজেকে নিজে দেখিতেছেন। 'নিজে দেখিতেছেন' ইহাই পূর্ণ আত্মার 'শিবভাব' এবং 'নিজেকে দেখিতেছেন' ইহাই পূর্ণ আত্মার 'শক্তিভাব'। পূর্ণ আত্মা নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন মানে শিবরূপী আত্মা শক্তিরূপী আত্মাকে দেখিতেছেন। বাস্তবিক শিব ও শক্তি অভিন্ন। যাহাকে আমরা বিশ্ব বলি, যাহাকে কাল,

দেশ ও আকার বলি—সব ইহার অন্তর্গত। ইহারই নাম 'আনন্দ'। ইহা নিরাকাঙ্ক্ষ নিত্যতৃপ্ত ভাব—ইহাই স্বাতন্ত্র্য অবস্থা। এই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ তিনি নিজে অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ইহাই নিজের অবিভক্ত হইতে বিভক্ত অবস্থায় অবতরণ। ইহাই আত্মসঙ্কোচ যাহার ফলে প্রমাতারূপী আত্মা সঙ্কুচিত এবং প্রমেয়রূপী আত্মাও সঙ্কুচিত। এই বিকাশের দুইটি দিক আছে—সঙ্কুচিত হইয়াও দ্রষ্টারূপে আত্মা এক এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যরূপে আত্মাও অর্থাৎ শক্তিরূপী আত্মাও এক। এই যে পরিচ্ছিন্ন এক দ্রষ্টা—ইহাই বেদান্তের পরিচিত 'একজীব'। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকেই বলে শূন্যপ্রমাতা। ইনি পরপ্রমাতা নহেন, কিন্তু অপরপ্রমাতা। এই যে একজীব, ইহাই ভবিষ্যৎ অনন্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ। ইহার দৃষ্টিই সৃষ্টি। ইহার প্রথম দৃষ্টি হইল মহাশূন্য। ইহাকেই মহাকাশরূপে অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে মূল সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই যে একজীব, ইনি ঈশ্বররূপী। কারণ, ইঁহার দৃষ্টি হইতে সৃষ্টি হয় এবং ইহাই আদি সৃষ্টি যাহা দৃষ্টি হইতে সৃষ্টি হয়। ইঁহার সৃষ্টি মহাশূন্য বা মহাকাশস্বরূপ। এই একদৃষ্টি-ভূমিকে আশ্রয় করিয়া খণ্ড খণ্ড অনন্ত সৃষ্টি হইতে থাকে। এইসব সৃষ্টি অনন্ত হইলেও শূন্যরূপ। এইস্থলে একজীব জীব হইয়াও ঈশ্বরস্বরূপ। একজীব যখন বিভক্ত হইয়া নানা জীবরূপে প্রকট হয়, তখন পূর্বোক্ত একজীবের বিভিন্ন সৃষ্টি নানা জীবের নিকট শূন্য সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয় না। নানা জীবের নিকট সেই সকল সৃষ্টি শূন্য সৃষ্টিরূপে পরিগণিত না হইয়া ভাব-সৃষ্টিরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সকল ভাবসৃষ্টি নানাজীব দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে আদিতে হয় দৃষ্টি এবং তদনুসারে হয় সৃষ্টি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ আদি একজীব দ্রষ্টা নানা জীব দর্শন করিয়া থাকে। সাধারণ মানুষ যে তাহার সম্মুখে সাজান জিনিস দেখিতে পাইতেছে, উহা আদি একজীবের শূন্যাত্মক কল্পনামাত্র। নানাজীব ঐ কল্পনাকে ভাবরূপে দেখিয়া থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় দৃষ্টি ও সৃষ্টি অভিন্ন, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবশে সঙ্কোচে পরিণত হইলে দৃষ্টি ও সৃষ্টি পৃথক হইয়া পড়ে। একজীবের অবস্থায় সৃষ্টি দৃষ্টিকে অনুসরণ করে—ইহা ঐশ্বরিক অবস্থা। নানা জীবের অবস্থায় দৃষ্টিই সৃষ্টিকে অনুসরণ করে—ইহা সাধারণ জীবের অবস্থা। সাধককে পূর্ণত্বে পৌঁছাইতে হইলে সাধনার দ্বারা দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে অপৃথক অর্থাৎ অবিভক্ত করিতে হইবে।

সারাংশ—পর্যালোচিত 'ক' হইতে 'জ' পর্যন্ত প্রবন্ধসমষ্টির সারমর্ম হইল এই যে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে 'প্রকৃতি-পরিণাম', শঙ্কর-বেদান্তে 'বিবর্তনবাদ' আর শক্তিতত্ত্বে 'আভাস' হইল বিশ্বসৃষ্টি-রহস্যের মূল। আগমমতে পরব্রহ্ম যুগপৎ বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বাতীত। পরব্রহ্ম যখন শুদ্ধ বিশ্বাতীতরূপে অবস্থান করেন, তখনও বিশ্ব তাঁরই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পরব্রহ্মের দুই প্রধান ভাব (aspect)- 'তিরোভাব' আর 'অনুগ্রহ'। তিরোভাব হল তাঁর লীলা—বিশ্বসৃষ্টি। পরব্রহ্মের নির্বিশেষ অদ্বয় অবস্থা অবর্ণনীয়, কেবল উচ্চাধিকারী সাধকের অনুভবগম্য। পরব্রহ্মের 'আমি আছি' এই উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা হইতেই বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভব। যখন তিনি নির্বিশেষ একক অবস্থায় ছিলেন, তখন আপনাকে তাঁর জানা হয়নি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।" ইত্যাদি

তাই তিনি নিজেকে জানিবার জন্য বলিলেন, 'আমি আছি, আমি বহু হব'—"একাকী নৈব রসতে, তস্মাৎ বহুস্যাম্ প্রজয়ামি"। এই বহু হইবার অভিলাষ, অর্থাৎ তাঁর বহির্মুখীনতাই সৃষ্টির উৎস। ইহাই তাঁর সবিশেষত্ব, সগুণত্ব। তাঁর আত্মসম্প্রসারণই হইল তাঁর সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব। তিনি সম্প্রসারণশীল হইলেন বলিয়াই যে বিশেষত্বের মধ্যে সগুণের মধ্যে বা বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব বিধৃত হইয়া তিনি নিঃশেষে ফুরাইয়া গেলেন, তাহা নহে। তিনি যে অসীম। অনন্ত তাঁর রূপ। তাই সংখ্যার সীমার মধ্যে তাঁর অস্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় না। তাঁর অসীমত্বের তুলনায় এই বিশ্ব তো একটি বালুকণা সদৃশ। এমন সহস্র কোটি বিশ্বসৃষ্টি হইলেও তাঁহার এক বিন্দু হ্রাস হয় না। সমুদ্র হইতে এক ঘটি জল তুলিলে কি সমুদ্রের কিছুমাত্র হ্রাস হয়? সমুদ্র যেমন, তেমনিই থাকে। তিনি তো শূন্য। শূন্য থেকে যত ব্রহ্মাণ্ডই সৃষ্টি হোক না, তিনি শূন্যই থাকেন। অতএব তাঁর দুইটি বিভাব—বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক। বিশ্বাতীত অবস্থাতেও বিশ্ব তাঁরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

তাঁর বহির্মুখী ইচ্ছায় তিনি স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা নিজেকে সঙ্কুচিত করিলেন। তিনি যেন স্বেচ্ছায় নিজের পূর্ণত্বকে খর্ব করিলেন। সৃষ্টির সূচনায় পরব্রহ্ম যেন নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন অর্থাৎ তাঁর পূর্ণত্বকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন: (ক) একদিকে বোধ বা শুদ্ধ প্রকাশ (যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শিব'), (খ) অপরদিকে বিমর্শ বা চিৎশক্তি। অথচ পরব্রহ্ম স্বরূপে অখণ্ডই থাকিয়া গেলেন। বোধরূপী শিব এবং বিমর্শিনী শক্তি উভয়ই চিন্ময়, কিন্তু উভয়ই অপূর্ণ। শিব ও শক্তির সামরস্যজনিত যে উন্নত অদ্বয় স্থিতি, তিনিই পরব্রহ্ম এবং তিনিই একমাত্র পূর্ণ। তাই বোধরূপী শিব এবং বিমর্শিনী শক্তি পরব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত।

শিব নিজে বোধ বা শুদ্ধ প্রকাশরূপী হইয়াও নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না। কারণ, শক্তিহীন শিব শবরূপ। তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে হইলে শক্তির সংযোগ দরকার। শাক্ত্যাত্মক বোধই নিজেকে প্রকাশিত করিতে সক্ষম। পরাবাক্ বা পরাশক্তি প্রকাশকে প্রকাশিত করে। 'Let there be light and there was light'। শব্দই ব্রহ্ম। 'I et there be light'—পরব্রহ্মের ইচ্ছাজাত এই শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই শব্দ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ শব্দ

অর্থরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু শব্দ হইতেই উৎপন্ন। এই যে শব্দের সৃষ্টি-ক্ষমতা, ইহাকেই পরাবাক্ বা পরাশক্তি বলে। শব্দ উত্থিত হওয়ামাত্রই শক্তির মধ্যে ক্ষোভ হয় এবং স্পন্দনের সৃষ্টি করে। ইহাকেই বলে ঈক্ষণ। স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি—এমনি করে সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়।

আবার শুদ্ধ বিমর্শিনী-শক্তি সৃষ্টি করিতে অক্ষম যতক্ষণ না বোধরূপ শিবের সঙ্গে যুক্ত হইতেছে। অতএব বোধাত্মক বিমর্শিনী শক্তিই সৃষ্টি করিতে সক্ষম। কারণ, শুদ্ধ বোধ বা শুদ্ধ শক্তি উভয়ই অপূর্ণ। উভয়ের সংযোগ ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না।

বিন্দুর ক্ষোভ হইতে বৈন্দব জগৎ এবং মায়ার ক্ষোভ হইতে জড় বা অচিৎ জগতের সৃষ্টি। জীব-জগতের বিবর্তনের শেষ ধাপে মনুষ্য জন্ম। মনোময় কোষের পূর্ণ বিকাশেই মনুষ্য জন্ম। মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মানুষের পার্থক্য এইখানে। প্রাণী জগতের শেষ পর্যায়ে মানবের উদ্ভব। সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারা আসিয়া শেষ হইয়াছে মানব-সৃষ্টির মধ্যে। মানুষের মধ্যে মনোময় কোষ ছাড়াও আরও দুটি উন্নত কোষ—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বিরাজিত। ব্রহ্মানন্দ লাভের একমাত্র অধিকারী মানুষ। তাই মানুষ পরমেশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি। পরব্রহ্মের চিদংশ ও আনন্দাংশ মানুষের মধ্যে থাকিলেও উভয় কোষ কুঁড়ির আকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। অতএব চিৎ থাকিলেই মানুষমাত্রই চেতন হয় না। চিত্তের একাগ্র অভিনিবেশ বা অনুশীলনের দ্বারা চিৎ-কে জানিলেই জীব চৈতন্য লাভ করে। মানুষ অমৃতের পুত্র হইলেও সে তা জানে না। নিজেকে জানিতে হইবে বা অমৃতের পুত্ররূপে নিজেকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে আপন পুরুষকারের দ্বারা। তাই শ্রুতির প্রথম উপদেশ—"আত্মানাং বিদ্ধি'—নিজেকে জান—Know thyself।

জন্মের পর বস্তু-জগতের যে জ্ঞান মানুষ ক্রমশঃ অর্জন করে, তা বিকার বা বিকল্প জ্ঞান। উহা নির্মল আত্মজ্ঞান নহে। জন্ম হইতেই মানুষের দৃষ্টি বহির্মুখী, তাই তার অর্জিত জ্ঞানও বহির্মুখী। বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তর্মুখী না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না। বহির্মুখী দৃষ্টি 'কামলা' রোগগ্রস্থ (Jaundice) ব্যক্তির দৃষ্টির মত। কামলারুগী যেমন সর্ববস্তুতে কমলার রং দেখে, অন্য দশজন নীরোগ ব্যক্তির ন্যায় স্বাভাবিক দৃষ্টি পায় না, সেইরূপ বস্তু সম্বন্ধে বহির্মুখী পার্থিব জ্ঞান অন্তর্মুখী আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী।

বস্তু-জগতের জ্ঞান আমাদের কিরূপ একটি উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যাক। ইংরাজিতে ২৬ (ছাব্বিশ)টি letters (অক্ষর) আছে। combination of letters হইতে word হয় এবং words-এর synthetical arrange দ্বারা sentence হয়। অজস্র sentences দ্বারা পূর্ণ হয়ে একটি বড় পুস্তক রচিত হয়। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির শব্দ ও অর্থ জ্ঞান জনিত পূর্ব সংস্কার থাকাতে পুস্তকটি পাঠে তাহার অর্থোপলব্ধি হয়। কিন্তু একটি শিশু যাহার সবেমাত্র ইংরাজি

অক্ষর জ্ঞান হইয়াছে, সমস্ত পুস্তকটির মধ্যে শুধু অক্ষরই দেখে। কারণ, বড় পুস্তকটি ২৬টি অক্ষরসমষ্টির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইরূপ আত্মা শুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশ বা শুদ্ধ জ্ঞান বা স্বচ্ছ আলো। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মা বিরাজিত। আত্মার আভায় মন উদ্ভাসিত হয় এবং এই উদ্ভাসিত মন ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে পার্থিব বস্তুকে গ্রহণ করে। পূর্ব সংস্কারাচ্ছন্ন মন পার্থিব বস্তুকে পৃথক পৃথক নাম রূপের দ্বারা চিহ্নিত করে এবং বস্তু-জ্ঞানের উদয় করায়। 'জড়' বস্তু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই। যাহাকে জড় বলি তাহা চিৎশক্তিরই স্থূল পরিণাম। আত্মার আলোকেই পার্থিব যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত। আত্মা দেহকে ছাড়িয়া গেলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। পৃথিবী যেমন আছে, তেমনিই আছে, কিন্তু সেই মৃত ব্যক্তির নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য। মন নানারূপ বাসনা-কামনায় পূর্ণ, পূর্ব পূর্ব সংস্কারে আচ্ছাদিত রঙ্গিন কাঁচ। আত্মার জ্যোতি তার উপর পতিত হওয়ায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মন যেরূপ যেরূপ ভাবনায় ও সংস্কারে মুদ্রিত, তাহার অভিলাষ, ক্রিয়াকলাপ, জ্ঞান এবং পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ ঠিক অনুরূপ ভাবে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এ-জন্মের গঠিত সংস্কারের জের পরবর্তী জীবনে টানিয়া চলে—এইরূপে চলে অনন্ত জীবন-চক্রের অনুবর্তন। কিন্তু যে মানুষ নিজের চেষ্টায় এবং ভগবানের অনুগ্রহ লাভে সংস্কারমুক্ত হইতে পারে, তাহার মন-দর্পণ নির্মল হইয়া যায়, আত্মার আলো উহার উপর স্বচ্ছ হইযা পড়ে, তাহার বহির্মুখী দৃষ্টির গতি আপনা হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে—ইহাই হইল শ্রুতির 'আত্মানং বিদ্ধি'। অর্থাৎ সেই পুরুষ তখন ব্রহ্মভূত হলেন। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়াতে তিনি যে দিকে দৃষ্টি ফেরান সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে নিজ আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেখেন—ইহাই হইল সমদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি—বৈষ্ণব মহাজনদের ভাষায় "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। অথবা উপনিষদের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

এখন ব্রহ্ম-দৃষ্টিই বা কিরূপ, আর সংস্কারযুক্ত পার্থিব বস্তু-দৃষ্টি বা লৌকিক জ্ঞানই বা কিরূপ একটি উদাহরণের সাহায্যে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা যাউক। বিজ্ঞানের নানা অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের মধ্যে সিনেমা একটি। অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে একটি ঝুলানো সাদা পর্দার উপরে আলো পড়ে। নানা জীবজন্তু, পর্বত-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-আকাশ-মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্র-আলো-ছায়া, ট্রাম-বাস-রিক্সা-রেলগাড়ী, লোকের মিছিল প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনে যা যা দেখে থাকি, সেই সব যেন জীবন্তরূপে ছবির পর্দায় দেখিতে পাই। ছোট্ট শিশু এইগুলি সত্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু পিতামাতারা জানেন এইগুলি সত্য নয়—আভাস মাত্র। focus-এর আলো আছে বলিযাই পর্দায় ছবিগুলি প্রতিফলিত হইতেছে। অতএব আলোটাই আসল। সেইরূপ, আত্মার আলোকে সমস্ত জগৎ ভাসমান্।

অতএব পার্থিব জগতের যে বস্তু-জ্ঞান আমরা আহরণ করি এবং সত্য বলিয়া ধারণা করি, তাহা আভাস মাত্র। প্রকৃত সত্য হইল আত্মজ্যোতি বা আত্মজ্ঞান। মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা 'জ্ঞান' হইতে 'জ্ঞেয়' বিচ্ছিন্ন হওযায আমরা আত্মজ্ঞানকে বাদ দিয়া জ্ঞেযকেই আসল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; যেমন জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয় এবং জলেতেই সেই বরফ ভাসিতে থাকে। বরফ জলের ঘনীভূত অবস্থা, উহাকে জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে আলাদা বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ জ্ঞেয়-বস্তু জ্ঞানের বা জ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা। মায়াশক্তিতে জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সেই জ্ঞেয়-বস্তুই আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়; এবং উহাকে আমরা 'জড়' উপাধি দিয়া থাকি। আসলে উহা জড় নয়, চেতন-শক্তিরই আভাস মাত্র।

মায়ার দ্বারা অভিভূত জীবের বিকার বা বিকল্প জ্ঞান এবং অনাত্মায় আত্মবোধরূপ অহংজ্ঞান,—উহা কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত বলিয়াই হয়। বিকার বা বিকল্প জ্ঞান ছুটিয়া গেলেই এবং অহং অভিমান অবলুপ্ত হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয় অথবা কুণ্ডলিনীর জাগরণের ফলেই বিকল্প জ্ঞান লুপ্ত হয়। বিকার বা বিকল্প দৃষ্টি ও ভ্রান্ত অহংকার অবসানের জন্য যে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা—উহাই আগমমতে 'আণব উপায়'।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ অর্থ—ভগবৎমুখী যে ধারা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া প্রবাহিত, আণব উপায়রূপ সাধনার (পুরুষকারের) দ্বারা সেই স্রোতের আকর্ষণের মুখে নিজেকে আনয়ন করা। একবার ঐ ঊর্ধ্ব স্রোতের বেগের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে পারিলে আর জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি আণব উপায়ের আবশ্যকতা থাকে না; স্রোতই তখন তাহাকে আপন গতিতে বহন করিয়া ভগবৎ-ধামে (শিবধামে) পৌঁছাইয়া দেয়। অগ্রসর হওয়ার পথে অগ্রগতির নিদর্শন সাধক পাইতে পারে বা বিনা নিদর্শনেই একেবারে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারে। গাড়ীর সহিত সাধকের এই গতিকে তুলনা করা যাইতে পারে। গাড়ি ধরিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে পায়ে হাঁটিয়া বা অন্য কোন যানবাহনের সাহায্যে ষ্টেশনে যাইতে হইবে। ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া গাড়িতে উঠিতে হইবে এবং বসিবার স্থান করিয়া লইতে হইবে—এই পর্যন্ত যাত্রীর চেষ্টা। সাধকের পক্ষে এই চেষ্টাই হইল পুরুষকার বা আণব উপায়। গাড়িতে উঠিয়া একবার বসিতে পারিলে যাত্রীর বিনা প্রচেষ্টায় গাড়ী তাহাকে বহন করিয়া গন্তব্যের দিকে ধাবিত হইবে। যাইবার পথে যাত্রী জাগরিত থাকিয়া যে যে ষ্টেশনে গাড়ি থামিবে, সেই সেই ষ্টেশন দেখিয়া কতদূর অগ্রসর হইল জানিতে পারে। কিম্বা নিদ্রিত থাকিয়া পরে জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পারে সে তাহার গন্তব্যস্থল হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইয়া গিয়াছে। ইহাকেই বলে 'শাক্ত উপায়'। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপী চিৎ-শক্তির জাগরিত হইয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে অর্থাৎ সুষুম্না পথে অগ্রসর হইয়া সহস্রারে প্রকাশরূপী শিবের সহিত

মিলিত হওয়া। কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতির পথে ষট্‌চক্রের ভেদ। এক একটি চক্র এক একটি ষ্টেশন। চক্রভেদ মানে চক্রে যে বর্ণ-সমষ্টি, সেই বর্ণগুলি বিগলিত হইয়া ধ্বনিতে পরিণত হওয়া। শব্দই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি হইল 'বাক্'। ব্রহ্মধামে অর্থাৎ চিন্ময়ধামে শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সমস্ত চক্র ভেদ হইলে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই পরাবাক্ বা পরাশক্তি (বাক্ হইতে বিশ্বসৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইবে)। সহস্রারে শিবের সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলনই শিবশিবানীর মিলিত তনুর 'যামল'রূপ।

ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে পৌঁছাইলে সাধকও সিদ্ধিলাভ করিয়া চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার মধ্যে শিবত্বের সংযোজন হয়। শিবত্বের যোজনা হইলেও তখনও 'শিবোঽহং' এই বোধ সাধকের মধ্যে জাগে না। 'শাম্ভব উপায়ে' সেই বোধ জাগ্রত হয়। ইহাই পরমশিবের অনুগ্রহ-শক্তি। শাম্ভব উপায়ে জাগ্রত চেতনাই হইল চিৎ-শক্তি। এবং তখনই শুদ্ধ প্রকাশময় বা বোধময় শিবের সহিত স্বাতন্ত্র্যময়ী চিৎ-শক্তির যোগযুক্ত অদ্বয় অবস্থার উপলব্ধিই হইল সাধকের পরম প্রাপ্তি—চরম পুরুষার্থ।

গঙ্গা সমুদ্রে মিলিত হইয়া যদি নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গঙ্গা সমুদ্রই হইয়া গেল অর্থাৎ universal হইল, কিন্তু individuality বজায় রহিল না। গঙ্গা যদি সমুদ্রে মিলিত হইয়া উপলব্ধি করিতে পারে যে সে নিজেই সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে universality হওয়ার পরেও individuality বা নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম 'অণুরঽপি অণীয়ান্ এবং মহতো মহীয়ান্'। মানুষের মধ্যে যে অণু-আত্মা বিরাজিত, সাধকের সর্বোচ্চ অবস্থায় সেই অনু-আত্মা মহীয়ান্ হইয়া উঠে অর্থাৎ সাধক universal হয়। মানুষের মধ্যে যে চিদাত্মা বিরাজ করে তাহা অণু হইলেও পূর্ণ, অপূর্ণ নহে। সাধকের মধ্যে চিদণু সাধনার প্রভাবে যখন মহান্ চিদাত্মায় পরিণত হয়, তখন চিদণুতে যে পূর্ণত্ব ছিল, মহান্ আত্মায় বা পুরুষোত্তমে সেই একই পূর্ণত্বই থাকে; যেমন স্বর্ণের একটি কণার মধ্যে যে গুণ, একতাল স্বর্ণের মধ্যেও সেই গুণ। অণু অবস্থায় বা মহান্ অবস্থায় উহার কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু চিদণুতে পূর্ণত্ব আচ্ছাদিত থাকে। সৃষ্টির লীলানন্দে পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমের যে স্বেচ্ছাকৃত আত্মসংকোচন এবং জীবের মধ্যে অনুচিৎরূপে অবস্থান, সেই আত্মসংকোচন বশতঃ মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ায় অণু চিদ্রূপী জীব যে পূর্ণ, আত্মবিস্মৃতির ফলে তাহা তাহার অজানা থাকে। পশু জীব যখন আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসায় শিবরূপী হয়, তখন সে যে নিত্য পূর্ণ—এ অনুভব তাহার হয়। সে universal হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি (জীবন) চক্রের আবর্তন পরিক্রমন শেষ করিয়া আসায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তার ফলে তাহার individualityও বজায় থাকে।

অতএব জীবের তিন প্রকার স্থিতি—এক, আণব-স্থিতি; দুই, শাক্ত-স্থিতি; তিন, শাম্ভব-স্থিতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বারির প্রথমে তুষার স্থিতি, দ্বিতীয় অবস্থায় তুষার গলিয়া গোমুখীর উৎস মুখ হইতে গঙ্গারূপে প্রবহমানতা, তৃতীয় পর্যায়ে পরিক্রমণ শেষে গঙ্গার সমুদ্রে মিলন। সেইরূপ প্রথমে জীবের আণব-স্থিতিতে নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি; দ্বিতীয়ে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও সুষুম্নাপথে সহস্রারে অবস্থিত শিবধামের দিকে ঊর্ধ্বগতি—ইহাই শাক্ত-স্থিতি; তৃতীয়ে প্রকাশরূপী শিবের সহিত মহামিলনের অখণ্ড স্থায়ী রূপ—ইহাই শাম্ভব-স্থিতি।

জীব-কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ বিশ্ব-কুণ্ডলিনী বা মহাকুণ্ডলিনীতে রূপান্তরিত হইয়া সহস্রারে প্রকাশরূপী শিবের সহিত মিলিত হইয়া শিব-শক্তির সামরস্য জনিত যে চিদানন্দের অনুভব, তাহাই সাধকের পরম প্রাপ্তি। পরম প্রাপ্তি হইলেও কিন্তু উহা চরম প্রাপ্তি নহে। ইহারও ঊর্ধ্বে আছে প্রাণ-কুণ্ডলিনী; তাহারও ঊর্ধ্বে সম্বিদ্-কুণ্ডলিনী। সম্বিদ্-কুণ্ডলিনী ভেদ হইবার পর যে-ব্রহ্ম জগতাত্মিক হইয়াও জগতাতীত অর্থাৎ জগতকে আত্মভূত করিয়াও যে নির্বিকল্প, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধি কূটস্থ ব্রহ্মের অবস্থিতি, সেই অদ্বয় ব্রহ্ম-স্থিতি লাভ হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মাবস্থা যে কিরূপ তাহা শুধু সেই উচ্চাধিকারী সাধকেরই অনুভবগম্য; উহাকে ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না এবং বর্ণনার দ্বারা অবগত হওয়া যায় না; উহা অবর্ণনীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ভাষার অতীত তীরে কাঙ্গাল নয়ন যথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।" উহা অনির্বচনীয়। কারণ, উহা আছেও বলিতে পারা যায়, আবার নাইও বলা চলে। উহারই নামকরণ হইয়াছে পরব্রহ্ম।

মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ আছে। মনুষ্যের মধ্যে আছে অন্নময় ও প্রাণময় ছাড়াও মনোময় কোষ। প্রাণময় কোষের ক্রম-বিকাশই (evolution) হইল মনোময় কোষ। প্রাণময় কোষ পর্যন্ত জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি বা নিত্য প্রবহমান ভগবৎমুখী ধারা নাই, যাহার একমাত্র অধিকারী মানুষ। মানুষই হইল সৃষ্টিধারার চরম বিকাশ—Man is the best creation of God। সেইজন্য God has created man after his own image—'সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ'। আবার মনুষ্য ও পরব্রহ্মের মধ্যে যে নিগূঢ় অধ্যাত্ম সম্বন্ধ—প্রেমের সম্পর্কে মনুষ্য ও পরব্রহ্মের মধ্যে যে মাধুর্যের অপূর্ব আস্বাদন, পরব্রহ্মের সহিত সেরূপ সম্পর্ক অন্য কোন দেবতার, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও নাই। তাঁহারা শুধু পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যের, ভোগের ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মানুষ সাধনার প্রভাবে ঐ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও সেই অধিকারিত্বের প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সহিত, সেই পুরুষোত্তমের সহিত এক ও

অভিন্ন হইয়াও দাসিতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিত্য লীলায় তাঁহার মাধুর্য-রস আস্বাদনের অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা রাখে। তাই, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। মনোময় কোষবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের স্ফূর্তির (বিকাশের) অবকাশ আছে। মানুষই আত্মিক অনুশীলনের দ্বারা তাহার মধ্যে সুপ্ত বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষদ্বয়কে পূর্ণ বিকশিত করিয়া পরমানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে। অতএব মানুষই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সৃষ্টি-বিবর্তনের চরমতম বিকাশ।

অচিৎ বস্তু-জগৎ হইতে প্রাণী জগৎ, প্রাণী জগৎ হইতে মনোময় কোষযুক্ত মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ধারার বিবর্তন (evolution of Nature)। প্রাণী জগৎ অন্ধ প্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা চালিত। প্রবৃত্তি বা instinct ই নিম্নতম প্রাণীকে উচ্চতম প্রাণীতে ক্রমশঃ পর্যবসিত করে। উন্নততম প্রাণীর মধ্যে মনের গঠন হইতে থাকে—উহা মনের আদিম (crude) অবস্থা। মনের পূর্ণ বিকাশে মনুষ্য জন্ম। মনোময় কোষ বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে অহং (ego) জাগ্রত হয়। মনুষ্য-জন্ম পর্যন্ত প্রকৃতির বিবর্তন। মনুষ্য-জন্মের পর মানব-জীবনের উপর প্রকৃতির বিবর্তনিক শক্তি আর ক্রিয়া করিতে পারে না। তখন মানুষের অহং অভিমানজাত কর্মসংস্কার বীজাকারে কালের গর্ভে সঞ্চিত হইতে থাকে। সংস্কারই জীবাত্মাকে জন্ম পরম্পরাক্রমে ভোগায়তন দেহ ধারণ করাইয়া পরিপক্ক কর্ম-সংস্কারগুলির ফল ভোগ করায়। অতএব অহং-জাত কর্মসংস্কারগুলিই তখন প্রত্যেক মানুষের জন্ম ও জীবন নিয়ন্ত্রিত করে—উহাকেই বলা হয় ভাগ্য (fate)। মানুষের ক্ষেত্রেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আছে বলিয়াই নৈতিক, অনৈতিক (morality, immorality) পাপ-পুণ্যের, ভাল-মন্দের প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে উহাদের মন নাই বলিয়া এবং উহারা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় বলিয়া morality বা immorality র প্রশ্ন উঠে না। উহারা unmoral.

প্রাকৃতিক বিবর্তনের শেষ ধাপে মানব-সৃষ্টি। মানবদেহের মধ্যে মনোময় কোষের ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ অস্ফুরণ অবস্থায় থাকে। এইবার মানব-জীবনে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের (internal evolution বা evolution of man's internal nature) সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত অহং অভিমান (ego) থাকে, ততদিন অর্থাৎ বহু জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত মানুষের অন্তরে অধ্যাত্ম-প্রকৃতির বা স্ব-ভাবের বিবর্তন (evolution) আরম্ভ হয় না। বহু জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে যদি কোন এক জন্মে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ মেলে, তবে সেই সদ্‌গুরু প্রদত্ত দীক্ষা অর্থাৎ বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং নিজ পুরুষকারের দ্বারা বীজমন্ত্রের অনুশীলন করিলে অন্তরস্থ আধ্যাত্মিক স্ব-ভাব উন্মোচিত হয় (খুলিয়া যায়) এবং সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতির ভগবৎমুখী বিবর্তন শুরু হয়। ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও উহার সুষুম্না পথে সহস্রারে শিবধামের দিকে

ঊর্ধ্বগতি বোঝায়। এই অধ্যাত্মযাত্রা বা অন্তঃ-বিবর্তনের নানা পর্যায় বা বিভাগ আছে। প্রথম ষট্চক্র ভেদ, পরে প্রাণ-কুণ্ডলিনী, সম্বিদ্-কুণ্ডলিনী প্রভৃতি সর্ব বিভাগ অতিক্রম করিবার পর পরিশেষে ভগবৎ-স্বরূপে স্থিতি হয়।

ভুবন হইতে মায়া বা অশুদ্ধ বিদ্যার প্রসারণ পর্যন্ত, অর্থাৎ মায়ার অধিকারের সীমা পর্যন্ত মায়ার রাজত্ব। মায়ার রাজ্য হল 'ভব'। ভব অর্থাৎ 'becoming'—এখানে ভব-বন্ধন, কর্মানুবর্তন, জন্মমৃত্যু চক্রের আবর্তন। মায়ার অতীত মহামায়া বা শুদ্ধ বিদ্যার অধিকার পর্যন্ত 'অভব'। এ অবস্থায় জীব স্থান-কালের পরিণামের অতীত নিত্য স্থিতি লাভ করে। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-বার্দ্ধক্যের অতীত বৈন্দব ভূমিতে বিরাজ করে। এ-লোক জ্যোতির্লোক, অসীম শূন্যতায় পরিব্যাপ্ত। এখানে সর্বপ্রকার বৈষম্যের অতীত অখণ্ড শান্তি বিরাজিত। ইহারও ঊর্ধ্ব অবস্থা হল 'অতি-ভব' পরিণতি। ভব ও অভবের সামরস্যে এক অখণ্ড অদ্বয় সত্ত্বা, যাহা ভবও বটে, অভবও বটে আবার ভব-অভবের অতীত 'অতি-ভব' অবস্থা। এ-অবস্থায় পরম লাভ 'ভগবৎ-প্রেম'—যেখানে চিৎ-সত্ত্বা খুলিয়া যায় এবং চিৎ-শক্তির প্রকাশে চিন্ময় আনন্দের উপলব্ধি ও আস্বাদন হয়।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, পরমস্থিতির এক অদ্বয় অব্যয় অবস্থা যাহা শিবও নয়, শক্তিও নয় অথচ উভয়ের একীভূত এমন এক পরম সত্তা যাহা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয়। এই অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট না থাকিয়া বহু হইবার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা করিলেন। সঙ্কল্প মাত্রেই ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং পূর্ণ অবস্থা হইতে তিনি যেন স্বেচ্ছায় নীচে নামিয়া আসিলেন অর্থাৎ নিজেকে নিজে দেখিলেন—ইহাই ঈক্ষণ। অর্থাৎ নিরাবরণ পরম প্রকাশ একদিকে projected হইলেন। সেই projection এ পরম প্রকাশ নিজেকেই নিজে দেখিলেন (অ=অ+অ)। বহির্মুখ গতির ফলে পরম প্রকাশ নিজেকে যেন সঙ্কোচ করিলেন এবং তখনই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তি তাঁহার সঙ্কুচিত রূপকে আবরণ করিলেন। স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপ আত্মমায়ার আবরণের ফলে তিনি নিজ পূর্ণস্বরূপ বিস্মৃত হইলেন এবং পশু-জীব বনিয়া গেলেন। এইখানেই জীবস্বরূপের প্রথম আরম্ভ। যখন তিনি জীব বনিয়া মায়া-প্রমাতা হইয়া গেলেন তখন তিনি কি দেখিলেন? তাঁহারই পূর্ণ-স্বরূপকে সঙ্কোচ করার ফলে সেই সঙ্কুচিত স্থানের চারিদিকের খালি অংশে একটা halo বা শূন্য বা আকাশ দেখিতে পাইলেন—এই শূন্য আকাশই 'ইদন্তা'র সূচনা। প্রথমেই আত্মমায়ার আবরণে স্বরূপ আবৃত হইয়াছে, তাই পূর্ণ ঈশ্বর আংশিক ঈশ্বর হইয়াছেন এবং জীব-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই 'একজীববাদ'। আত্মমায়ার 'আবরণ'-শক্তি ছাড়া 'বিক্ষেপ'-শক্তি আছে। একজীবই সমষ্টিজীবের সমাহার। স্বরূপাবৃত সঙ্কুচিত সমষ্টিজীবের উপর এইবার আত্মমায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সময় পরাবাক্ সেই শূন্য আকাশে

স্বরূপাবৃত সমষ্টিজীবের সম্মুখে ছবির ন্যায় নব নব দৃশ্য একের পর এক অবিরাম ফুটাইয়া তোলে। পরিপূর্ণস্বরূপ পরমশিবের মধ্যে অবস্থিত তাঁহারই চিৎ-শক্তির মধ্যে নিরন্তর স্পন্দন হইতেছে বলিয়া ঐ সব দৃশ্য ভাবাকার পায়। পরাবাক্ এখন যে সমস্ত দৃশ্য সমষ্টিজীবের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা সবই পরমশিবের পূর্ণস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত অথচ এখন আত্মমায়ার আবরণে আবৃত হইয়া স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে এই সমস্ত দৃশ্যই সমষ্টিজীবের নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়। এত যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে—এ সবই 'ভাবরাজ্যে'—matter বলিয়া সেখানে কিছু নাই। এই সমস্ত দৃশ্যের যে-কোন একটিতে যখন যে-জীবের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়, তখন সেই দৃশ্যরূপের সঙ্গে সেই জীবের তাদাত্ম্য ঘটিয়া যায় অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ এক হইয়া যায়। এইরূপ তাদাত্ম্যের ফলেই প্রতিটি জীবের ভাগ্য সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। এরূপ কেন হয়, তাহা বলা যায় না। কারণ ইহার উপর কাহারও হাত নাই। যে যে জীব যেরূপ যেরূপ দৃশ্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, ভাবনা-কল্পনা, রুচি-প্রবৃত্তি, দোষ-গুণ অর্থাৎ এক কথায় তাহার যাবতীয় স্বভাব-ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ইহাই প্রতিটি জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব (individuality)। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে তাই প্রতিটি জীব অপর জীব হইতে স্বতন্ত্র। জগতে অসংখ্য অনন্ত কোটি জীব পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন এবং অনন্ত বৈচিত্র্যে পূর্ণ—একে অপরের অনুরূপ নয়। অথচ পূর্ণ-স্বরূপে সকলেই এক ও অভেদ। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যখন কোন জীবের মায়ার আবরণ দূর হইয়া স্বরূপ-পরিচয় হয়, তখন সর্বত্র অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকেই দেখিতে পায়। দেখিতে পায় ঘটে ঘটে নিজেই নানা বিচিত্ররূপে বিরাজমান। তখনই জগতের সঙ্গে তাহার অভেদ জ্ঞান হয়। জগতের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া মহা-করুণার উদ্রেক হয়—ইহাই great compassion যাহা বুদ্ধদেব প্রজ্ঞালাভের পর অনুভব করিয়া নিজের মুক্তির জন্য নির্বাণ লাভের দিকে না গিয়া উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া জগতের দুঃখ মোচন করিয়া সকলকে লইয়া মহামুক্তির জন্য পথের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং পরম করুণাবশতঃ সকলের জন্য সে-পথের সন্ধানও দিয়াছিলেন।

যাহা হোক, স্বরূপাবৃত জীবের নিকট পরাবাক্ শব্দের সাহায্যে অনন্ত অর্থকে একের পর এক পরিস্ফুট করিতে থাকেন অর্থাৎ বিকল্পের সৃষ্টি করিতে থাকেন। এই বিকল্পই মহামায়ার বিক্ষেপশক্তি। এই শব্দানুবিদ্ধ বিকল্প অর্থের বা দৃশ্যের দ্বারা যেই জীব প্রলুব্ধ হইতেছে, অমনি জীব মায়ার দ্বারা বদ্ধ হইয়া নাম-রূপাত্মক বহির্জগতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। জীবের যে স্থূল শরীর তাহা মাতৃগর্ভে মধ্যমা বাক্ বা বর্ণের দ্বারাই নির্মিত। 'ক'-বর্গ, 'চ'-বর্গ, 'ট'-বর্গ, 'ত'-বর্গ, 'প'-বর্গ, 'য'-বর্গ, 'শ'-বর্গ এবং স্বরবর্ণের 'অ'-বর্গ—এই অষ্টবর্গের বিশেষ বিশেষ সংস্থানেব (arrangement) দ্বারা বিশেষ বিশেষ জীব-শরীর

গঠিত। বর্ণরূপ মাতৃকাশক্তির দ্বারা মাতৃগর্ভে যে শরীর গঠিত হয়, তাহা মধ্যমা ও বৈখরি বাকের সংযোগে সাধিত হয়। নামরূপাত্মক স্থূল জগতে সেই স্থূল শরীর লইয়া শিশু ভূমিষ্ট হয়। নাম-রূপাত্মক বহির্জগতের যে জ্ঞান, তাহা শব্দার্থক বিকল্প জ্ঞান—বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। এবং স্থূল শরীরে জীবের যে 'অহং'-প্রতীতি হয়, উহা ভ্রান্ত অহং-জ্ঞান—বিশুদ্ধ স্বরূপ-অহং জ্ঞান নহে, যে স্বরূপ-জ্ঞানে 'শিবোহহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বোধ জন্মায়। অনাত্মায় আত্মবোধহেতু জীবে অহং-অভিমান বা অহঙ্কার জাগ্রত হয় এবং ভেদ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। স্বরূপ-চেতনার বা জ্ঞানের উদয় হইলে ভেদ-জ্ঞান বা ভ্রান্ত অহং-বুদ্ধির লয় হইয়া যায়। তখন শুদ্ধ চিন্ময় জ্ঞানে অর্থ শব্দানুবিদ্ধ হইয়া বিকল্পের উদয় করিতে পারে না। সব কিছুই জ্ঞানাকারে জ্ঞানে ভাসিতে থাকে, যেমন জলই জমাট বাঁধিয়া বরফ-আকারে জলে ভাসিতে থাকে। মায়ার ক্রিয়ায় ঐ জ্ঞানই যখন শব্দানুবিদ্ধ হইয়া বিকল্প অর্থ-জ্ঞানের উদয় করে, তখন জ্ঞান আর বিশুদ্ধ থাকে না। মায়া জীবের চেতনায় মলিন অঞ্জন মাখাইয়া ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপাদন করে এবং ঐ ভ্রান্তিকেই জীব সত্য বলিয়া মনে করে। তখন আমাদের পার্থিব জ্ঞান আর বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত subjective জ্ঞান থাকে না, উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞেয়রূপে বা objective world রূপে প্রতিফলিত হয়, যেমন বরফকে জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে আলাদা বস্তু বলিয়া মনে হয়। অতএব প্রথমে জ্ঞান, তারপর শব্দ এবং তারপরে আসে অর্থ। স্বরূপজ্ঞানের আবরণের ফলে প্রথম পরাবাক্ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের নিকট শব্দানুবিদ্ধ বিকল্পাত্মক অর্থকে প্রস্ফুটিত করিয়া বিকল্পক জ্ঞানের উদয় করায়। বিকল্পকে হটাইয়া শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় করাইতে হইলে যে-শব্দ বিকল্পের সৃষ্টি করে, সাধনার দ্বারা সেই শব্দার্থ-জ্ঞান হইতে চেতনাকে মুক্ত করিতে হইবে। তখন চেতনারূপ জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইবে শুধু অর্থকে প্রকাশ (reveal) করা এবং শেষে জ্ঞানই যখন অর্থ হইয়া অর্থরূপে প্রকাশমান হইবে, তখন তাহাই হইবে বিশুদ্ধ জ্ঞান। স্বরূপাবৃত সমষ্টিজীবের নিকট মহামায়া শব্দানুগত যে অর্থ একের পর এক ক্রমান্বয়ে ফুটাইয়া তুলিয়া জীবের মধ্যে যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, তাহাই পরবর্তী পার্থিব দশায় চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ হয়। ইহাই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। অতএব মায়ার দুই শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। যে মায়া জীবের বন্ধনের কারণ হইয়া জীবজন্ম ঘটাইয়া পার্থিব সুখ-দুঃখের ফলভোগ করায়, সেই মায়াই জীব ভগবন্মুখ হইলে তাহার সহায় হইয়া বন্ধন মোচন করিয়া দেয় এবং তাহার শিব-স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তাহার অনুগত হয়। মায়াই জীবের অবতরণকালে খেচরী-চক্র, ভূচরী চক্র প্রভৃতি চক্ররূপে জীবের বন্ধনের কারণ হয়। চক্র অর্থে বন্ধন। আবার স্বরূপের দিকে আরোহণকালে সেই মায়াই ভূচরী শক্তি, খেচরী শক্তিরূপে জীবের

শক্তিতে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে শিব-স্বরূপের দিকে আগাইয়া লইয়া যায়। চক্রগুলিই জীবশরীরের অভ্যন্তরে ষট্‌চক্র—মায়াশক্তি এখানে চক্রাকারে বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়া জীব-কুণ্ডলিনীরূপে নিদ্রিতা। আবার সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলে সহস্রার হইতে মূলাধার পর্যন্ত ব্রহ্মনাড়ীতে সরলরেখা উৎপন্ন হয় এবং জাগ্রতা কুণ্ডলিনীশক্তি সেই সরলরেখা ধরিয়া উপরে উঠিতে থাকিলে প্রতি চক্রধৃত বর্ণগুলি বিগলিত হইয়া নাদে পরিণত হয়।

সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে পরমসত্তার যখন দ্বিতীয় হইবার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা জাগে, তখন ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং নিজেকেই নিজে দেখেন—ইহা 'ঈক্ষণ'। পরমেশ্বরের মধ্যেই যখন চিৎশক্তি জাগ্রত হয়, তখন তাহা পরমেশ্বরের শক্তিমায়া বা স্বাতন্ত্র্যশক্তি। ঈক্ষণের ফলে চিৎশক্তিরূপা আত্মমায়ার মধ্যে নিরন্তর যে ভাব-স্পন্দন উত্থিত হয়, তাহাই 'সামান্য স্পন্দ'। এইরূপ স্পন্দনের ফলে অসংখ্য 'ভাব' দৃশ্যরূপে আকার প্রাপ্ত হয। যখন পরমসত্তা বহির্মুখ হন, তখন তাঁহার অন্তর্ভুক্ত চিৎশক্তির মধ্যে স্পন্দন জাগে আর যখন অন্তর্মুখ হন তখন চিৎশক্তির মধ্যে কোন স্পন্দন থাকে না। তখন কেবল আনন্দই আনন্দ, পরিপূর্ণ আনন্দ। পরমসত্তার বহির্মুখ গতির ফলে তাঁহার পরিপূর্ণ আনন্দের লাঘব হয়, তখন আনন্দ হ্রাসের জন্য অভাব বোধ জাগে এবং তাহা পূরণের ইচ্ছায বাইরের দিকে তাকান। এই বাহির কি এবং তাকিযেই বা কি দেখেন?

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরমশিব self contraction এর দ্বারা স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত হইযা আপন স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপ মাযাশক্তির দ্বারা আবৃত হইযা জীবে পরিণত হইলেন, অর্থাৎ মায়াপ্রমাতা বা শূন্যপ্রমাতা হইলেন। পরমশিবের পূর্ণতা হইতে আত্মসঙ্কোচনের (self contraction) জন্য যে অংশ খালি হইয়া পড়ে, তাহা halo বা শূন্যমণ্ডল বা আকাশে পরিণত হয়। পরমশিবই আত্মমায়ায় (শক্তিমায়ায) আবৃত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইযা জীব হইলেন। এই জীব একক—ইহাই 'এক জীববাদ'। একক জীবই অসংখ্য জীবের সমষ্টিভূত। অর্থাৎ এক জীবের মধ্যেই অসংখ্য জীব আছে এবং তাহাদের সকলের সমষ্টিই ঐ 'এক জীব'। যেমন ভারতীয় (Indian) বলিতে বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাতী, মাদ্রাজী প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের লোকের সমষ্টিকে বুঝায। যে শূন্যাকাশ তৈরী হইল, পরাবাক্ সেই শূন্যাকাশে মায়া-প্রমাতা জীবের সম্মুখে অনবরত নানা দৃশ্যরূপ ফুটাইয়া তোলেন। পূর্বে যে বলিয়াছি, আনন্দের হ্রাসের নিমিত্ত পরমশিবই মায়া-প্রমাতা জীব বনিয়া বাহিরে তাকান—সেই বাহির হইল ঐ আকাশ এবং যাহা দেখেন, তাহা ঐ পরাবাক্-সৃষ্ট দৃশ্যরূপ। পরাবাক্ যে দৃশ্যরূপ জীবের সম্মুখে একের পর এক ফুটাইযা তোলেন, তাহা ঐ 'সামান্য-স্পন্দন' হইতেই উদ্ভূত ও আকার-প্রাপ্ত। অতএব আনন্দের অভাববোধ হইতে জাত

ক্ষোভের ফলে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই অভাববোধ পূরণের জন্য চিদানন্দ হইতেই ভাব-উপকরণ সংগৃহীত হইয়া ভাবরাজ্যে যে দৃশ্যরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া আভাসমান হয়, তাহা অনাবৃত চিন্ময় পরমপ্রকাশ পরমার্থ-সত্তা হইতেই গৃহীত হয়। কারণ, এক ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই নাই।

পরাবাক্ কর্তৃক পরিস্ফুট দৃশ্যরূপ এক-জীব দেখেন এবং তাঁহার দর্শনের সঙ্গে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিজীব ব্যষ্টিরূপে তাহা সন্দর্শন করে এবং যাহার যে রূপে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়, সেই রূপে তাদাত্ম্য হইয়া যায় এবং এইখানেই সেই জীবের ভাগ্য, তথায় পুনরাগমন না হওয়া পর্যন্ত, নির্দিষ্ট হইয়া যায়। পরাবাক্ জীবের সম্মুখে নিরন্তর দৃশ্যরূপ ফুটাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে জীবের মধ্যে যে বিক্ষেপের উদয় হইতেছে, তাহাই সেই জীবের পার্থিব দশায় চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ হয়। ইহাই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি।

এই প্রসঙ্গে 'সদৃশ পরিণাম' ও 'বিসদৃশ পরিণাম' সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা যাইতেছে। 'সামান্য স্পন্দে'র ফলে অনবরত 'নদন' হইতেছে। 'নদন' হইতে অক্ষরমালা নির্গত হইতেছে। একই অক্ষর অনন্ত অক্ষর সৃষ্টি করিতেছে, যেমন ক ক ক $ক_১$ $ক_১$ $ক_১$ $ক_২$ $ক_২$ $ক_১$...এইরূপ অনন্ত ক সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। তেমনি খ হইতে অনন্ত খ, গ হইতে অনন্ত গ, ঘ হইতে অনন্ত ঘ প্রভৃতি অবিরল ধারায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই হইল 'সদৃশ' পরিণাম বা self multiplication.

'বিসদৃশ' পরিণামে 'কখ' বা 'কগ' বা 'কঘ' বা 'ঘক' বা 'ঘখ' বা 'খক' বা 'গঘ' বা 'গখ' ইত্যাদি অনন্ত বিভিন্ন প্রকার পরিমাণ ও সংস্থান সামঞ্জস্য বুঝায়। ইংরাজিতে যে প্রণালীতে permutation combination এর দ্বারা অঙ্ক কষা হয়, ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের সংস্থান ও পরিমাণ সামঞ্জস্যের দ্বারা ভাব-জগতে নানা অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ও ভাবময় দৃশ্যময় ফুটিয়া উঠে। এইখানেই সৃষ্টির আরম্ভ—ইহা সম্বিদ্-সৃষ্টি। এখানে জ্ঞেয় জ্ঞানের সহিত একাকার হইয়া থাকে। মায়ার ক্রিয়ায় জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়া-প্রমাতা এক-জীব এবং এক-জীবের অন্তর্ভুক্ত সমষ্টি জীবের নিকট স্থূল দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিসদৃশ পরিণাম হইতেই বর্ণমালার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবদেহের গঠন হয়। বর্ণই মাতৃকাশক্তি—বর্ণমালা বা অক্ষরমালা পরাশক্তিরূপা মহামাতার শক্তিচক্র। 'বিশেষ স্পন্দ' হইতেই বিসদৃশ পরিণাম হইয়া থাকে। বিসদৃশ পরিণামকে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ অবস্থা। যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিক্ষুব্ধ হইয়া অসাম্য হয়, তখন পরমাণুপুঞ্জের সংস্থান ও পরিমাণ সামঞ্জস্যের দ্বারা ভূত, সূক্ষ্ম ও স্থূলের উৎপত্তি হয়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টি

সাংখ্যমতে সৃষ্টি-কার্যের মূলে প্রকৃতি-পরিণাম। এই সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার নির্যাস নিম্নে দেওয়া হইল।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য পরিণামী অর্থাৎ পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। প্রকৃতির পরিণাম প্রতিক্ষণই হইতেছে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থারূপ। সৃষ্টি প্রকৃতির বিকার স্বরূপ। যতক্ষণ গুণক্ষোভ হইয়া বিকারের উৎপত্তি না হয় ততক্ষণ প্রকৃতি সাম্যাবস্থাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এই সাম্যাবস্থাতেও তাহার পরিণাম অব্যাহত থাকে। ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ সত্ত্বরূপে, রজোগুণ রজোরূপে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিণত হওয়ার নাম 'সদৃশ পরিণাম'। এই অবস্থায় তিনটি গুণের পরস্পর সংমিশ্রণ হয় না। এই প্রকার সংমিশ্রণ না হইলে সৃষ্টিকার্যের উদ্ভব হইতে পারে না। তাই এই পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। পরস্পর বৈষম্যযুক্ত পরিণামকে 'বিসদৃশ পরিণাম' বলে। বিসদৃশ পরিণামে তিনটি গুণ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ থাকিতে পারে না—পরস্পর মিলিত হইয়া একটি কার্য উৎপন্ন করে এবং মিলিত হওয়ার সময় উহাদের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন একটি গুণ প্রধান হইয়া কেন্দ্রস্থান অধিকার করে ও অপর দুইটি গুণ অপ্রধানরূপে ঐ প্রধান গুণের আশ্রিতভাবে তাহাকে আবর্তন করিতে থাকে। প্রধান গুণে শুধু যে গুণগত প্রাধান্য থাকে তাহা নহে, গুণে মাত্রাগত প্রাধান্যও থাকে। অপ্রধান গুণের মধ্যেও মাত্রাগত উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রভৃতি থাকে।

ইহা ছাড়া, কোন কার্যের উৎপাদনে গুণ সমূহের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ব্যবধান, স্থিতি ও পরস্পর আভিমুখ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিকার বা কার্যের উপাদান একই প্রকৃতি—ইহা সত্য, তথাপি জগতে অনন্তপ্রকার কার্য পরস্পর বিভিন্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ গুণত্রয়ের সংখ্যা ও মাত্রাগত ভেদ এবং পরস্পর অবস্থানের ও কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য।

এই একই বিষয়কে লইয়া কবিরাজ মহাশয় 'বিশুদ্ধবাণী ষষ্ঠ ভাগে সূর্য-বিজ্ঞান-রহস্য' প্রবন্ধে এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—'অবয়বের যথাবিধি সংস্থান হইতেই অবয়বী উৎপন্ন হয়। অবয়ব সকলকে ভালভাবে চিনিতে পারিলে এবং তাহাদের সংযোজন-প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিলে অবযব সমূহের মিলনের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ অবয়বীকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন বর্ণদ্বারা

পদ রচনা হয় তেমনি অবয়বের দ্বারা অবয়বী রচনা হয়। এই রচনা-প্রণালীতে শুধু অবয়ব সমূহেরই যে গুরুত্ব আছে তাহা নহে, কিন্তু অবয়ব সকলের পরস্পর সম্বন্ধেরও আবশ্যকতা আছে।...এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এই যে অন্তিম অবয়বের আবির্ভাব ও যোজনা না হওয়া পর্যন্ত সমগ্ররূপে অবয়বীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মধ্যে, এমনকি অন্তেও, একটি অবয়বের অভাব হইলে অথবা একটির আধিক্য হইলে পূর্ব-নির্দিষ্ট কার্য উদ্ভূত হইতে পারে না। যথোচিত ভাবে অবয়বের সন্নিবেশ ব্যতিরেকে অবয়বীর উৎপত্তিই অসম্ভব।...

বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, জগতের সকল বস্তুই সর্বাত্মক অর্থাৎ জগতের যে কোন বস্তুতে অন্য যে কোন বস্তুর সত্তা আংশিকভাবে রহিয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে নিরপেক্ষ কোন বস্তু থাকিতে পারে না। আমরা কোন বিশেষ বস্তুকে তাহার বিশেষ রূপ অথবা নামের দ্বারা অথবা গুণ-ক্রিয়ার দ্বারা চিনিয়া থাকি। ইহাতে মনে করা উচিত নহে যে অন্য বস্তুর উপাদান উহাতে নাই। যদি প্রকৃতিকে মূল উপাদান বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে প্রকৃতিই বস্তুর মূল উপাদান। প্রকৃতি হইতেই পরিণামের ক্রম ধরিয়া ঐ বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ প্রকৃতিরূপ উপাদানের কার্যবিশেষ। এইজন্য যে কোন বস্তুতে জগতের যাবতীয় বস্তুর উপাদান রহিয়াছে বলিয়া প্রয়োজন অনুসারে উহাকে যে কোন বস্তুরূপে পরিণত করা সম্ভবপর। যাহাকে আমরা গোলাপ বলি তাহা বাহ্য-স্বরূপে সত্যই গোলাপ ইহা সত্য, কিন্তু উহার উপাদানে বিশ্ব-সৃষ্টির মূল উপাদান বর্তমান রহিয়াছে। তাই প্রয়োজন হইলে উহার মধ্য হইতে পদ্মের উপাদানকে আকর্ষণ করিয়া একটি পদ্মফুল নির্মাণ করা যায়। তদ্রুপ প্রয়োজন হইলে উহা হইতে জবা অথবা চম্পকও বাহির করা যায়। শুধু পুষ্প কেন অন্য যে কোন বস্তুরূপে ঐ গোলাপ ফুলটিকে পরিবর্তন করা যায়। ইহা এইজন্য সম্ভবপর যে গোলাপে ঐ সকল জিনিষের উপাদান রহিয়াছে। গোলাপ ফুলের সৃষ্টিতে গোলাপের উপাদানই বিশেষভাবে কার্য করে, অন্যান্য উপাদান অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি গোলাপ ফুলটিকে পদ্মফুল করিতে হয় তাহা হইলে গোলাপের মধ্যেই যে পদ্মের উপাদান আছে তাহাকে ক্রিয়াশীল করিতে হইবে। পদ্মের উপাদান ক্রিয়াশীল করিতে পারিলে ঐ ক্ষুদ্র উপাদান বাহ্য সৃষ্টি হইতেও স্বজাতীয় উপাদান আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে এবং পুষ্টির পরিণাম স্বরূপ পদ্মরূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যে অনুপাতে পদ্মের উপাদান প্রবল হইয়া অর্থাৎ পুষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে ঠিক সেই অনুপাতে গোলাপের উপাদান ক্ষীণ হইয়া অব্যক্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু অব্যক্ত হইলেও শূন্য হইবে না। কারণ মূল প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে সকল উপাদানই বিদ্যমান

থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, গোলাপ পদ্মে পরিণত হইল। তখন গোলাপের নাম রূপ গুণ ক্রিয়া কিছুই থাকিবে না, পক্ষান্তরে পদ্মের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গোলাপ, পদ্মে পরিণত হইল না। কারণ গোলাপ সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া গেল এবং পদ্ম স্থূলরূপে ফুটিয়া উঠিল। পূর্বে পদ্ম সূক্ষ্মরূপে ছিল এবং গোলাপ স্থূলরূপে, এখন তাহার ব্যতিক্রম হইল।

এইভাবে বিচাবপূর্বক দেখিতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রত্যেক বস্তুরই পৃষ্ঠদেশে অব্যক্ত এবং সূক্ষ্মভাবে মূল প্রকৃতি রহিয়াছে। আপূরণের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকাব কার্যের উৎপত্তি হইযা থাকে। যোগসূত্রকাব পতঞ্জলি বলিযাছেন--- "জাত্যন্তর পবিণামঃ প্রকৃত্যাপূবাৎ" অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা উপাদানের আপূবণ হইলে এক জাতীয বস্তু অন্য জাতীয বস্তুতে পরিণত হইতে পারে।

সাংখ্যেব সৃষ্টির মূলে প্রাকৃতিক উপাদানেব কথা বলা হইল। কিন্তু আগামতত্ত্ববিদ্ ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখায সাংখ্যসূত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পাবেন নাই। তিনি আরও গভীরে প্রবেশ করিয়া 'যোগবলে' সৃষ্টির কথা বলিযাছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধেই বলিযাছেন, "কিন্তু যোগবলে যে সৃষ্টি হয় তাহা এই প্রকার নহে। যোগ সৃষ্টি ইচ্ছাশক্তি হইতে হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিতে পৃথক্ উপাদানের আবশ্যকতা থাকে না, উপাদান বস্তুতঃ স্রষ্টার স্বীয় আত্মাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিতে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় অভিন্ন—আত্মা অর্থাৎ যোগী স্বয়ং নিজের স্বরূপ হইতেই বাহ্য কোন উপাদানের অপেক্ষা না রাখিয়া ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অন্তঃস্থিত অভিলষিত পদার্থকে বাহির করিয়া থাকেন। এই যে আত্মার অন্তঃস্থিত অর্থ ইচ্ছা দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত করা ইহারই নাম যোগসৃষ্টি। তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই বিন্দুর বিসর্গলীলা। অদ্বৈত ভূমিস্থিত যোগী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শক্তিসূত্রে আছে—

"স্বেচ্ছয়া স্ব-ভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি"।—তাই উৎপলাচার্য বলিয়াছেন—

চিদাত্মা হি দেবোহন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।
যোগীব নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ॥

শ্রীশংকরাচার্য বলিয়াছেন যে সমগ্র বিশ্ব, আত্মার নিজ-স্বরূপের অন্তর্গত। দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে দৃশ্যমান নগরী যেমন দর্পণেরই অন্তর্গত, দর্পণ হইতে পৃথক্ নহে, তদ্রূপ প্রকাশময় আত্মাতে প্রতিভাসমান দৃশ্য আত্মারই অন্তর্গত, আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। জ্ঞানী এইরূপেই বিশ্বকে দেখিযা থাকেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে আত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই। কিন্তু যে অজ্ঞানী, যে প্রকাশময় আত্মার স্বরূপ দর্শন করে নাই, সে জাগতিক পদার্থকে আত্মা

হইতে অভিন্ন বলিযা অথবা আত্মার অন্তর্গত বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ মায়ার প্রভাব। মায়া-শক্তি দেশ ও কাল উদ্ভাবন করিয়া আত্মনিহিত বিশ্বকে দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছন্নরূপে এবং পৃথক্ রূপে জীবের নিকট প্রদর্শন করে। ঈশ্বর মায়াশক্তির অধিষ্ঠাতা—ঐশ্বর্য-সম্পন্ন যোগীও আংশিকভাবে তাহাই। এইজন্য যোগী অঘটন-ঘটন পটীযসী মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিযা কোন পদার্থকে বাহিরে প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহাবই নাম যোগীর ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার। ইচ্ছাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্য-শক্তিই মায়া-শক্তির স্বরূপ। এই যে বাহ্য প্রকাশন ইহা অজ্ঞানান্ধ জগতের দৃষ্টিতে বস্তুর উৎপত্তি বা আবির্ভাব রূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে আত্মার সঙ্গে অভিন্নভাবে স্থিত বস্তুর, অর্থাৎ আত্মারই শক্তির বাহ্য প্রকাশন মাত্র। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূবেই দেওয়া হইয়াছে কবিরাজ মহাশয়ের বিশ্লেষিত 'ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিযাশক্তি' প্রবন্ধে। সুতরাং এখানে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে ইহাই বলা যাইতে পারে যে কবিরাজ মহাশয তাঁহার পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রী যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পবমহংসদেবের নিকট হইতে উক্ত উভয ধারার সৃষ্টিব সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানকে তাঁহার গুরুদেবের প্রদর্শিত সূর্যবিজ্ঞান-শক্তির এবং যোগশক্তির প্রমাণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিলাইযা লইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমবা যে-কযজন পরম পূজনীয় গোপীনাথ কবিরাজের পদতলে বসিযা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের এবং কাশ্মীর আগমশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিতাম, সেই আমাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর স্বামী, ডঃ রাম অধিকারী, জয়দেব সিং প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও ছিলেন। যখনই কেহ গোপীনাথ কবিরাজের বিশ্লেষিত কোন অংশে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন, তখনই বিছানার উপব উপবিষ্ট তিনি মাথার বালিশের উপর জোরে তিনবার চাপড় মারিয়া বলিতেন—'হয, হয়, হয়। এই তিনবার আমি গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি।'

যাহা হউক, আমাদের পুনরায় সাংখ্যসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক্। "সাংখ্যসম্মত বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে যোগীর ইছাশক্তিরূপ মৌলিক ইচ্ছার কোন ক্রিয়া থাকে না। সাধারণ ইচ্ছা অবশ্যই থাকে, কারণ, তাহা না থাকিলে ক্রিয়াশক্তি কার্য করিতে পারে না। তাই সাংখ্যের সৃষ্টির মূলেও ইচ্ছা বর্তমান, কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা চ্যুত হইতে পারে না। ইচ্ছা নির্বিষয়ক হইতে পারে না। কোন একটি বিষয়কে পাইবার জন্য ইচ্ছার উদয় হয়। সৃষ্টির প্রথমে ইচ্ছা ভাবরূপে উদয় হয় অর্থাৎ ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাই স্রষ্টব্য 'ভাব'। ইচ্ছার প্রভাবে প্রকৃতির তিনটি গুণ ক্ষুব্ধ হইয়া উক্ত 'ভাবে' পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহাই সৃষ্টির উদয়। এই যে ক্ষোভের

কথা বলা হইল ইহা পরিণামাত্মক ব্যাপার নহে, কারণ পরিণাম তো প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ক্ষোভ হইতে পরিণাম হয় না, কিন্তু ক্ষোভ হইতে পরিণামের বৈশিষ্ট্য নিরুপিত হয়। অর্থাৎ কি প্রকার পরিণাম হইবে তাহাই ক্ষোভের উপর নির্ভর করে। ক্ষোভের মূল 'ইচ্ছা'। পরিণামের মূল 'ইচ্ছা' নহে, উহা প্রকৃতির স্বভাব।

সদৃশ পরিণামের সময় সত্ত্বগুণ প্রতিক্ষণেই সত্ত্বগুণরূপেই স্ফুরিত হইতে থাকে। ইহার জন্য ইচ্ছার আবশ্যকতা হয় না। এই প্রকার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সদৃশ পরিণাম প্রকৃতির কার্যোন্মুখতা সূচিত করে। এই অবস্থা নিরুদ্ধ হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হইতে পারেনা। তখন প্রকৃতি জননীরূপ ধারণ করেন না, তখন প্রকৃতির কুমারী অবস্থা। প্রকৃতি হইতে সদৃশ পরিণাম অপগত হইলে প্রকৃতির স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতি শুধু অব্যক্ত নহেন, পুরুষের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না তাঁহারা প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক পরিণাম মানেন না। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি পুরুষে অস্তমিত হইয়া পুরুষের স্বশক্তিরূপেই বর্তমান থাকে। কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য মতানুসারে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদৃশ পরিণামও স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ পরিণামটিকে প্রকৃতির স্বভাব বলিয়া গণনা করিতে হয়।

জীবের ইচ্ছা উদ্ভূত হইয়া সংস্কাররূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে। অনাদিকাল হইতে বহু ইচ্ছা এই প্রকার উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিগর্ভে সুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল ইচ্ছা বীজস্বরূপ। ইহারা কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ক হইতেছে। যখন এই পরিপাক ক্রিয়াপ্রভাবে কোন ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তখন উহা ফলরূপে অর্থাৎ কার্যরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহ পুষ্ট হইতে হইতে যেমন পরিপূর্ণ পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয় তদ্রূপ যে কোন ইচ্ছারূপ সংস্কার-বীজ কালশক্তির প্রভাবে যথার্থভাবে পরিপক্কতা লাভ করিলেই ফলরূপে ফুটিয়া বাহির হয়। তখনই উহা অর্থাৎ ঐ ফল ইচ্ছার আশ্রয়ভূত কর্তৃত্বসম্পন্ন জীবের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। এই যে ইচ্ছা হইতে ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব ইহার জন্যই প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম আবশ্যক। সদৃশ পরিণামবিশিষ্ট প্রকৃতি ফলোন্মুখ ইচ্ছার প্রভাবে উক্ত ফলের আকার ধারণ করে। ফলাবস্থা হইল ভোক্তা জীবের ইন্দ্রিয়ের ভোগাবস্থা। ত্রিগুণের পরস্পর মিশ্রণ না হইলে এই বিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব হইতে পারে না।

পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে প্রতি পদার্থের পাঁচটি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। এই পাঁচটি অবস্থার নাম—স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে

অর্থবত্ত্বই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। অর্থবত্ত্ব না থাকিলে প্রকৃতিতে বিসদৃশ পরিণাম উৎপন্ন হইবার অন্য কোন বিশেষ কারণ পাওয়া যায় না।

অর্থবত্ত্ব কাহাকে বলে? 'চাই' এইভাব, ইহাকেই অর্থবত্ত্ব বলে। যখন এই 'চাই' ভাব অর্থাৎ যাহাকে পূর্বে জীবের সুপ্ত ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, পরিপক্কতা বশতঃ স্ফুরিত হয় তখনই এই 'চাই' ভাবের অনুকরণ করিয়া প্রকৃতিতে তদনুরূপ পরিণামের আবশ্যকতা হয়। যাহা Idea ছিল তাহা এইভাবে actual রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ অর্থবত্ত্বটি একটি ছাঁচ বা mould। প্রকৃতি রসরূপে তাহাতে ঢলিয়া পড়ে এবং তাহার আকার ধারণ করে। পরিপূর্ণ স্থূল অবস্থা পর্যন্ত উপনীত হইতে মাঝে আরও তিনটি অবস্থা ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এই তিনটি অবস্থা হইল পূর্বোক্ত অন্বয়, সূক্ষ্ম ও স্বরূপ। পুরুষ নিষ্কাম হইলে প্রকৃতিতে অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ 'চাই' ভাব থাকে না বলিয়া বিসদৃশ পরিণাম হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি স্থগিত থাকে। এই যে অর্থবত্ত্ব ইহা ইচ্ছাত্মক হইলেও ভাবগত একটি আকার মাত্র। প্রকৃতিতে ইহার যোগ হইলে, প্রকৃতি এই আকার ধারণ করিয়া থাকে। তাহাই সৃষ্ট পদার্থরূপে অর্থাৎ বিকৃতিরূপে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতি তখনই কোন আকার ধারণ করিতে পারে যতক্ষণ ইহাতে দ্রুতি আছে। কারণ গলা বস্তুই আরোপিত আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতির এই গলা-ভাবটি প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ সদৃশ পরিণামের দ্যোতক। সদৃশ পরিণাম শব্দে প্রকৃতির এই গলিত ভাবটিই লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম এবং সৃষ্টির জন্য উভয়ই আবশ্যক। (দ্রষ্টব্য, পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা-২০)

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতি, বেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের মায়া সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া লইতেছি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব সাংখ্যের। সাংখ্যে মায়ার কোথাও উল্লেখ নাই।

বেদান্তে মায়া ব্রহ্মাশ্রিত। আগমে মায়া একত্ব বাচক এবং বহুত্ব বাচক বিধায় দ্বিবিধ। একত্ববাচক মায়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ। ইহার বিবিধ নাম, যেমন—পরাশক্তি, যোগমায়া, পরাবাক্ প্রভৃতি। বহুত্ববাচক মায়া অশুদ্ধ অহং অভিমান সম্পৃক্ত। যখন সাধক, সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হয়, তখন জীবন ও জগৎ, সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা, আনন্দ-বেদনা সমস্ত মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে। কারণ, সাধক তখন যে অবস্থায় থাকে, সেটা তুরীয় অবস্থা। সেখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পাপ-পুণ্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ঐ সমস্তের অনুভবও নাই। ইহাই বৈদান্তিক

মায়াবাদীদের অভিমত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় উপনীত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, পাপ-পুণ্য সমস্ত কিছুই সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য। পার্থিব মানুষ মায়াভিভূত অবস্থায় থাকাকালে যদি বলে, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্য, কর্ম-অকর্ম, ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই, সবই মিথ্যা, তবে সেটা হবে তার পক্ষে সত্যের অপলাপ করা। পার্থিব মানব যতক্ষণ অশুদ্ধ অহংজ্ঞান-সম্পৃক্ত মায়ায় আবৃত, ততক্ষণ তাহার নশ্বর শরীরেব অস্তিত্বও যেমন সত্য, তেমনি পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ কর্মের বিচারও সত্য, একতিল মিথ্যা নয়।

তন্ত্রে মায়া হইল ব্রহ্মের চিৎশক্তি। এই চৈতন্য শক্তি হইতে উদ্ভুত জীব, জগৎ, মনুষ্য-শরীর অর্থাৎ পার্থিব যাবতীয় বস্তু সবই সত্য। জীবের মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ, জড়ের মধ্যেও সেই একই শক্তি বিদ্যমান। জড়দেহের মধ্যে সুপ্ত চৈতন্য শক্তিকে জাগ্রত করাই তান্ত্রিকের লক্ষ্য। তান্ত্রিকের নিকট জড়দেহ মিথ্যা নয়, সাধনার প্রধান অবলম্বন। কায়া ও মায়া (অর্থাৎ চিৎশক্তি) তান্ত্রিকের নিকট অবিনাভাবে যুক্ত। অতএব দুই-ই তাহার নিকট সত্য। প্রথমটিকে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিলে দ্বিতীয়টির সাধনা হয় না। সাধন-পথে তাহার পক্ষে উভয়েরই সমান মূল্য, উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ।

শব্দাত্মক বা নাদাত্মক সৃষ্টি প্রক্রিয়া

সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আলোচনা কবিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সর্বত্রই সৃষ্টির মূলে শব্দের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈদিক, তান্ত্রিক এবং অন্যান্য সাধনাব চরম সিদ্ধান্ত ইহাই এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে খ্রীষ্টীয় সাধন-তত্ত্বেরও ইহাই সার কথা।

আগম মতে শব্দতত্ত্ব বা নাদতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবাব পূর্বে বেদ ও উপনিষদে অক্ষর-তত্ত্ব বা শব্দ-ব্রহ্মের বিশ্লেষণ যেভাবে করা হইযাছে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করিয়া লওয়া যাইতেছে। ইহাতে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় ধারার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যগ্ অবগত হওয়া যাইবে।

অক্ষরতত্ত্ব—ওঙ্কার শব্দের উদ্ভবঃ—-ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'ওঙ্কার'কে 'অক্ষর' এবং পরম-ব্রহ্মের উপাসনাকে 'অক্ষর-ব্রহ্মে'র উপাসনা বলেন। সুতরাং অক্ষর-ব্রহ্মই ওঙ্কার পদবাচ্য। ওঙ্কার—শব্দ। অতএব শব্দই ব্রহ্ম।

কিন্তু 'ওঙ্কার' শব্দের কোন উল্লেখ সাক্ষাৎভাবে ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের ৩য় ঋকে একটি বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানে অক্ষর শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে অক্ষর শব্দ যে ওঙ্কারেরই প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইযাছে—সায়নাচার্য এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎভাবে ওঙ্কারের বর্ণনা পাই। সেখানে ওঙ্কারের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের বণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা হইতে প্রথম 'ওম্' শব্দের উৎপত্তি হয় এবং ইহার প্রথম বর্ণ 'ও' হইতে 'আপ্' এবং 'ম্' হইতে 'তেজে'র সৃষ্টি হয়। 'ওম্' এখানে দুই বর্ণবিশিষ্ট; 'ও' আকাশতত্ত্ব 'ম্' পৃথিবীতত্ত্ব। তদনন্তর বৈদিক যুগেই এই দুই বর্ণ অ, উ, ম্—এই তিন বর্ণে পরিণত হয় এবং আরও পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বা শক্তিসাধনায় চন্দ্রবিন্দু (ঁ) উক্ত তিন বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া একাক্ষর 'ওঁ' হইযাছে। 'ওঙ্কারে'র এইরূপ ক্রমবিকাশের সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপার সম্বন্ধে আর্য ঋষিদিগের জ্ঞান-বিকাশের একটি পরম্পরা লক্ষিত হয়। 'ওঁ' এই অক্ষর এক্ষণে ভূঃ-ভূবঃ-স্বঃ এই তিনলোক, ঋক্-যজু-সাম এই তিন বেদ, গায়ত্রী-ত্রিষ্টুপ-জগতী এই তিন ছন্দ এবং প্রাণ-অপান-ব্যান এই তিন বায়ু নির্দেশ করে।

ওঙ্কারের অর্থ বিশ্লেষণঃ—ওঁ এই একাক্ষর শব্দের অর্থভাবনা উপনিষদ্‌যুগে ব্রহ্মতত্ত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন—

(১) 'ঐতরেয়' উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ বাক্য—"ওঁতৎসৎ"। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের সর্বগত (ওঁ), সর্বাতীত (তৎ) এবং সর্বান্তরভাবক (সৎ) ত্রিবিধ স্বরূপকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(২) 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ওমিতি-ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্" (১।৮)। অর্থাৎ 'ওঁ'-ই ব্রহ্ম, 'ওঁ' এই সমুদয়। এখানে ব্রহ্মের সর্বগতত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

(৩) 'প্রশ্নোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে—"পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কার" (৫।২)। অর্থাৎ ওঙ্কার বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ তাহা পর ও অপরব্রহ্মস্বরূপ।

(৪) শঙ্করভাষ্যে প্রশ্নোপনিষদের উদ্ধৃত শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখা করা হইয়াছে—

"পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যং, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং"। অর্থাৎ পুরুষ-সংজ্ঞক অক্ষরস্বরূপ যে পরব্রহ্ম এবং প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর-ব্রহ্ম—এই উভয়ই ওঙ্কারাত্মক। ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।

কাশ্মীরী শৈবাগমে ইহাকেই এইরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—"প্রাক সংবিদ্ প্রাণে পরিণতা"।

(৫) ব্রহ্মের সর্বগতত্ব জ্ঞাপক 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা 'মাণ্ডুক্য' উপনিষদে এইরূপে করা হইয়াছে—

"ওঁ ইত্যেদক্ষরমিদং সর্বং; ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কারমেব" (১ম শ্লোক)। অর্থাৎ 'ওঁ' এই অক্ষরই সমুদয়; ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমুদয়ই এই ওঙ্কার।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখা করা হইয়াছে—

(ক) "সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"। (২য় শ্লোক)

(খ) "সোহয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা
মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকার মকার ইতি"। (৮ম শ্লোক)

(গ) "জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাহ্ হপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি
হ্ বৈ সর্বান, কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ"। (৯ম শ্লোক)

(ঘ) "স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকার দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ্ বৈ
জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি য এবং বেদ" (১০ম শ্লোক)

(ঙ) "সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতের পীতের্বামিনোতি
হ্ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ"। (একাদশ শ্লোক)

(চ) "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব
সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানং য এবং বেদ"। (দ্বাদশ শ্লোক)

অর্থাৎ—(ক) এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আত্মা। এই আত্মা চতুষ্পদ। (খ) সেই এই আত্মা ওঙ্কার। ওঙ্কারের অক্ষর ও মাত্রা অবলম্বনে পাদ ও মাত্রা। অকার, উকার ও মকার, পাদ ও মাত্রা। (গ) জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার। তিনি আপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা আদিমত্ব বশতঃ প্রথম মাত্রা অকার। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন। (ঘ) স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার। যিনি এরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহের উৎকর্ষসাধন করেন এবং ইহার ফলে শত্রুমিত্র সকলে তাঁহার নিকট সমান হয় এবং তাঁহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। (ঙ) যিনি সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ, তিনি মিতত্ব বা একীভূতত্ব বশতঃ তৃতীয় মাত্রা মকার। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সকলের পরিমাণ করেন ও এক হন। (চ) মাত্রাশূন্য চতুর্থ অব্যবহার্য, প্রপঞ্চাতীত, শিব ও অদ্বৈত। এইরূপ ওঙ্কারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন, তিনি পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

(৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুব্রাহ্মণ অবতারণার প্রাক্কালে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা ধাতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি"। (৩।৮)

অর্থাৎ, হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য-চন্দ্র নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁহার শাসনে স্থির রহিয়াছে। নিমেষ, কালের অতি ক্ষুদ্র অংশ মুহূর্ত, দিবা-রাত্রি, অর্ধমাস, মাস, ঋতু সংবৎসরসমূহ এই অক্ষরের শাসনে নিয়মিত রহিয়াছে। এই অক্ষরের শাসনে শ্বেতপর্বত অর্থাৎ হিমালয় হইতে পূর্বদিকবাহিনী (গঙ্গা প্রভৃতি) নদীসকল যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে, সেইরূপ পশ্চিমদিক প্রবাহিনী ও অন্যান্য নদীসকল যে যেদিকে যাইয়া থাকে, তাহারা তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করে না।

(৭) কঠোপনিষদে ওঙ্কারের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

সমুদয় বেদ যে পদের কীর্তন করে, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থীরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি এই 'ওঁ'।

এই যে অক্ষরটি ইহা সর্বগত ব্রহ্ম, ইহাই আবার সর্বাতীত ব্রহ্মও। ইহাকে জানিয়া যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়—

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি,
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাতা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ॥"
(১।২।১৫,১৬)

কঠোপনিষদের এই মন্ত্রের উল্লেখপূর্বক মৈত্রী উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, এই ওঙ্কারই প্রাণ এবং আদিত্যরূপে আত্মার মূর্তি; এই মূর্তি উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত—এই তিন স্বরে উচ্চারিত হইয়া শব্দবতী হন। ইহাই অগ্নি, বায়ু এবং সূর্যরূপে দীপ্তিমতী হন; ইহাই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র; ইহা গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি—এই তিন মুখবিশিষ্ট; ইহা ভূঃ, ভুবঃ, স্ব—এই ত্রিভুবন এবং ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালবিশিষ্টা। ইহা প্রাণ, অগ্নি, সূর্য্য—এই ত্রিবিধ তেজের আধার এবং অন্ন, জল ও চন্দ্রমা—এই তিনরূপ আপ্যায়নবিশিষ্টা (এষা অন্নম্ আপঃ চন্দ্রমা ইতি আপ্যায়নবতী)। ইহা বুদ্ধি, মন এবং অহঙ্কার—এই ত্রিবিধ চেতনবতী। এই হেতু 'ওঁ' এই অক্ষরের দ্বারা এই সকল প্রশংসিত, অর্চিত এবং বিশেষভাবে প্রাণাদিত্যরূপ আত্মাতে সমারোপিত হন।

(৮) গীতাতেও বলা হইয়াছে—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩)। অর্থাৎ, ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ দ্বারা ব্রহ্মের সর্বগত, সর্বাতীত এবং সর্বান্তরভাবক রূপ সূচিত হয়। 'ওঁ' সর্বগত ব্রহ্ম, 'তৎ' সর্বাতীত ব্রহ্ম—"তদেতৎ" (কঠোপনিষদ্ ৫।১৪), অর্থাৎ 'তিনিই এই' এবং 'সৎ' সর্বান্তর্যামী, সর্বান্তরভাবক ব্রহ্ম—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্যে উপনিষদ্ ৬।২১), অর্থাৎ, হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ-ই ছিলেন।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐতরেয় উপনিষদ্ (১।১)॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সৎ' এবং ঐতরেয় উপনিষদের 'আত্মা'—উভয় শব্দই একই অর্থবাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।৭ মন্ত্রে ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—

"স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি"। অর্থাৎ সেই যে এই আণিমা অর্থাৎ অণুত্ব, ইহাই সৎ পদার্থ, এ সমস্তই এতৎস্বরূপ। অর্থাৎ এই সৎস্বরূপ অণুত্বই জগতের মূল। সেই সৎ পদার্থই সত্য, তাহাই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ হও।

মহানির্বাণ তন্ত্রে "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রেব মহিমাব বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ উক্ত হইযাছে—

"নিগমাগম তন্ত্রাণাং সাবাৎসাবতবো মনুঃ।
ওঁ তদসর্দিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীবিতম্।"

(১৪শ, উল্লাস-১৫৯)

অর্থাৎ, হে দেবেশি! "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র যে নিগম ও আগম তন্ত্র সমূহেব সাব, একথা তোমাকে আমি সত্য কবিযা বলিতেছি।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয যে, সর্বগতত্ব, সর্বান্তর্যামীত্ব এবং সর্বাতীতত্ব একাধাবে যুগপৎ এই তিন অবস্থা লইযা "অক্ষব-পুরুষ" এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন লইযাই 'অক্ষব তত্ত্ব"। 'ওঁ' এই শব্দ প্রতিপাদিত 'অক্ষব পুরুষ' হইতে 'অক্ষব তত্ত্ব' মূলক জীব-জগতেব আবির্ভাব হইযাছে। অথবা ব্রহ্ম অভিধেয ওঁ কাব হইতেই প্রাপঞ্চাত্মক স্থূল জগৎ প্রসবিত হইযাছে।

উপবে বৈদিক পদ্ধতিতে 'অক্ষব তত্ত্ব' বিশ্লেষিত হইল। এইবাব ম. ম. গোপীনাথ কবিবাজেব বিশ্লেষণ অনুসবণ কবিযা তান্ত্রিক বা শাক্ত প্রণালীতে শব্দ-তত্ত্ব বিশদরূপে আলোচনা কবা যাইতেছে।

শব্দতত্ত্ব বা নাদতত্ত্ব—শাক্ত বা তন্ত্রশাস্ত্রে নাদ বা শব্দ-তত্ত্বেব বিজ্ঞান সম্মত বহু আলোচনা আছে। সেখানে বর্ণনা কবা হইযাছে যে, কুণ্ডলিনী বিন্দুস্বরূপা মহামাযা। ভগবানেব চিৎশক্তি বিন্দুরূপী মহামাযাতে পতিত হইলে, মহামাযা স্পন্দিত হইয়া নাদরূপে পবিণত হয। তখন সেই নাদ বিন্দুরূপী চিদাকাশে তবঙ্গরূপে প্রবাহিত হয। অতএব নাদেব অভিব্যক্তিব মূল হইল চিদাকাশে চিৎশক্তিব আঘাত। চিৎশক্তি যখন মহামাযা হইতে মাযাতে প্রতিফলিত হয, তখন মায়াতে ক্ষোভ জন্মে।

শব্দ চৈতন্যস্বরূপ। বিশুদ্ধ ব্যোমতত্ত্বে বা চিদাকাশে অখণ্ড নাদরূপে তাহাব আত্মপ্রকাশ হয়। কিন্তু "মাযাস্পর্শে ব্যোম (চিদাকাশ) কলঙ্কিত হইলে তাহাতে ক্ষোভবশতঃ বাযুব উদ্ভব হয। বাযু বক্রগতিবিশিষ্ট। তখন ঐ বক্র ও কুটিল গতিব প্রভাবে সবল নাদধ্বনি খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন বর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয। এই বর্ণমালা বাযুবই খেলা" (ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ: পত্রাবলী পৃঃ ৫)। মানুষেব চিত্তাকাশে ৪৯টি বাযু আছে। এই "৪৯টি বাযু ৪৯ প্রকাব গতিবিশিষ্ট। ইহাদেব পবস্পব মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার গতি বাযুমণ্ডলে প্রচলিত বহিযাছে। এইগুলি বস্তুতঃ শব্দতবঙ্গ" (পত্রাবলী পৃ-৭)।

অতএব চিদাকাশ হইতে যে শব্দ-তবঙ্গ উত্থিত হয, মায়া স্পর্শে তাহা

বিভক্ত হইয়া বর্ণমালার আকার ধারণ করে। এই বর্ণমালা মাতৃকাচক্র। বর্ণের বিন্যাসে যে শব্দ গঠিত হয়, তাহা একটি অর্থকে প্রকাশ করে। এইরূপে প্রপঞ্চময় জগতে শব্দার্থ গঠিত হয় এবং ভেদজ্ঞানের উৎপাদন করে। ইহাই বৈখরী বর্ণাত্মক শব্দজাত বিকল্প জ্ঞান। এই অবস্থায় শব্দ বর্ণাত্মক বৈখরীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করে। ৪৯ বায়ুর স্বাভাবিক কম্পনের তারতম্য অনুসারে নাদরূপী শব্দ ৪৯ ভাগে বিভক্ত হয়। ইহাই বর্ণমালার সৃষ্টি।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্ণাত্মক স্থূল বা বৈখরী শব্দের অন্তরালে রহিয়াছে নাদাত্মক চেতন শব্দ এবং তাহারও পৃষ্ঠদেশে রহিয়াছে চিৎশক্তি বা পরাবাক্।

মহামায়ারূপী বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদের অভিব্যক্তি হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই নাদ সৃষ্টির আদিভূত কারণ। ইহাই ক্রমশঃ প্রকাশ ও জ্যোতি-স্বরূপা পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাক্‌রূপে প্রকাশমান হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিন্দুই জগৎ-সৃষ্টির আদি এবং মূলীভূত কারণ। বিন্দু বিভক্ত হইয়া ঊর্ধ্ববিন্দু এবং অধোবিন্দু অর্থাৎ বিসর্গ (ঃ)-রূপে পরিণত হয়। এই দুই বিন্দুর সংযোজক সূত্ররূপে নাদ-স্রোত প্রবাহমান থাকে। নাদের "অধোধারাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিমুখে অনন্ত শক্তির স্তর, লোক লোকান্তর এবং দেহবিশিষ্ট জীবরাশি অবিরাম প্রবাহে নিরন্তর আবির্ভূত হইতেছে। অধোবিন্দু ভেদ করিয়া যখন এই ধারার আভাস বহিঃনিসৃত হয়, তখনই সাংসারিক প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইয়া থাকে" (পত্রাবলী পৃঃ ৩৩)।

পরমশিবে সমবেতা চিৎশক্তি জ্ঞানস্বরূপা। চিৎশক্তির এই জ্ঞান নির্বিকল্পক। যাহাকে চিৎশক্তি বলা হইল উহাই পরমশিবের ইচ্ছা, উহাই তাঁহার জ্ঞান, উহাই তাঁহার ক্রিয়া। উহাতে বিকল্পের সংস্পর্শ মোটেই নাই। বিন্দুর ক্ষোভ জনিত যে "শুদ্ধ-অধ্বা'র বিকাশ হয়, সেই শুদ্ধ-অধ্বার সকল অধিকারীর জ্ঞান শুদ্ধ সবিকল্পক। সেইজন্য মায়াধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের জ্ঞানও শুদ্ধ সবিকল্পক। শুদ্ধ সবিকল্পক জ্ঞানের পৃষ্ঠভূমিতে থাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান। নির্বিকল্পক জ্ঞান বিন্দুক্ষোভ-জন্য শব্দ দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া সবিকল্পকরূপে পরিণত হয়। এই সবিকল্পক জ্ঞান শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার।

"শুদ্ধ সৃষ্টি না হইলে অশুদ্ধ সৃষ্টি হইতে পারে না। শুদ্ধ সৃষ্টি বিন্দু বা মহামায়া হইতে উদ্ভূত। পরমশিবের বা পরমেশ্বরের ইচ্ছাময়ী চিৎ-শক্তি সক্রিয় হইয়া যখন বিন্দুকে বা মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করে, তখন মহামায়া হইতে সৃষ্টির নির্মাণ হয়। এই সৃষ্টি শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধবিদ্যা-রূপে পঞ্চধা বিভক্ত। ইহাই 'শুদ্ধ পঞ্চতত্ত্ব'। অশুদ্ধ-সৃষ্টি বিন্দু বা মহামায়ার

ক্ষোভ হইতে হয় না, মাযাব ক্ষোভ হইতে হয়।" (তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন, পৃ-২)॥

অতএব নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরিবর্তে শুদ্ধ সবিকল্পক জ্ঞানের উদয় না হইলে মায়ায় ক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মায়াধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের জ্ঞান শুদ্ধ সবিকল্পক। ঈশ্বর-শক্তির দ্বারাই ক্ষুব্ধ হইয়া মায়ার গর্ভ হইতে অশুদ্ধ জগতের নির্গম হয। মাযা-গর্ভজাত অশুদ্ধ জগতের সকল প্রাণীর জ্ঞান অশুদ্ধ সবিকল্পক।

বিকল্প জ্ঞান শব্দমূলক। পূর্বে বলা হইয়াছে, পরমেশ্বরের জ্ঞান নির্বিকল্পক। আদিতে এই নির্বিকল্পক জ্ঞান শব্দের ক্রিযার সংস্পর্শে বিকল্পযুক্ত হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে পরাবাক্, পশ্যন্তীবাক্ প্রভৃতি ক্রম আশ্রয় করিযা শব্দের ধারা আবির্ভূত হয়। বিন্দুই শব্দের উপাদান বলিযা তন্ত্রে বিন্দুর পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারিপ্রকার শব্দবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। শব্দানুবিদ্ধ হইয়া আত্মার সবিকল্পক জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে—

"সবিকল্পক-বিজ্ঞানং চিতেঃ শব্দানুবেধতঃ।"—সবিকল্পক জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ হইয়াই উৎপন্ন হয়।

তান্ত্রিকগণ স্থূল আকাশকে এই শব্দের অভিব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিন্দু-ক্ষোভ হইতেই এই শব্দ উৎপন্ন হয়। চিদাকাশেই এই শব্দ ধ্বনিত হয়।

বিন্দুর প্রসরণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথমটি 'নাদ'। ইহা সূক্ষ্ম নাদ বা পরানাদ বা পরাবাক্ নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্ষ্ম বা পবানাদ. 'পরনাদ' হইতে পৃথক্। পরনাদ সৃষ্টির অতীত। পরমশিব বা পরমেশ্বরের সমবায়িনী চিদ্রূপা শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখনও সেই নিষ্ক্রিয চিৎ-শক্তির মধ্যে অস্ফুটরূপে 'পরনাদ' বিদ্যমান থাকে। 'পবনাদ' বিন্দুর অন্তর্গত 'পরানাদে'র মূল উৎস।

সূক্ষ্মনাদ বা পরানাদ বা পরাবাক্ বিন্দুর প্রথম স্ফুরণ হইতে উদ্ভূত। বিন্দুর দ্বিতীয় প্রসরণ 'অক্ষরবিন্দু'—ইহা সূক্ষ্মনাদ বা পরাবাকের কার্য। সূক্ষ্মনাদ বা পরাবাক্ শুদ্ধ জ্যোতির্ময়-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। অক্ষরবিন্দুতে বিবিধ 'বর্ণ' অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। বিন্দুর তৃতীয় প্রসরটি 'বর্ণ'। ইহা শ্রবণগ্রাহ্য স্থূল শব্দ যাহা স্থূল আকাশ ও বায়ু হইতে আত্মপ্রকাশ করে।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় পরাবাকের বিশ্লেষণ এইরূপে করিয়াছেন, "সৃষ্টির অতীত স্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দের অতীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই মূল

স্পন্দই আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ পরাশক্তি। স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরূপ একরসভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যই এই যে উহা আত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতীত হইতে পারে, এক থাকিযাও অনেকবৎ প্রকট হইতে পারে এবং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিলাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতন্ত্র্য ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্রিকগণ 'বিমর্শ-শক্তি'রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে পরমসত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে 'প্রকাশ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ এবং বিমর্শ দুই-ই এক; অথচ এক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে অনির্বচনীয় বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় স্বরূপতঃ প্রকাশ থাকিলেও 'স্বপ্রকাশ' বলিয়া পরিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না। বিমর্শের প্রভাববশতঃই প্রকাশ 'স্বয়ংপ্রকাশ'রূপে নিজের অনুভূতিগোচর হন। এই বিমর্শই আত্মার মহিমা—ইহাই মহাশক্তির স্বরূপ। এই বিমর্শের নামান্তর অহং-ভাব। বিমর্শহীন প্রকাশে অহংভাবের স্ফুরণ থাকে না। এইজন্যই উহাকে জড় বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। অহন্তাবর্জিত প্রকাশ জড়, অহন্তাবিশিষ্ট প্রকাশ চৈতন্য। মনে রাখিতে হইবে জড় এবং চৈতন্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কারণ, প্রকাশের দিক হইতে উভয়ে একই। কেবল বিমর্শের স্ফুরণবশতঃই জড় ও চৈতন্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়। এই যে অহন্তার কথা বলা হইল, ইহার কোন প্রতিযোগী নাই। ইহা অপরিচ্ছিন্ন 'অহং-ভাব'। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'ইদং-ভাবে'র সত্তা এখনও প্রকটিত হয় নাই। এইজন্য ইহাকে 'পূর্ণাহন্তা' বলে। পূর্ণাহন্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিকগণ ইহাকেই পরাবাক্ বা শব্দের আদিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সৃষ্টির পূর্বে নিত্যস্বরূপে শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শব্দই প্রজ্ঞা। খণ্ড প্রজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য ইহাকে পূর্ণপ্রজ্ঞা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধগণ ইহাকেই প্রজ্ঞা-পারমিতা বলিতেন। ইনিই সমগ্র জগতের প্রসূতি, শুধু জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমন কি ঈশ্বরভাবেরও প্রসূতি। কারণ, এই পূর্ণহন্তাই মূল ঐশ্বর্য। ইহাই পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব। আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনই পূর্ণহন্তা-বিরহিত হইয়া থাকেন না। St. John এর Gospel-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্থাৎ The Word was with God and the Word was God. 'Word' শব্দে এখানে মূল শব্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'শব্দব্রহ্ম' ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে।" (পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা-২৮)॥

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং বিবর্ত্ততে

অর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ"। 'অনাদি নিধনং ব্রহ্ম' বলিতে শব্দের পরমতত্ত্বকেই বুঝায়। সৃষ্টির ঊষাকালে পরমতত্ত্বরূপ শব্দ হইতেই অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তারপর ঐ অর্থ জগৎরূপে দেশ ও কালগত অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রতিভাসপূর্বক প্রকট হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'বিন্দু' বিশুদ্ধ সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ। বিশুদ্ধ সৃষ্টির বর্ণনা আগমশাস্ত্রের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ উভয়াত্মক। বাচক শব্দ যেমন বিন্দু হইতে উদ্ভূত তেমনি বাচ্য অর্থও বিন্দু হইতে উদ্ভূত।

বাচ্য ও বাচকের আবির্ভাব কি প্রকারে হয়, তাহা আগমশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি বিন্দু বা চিদাকাশে যখন পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎশক্তি পতিত হয়, তখন বিন্দু বিক্ষুব্ধ হয়। এই বিক্ষোভ হইতেই একদিকে বাগাত্মক শব্দ এবং অপরদিকে অর্থ আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দের ধারা প্রবর্তিত হইয়া স্তরে স্তরে স্থূলত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ধারাতেও তাহাই হয়। এই দুইটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয় এবং উভয়ের সঙ্গে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য।

বাকের অবরোহণ ক্রম অনুসারে প্রথমে পরাবাক্, পরাভূমি হইতে পশ্যন্তীভূমি, পশ্যন্তী হইতে মধ্যমাভূমি, এবং মধ্যমাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে, বৈখরী বাকের উৎপত্তি হইয়াছে। পরাবস্থা অব্যক্ত। পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ এক সত্তায় অভেদে যুক্ত থাকে। ইহা চৈতন্যের স্ফুরণাবস্থা। মধ্যমা ভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের আবির্ভাব হয়। 'অর্থ' অর্থে এক সর্বব্যাপক চিন্ময় জ্যোতি বুঝায়। এখানে স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত ভাবময় একটি অনন্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে। বৈখরীতে আসিয়া শব্দ হইতে অর্থ পৃথক হইয়া পড়ে; অর্থাৎ চিন্ময়ধাম হইতে পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চময় বাহ্য দৃশ্য জগৎ নির্গত হয়।

অতএব, প্রথম শব্দ বা নাদ; তাহা হইতে জ্যোতি এবং জ্যোতি হইতে রূপ, দৃশ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। উপনিষদে এই ক্রমকে লক্ষ্য করিযা বলা হইয়াছে—"ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। তান্ত্রিক মতে, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে শব্দ দুই প্রকার। শুদ্ধ শব্দের ক্রমবিকাশে প্রথমে অস্পষ্ট আলোক, তারপরে স্পষ্টালোক এবং তারপর জ্যোতির অভিব্যক্তি হয়। তারপর মায়ামল-উপহত অশুদ্ধ শব্দ হইতে প্রপঞ্চময় বাহ্য জগতের উদ্ভব হয় এবং তাহা অনন্তপ্রকার বিকল্প জ্ঞানের উদয় করায়।

শব্দের পরাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে অবতরণ এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইতিহাস পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অতিশয় সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনাংশটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"অদ্বৈত তন্ত্রমতে পরাবাক্ বা স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আত্মা সর্বপ্রথম পশ্যন্তীভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই ভূমিতে বাচ্য এবং বাচকের পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। পরাবস্থায় বাচ্য-বাচকভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং সেখানে সম্বন্ধের কল্পনা নিরর্থক। উহা অদ্বৈতভূমিরও অতীত। কিন্তু পশ্যন্তী অবস্থায় বাচ্য ও বাচক এই দুইটি ভাব থাকে। কিন্তু উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই বাচ্য-বাচকই অর্থ ও শব্দের স্বরূপ। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য, অথচ উভয়ই অভিন্ন। মধ্যমাভূমিতে বাচক ও বাচ্যের অভেদ থাকিলেও একটা ভেদের আভাস স্ফুরিত হয়। এই অবস্থায় শব্দ হইতে অর্থ পৃথক বস্তুরূপে পরিগণিত হয় না অথচ উভয়ে সর্বথা অভিন্নতাও থাকে না। ইহা ভেদাভেদের অবস্থা। এই অবস্থাতেই শব্দ অর্থরূপে প্রতীয়মান হয় এবং কিভাবে উহা ঘটিয়া থাকে তাহা যোগের প্রত্যক্ষ গোচর। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বাচ্য অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। লৌকিক শব্দের অর্থবোধের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম বর্তমান আছে উহার কোনটিই সেখানে প্রযোজ্য হয় না। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তাহার অব্যবহিত পরেই অর্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সংহার-কালেও অর্থের উপশম শব্দের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই মধ্যমাভূমি অত্যন্ত রহস্যময়। এই ভূমিতে অবস্থিত হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় শব্দ এবং অর্থ এই দুইটি অবিনাভাব সম্বন্ধ। শব্দ আয়ত্ত হইলে তাহা হইতে যেমন অর্থকে ফুটাইয়া তোলা যায় তদ্রূপ অর্থ আয়ত্ত হইলে তাহা হইতে তাহার মূল শব্দ আবিষ্কার করা যায়। উভয়ে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকার দরুণ একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শব্দ ও অর্থই বস্তুতঃ নাম ও রূপ। বৈখরীভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের পৃথককরণ সুসম্পন্ন হয়। তখন বিস্মৃতির উদয় হয় এবং তাহার ফলে শব্দ হইতে অর্থকে এবং অর্থ হইতে শব্দকে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় শব্দ এবং অর্থের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ থাকে। জগতের অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ এই বৈখরীভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া শব্দের সহিত অর্থকে যোজনা করিতে হয়। এই ভূমিতে সঙ্কেত অথবা Convention অঙ্গীকার করিয়া শব্দ হইতে অর্থবোধের উপাদান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেখানে শব্দ অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়াছে সেখানে এই Convention আবশ্যক হয় না। পরাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে অবতরণই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইতিহাস" (পত্রাবলী, পৃঃ ৮১।৮২)।

দেহতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়, যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে ভাণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যদেহে। দেহাভ্যন্তরস্থ ষট্চক্রের দিক হইতে তান্ত্রিকগণ বর্ণাত্মক জীবজগতের সৃষ্টির কথা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ছয়টি চক্র আছে। ইহারা সৃষ্টির যন্ত্রস্বরূপ। এই ছয়টি চক্র হইল মূলাধার,

স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। প্রত্যেকটি চক্র বিভিন্ন দলযুক্ত, যেমন—মূলাধার চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল, মণিপুর দশদল, অনাহত দ্বাদশদল, বিশুদ্ধ ষোড়শদল এবং আজ্ঞাচক্র দ্বিদল-বিশিষ্ট। এইরূপে দল সংখ্যার সমষ্টি পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশটি দলে অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ বা রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া আছে। ইহারাই বর্ণমালা বা মাতৃকাশক্তি। এই পঞ্চাশটি বর্ণ বা রশ্মি চিদ্জ্যোতিবিশিষ্ট। ইহাদের দ্বারা শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়, যাহার বিকাশ ও পরিণতি যথাক্রমে পশ্যন্তি ও মধ্যমা বাকের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চাশটি দলের অধোমুখ বা বহির্মুখ গতিতে স্থূল বৈখরী শব্দের উৎপত্তি হইয়া বাচ্য-বাচকরূপ প্রপঞ্চময় সৃষ্টির বিস্তার হয় এবং স্থূল দেহের গঠন হয়। অতএব দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণেও আমরা দেখিতে পাই বর্ণমালা হইতেই জীবজগতের সৃষ্টি।

অক্ষরব্রহ্ম শব্দাত্মক। ইনিই শব্দব্রহ্ম। ইনি স্বরূপতঃ সর্বাতীত হইলেও ইঁহাতে অনন্ত শক্তি সর্বদা অস্পন্দভাবে বিদ্যমান থাকে। এই সকল শক্তি মূল শব্দ হইতে পৃথক বা ভিন্ন নহে। ইহারা স্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। এই সকল শক্তিই 'কলা' নামে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে পরিচিত। এই সকল 'কলা'ই নিত্য হইলেও ইহারাই সৃষ্টির আদি প্রবর্তক। এইসকল 'কলা'ই নিত্য কলা সমষ্টিরূপে 'নিত্যামণ্ডলে'র আকারে বিরাজ করে।

'ওঁ'-কারই শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম হইতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অতএব সমস্ত সৃষ্টিই শব্দাত্মক। প্রশ্ন হইল, শব্দাতীত পরব্রহ্ম হইতে শব্দটা আসে কেমনভাবে? প্রথম আসে 'ম্', ধ্বনি। তখন কেবল 'ম্-ম্-ম্' এই ধ্বনিই চলিতে থাকে। তারপর আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ হয় 'অ' বা 'উ' ধ্বনি। তাহার ফলে হয় 'অমা' বা 'উমা'। এই উমা হৈমবতীই বা অমাকলাই সৃষ্টির মূলে। শেষে হয় অ, উ, ম্ বা ওঁ ধ্বনি। ইহার পর আসিয়া যোগ হয় 'কাল'। তখন 'কালচক্র' ঘুরিতে থাকে। কালের ঘানি অবিরাম ঘুরিতেছে—তাহার মধ্যে নিত্য কলা সকল পড়িলেই উহাদের স্থূলরূপের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হয়। কালচক্র পঞ্চদশ কলাসমন্বিত। এইজন্য ইহাকে পঞ্চদশী বলা হয়—ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। হ্রাস হইতে হইতে এক কলায় নামিয়া আসে আবার বৃদ্ধি হইতে হইতে পঞ্চদশ কলা পর্যন্ত যায়। আবার হ্রাস হয় এবং বৃদ্ধি হয়। এইরূপই চলিতে থাকে। ইহা কালচক্রের আবর্তনজনিত হয়। ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রলয় পর্যন্ত কালচক্রের আবর্তন চলিতেছে। কালচক্রের আবর্তনের মূলে 'নিত্যামণ্ডলে'র সঞ্চরণ রহিয়াছে। নিত্যামণ্ডলের মধ্যবিন্দুরূপে যিনি রহিয়াছেন তিনি নিত্য প্রকাশমান চিদানন্দস্বরূপ—তিনি 'ষোড়শী' কলা। পঞ্চদশ কলার

আবর্তন আছে বলিয়া তাহা হইতে ক্ষরণ হয়। ষোড়শ কলা হইতে অমৃত দ্বারা পঞ্চদশ কলা আপূরিত হয়, সেইজন্য পঞ্চদশ কলা হইতে ধারারূপে অমৃতক্ষরণ সম্ভবপর হয়। এই অধঃপ্রবাহ হইতেই সৃষ্টির সূচনা হয়। ষোড়শী কলা হইতে ঊর্ধ্ব প্রবাহরূপে একটি রশ্মি সপ্তদশীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহা কালের অতীত। উহাকে আশ্রয় করিয়াই নিত্য বৃন্দাবনের আবির্ভাব হয়। নিত্য বৃন্দাবনধামে সব অবস্থাগুলিই নিত্য।

এখানে আরও একটি রহস্য আছে। শব্দাতীত পরব্রহ্মে পৌঁছাইতে হইলে ওঁ-কার বা শব্দব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যাইতে হয়। ওঁ-কারই আবার সূর্যমণ্ডল, তাই সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়। "মণ্ডল তিনটি—একটি অগ্নিমণ্ডল, দ্বিতীয় সূর্যমণ্ডল, তৃতীয় চন্দ্র বা সোমমণ্ডল, একপাশে অগ্নি, অপর পাশে সোম, মধ্যে রবি। রবি হইলেন অগ্নি-সোমের সাম্যাবস্থা—ইনিই কামাখ্য রবি। 'রৌতি' অর্থাৎ 'শব্দং করোতি ইতি রবিঃ'। ইনিই শব্দব্রহ্ম। ইনিই আবার all pervading জ্যোতি বা রশ্মি। রবি বা কাম ক্ষুব্ধ হইলে একদিকে সোম অপরদিকে অগ্নির আবির্ভাব হয়। রবির মধ্যরশ্মি হইতে সোমের নির্গম। এই মধ্যরশ্মিই সুষুম্না। অগ্নি হইলেন কালরূপ, ইনিই কালাগ্নি—সমস্ত বিপরিণামের হেতু। অগ্নির মধ্যে তাপ। সোমের মধ্যে স্নিগ্ধতা, আনন্দ, শান্তি। অগ্নিমণ্ডলই মর্ত্যলোক, সোমমণ্ডল অমৃতলোক। দুই জায়গাতেই দেহ আছে, একটি বিনশ্বর দেহ, অপরটি অবিনশ্বর দেহ। সূর্যে দেহ নাই। মর্ত্যলোকে অগ্নির জয়, অমৃতলোকে সোমের জয়। সোম ছাড়া দেহ হয় না, সেজন্য মর্ত্যদেহেও সোমের উপাদান আছে। তবে এটা অগ্নির রাজ্য বলিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সোম অগ্নির দ্বারা শোষিত হইয়া যায়—তাহার শেষ পরিণাম মৃত্যু। এখানে যতই বিকাশ, বৃদ্ধি দেখা যাক্ সবই শেষ অবধি কিন্তু আগাইয়া চলিয়াছে মৃত্যুর দিকে।

সোমের রাজ্য কালের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। এই সোমকলাত্মক দেহ-প্রাপ্তির নামই প্রকৃত দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্বলাভ। এই দেহের আর পাত হয় না। সোমকলাই হইল ষোড়শকলা। ষোড়শকলা প্রাপ্তির জন্যই দীক্ষা, উপনয়ন। আমরা যে চন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত ইনি পঞ্চদশ কলাত্মক। ইনি কালের কবলিত। কিন্তু ষোড়শকলাত্মকে কালের প্রভাব নাই। এই ষোড়শকলাত্মক সোমমণ্ডল, সূর্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধে; পঞ্চদশ কলাত্মক চন্দ্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডলের নীচে। সূর্যমণ্ডলে গতির নাম দেবযান গতি। সেখানে গেলে কলা শুকাইয়া যায়, দেহবীজ থাকে না। তাকে ভেদ করিতে পারিলে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে ষোড়শকলাত্মক সোমমণ্ডলে প্রবেশ হয়। নতুবা ঐখানেই সূর্যমণ্ডলে নির্বীজ

কৈবল্য অবস্থায় নিরাকার চৈতন্যে স্থিতি হয়।" (গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, পত্রপ্রসাদ, পৃ-৫৩।৫৪)

নিম্নে শব্দাত্মক সৃষ্টির একটি ছক্ আঁকা হইল :—

The Word was with God→	পরব্রহ্ম→ ↓	ইনি শব্দাতীত, কিন্তু শব্দ অস্পন্দ অবস্থায় তাঁহাতে বিদ্যমান।
The Word was God .. →	শব্দব্রহ্ম→ ↓	পরাবাক্
God Said, 'Let there be light and there was light'→	অর্থ → ↓	প্রকাশ (পশ্যন্তী বাক্)
	কলা → ↓	ইহা ব্যাপক নিত্য কলা, অপ্রাকৃত জগৎ, দিব্য ও নিত্যধাম ইহা হইতে সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত সৃষ্টি জ্যোতির্ময়।
	কাল → ↓	নিত্যকলা হইতে অসংখ্য খণ্ডকলা কালের গর্ভে বীজরূপে পতিত হয় এবং তাহা হইতে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃত জগৎ

প্রকৃতি দুই প্রকার :—(১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমো যুক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যাহা হইতে প্রাকৃত জগৎ প্রসবিত হয়। ইহা কালের অধীন এবং পরিণামী।

(২) বিশুদ্ধ সত্ত্বময় প্রকৃতি যাহা হইতে অপ্রাকৃত জগৎ ও দিব্যধাম সকল রচিত হয়। এখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। অর্থাৎ কাল ইহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, তাই এই সমস্ত অপ্রাকৃত দিব্যধাম নিত্য। কোন বিকার বা পবিণাম ইহাদের হয় না।

সাধন-সংকেত

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি তত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার সংকেতও দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের হৃদয়ে ভক্তির বীজ বপন করিয়া অধ্যাত্মভাবের বিকাশ ঘটাইয়া দিতেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখার মধ্যেও পরিস্ফুট। তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া এবং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া সাধনা সম্বন্ধে যে ধারণা আমার হইয়াছে তাহাই এখানে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। ইহার তাৎপর্য পূর্ণরূপে গ্রহণ করা আমার মত অসাধকের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি তাঁহার বক্তব্যকে যথাসাধ্য তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম। ইহার জন্য তাঁহার উপদেশকে একটি মাত্র প্রবন্ধের মধ্যে সুনির্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলার মধ্যে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম না। কয়েকটি প্রবন্ধে বিভক্ত করিয়া সাধনার ধারাটিকে ধরিবার ও বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

নাদ হইতে মহানাদে প্রবেশের সন্ধান—বর্ণাত্মক শব্দ বর্ণভাব পরিহার করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত হইলেই নাদের উপলব্ধি হয়—ইহা ষট্‌চক্র ভেদরূপ তান্ত্রিক সাধনা-সাপেক্ষ। নাদের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হইয়া আসে। কিন্তু খণ্ডমন মহামনে পরিণত হয় না। এইজন্য নাদ হইতে মহানাদে প্রবেশ করা আবশ্যক। মহানাদের উন্মেষ অনুভব করিতে না পারিলে চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

খণ্ড মনের পরিবর্তে অখণ্ড মনের পরিচয় একাগ্রতা সাধনের দ্বারা পাইয়া সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে বিবেকমার্গের সাহায্যে বিশুদ্ধ কৈবল্যাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহার পর পরমপুরুষের বিশেষ অনুগ্রহে সেই মনোভূমির অতীত কেবল আত্মসত্তাতে উন্মনী-শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। উন্মনী-শক্তির বিকাশ হইলে মনের খেলা বলিয়া এতদিন যাহা প্রতীত হইত, তাহা চিদানন্দময়ী পরাশক্তির আত্মলীলা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তখন সর্বত্র আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সবই আত্মশক্তিরই স্ফুরণ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। জড়ত্ব, অজ্ঞান এবং কালের প্রভাব চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

মনের অন্তর্মুখী গতি সিদ্ধ হইলে উহার ঊর্ধ্বমুখী গতি অনুভব করা যায়।

অন্তর্মুখী গতি সম্যকপ্রকারে সিদ্ধ না হইলে ঊর্ধ্বমুখী গতির পূর্ণতালাভ অসম্ভব। অন্তর্মুখী গতির উদ্দেশ্য হইল বিচলিত মনকে একাগ্র করিয়া মনের স্বভূমিতে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনের নিজভূমিতে প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে ঊর্ধ্বশক্তি স্বভাবতই অবতীর্ণ হইয়া ঐ স্থির মনে পতিত হয়। উহার ফলে একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মন ঊর্ধ্বমুখে আকৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইতে থাকে। মনের একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হইলে বিক্ষিপ্ত মন সংহত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। যখন মনের অন্তর্মুখী গতি সম্পূর্ণ হইবে তখন বাহ্য আকর্ষণ, অধঃআকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ এবং সংসর্গের প্রভাব কিছুই মনের উপর কার্য করিতে পারিবে না। ঐ অবস্থাটি না হওয়া পর্যন্ত ঊর্ধ্বশক্তির অবতরণ-ক্রিয়া চেতনভাবে অনুভব করিতে পারা যায় না।

নাদ-সাধনা—মন বিক্ষিপ্ত থাকা পর্যন্ত নাদকে পায় না। বিক্ষিপ্ত হইতে একাগ্র-ভূমিতে ক্রমশঃ সঞ্চরণই নাদ সাধনা। নাদ তরঙ্গরূপে অবিরাম প্রবাহিত হয়—চিদাকাশ অথবা কুণ্ডলিনী হইতেই এই প্রবাহ উত্থিত হয়। কুণ্ডলিনীই বিন্দুস্বরূপা মহামায়া। ভগবানের কৃপাশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি মহামায়াতে পতিত হইলে মহামায়া বা বিন্দু বিক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে পরিণত হন। চিদাকাশে চিৎশক্তির আঘাতই নাদের অভিব্যক্তির মূল। নাদ অভিব্যক্ত হইলেও মন তাহাতে যুক্ত না হইলে তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলে নাদ শ্রুত হয়। তখন নাদই ক্রমশঃ মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। যে অনুপাতে নাদে আকৃষ্ট হইতে থাকে সেই অনুপাতে মন একাগ্রতা লাভ করিতে থাকে। নাদ উত্থিত হয় চিদাকাশ হইতে এবং লীনও হয় চিদাকাশে। নাদ ফিরিবার মুখে যোগীর মনকে টানিয়া লইয়া যায় চিদাকাশে। বিন্দুই চিদাকাশ। যখন মন ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া যায় তখন তাহার চঞ্চলতা আর থাকে না, তাহা বিন্দুতে স্থিতিলাভ করে। ইহাই একাগ্রতা।

আগম মতে ভ্রূ মধ্যে বিন্দুস্থান। চিত্ত একাগ্র হইলে ইহার রশ্মি চারিদিক হইতে উপসংহৃত হইয়া বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। সূর্যমণ্ডল হইতে যেমন কিরণধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেই প্রকার চিত্তবিন্দু হইতে তাহার রশ্মিমালা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থা বলে। সাধক সাধনবলে গুরুকৃপায় এই বিক্ষিপ্ত রশ্মিসমূহকে ফিরাইয়া আনে এবং কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারই নামান্তর 'একাগ্রতা'। একাগ্র অবস্থায় মনের লয় হয় না। একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ইহা চৈতন্যাবস্থা। ইহাকে প্রজ্ঞা বলে। মনের জাগ্রৎ অবস্থা ইহাই।

কিন্তু এই একাগ্রতা লাভ সাধারণ সাধকের ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ছয়টি চক্র আছে তাহারা যন্ত্রস্বরূপ। এই যন্ত্রে বহির্মুখ গতিতে যেমন সৃষ্টির বিস্তার হয়, তেমনি অন্তর্মুখ গতিতে সৃষ্টির উপশম হয়। মূলাধার চক্রে চারিটি পৃথক্ পৃথক্ দলরূপে চারিটি রশ্মি বা বর্ণ বিকীর্ণ হইয়া আছে। মূলাধার যেমন চতুর্দল, সেইরূপ স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল, মণিপুর দশদল, অনাহত দ্বাদশদল, বিশুদ্ধ ষোড়শদল এবং আজ্ঞাচক্র দ্বিদল। দলসংখ্যার সমষ্টি পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশটি দলে অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ। ইহাই অক্ষমালা। সাধনার দ্বারা মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইলে সেই শক্তি সুষুম্নাপথে ব্রহ্ম-নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রতি চক্র ভেদ করতঃ ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়। ঊর্ধ্বগতির মুখে প্রতি চক্রে অবস্থিত বর্ণমালা বিগলিত হইয়া ধ্বনিরূপে বা নাদরূপে পরিণত হয়। প্রথমে এই নাদধ্বনি অস্ফুটরূপে শ্রুত হয়। কিন্তু কুণ্ডলিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ স্ফুট, স্ফুটতর, স্ফুটতম হইতে থাকে—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নাদের ধারার সঙ্গে মন যুক্ত হইলেই মনের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া জ্ঞানপ্রবাহে পর্যবসিত হয়। তখন ঐ জ্ঞানের ধারারূপে নাদ চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিন্দু স্পর্শ করিয়া নাদ নিঃশব্দ অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের উন্মেষ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চিৎশক্তি সাক্ষাৎভাবে মায়াতে পতিত হয় না। মহামায়া হইতে প্রতিফলিত হইয়া মায়াতে পতিত হয়। তখন মায়াতে ক্ষোভ জন্মে। মায়াকাশ হইতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ ও বন্ধনের হেতু। ইহাই বিকল্পজাল। মাতৃকাচক্ররূপে এই বর্ণমালা অনন্ত বিকল্পময়ী বৃত্তি আকার ধারণ করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই মায়াজাল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই শুদ্ধ নাদময় শব্দকে আশ্রয় করিতে হয়। নাদময় শব্দই জাগ্রৎ মন্ত্র। ইহা অভেদজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দের জালকে ভাঙ্গিয়া দেয়।

চিৎশক্তি বিন্দুতে পতিত না হইলে নাদ উত্থিত হয় না, তদ্রূপ ফিরিবার পথে নাদ বিন্দুতে প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত চিৎশক্তিকে পাওয়া যায় না। মন বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুর ক্ষোভ মিটিয়া যায়, তখন মন চিৎশক্তিতে স্থিতিলাভ করে। চিৎশক্তিই চিৎকলা বা কলা। মন কলাত্মক হইয়া কলাতীত আত্মস্বরূপে অভেদে অবস্থান করে। নাদ-বিন্দু-কলার ইহাই রহস্য।

মনই সাধনার যন্ত্রস্বরূপ। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—প্রতি কার্যেই মনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রথম অবস্থাতেই মনকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করা উচিৎ

নয়। করিলেও তাহা সুফল প্রসব কবিবে না। প্রথম হইতে কৃত্রিম উপায়ে মনকে নিরোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া শুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইবে সাধকের অধ্যাত্মজীবনে মন কি প্রকার সাহায্য করে। মলিন মনই সাধকের রিপু, নির্মল মন তাহার পরম মিত্রস্বরূপ।

মন সর্বদাই চঞ্চল, সর্বদাই অস্থির। ইহার একমাত্র কারণ—মন সর্ব সময়েই একটা অভাব বোধ কবিতেছে, একটা অস্পষ্ট অথচ বিপুল অতৃপ্তি তাহাকে শান্ত থাকিতে দিতেছে না। মন চায় জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মাকে। আত্মা মনের অতি নিকটে অবস্থিত। তথাপি মন তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না। উহার প্রধান কারণ এই যে মন বহির্মুখ বলিয়া আত্মার দিকে বিমুখ। সুতরাং মনকে অন্তর্মুখ করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

যে বহির্মুখ গতির প্রভাবে মন বাহিরের দিকে গতিশীল, তাহা প্রকৃতির শক্তি। আবার যে অন্তর্মুখ গতির প্রভাবে মন অন্তর্মুখ হয়, তাহাও প্রকৃতির শক্তি। উভয় শক্তি মূলতঃ একই শক্তি। ইহাই শব্দশক্তি। শব্দ স্বরূপতঃ এক হইলেও উহার ঐ মৌলিক রূপ মায়ার আবরণে তিরোহিত। শব্দ চৈতন্যস্বরূপ, অখণ্ড নাদ রূপেই তাহার আত্মপ্রকাশ হয়। বিশুদ্ধ বোমতত্ত্বে ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াস্পর্শে ব্যোম কলঙ্কিত হইলে তাহাতে ক্ষোভবশতঃ বায়ুর উদ্ভব হয়। বায়ু বক্রগতিবিশিষ্ট। তখন ঐ বক্র এবং কুটিল গতির প্রভাবে সরল নাদ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন বর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই বর্ণমালা বায়ুরই খেলা—ইহা হইতেই বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রবাহে নানা বৃত্তির উদ্গম হয়। এইগুলি মনকে আবদ্ধ করে এবং বিক্ষিপ্ত করে। মন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই অসংখ্যপ্রকার বিক্ষেপে ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে পরিণত হয়। পুনরায় চৈতন্যপ্রবাহে অর্থাৎ নাদে মনকে ফেলিতে পারিলে তাহার আত্মবিস্মৃতি কাটিয়া যায়—সে সুপ্তি হইতে জাগ্রত হয়। বিশুদ্ধ ব্যোমে যে নাদপ্রবাহ নিরন্তর চলিতেছে, সেই শুদ্ধ নাদধারাই দেহের অভ্যন্তরে নির্মল চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়। তাই বিশুদ্ধ নাদই অবলম্বনের বস্তু। অশুদ্ধ শব্দধারারও অন্তরালে এই বিশুদ্ধ নাদ-প্রবাহ রহিয়াছে। একবার শুদ্ধ নাদের আশ্রয় পাইলে ও তাহাকে নিরন্তর ধরিয়া থাকিতে পারিলে মনের মলিনতা কাটিয়া যায়। তখন আর উহা বর্ণমালার দ্বারা বিরচিত বিকল্পজালে জড়িত হয় না। সর্বদা বিকল্পহীন শুদ্ধ চৈতন্যের ধারাতেই বহিতে থাকে।

নাদ সাধনার অখণ্ড অভ্যাসের ফলে অনুভূতির এমন একটি অবস্থা আসে যখন বুঝিতে পারা যায় ঐ নাদ বা শব্দ শুধু আপন হৃদয়ে আবদ্ধ নহে, উহা স্বীয় হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগতের সর্বত্র সর্ব বস্তুতে সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। ইহাই নাদসিদ্ধির

লক্ষণ। ইহার পর ঐ নাদে ডুবিলেই অন্তঃস্থ বিশাল জ্যোতির অনুভব হয়। নাদকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহাজ্যোতিতে প্রবেশ করা যায় না। দিব্যরূপ ও ইষ্টদেবতার রূপের আবির্ভাব মহাজ্যোতি হইতে হয় এবং জাগতিক বস্তুর আবির্ভাব শব্দ হইতে হয়। বস্তুতঃ শব্দ ও জ্যোতি ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ স্বরূপ। সাধনার দ্বারা জীবহৃদয়ে ইহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র।

শব্দ-জ্যোতি-রূপ-দৃশ্য-মহাচৈতন্য, ইহাই নাদ-সাধনার স্বাভাবিক ক্রম। নাদসাধনাই শব্দসাধনা। বিন্দুই জ্যোতি। কলা চিদ্রূপা শক্তি। অতএব কলাসিদ্ধিই রূপসিদ্ধি। ইহার পর কলাতীতই প্রকৃত সত্য। তাহাই অশব্দ, অরূপ, নিষ্কল ও নিরঞ্জন।

শব্দ হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে রূপ, দৃশ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দকে আশ্রয় না করিয়া জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের মনের যাবতীয় বৃত্তি এবং বিক্ষিপ্ততা সবই অশুদ্ধ শব্দের খেলা। অশুদ্ধ শব্দ অনন্ত প্রকার বিকল্প জ্ঞান ও চিন্তার আকারে আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য চক্র আবর্তিত হইতেছে। ঐ চক্রসকলের আবর্তনেই দেহটি চৈতন্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ এই পার্থিব চৈতন্য অশুদ্ধ—ইহাই বিকল্প জ্ঞান। "ক্ষুদ্র বৃহৎ কত চক্র যে এই দেহে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। কোন চক্রই স্থির নহে—সবগুলি আপন আপন বেগে আবর্তন করিতেছে। এই সকল ছোট বড় চক্রের ঘূর্ণীর ফলস্বরূপ আমাদের চিত্তে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি অথবা মানসিক ভাবপুঞ্জ চক্রসকলের আবর্তনের ফলজনিত অনুভব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহাই জাগতিক অভিজ্ঞতা। এই সকল আবর্তন হইতে অনবরত তরঙ্গাত্মক শব্দ উত্থিত হইতেছে। যেমন একটি মেশিনে ছোট বড় নানাপ্রকার চাকা অনবরত ঘুরিতে থাকিলে শব্দের উদয় হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই সকল শব্দ ধ্বন্যাত্মক। এই সকল ধ্বনি বহির্মুখ মন অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ এইগুলিকে ধ্বনিরূপে অনুভব না করিয়া মানসিক বৃত্তিরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ মানসিক বৃত্তিগুলিই ধ্বনি। যাহাদের মন অন্তর্মুখ হইয়াছে তাহারা চিত্তের জল্পনা-কল্পনা সবগুলিকেই শব্দরূপে অনুভব করিয়া থাকে। ইহা অশুদ্ধ শব্দের খেলা। এই ধ্বনিতেই জগৎ ডুবিয়া রহিয়াছে—অথচ বুঝিতে পারিতেছে না। যোগীর একমাত্র লক্ষ্য এই ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়া।

গুরুদত্ত নাম বা মন্ত্র যথাবিধি অভ্যাস করিতে পারিলে উহা হইতে যে ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ ধ্বনি। ইহা অশুদ্ধ ধ্বনিকে শুদ্ধ করিয়া আপন স্বরূপে পরিণত করে। অশুদ্ধ ধ্বনিতে ধ্বনি অংশ অপেক্ষা বর্ণাংশের

প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহাতে বিকল্পের উদয় হয়। এই বর্ণাভাস ক্রমশঃ গলিয়া গিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিতে পরিণত হইলে এবং সেই ধ্বনি পূর্বোক্ত শুদ্ধ ধ্বনিতে বিলীন হইলে একমাত্র শুদ্ধ ধ্বনিই বিরাজ করে। ইহাই চৈতন্যশক্তির খেলা। নাম বা মন্ত্র-জপ হইতে এই শুদ্ধ ধ্বনির বিকাশ হয়। শুদ্ধ ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয় তখন ধ্বনি হইতে জ্যোতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয। বস্তুতঃ জ্যোতির বহির্মুখ ক্রিয়াই ধ্বনি। অর্থাৎ জ্যোতি আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত না হইয়া বাহিরের দিকে উন্মেষ প্রাপ্ত হইলে জ্যোতির চারিদিকে অখণ্ড ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধ্বনিমণ্ডল বহিরুন্মেষ বা বাহ্যভাবের আধিক্যবশতঃ অশুদ্ধ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া বায়ুসহযোগে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়। অন্তর্মুখ গতিতে জপ ও ধ্যানের ফলে এই বর্ণমালা গলিয়া গিয়া অশুদ্ধ ধ্বনিভাব পরিহাবপূর্বক শুদ্ধ ধ্বনিরূপে পবিণত হয়।" (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮-১৯)।

যখন শুদ্ধ শব্দ ফুটিয়া উঠে তখন উহার ক্রমবিকাশে প্রথমে অস্পষ্ট আলোক, তারপরে স্পষ্টালোক এবং তারপরে জ্যোতির অভিব্যক্তি হয়। জ্যোতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরমাবস্থায জ্যোতিই থাকিয়া যায়, ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায় জ্যোতির বাহিরে ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহিরে বর্ণাত্মক শব্দ। এই বর্ণসমষ্টি লইয়া বদ্ধ জীবের ভাব ও ভাষা রচিত হইয়াছে।

জ্যোতির বিকাশ ও স্থিতি হইলে সেই প্রশান্ত জ্যোতিতে যোগী অভিভূত না হইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলে সেই জ্যোতির মধ্যে রূপের আবির্ভাব স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। এই জ্যোতির সহিত রূপের সম্বন্ধ দুইভাবে উপলব্ধ হয়। প্রথমে মনে হয় জ্যোতিই যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘনীভূত হইয়া জ্যোতির্ময় দৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য অনন্ত প্রকার হইতে পারে। মূর্তি মন্দির ফল পুষ্পাদি উদ্যান সরোবর পাহাড পর্বত প্রভৃতি সকল আকারেই ইহা প্রকাশিত হইতে পাবে। ইহার পর আর একটা অবস্থা আসে, তখন বুঝা যায় জ্যোতিটি ঘনীভূত হইয়া রূপ হয় নাই, রূপ হইতেই চারিদিকে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যোগীর ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। তখন জ্যোতির মধ্যে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যোগীর ইচ্ছা অনুসারে রূপের বিকাশ হয়। কিন্তু যে সাধকের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন হয় না অর্থাৎ যে সাধক প্রথম হইতেই চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা বিবেকের পথে নির্বাণমুক্তির দিকে অগ্রসর হয় সে ঐ মহাজ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না। পূর্বে যোগীর যে উচ্চ অবস্থার কথা বলা হইল তাহারও পরাবস্থা আছে। রূপকে বেষ্টন করিয়া তখন যে জ্যোতি থাকে তাহাও ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্রমশঃ উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

তখন শুধু রূপই থাকে। ঐ রূপ স্বয়ংপ্রকাশ। অনন্ত আকাশের মধ্যে ঐ চিদানন্দময় রূপই ভাসিতে থাকে। পরে আকাশও থাকে না। ঐ চিদানন্দময় রূপই সাধকের আত্মা—উহাই সাধক স্বয়ং—উহাই পূর্ণ—উহাই ষোড়শী। যে নিরাধার ও অব্যক্ত নিরাকার সত্তা এই পূর্ণত্বের দ্রষ্টা ও প্রদর্শক সেই গুরু—সেই সপ্তদশী। ইহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যাবস্থা। অনন্ত কোটি জগৎ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমগ্র কাল এই মহাচৈতন্যে ভাসিতেছে।

অতএব শব্দের ধারা ধরিয়া উত্তরণের তিন ভূমি—প্রথম শব্দ, তারপর জ্যোতি, শেষ রূপ। শব্দকে ভেদ করিতে না পারিলে জ্যোতিতে গিয়া পৌঁছান যায় না। এই শব্দই হইল মায়ার রাজ্য। জ্যোতি হইলেন আত্মা—এখানে জ্যোতির রাজ্য বা মহামায়ার রাজ্য বা বৈন্দব জগৎ। জ্যোতি ভেদ করিয়া উঠিলে ফুটিয়া উঠে রূপ। রূপই পরমাত্মা। পবমাত্মারও পরাবস্থা হইলেন ভগবান স্বয়ং। ভগবানের স্বরূপ হইল একই সঙ্গে transcendent and immanent সাধনা সুরু হয় স্থূল রূপ হইতে আবার শেষও হয় চিৎ-রূপে। যেখান হইতে start সেখানেই end—তবেই circle complete হয়।

জপরহস্য—নাদ, বিন্দু ও কলার সন্ধান না জানিলে জপরহস্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই নাদ, বিন্দু ও কলা সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হইল। এখন আমাদের জপেব উদ্দেশ্য কি এবং জপের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে তাহা ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের অনুসরণে বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের চিত্ত সর্বদাই নানাপ্রকার বিকল্পে আক্রান্ত হইতেছে। এইসব আক্রমণের ফলে চিত্ত তরঙ্গিত হইতেছে। এইসব বিকল্প বাসনাত্মক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্লেষণ কবিলে জানিতে পারা যায় বাসনামাত্রই বায়ুর তরঙ্গ। বায়ুর গতিতে বক্রতা আসিলে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই বাসনা—তাহাকেই অণু বলে। ইহা অশুদ্ধ শব্দাত্মক। আমরা যাহাকে চিত্তবৃত্তি বলি তাহার মূলে এই প্রকার অণুর কম্পন রহিয়াছে—ইহাই বাসনার ক্ষোভ। ৪৯টি বায়ু ৪৯ প্রকার গতিবিশিষ্ট। ইহাদের পরস্পর মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার গতি বায়ুমণ্ডলে প্রচলিত রহিয়াছে। এইগুলি বস্তুতঃ শব্দতরঙ্গ—মাতৃকার লহর। চিত্ত এই লহরে আক্রান্ত হয়। তাহার ফলে জীবাত্মা নিজের স্বভাবসিদ্ধ দ্রষ্টৃভাব হইতে স্খলিত হইয়া চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় ও ঐ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে। আত্মা তরঙ্গের অতীত হইয়াও অবিবেকবশতঃ চিত্তের তরঙ্গকে নিজের মধ্যে আরোপ করে। তাই সুখ-দুঃখরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া ভব-জ্বালা অনুভব করিতে বাধ্য হন।

এই যে বায়ুমণ্ডলের কম্পন এইগুলি বর্ণমালা। এই সকল বর্ণ নিরন্তর উদিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে এবং নানাপ্রকার মিলনের ফলে চিত্তে বৃত্তিরূপে অনুভূত হইতেছে। ইহাই বিক্ষিপ্ততা।

কিন্তু এই তরঙ্গের মূল কোথায়—তাহাই আমাদেব দেখিতে হইবে। শুদ্ধ চিদাকাশে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই নাদের হিল্লোল। ইহা সাক্ষাৎ চিৎশক্তির অভিঘাতে সৃষ্টিকাল হইতে নিরন্তরই চলিতেছে। এই সূক্ষ্ম নাদকে আশ্রয় করিয়া মায়াতীত শুদ্ধ জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই শুদ্ধ আকাশে বায়ুর ক্রিয়া নাই। তির্যক্‌গতি বায়ুর স্বভাব, গতি বক্রতাহীন হইলে বায়ু সরল গতি লাভ করে। চিত্তকে বক্রবায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত করাই চিত্তের বিক্ষিপ্ততা পবিহারের একমাত্র উপায়। জপের উদ্দেশ্য—বায়ুর বক্রতা দূর করা। জপের মন্ত্র নাদাত্মক। আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা বর্ণাত্মকরূপে প্রতিভাত হইলেও দীর্ঘকাল জপের ফলে মন্ত্র নাদে পরিণত হয। মন্ত্র যতক্ষণ নাদে পরিণত না হয় ততক্ষণ মন্ত্র-চৈতন্য লাভ হয না। আসল কথা এই, বর্ণাত্মক স্থূল শব্দের অন্তরালে নাদাত্মক চেতন শব্দকে চিনিতে পারিলে চিত্তের বর্ণগত যাবতীয় বাসনা-দোষের উপসংহার হয়। তখন চৈতন্যই মুখ্য হয। একাগ্রতার ইহাই লক্ষণ। এই অবস্থায় বক্র বায়ুর তরঙ্গ থাকে না, সরল গতিই মাত্র থাকে। অর্থাৎ, জপ করিতে করিতে বর্ণ শুদ্ধতা লাভ করিয়া নাদের অভিব্যঞ্জনা করে এবং চরম অবস্থায় একাগ্রতা সাধিত হইয়া চৈতন্যের বিকাশ হয়।

"যে অনাহত ধ্বনি অথবা নাদ নিরন্তর চিদাকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যাহা যোগীমাত্রই অন্তর্মুখ হইয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন তাহা নাড়ীসকলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণশীল অন্তর্যামী পুরুষের-দৃষ্টিরূপ রশ্মির অনন্ত ধারা মাত্র। ঐ রশ্মিটি একদিকে জ্যোতিরূপে এবং অপরদিকে শব্দরূপে সাধকের নিকট অন্তর্মুখ অবস্থায অনুভূত হয়। সাধক নাদরূপী ঐ ধারা অবলম্বন করিয়া তাহাতে মন যোগ করিয়া ভাসিতে পারিলে ঐ ধারার প্রবাহে যথাসময়ে উহার উৎপত্তিস্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হয। নাদকে আশ্রয় করিতে না পারিলে ভৌতিক দেহের অভিমান হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সাক্ষীস্বরূপে শূন্যরূপে হৃদয়স্থানে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে না। নাদের বিকাশ এবং নাদের সঙ্গে মনের ভাবাবেশ সম্ভব হইলে কর্তা এবং ভোক্তা জীব কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বহীন হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। শূন্যরূপ হৃদয়দেশে স্থিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবচৈতন্য অবলম্বনশূন্য হইয়া জীবভাব পরিত্যাগ করে এবং তাহার সকল অভিমান বিগলিত হইয়া যায। এই হৃদয়টি বিন্দুস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিন্দুতে নাদের অবসান হইলে যখন আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় তখন আত্মা দ্রষ্টারূপে সেই মহাশূন্য হইতে সূক্ষ্মরূপে দেহরূপ

অখণ্ড জগৎকে দেখিতে পায়। শুধু ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পায় যে ঐ বিন্দুস্থান হইতে রশ্মিরূপী শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালিত করিতেছে। বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা স্বয়ং এই বিশাল যন্ত্রের কেন্দ্রমধ্যে অবস্থিত। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিরাট দর্শনটি খুলিয়া যায়। তখন জীবভাব থাকে না। আত্মা নিজেই দ্রষ্টারূপে স্থিত হয়—এই পর্যন্ত মুক্তভক্তের অনুভূতি বুঝিতে হইবে। ইহার পর মুক্ত সাধকের দ্রষ্টা-আত্মা হইতেই যে রশ্মি নির্গত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটি চালনা করিতেছে তাহা উপলব্ধি গোচর হয়। তখন সাক্ষী থাকিয়াও মুক্ত সাধক ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধকের দ্রষ্টা-আত্মা তখন শুধু দ্রষ্টা নহে স্বয়ং অন্তর্যামী পুরুষ। এই দেহযন্ত্রেব সেই একমাত্র যন্ত্রী। ইহা নাদাতীত অবস্থা।" (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ—৪১-৪৩)।

জপের উদ্দেশ্য—জপের উদ্দেশ্য ইষ্টকে ভাবনা। জপের বিষয় নাম অথবা বীজ যাহাই হউক না কেন, উহা যে সদ্গুরু প্রদত্ত মন্ত্রঃপূত শব্দের অন্তর্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাম ও নামীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এইজন্য প্রাচীন ঋষিগণ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধকে বাচ্য ও বাচক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নামকে আশ্রয় করিতে পারিলে নামীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বীজমন্ত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

নাম অথবা বীজ যাহাই হউক উভয়ই শব্দাত্মক। এই শব্দ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উত্থিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি চিদাকাশস্বরূপ মহামায়ার নামান্তর। যখন সদ্গুরুর কৃপাবশতঃ চিৎশক্তির উন্মেষে কুণ্ডলিনী ক্ষুব্ধ হন অর্থাৎ স্পন্দিত হন, তখন মহানাদের আবির্ভাব হয়। মন্ত্রাদি শুদ্ধ শব্দমাত্রই মহানাদের প্রকারভেদ। এই শুদ্ধ শব্দ কুণ্ডলিনী হইতে উত্থিত হয় বলিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে শুদ্ধ সৃষ্টির জননী বলা হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি জীবদেহে মূলাধার চক্রে সুষুপ্তভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। ইনি যতদিন সুষুপ্ত থাকেন ততদিন জীবের অনন্তপ্রকার স্বপ্নদর্শন হয়। এই স্বপ্নদর্শনই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া স্বপ্নদর্শন আর থাকে না। অর্থাৎ তখন সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় বা হইবার উপক্রম হয় এবং সেই অনুপাতে মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাদর্শন ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। সত্যদর্শন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে মিথ্যাদর্শন অর্থাৎ বিকল্প জ্ঞান ও তাহার কার্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া যায়। ইহাকে জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ বলে। সাধকগণ যে অবস্থাকে ষট্চক্রভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

অতএব জপের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন। কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই হইল জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উত্তরণের পথে জ্ঞানের বিকাশটা চলে ধাপে ধাপে বা ক্রমে ক্রমে। প্রকাশ ও বিকাশের প্রভেদটা (distinction) জানা দরকার। বিকাশ হইল ক্রমিক আর প্রকাশ হইল অক্রম। বিকাশটা হয় কালে আর প্রকাশটা হয় ক্ষণে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিকাশটা পূর্ণ না হইলে প্রকাশটা ফোটে না। কর্মটা শেষ বা সম্পূর্ণ হইলে জ্ঞানটা revealed হয়। যেমন শব্দজ্ঞানে গো-পা-ল, এখানে যতক্ষণ ল পর্যন্ত বলাটা শেষ না হইতেছে ততক্ষণ বুঝিবার উপায় নাই কী অর্থটা প্রকাশ করিবে শব্দ। তাই একেবারে last limit-এ আসিলে তবে প্রকাশটা আপনি হইয়া পড়ে। যেমন গর্ভে থাকিতে হয় দশমাস কালব্যাপী, সেখানে ক্রমে ক্রমে দেহের গঠন, পুষ্টি আদি চলিতে থাকে, শেষে জন্মটা হয় এক ক্ষণে। ইহা ঠিক যেন unveiling এর মত। পর্দার আড়ালে জিনিসটা তৈরী হইয়া আছে, শুধু আবরণটা সরাইলেই তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই জ্ঞানের বিকাশটা ক্রম ধরিয়া হইয়া থাকে, আর প্রকাশটা অক্রমে ক্ষণমধ্যে হইয়া পড়ে।

কাশ্মীর শৈবাগম শাস্ত্র "শিবসূত্র বিমর্শিনী"-তে অক্রম জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম এখানে দুই-একটি কথায় বলা যাইতেছে। পরমেশ্বরের বোধরূপা-শক্তি অর্থাৎ চিৎ-শক্তি বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া পরাকুণ্ডলিনীরূপে এবং বিমর্শাত্মিকা বলিয়া নাদাত্মিকা বর্ণকুণ্ডলিনীরূপে স্ফুরিত হয়। এই বিশ্বগর্ভা কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ। ইহা স্বভাবতঃই নাদময় বা বিমর্শময়। জীবদেহে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে যোগী নাদ বা শব্দরূপে স্পষ্টভাবে ইহার অনুভব লাভ করে। নাদের অপর ভাব বিন্দুরূপ জ্যোতি, যাহা অর্ধচন্দ্র ও নিরোধিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। জ্যোতির অপরভাব হইল মন্ত্র। অকার, উকার ও মকাররূপ 'বর্ণপরামর্শই' মন্ত্র। জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত প্রতি চক্র ভেদ করিয়া উত্থিত হইলে প্রতি চক্রস্থিত বর্ণ বিগলিত হইয়া আজ্ঞাচক্রের উপরে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। এই বিন্দুই জ্যোতির্ময় জ্ঞান-স্বরূপা। আজ্ঞাচক্রের উপরে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত নয়টি সিদ্ধ ভূমি আছে। এই নয়টি ভূমির নাম যথাক্রমে বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। সমনা পর্যন্ত অতি সূক্ষ্মরূপে মন থাকে। ইহা বিশুদ্ধ মনের অবস্থা। ইহাও অতিক্রম করিলে যোগী শুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমনা পর্যন্ত যে জ্ঞান, তাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ক্রম জ্ঞান। 'শাক্ত উপায়ে' যে জ্ঞান লাভ হয়, ইহা সেই জ্ঞান। সোমনা অবস্থা ভেদ হইলে

উন্মনা অবস্থা। এই অবস্থায় যে জ্ঞান, উহা অক্রম জ্ঞান। উন্মনা হইল মনের উল্লঙ্ঘন, সুতরাং সেখানে কালের কলন নাই, উহা কালাতীত। উন্মনা অবস্থা কালাতীত বলিয়া এখানে জ্ঞানের কোন পর্যায় বা ক্রম নাই। সমুদয় জ্ঞান নিত্যকালের জন্য একই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয। ইহাই সহজ বিদ্যা বা শুদ্ধ বিদ্যা। 'শাম্ভব উপাযে' এই জ্ঞান লাভ হয। শাম্ভব উপায় হইল পরমেশ্বর বা পবমশিবের অনুগ্রহ লাভ। তাঁহার অনুগ্রহ লাভের সাথে সাথেই একটা ক্ষণের মধ্যে অক্রম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সমনা পর্যন্ত জ্ঞান ক্রমযুক্ত, সমনার উপরে শুদ্ধ আত্মা আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ক্রমলঙ্ঘন হইযা থাকে। ঐ সময একই সময়ে সমগ্র বিশ্ব অভেদে প্রকাশিত হয। এই অভেদপ্রকাশ উন্মনাশক্তির ব্যাপার। উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ আত্মা পবমেশ্বব অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিদানন্দময় পরমশিবের সঙ্গে আত্মার অভেদ সম্পন্ন হয। ইহাকেই বলে 'শিবত্ব-যোজনা'। পরমশিব অবস্থা প্রাপ্তিই হইল পূর্ণত্ব প্রাপ্তি।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা আত্মার ক্রমোত্তরণের একটি স্পষ্ট রূপরেখা পাইতেছি। শৈবাগম মতে মাযিক জগৎ হইতে উত্তীর্ণ সাধক-আত্মা প্রথম বিন্দু বা মহামায়ার রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এই অবস্থায় ভোগাকাঙ্ক্ষী আত্মা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং ঐশ্বর্যের সম্ভোগ করে। এইরূপ আত্মাকে আগমের ভাষায় 'অধিকারী আত্মা' বলা হয। ইহা 'ঈশ্বর' পদবাচ্য। এই অবস্থাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যে আত্মা ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মপথে আরও অগ্রসর হয় সেই আত্মা আরও ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয়। এইরূপ অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বস্তরেব আত্মা অধিকারী নহে, কিন্তু ভোগী। এই ভোগ আত্মানন্দ-সম্ভোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহা সর্বদা আনন্দ-সম্ভোগে মগ্ন থাকে। এই অবস্থারও ঊর্ধ্বে যে আত্মার গতি হয, সেই আত্মা স্বরূপানন্দ সম্ভোগশীল অবস্থা হইতেও ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়। আগমে এই অবস্থাকে 'লয়' বলে। কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায "লয়স্থিতি বস্তুতঃ বিন্দুস্থিতি। ইহাই আত্মার শিবতত্ত্ব-রূপে অবস্থান। ইহা শিবতত্ত্ব হইলেও তত্ত্বাতীত শিব নহে। সুতরাং এই অবস্থাকেও আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি বলা যায় না।" (তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন, পৃ-৫)। যদিও এই অবস্থায় শিবত্ব একপ্রকার অনাবৃতভাবেই প্রকাশিত হয় তথাপি এখানেও কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিয়া যায়। এই আবরণটি আর কিছু নয়, বিন্দুর ক্ষীণ সম্বন্ধ বা স্পর্শ। বিন্দু শুদ্ধ হইলেও অচিৎ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আত্মা যতক্ষণ ইহার স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হয় ততক্ষণ সে অবস্থাকে যথার্থ শিনত্ব বলা যায না। চিৎ-শক্তির কৃপা ভিন্ন বিন্দুকে অতিক্রম করা যায় না। শিবতত্ত্বে অবস্থিত সাধক-আত্মা তখন চিৎ-শক্তির শরণাপন্ন হয।

ইহাই চরম শরণাগতি। চিৎ-শক্তির কৃপায শিবরূপী সাধক আত্মায উন্মনাশক্তির উন্মেষ হয়। উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ আত্মা পরমশিবাবস্থা প্রাপ্ত হয। কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায় "চিৎ-শক্তির উন্মেষ বিন্দুকে আশ্রয করিযা হয বলিয়া যদিও প্রথম প্রথম বিন্দুর সংশ্রব থাকে তথাপি সর্বশেষে বিশুদ্ধ চিৎ শক্তিই থাকিযা যায়; বিন্দু নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ হইযা যায। তখন চিৎ-শক্তি উহাকে অতিক্রমণ করে। বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তির প্রকাশ বিন্দু হইতে মুক্ত হওয়াব পর পূর্ণভাবে ঘটে। তখন ঐ শক্তি নিষ্ক্রিয হইযা যায়। ইহাই নিত্যমুক্ত শিবাবস্থার উদ্‌ভব" (ঐ, পৃ-৫)। অর্থাৎ শিবত্ব-প্রাপ্ত সাধক-আত্মায চিৎ শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হইলে ঐ শিবরূপী আত্মা চিৎ-শক্তিময় হইয়া যায। তখন চিৎ-শক্তি আবার নিষ্ক্রিয় হইযা শান্ত-স্বরূপে পরমশিবে সমবেত হয়। শিবরূপী আত্মাও সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাতীত নিত্যমুক্ত পরম শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আত্মার যথার্থ শিবত্ব, ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপস্থিতি।

এই প্রসঙ্গে আমরা 'অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রমকে' ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যেরূপ বর্ণনা করিযাছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিযা দিলামঃ

(১) প্রথম কর্মাভ্যাস অর্থাৎ জপ, তপ, ঈশ্বর-প্রণিধান প্রভৃতি সৎ কর্মাচবণ।

(২) যথাবিধি কর্ম করিতে করিতে চিত্তক্ষেত্র অর্থাৎ হৃদয় শুদ্ধ হয়। কর্মাভ্যাসের ফলে হৃদয হইতে সংস্কারমল তিরোহিত হইলে হৃদয়টি স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় প্রকাশমান হয়।

(৩) ইহার পর স্বচ্ছ হৃদয়াকাশে সূর্যোদযের ন্যায ইষ্টস্বরূপ উদিত হয়। তখন ইষ্টের আলোকে সমগ্র হৃদযাকাশ আলোকিত হয। ইহাবই নাম হৃদয়ে ইষ্ট দর্শন।

(৪) নিরন্তর এই ইষ্ট দর্শন হইতে থাকিলে দীর্ঘকাল পরে ইহা হৃদয়ে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থা সাধকের ইষ্টলোকে স্থিতিরই নামান্তর।

(৫) এই স্থিতির পর হৃদয়স্থিত ইষ্ট হইতে তাহার একটি আভাস স্ফুরিত হইয়া বহিরাকাশে প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরাকাশের ন্যায় বহিরাকাশেও অবাধিত রূপে ইষ্টদর্শন হইয়া থাকে। বাহ্য কোন পদার্থের সহিত এই ইষ্টরূপের কোন যোগ আছে বলিয়া প্রথমে মনে হয় না।

(৬) ইহার পর বাহ্যপদার্থের প্রত্যেকটিতেই জড়িতরূপে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে-কোন দিকে দৃষ্টি পতিত হউক্—তাহাই যেন ইষ্টের আসন অথবা অধিষ্ঠান। ইষ্টরূপই তখন মুখ্য—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

(৭) ইহার পর বাহ্যভাব ক্ষীণ হইয়া ক্রমশঃ ইষ্টের রূপই প্রাধান্য লাভ করে। চরমাবস্থায় শুধু ইষ্টের রূপই থাকে, বাহ্যজ্ঞান আর থাকে না। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। সাধক দ্রষ্টারূপে স্থিতি লাভ করে।

(৮) এই ইষ্টরূপ দৃক্‌শক্তির দ্বারা ভিন্ন হইলে ইহার মধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। একমাত্র ইষ্টরূপেই অনন্ত জগৎ প্রতিভাসমান হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় ঐ এক ইষ্টই যেন ইষ্ট থাকিয়াও অনন্ত আকারে প্রকাশমান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই অনন্ত রূপ চিন্ময়। কারণ ইহা ইষ্টের স্বরূপ-দর্শনের পর আবির্ভূত। ইষ্টের স্বরূপ-দর্শন হইলে অচিৎ অংশ আর অবশিষ্ট থাকিতে পারে না।

(৯) ইহার পর ইষ্টরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন অনন্তরূপেই ইষ্ট থাকেন। ইষ্টের পৃথক সত্তা থাকে না। ইহাই পূর্ণত্ব বা নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। আগম অনুসারে তন্ত্রদীক্ষিত যোগী দ্রষ্টারূপে সূক্ষ্মভাবে তখনও থাকে।

(১০) ইহার পর ইষ্ট বা ব্রহ্ম দ্রষ্টা-যোগীর আত্মস্বরূপে প্রতিভাসমান হয়। ইহাই সর্বাত্মভাব। এই অবস্থায় সর্বত্রই নিজেকে দেখা যায় অর্থাৎ নিজ আত্মায় সর্বভূতকে দেখা—'সর্বভূতাত্মরাত্মা'। বেশ অনুভব করিতে পারা যায় আমিই 'সব' হইয়া আছি এবং খেলা করিতেছি।

(১১) ইহার পর এই 'সব' হইয়া থাকার বোধও থাকে না। একমাত্র আমিই আছি—অখণ্ড অব্যক্ত অনন্ত আমি। ইহাই থাকে—দ্বিতীয় কিছুই নাই। এইটি চিদানন্দঘন অবস্থা।

(১২) ইহার পর এই মহান্ আমিও থাকে না। সে অবস্থাকে চিদানন্দ বলা যায় না, পূর্ণ অহং বলা যায় না, পরব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ উহা অনন্তের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার প্রকাশ চলে না। ইহাও স্বয়ংপ্রকাশ অবস্থা। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতাবস্থা।

(১৩) ইহারও পরাবস্থা আছে।

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্র সংখ্যা—১৩)

জপের প্রক্রিয়ায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ—সাধনার প্রথমাবস্থা হইল আণব উপায়। আমরা পাশবদ্ধ জীব অর্থাৎ পশু। মায়ার আবরণই হইল পাশ বা মল। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়াশক্তিই হইল মায়া। মায়া বা ক্রিয়াশক্তির প্রভাবেই জ্ঞানের মধ্যে ভাসমান জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরে আভাসিত হয়; অর্থাৎ জ্ঞেয়-বস্তু আমা হইতে পৃথক বলিয়া জীবের নিকট প্রতীয়মান হইয়া ভ্রান্তি বা অজ্ঞানের সৃষ্টি করে। অতএব ক্রিয়াশক্তিই জীবের

ভ্রম উৎপাদনকারী অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা মায়ার রাজ্যে যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের উদ্ভব হয়, তাহা সবই প্রমাদপূর্ণ বা অজ্ঞান-প্রসূত। মায়ার অধিকারভুক্ত অশুদ্ধ অধ্বায় জীবের যে জ্ঞান, চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সবই অজ্ঞান বা অশুদ্ধ বিদ্যা। অতএব এই অজ্ঞান, অবিদ্যা বা পাশকে ভেদ করিতে হইবে। আণব মল ও মায়া মলকে পরিপক্ক করিতে হইলে ক্রিয়াশক্তিকেই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ক্রিয়াশক্তি কি? গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র বা নামের জপ, ধ্যান, ধারণাই হইল ক্রিয়াশক্তি। গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রই হইল সাধন-শক্তি। গুরু-কৃপাই হইল শক্তিপাত। গুরুদ্বারা যে শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, নিয়মিত জপ তপের দ্বারা সেই শক্তির অনুশীলনের নামই আণব-উপায়। ইহার দ্বারা অশুদ্ধ মায়ার জগৎ ভেদ হয়।

নাদ ও জ্যোতির অভিব্যক্তির জন্য জপ অপরিহার্য। জপ তিন প্রকারঃ বাচিক, উপাংশু ও মানস জপ। এই তিন প্রকার জপ হইতে কিরূপে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় সে-সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইলঃ "বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং উপাংশু জপ হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্রে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বাচিক জপে বাহ্য বায়ুর সম্বন্ধ অধিক, কিন্তু উপাংশু জপে এই সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তবুও কিছু কিছু থাকে। প্রকৃত মানস জপে বাহ্য জপের সম্বন্ধ একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে। বাহ্য বায়ুর প্রভাববশতঃই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অনুপাতে বাহ্য বায়ুর প্রভাব কমিয়া আসে সেই অনুপাতে বিক্ষিপ্ততাও হ্রাস পাইতে থাকে। বাচিক জপ অপেক্ষা মানসিক জপে যে একাগ্রতা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেইজন্যই যে মানসিক জপের উৎকর্ষ অধিক তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাচিক জপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু ঠিকভাবে যথাবিধি জপ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হইয়া যায়। শ্বাসের গতি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা না করিলেও বাচিক জপ উপাংশু জপে পরিণত হইয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি একান্তভাবে ক্ষীণ হইলে বিনা চেষ্টাতেই উপাংশু জপ মানসিক জপে পরিণত হয়। ঐ সময় বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিতপ্রায় হয় অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া অনেকটা শান্ত হয়। জপ প্রসঙ্গে যে শক্তি এতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলার পথে সঞ্চরণ করিতেছিল, তাহা তখন সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এতক্ষণ যে শব্দ বাহিরে উচ্চারিত হইতেছিল, সুষুম্নাতে শক্তির অন্তঃপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মধ্যমায় বায়ুর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে তাহা ভিতরে ভিতরে উচ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই বাহ্য উচ্চারণ এবং আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ঠিক একপ্রকার নহে। বাহ্য উচ্চারণ বাহ্য বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই বায়ু ইড়া পিঙ্গলার পথে

প্রবাহিত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ভিতরের বায়ু দ্বারা সিদ্ধ হয়, এই বায়ু সুষুম্না পথে প্রবাহিত হয়। বাহ্য বায়ু স্থূল, ভিতরের বায়ু সূক্ষ্ম। সুষুম্নাতে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি না হইলে প্রকৃত মানসিক জপ হয় না। বাহ্য বায়ুকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালনা করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু সুষুম্নাস্থিত বায়ু নিয়ত ঊর্ধ্বগমনশীল বলিয়া সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্বনি উত্থিত হয়। সুষুম্না নিরন্তর শব্দময়। ইহার সহিত কুণ্ডলিনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্য জপের অনুষ্ঠানের ফলে যখন সুষুম্নাতে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ হয় তখন পূর্বোক্ত বাহ্য জপের সংস্কার সুষুম্নাকে রঞ্জিত করে। ইহার ফলে অনবচ্ছিন্ন নাদ সাধকের বাহ্য জপের অনুরূপ ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। এই অবস্থায় মন্ত্রজপ ভিতর হইতে আপনা আপনি হইতে থাকে, চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা বস্তুতঃ অজপারই একটি অবস্থা। প্রচলিত মানসিক জপ হইতে এই মানসিক জপ অনেকাংশে পৃথক্—কারণ প্রচলিত জপে সাধকের চেষ্টা থাকে কিন্তু এইপ্রকার মানসিক জপে চেষ্টা থাকে না।

বৈখরী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে পশ্যন্তী এবং পশ্যন্তী হইতে পরা—ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। বাচিক ও উপাংশু জপ উভয়ই বৈখরীতে হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক জপ মধ্যমা ভিন্ন হয়না। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ এক সত্তায় পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের স্ফুরণ। আত্মসাক্ষাৎকার, মন্ত্রসিদ্ধি, ইষ্টদর্শন, অপরোক্ষ দর্শন প্রভৃতি পশ্যন্তী অবস্থারই ব্যাপার। পরাবস্থা অব্যক্ত। মধ্যমা অবস্থাতেই শব্দ হইতে জ্যোতির আবির্ভাব আরম্ভ হয়, হৃদয়ের সঞ্চিত অন্ধকার মধ্যমা নাদের সময়ই বিগলিত হইতে থাকে। বৈখরী ও পশ্যন্তীর মধ্যবর্তী অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য জগৎ তিরোহিত হইয়া স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত ভাবময় একটি অনন্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে। এই জগৎ উপসংহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাপক আলোকরাশি এবং তদালোকিত অনন্ত দৃশ্যরাশি বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে পরিণত হয়। ইহাই আত্মজ্যোতি। ইহা পশ্যন্তী বাকের অবস্থা। এই জ্যোতিতে ডুবিতে পারিলে এবং ডুবিয়া আত্মহারা না হইলে জ্যোতির মধ্যে আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহারও পরাবস্থা আছে।”

পরাবস্থা সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এখানে কিছু বলেন নাই। পরাবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বই পড়িয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বিবৃত করিতেছি।

অদ্বয় অবস্থা হইতে পরব্রহ্ম বা পরমশিবের Self multiplications হইল তাঁহার বিভূতি (বিভব)। চিৎরূপী আনন্দশক্তি হইতে ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া যে বিচিত্র ও অনন্ত ভাবময় সৃষ্টি তাহাই তাঁহার বিভূতি। পরাবাক্ হইতে

এই সৃষ্টি। পরাবাকের 'অধে' অর্থাৎ বহির্মুখী গতিতে এই সৃষ্টি। যেমন—God said, "Let there be light and there was light." পরাবাক্ হইতে এই বহির্মুখী সৃষ্টিই পরমশিব বা পরমেশ্বরের বিভূতি।

বহুকে যখন নিজের মধ্যে গুটিয়ে এক করা হয়, তাহাই যোগ। মধ্যমা ও পশ্যন্তী ভূমির মধ্য দিয়া ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপা আত্মশক্তিকে গুটিয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উপরে যে বিশুদ্ধ সংবিদ্-রূপা চিন্ময় অবস্থা যোগী প্রাপ্ত হয়, তাহাই অন্তর্যোগ। পরাবাকেব 'ঊর্ধ্বে' এই অন্তর্মুখ যোগ। এইরূপ যোগাবস্থা লাভই যোগী-ভক্তের কাম্য। এখানে যোগীভক্তের অন্তরাত্মায় পরামাত্মাব স্পন্দন বা স্ফুরণ ও ব্যাপ্তি আপনা হইতে সহজভাবে হয়। ইহাই পরাবাক্ বা চিৎশক্তি—ইহাই সহজ ভাব, শুদ্ধ বিদ্যা। অর্থাৎ অন্তরাত্মায় সংবিদ্রূপ আত্মা খেলা করে।

মনে রাখিতে হইবে পরাবাকের 'অধে' বহির্মুখী সৃষ্টি আর পরাবাকের 'ঊর্ধ্বে' অন্তর্মুখ যোগ। পরাবাকের ঊর্ধ্বে অন্তর্মুখ যোগের কথা গীতাতেও উল্লেখ আছে—"শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে"।

আবার আমরা ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের বিশ্লেষণে ফিরিয়া আসি। "বর্ণাত্মক শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রবেশ করিতে না পারিলে যোগপথ পাওয়া যায় না। ধ্বন্যাত্মক শব্দই নাদ। বর্ণরূপ শব্দ যতক্ষণ বিগলিত হইয়া বৈচিত্র্য পরিহার করিতে না পারে, ততক্ষণ নাদরূপী শব্দের উপলব্ধি হয় না। (কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও সুষুম্না পথে ঊর্ধ্বগমনের পথে প্রতি চক্রের বর্ণরাশির বিগলিত হওয়ার কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে)। নাদ ভিন্ন বিন্দুর উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? রেখা যেমন গতিহীন হইলে বিন্দুরূপ ধারণ করে, নাদও তেমনি প্রবাহহীন হইলে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। এই বিন্দুই পূর্ববর্ণিত জ্যোতি। আত্মস্বরূপের ইহাই অভিব্যঞ্জক।

যখন সদ্গুরু কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিষ্যের অধিকার অনুসারে কোন না কোন প্রকারে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন তখন ঐ দীক্ষা ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশুদ্ধকায় অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয় তাহাই বাস্তবিক পক্ষে শিষ্যের স্বদেহ। সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত দীক্ষাকে সেইজন্য 'দ্বিজত্ব' লাভ বলে। অর্থাৎ শিষ্যের বিশুদ্ধ দেহ লাভজনিত দ্বিতীয় জন্ম সাধিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে তাহাতে যেমন ফল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গুরুদত্ত বীজ শিষ্যের হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যথাবিধি পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, জ্ঞানরূপ দেহ উৎপন্ন করিবেই করিবে। বীজ যেমন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং বাহির হইতে কেবলমাত্র পরিকর্মের

আবশ্যকতা হয়, তদ্রূপ বীজ গুরুশক্তি বা চৈতন্য শক্তির প্রভাবে শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া আপনা আপনি বিকশিত হইতে থাকে। শিষ্যকৃত সাধনা পরিকর্মরূপে প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে মাত্র। শিষ্যের যাবতীয় ক্রিয়া গুরুদত্ত অথবা গুরুকর্তৃক অভিব্যঞ্জিত চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জপাদি যাবতীয় সাধন ক্রিয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাই স্বাভাবিক সাধন। কর্তৃত্বাভিমানশীল জীব এই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ দেহাভিমানের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বা গুরুশক্তি আপন স্বভাবে উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যে জপাদি হয়, তাহা প্রচলিত জপাদি হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। বস্তুতঃ ইহা অজপারই খেলা। কারণ ইহার মূলে স্থূলদেহী জীবের কোন চেষ্টা থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রভাবে যে ভাবে ইহা চলিতে থাকে এবং পর পর যে সব অবস্থার উদ্ভব হয়, সাক্ষীরূপে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া না দিলে সাধনার ঐ স্বাভাবিক মার্গ আয়ত্ত হইতে পারে না। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যকে চৈতন্যের আভাস মাত্র দিয়া তাহাকে সাধন প্রণালী উপদেশ দিয়া থাকেন। শিষ্যকে পুরুষকার অথবা চেষ্টা করিয়া সাধন করিতে হয় এবং ঐ আভাসরূপী চৈতন্যের সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সাধককে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় জপাদি সকল প্রকার সাধন চেষ্টাপূর্বক করিতে হয় না। শুধু প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অর্থাৎ পুরুষকারনিরপেক্ষ স্বভাবের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়। সাধন করিতে করিতে চৈতন্যের বিকাশ সিদ্ধ হইলে সাধনের আর প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহা আভাসরূপী চৈতন্য ছিল, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয় সাধক বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈখরীভূমি হইতে পশ্যন্তী ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা-৪৫)

নাদের অভিব্যক্তি—প্রাণায়ামের সাহায্যে এবং মন্ত্রের সাহায্যে—এই উভয় প্রকার উপায়েই নাদ উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু নাদ যে ভাবেই উত্থিত হউক তাহার মূল আবির্ভাব প্রক্রিয়া একই। বিন্দুরূপিনী মহামায়া সাক্ষাৎভাবে শুদ্ধ জগতের এবং পরম্পরাতে অশুদ্ধ জগতের উপাদান কারণ। যখন পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা চিৎশক্তি এই বিন্দুকে আঘাত করেন, তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে

পারে না এবং মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যমূলক আঘাত ব্যতিরেকে বিন্দুর ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে যেমন শাব্দিক সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়, অপরদিকে তেমনি আর্থী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর এবং যাবতীয় শুদ্ধ জগতের অধিবাসীগণের দেহ এই ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতেই রচিত হইয়া থাকে। শব্দের সঙ্গে অর্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়েরই মূলে বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, ছত্রিশটি তত্ত্ব এবং তত্ত্বময় বিশ্ব মূলতঃ বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই বিন্দুর নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। ব্যষ্টিরূপে মানবদেহে জীব-কুণ্ডলিনীরূপে এবং সমষ্টিরূপে বা মহাসমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বদেহে জগৎকুণ্ডলিনীরূপে এই শক্তিই বিরাজ করিতেছে। কুণ্ডলিনী হইতেই নাদের আবির্ভাব। মাতৃগর্ভে যখন জীবদেহ রচিত হয় এবং বিশ্বমাতৃকার গর্ভে যখন আদি সৃষ্টির উদ্ভব হয়—উভয়ত্রই কুণ্ডলিনীরই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা সৃষ্টির দিক্‌কার কথা। কিন্তু সাধক যখন নাদকে অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তখন উহা দুই জগৎ হইতে প্রত্যাবর্তন পথেই করিতে হয়। নাদ অভিব্যক্ত করাব অর্থ অভিব্যক্ত নাদকে উপলব্ধিগোচর করা। প্রাণায়ামের দ্বারা কুম্ভক প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ হইলে সুষুম্নাপথে সূক্ষ্ম বায়ুর গতি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তখন মন ইড়া পিঙ্গলা মার্গ পরিহার করিয়া যে অনুপাতে সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হয়, সেই অনুপাতে সুষুম্নাস্থ নাদধ্বনি শুনিতে পায়। সুষুম্না শূন্য পথ, শূন্যই আকাশ, নাদ উহারই ধর্ম। সুতরাং যতক্ষণ আকাশ বা ব্যোমপথে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ নাদশ্রবণ হইতে পারে না। কুম্ভকের দ্বারা এই ব্যোমপথেই প্রবেশ লাভ হয়। সেইজন্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যোগ থাকার জন্য নাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র বস্তুতঃ নাদময়। কারণ বিন্দু হইতেই মন্ত্রের স্বরূপ রচিত হয়। সুতরাং মন্ত্রশক্তি বৈন্দব-শক্তি বা কুণ্ডলিনী-শক্তি ছাড়া আর কিছু নহে। তবে আমাদের অচৈতন্য বশতঃ এই নাদরূপী মন্ত্রে নানাপ্রকার আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। জপাদির দ্বারা এবং অন্যপ্রকার সাধনার প্রভাবে এই আগন্তুক আবরণ অপসারিত হইলেই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভূত হয়। আকাশে সূর্য উদিত থাকিলেও মেঘের আচ্ছাদনবশতঃ যেমন তাহা গোচরীভূত হয় না, ঠিক সেইপ্রকার মন্ত্র নাদময় ও জ্যোতির্ময় হইলেও আবরণবশতঃ এই নাদময়তা ও জ্যোতির্ময়তা অনুভূত হয় না। যাহাকে মন্ত্র-চৈতন্য বলে তাহাই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভব। বস্তুতঃ মন্ত্র নিত্যচেতন, তথাপি যতক্ষণ আবরণ অপসারিত না হয় ততক্ষণ তাহাকে চেতন বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না।

সুতরাং মন্ত্র জাগিলে সুষুম্নাপথে নাদধ্বনিরূপে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। কুম্ভকের ফলে সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইলেও ঐ প্রকার নাদধ্বনি পাওয়া যায়।

নাদের বিকাশ ভিন্ন আকাশমার্গে সঞ্চার হইতে পারে না। শূন্য, মহাশূন্য, অতিশূন্য প্রভৃতি শূন্যের বা আকাশের ঔপাধিক ভেদ রহিয়াছে। সেই প্রকার নাদের অভিব্যক্তিতেও ক্রম আছে, কারণ নাদ হইতে মহানাদ পর্যন্ত না গেলে নিত্যগুরুর সন্ধান পাওয়া যায় না বা মহাকৃপার সঞ্চার হয় না।

নাদাভ্যাসে চৈতন্যশক্তির বিকাশ—নাদ হইতে মহানাদে উপস্থিত হইতে না পারিলে নিত্যগুরুর দর্শন হয় না বা মহাকৃপাও লাভ করা যায় না। নাদ হইতে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্তরসমূহ ভেদ করিতে করিতে নাদের মূল প্রস্রবণ মহানাদের সাক্ষাৎকার হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে নাদ ভিন্ন মনকে শুদ্ধ করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অসংখ্য কর্মসংস্কার ও বাসনা শুদ্ধ মনে জড়িত হইয়া মনকে আবর্জনাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মনের স্থূলত্বের ইহাই কারণ। এই স্থূলতাবশতঃই মন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর বহির্মুখে ধাবিত হয় এবং বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। নাদের প্রভাবে মনের আবর্জনা ক্রমশঃ দূর হইতে থাকিলে মন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিতে থাকে এবং তদনুরূপ মনের অন্তর্মুখ গতিও সিদ্ধ হয়। মনের নির্মলতা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ আকর্ষণ করিয়া বহির্মুখ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ সময় মন ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে না। সুতরাং মনের ঐ অবস্থায় রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বাহ্যজগৎ মনকে বিচলিত করিতে পারে না—ইহাই মনের স্থিরতা। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে ঊর্ধ্ব আকর্ষণের প্রভাবে মন ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উন্নীত হয়। মনের ঊর্ধ্বগতির অনুপাতে চৈতন্যশক্তির বিকাশ ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। প্রথমে মনের শোধন তাহার পরে মনের বোধন—ইহাই অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশের নিয়ম। মন শুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইতে থাকে। অর্ন্তমুখী গতি দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং অচল অবস্থায় স্থিত হয়।

ঊর্ধ্বমুখি গতি দ্বারা স্থির মনই ক্রমশঃ চৈতন্যশক্তিরূপে পরিণত হইতে থাকে। যে স্থানে ঊর্ধ্বগতির অবসান সেই স্থানে মন নিবৃত্ত হইয়া একমাত্র চৈতন্যশক্তিই বিরাজমান থাকে। উহাই মনের উন্মনী অবস্থা। ঐখান হইতেই ভগবদ্দর্শনের পথের সন্ধান লাভ করা যায়। মনোরাজ্যে থাকিয়া যথার্থ ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর নহে। নাদধ্বনি যদি অখণ্ডিতভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে মনের অন্তর্মুখী এবং ঊর্ধ্বমুখী উভয় গতিই সিদ্ধ হয় এবং চরম অবস্থায় আত্মাতেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ফুটিয়া উঠে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিন্দু অর্থাৎ মহামায়া স্পন্দিত হইয়া নাদরূপে পরিণত হয়। মহামায়া কুণ্ডলিনী-শক্তিরই নামান্তর। বিন্দু স্পন্দিত হইয়া যখন

চৈতন্যরূপ নাদে পরিণত হয় তখনই সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে শক্তির কিরণ বিকীর্ণ হইতে থাকে। কারণ, এই নাদরূপ চৈতন্য-জ্যোতিঃকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে পরমপদে পৌঁছিতে হইবে। সুকৃতির প্রভাবে যাহার নাদ খুলিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে মনের সংস্কার করিবার জন্য আর পৃথক্ চেষ্টার দরকার হয় না। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাপ্রবাহ অবতীর্ণ হইয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, ঠিক সেইপ্রকার বিন্দু হইতে নাদ উত্থিত হইয়া মহাজ্যোতির দিকে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে।

নাদ খুলিয়া গেলে নাদে মনকে সংলগ্ন করিয়া রাখাই তখন সাধকের একমাত্র কর্ম। নাদে মনকে সংলগ্ন রাখাই 'নাদাভ্যাস'। নাদ সাধকের সংলগ্ন মনকে সঙ্গে লইয়া ঊর্ধ্বমুখী হইয়া যখন উহার উৎপত্তিস্থান চিদাকাশে উপনীত হইবে, তখন আর নাদধ্বনি শ্রুত হইবে না এবং মনের সত্তাও অনুভব করিতে পারা যাইবে না—ইহাই উন্মনী অবস্থার উন্মেষক্ষণ, ইহাই আত্মজ্ঞান বিকাশের সন্ধিক্ষণ। শব্দ নিরুদ্ধ হওয়ার দরুণ মনও নিরুদ্ধ হয় এবং চৈতন্য-ক্ষেত্রে আত্মস্বরূপ ভাসিয়া উঠে। কারণ, শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি। যখন শব্দের গতি রোধ হইয়া যায় এবং মনও থাকে না তখন জগৎ দর্শন থাকে না বলিয়া নিত্যসিদ্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপই স্বপ্রকাশে বিরাজ করে।

এইবার বিন্দু হইতে নাদের উৎপত্তি এবং প্রত্যাবর্তন ক্রমে বিন্দুতেই নাদের লয় এবং মহাজ্ঞান প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় পত্রাবলীর ১ম খণ্ডে ১২নং পত্রে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশটি লিপিবদ্ধ হইলঃ—

বিন্দু হইতে নাদ উত্থিত হয় এবং প্রত্যাবর্তন ক্রমে বিন্দুতেই নাদের লয় হয়। ইহা স্বাভাবিক ক্রম। এই ক্রমকে আশ্রয় করিয়া মহাযোগিগণ নিজের পরমলক্ষ্য অনুসরণ করিয়া আপন আপন ধাম অথবা পরমপদে আপন আপন স্থিতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। বিন্দুতে চিৎশক্তির আঘাত না পড়িলে বিন্দু কম্পিত হইতে পারে না, এবং বিন্দু কম্পিত না হইলে নাদের বা শব্দের উদয় হওয়া অসম্ভব। এই উত্থিত নাদই অভিব্যক্ত চৈতন্য। অব্যক্ত চৈতন্যের দুইটি দিক আছে, একটি সক্রিয় বা dynamic এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় বা static। এই দুইটি দিকের অন্তরালে মহা ইচ্ছার সত্তা বিদ্যমান। ইচ্ছার প্রভাবেই নিষ্ক্রিয় শক্তি ক্রিয়ারূপ ধারণ করিয়া থাকে।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া যে নাদের অভিব্যক্তি হয়, সেই নাদ সৃষ্টির অন্তর্গত অথচ সৃষ্টির আদিভূত 'মহানাদ'। ইহাই জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশমান হইয়া বিক্ষোভের ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর পর বিভিন্ন স্তরের বিকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে ক্রিয়ারূপা শক্তি বিন্দুতে পতিত হইয়া বিন্দুকে স্পন্দিত করিতেছে,

অনেকে তাহাকেও নাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহানাদ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য তাহাকে 'পরনাদ' বলিয়া বর্ণনা করা চলে। উহা অব্যক্ত চৈতন্যস্বরূপ। মহানাদ জগৎ সৃষ্টির আদি, কিন্তু পরনাদ সৃষ্টির আদিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। উহা অনাদি চৈতন্য প্রবাহ।

বিন্দু যখন বিভক্ত হইয়া ঊর্ধ্ববিন্দু এবং অধোবিন্দুরূপে অর্থাৎ বিসর্গ (ঃ) রূপে পরিণত হয় তখন ঐ নাদরূপী অবিচ্ছিন্ন স্রোতই উভয়ের মধ্যে যোজক সূত্ররূপে বর্তমান থাকে। ঊর্ধ্ববিন্দু হইতে যে ধারা নিঃসৃত হয় তাহা অধোবিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয় এবং অধোবিন্দু হইতে যে ধারা নির্গত হয় তাহা ঊর্ধ্ববিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয়। অধোমুখী ধারা ও ঊর্ধ্বমুখী ধারা উভয়েই স্বরূপতঃ একই শক্তির ধারা। তথাপি উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। অধোমুখী ধারাতে চৈতন্যের উপলব্ধি পাওয়া যায় না। এই ধারাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিমুখে অনন্ত শক্তির স্তর, লোক লোকান্তর এবং দেহবিশিষ্ট জীবরাশি অবিরাম প্রবাহে নিরন্তর আবির্ভূত হইতেছে। অধোবিন্দু ভেদ করিয়া যখন এই ধারার আভাস বহিঃনিসৃত হয়, তখনই সাংসারিক প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রপঞ্চময় জগৎ, জ্যোতিঃপ্রবাহের একাংশের ঘনীভূত অবস্থা—ইহা মায়াশক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং জ্যোতিঃপ্রবাহেই ভাসিতে থাকে; যেমন সমুদ্রের জল কোন এক স্থানে অত্যধিক শৈত্যের জন্য ঘনীভূত হইয়া সমুদ্রেই ভাসিতে থাকে। অধোধারাকে অজ্ঞানের ধারা বলা চলে। কিন্তু যেটি ঊর্ধ্বমুখী ধারা সেইটি অজ্ঞানের ধারা নহে। তাহা জ্ঞানের ধারা। চৈতন্যরূপী জ্ঞানের ধারাকে আশ্রয় না করিয়া ঊর্ধ্ববিন্দুকে পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধোবিন্দু হইতেও যেমন ধারার বিকিরণ আছে, যাহার ফলে সাংসাবিক প্রপঞ্চের উদ্ভব হয় তদ্রূপ ঊর্ধ্ববিন্দু হইতেও ধারার নির্গম আছে—যাহার ফলে পরমধামের স্ফুরণ হয়। বিন্দুর বিভাগের জন্য সাংসারিক প্রপঞ্চ এবং পরমধামেব মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। যোগসাধনার দ্বারা এই ব্যবধান মিটাইতে পারিলে অধোবিন্দু এবং ঊর্ধ্ববিন্দু একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিন্দুরূপে স্থিত হয়। অর্থাৎ বিসর্গরূপী বিন্দুদ্বয় মহাবিন্দুরূপী অদ্বৈত বিন্দুতে পর্যবসিত হয়। তখন অখণ্ড পরমতত্ত্বে অধিষ্ঠিত তত্ত্বাতীত আত্মপ্রকাশ করেন। অধোবিন্দুকে মূলাধারস্থ ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু এবং ঊর্ধ্ববিন্দুকে সহস্রদল কমলস্থিত ত্রিকোণের কর্ণিকারূপী মধ্যবিন্দু বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া নাদস্রোত স্বভাবতঃই সহস্রারে বিলীন হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন হইল, যে ধারা অবতরণকালে জ্ঞানহীন জড়শক্তির ধারারূপে বর্ণিত হয়, তাহাই উত্থানকালে চৈতন্যের ধারারূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য হয় কেন? এই প্রশ্নের মুখ্য সমাধান—মনঃসংযোগ। অজ্ঞাতসারে নাদের বা শব্দের যে

ধারা ঊর্ধ্ববিন্দু হইতে বহিয়া চলিয়াছে তাহাব সঙ্গে মনকে যুক্ত করিতে পারিলেই ঐ ধারা জ্ঞানের গোচর হয। শুধু তাহাই নহে মনও জ্ঞান বা চৈতন্যের ধারারূপে পরিণত হইযা ঊর্ধ্বমুখে চলিতে বাধ্য হয়। এই যে মনের যোগ ইহা কোথায অর্থাৎ কোন ঘাটে সম্পন্ন হইবে তাহা নির্ভব করে মনের আপেক্ষিক স্থিতির উপর। যাহার মন অত্যন্ত অধিক স্থূল সংস্কাব-সম্পন্ন এবং অধোদেশে অবস্থিত, সে অধোদেশেই ঐ ধারাকে প্রাপ্ত হয এবং ঐ স্থানেই মনের সহিত ধারার যোগ হয়। তাহার পর ধাবা ঊর্ধ্বগামী হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও যুক্ত আছে বলিযা ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাহার মন জন্মান্তরীণ সাধনাভ্যাসের ফলে অথবা ভগবৎকৃপায় কিংবা মহাপুরুষের অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং ঊর্ধ্বস্তরে অবস্থিত তাহার পক্ষে ঐ ধারার সহিত সংযোগ কতকটা ঊর্ধ্বপ্রদেশেই হইয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মন যখন সকলেরই চঞ্চল, এবং একাগ্র বা স্থির মন ভিন্ন স্রোতের সহিত যোগ হওয়া সম্ভবপর নহে তখন মনের এই আপেক্ষিক স্থিতি নির্দেশের সার্থকতা কি? ইহাব উত্তর এই যে, মন চঞ্চল হইলেও, যখন ঐ চঞ্চলতা দূরীভূত হয় তখন মনের স্থিতি সমরূপেই সকলেরই হয় সত্য, কিন্তু উহা একস্থানে হয় না। সংস্কার বা বাসনাব ক্রমশুদ্ধির প্রভাবে মনের স্থিতি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বপ্রদেশে হইতে থাকে। অতএব চঞ্চল মন স্থির হইলে এই মনের শুদ্ধতার তারতম্য অনুসাবে 'শূন্যের প্রদেশ বিশেষে' মন স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। এই 'শূন্য প্রদেশে'ব নাম 'হৃদয়', যেখানে বায়ুর ক্রিয়া নাই। মনের এইরূপ বিশেষ স্থিতিস্থান হইতেই তাহার ঊর্ধ্বমুখ গতি আরম্ভ হয় অর্থাৎ নাদ স্রোতের সহিত মনের যোগসিদ্ধ হয়।

হৃদয় নামক বিরাট শূন্য প্রদেশে কোনপ্রকাব তারতম্য না থাকিলেও সূক্ষ্ম তারতম্য রহিয়াছে। যেটি ইহাব কেন্দ্রস্থান তাহাই 'মহাশূন্য'। তাহাতে সংস্কার বা বাসনা সূক্ষ্মভাবেও কার্য করে না। কিন্তু মহাশূন্যরূপ কেন্দ্রস্থান বা মধ্যবিন্দু হইতে শূন্যপ্রদেশের ব্যবধানের মাত্রা যত বাড়িতে থাকে ততই সূক্ষ্ম-সংস্কারের মাত্রা বাড়িতে থাকে। অতএব, যাহার মন যতটা শুদ্ধ অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত তাহার মন স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে হৃদয়ের ঐ শূন্য প্রদেশের তদনুরূপ স্থানেই স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। মহাশূন্যে স্থিতি মহাযোগী ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সংস্কারের মাত্রানুসারে মনের স্থিতি অনুযায়ী নাদের ঊর্ধ্বমুখ প্রবাহ ঐ বিশিষ্ট শূন্য প্রদেশ হইতেই উত্থিত হয়। মহানাদের প্রবাহ মহাশূন্য হইতে উত্থিত হয়। এইখানে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মূলাধারাদি ষটচক্রের যে কোন চক্রেই বা ঘাটেই মন স্থিত হউক

না কেন, স্থিত হয় বস্তুতঃ ঐ হৃদয়াত্মক শূন্যপ্রদেশের স্থল বিশেষে। অবশ্য তেমন অধিকারী হইলে কেন্দ্র বা মহাশূন্যেও যে মনের স্থিতি না হইতে পারে এমন নহে।

শক্তির ধারাটি যেখান হইতে উত্থিত হয় পুনর্বার সেইখানে যাইয়া উহা লীন হয়। ইহা স্বভাবেব নিয়ম। কিন্তু মনের সঙ্গে যোগ না হইলে এই প্রত্যাবর্তনটি অলক্ষ্যপথে সম্পন্ন হয়। সৃষ্টি ও তদনন্তর সংহাব অজ্ঞানের রাজ্যে এইভাবেই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে এই সৃষ্টি-সংহার চক্রের অতীত হইয়া সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করা যায়। কিন্তু তাহা চৈতন্যের উপলব্ধি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অর্থাৎ শক্তিধারার সঙ্গে মনের যোগ হওযার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধারা উজানে বহিতে থাকে। নাদরূপে ঐ ধাবার উপলব্ধি হয। নাদাবস্থা প্রাপ্তি বিন্দুভাবেব পূর্ব সূচনা। বিন্দুর বিক্ষিপ্ত অংশই নাদ। সুতরাং যখন এই বিক্ষিপ্ত অংশরূপী নাদ ঊর্ধ্ব আকর্ষণের প্রভাবে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অর্থাৎ একাগ্রতার পূর্ণবিকাশে বিন্দুরূপ ধারণ করে তখনই চৈতন্য বা উপলব্ধি কেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আত্মজ্ঞানের নামান্তর। নাদের যেমন তারতম্য আছে অথচ মহানাদরূপে সবই এক তদ্রূপ আত্মজ্ঞানেরও তারতম্য আছে—তথাপি সকল তাবতম্যের মধ্যেও স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। এইজন্যই মহাশূন্য হইতেই মহাজ্ঞানের মার্গ প্রাপ্ত হওযা যায় এবং মহানাদই এই মার্গে ঊর্ধ্বগতির সূচনা করিয়া থাকে।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয, তাঁহার পত্রাবলীব ১ম খণ্ডের ২১ নং পত্রে 'হৃদয' সম্বন্ধে যাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাও এখানে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করিযা দিলাম—

হৃদয় শব্দে কোন্ বস্তুটিকে বুঝায় তাহা সাধক মাত্রেরই জানিয়া রাখা আবশ্যকে। কাবণ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সকল মার্গেই হৃদয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে ঠিকভাবে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায না। প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ দহরবিদ্যা নামে এই হৃদয়-বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিতেন। হৃদয়টি যে আকাশস্বরূপ তাহা দহরাকাশ এই শব্দ দ্বারাও তাঁহারা ইঙ্গিত করিয়া গিযাছেন। ইহাই অন্তরাকাশের নামান্তর। বাহিরে যেমন বিশাল আকাশ প্রতীতিগোচর হয় তেমনি দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইলে ভিতরেও বিশাল অনন্ত আকাশের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই আকাশটিই হৃদয় নামে পরিচিত। দৃষ্টি যখন বহির্মুখ থাকে তখন ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ যে আকাশে প্রতিভাসমান হয় তাহাই বাহ্যাকাশ। তদ্রূপ দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইলে দৃশ্যপ্রপঞ্চ যে আকাশে পরিস্ফুরিত হয় তাহাই অন্তরাকাশ বা হৃদয়রূপী আকাশ।

এই হৃদয় আকাশে ইষ্টের স্ফুরণ হইয়া থাকে। যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততদিন হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন থাকে। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং স্বচ্ছ প্রকাশরূপে অন্তরদৃষ্টির সম্মুখে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়। ইহার পর স্বচ্ছ আকাশে জ্যোতির আবির্ভাবই জ্ঞানের সূচনা করে।

এই যে হৃদয়-আকাশের কথা বলা হইল, উপনিষদ্ ইহাকে পুণ্ডরিক অথবা কমল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যতদিন এই কমল প্রস্ফুটিত না হয় ততদিন অন্তঃকরণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। সাধনার দ্বারা হৃদ্‌কমল প্রস্ফুটিত হইলে হৃদয়াকাশ আলোকিত হয় এবং ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। এই হৃদয়রূপী আকাশ অথবা পদ্মই ইষ্টদেবতার অর্থাৎ ভগবানের আসন। 'গীতা'ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুনতিষ্ঠতি। ভ্রাময়ণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢাণি মায়যা"। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্যামী পুরুষরূপে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি ঐ শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তি দ্বারা দেহকে নিরন্তর চালনা করিতেছেন। দেহের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মূলে হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তমের প্রেরণা ভিন্ন অন্য কোন কারণ বর্তমান নাই। অহংকারে আবিষ্ট জীব মনে করে সেই তাহার যাবতীয় জ্ঞান ও ক্রিয়ার কর্তা অর্থাৎ সেই জানে এবং সেই করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহার অভিমান মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, সে জানেও না বা করেও না। সে শুধু দ্রষ্টামাত্র। যাবতীয় জ্ঞান ও ক্রিয়া মায়াশক্তির খেলা মাত্র। এই মায়া-রূপিনী শক্তির আশ্রয় এবং অধিষ্ঠাতা হইলেন জীবের হৃদয়াস্থিত অন্তর্যামী পুরুষ। এইটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীব কর্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

এই হৃদয়কে উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা প্রাপ্ত হইবার জন্য অসংখ্য পথ রহিয়াছে। যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত স্থিতি অনুসারে যে কোন পথ ধরিয়া এই হৃদয়রূপী শূন্যে উপনীত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হইতে দেহের বহির্ভাগে বাহ্য বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি বিস্তৃত রহিয়াছে। জীব দেহত্যাগ করিয়া বাহিরে সঞ্চরণ করিবার সময় ঐ সকল মার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে। তদ্রূপ ঐ ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হইতে দেহের অভ্যন্তরেও অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি জালের মত বিকীর্ণ রহিয়াছে। সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রকোপ এবং বৈষম্যবশতঃ এই সকল নাড়ী জটিল এবং কুটিল আকার ধারণ করিয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্যই এই জালটিতে অসংখ্য গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে চিত্তগ্রন্থি বলে। ঐ জালের তারগুলিও সরল এবং সমসূত্র নহে। এইজন্যেই চিত্তে নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ত বৃত্তির উদয় হয়। যখন সাধনারূপ ক্রিয়াকৌশলে অথবা ভাবনার প্রভাবে

অথবা জ্ঞান বা ভক্তিতে নিষ্ঠার ফলে ভিতরে তীব্র তেজের আবির্ভাব হয় তখন ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রশ্মি সংযত হইয়া এবং বক্রতা পরিহারপূর্বক একাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ গ্রন্থিগুলিও শিথিল হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে গ্রন্থিহীন, জটিলতা এবং কুটিলতাহীন, বক্রতাহীন—-একটি সরল পথ খুলিয়া যায়, যাহাতে ভীম বেগে গর্জন করিতে করিতে শক্তিপ্রবাহ উত্থিত হইতে থাকে। এই শক্তির ধাবা যেখানে পর্যবসিত হয় তাহাই শূন্য স্থান বা হৃদয়াকাশ। সমস্ত শক্তিপ্রবাহ নিঃশেষ হইয়া গেলে বায়ুর ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয এবং মনেরও ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয—ইহাই হৃদয়ে স্থিতি। এখান হইতেই মন্ত্ররূপে চৈতন্যশক্তি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ ভগবদ্ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ঊর্ধ্বগতিব অবস্থা।

পর্বকথিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায যে মনুষ্যের বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া যেখানে উপবত হয় তাহাই হৃদয। যদি সেই অবস্থায সাধক নিজেকে জাগ্রতভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে তাহা হইলেই মন্ত্রচৈতন্য উপলব্ধি হইবে, নতুবা উহা সুষুপ্তির নামান্তব।

ম. ম. গোপীনাথ কবিবাজ মহাশয়েব উদ্ধৃত প্রবন্ধ দুইটির তাৎপর্য হইল এই যে, চৈতন্যশক্তি ভৌতিক দেহকে আশ্রয কবিয়া দুইভাবে প্রকাশিত হইযা থাকে। প্রথমতঃ দেহসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই 'চৈতন্য' তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহেতে আত্মাভিমানপূর্বক জীবভাবে প্রকাশিত হইযা থাকে। তখন ঐ দেহ বা দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অবলম্বন করিযা জীবের মধ্যে ভ্রান্ত আমিত্বের বা অহং অভিমানের বিকাশ হয, এই অশুদ্ধ মাযামুগ্ধ অহং অভিমান বা অহংকারের ক্রিযাই জীবভাবেব খেলা।

অপরদিকে 'চৈতন্য' জীবভাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেহেব সঙ্গে কোনপ্রকার সংস্রব বা লিপ্তভাব না রাখিয়া দেহ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্রিযাদির 'দ্রষ্টারূপে' দেহমধ্যে অবস্থান কবে। এই দ্রষ্টা বা সাক্ষী চৈতন্য পরমাত্মারই অপব দিক যাহা শুদ্ধ এবং অভিমানশূন্য। পূর্বোক্ত জীবাত্মা ভোক্তা আর এই দেহস্থ নির্লিপ্ত পরমাত্মা শুধুই দ্রষ্টা। এই যে দেহস্থ নির্লিপ্ত পবমাত্মা, ইনিই অন্তর্যামী পুরুষ। ইনি দেহমধ্যেই আছেন অথচ সাক্ষাৎভাবে দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—ইনি শুধু দ্রষ্টা। ইনি ভিতর হইতে শুধু দৃষ্টি দিতেছেন এবং সেই দৃষ্টিব প্রভাবে দেহরূপ যন্ত্র চালিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষের দৃষ্টি ভিন্ন জড়দেহ ক্রিযাশীল হইতে পারে না। দেহের ও মনের যাবতীয় বৃত্তির মূলে অন্তর্যামীর দৃষ্টিরূপ রশ্মিব যোগ রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও অন্তর্যামীকে দৈহিক কার্যের কর্তা এবং ঐ কার্যের ফলের ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। কারণ একদিকে যেমন তাঁহার কর্তৃত্বের অভিমান নাই,

অপরদিকে তেমনি তাঁহার ভোক্তৃত্বেরও অভিমান নাই। তিনি আমিত্বহীন চিদাত্মক সাক্ষী-পুরুষ। কিন্তু তিনি কর্তা না হইলেও সকল কর্তৃত্বের মূল তাঁহাতেই রহিয়াছে। এই যে দৃষ্টিরূপ রশ্মিটির কথা বলা হইল উহা দ্বারাই সমস্ত জীবের দেহের সমস্ত ক্রিয়া প্রতিটি জীবের আধার ও প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই অন্তর্যামী পুরুষই দৈহিক প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা; কিন্তু অহংকারমুগ্ধ জীব নিজেকেই সর্বকার্যের কর্তা মনে করিয়া কর্মফল ভোগে বাধ্য হয় এবং সংসারে বদ্ধ হয়। ভ্রান্ত অহংবুদ্ধি সম্পন্ন মায়াবদ্ধ জীবের এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতাতে বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

(গীতা, ১৮ অঃ ৬১ শ্লোক)

সর্বভূতের মধ্যে যে ঈশ্বরের সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে তাহাই এই শ্লোকটিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই অন্তর্যামী পুরুষরূপ ঈশ্বর দেহের মধ্যে কোন্ স্থানে আছেন? এবং জীব তাঁহাকে কোন্প্রকারে পাইতে পারে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সমস্ত দেহের মধ্যে যেটি শূন্যস্থান যেখানে কোনপ্রকার বাসনারূপী বায়ুর তরঙ্গ উত্থিত হয় না, যাহা স্থির, যাহা আকাশসদৃশ নির্মল ও নিষ্কম্প, সেই শূন্যস্থানেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই স্থানটিকে 'হৃদয়' বলে। এই হৃদয়রূপ নির্মল শূন্য স্থান হইতে পরমাত্মার শক্তি দেহের সর্বত্র নাড়ীসংযোগে স্থূল সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয় এবং দেহকে চালনা করে। ইহাই মায়াযন্ত্রের ব্যাপার আর অন্তর্যামী ঈশ্বরই মায়াযন্ত্রের যন্ত্রী।

যখন শক্তি জাগিয়া উঠে অর্থাৎ জীবের বহির্মুখ গতি অন্তর্মুখী হয় এবং অন্তর্মুখ গতিরও যখন অবসান হয় তখন হৃদয় হইতে যে গতির সূত্রপাত হয় তাহা ঊর্ধ্বমুখ গতি। এই ঊর্ধ্বমুখ গতি হইল সাধকের জাগ্রৎ ও একাগ্রীভূত চৈতন্যশক্তি যাহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া যোগীর পরব্রহ্মের অভিমুখে যাত্রা সুরু হয়। কিন্তু যতক্ষণ হৃদয়াকাশে নিজেকে সাক্ষী অথবা দ্রষ্টারূপে বা মুক্তরূপে না পাওয়া যায় ততক্ষণ ভগবদভিমুখী গতি আরম্ভই হয় না।

সাক্ষীরূপী আত্মা অর্থাৎ জাগ্রৎ জীবন্মুক্ত আত্মা হৃদয়াকাশে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তাহার জাগরণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই পড়িয়া থাকে। হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ওখানে খুঁজিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় না। সুষুপ্তি অবস্থায় মন স্বভাবতঃই হৃদয়কে আশ্রয় করে। জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় মন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয় না। যদি মন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেই আত্মার জাগরণ সিদ্ধ হইত তাহা হইলে জীবের সুষুপ্তির এবং 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি'র মধ্যে কোনও পার্থক্য

থাকিত না। জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়মন্দিরে ইষ্ট বা আত্মা কাহাকেও পাওয়া যায় না। ততদিন পর্যন্ত আত্মশক্তি সুপ্ত হইয়া মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। মনের অন্তর্মুখ গতি সিদ্ধ না হইলে সুপ্ত আত্মশক্তির জাগরণ হয় না এবং আত্মজ্ঞানেরও বিকাশ হয় না।

শক্তির জাগরণেই সংসার-নিবৃত্তি। মানুষ নিদ্রিত হইলে যেরূপ সংস্কারবশতঃ স্বপ্ন দর্শন করে, ঠিক সেইপ্রকার চৈতন্যশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীর সুপ্তাবস্থায় মানবের যা কিছু জ্ঞান বা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সবই স্বপ্নবৎ। উহা চৈতন্যের দ্বারা হয় না, আভাসচৈতন্য দ্বারা হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে ক্রমশঃ এই আভাসচৈতন্য যথার্থ চৈতন্যে পরিণত হয়। তখন এই দীর্ঘ সংসাররূপী স্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়। কারণ নিদ্রা ব্যতিরেকে যেমন স্বপ্ন হয় না তদ্রূপ চৈতন্যশক্তি সুপ্ত না থাকিলে সংসাররূপ স্বপ্ন দর্শন হইতে পারে না। সুতরাং শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুপাতে সংসারের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। পূর্ণ জাগরণের উৎকর্ষে সমগ্র জগৎই চিদাত্মার স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রতীত হইবে। অজ্ঞানকল্পিত জগৎ তখন আর থাকিবে না।

শক্তির জাগরণের জন্য প্রয়োজন দীক্ষার। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। কাষ্ঠে কাষ্ঠে তীব্র সংঘর্ষণ হইলে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দেহে চৈতন্যশক্তি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত। উহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে তীব্র সংঘর্ষ আবশ্যক। এই তীব্র সংঘর্ষই ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার। যাহাকে দীক্ষা বলা হয় এবং দীক্ষা জনিত নাম বা মন্ত্রের তীব্র অনুশীলন বুঝায় তাহাই ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়ার তীব্র সংঘর্ষ ব্যতিরেকে ঘুমন্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার আর কোন উপায় নাই।

জাগ্রত আত্মচৈতন্য ও মহাচৈতন্য—সদ্‌গুরুর কৃপায় হউক বা ভগবানের করুণাধারায় স্নাত হইয়াই হউক যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে স্থায়ী জাগ্রত চৈতন্যের বিকাশ হয় অর্থাৎ স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা নহে, জাগ্রত থাকিয়াই যখন কোন ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয়, তখন সেই জাগ্রত চৈতন্যশীল ব্যক্তি সর্বব্যাপ্ত মহাচৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পায়। অর্থাৎ বৈন্দব বা চিন্ময় আলোর রাজ্যে সাধকের প্রবেশ হয়। এই মহাপ্রকাশরূপ জ্যোতির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ভাসমান। উপনিষদে এই মহাপ্রকাশকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—"ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। সবকিছুই অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই জ্যোতির মধ্যে ভাসমান্ থাকিলেও সাধকের নিকট তাহা প্রতিভাত হয় না। সাধক এক শুভ্র অনন্ত জ্যোতি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। এইরূপ অবস্থায় যদি সাধক-চিত্তে কোন কিছু দেখিবার ইচ্ছার উদয়

হয়, তবে তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষণের মধ্যে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ-গোচর হয় এবং ইচ্ছার নিবৃত্তিতে তাহা মিলাইয়া যায়। অর্থাৎ বিম্ব আছে, সাধকের ইচ্ছার সাথে সাথে তাহা দর্পণে প্রতিবিম্বনের ন্যায় সেই শুভ্র জ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই সাধকের নিকট 'ইদং'রূপে প্রতিভাত হয়। এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এই যে সবকিছুই সাধকের ইচ্ছার পূরণরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা কোথায় হয়? তাহা হয় মহাশূন্যে যাহাকে সাধকের 'চিদাকাশ'ও বলা হয়। এরূপ অবস্থায় তিনটি সত্তার অবস্থান দৃষ্ট হয়—প্রথমে জাগ্রত চৈতন্যে অবস্থিত সাধক, মধ্যে আধেযরূপে বা পাত্ররূপে অনন্ত মহাশূন্য বা চিদাকাশ এবং উপরে সীমাহীন মহাপ্রকাশ। জাগ্রত চৈতন্য হইল সাধকের আত্মচৈতন্য। মায়িক জগতে এই আত্মচৈতন্য মায়া-প্রমাতা বা পরিচ্ছিন্ন প্রমাতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অশুদ্ধ চিত্তের আকারে মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। মায়া-প্রমাতারূপ অশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা আবৃত হইয়া জীব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করে। আত্মার স্বরূপ বিস্মৃতির সুযোগে অশুদ্ধ চিত্ত মায়িক জগতে মানুষের মধ্যে দেহাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তোলে। দেহাত্মবোধের ফলে যে অশুদ্ধ অহং-জ্ঞানের উদয় হয় তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাসনা-কামনা অর্থাৎ সম্ভোগ-তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া কর্ম করে। ইহার ফলে কর্ম-সংস্কার সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত কর্ম-সংস্কারই 'প্রাক্তন' বা 'প্রারব্ধ' নামে কথিত। বর্তমান জীবনে প্রারব্ধ কর্মের যে ফলভোগ হয় তাহাকেই 'ভাগ্য' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। কারণ, কর্ম-সংস্কারই জীবের জন্ম-জাতি-আয়ু নির্ধারণ করে। কালের বর্তুল-প্রবাহ বা আবর্তন জনিত বীজাকারে সঞ্চিত অসংখ্য সংস্কারের মধ্যে যেগুলি পরিপক্ক হইয়া ফলোন্মুখ হয় তাহাই প্রারব্ধরূপে জীবজন্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইরূপে প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব পর্যায়ক্রমে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক বৎসরে ষড়ঋতুর আবর্তন হইতেছে। প্রত্যেক ঋতু উহার বৈশিষ্ট্য লইয়া বৎসরে বৎসরে একই আকারে বারে বারে পুনরাগমন করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে আম্রফল ফলে। এই ঋতুর অবসানে আম্র-ফলনও বন্ধ হইয়া যায় এবং অন্য ঋতুতে ইহা ফলে না। আবার গ্রীষ্ম ঋতু ফিরিয়া আসিলে একই আম্রবৃক্ষ আবার আম্রফল ধারণ করে। ইহাকেই বলা হয় বর্তুলাকারে কালের আবর্তন। এইরূপে প্রতিটি মানুষের জন্ম-মৃত্যুও কর্মানুসারে কালের আবর্তনে বর্তুলাকারে বিঘূর্ণিত হইতেছে। যখন কোন মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়, সদ্‌গুরু বা ভগবানের কৃপায় দেহাত্মবোধ বিনষ্ট হইয়া জাগ্রত আত্মচৈতন্যে অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চিদাকাশ বা মহাশূন্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এই মহাশূন্যও কালের অন্তর্গত,

কালের অতীত নহে। কিন্তু মহাশূন্য কালের মধ্যে অবস্থিত হইলেও এখানে কালের আবর্ত্তন নাই। কাল এখানে প্রশান্ত; যেমন সমুদ্রের উপরিভাগে তরঙ্গ-বিক্ষোভ, কিন্তু তলদেশ প্রশান্ত গম্ভীর। আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ সাধক এই প্রশান্তবাহী মহাকাল বা মহামায়ার অধিকারভুক্ত হয়। যেহেতু এখানে কালের কোন আবর্ত্তন নাই, সেইহেতু প্রবুদ্ধ সাধকও নিত্যকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু সাধক সম্পূর্ণ কালের অতীত হইতে না পারিলে পরমবস্তু মহাপ্রকাশকে লাভ করিতে পারে না। যদিও মহাপ্রকাশ জাগ্রত-চৈতন্য সাধকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত, তথাপি মধ্যে অসীম মহাশূন্যতা উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে। অনেক সাধক এই মহাশূন্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া এইখানেই থাকিয়া যায়। বৈষ্ণবদের ভাষায় বলা যায়, এই মহাশূন্যই বিরজা নদী বা কালিন্দী—কাল-নদী। মহাশূন্যের এপারে অবস্থিত প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড 'ইদং'রূপে ভাণ হয়। অর্থাৎ সাধকের 'অহং' ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ 'ইদং'-এর মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু কোন প্রবুদ্ধ সাধক যদি তীব্র সাধনার বলে মহাশূন্যকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে জাগ্রত আত্মচৈতন্য মহাপ্রকাশরূপ মহাচৈতন্যে পরিণত হয়। জাগ্রত আত্মচৈতন্য ও মহাচৈতন্য পরস্পর relative। আত্মচৈতন্য জাগ্রত বা প্রবুদ্ধ হইলেই মহাচৈতন্য বা মহাপ্রকাশের আবির্ভাব হয়, মায়াপাশ ও কর্মপাশে আবদ্ধ দেহাত্মাভিমানী জীবের নিকট তাহা প্রকটিত হয় না।

প্রবুদ্ধ সাধক যে মুহূর্ত্তে মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া মহাচৈতন্যে পরিণতি লাভ করে, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ 'অহং'-এর বিকাশ হয়। কারণ, মহাচৈতন্য বা মহাপ্রকাশই তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও উহার অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বস্তুর নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—"ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। মহাপ্রকাশ ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা বা অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না। সাধক যখন মহাচৈতন্য লাভ করে তখন তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ 'অহং' স্ফুরিত হয় এবং সেই শুদ্ধ 'অহং'জ্ঞানে দেখিতে পায় সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই কলেবর—তিনিই সবকিছু হইয়াছেন। তখন 'ইদং' লুপ্ত হইয়া যায়—সব 'অহং'ই 'অহং'। ইহাই শুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন অহন্তা। এই অবস্থায় উপনীত হইলে যথার্থ 'মহানাদে'র মধ্যে প্রবেশ হয়। তখন যে অনাহত নাদধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে তাহাই কালিন্দীর তীরে শ্যামের বংশী-ধ্বনি।

নাদের তিন অবস্থা—অপরনাদ, মহানাদ ও পরনাদ। এখানে ওঁকারের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ওঁ—অ, উ, ম এবং অর্দ্ধ তন্মাত্রা। অ, উ, ম হইল সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের প্রতীক—ইহা আবর্ত্তনশীল কালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জাগ্রত চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হওয়ার অর্থ কালরাজ্যের অতীত হওয়া। কালরাজ্যের

অতীত হইলেই অর্দ্ধতন্মাত্রার বিকাশ হয়। অর্দ্ধতন্মাত্রা হইল 'চিৎ উজ্জ্বল মন বা চিত্ত'। চিৎ-উজ্জ্বল মন বা চিত্ত হইল শুদ্ধ বিদ্যা উদয়ের দ্যোতক (অভিজ্ঞান)। এতদিন মন ছিল অশুদ্ধ বিদ্যা বা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং আবর্ত্তনশীল কালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অশুদ্ধ মায়া উঁহার বিক্ষেপণ-শক্তি দ্বারা মানব-মনকে মায়িক জগতে মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। মায়ার দুই শক্তি (functions): একটি আবরণ, অপরটি বিক্ষেপণ। আবরণ-শক্তি দ্বারা শিবকে পশুতে পরিণত করে এবং বিক্ষেপণ-শক্তি দ্বারা সেই মানব-পশুর মনকে মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া রাখে। অশুদ্ধ মায়াব অতীত হইলে অর্থাৎ অশুদ্ধ বিদ্যাব কবল হইতে অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধ বিদ্যার উদয়ে মনও মালিন্যশূন্য হইয়া চিন্ময় হয় এবং চিন্ময় মহামায়াব আলোর রাজ্যে প্রবেশ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই চিৎ-উজ্জ্বল মনই অর্দ্ধ তন্মাত্র। এখন হইতে প্রকৃত উপাসনার আরম্ভ হয। উপাসনা অর্থে 'উপ' অর্থাৎ নিকটে আসীন। ইহার অর্থ জাগ্রত চৈতন্যে প্রবুদ্ধ যোগীর তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত মহাপ্রকাশকে অনিমেষ লোচনে দর্শন করা এবং মহাপ্রকাশের সহিত যুক্ত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া। উৎকণ্ঠা যতই তীব্র হইবে ততই মহাপ্রকাশের নিকটবর্তী হইতে থাকিবে এবং ততই মন ক্ষীণ হইতে থাকিবে। অর্থাৎ অর্দ্ধ তন্মাত্রা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইবে। মধ্যে যে নিরোধিকা (ব্যাপিকা, বিরজা বা কালিন্দী নদী) অন্তরায় রূপে বিরাজিত, যোগীর তীব্র উন্মুখীনতার প্রাবল্যে তাহা ভেদ হইয়া যায়। ভেদ হইলেই যোগী মহাপ্রকাশের সাযুজ্য লাভ করে। মহাপ্রকাশ ঘনীভূত হইয়া যোগীর ইষ্ট দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে। মাতৃসাধকের নিকট মাতৃরূপে, ভক্ত যোগীর নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে, পরমপিতার সাধকের নিকট 'God, the father' রূপে আবির্ভূত হন। এইভাবে ভক্ত-সাধক ভগবানের সাযুজ্য লাভ করে। এই অবস্থায় মন বা অর্দ্ধ তন্মাত্রার কোন অস্তিত্ব থাকে না। নিরোধিকা ভেদ করিবার পূর্ব পর্যন্ত মন অতি ক্ষীণ সূক্ষ্মাকারে থাকে। যোগীর মনের এই অবস্থাকে কাশ্মীরী শৈবাগমে 'সমনা' বলে। যেই নিরোধিকা ভেদ হইয়া যায়, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন এপারে পড়িয়া থাকে। মনের অতীত হইয়া যোগী তাঁহার ইষ্টদেবতার সাযুজ্য লাভ করে। যোগীর মনের অতীত অবস্থাকেই কাশ্মীরী শৈবাগমে বলা হইয়াছে 'উন্মনা'।

ভগবানের সাযুজ্য লাভ করাই হইল প্রকৃত 'যোগ'। এইবার ভক্ত যোগী একবার ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহিরে আসে। ভগবানও ভক্তের মধ্যে অনুরূপভাবে প্রবেশ করেন ও বাহির হন। এইরূপ পর্যায়ক্রমে চলিতে থাকে যতক্ষণ না ভক্ত ও ভগবানের সত্তা একই পর্যায়ে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও এক গ্লাস গরম জল লইয়া

ঢাল-উপর করিতে করিতে একসময় উভয় গ্লাসের জল সমতা (neutralised) প্রাপ্ত হয়।

প্রতিবার ভক্ত যখন ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসে, তখন ভগবানের কিছু অংশ ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। আবার ভগবান যখন কৃপাবশতঃ ভক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ভক্তের মধ্যে তাঁহার সঞ্চারিত শক্তিকে আরও স্ফুটতর করিয়া বাহিরে আসেন। এইরূপ পর্যায়ক্রমে যখন অবস্থান্তর চলিতে থাকে তখন তাহাকেই বৈষ্ণব, আগম ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় যুগল, যামল ও যুগনদ্ধ রূপ বলা হয়। যখন ভগবান্ ও ভক্ত এক হইয়া যান, তাহাকে 'সামরস্য' বলে। সামরস্য লাভের পর যদি কোন ভক্ত-যোগীর মধ্যে রসাস্বাদনের ইচ্ছা প্রকট থাকে, তখন ঐ একই সত্তা ভগবানরূপী 'তুমি' ও ভক্তরূপী 'আমি'তে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ 'আনন্দস্বরূপ' ও আনন্দের আস্বাদনীশক্তি 'হ্লাদিনী'তে পরিণত হইয়া অর্থাৎ প্রেমের 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' হইয়া লীলাবৈচিত্র্যের অবতারণা করেন।

চিদাকাশ-চিত্তাকাশ-ভূতাকাশ—প্রাসঙ্গিকক্রমে আমি এখানে চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লইতেছি। নানা প্রসঙ্গে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাদের পার্থক্যের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া এবং তাঁহার লেখা পড়িয়া আমার যাহা উপলব্ধি হইয়াছে তাহাই নিম্নে বিবৃত করিলাম।

পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণচিৎ হইতেই চিদাকাশের প্রকাশ। কিন্তু ইহার প্রকাশ ঘটায় চিৎশক্তি। অর্থাৎ পূর্ণচিৎ হইতে চিদাকাশের আবির্ভাব চিৎ-শক্তির উন্মেষ এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ। চিৎশক্তির ক্রিয়া ব্যতিরেকে পূর্ণচিৎ হইতে চিদাকাশের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। পূর্ণচিৎ ও চিদাকাশের মধ্যাবস্থা হইল চিৎশক্তি। চিৎকে যদি স্বরূপ ধরা যায় তাহা হইলে চিৎশক্তি তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি এবং চিদাকাশ তাঁহার বৈভব। মৌলিক ক্রম এইরূপঃ চিৎ—চিৎশক্তি—চিদাকাশ।

আমরা সাধারণতঃ অন্ধকারময় ভূতাকাশে অবস্থান করি। এটা অন্ধকারের রাজ্য, তাই হৃদয়াকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইহাই অজ্ঞানের নিদর্শন। কিন্তু যখন ভিতরে জ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠে তখন অন্ধকারের পরদা সরিয়া যায়। যখন হৃদয় হইতে অন্ধকার চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায় তখন একমাত্র আলোকময় আকাশই ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হয়। ইহাই চিত্তাকাশ। শুদ্ধ চিত্তে চিৎ-এর প্রতিফলন হইলেই আলোকের বিকাশ হয়—তাহারই নাম জ্ঞান। শুদ্ধ চিত্তে একমাত্র সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য। সুতরাং চিত্তে তখনও গুণময়ী প্রকৃতির

ক্ষীণ প্রভাব থাকে। চিত্তাকাশ হইতে সত্ত্বগুণের আলোকময় পরদা মধ্যে মধ্যে অপসৃত হইলেই ঐ রন্ধ্রপথে মুক্ত চিদাকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই দর্শন জ্ঞানচক্ষুর ব্যাপার, দিব্যচক্ষুর নহে। দিব্যচক্ষু শুদ্ধ চিত্তাকাশ এবং ঐ আকাশের অনন্ত বিভূতি দর্শনেই পর্যাপ্ত হয়। এখানে উল্লেখনীয় যে শ্রীমৎভগবৎ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানচক্ষু নহে। দিব্যচক্ষু চিদাকাশ দর্শনে সমর্থ হয না। চিদাকাশ দর্শন অভেদ দর্শন, কিন্তু চিত্তাকাশ ও উহার বিভূতি দর্শন ভেদাভেদ দর্শন—উভযে অনেক পার্থক্য। আর একটি কথা—দিব্যদর্শনে জ্যোতির প্রাধান্য, জ্ঞানচক্ষুব দর্শনে জ্যোতি থাকে না, থাকে মাত্র শুদ্ধ প্রকাশ।

চিত্তাকাশের আলোকময় পরদা মাঝে মাঝে অপসৃত হইলে যেমন চিদাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার ভূতাকাশেব অন্ধকারময পরদা মাঝে মাঝে সরিযা গেলে ঐ রন্ধ্রপথে আলোকিত চিত্তাকাশের দর্শন হয়। চিদাকাশের দর্শন ঊর্ধ্বনেত্রে, চিত্তাকাশের দর্শন মধ্যনেত্রে এবং ভূতাকাশেব দর্শন অধোনেত্রে হইয়া থাকে। চিদাকাশের দর্শনমার্গ ব্রহ্মরন্ধ্র, যাহা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট। চিত্তাকাশের দর্শনমার্গ ভ্রূমধ্য যাহা দিব্যচক্ষু দ্বারা দৃষ্ট এবং ভূতাকাশের দর্শনমার্গ ইন্দ্রিয়। দ্রষ্টা সর্বত্র সমভাবে পশ্চাতে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়ের দর্শন বা ভৌতিক দর্শন ভেদময়, শুদ্ধ মনের বা দিব্যচক্ষুর দর্শন ভেদাভেদময় এবং জ্ঞানচক্ষুর দর্শন অভেদময। ভূতশুদ্ধির ফলে চিত্তাকাশে এবং চিত্তশুদ্ধির ফলে চিদাকাশে প্রতিষ্ঠা হয়।

চিদাকাশই বিষ্ণুর পরমপদ—যাঁহার নিকট ইহা সদা প্রকাশিত, তিনি সূরি ও ব্রহ্মদর্শী। অখণ্ড মণ্ডলাকার রূপে ইহা দেহে অবস্থান কালেও প্রত্যক্ষ হয়। অখণ্ড মণ্ডলের একদেশে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় সমগ্র বিশ্ব অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হয়। অভিন্ন হইলেও শুদ্ধ বিকল্প দৃষ্টিতে অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টিতে ইহা ভিন্নাভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। অশুদ্ধ বিকল্প দৃষ্টিতে অর্থাৎ ভৌতিক দৃষ্টিতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ বিকল্প মহামায়ার বৈন্দব জগতের এবং অশুদ্ধ বিকল্প মায়িক জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। মহামায়া ও তদন্তর্গত শুদ্ধ ধামাদি স্তরসমূহ এবং মায়া ও মায়িক জগৎ—সবই বিশ্বের অন্তর্গত। ভগবৎস্বরূপে অর্থাৎ নির্বিকল্পক পরমপদে বিশ্ব তাঁহার সহিত অভিন্ন হইলেও অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাসরূপে অবস্থিত হইলেও বিকল্প ভূমিতে তাঁহা হইতে বিসৃষ্ট হয়। কিন্তু বিসৃষ্ট হইয়াও তাঁহাতেই সংসৃষ্ট থাকে। কারণ তিনি পরমাশ্রয় ভূমি। বিশ্বের শুদ্ধ বিকল্পময় মহামায়ার জগৎ চিত্তাকাশের অন্তর্গত এবং অশুদ্ধ বিকল্পময় অবিদ্যাচ্ছন্ন মায়িক জগৎ ভূতাকাশের অন্তর্গত। শুদ্ধ বিকল্পাত্মক জ্ঞানোদয়ে ভূতাকাশ আলোকিত হইলে যে চক্ষুর উন্মীলন হয় সেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা

অর্থাৎ তৃতীয় নেত্রের দ্বারা পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে গমনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আবার শুদ্ধ বিকল্পময় জ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে এবং গুণাতীত চিৎকলার উন্মেষ হইলে ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব ছিদ্রপথে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বরশ্মি বা অমৃতরশ্মি যোগে চিদাকাশে প্রবেশ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এই অমৃতরশ্মি বা অমৃতনাড়ীর ক্রিয়াই 'পরাভক্তি' নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। পরাভক্তি ব্যতিরেকে চিদাকাশে অভেদস্থিতি হইতে পারে না।

চিদাকাশে প্রবেশ করিলে আর মর্ত্য দর্শন হয় না। কারণ উহা ব্রহ্মনির্বাণ অবস্থা। শুধু তাহাই নহে। ওখান হইতে চিদাকাশেরও দর্শন হয় না—ভূতাকাশ তো দূরের কথা। কিন্তু চিদাকাশে চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ উভয়ই থাকে অভিন্নভাবে, চিদাত্মকরূপে, ব্রহ্মরূপে। এইরূপ ব্রহ্মদর্শন বস্তুতঃ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতি। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মের অভিন্নতার বোধই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান। চিদাকাশ শব্দব্রহ্মের নামান্তর। এখানে দ্রষ্টা পরব্রহ্ম এবং দৃশ্য চিদাকাশ বা শব্দব্রহ্ম। উন্মনা শক্তির উন্মেষ বশতঃ ভগবদনুগ্রহে বা পরাভক্তির প্রভাবে চিদাকাশে প্রবিষ্ট হইলে পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মের অথবা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের নিত্য সামরস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই স্বাতন্ত্র্যময় বোধস্বরূপ আত্মা বা পূর্ণব্রহ্ম। ইহা অদ্বয়তত্ত্ব, সকল তত্ত্বের অতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বময় পরমতত্ত্ব।

লীলাতত্ত্বের দিক হইতে পূর্ণচিৎ, চিচ্ছক্তি ও চিদাকাশের সম্বন্ধকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ণব্রহ্মে বা পূর্ণচিৎ-এ স্বাতন্ত্র্যময় চিৎশক্তির উল্লাস হইলেই চিদাকাশের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ চিৎ-এর এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া চিদাকাশও নিত্য আবির্ভূত। অর্থাৎ দ্রষ্টা যেমন নিত্য, তাহার দৃশ্যও তেমনি নিত্য—এ দৃশ্য দ্রষ্টারই স্বরূপভূত শক্তি, উভয়ই চিদেকরস। মহাশক্তির মধুর লীলায় একই অদ্বয় তত্ত্ব অনাদি দিব্য মিথুনরূপে, যুগলরূপে, যুগনদ্ধরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে—অথচ ইহা বিকল্পময় মনোরাজ্যের বা বিশ্বের ঊর্ধ্বে—কালের কলনাত্মক ব্যাপারের অতীত অবস্থা, a play as it were in the heart of Eternity.

চিৎশক্তির প্রকাশ আনন্দাত্মক। ইহা স্বরূপভূত আনন্দ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত আস্বাদন জীবই করিয়া থাকে। অথচ ইহাও সত্য—জীব জীবভাব লইয়া চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। নিগূঢ় রহস্য এই—জীব 'ভাব' হইতে 'অভাবে' যাইয়া পুনরাবর্তন করিতে পারিলে এই 'ভাব'ই তাহার স্বভাবরূপে পরিণত হয়। এইজন্য ভাবাবস্থার আনন্দ আস্বাদনাত্মক নহে, কারণ ভাবাবস্থায় অভাবের অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি থাকে না। ভাবাবস্থা হইতে অভাবে গিয়া দুঃখের অনুভব হইবার পর পুনর্বার ভাবাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে ওখানকার

স্বরূপভূত আনন্দকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। মোট কথা, প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অভাব অবস্থায় জীবভাব থাকে না, কিন্তু চরমাবস্থাতে জীবভাব আত্মস্বভাবে পরিণত হয় বলিয়াই প্রথমাবস্থায় যাহা ঠিক ঠিক আস্বাদিত হয় নাই, চরমাবস্থায় তাহা আস্বাদিত হইয়া থাকে।

পুনরায় আমাদের পূর্বের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। চিদাকাশ দর্শনের পর সেখান হইতে স্বেচ্ছাবশতঃ অবতরণের মুখে সম্পূর্ণ চিত্তাকাশ যুগপৎ দর্শন হয়—ইহাই বিশ্বদর্শন। এখানে বিশ্ব সমগ্রভাবে প্রকাশিত—ইহার মধ্যে ক্রম নাই। ইহার পর চিত্তাকাশে প্রবেশ হয় ও জীবরূপে চিত্তাকাশের মধ্যে সঞ্চরণ হয়। এখানে বিশ্ব-সৃষ্টির পর পর অবস্থাগুলি চিত্তাকাশে প্রবিষ্ট জীবের নিকট ক্রমশঃ অর্থাৎ ক্রমের পর ক্রম ফুটিতে থাকে। ক্রম হইতেই কালের মান নির্ণীত হয়। চিত্তাকাশ হইতে অবতরণ মুখে সম্পূর্ণ ভূতাকাশটি ঘোর অন্ধকারময় গোলক রূপে দৃশ্যমান হয়। এই অন্ধকারই মায়ার অন্ধকার। ইহার মধ্যে ঢুকিলে আত্মবিস্মৃতি পূর্ণতা লাভ করে, নিজের স্বরূপ জ্ঞান একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর মায়াগর্ভ হইতে প্রপঞ্চময় জগতে বাহির হইলেই ভেদজ্ঞানময় অবস্থা স্থায়ী হইয়া যায়। যতদিন ভূতাকাশে অবস্থান হইবে ততদিন এই ভেদজ্ঞান যাইতে পারে না। তবে জ্ঞানের আলোক বা দিব্যচক্ষুর বিকাশে চিত্তাকাশ দর্শনের অবস্থায় ভেদাভেদ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অভেদজ্ঞান চিদাকাশ ব্যতিরেকে হওয়ার উপায় নাই।

মূলে আকাশ একই। তাহা একটি অনন্ত প্রকাশময় ব্যাপকসত্তা—'আ সমন্তাৎ কাশতে'। তাহাকে কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ পরাশক্তি বলেন, কেহ পরশূন্য বলেন, কেহ পূর্ণ বলেন। তাহা বস্তুতঃ অবস্থাহীন হইলেও ব্যবহারতঃ অবস্থাভেদে বিভিন্ন আকাশরূপে বর্ণিত হয়। ভূতাকাশ হইতে ভূতাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশ হইতে গুণাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশ নির্মল—তাহাতে কোন আবরণ নাই। শৈবগণ চিদাকাশকেই 'চিদম্বর' বা 'উমা-হৈমবতী' বলিয়া অভিহিত করেন। পরব্রহ্ম ও পরাশক্তির সামরস্য অবস্থায় এই চিদাকাশেরও ভান থাকে না।

প্রসঙ্গতঃ 'শ্যামাদাস বাবাজী'র অনুভূতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যেভাবে তাঁহার অনুভূতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিযাছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

পুরীধামে শ্যামাদাস বাবাজীর সহিত কবিরাজ মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইনি (শ্যামাদাস বাবাজী) বাহ্যদৃষ্টিতে একজন চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী। তিনি যৌবনের শেষ দিকে তৈলঙ্গস্বামীর কৃপা পাইয়াছিলেন। তাছাড়া সময়ে সময়ে প্রভু জগবন্ধু এবং অন্যান্য বহু সাধুপুরুষের সঙ্গ ও

আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। যে ভাবেই হউক তাঁহার 'স্বভাব' জাগিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া নিজের স্বভাবের খেলা দেখিতেছেন। এই দেখার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কোন ভাব জড়িত নাই। একটা শান্ত আনন্দময় নির্লিপ্তভাব এই দেখার প্রাণ। তিনি অনেক গুহ্য অনুভূতি স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আমার নিকট কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক স্থিতির একটা পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঐ যে স্বভাবের কথা বলিলেন, উহাকে চিদাকাশ বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐটিকে একটি নীলবর্ণ মণ্ডলাকার আকাশের মতন তিনি অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদা দেখিতে পান। যখন বস্তুভাবে লিপ্ততা আসে তখন অবশ্য উহা দেখিতে পান না, আবার কিছুক্ষণ পরেই যেমন পূর্বে দেখিতেন তেমনি দেখিতে থাকেন। পক্ষান্তরে ঐ আকাশে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে বাহ্যভাবে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নিজের প্রকৃতির—মনঃ প্রভৃতির—সব খেলাই ঐ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা বিবিক্তদর্শন বলিয়া দ্রষ্টাকে রঞ্জিত করিয়া ভোক্তার রূপে পরিণত করিতে পারে না। তাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই তিনি নিজের স্বভাবটিকে স্পষ্ট দেখিতে পান। স্বভাবের মধ্যে নিরাকার আকাশকে দেখেন, আবার ঐ নিরাকার আকাশের মধ্যে জাগতিক যত খেলা সব দেখেন—অথচ এই দেখাতে কোনপ্রকার মোহের সংস্রব নাই। মাঝে মাঝে যে লিপ্ততার আভাস আসে তাহা পূর্বসংস্কারের অভিনয় মাত্র। এই সংস্কারটুকু শোধিত হইলে ঐ অভিনয়টাও আর থাকিবে না।

বাবাজী মহাশয় এখনও চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কারণ কখনও কখনও তিনি (অল্প সময়ের জন্য হইলেও) আত্মবিস্মৃতবৎ হন এবং দ্রষ্টার নিরপেক্ষ স্বরূপ হইতে যেন 'চ্যুত' হইয়া লৌকিক পুরুষের ন্যায় লিপ্ত ও বিবেকহীন ভাবপ্রাপ্ত হন। অবশ্য ইহা তাঁহার পূর্বসংস্কারের উদ্দীপন জন্য সাময়িক ভাব মাত্র। ক্ষণকাল পরেই তিনি বিবিক্ত সাক্ষিরূপে প্রত্যাগমন করেন। তখন স্বীয় আত্মপ্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকেন। ইহা একপ্রকার আত্মদর্শনেরই নামান্তর হইলেও বিশুদ্ধ আত্মদর্শন নহে। কারণ বিশুদ্ধ আত্মদর্শন একবার হইলে আর কখনও তাহা হইতে চ্যুত হওয়া যায় না। ব্যুত্থান অবস্থায় জগদ্দর্শনকালেও সেই আত্মদর্শন অনুস্যূত থাকে। আসল কথা এইঃ বাবাজী মহারাজ চিত্তাকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐখান হইতে মধ্যে মধ্যে—এমন কি অধিক সময়ই চিদাকাশের দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি এখনও চিদাকাশে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।" (দ্রঃ পত্রাবলী-১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫-৯৭)।

চিদাকাশ ও নিত্যলীলা—নিত্যলীলা চিদাকাশেরই ব্যাপার—চিত্তাকাশের বা ভূতাকাশের নহে। চিত্তাকাশে কর্মসংস্কার সঞ্চিত থাকে। সুতরাং ভূতাকাশ তো

বটেই চিত্তাকাশও মায়া দ্বারা কলঙ্কিত। মায়াতীত পদে আরূঢ় না হইলে নিত্যলীলার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিত্যলীলা জড়জগতের ব্যাপার নহে। চিন্ময়ধামেই উহার স্বাভাবিক স্ফূর্তি উপলব্ধ হইতে পারে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মহাজনগণ স্বরূপশক্তির উল্লাসরূপেই নিত্যলীলার বর্ণনা করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি যে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন অথচ শক্ত্যাত্মক। মায়া জড়শক্তি, তাই মায়িক প্রপঞ্চ মধ্যে নিত্যলীলা সম্ভব নয়। তান্ত্রিকগণও তাহাই বলেন। 'অনুত্তর' অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে শিবশক্তির পরস্পর ঔন্মুখ্য বশতঃ রসধারা উচ্ছলিত হইতে থাকে। এইখানেই রসস্ফূর্তিরূপ লীলার বিকাশ হয়। আগমে ইহাকে বিসর্গভূমি বলে। শিবশক্তির 'যামল'রূপ—যাহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'যুগল'রূপ এবং সহজযানী বৌদ্ধগণ 'যুগনদ্ধ'রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন—এই রসধারার প্রস্রবণস্বরূপ। ইহা ইচ্ছাশক্তি উন্মেষের পূর্ব অবস্থা। তন্ত্রমতে 'অ' ও 'আ'—একই সত্তার দুইদিক। 'ই'কার হইতেই বিশ্ববীজ 'ইচ্ছার' উদ্ভব। অ=অনুত্তর। আ=আনন্দ। 'অ' অনুত্তর পরপ্রকাশ মাত্র—ইহা শিবশক্তির অদ্বয়রূপ বা তত্ত্ব। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত। আর আনন্দ=প্রকাশরূপী শিব ও বিমর্শরূপী শক্তি। উভয়ের মিথুনীভাব বা পরস্পর অনুপ্রবেশ হইতে রসধারা উচ্ছ্বসিত হয়। এই রসধারা শৃঙ্গার বা আদিরসকে আশ্রয় করিয়া "বিবর্তবিলাস"রূপে খেলিতে থাকে। ইহার পর ইচ্ছার বিকাশক্রমে পর পর পরা, পরাপরা এবং অপরা শক্তিসকলের আবির্ভাব হয়। এইগুলিই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির রূপ। এই সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং লীলা চিত্তাকাশের বা ভূতাকাশের ব্যাপার নহে। শুদ্ধ চৈতন্য নিষ্ক্রিয় আর লীলা ক্রিয়াত্মিকা। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে শুদ্ধ চিৎস্বরূপে লীলার কোন স্থান নাই। ইহা ঠিক নহে। লীলা চিৎস্বরূপে অন্তর্নিহিত স্পন্দময়ী শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিলাস মাত্র—ইহার সঙ্গে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। ইহা ভগবৎস্বরূপের নিগূঢ় রহস্য। চিত্তাকাশে ইহা দেখিবার জিনিষ নহে, ভূতাকাশ তো কোন্ ছার। বাহ্যভাব থাকা পর্যন্ত ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সিদ্ধদেহে জীব মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার সঞ্চারীভাবস্বরূপা সখীগণের অনুগত হইয়া দ্রষ্টারূপে সাক্ষীরূপে চিদাকাশে অনুষ্ঠিত রসরাজমূর্তি রসিক রাজশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী স্বরূপা-অন্তরঙ্গা শক্তির এই লীলা দেখিতে পারে। জীব মুক্ত হইয়া পরাভক্তির প্রভাবে সখীর সহিত যোগযুক্ত হইয়া যায় বলিয়াই সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইয়া লীলাদর্শনের অধিকারী হয়। মায়া ও মহামায়ার অতীত হইয়া সিদ্ধ যোগী বিশুদ্ধ চিদুজ্জ্বলা ভগবানের স্বরূপভূতা মহাশক্তির অঙ্কাশ্রিত থাকে বলিয়া সাংখ্যাদিসম্মত কেবলী দ্রষ্টা হইতে এই দ্রষ্টা অনেক উর্ধ্বে অবস্থান

করে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই এই তত্ত্ব গুপ্ত সাধকগণ বিদিত ছিলেন।

নিত্য লীলা কখন মানস বৃন্দাবনের ব্যাপার হইতে পারে না। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বিরজার পরপারে পরব্যোমের বর্ণনা আছে—ইহা নিত্য চিন্ময় ভূমি, এখানকার লতা গুল্মাদি চিন্ময় ও আনন্দঘন। 'ভগবৎসন্দর্ভে'ও ইহার কথা আছে—ইহা নারায়ণের ত্রিপাদ বিভূতিস্বরূপ নিত্য অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য পরমপদ, যে পরমপদ "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। বলাবাহুল্য, ইহা মায়াতীত, মহামায়াতীত ভূমি। তাই ইহাকে 'মানস বৃন্দাবন' না বলিয়া 'নিত্য বৃন্দাবন' বলিয়া গ্রহণ করা উচিৎ। বৃন্দাবন তিন প্রকারঃ নিত্য বৃন্দাবন, চিন্ময় বৃন্দাবন ও মানস বৃন্দাবন। মানুষও সেইরূপ তিন প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ, অযোনিসম্ভব ও যোনিসম্ভব মানুষ। নিত্য বৃন্দাবনেই স্বতঃসিদ্ধ মানুষের প্রকাশ হয়। চিন্ময় বৃন্দাবনে অযোনিসম্ভব এবং মানস বৃন্দাবনে যোনিসম্ভব মানুষের স্থিতি। ভাবদেহের বিকাশই অযোনিসম্ভব মানুষ। ইহা সাধকের অন্তরে বিকাশলাভ করে। ভাবদেহে ভাবসাধনাই চিন্ময় বৃন্দাবনের ব্যাপার। যোনিসম্ভব মানুষ সাধারণ মানুষ। তাহার ভাবসাধনা মানস বৃন্দাবনের ব্যাপার। মানস বৃন্দাবনের সহিত নিত্য বৃন্দাবনের ভেদ বৈষ্ণব সহজিয়া রহস্যমার্গে প্রসিদ্ধ। যিনি 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' বলিয়া বর্ণিত হন তিনি বিরজার এপারের বস্তু নহেন। 'প্রেমানন্দ লহরী', 'রাধারসকারিকা', 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী', 'বিবর্ত বিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অর্থাৎ যুগলরূপের নিগূঢ় রহস্য বর্ণিত আছে। মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাবে অথবা নামমাহাত্ম্য বশতঃ ভাবদেহ সাধক অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়। ভাবদেহের পরে সিদ্ধদেহ লাভ হয়, সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি সাধক অবস্থাতে হয় না। সাধকের আশ্রয় সখীর চরণ, কিন্তু সিদ্ধের আশ্রয় শ্রীরাধার চরণ। সাধকের লীলা রাগ, কিন্তু সিদ্ধের প্রেম ও প্রাপ্তি রাগ। মানস বৃন্দাবনে এই সিদ্ধজন উপভোগ্য রসের আস্বাদন সম্ভবপর নয়। প্রাচীন রামায়েত সম্প্রদায়েও এই নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলসীদাসের শ্রীরামনামকলমণিকোষমঞ্জুষাতে এবং কবীরের 'রেখ্‌তা' প্রভৃতিতে এই তত্ত্বের পরিচয় সুষ্টুরূপে উপলব্ধ হয়। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি পঞ্চদেহ অতিক্রম করিয়া হংসদেহ লাভ করিলেই শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদভাব উপলব্ধ হয়। ইহা সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের অতীত অথচ উভয় ভাবময়রূপে বা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই যুগলরূপের রহস্য। তান্ত্রিকগণের যামলরূপ এবং বজ্রযানী বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধরূপ তত্ত্বতঃ ইহাই। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাপ্রভু উৎকলে যে নিগূঢ় ধর্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন যাহা অধিকার ভেদে উৎকলীয় পঞ্চ সখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহারও আলোচনা আবশ্যক। উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ

যথা—প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা, গুরুভক্তি গীতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণ আবশ্যক।

বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত এবং তিন প্রকার কৈবল্য—প্রকৃতি বিমোহিত মর্ত্ত মানব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত। প্রকৃতির সংস্রব বিচ্ছিন্ন কবিয়া শুদ্ধ চিন্ময় আত্মস্বরূপে অবস্থান কবিবাব নিমিত্ত 'ইহা নহে', 'ইহা নহে' বেদান্তের এই নেতিবাদ অনুসরণের সাধনা করিতে হয়। অর্থাৎ বৈবাগ্য সাধনার দ্বারা প্রকৃতিব প্রভাবমুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হয। ইহাকে 'বামাবর্ত্ত' বলে। যে সাধক এইখানেই থামিযা যায়, সেই সাধক কেবলই আত্মা লাভ কবিয়া সাংখ্য-নির্দিষ্ট 'কৈবল্য' প্রাপ্ত হয। বৈদান্তিক সাধক নেতি নেতি করিয়া বৈরাগ্য সাধনপূর্বক ঈশ্বরত্বে অধিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধক দেখিতে পায় যে সে মাযা-উপাধি দ্বারা উপহত। তখন সাধক মায়ার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া রিক্ত আত্মা হইযা জ্যোতির্ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ইহা সংখ্যেব কৈবল্য অপেক্ষা উন্নত ধরনের দ্বিতীয় প্রকার 'কৈবল্য'।

আগম পন্থানুসারী যোগী প্রথম 'বামাবর্ত্ত' অনুসরণ করিয়া মায়ার প্রভাবমুক্ত হয এবং প্রবুদ্ধ হইযা আত্মজ্ঞান লাভ করিযা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। বামাবর্ত্ত অনুসরণের সময় 'ইহ বাহ্য, ইহ বাহ্য' বলিয়া যোগী যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া গিযাছিল অর্থাৎ পার্থিব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি প্রপঞ্চে গঠিত জগৎ অশুদ্ধ মলিন বলিয়া উহা হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া চলিয়া শুদ্ধ জাগ্রত চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইবার পর পুনরায় সেইপথে নিম্নে অবতরণ করে। অবতরণের সময় যেহেতু যোগী চিন্ময় সত্তা লইয়া ফিরিয়া আসে, সেইহেতু তাঁহার চিন্ময় সত্তার সংস্পর্শে সবকিছু অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, পৃথিবী এবং মায়িক শরীর চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই চিন্ময় পরিবর্তন মাযিক জীবের অগোচর, একমাত্র সেই যোগীর নিকটই উহা প্রতিভাত হয়। ইহাকে 'দক্ষিণাবর্ত্ত' বলে। ইহা ছাড়া, আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ সাধকের সম্মুখে মহাপ্রকাশ উদ্ভাসিত হয়। নিরোধিকা ভেদ করিলে সাধক মহাপ্রকাশের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শিবরূপী হয়। নিরোধিকা ভেদের পূর্বে মনের যে লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল, নিরোধিকা ভেদের পর তাহাও আর থাকে না। তখন বিশুদ্ধ 'অহং' জ্ঞানের বিকাশ হয় অর্থাৎ আত্মায় আত্মবোধ জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরমশিবত্ব তখনও লাভ হয় না। কারণ, সেই শিবের মধ্যে পরমশিবের স্বাতন্ত্র্যরূপী আবরণাত্মিকা মায়ার সূক্ষ্ম আবরণটুকু তখনও থাকিয়া যায়। শিবরূপী যোগী যখন তাঁহার সেই বিশুদ্ধ 'অহং'কে পরমশিবে সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ শরণাগত হন, তখন পরমপিতা পরমশিব অনুগ্রহ করিয়া আবরণ সরাইয়া নেন এবং শিবরূপী যোগীকে

আত্মসম অর্থাৎ নিজের মধ্যে এক করিয়া নেন। ইহা সর্বোত্তম তৃতীয় প্রকার 'কৈবল্য'।

অলিঙ্গ, একলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গ—কৈবল্যের যেমন তিন প্রকার ভেদ, সেইরূপ পরমতত্ত্বও অলিঙ্গ, একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ ভেদে তিন প্রকার। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অনেক প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহাব সংক্ষিপ্ত মর্ম হইল এইরূপঃ

পরমতত্ত্ব অলিঙ্গ, উভয লিঙ্গ, পুরুষ, প্রকৃতি—অথবা সব হইয়াও সকলের অতীত হইতে পারে। অলিঙ্গ বলিতে পুরুষ বা প্রকৃতি ভাববর্জিত অবস্থা বুঝায। ইহাকে কূটস্থ ব্রহ্মসত্তাও বলা যায়। ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবস্থাতে শক্তিব অভিব্যক্তি থাকে না—ইহা সুযুপ্তির মতন অবস্থা।

ব্রহ্মের একটি একলিঙ্গ অবস্থা আছে। একলিঙ্গাবস্থায় তিনি হন পরমপুরুষ নতুবা পরমা-প্রকৃতি। যাঁহারা পবমপুরুষের উপাসক তাঁহারা পরমপুরুষরূপী একলিঙ্গ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি এই পুরুষে লীন থাকেন অথবা আশ্রিতভাবে বর্তমান থাকেন। এই সকল উপাসক যুগলের উপাসক নহেন। যাঁহারা পরমা প্রকৃতির উপাসক তাঁহারাও একলিঙ্গ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। ইঁহারাও যুগলসেবক নহেন। উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম যুগপৎ পিতা ও মাতা, বা পুরষোত্তম ও পরমা প্রকৃতি উভযই। তিনি অলিঙ্গ নহেন, একলিঙ্গও নহেন—উভয়লিঙ্গ। যুগল উপাসক এই উভয়লিঙ্গ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এখানে পুরুষ-প্রকৃতি উভয় ভাবই আছে। অথচ উভয়ে বিরোধ নাই। এই পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মধ্যে বৈষম্য নাই। শিব ব্যতিরেকে শক্তি, শক্তি ব্যতিরেকে শিব অলীক—উভয়ে অবিনাভাব সম্বন্ধ। অগ্নি ও দাহিকা শক্তি যেমন অপৃথক্, ব্রহ্মের এই লিঙ্গদ্বয়ও তদ্রূপ।

একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ—দুই-ই সলিঙ্গ ব্রহ্ম। তাছাড়া অলিঙ্গ ব্রহ্মও আছেন। যখন এই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গ ব্রহ্মের ভেদ থাকিয়াও থাকিবে না, অথবা এক নির্বিশেষ অভেদ অবস্থার মধ্যেও উভয়লিঙ্গেব ও একলিঙ্গের প্রতিভাস পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে, তখনই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হইবে। এই অবস্থাতে শিব ও শক্তি এই দুই শব্দের পৃথক্ অর্থ থাকে না, অর্থাৎ থাকিয়াও থাকে না।

অলিঙ্গ স্থিতি হইল ব্রহ্মনির্বাণ বা কৈবল্যবৎ অবস্থা। এই অবস্থায় স্বরূপের মধ্যে স্থিতি হইলেও স্বরূপশক্তির উল্লাস থাকে না। ইহা নিষ্ক্রিয় শান্ত অচল পরমাবস্থা। যোগীর এই স্থিতির অনুভূতিতে জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়। পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অনুভূতিতে কিন্তু জগৎটি সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়।

ইহা ব্রহ্ম সত্তারই বাহ্য বিলাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। শুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ বিলাসের অনুভূতি অসম্ভব। অর্থাৎ দুইটি প্রধান অনুভূতিঃ (১) 'এক', (২) 'এক ও নানা'। 'এক' আছে, 'নানা' নাই---ইহা অলিঙ্গ ব্রহ্মানুভূতি। আবার 'এক' আছে, 'নানা'ও আছে—ইহাই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গের যুগপৎ অনুভূতি, অভেদরূপে অনুভূতি। এক ও নানা = অখণ্ড। এক ও নানাব যুগপৎ অনুভূতিই হইল অখণ্ড অনুভূতি। (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্র সং--৪)

জীবসৃষ্টি ও বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে নাদের সম্বন্ধ এবং নাদ সাধনার তাৎপর্য—পুনরায় আমরা নাদের বিশ্লেষণে ফিরিয়া আসিতেছি। এখানে আমরা তিনটি প্রবন্ধের অবতারণা করিযা নাদ-তত্ত্বের আলোচনাব পরিসমাপ্তি ঘটাইতেছি। এই তিনটি প্রবন্ধ হইল যথাক্রমে (১) জীবসৃষ্টি ও বিশ্বসৃষ্টিব সঙ্গে নাদের সম্বন্ধ এবং নাদ-সাধনাব তাৎপর্য, (২) তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য এবং (৩) কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব।

জীবভাবের ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্রপাত আদিসৃষ্টিতেই হইয়া থাকে। অনাদি-সুষুপ্তি অবস্থায় অনন্ত জীব সমষ্টিরূপে লীন থাকে। অনাদি সুযুপ্তির ঊর্ধ্বে যেখানে নিত্য চৈতন্য সর্বদা বিরাজ করে সেখান হইতে অব্যক্তভাবে সুযুপ্তিমধ্যে অনন্ত জীবের সূচনা হয। যে মহা ইচ্ছা হইতে ইহাদের আবির্ভাব, তাহা পবমপুরুষের বহু হইবার ইচ্ছা। পবমেশ্বরের ইচ্ছা মাতৃ-শক্তি মহামায়াতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে নিরন্তর অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় জীবসৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহারা মহামায়াতে অণুসমষ্টিরূপে সঞ্চিত হয় এবং সুপ্ত থাকে। মহামাযার আদি নাই, তাই ঐ সকল জীবের সুষুপ্তিও অনাদি নিদ্রা বলিযা অভিহিত হয়। যিনি এই মহামাযার ঊর্ধ্বে সর্বদা বিরাজ করেন তিনিই পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, শিব-শক্তি, বা ভগবান-ভগবতীর নিত্যমিলিত অদ্বয়স্বরূপ। পরমেশ্ববের স্বাতন্ত্য-বলে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের পূর্বে শক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপে গুপ্ত থাকেন।

অতএব শক্তির দুইটি অবস্থা—একটি গুপ্ত এবং অপরটি প্রকট। শক্তি যখন গুপ্ত থাকে তখন পরমেশ্বরের আত্মোপলব্ধি হয় না। শক্তির অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। ইহাই শিবের 'শব' অবস্থা। কিন্তু শক্তি যখন প্রকট তখন তাহাকে চৈতন্য বলে। ইহার প্রভাবেই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের স্ফুরণ হইয়া থাকে। শক্তি প্রকট বা চৈতন্য অবস্থাকে বিশিষ্ট আগমবিদ্‌গণ 'পরনাদ' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরনাদ বা চৈতন্যের প্রভাবে মহামায়ার ঘুমন্ত সত্তা জাগিয়া উঠে। পরনাদেব প্রভাবে মহামায়া বা বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে বিন্দু হইতে জাত নাদের সূত্রপাত হয়। বিন্দুর

ক্ষোভজনিত নাদকে 'অপরনাদ' বলা হয়। 'অপরনাদ' শব্দরূপ জ্ঞান, পরনাদ শব্দাতীত বোধরূপ জ্ঞান। অতএব জ্ঞান, বোধরূপ ও শব্দরূপ—এই দুই প্রকার।

পরনাদ বা চৈতন্যের প্রভাবে মহামায়ার ঘুমন্ত সত্তা জাগিয়ে উঠিলে মহামায়াসত্তায় সুপ্ত জীবসকলও জাগিয়া উঠে। সুপ্ত জীবসকল যে জ্ঞান ভূমিতে জাগিয়া উঠে তাহা পরনাদরূপে সাক্ষাৎ চৈতন্য নহে এবং মায়িকজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানও নহে। কারণ, তখন মায়ার ক্ষোভ হয় নাই। উহা শব্দরূপ জ্ঞান যাহা বিন্দুজনিত নাদ বা অপরনাদ। এই নাদ জ্যোতিঃস্বরূপ।

জীব সকল যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহারা বহির্মুখভাবেই জাগে, কারণ সৃষ্টিকর্তার বহু হইবার ইচ্ছাই বহির্মুখ হওয়া। বহির্মুখ না হইলে বহু হওয়া যায় না। এই সকল জীব বা অণু জাগিয়া উঠিয়াই নিজের এবং নিজধামের জ্যোতির্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে। জীব যখন সুপ্ত ছিল, তখন তাহার বোধ ছিল না। বোধ ছিল না বলিয়াই তাহার মধ্যে আমিত্বভাব ছিল না। কিন্তু যখন সে জাগে তখন 'আমি'-ভাব লইয়াই জাগে। ইহাই আমিত্বের প্রথম আবির্ভাব। এই 'আমি' বা 'বোধ' পরিদৃশ্যমান অনন্ত জ্যোতির সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যেটি তার নিজের প্রকৃত স্বরূপ, যাহা এই জ্যোতিরও অতীত, তাহা সে ধারণা করিতে পারে না, কারণ জীব তখন বহির্মুখ। বহির্মুখতার জন্য নিজ স্বরূপের উপলব্ধির সম্ভাবনা তখন তাহার থাকে না। কারণ, বহির্মুখ গতি পরিসমাপ্ত করিয়া অন্তর্মুখ গতি প্রাপ্ত না হইলে স্বরূপদর্শন হইতে পারে না।

এই যে জ্যোতিঃস্বরূপে নিজের উপলব্ধি ইহা স্থায়ী হয় না। জীব জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও বহির্মুখ বলিয়া উহাতে স্থিত থাকিতে পারে না। সে বাহিরে তাকাইয়া একটি ছায়ার মত জিনিষ দেখিতে পায় এবং নিজেকে উহার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে থাকে। বহির্মুখ জীব প্রবৃত্তিমুখী। প্রবৃত্ত্যভিমুখ বশতঃ জ্যোতিঃভ্রষ্ট হইয়া এই সকল জীবাণু মহামায়ারাজ্য হইতে মোহান্ধকারময় মায়ারাজ্যে পতিত হইয়া সংসার জীবন যাপন করে। এই প্রকারে জীব ব্রহ্মভাব হইতে ক্রমশঃ মহাকারণ, কারণ, এবং সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া স্থূলে অবতীর্ণ হয়। অবতরণের ইহাই চরম সীমা। ইহার পর ভোগ। ভোগের অবসানে পুনর্বার স্বস্থানে ফিরিবার জন্য নিবৃত্তিপথে চলা আরম্ভ হয়। নিবৃত্তির মুখে সদ্গুরুর কৃপায় ঊর্ধ্বে আরোহণ হইতে থাকে। এই আরোহণই অধ্যাত্ম জাগরণের তত্ত্ব বা দ্বিতীয় জাগরণ বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি। ইহার প্রভাবে চরম অবস্থায় নিজের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। অবরোহণের মূলে যেমন চৈতন্যের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম জাগরণ, তেমনই আরোহণের মূলেও চৈতন্যের ক্রিয়া বা দ্বিতীয় জাগরণ।

অন্নময় কোষের প্রথম গঠন হইতে মনোময় কোষের বিকাশ পর্যন্ত জীবের গতি বহির্মুখী। মনোময় কোষে থাকিতেই সদ্‌গুরু কর্তৃক মন্ত্র-চৈতন্যের সঞ্চারবশতঃ দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অন্তর্মুখী-গতি চলিতে থাকে। ব্রহ্ম অবস্থা হইতে মহাকারণ শরীর কারণ-অবস্থায় অবতীর্ণ হইয়া লিঙ্গাত্মক ভাবরূপে ব্যক্ত স্থূলসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। বীজ যেমন ক্ষেত্রে পতিত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ইহার পর ক্রমশঃ যোনিভেদে স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইতে থাকে। স্থাবর হইতে মনুষ্যযোনির পূর্ব পর্যন্ত চুরাশি লক্ষ যোনির কথা প্রসিদ্ধ আছে। উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি অগণিত যোনিভ্রমন করিয়া বাহ্য আকারটি ক্রমবিকশিত হইয়া মনুষ্য আকারে পরিণতি লাভ করে। তখন প্রকৃতির বিকাশ আপাততঃ স্থগিত হয়। মনুষ্যদেহ লাভ করা আর অন্নময় কোষ হইতে মনোময় কোষ পর্যন্ত বিকাশ হওয়া একই কথা। চুরাশি লক্ষ যোনি পর্যন্ত প্রথমে অন্নময় ও পরে প্রাণময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। শেষদিকে মনোময় কোষের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যথার্থ মনোময় কোষের বিকাশ মনুষ্যদেহেই সম্ভবপর হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেই কর্মে অধিকার জন্মে। সৎ ও অসৎ এর বিচার, পাপ-পুণ্যের বোধ, কর্তব্যবোধ, কর্তৃত্ব-অভিমান এবং আভাসমাত্র হইলেও বিবেকজ্ঞানের উদয় প্রভৃতি মনুষ্যদেহের ধর্ম।

মনোময় কোষ বিকশিত হইবার পর জীবের সংসারদশা চলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করা ও তাহার ফলভোগ করাই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। যে পরিণামপ্রবাহে মনোময় কোষ পর্যন্ত বিকাশ হইয়াছে তাহা তখন নিরুদ্ধ থাকে। মানুষ তখন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করে। এই স্বপ্নভ্রমণের নামই সংসার। বিচিত্র বাসনা অনুসারে বিচিত্র ভোগ সম্পন্ন হয়। এইরূপে দীর্ঘকাল স্বপ্নরাজ্য ভোগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অতৃপ্তি ও অবসাদে চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তখন ভোগ্য পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। জ্ঞান ও আনন্দময় একটি নিত্যবস্তু পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিতে থাকে। নিজের অজ্ঞান ও অক্ষমতা মুহুর্মুহু চিত্তকে ক্লিষ্ট করে। তখন মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শিশু হইয়া প্রকৃতি-জননীর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়।

ইহার পর দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। চিন্ময়ী প্রকৃতি তখন সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তাহাকে জাগাইয়া নিজের কোলে টানিয়া লন। তাহার এতদিনকার স্বপ্নের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। সে তখন শিশু হইয়া মাতৃকোলে উপবেশনপূর্বক দ্রষ্টারূপে মায়ের সকল খেলা দেখিতে থাকে। প্রকৃতিমাতা তখন আবার গৃহরচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গৃহটি বিজ্ঞানময় কোষ। জীব তখন আর জীব নহে, মুক্ত পুরুষ, কেননা সে তখন সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির খেলা

নিরীক্ষণ করে। দ্বিতীয় জাগবণ হইতে অন্তর্জগতে বিন্দু পর্যন্ত প্রবেশলাভ করাই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ। আনন্দময় কোষের বিকাশই ভগবত্তালাভ। মহাকারণ দশায সে আকাবের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতির শেষে জীব তখন সেই আকারে স্থিত হয়। প্রথম জাগরণের পর বহির্মুখী গতি, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতি—দুইটি গতির সমান সমান ভাবে বৃত্তাকারে ঘোরা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায। ইহাই পবমস্বরূপে অবস্থান।

নাদের বিকাশের ক্রম - নাদতত্ত্ব, বিশ্বসৃষ্টি—আত্মা নির্বিকল্প প্রকাশাত্মক স্বাতন্ত্র্যময় শিবস্বরূপ—ইহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু জীব স্বরূপে শিবময় হইলেও নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে অনাত্ম-বস্তুকে আত্মা মনে কবিযা তাহাতে অহংভাবের আরোপ করিতেছে এবং তদনুসাবে কর্ম সম্পাদন পূর্বক সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিতেছে। ইহাই তাহাব মায়াধীন সাংসারিক জীবন। ইহা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শাস্ত্রে যে সকল উপায নির্দিষ্ট হইযাছে তন্মধ্যে নাদ-সাধনা অথবা নাদানুসন্ধান উৎকৃষ্ট উপায়েব মধ্যে পরিগণিত হয়।

সৃষ্টিক্রমে শব্দের গতি পরাবাক্ হইতে বৈখরী বাকের দিকে; কিন্তু সাধনার পথে শব্দের গতি হয় ক্রমশঃ বৈখরী হইতে মধ্যমা ও পশ্যন্তীর মধ্য দিয়া পরাবাকের দিকে। কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতিব দ্বারা যে শব্দের উচ্চারণ হয় এবং কর্ণের দ্বারা যাহা শ্রুত হয তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা। ইহাই শব্দের স্থূলরূপ। জপ ও কীর্তনাদিতে বৈখরী বাক্‌কে আশ্রয করিযাই সাধনকার্য আরব্ধ হয়। গুরুদত্ত মন্ত্র অথবা ভগবন্নাম নিষ্ঠাপূর্বক যথাবিধি উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চেষ্টাপূর্বক উচ্চারণ আবশ্যক হয় না। মন্ত্র বা নাম তখন আপনিই কণ্ঠ হইতে স্ফুরিত হইতে থাকে অথবা কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইলে হৃদয হইতে চলিতে থাকে। সুতরাং স্থূলভাবে উচ্চারণের সামর্থ্যও তখন থাকে না অথচ ভিতর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ হইতে থাকে। এই অবস্থাকে সাধকগণ সাধারণতঃ জপ-করা বা নাম-করা বলেন না, ইহা জপ ও নামের আপনা আপনি হওয়ার অবস্থা, কারণ ইহা কাহারও ইচ্ছা বা প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে না। সাধক শুধু অবহিত চিত্তে এই ভিতরকার নামের খেলা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সাধকের দীর্ঘকালব্যাপী মন্ত্রজপ বা নাম কীর্তনের অভ্যাসের ফলে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রভাবে হৃদয় পবিষ্কার হইয়া সাধকের ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়। ইহাই মন্ত্রচৈতন্যের

পূর্বাভাস। এই অবস্থার উদয় হইলে স্বভাবের ধারাটি উন্মুক্ত হয় বলিয়া পুরুষকারের আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। তত্ত্ববিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ কর্তৃত্বের অভিমানে আবদ্ধ এবং পূর্বসংস্কার ও ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া তাহার প্রাণ বক্রগতি-সম্পন্ন হইয়া ইডা ও পিঙ্গলা নাড়ী অবলম্বন পূর্বক ক্রিয়া করিতে থাকে। যথাবিধি সাধন অনুষ্ঠিত হইলে প্রাণ ও অপানের বিরুদ্ধ প্রবাহ ক্রমশঃ সাম্য প্রাপ্ত হয ও ঐ সাম্যপ্রাপ্ত প্রবাহ সুপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণবশতঃ মধ্য নাড়ী সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া সরল গতিতে ঊর্ধ্বমুখে সঞ্চালিত হইতে থাকে। প্রাণেব সঙ্গে মনও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও নির্মল হইয়া ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। কুণ্ডলিনী শব্দ-মাতৃকা; বিন্দু বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ইহাব নামান্তর। মন ও বায়ুর ঊর্ধ্বমুখ সঞ্চাবের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুও ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপ ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বদিকে বহিতে থাকে। নাদের অধিষ্ঠান সুষুম্না। ইহা মূলাধার হইতে জাগিয়া উঠিয়া ষট্‌চক্র ভেদ কবিয়া ঐ সুষুম্না নাড়ীরই উপরিভাগে নির্গত হয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে বিশ্রান্ত হইয়া সর্বভূতে চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রকৃত অনাহত নাদ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে ইড়া-পিঙ্গলার ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার শ্রুতিমধুর স্থূল নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। মন-প্রাণ ও কুণ্ডলিনীর যুক্তভাবে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর নাড়ী-মার্গে সঞ্চরণের ফলে ঐ সকল আনন্দদায়ক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয। গুরুব উপদেশ এই যে, ঐ সকল ধ্বনি বাস্তবিকপক্ষে অনাহত-ধ্বনি নহে। তাই ঐগুলিকে পরিহার করিযা যেটি বাস্তবিক বা পরম নাদ, তাহাকেই আশ্রয করিতে হয়। পক্ষান্তরে, এমনও হইতে পারে যে, ঐ সকল মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ গুরুকৃপায় অনাহত নাদ শ্রবণপথে আসে। তখন ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ, ঐ সময়ে মন অনাহতে লীন হয। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রবেশদ্বার খুলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যেও ক্রম আছে। অনাহত নাদের উদয় মধ্যমা-বাকের আবির্ভাব সূচিত করে। বৈখরী বাকে সাধকের জপে কণ্ঠক্রিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যমার উদয়ে অনেক সময় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায় অথবা রোধ ঘটিতে আরম্ভ হয়। একদিকে যেমন কণ্ঠদ্বার নিরুদ্ধ হয়, অপরদিকে তেমনি মধ্যনাড়ীর অধোদ্বার ক্রমশঃ অধিক উন্মীলিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রাণ, মন ও কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মধ্যমার্গে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমশঃ দৃষ্টির অন্তর্মুখতা বাড়িতে থাকে। ফলে অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ নির্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হইয়া উঠে। বাসনার কালিমা চিত্ত হইতে অপসৃত হয়।

অন্তরাকাশ নির্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়সরোববস্থ ভাব-কমলটি প্রস্ফুটিত হইয়া উর্ধ্বমুখ হয়। অনাহত নাদের সূচক অবান্তর নাদসকলও নাড়ী-শোধন, ভূত-শোধন ও চিত্ত-শোধনের কার্য করে। বস্তুতঃ 'চেতন শব্দই' জ্যোতিঃরূপে এই সংস্কারকার্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সাধারণতঃ স্থিরভাবে জ্যোতিদর্শন হয় না, তবে তমোহবণরূপ জ্যোতির কার্য অবাধে চলিতে থাকে। তমোনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। পরে এমন একটি স্থিতির উদয হয় যখন নির্মল বাহ্য আকাশে সূর্যমণ্ডলের উদয়েব ন্যায বিশুদ্ধ অন্তরাকাশে জ্যোতির মণ্ডল স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠে। এইটি মধ্যমা পার হইযা পশ্যন্তী অবস্থায় বাকের সঞ্চারের লক্ষণ। পূর্ণ পশ্যন্তী অবস্থার উদয হইলে পূর্ববর্ণিত নাদধ্বনি সকল থাকিয়াও যেন আর থাকে না অর্থাৎ তখন আব শ্রুতিগোচর হয় না, কারণ ঐ সময়ে মন নিবৃত্ত হয়। ইহাই মন্ত্রাত্মক ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকারের অবস্থা, ইহাই যোড়শকলা-বিশিষ্ট আত্মার ষোড়শী বা অমৃত কলার অভিব্যক্তির সূচনা। এই অবস্থাতে আত্মার অধিকার নিবৃত্ত হয, কাবণ ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটি পুরুষার্থ তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রযীবাকের এইখানেই উপশম হয়। জ্যোতিদর্শনও ক্রমশঃ নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে, মধ্যমাতে উভয়েব মধ্যে ভেদও থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভেদও থাকে, কিন্তু পশ্যন্তীতে ভেদ মোটেই থাকে না। তখন একমাত্র অভেদই বিরাজ করে অর্থাৎ পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হয়—ইহারই নাম মন্ত্রসাক্ষাৎকাব। ইহার পর সর্ব বিকল্পের উপশম হইলে যখন পূর্ণ অহন্তার বিকাশ হয় তখনই বুঝিতে হইবে পরা বাকের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই পরা বাক্‌ই পরমেশ্বরের পরম শক্তি এবং ইহা তাঁহার সহিত অভিন্ন। এইজন্য এই স্থানেই জীব নিজের শিবভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্যন্তীতে অখণ্ড জ্যোতির্মণ্ডল দর্শন হয়, চিদাকাশে এই জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ করিতে পাবিলে স্বযংপ্রকাশ নিজস্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখন আর চিদাকাশ থাকে না, নিজের মধ্যেই নিজ স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। এইজন্যই উপনিষদ্ বলিযাছেন—"স্বে মহিম্নি"। "জ্যোতিবভ্যন্তরে রূপমচিন্ত্যং শ্যামসুন্দরম্"—ইহারই নাম জ্যোতিভেদে স্বরূপের প্রাপ্তি। পশ্যন্তীর যেটি পৃষ্ঠভূমি তাহাই পরা। দৃষ্টিব পার্থক্যবশতঃ সেই পরাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি বলিয়া যেমন কেহ কেহ মনে করেন, তেমনই কেহ কেহ উহাকে ভেদ করাই মানবজীবনেব চরম সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই দ্বিতীয় মতে পরা বাক্‌ই শব্দব্রহ্মরূপ সূর্যমণ্ডল এবং ইহাকে ভেদ করিযা আত্মস্বরূপে স্থিত হওয়াই মহাজ্ঞানের যথার্থ ফল।

অদ্বৈত আগমদৃষ্টিতে পরাবাক্ আত্মার স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া চিদ্রূপা। এই চিৎশক্তি আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি। আনন্দশক্তিও তাই। কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে চিৎশক্তি আত্মস্বরূপে সমরসভাবে বিরাজ করে বলিয়া তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে এই চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক রূপ ধারণ করে অর্থাৎ চিৎশক্তি যেন উদ্রিক্ত হইয়া মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করে। মহামায়া কুণ্ডলিনী বা বিন্দুরূপে বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপে অব্যক্ত থাকে। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যরূপা চিৎশক্তি ক্রিয়ারূপে প্রবলতা ধারণ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। তখন ঐ ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে নাদ ও জ্যোতির স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ নাদ ও জ্যোতি এক হিসাবে বিন্দু-ক্ষোভের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। তখনকার ঐ জ্যোতি পরম প্রকাশরূপে এবং নাদ পরনাদরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি সমসূত্রভাবে সৃষ্টির মূল হইতেই ক্রমশঃ বহির্মুখে অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। অর্থাৎ বিন্দু ক্ষুব্ধ হওয়ার পরে যে নাদ ও জ্যোতির স্ফুরণের কথা বলা হইল, তাহাই সৃষ্টির মূল।

চিৎশক্তি বা সংবিৎ স্পন্দরূপা। যখন সৃষ্টিমুখে উহা প্রাণরূপে পরিণত হয় তখন ঐ প্রাণকে ভিত্তি করিয়া বিরাট দেশ ও বিরাট কালের প্রাসাদ গাড়িয়া উঠে। সমগ্র বিশ্বই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রাণ আছে বা স্পন্দ শক্তির খেলা আছে সেখানে প্রবাহ থাকিবেই—মূলে এই প্রবাহটি সরল থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ বক্রভাবে পরিণত হয়। নাদের যেটি পরমরূপ সেটি ঐ সরল প্রবাহেই স্ফুরিত হয়। তাহা সর্বদাই প্রকাশমান—তাহার তিরোভাব কখনই হয় না। ইহাই অনাহত নাদ বা ধ্বনি। এই ধ্বনি প্রাণীমাত্রেরই হৃদয়ে সর্বদা ধ্বনিত হইতেছে—

একো নাদাত্মকো বর্ণঃ সর্ববর্ণাবিভাগবান্।
সোঽনস্তমিতরূপত্বাৎ অনাহত ইবোদিতঃ।।

এই যে অনাহত নাদের কথা বলা হইল ইহা ব্রহ্ম-প্রণব-সংলগ্ন নাদ বা জ্যোতি। এইখানে মন লয়প্রাপ্ত হইলেই পরম পদের সাক্ষাৎকার হয়। মন না থাকিলে নাদ থাকে না, আবার নাদ না থাকিলেও মন থাকে না। কেহ কেহ এই অবস্থাটিকে পরব্রহ্ম অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করেন। জীবের যে অবস্থায় নাদ শ্রুত হয় না, সেটি বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত অথবা মূঢ়দশা, কিন্তু যখন নাদ শ্রুতিগোচর হয়, সেইটি একাগ্র অবস্থা অথবা জ্ঞানের অবস্থা। এরপর যখন নাদ-শ্রবণ স্থগিত হইয়া যায় সেইটি চিত্তের নিরোধ অবস্থা। তখন মনের বৃত্তি থাকে না, শুধু সংস্কারমাত্ররূপে মন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই সংস্কারও যখন থাকে না, তখন চিন্মাত্র আত্মার স্বরূপস্থিতি বুঝায়।

অনাহত পরনাদ কিংবা পরজ্যোতি বস্তুতঃ চিদাত্মিকা শক্তি। ইহাই 'পরা বাক্' পদবাচ্য। পূর্ণ অহন্তা ইহার স্বরূপ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। "এই চিন্ময় ও অসীম নাদপ্রবাহ বিশ্বকল্যাণের জন্য ঊর্ধ্ব হইতে ভ্রূ-মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। বিষ্ণু-পদ হইতে যেমন গঙ্গা শিব-মস্তকে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তদ্রূপ এই নাদ-গঙ্গাও বিশ্বসৃষ্টির জন্য জীবের পরম কল্যাণ. সাধনের জন্য ভ্রূ-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রূ-মধ্যস্থানই চিত্তের কেন্দ্রবিন্দু। এই স্থানে প্রকৃতি হ, ক্ষ এবং তন্মধ্যে লং-বীজ রক্ষা করিয়া সৃষ্টিমুখে নীচে অবতীর্ণ হন। মনোভূমি সঞ্চালনের জন্য এই তিনটি বর্ণ ভ্রূ-মধ্যে সংরক্ষিত হয়। ইহার পর চিৎ-সূত্র অবলম্বন পূর্বক অধোপ্রদেশে ক্রমশঃ তিনটি মণ্ডল রচিত হয়—প্রথমে সোমমণ্ডল তাহার পর সূর্যমণ্ডল এবং অন্তে অগ্নিমণ্ডল। তিনটি মণ্ডলই 'বর্ণময়'। তন্মধ্যে সোমমণ্ডল স্বরবর্ণময়, সূর্যমণ্ডল ক-কারাদি ২৫টি ব্যঞ্জন বর্ণময় এবং অগ্নিমণ্ডল য-কারাদি অবশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণময়। এই তিন মণ্ডলে ক্রমশঃ কারণ দেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উদ্ভূত হয়। ইচ্ছা, মন এবং প্রাণের অভিব্যক্তির ইহাই ক্রম। এই পর্যন্ত বর্ণমালাত্মক রচনা সম্পূর্ণ হইলে বর্ণসমষ্টি আরও নীচে অবতরণ করে এবং অজ্ঞানময় কারণ সমুদ্রে যাইয়া নিমগ্ন হয়। তখন উহার নাম হয় কুণ্ডলিনী। এইটি চিন্ময় বর্ণমালার সুপ্ত অবস্থা। ইহা ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে সমভাবে হইয়া থাকে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে, নাদ হইতেই সমগ্র-বিশ্ব সৃষ্ট হয় এবং সৃষ্ট বিশ্বের অন্তরে নাদই প্রাণ বা জীবনী-শক্তিরূপে নিহিত থাকে। ইহাই অনন্ত বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিযা প্রসুপ্ত ভুজগাকারে অবস্থান করিতেছে। এই অবস্থায় ইহার নাদ-ভাব অভিভূত থাকে এবং প্রাণাত্মক ভাব উন্মুক্ত থাকে। যখন ইহা বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে তখন ইহার নাম হয পরাকুণ্ডলী; যখন ইহা নাদাত্মক রূপে স্ফুরিত হয় তখন ইহার নাম হয় বর্ণকুণ্ডলী এবং যখন এই নাদরূপও ডুবিয়া গভীর সুষুপ্তিতে অবস্থান হয়, তখন ইহার নাম হয প্রাণকুণ্ডলী।

এই প্রাণই হংস। ইহা আপন স্বভাবে অধঃ-ঊর্ধ্ব সঞ্চরণ করে—'হ্'-কার বিমর্শরূপে হান (ত্যাগ) করে এবং 'স'-কার বিমর্শরূপে সমাদান (গ্রহণ) করে।—ত্যাগ ও গ্রহণ ইহার স্বভাব। ইহাই নাদাত্মক হংসের নিত্য উচ্চার। 'হ্'-অভিব্যঞ্জক 'অ'-কার। ইহা নাদের শিরোরূপে কল্পিত হয়। এই অ-কারের সঙ্গে উ-কারের যোগ হইলে বিন্দু প্রভৃতি প্রমেয়ের প্রাকট্যের সূত্রপাত হয়। ইহা অনুস্বার বা ম-কার মাত্রাতেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে অ-উ-ম রূপে বা প্রণবরূপে এই উচ্চারণের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। ইহাই বর্ণের উচ্চার।

এই যে বর্ণ-উচ্চারের বিবরণ দেওয়া হইল, ইহার অনুভূতি একটু অন্তর্মুখ

হইলে সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেরই হইতে পারে। ইহা নাদের স্থূল অনুভূতি। কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রবুদ্ধ হইলে ইহা অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই লাভ করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মন ও প্রাণ সম্মিলিত হইযা জাগ্রত-কুণ্ডলিনীর সহিত যোগে মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই অনন্তপ্রকার বিচিত্রতা সম্পন্ন স্থূল নাদের অনুভব হইতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ দশ প্রকার ধ্বনির বর্ণনা পাওয়া যায। নযটি ধ্বনি ত্যাগ করিযা দশমটিকে ধরিযা থাকিবার বিধান রহিযাছে। সুষুম্না নাড়ীই ব্রহ্মনাড়ী, কিন্তু যতক্ষণ ইহাব সহিত সংসৃষ্ট অন্য নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ ইহা প্রকৃত ব্রহ্মনাড়ী-পদবাচ্য হয় না। বজ্রা, চিত্রিণী প্রভৃতি নাড়ী, ব্রহ্মনাড়ীবই পূর্বাভাস। এই নাড়ী-সংঘট্টবশতঃ মন, বায়ু ও কুণ্ডলিনীর সঞ্চার বিভিন্ন মার্গে ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তিগত আন্তর প্রকৃতির ভেদবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্যই স্থূল নাদের বৈচিত্র্য ঘটে। নাদের সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে। নাদের ভিন্নতার অনুরূপ জ্যোতিরও ভিন্নতা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্যোতি তাহাই, যাহাতে কোন রং নাই—যাহা শুভ্র প্রকাশ অথবা অবর্ণ প্রকাশ। বিশুদ্ধ নাদও তাহাই, যাহাতে স্বরগত, মাত্রাগত ও গুণগত কোন বিভাগ নাই।

অ-উ-ম রূপে যে নাদক্রিয়ার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা যোগাভ্যাস বশতঃ ক্রমশঃ অধিক সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। ম-কার মাত্রাব পর ঐ উচ্চার ভ্রূ-মধ্যে বিন্দুরূপ ধারণ করে। যোগিগণের নয়টি যোগভূমি বা চিন্ময় অনুভূতিভূমির মধ্যে বিন্দুই প্রথম। এই নয়টি ভূমিও 'নবনাদ' নামে প্রসিদ্ধ। বিন্দুব উচ্চারণ-কাল অর্ধমাত্রাতে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল যোগভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্রা হইতে অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ অত্যন্ত দুরূহ। মনের লৌকিক স্থিতিতে অৰ্দ্ধমাত্রাতে প্রবেশ মোটেই ঘটে না, কাবণ একাগ্রতা ও নিরোধের সন্ধিস্থানে অৰ্দ্ধমাত্রা অবস্থিত। প্রজ্ঞার উৎকর্ষ যদি বিভূতির দিকে হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্বের অর্থাৎ অস্মিতার আবির্ভাব হয়, কিন্তু যদি উহা চিৎ-প্রকাশের দিকে হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্বের অর্থাৎ অস্মিতার নিরোধ ও বিবেকের উদয় হয়। অস্মিতাই গ্রন্থি—ইহা মুক্ত হইলে পূর্ণমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত যে বিবেক-প্রবাহ চলিতে থাকে তাহাই পূর্ণ নিরোধের দিকে লইয়া যায়। ইহারই নাম 'উন্মনী'। মাত্রাহ্রাসানুসারে কালের সম্বন্ধ যতটা কম হয় জড়ের সম্বন্ধও ততটাই কম হইয়া থাকে এবং সেই অনুপাতে চিৎ-প্রকাশের উজ্জ্বলতাও বাড়িয়া থাকে। তাই নিরোধ বা উন্মনী অবস্থায় কাল থাকে না।

দেহতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। ইহা ভেদ করিতে হইলে দেহের 'সকল', 'সকল-নিষ্কল' ও 'নিষ্কল'—এই তিনটি স্তর ভেদ করিতে হয়। অকুল সহস্রার

হইতে মূলাধারাদি যাবতীয় কুলপদ্ম ভেদ করিয়া ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যে সহস্রদল কমলের কথা শুনিযা থাকি তাহা দেহের উর্ধ্বদেশে অবস্থিত। অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত প্রদেশের ভাবনা 'সকল', বিন্দু হইতে উন্মনী পর্যন্ত 'সকল-নিষ্কল' এবং মহাবিন্দু 'নিষ্কল'।

ভ্রূ-মধ্যে কিঞ্চিৎ উপরদিকে ললাটে বিন্দুর স্থান। ইহা বর্তুলাকার এবং দেখিতে দীপের ন্যায়। বিন্দু-আবরণে মূল পাঁচটি কলারই স্থিতি রহিয়াছে। চারিদিকে নিবৃত্তি প্রভৃতি চারিটি কলা এবং 'শান্ত্যতীতা' নামে পঞ্চম কলা বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থাই বিন্দু। আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে অনন্তে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বারই বিন্দু। স-কল অবস্থাতে সাধক সীমার মধ্যে বর্তমান থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় পরপর ভূমি ভেদ করার ফলে চিত্ত ক্রমশঃ অধিকতর একাগ্রতা লাভ করে। আজ্ঞাচক্রে একাগ্রতার পূর্ণবিকাশ হয়। পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণ বিকাশ 'অস্মিতা' নামে অভিহিত হয়। উহাতে প্রজ্ঞাব পূর্ণ বিকাশ হইলেও উহা স্থূলেরই ব্যাপার, কারণ সর্বজ্ঞত্বও স্থূলের ধর্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। বিশুদ্ধ চিদনুভূতি এই ভূমিতে হয় না। গ্রন্থিভেদের পর নিবোধের দ্বার খুলিয়া গেলে সূক্ষ্ম চিদনুভূতির সূত্রপাত হয়। নিরোধের চরম অবস্থায় চিত্ত বৃত্তি-শূন্য হয়।" (তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৪২-৩৪৬)

তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য—"তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য হইল পূর্ণত্বলাভ এবং এই পূর্ণত্ব লাভের জন্য অপরিচ্ছিন্ন চিৎ-শক্তির সঙ্গে সর্বদা সংযোগ থাকা প্রয়োজন। অপরিচ্ছিন্ন চিৎ-শক্তির সংকোচ বা সুপ্তির ফলেই জীবের অপূর্ণতা বা বন্ধন এবং সেই শক্তির জাগরণ ও বিকাশেই তাহার পূর্ণতা বা মুক্তি। সদ্গুরু দীক্ষার মাধ্যমে জীবের এই প্রসুপ্তা শক্তিকে জাগাইয়া দেন।

মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ কি? সাংখ্য বা পাতঞ্জল যোগের মতে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইযা চিৎস্বরূপে আত্মা নিজেব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয। বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জড় হইতে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া চিনিতে পারে। এই স্বরূপটি দ্রষ্টার স্বরূপ। এই প্রকারে নিজের স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে কর্মবীজ দগ্ধ হইযা যায়। এই অবস্থায দেহ থাকে না, শুধু নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপ মাত্র স্বপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান থাকে। দেহবীজ দগ্ধ হইযা যাওয়াতে আর অভিনব দেহ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয না। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ বিদেহকৈবল্য

নামে অভিহিত করা হয়। এই স্থিতিলাভের পর জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া যায়।

তন্ত্রের বক্তব্য হইল, এই প্রকার বিদেহ কৈবল্যলাভ মনুষ্যজীবনের পরম লক্ষ্য হইতে পারে না। কারণ, বিদেহ কৈবল্যে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানক্রিয়া শক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল দিব্যশক্তির পূর্ণবিকাশ না হইলে শুধু কৈবল্য লাভ করিলেই মনুষ্যের পূর্ণত্ব লাভ হইল, ইহা বলা চলে না। পূর্ণত্ব লাভের জন্য অপরিচ্ছিন্ন চিৎ-শক্তির নিত্য সংযোগ থাকা আবশ্যক। ভগবৎ শক্তি মূলে চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তিরূপা হইলেও বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঐ মূল অব্যক্তশক্তিরই অভিব্যক্ত প্রকাশ মাত্র।

মূল শক্তি যে চিৎশক্তি তাহা মনুষ্যদেহে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম শক্তিরূপে বিরাজমান। তন্ত্রে এই চিৎশক্তি কুলশক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎ যেমন আনন্দরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ আনন্দ বহির্মুখে উচ্ছলিত হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা, জ্ঞান ও সর্বশেষে ক্রিয়ারূপে পরিণতি লাভ করে। যাহাকে আমরা বর্ণমাতৃকা (letters of alphabets) বলি তাহা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবেরই শাব্দিক দ্যোতনা মাত্র। তদনুসারে 'অ' হইতেছে অনুত্তর বা চিৎশক্তি, আ—আনন্দশক্তি, ই—ইচ্ছাশক্তি, উ—উন্মেষ বা জ্ঞানশক্তি এবং এ, ঐ, ও, ঔ—অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর ও স্ফুটতম ভেদে বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির পর আর শক্তির বিস্তার হয় না। তখন উহা প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরালবর্তী সকল শক্তিকে গুটাইয়া লইয়া সমষ্টিভাবে বিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বিন্দু অনুত্তর চিৎশক্তির সহিত যুক্ত হয়। বস্তুতঃ ইহা শিববিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর ঐ বিন্দু নিজেকে বিভক্তবৎ করিয়া দুইটি বিন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই বিন্দুর বিসর্গলীলা। এই বিসর্গলীলা-প্রসঙ্গে তত্ত্ব ও ভুবনের সৃষ্টি হয় এবং শিববিন্দু, বিসর্গের প্রভাবে হ-কার পর্যন্ত প্রসৃত হইয়া অহংভাবের বিকাশ করে। ইহাই পূর্ণ-অহন্তা। এই অহং এর প্রতিযোগীরূপে ইদংভাবের বিকাশ তখনও হয় না, ইদংভাবই বিশ্বের প্রতীক। সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে অহং হইতে পৃথক না হইয়াও পৃথক্‌ভাবে ইদং-এর প্রকাশ হয়। ইহাই মহাসমষ্টি সৃষ্টির পূর্বাভাস। মহাসমষ্টি সৃষ্টি হইতে সমষ্টি এবং সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির উদয় ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সৃষ্টির বহির্মুখী ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বিষয়-সৃষ্টির মূলে আছে প্রকৃতির সদৃশ-পরিণাম হইতে বিসদৃশ-পরিণামের উদ্ভব।

বিসর্গের দুই প্রান্তে আছে দুইটি কুণ্ডলিনী। আদি কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম প্রাণ-কুণ্ডলিনী। বহির্মুখ গতিতে সংবিৎ এখানে প্রাণরূপে

প্রকাশিত হয়—"প্রাক্ সংবিদ্ প্রাণে পরিণতা"। অন্তিম কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম পরা-কুণ্ডলিনী। ইহাই পরা সংবিৎ। ইহারই নামান্তর সপ্তদশী কলা 'অমা'। ইহা নিত্যোদিত। ইহাই অমৃত কলা।

"মনুষ্যদেহে সুপ্তরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই ক্রমিক উত্থানের কালে মনুষ্যের বিকাশের পরিপন্থী যাবতীয় বিকল্পজ্ঞানের উপশম হয়। চক্রের পর চক্র ভেদের ইহাই উদ্দেশ্য। কয়েকটি চক্রভেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার তৃতীয় নেত্র মল-শূন্য হইয়া স্বচ্ছ ও প্রসন্নরূপ ধারণ করে। বিকল্পসমূহের নিবৃত্তির ফলে নির্বিকল্পক স্বরূপ দর্শন আপনিই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ তখন জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন হয় এবং শিবোহং-রূপে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

শিবরূপী আত্মা যখন সৃষ্টির আদিতে পশু সাজিয়াছিলেন, তখন মাতৃকার সাহায্যেই নিজের স্বরূপ গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃকাগুলি স্বভাবসিদ্ধরূপে 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত উল্লসিত হয়। ইহাই অহন্তারূপী মহাশক্তির প্রকাশ, যাহাতে সর্বশক্তির সমাবেশ রহিয়াছে। পশু সাজিবার সময় আত্মার এই স্বাভাবিক ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া যায়। তখন এই আত্মা দৈন্য প্রাপ্ত হয় এবং নিজস্বরূপ হইতে সম্ভূত শক্তিবর্গের অধীন হইয়া পড়ে।

কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইলে চিৎ-শক্তি নিজের সম্বিৎরূপ মাত্র প্রকাশ করে। ইহা অতি প্রবল অগ্নিস্বরূপ। ইহাকেই চিদগ্নি বলা হয়। গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা, মলের পরিপাক, পুরুষকার অথবা অন্য কোন কারণে এই শক্তি জাগ্রত হইতে পারে। এই জাগরণের মূলে প্রাণ ও অপান শক্তির সাম্য স্থাপন জানিতে হইবে। প্রাণ ও অপান বলিলে এখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ শক্তি বুঝিতে হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির সাম্যভাবের নামই সমান বায়ুর ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তি। এই সময় নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে এবং সাধকের মন ও প্রাণ এই জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনীরূপা অগ্নিশক্তির সহিত একীভূত হয়। এই একীভূত শক্তির দ্বারা দেহস্থিত ছয়টি চক্রের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রকে আয়ত্ত করিতে হয়। এই ছয়টি চক্র পঞ্চভূত ও চিত্তের প্রতীক। এই ছয়টি চক্রের ক্রিয়া হওয়া মানেই পঞ্চভূতের শোধন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত শোধন। পঞ্চভূত শুদ্ধ হইলে তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধির ফলে পঞ্চভূতের শুদ্ধি হয়।

সৃষ্টিক্রমে বিন্দু, কলা ও নাদ অর্থাৎ মাতৃকার এই তিনটি স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। দেহস্থিত প্রত্যেকটি চক্রই এক একটি কমলের আকার। ইহাতে কমলের দলরূপে মাতৃকা বর্ণগুলি রশ্মির আকারে নিঃসৃত হইতেছে। ছয়টি

চক্র, যথা—ক) মূলাধাব চক্র, খ) স্বাধিষ্ঠান চক্র, গ) মণিপুর চক্র, ঘ) অনাহত চক্র, ঙ) বিশুদ্ধ চক্র এবং চ) আজ্ঞাচক্র।

ক) মূলাধাব চক্রেব চারিটি দলে চারিটি বর্ণ, যথা—ব, শ, ষ, স।

খ) স্বাধিষ্ঠান চক্রেব ছয়টি দলে ছয়টি বর্ণ, যথা—ব, ভ, ম, য, র, ল।

গ) মণিপুর চক্রের দশ দলে দশটি বর্ণ, যথা—ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ।

ঘ) অনাহত চক্রের দ্বাদশদলে দ্বাদশবর্ণ, যথা—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ।

ঙ) বিশুদ্ধ চক্রের ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরাত্মক বর্ণ, যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ।

চ) আজ্ঞা চক্রের দ্বিদল পদ্মে, দুইটি বর্ণ, যথা—হ, ক্ষ।

উক্ত বর্ণগুলি রশ্মির আকারে নিঃসৃত হইতেছে। ইহার পর একটা ব্যাপক ঢালা প্রকাশ ঊর্ধ্ববাক্‌রূপে নাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। সর্বান্তে কমলের কর্ণিকা হইতে বিন্দুরূপে চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরীর আসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জাগ্রত চিৎশক্তি দেহ হইতে উত্থিত হইয়া প্রত্যেকটি চক্রকে আক্রমণ করে। প্রথমে মূলাধার চক্রে এই আক্রমণ ঘটে। ইহার ফলে চক্রস্থিত চারিটি বর্ণ উক্ত চিদগ্নির প্রভাবে বিগলিত হইয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে ধারা বহিতে থাকে। এই ধারা নিজ প্রভাবে পর পর চাবিটি বর্ণকে জাগাইয়া এবং নিজের সহিত মিলিত করিয়া মধ্যবিন্দুর দিকে ক্ষিপ্র অথবা মন্দবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইলে নাদ উপসংহৃত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রতি চক্রের বিন্দুটি মধ্যমার্গ বা শূন্য পথে বিরাজ কবে। বর্ণ, নাদ ও বিন্দু প্রতি কমলেই বিদ্যমান রহিযাছে। প্রথম কমলের বিন্দুটি সমস্ত কমল গ্রাস করিবার পর ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্ব আকর্ষণেব ফলে উপরকাব চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্বের ন্যায় উহার বর্ণ, নাদ ও বিন্দুকে গলাইয়া ও নিজেব সঙ্গে একীভূত করিযা পূর্ববৎ মধ্যনাড়ীর একীভূত বিন্দুপথে ব্রহ্মনাডীর ঊর্ধ্ব আকর্ষণের ফলে ঊর্ধ্বদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পৃথক্ পৃথক্ বিন্দু তখন এক বিন্দুতেই পর্যবসিত হয়। এইভাবে ঐ বিন্দুও অন্য বিন্দুব সহিত অভিন্ন হইযা ক্রমশঃ মধ্যনাড়ীর দিকে ধাবমান হয। পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চচক্র ও মনোময ষষ্ঠ চক্র বিধ্বস্ত হইযা যায়। পঞ্চভূত ও যোগীর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প স্বচ্ছ প্রজ্ঞাতে ডুবিয়া যায়। ইহা বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী শক্তিরই উন্মেষপ্রাপ্ত অবস্থা।

ষট্‌চক্রভেদের পর ভ্রূ-মধ্যে নিম্নদেশ হইতে যাবতীয় বিকল্প তিরোহিত হইতে থাকে। তখন ললাটপ্রদেশে দেহাভিমান বর্জিত হইয়া পরম জ্যোতির অনুভবের শক্তি জন্মে এবং প্রতিদিন ঐ মহাজ্যোতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অন্তরতম ভাবে মহাশূন্যের মধ্যে সহস্রদল কমলের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূ-মধ্যস্থ বিন্দু হইতে সহস্রারের মহাবিন্দু পর্যন্ত অনেকগুলি স্তর আছে। এই সকল স্তর ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মহাশক্তি মহাবিন্দুস্থ পরমশিবকে আলিঙ্গন করেন। সুদীর্ঘকালের বিরহের পর শিবশক্তির এই মহামিলন সংঘটিত হয়। ইহাকেই শিবশক্তির সামরস্য বলা হয়। এই মিলনের ফলে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, সেই সুশীতল ধারাতে মন ও প্রাণ অভিষিক্ত হয় ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই ধারা পান করিতে থাকে। সমান বায়ুর ক্রিয়ার পর উদান বায়ুর ক্রিয়ার ফলে কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগতি নিষ্পন্ন হয়। এই ঊর্ধ্বগতি বস্তুতঃ সহস্রারে পরিসমাপ্ত না হইয়া—ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহার পর আর ঊর্ধ্বগতি থাকে না। তখন ব্যান-শক্তির প্রভাবে নিজের খণ্ডসত্তা অনন্ত ব্যাপকরূপ ধারণ করে। ইহাই সংক্ষিপ্তভাবে আত্মার নিজস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়ার ইতিহাস। বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, এবং সন্তানরূপ যোগীভক্ত তখন একই মহাসত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই পরিপূর্ণ অদ্বৈত স্থিতি এবং নিজের পূর্ণতা লাভ।

কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই মহাপথে চলা সম্ভবপর হয় না, পরম লক্ষ্যের প্রাপ্তি তো দূরের কথা। শুধু বিবেকপথে খণ্ড কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত হইতে ঊর্ধ্বে স্থানলাভ মানুষের পরম লক্ষ্য হইতে পারে না। নিজের সুপ্ত ভগবত্তা পূর্ণভাবে জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সফলতা আসে না। কুণ্ডলিনী না জাগিলে চিৎ ও অচিতের দ্বন্দ্বভাব কাটিতে পারে না। শক্তির সাধনা ব্যতীত শিবভাবের প্রাপ্তি দুর্ঘট এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণ ব্যতীত শক্তি সাধনা আরম্ভই হইতে পারে না।" (তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৪—২৮৮)।।

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব—এই প্রবন্ধটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত "কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব" প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ (দ্রঃ—তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৯—৩০৮)।।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ-প্রবর্তক নাথাচার্যগণ এবং আগমবিদ্‌গণ বলেন যে, মূলাধারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ না করিলে কর্ম, জ্ঞান কিংবা ভক্তি কোনটিই মুক্তি বা অনর্থনিবৃত্তির উপায়রূপে পরিণত হইতে পারে না। যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের সহায়তা

করে, তাহাই যথার্থ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তাহাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তদ্ভিন্ন কর্মাদি ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা কখনই সিদ্ধিদায়ক হয় না। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে। কুণ্ডলিনী যখন সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া চৈতন্যময় হইয়া যায়, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়, তাহা এবং "সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম" এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ব্রহ্মময়তা অনুভবের সাধনা—একই বস্তু। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি এই জাগরণেরই অবস্থাভেদ মাত্র। যখন জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, যখন নিদ্রা আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, তখনই পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার পূর্বে দ্বৈতস্ফুর্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকেই পূর্ণাহন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মূল অদ্বৈতাবস্থাটি পরম সাম্যাবস্থাস্বরূপ। উপনিষৎ ইহার স্বরূপ-নির্দেশ প্রসঙ্গে "পরমং সাম্যম্" এই পদই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে নামরূপ কল্পনা করা চলে না, ইহার বর্ণনা নাই—ইহা অবাঙ্মানসগোচর। আবার যাবতীয় নামরূপ ও বর্ণনার—এক কথায় সমগ্র বিশ্বের—ইহাই মূল। ইহাকে তত্ত্ব বা তত্ত্বাতীত উভয়ই বলা হইয়াছে। ইহা বিশ্বাত্মক (immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (transcendent)। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ (The Absolute)। কেহ যেন মনে না করেন, এই বিশ্বাত্মক দিক্‌টা মিথ্যা, বিশ্বাতীতই সত্য।

পরম সাম্যাবস্থার যেটা বিশ্বের দিক্ তাহা 'অপর' সাম্য। তাহাই মহাবিন্দু। এখানে শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সমরস—একাকার। ইহা নিত্য অবস্থা। এখানে অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে—অথচ সব একাকার।

যখন এই অপর সাম্য ভঙ্গ হয় অর্থাৎ স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয়, তখন এই মহাবিন্দুই শক্ত্যাংশে পরিণাম লাভ করে এবং শিবাংশে সাক্ষী থাকে। সাক্ষী অপরিণামী ও এক, কিন্তু শক্তি ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রসারিত হইতে থাকে। শক্তির প্রসারণ ও সঙ্কোচ, এই দুইটি অবস্থা আছে। সাক্ষীর তাহা নাই—সাক্ষী সকল অবস্থার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, অর্থাৎ ইহা যেমন আত্মভাবাপন্ন সাম্যময়ী শক্তির দ্রষ্টা, তেমনই শক্তির প্রসারণ ও সঙ্কোচ নামক অবস্থাদ্বয়েরও দ্রষ্টা। সাক্ষী বিশ্বাতীত, সুতরাং নিত্যই কালচক্রের উর্ধ্বে অবস্থিত, অথচ ইহা কালচক্রের নাভিস্বরূপ। শক্তির প্রসারকে সৃষ্টি বলে, সঙ্কোচকে সংহার বলে। প্রসার ও সঙ্কোচ উভয়েরই আদি ও অন্ত সাম্যাবস্থা। মধ্যে বৈষম্য কিংবা কালচক্রের আবর্তন। অর্থাৎ বৈষম্যের পটভূমিতে সাম্যাবস্থা নিহিত রহিয়াছে।

সৃষ্টি ও সংহার অর্থাৎ প্রসার ও সঙ্কোচ, শক্তির স্বভাব। ইহা নিয়তই হইতেছে। এই বহির্গতি ও অন্তর্গতি, অধোগতি ও ঊর্ধ্বগতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সম্মিলিতভাবে বৃত্তরূপে কম্পিত হয় এবং কালচক্র নামে অভিহিত হয়।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রভা নির্গত হয়, জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেখান হইতে যেমন চারিদিকে মণ্ডল রচিত হয়, বিন্দুও সেইভাবে প্রসারিত হয়। ক্রমবর্ধমান—কিন্তু বৃদ্ধির সীমা আছে। কারণ, সৃষ্টির প্রসার অনন্ত হইতে পারে না। আমরা পূর্বেই সঙ্কোচ ও প্রসার এই দুইটি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছি। প্রসারশক্তি যতই ক্ষীণ হইয়া আসে, সঙ্কোচশক্তি ততই পুষ্ট হইতে থাকে। সংকোচশক্তির ক্ষয়ে প্রসারের পুষ্টিও সেইপ্রকার। সংকোচ ও প্রসারশক্তি ক্রমশঃ একটির পর অপরটির প্রাকট্য লাভ করে, ইহাই কালচক্রের আবর্তন—ঊর্ধ্বতম স্তর হইতে সর্বনিম্নভূমি পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব এই চক্রে আবর্তিত হইতেছে। বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এই চক্রের আবর্তন হইতেছে। এইভাবে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ মধ্যস্থ বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাকে সাংখ্যদর্শনে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম, অনুলোম ও বিলোম বলে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাকেই বলে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি। উত্তরায়ণ বা ঊর্ধ্বগতিকে দেবযান এবং দক্ষিণায়ন বা অধোগতিকে পিতৃযান বলে। যাঁহারা তন্ত্রের ষোড়শনিত্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই সৃষ্টি-সংহারই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষরূপে মাসচক্র। চন্দ্রের ষোড়শীকলা অমৃত-স্বরূপা ও বিন্দুস্বরূপা।

বিন্দুরূপা সাম্যশক্তির বৈষম্যকালে মূল-বিন্দু হইতে তিনটি বিন্দু পৃথগ্‌ভাবে প্রকটিত হয়। বিন্দুর প্রাকট্যে রেখার সৃষ্টি। বিন্দু কম্পিত বা স্পন্দিত হইলেই রেখা উৎপন্ন হয়। রেখা চারিদিকে সমভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া, মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম মণ্ডলটি সহস্রার নামে পরিচিত। বিন্দুটি ব্রহ্মবিন্দু বা আদিসূর্য, সহস্র রেখাই সহস্র অংশু বা চারিদিকে প্রসারিত সহস্ররশ্মি। ইহা জ্যোতির্ময় লোক। ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রাজ্য।

এই জ্যোতির্মণ্ডলের বাহিরে দ্বিতীয় বিন্দুর মণ্ডল। ইহাকে তটস্থমণ্ডল বলা যাইতে পারে। এই তটস্থমণ্ডলের কেন্দ্রে 'রজঃ' নামক দ্বিতীয় বিন্দু। 'রজঃ' শব্দের অর্থ কণা বা অণু। প্রথম স্তর অখণ্ড জ্যোতির্ময় ধাম। প্রসারণ-শক্তি যখন ঐ স্তরের চরম সীমা অর্থাৎ জ্যোতিরেখার সীমা ছাড়াইয়া বাহির হয়, তখন তাহারই প্রেরণায় ঐ জ্যোতিরাশি হইতে কণাসকল বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সকল কণা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতন অখণ্ড সত্ত্বের অংশ। অখণ্ড সত্ত্বের ন্যায় এই সমস্ত খণ্ড সত্ত্বও জ্যোতির্ময়, চৈতন্যময়। পাঞ্চরাত্রগণ ও ভাগবত-সম্প্রদায়

এই সকল কণাকে 'চিৎকণ' নাম দিয়াছেন। শৈবাচার্যগণের পরিভাষা অনুসারে ইহাদের নাম 'বিজ্ঞানাকল'। ইহাই বিশুদ্ধ জীবভাব। এখানে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, প্রথম বিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিদাকাশ। ইহাকে 'পরব্যোম' শব্দেও নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিন্দুব প্রসাবক্ষেত্রই চিত্তাকাশ।

এই দ্বিতীয় মণ্ডলের বাহিরে গভীর অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল। ইহা অখণ্ড তমোময এবং তৃতীয বিন্দুর প্রসাবণ হইতে উদ্ভুত। ইহাকে ভূতাকাশ বলিতে পারা যায়। ইহাই মাযার আবরণ। বৈষ্ণবগণ এই স্তরকে বহিরঙ্গ নাম দিযাছেন। যে প্রসারণশক্তি বিশুদ্ধ জীবভাব পর্যন্ত অভিব্যক্ত কবিযাছে, তাহা তখনও ক্রিয়াশীল বলিযা জীবরূপ বিন্দুপ্রসৃত হইতে হইতে রশ্মিরূপে এই অন্ধকাব রাজ্যে প্রবেশ করে। এই ভূতাবরণ পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিযা তটস্থ দ্বিতীয বিন্দু ব্যাকৃত অবস্থায পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া প্রসাবণের ফলে পঞ্চমণ্ডলরূপে পরিণাম লাভ করে। ইহাবই পাবিভাষিক নাম বিশুদ্ধাদি পঞ্চ চক্র। তটস্থ দ্বিতীয় বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয়, তাহাব নাম আজ্ঞা চক্র। তাহার ঊর্ধ্বেই সহস্রার চক্র। মূলাধার বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল।

মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইলেই জীবকণা বা সুষুম্নাবাহী জীববশ্মি স্থূল পঞ্চীকৃত ভূতময় আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে। এই স্তরেই স্থূল জগতের জীব গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার স্থূল বস্তু ছিল, আছে এবং হইবে সে সমুদায়ের বীজ এই স্তবে চিরবর্তমান। মহাপ্রলযেব সময় এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইযা পাঁচভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি চক্রে বিলীন হইয়া যায। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা প্রসার শক্তির ক্রিয়াবসানে সঙ্কোচশক্তির উন্মেষ হইলে হইযা থাকে। সঙ্কোচশক্তির ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই পঞ্চচক্র ক্রমশঃ উপসংহৃত হইয়া পঞ্চবিন্দুরূপ ধারণ করে এবং পঞ্চবিন্দু পরে মিলিত হইযা এক হইয়া যায। আজ্ঞামণ্ডল অথবা তটস্থ চিৎ-পরমাণুপুঞ্জও এইপ্রকারে উপসংহৃত হয। সহস্রার মণ্ডলও মূল সত্ত্বাবিন্দুতে আকুঞ্চিত হইয়া যায। তদনন্তর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন বিন্দু বা মূলত্রিকোণরূপা মহাশক্তিব তিন কোণ বৈষম্য পবিত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ মহাবিন্দুতে সাম্যভাবে অবস্থান করে। এই মহাবিন্দুই বৈষ্ণবগণের মহাবিষ্ণু, ত্রিক মতাবলম্বী শৈবাচার্য এবং শাক্তাগমবিদ্‌গণের সদাশিব। বেদান্তে ইহাকে তুরীয় বলে—ইহা সামবস্য অবস্থা। এখানে সাক্ষী ও সাম্যশক্তি একাকার—অদ্বৈত ভাবাপন্ন। এখানে দেশ নাই, কাল নাই, কলা নাই, মন নাই—এমন কি উন্মনীশক্তি পর্যন্ত এখানে নিষ্ক্রিয হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও অবস্থা আছে। কেহ কেহ তাহাকে তুরীয়াতীত নাম দিয়াছেন। শৈব ও শাক্তগণের

শিব-শক্তি বা কামেশ্বর-কামেশ্বরী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধা-কৃষ্ণ এই মহাবিন্দুর উর্ধ্বে অবস্থিত। দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবন—এই ধামত্রয় মহাবিন্দুর পরপারে অবস্থিত। চিদ্‌ঘন সদাশিবতত্ত্ব ভেদ না করিলে অর্থাৎ আচার্য শঙ্কর প্রদর্শিত নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, লীলামধ্যে প্রবেশলাভ হয় না। সত্ত্বমণ্ডলের বাহিরে বিশুদ্ধ সত্ত্বকে মহাযানী বৌদ্ধগণ 'বজ্রধাতু' বলিতেন। তাঁহাদের 'সুখাবতী' এবং অন্যান্য নিত্যধাম এই উপাদানে গঠিত।

স্থূলস্তরে আসিয়া প্রসারশক্তি প্রতিহত হয়। স্থূলজগৎ-ই বাহ্যজগৎ। বাহ্যজগতে স্থূলদেহে কালচক্র আবর্তিত হইতে থাকে। এই আবর্তনমার্গের একাংশ ইড়া (বাম) ও অপরাংশ (দক্ষিণ) পিঙ্গলা। এই উভয়মার্গের প্রত্যেকটির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট নাড়ী মৎস্যজালের ন্যায় সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। প্রসারশক্তি স্থূলে আসিয়া যখন প্রতিহত হয়, তখন জীবও স্থূল কোষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—পূর্বস্মৃতি ভুলিয়া যায়, বৈষ্ণবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া ইড়া-পিঙ্গলামার্গে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই সঞ্চারকে সংসারগতি অথবা কালচক্রে পরিভ্রমণ বলা হয়। যে শক্তিপ্রবাহ প্রথমতঃ জ্যোতিরূপে ও পরে নাদরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই স্থূলস্তরে আসিয়া প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিঃ নাদ ও প্রাণ একই শক্তির ক্রমিক বিকাশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ু প্রভৃতি প্রাণশক্তিরই বিকাশ।

জীব স্থূলাবরণে বেষ্টিত হইয়া সূক্ষ্ম সুষুম্নামার্গে প্রবেশপথ পায় না। পূর্বসংস্কার বা বাসনা, অভিমান বা কর্তৃত্ববোধ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বা ভোগবিলাস (যাহাকে কামনা বলে), এই তিনটি আবরণে জীবের স্থূলত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয়াদিরূপে এই স্থূলাবরণ জীবকে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেয় না। জীবমাত্রই জ্ঞান চায়, আনন্দ চায়, অমরত্ব চায়—এককথায় ব্রাহ্মীস্থিতি চায় এবং সেই প্রত্যাশাতে বিষয়রাজ্যে পরিভ্রমণ করে। বস্তুতঃ বিষয়াদি তাহার প্রার্থনীয় নহে—আনন্দই প্রার্থনীয়। আনন্দের সাধনরূপে গৌণভাবে সে বিষয়াদির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু যুগ-যুগান্তর, এমন কি কল্প-কল্পান্তর, লোক লোকান্তরে সঞ্চরণ করিয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে সর্বত্রই বাসনা, কামনা ও কর্তৃত্বাদি সহকারে পরিভ্রমণ করে। যতদিন বাসনাদির উচ্ছেদ না হইবে ততদিন সুষুম্নায় প্রবেশ-পথ পাইবে না। কারণ স্থূলবস্তু সূক্ষ্মমার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতিরও তাৎপর্য এই স্থূলতা বিসর্জন ভিন্ন অপর কিছু নহে। পঞ্চভূত যখন শুদ্ধ হয়, তখন পঞ্চীকরণ থাকে না, এমন কি পঞ্চবিন্দু পর্যন্ত এক বিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই এক বিন্দু

নির্মল হইয়া জ্ঞানচক্ষুঃ অথবা তৃতীয় নেত্রের বিকাশ করে। ইহাই বিশুদ্ধ জীবাবস্থা। ইহার পর ঈশ্বর-তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হওযাই উপাসনা। উপাসনাতে আজ্ঞাস্থ বিন্দু ও সহস্রাবস্থ মহাবিন্দুতে ভেদ থাকে, অভেদও থাকে। ক্রমশঃ এই ভেদাভেদের মধ্যে ভেদাংশ বিগলিত হইয়া অভেদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ। ইহাব পর ত্রিগুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা বা ব্রহ্মত্ব।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীযমান হইবে যে, কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জীবের উর্ধ্বগতি সম্ভবপব নহে। অবণিস্থ সুপ্ত (latent) অগ্নি যেমন সংঘর্ষণে উদ্দীপিত হয়, সেইপ্রকার সাধন প্রণালী দ্বারা প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাইতে হয়। অগ্নি প্রকটিত হইয়া যেমন ইন্ধনকে দগ্ধ করে, কুণ্ডলিনী জাগ্রতা (চৈতন্যময়ী) হইলে তেমনই সাধনা বিলুপ্ত হয়। বাহ্য সাধনমাত্রই—বিচার, ভক্তি, অথবা হঠ কিংবা মন্ত্রযোগাদি—পুরুষকার সাপেক্ষ, কর্তৃত্ববোধমূলক। এই কর্তৃত্ববোধ ক্রমশঃ কুণ্ডলিনী-চৈতন্যের সহিত লুপ্ত হইযা আসে। কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হইতে হইতে কুণ্ডলিনী অধিকতর জাগ্রত হইয়া উঠিলে তখন আর বাহ্য সাধনার প্রয়োজন থাকে না; স্বভাবের নিয়মেই সকল কার্য হইতে থাকে। অনুকূল স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে নৌকা যেমন স্রোতের মুখে পড়িয়া সমুদ্রেব দিকে আপনিই ভাসিয়া চলে, পৃথক চেষ্টা করিতে হয় না, সেই প্রকার কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তাহার প্রবাহে প্রাণ-মন ঢালিযা দিলে জীবকে আর ব্রহ্মাবস্থা লাভের জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না। (প্রাচীন বৌদ্ধগণ ইহাকে 'স্রোত-আপন্ন' নাম দিয়াছেন। বুদ্ধদেব শক্তি-সঞ্চারপূর্বক শিষ্যকে এই উর্ধ্বস্রোতে স্থাপন করিতেন। ইহা সুষুম্নাবাহী উর্ধ্বস্রোত ভিন্ন অপব কিছু নহে)। উর্ধ্বাবিন্দুস্থিত আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অন্তর্মুখ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সাম্যাবস্থায গিয়া স্থিতিলাভ কবে।

কুণ্ডলিনীর জাগরণের (চৈতন্যের) সঙ্গে সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলায় প্রবহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবেশ করে এবং সুষুম্না পথেও উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ী অথবা আনন্দময় কোষেও গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য অবস্থা। আনন্দময় কোষেও যখন আব লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

উর্ধ্বস্থ সত্ত্ববিন্দু এবং অধঃস্থ তমোবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে মেরু (Axis) বলা চলে। এই রেখার উর্ধ্ববিন্দু উত্তরমেরু এবং অধোবিন্দু দক্ষিণ মেরু (North

and South Poles)। উভয় বিন্দু আকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট। অধোবিন্দুর আকর্ষণের নাম 'মাধ্যাকর্ষণ'। উর্ধ্ববিন্দুর আকর্ষণ 'সংকর্ষণ' নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃপা। আজ্ঞাস্থ বিশুদ্ধ জীব বা কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ উভয় আকর্ষণের ঠিক মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্তমান। তাঁহাদের উপাধি নির্মল বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া হয় না—এইজন্য ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তাঁহাদের স্থিতি নাই। উর্ধ্বদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতি ভগবৎ-কৃপাশক্তিও ক্রিয়া করে না। ইঁহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঁহারা মায়াতীত হইয়াও মহামায়ার অধীন। আগমে ইঁহাদের নাম বিজ্ঞানাকল দেওয়া হইয়াছে।

ঐ সমস্ত তটস্থপ্রাপ্ত জীব যখন কোন অনির্বচনীয় কারণে উর্ধ্বমুখ হয়, তখন তাহার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। তখন আর সে তটস্থ নহে, তখন সে সহস্রারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন রেখা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ভাবের সাধনা—ইহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দু যেমন পাঁচভাগে বিভক্ত, সেই প্রকার শুদ্ধ সত্ত্বস্তরও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক এক স্তরে এক একটি ভাবের প্রাধান্য। শান্ত হইতে মাধুর্য পর্যন্ত এই পাঁচ স্তর প্রসারিত রহিয়াছে। মাধুর্যই শুদ্ধ সত্ত্ববিন্দুর অন্তরতম অথবা উর্ধ্বতম ভাব। যখন ইহাও অতিক্রান্ত হয়, তখনই পূর্ণাবস্থা লাভ হয়, তৎপূর্বে নহে। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা জাগরণ পূর্ণ হইল বলা যায়। কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে একমাত্র অদ্বিতীয় ও পূর্ণ বস্তুতেই স্থিতি হয়, সমগ্র জগৎ নিরাধার হইয়া ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ব্রাহ্মীস্থিতি, শাশ্বত পদে অবস্থান সুসিদ্ধ হয়।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কুণ্ডলিনীতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের—শুধু দেহ কেন, জগতের যাবতীয় তত্ত্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যিনি মুক্তি মার্গের পথিক, তাঁহাকে জড়তত্ত্ব, চিৎতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব—সকল তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তত্ত্বমাত্রই বৈষম্যাবস্থার অন্তর্গত। সাম্যাবস্থা তত্ত্বের অতীত। তবে তাহাকে যে কখন কখন তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সে কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্য।

কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইলেই জীবের উর্ধ্বগতি অথবা ক্রম-মুক্তির স্তর অনুযায়ী আরোহণ আরম্ভ হয়। কুণ্ডলিনীর ক্রমোন্নতিতে সমাধির ক্রমবিকাশ ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত একাগ্রভূমিতে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ তাহার অবলম্বন আছে। অবশ্য এই অবলম্বন ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রচলিত পাতঞ্জল মতানুসারে অস্মিতাই এই বিন্দু, সেইজন্য সাস্মিত সমাধিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমাবস্থা। এই ভূমিতে

প্রজ্ঞার উদয় হইলে চিত্ত নিরালম্বন হইয়া পরিপূর্ণ শুদ্ধি লাভ করে। তখন উপায়-প্রত্যয়াত্মক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হয়। এই অবস্থায় ক্লেশ থাকে না, কর্মাশয় থাকে না, পূর্বসংস্কার, কর্তৃত্ববোধ কিছুই থাকে না—চিত্ত সকল প্রকার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিমল ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণকায়াদির প্রসূতি।

সাংখ্যের কৈবল্য পূর্ণ অবস্থা নহে। উপাধিবিহীন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বহু হইতে পারে না। উপাধিবিহীন শুদ্ধ চৈতন্যে ভেদ প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। উপাধির বহুত্ব হেতু তদুপহিত চৈতন্যেরও বহুত্ব অঙ্গীকার করা চলে। সাংখ্যের বহু পুরুষ বস্তুতঃ বহু সত্ত্বে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। সত্ত্বের বহুত্ব যে খণ্ডতানিবন্ধন তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এক অখণ্ড সত্ত্বই খণ্ডিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এক অখণ্ড সত্ত্বই বহুর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। সুতরাং বহুপুরুষ যতক্ষণ এক উত্তম পুরুষকে প্রাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ যথার্থ সাম্যভাব লাভের আশা সুদূর-পরাহত।

সুতরাং সাংখ্যের মুক্তি প্রকৃত মুক্তি নহে। তখনও যে কুণ্ডলিনী সম্পূর্ণ চেতন হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধনার প্রকর্ষতায় সাধকের চিত্তে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্যের বিকাশ হইলেই সাংখ্যদৃষ্টিতে ঈশ্বরত্ব লাভ হইল বলা চলে। কিন্তু এ ঐশ্বর্য অনিত্য। মোট কথা, সাংখ্য নির্দিষ্ট সাধনে জীব তটস্থভাব হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে পারে না। তটস্থবিন্দু ঊর্ধ্ববিন্দুর আকর্ষণের বহিঃসীমায় অবস্থিত, তাই সহস্রারে প্রবেশ পায় না। তখনও আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না বলিয়া কুণ্ডলিনী আংশিকভাবে প্রসুপ্ত থাকে। শৈবাগমের মতে ইহা একপ্রকার 'বিজ্ঞানাকল' অবস্থা। বৈধী-ভক্তি এবং উপাসনা বলে খণ্ড সত্ত্ব, অখণ্ড সত্ত্বের ধারায় অর্থাৎ আদি সূর্যের একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করে এবং ক্রমশঃ সেই রশ্মি অবলম্বনে কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতে থাকে। খণ্ড সত্ত্বে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রদল কমলের নিত্য বিভূতি প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে। ভাব ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া বিধিকোটি অতিক্রম করে এবং রাগরূপে পরিণত হয়। রাগেরও ক্রমবিকাশ আছে। দাস্যভাব পর্যন্ত ঐশ্বর্যাবস্থার অনুভব হয়, পরে দাস্যভাবের অতীত হইলেই মাধুর্যাবস্থার বিকাশ হইয়া থাকে। মাধুর্যাবস্থা সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তরূপ স্থূলতঃ ত্রিবিধ। তন্মধ্য কান্তভাবেই মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণতি লাভ করে। এই মহাভাব, বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতি কারণ বশতঃ শৃঙ্গাররসে পরিণত হয়। ইহাই আদিরস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শান্ত ও শৃঙ্গার—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আদিরস, তাহা লইয়া সাধক সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। তবে যাঁহারা লীলানুরাগী, তাঁহারা

শৃঙ্গার রসকেই আদিরস বলিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শান্তরসকে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্থান প্রদান করেন। মোট কথা শান্ত ও শৃঙ্গার এই দুইটি রস আস্বাদনের প্রাপ্ত অবস্থা। কাশ্মীরীয় শৈবাচার্যগণ যদিও শান্তরসকে প্রধান বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা শিবশক্তির সামরস্যরূপে শৃঙ্গারকে শান্তের সঙ্গে সমন্বয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুব রসতত্ত্বের শিক্ষায় শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য।

আমরা যাহা বলিতেছিলাম তাহা হইল, কুণ্ডলিনীর ক্রমিক চৈতন্যে বা জাগরণে ঊর্ধ্ববিন্দু পর্যন্ত জীব উত্থিত হয়। কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই লীলাভূমির অপর পার আয়ত্ত হইয়া যায়। তখন সাম্যভাবে স্থিতি হয়। সেইটিই উপশম বা শান্ত অবস্থা। কাহারও কাহারও পরিভাষানুসারে উহাই নির্বাণ পদ। সুতরাং শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাকট্যে শৃঙ্গাব-রসই সর্বরসের সারভূত আদিরস এবং গুণাতীত অবস্থায় সে শৃঙ্গার-রসের আস্বাদও থাকে না। তখন পূর্ণ শান্তভাব।

সদ্‌গুরুতত্ত্ব

ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। এমন কোনো ধর্মমত বা ধর্মপথ ভারতে নাই, যেখানে গুরুর প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হয় নাই। অতএব গুরুতত্ত্বের আলোচনা খুবই একটি অত্যাবশ্যকীয় আলোচনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু কে? তদুত্তরে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে যিনি শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিযা দেন, তিনিই সদ্‌গুরু। সহজভাবে আমরা দেখিতে পাই, একজন আর একজনকে শিক্ষা না দিলে যে-কোনো বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। সেইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যার জ্ঞান সদ্‌গুরু শিক্ষা না দিলে হাজার চেষ্টা করিয়াও কেহ উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কিন্তু এমন দুই চারিজন আশ্চর্য ভাগ্যধর প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ জগতে জন্মিয়াছেন যাঁহারা বাহিরে গুরুকরণ না করিয়াই ভিতর হইতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধ্যাত্মবিদ্যার অধিকারী হইয়াছেন। ইঁহাদের অধ্যাত্মজ্ঞানকে 'প্রাতিভ'জ্ঞান বলে। এরূপ ব্যক্তি দুর্লভ। এইরূপ অসামান্য দুর্লভ দুই একজন ছাড়া সবাইকেই অধ্যাত্মশিক্ষা লাভের জন্য গুরুর সাহায্য লইতে হয়---ইহাই গুরুবাদের ভিত্তি।

সুতরাং সাধারণ বিচারে গুরু একজন শিক্ষক ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার পথ বা মত অসংখ্য। কারণ তিনি এক হইয়াও বহু বিচিত্র রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং লীলা করিতেছেন। সুতরাং যিনি যে ধর্মমত বা ধর্মপথের গুরু, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি যাহা শিখিয়াছেন বা যে অধ্যাত্মবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাই তিনি অপরকে শিক্ষা দেন; এবং যে সব ক্রিয়া-কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন সেই সব ক্রিয়া-কৌশলও দীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি নিজে যে পথে চলিয়াছেন সেই পথটাই দেখাইয়া দেন। কারণ, যিনি যে পথে চলেন নাই তিনি সেই পথ সম্পর্কে উপদেশ দিবার অধিকারী নহেন। কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ফিজিক্স পড়ান না বা ফিজিক্সের অধ্যাপক দর্শন পড়ান না। এই দৃষ্টিতে যখন গুরুকে দেখি তখন তাঁহাকে অধ্যাত্মপথে চলিবার একটি নির্দিষ্ট পথ-প্রদর্শক বলিয়া গণনা করি।

গুরু কে? না, যিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া আত্মস্বরূপের প্রকাশ ঘটাইযা দেন তিনিই গুরু। সেইজন্য গুরুর বন্দনা-মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকযা।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যাঁহার মধ্যে অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইযা জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হইযাছে, একমাত্র তিনিই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিব অধ্যাত্ম পথে চলিবার পথ-প্রদর্শক হইতে পারেন, অন্যথায় নহে। উদাহরণস্বরূপ ধবা যাক একটি লণ্ঠন। অন্ধকারের মধ্যে একটি লণ্ঠন জ্বালিলে অন্ধকার দূর হইয়া যায। প্রথমে মনে হয় লণ্ঠনই অন্ধকার দূর করিতেছে। একটু লক্ষ্য কবিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, লণ্ঠনের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহাই অন্ধকার দূর করিতেছে। লণ্ঠন গুরুব দেহ, ভিতরের অগ্নি চিদুজ্জ্বল পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রভা ভূতশুদ্ধ চিত্তশুদ্ধ গুরুর দেহের মধ্যে অত্যন্ত ভাস্বর ভাবে প্রকাশিত হয়। যে লণ্ঠনের চিম্‌নি অনুজ্জ্বল, সেই লণ্ঠনের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও আলো বিকিরিত হয় না। সেইরূপ ভূতশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি হইয়া যাঁহার চিদাকাশ জ্ঞানোদ্ভাসিত হয় না, অর্থাৎ যিনি মায়ান্ধকারের পরিধির ঊর্ধ্বে চিন্ময় আলোর রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পান নাই, তিনি কিরূপে অপরকে পথ দেখাইবেন? সেইজন্য এইরূপ ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয। ইহার কারণ এই যে দেহের ও মনের অপূর্ণতা, অশুদ্ধতা অর্থাৎ লণ্ঠনের ভূষা-পড়া কালো চিম্‌নি উহার মধ্যস্থ অগ্নির জ্যোতি-বিকিরণী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। তাই সদ্‌গুরুর জন্য, যাঁহার ভিতরে সত্য জাগ্রত হইয়াছে, এমন শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সাত্ত্বিক চিত্তে অপেক্ষা করিতে হয়। সদ্‌গুরু লাভের জন্য আত্মপ্রস্তুতির দরকার, যাতে যেদিন তিনি আসিবেন যেন তাঁহার জন্য হৃদয়াসন যোগ্যভাবে পাতিযা দিতে পারি। যতদিন সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ না পাওয়া যায় ততদিন যেন নিজের সরল, সহজ বুদ্ধিতে সৎপথে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাইতে পারি। ইহাই সদ্‌গুরু লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহার জন্য অর্থাৎ নিজের আধার অনুসারে সদ্‌গুরু নির্দিষ্ট সত্যপথ লাভের জন্য হয়ত দুই চারি জন্ম ঘুরিতে হইবে, তথাপি শুদ্ধ চিত্তে সাত্ত্বিক মনে নিষ্কাম কর্ম করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ, সদ্‌গুরু বহু পূণ্যে বা ভগবানের অহেতুক কৃপায লব্ধ হয়। যে ভূমিতে হল কর্ষিত হইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, একমাত্র তাহাতেই কৃপার বারি ও বীজ পতিত হইলে দেখিতে না দেখিতে তাহা রমনীয় ফলভারে শ্যাম-শোভায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া যথার্থ যোগপথে আরূঢ় হইলে আধ্যাত্মিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী, এবং বিকাশের স্তবগুলি উত্তরোত্তর অধিকৃত হইতে থাকে। সদ্‌গুরুর শক্তি

সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তি। তাহাকে অববোধ করিবাব সামর্থ্য জাগতিক কোন শক্তিতে নাই। এইজন্য একবার ঐ শক্তি প্রস্তুত ক্ষেত্রে অর্থাৎ আধারে বীজরূপে পতিত হইলে তাহাব সুফল অবশ্যম্ভাবী। তবে শিষ্যের সাধন ক্রিযায শিথিলতা এবং জড়তা প্রভৃতির প্রভাবে আধ্যাত্মিক বিকাশে বিলম্ব হইতে পারে।

যেখানে সহজচক্ষে গুরুকে সামান্য মানব বলিয়া মনে হইবে, যেখানে সাধন করিবার পবেও সত্যের আভাস মিলিবে না, যেখানে গুরুমুখ-নিঃসৃত মন্ত্র মনকে একনিষ্ঠ করিতে অপারগ হইবে, শিষ্যের আধার অনুসারে যে পথে চলিলে প্রকৃতই নির্বিঘ্ন যাত্রা হইবে সেই পথ যদি না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর শিষ্যকে এক গুরু হইতে অন্য গুরুর অন্বেষণে ধাবিত হইতে কোন বাধা আছে কি না শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত।

আমরা অনেক সময় ঝোঁকের মুখে বা খেয়ালেব বশে বা অনেকের দেখাদেখি গুরুকরণ করিয়া ফেলি। ইহার কারণ আমাদের অপেক্ষা করিবার শক্তির অভাব, নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপার জন্য উন্মুখ করিয়া শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্যের অভাব এবং আত্মপ্রস্তুতির রুচির অভাব।

চিত্তেব আত্যন্তিক ব্যাকুলতাই সদ্‌গুরু লাভের অব্যর্থ নিদর্শন। সদ্‌গুরু লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাকে না পাওয়ার জন্য যে তীব্র অভাববোধ, শূন্যতাবোধ, তাহাই সদ্‌গুরুর কৃপা-প্রাপ্তির পূর্ব সূচনা। আমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছি না কবে এবং কিভাবে সদ্‌গুরু লাভ হইবে। কিন্তু যিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন তিনি পূর্ব হইতেই আমাকে জানেন এবং আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সমযের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং ধৈর্য ধবিযা কালের প্রতীক্ষা করাই উচিৎ।

একমাত্র ভগবানই সদ্‌গুরু। যিনি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হন তাঁহাকেও এইজন্যেই সদ্‌গুরু বলা হয। যোগযুক্ত সিদ্ধ পুরুষের ভিতর দিয়াই ভগবানের করুণাশক্তি সাধাবণতঃ শিষ্যের উপর বর্ষিত হয়। এইজন্য নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র করিবার চেষ্টা করিতে হয। আধার নির্মাণ প্রথমেই আবশ্যক। কৃপা যখনই আসুক নিজেকে তাহার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিতে হয়।

সদ্‌গুরু বা শ্রীগুরুর সংজ্ঞা ও স্বরূপ—সদ্‌গুরু বা শ্রীগুরু কে? তাঁর স্বরূপ কি প্রকার? সেই গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইলঃ

শ্রীগুরুর সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি প্রথমেই গুরু-বন্দনার শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"এই শ্লোকটি শ্রীগুরুর নমস্কার শ্লোক। লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে গুরুকে শ্রীগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'শ্রী'শব্দ 'পরাশক্তি'র বাচক, সুতরাং শ্রীসহিত বা শ্রীযুক্ত গুরুই শ্রীগুরু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গুরু শক্তিহীন হইলে তাঁহা দ্বারা জীব বা জগতের কল্যাণসাধন সম্ভবপর হয় না। শ্রীরহিত গুরু বস্তুতঃ গুরুপদ বাচ্যই নহেন। তন্ত্রশাস্ত্রে স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে নিত্যমিলিত গুরুকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্ররহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাবতীয় আধারকমল বিদ্ধ এবং অতিক্রম করিতে করিতে উত্থিত হইয়া সহস্রদলের বিন্দুস্থানে পরমশিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলন নিত্য মিলন। এই মিলনে শিবরূপী গুরু শক্তিযুক্তরূপে সাক্ষী জীবের নিকট নিরন্তর অপরোক্ষভাবে প্রকাশিত হন। জীব সাধনবলে অথবা ভগবৎকৃপায় কোন শুভ মুহূর্তে এই মহামিলনের অবস্থা লাভ করে। কিন্তু শ্রীগুরু নিত্যই নিজশক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত থাকেন। তাই তিনি নমস্য।

'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলিতে এই চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরম গুরুতত্ত্বই জীবের নমস্কারের বিষয়রূপে লক্ষিত হইয়াছে। নমঃ বলিতে বুঝায় ন মম অর্থাৎ আমার নয় অর্থাৎ তোমার। আমি ভাব এবং তন্মূলক মমত্বভাব যাঁহাকে অর্পণ করা যায় তাহাই আমির পক্ষে নমস্য। এই নমস্কার শ্লোকে 'শ্রীগুরু'তে আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে, 'শ্রীহীন গুরু'তে নহে।

শ্রীগুরুর স্বরূপটি বুঝাইবার জন্য শ্লোকের পূর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে পরমতত্ত্ব উপেয়রূপে এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি উপেয় তাঁহাকে 'পরমপদ' বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর যিনি এই পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই শ্রীগুরু। বস্তুতঃ উপেযরূপে পরমপদ এবং উপায়রূপ শ্রীগুরু মূলতঃ অভিন্ন। কারণ উভয়ে স্বরূপগত ভেদ থাকিলে একটির দ্বারা অপরটির প্রাপ্তি বা প্রকাশন সম্ভবপর হইত না। কারণ যে যাহা নয় সে তাহা জানে না এবং জানাইতে পারে না।

জীবের নিকট সেই পরমপদ প্রকাশিত হয় না, যতক্ষণ জীবের তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ জ্ঞান নেত্র উন্মিষিত না হয়। শ্রীগুরুই এই জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ করাইয়া দেন। সেইজন্য অপর একটি শ্রীগুরুর নমস্কার শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

অনাদি অজ্ঞান পাশে আবদ্ধ জীব যতক্ষণ শ্রীগুরুর কৃপায় এই জ্ঞাননেত্রের উন্মীলনের সৌভাগ্য লাভ না করে ততক্ষণ তাহার পক্ষে মিথ্যাদর্শন ব্যতিরেকে পরমার্থ দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়?

এই যে পরমপদের কথা বলা হইল ইহাই মুখ্য বিষ্ণুপদ বা বিষ্ণুর পরমপদ যাহা নিত্যযুক্ত পুরুষ সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—"সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। বিষ্ণু কাহাকে বলে?—যিনি ব্যাপক, যিনি সম্যকরূপে 'সর্বভূতে' অনুপ্রবিষ্ট আছেন তিনিই বিষ্ণু; অর্থাৎ পরমাত্মা এবং বিষ্ণু একই অভিন্ন সত্তা। সর্বভূত বলিতে স্থাবর এবং জঙ্গম, চর এবং অচর সকল পদার্থই বুঝাইতেছে। এই যে সর্বভূতাত্মক পরমাত্মা বা বিষ্ণু, তিনিই কার্য ও কারণ উভযাত্মকরূপে অখণ্ডমণ্ডলভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মণ্ডলের ব্যাপকরূপে যে অনন্ত মহাসত্তা রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণু বা পরমাত্মা। এই বিষ্ণু বা পরমাত্মার অতি ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন এক অংশে স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিষ্ণু বা পরমাত্মা ব্যাপক—জীব বা জগৎ তাহার ব্যাপ্য। সুতরাং বিষ্ণুপদ বা পরমপদ বলিতে বুঝিতে হইবে সেই পরমস্থিতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জগৎ এবং ঈশ্বর সবকিছুই প্রকাশিত হয়। যিনি এই 'তৎপদ'কে (পরমপদকে) প্রত্যক্ষ ফুটাইয়া তুলেন বা প্রকাশিত করেন তিনিই শ্রীগুরু। জীবের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের দ্বারাই ইহা নিষ্পন্ন হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু ভিন্ন পরমপদ জানিয়া জানাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না। শ্রীরহিত গুরু বস্তুতঃ গুরুপদ বাচ্যই নহেন।

পূর্ব বর্ণনায় অচর বলিতে অচিৎ, চর বলিতে চিৎ, এবং বিষ্ণু বলিতে পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং তৎপদ বলিতে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইতেছে, শ্রীগুরু এই চারিটি তত্ত্ব হইতেই উচ্চতর তত্ত্ব। গুরুর এই প্রকার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। 'নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্' এই প্রসিদ্ধ বাক্যেও গুরুভাবের শ্রেষ্ঠতাই সূচিত হইয়াছে।" (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৬)।

কুলগুরু—শাস্ত্রে কুলগুরু হইতে দীক্ষা লইবার নির্দেশ আছে। পৈতৃক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সকলেই কুলগুরু গ্রহণ করিলাম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতার যিনি গুরু, সেই গুরুর পুত্র বা কন্যা হয়ত নিজ জীবনে সত্যের জাগরণ অনুভব করিতে নাও পারেন। এইরূপ কুলগুরুর অজ্ঞানী পুত্র বা কন্যার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহর করিলে শিষ্যের পক্ষে প্রকৃত পথ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি? থাকিতে পারে না। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তেমন গুরুই প্রকৃত 'কুলগুরু'। তিনি আমার পূর্বপুরুষের গুরুর বংশের সন্তান নাও হইতে পারেন। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তিনিই কুলগুরু। তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণই কুলগুরু গ্রহণ। এ-সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের গুরুদেব যোগিরাজাধিরাজ শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। একদিন তাঁহার এক শিষ্য শ্রী সুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণেব পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কুলগুরু ত্যাগে প্রত্যবায আছে কিনা?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "যাঁহার নিজের কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং যিনি সেই শক্তি শিষ্যেব চিত্তে জাগ্রত করিতে সক্ষম তিনিই কুলগুরু। তোমার বাবার মাষ্টারের মূর্খ সন্তান নিরেট; উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার শিক্ষকের উপযুক্ত নাও হইতে পারেন।" (দ্রঃ বিশুদ্ধবাণী, শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ, পৃঃ ২১৮/১৯)।

স্ত্রীগুরু—শাস্ত্রে স্ত্রীগুরু গ্রহণ নিষেধ আছে। ইহার অর্থ, যে স্ত্রীলোকের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী জাগে নাই, তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ নিষেধ। কুলকুণ্ডলিনী স্ত্রীলোকের মধ্যেও জাগিতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ মীরাবাঈ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী মা সারদা দেবী, আনন্দময়ী মা, শোভা মা প্রভৃতির নাম কবা যাইতে পারে। যেহেতু শাস্ত্রে আছে কুলগুরুই গ্রহনীয, সেইহেতু স্ত্রী-সাধিকার ভিতরে সত্যের জাগরণ ঘটিলে, এই যুক্তির বলেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ বিধেয। স্ত্রীগুরুতে গুরুশক্তির বিকাশ হয় না বা তাঁহাব মধ্যে ব্রহ্মজাগরণ ঘটে না—ইহা সত্য নহে।

গুরুপরীক্ষা—কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে তাঁর পরীক্ষা লওয়া একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যাঁর মধ্যেও কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কাহার কুলকুণ্ডলিনী জাগিযাছে, তাহা নির্ণয করা সুকঠিন। তবে একটি সহজ উপায়ও আছে। যাঁহার সংস্পর্শে আসা মাত্র চিত্তের নিম্নগামী বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ হইয়া যায, আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা হৃদযে প্রবল হইয়া উঠে, বুঝিতে হইবে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁহার সংস্পর্শে আসা মাত্র মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁহার সংসর্গের প্রভাব আমার মধ্যে অধিক ক্রিয়াশীল, সত্ত্বভাবের উদ্বোধক, বুঝিতে হইবে, তিনিই কুলগুরু। কুলকুণ্ডলিনী যাঁহার জাগ্রত হইযাছে, তেমন সিদ্ধ গুরুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিই প্রকৃত দীক্ষা—যেমনটি ঘটিযাছিল স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে। নরেনের ভগবদ্দর্শনের অশান্ত জিজ্ঞাসা, চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইয়া গিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের স্নিগ্ধ সংস্পর্শে আসিবার পব। আমরা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাই ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের সম্পাদিত "শ্রী শ্রী বিশুদ্ধবাণী"র প্রথম হইতে নবম খণ্ড পর্যন্ত পুস্তকগুলিতে। এই পুস্তকগুলিতে দেখিতে পাই কত অভাজন ব্যক্তি যোগিরাজাধিবাজ শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পবমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা পাইবার জন্য প্রবল ব্যাকুলতা অনুভব করিযাছিল।

যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাশক্তি, তাহাই জীবেব ক্ষুদ্র দেহমধ্যে মূলাধারে

কুণ্ডলাকৃতিতে ঘুমাইয়া থাকেন। যখন তিনি জাগ্রতা হন, তখনই তাঁহাকে বলা হয় কুলকুণ্ডলিনীশক্তি। চিন্ময়ী মহাশক্তিই জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি। কিন্তু এই মহাশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে আসিয়া দেহের ফাঁদে পড়িয়া অর্থাৎ দেহের অভ্যাস ও মনের সংস্কাররূপ শত শৃঙ্খলে বেষ্টিত হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়েন। ইহাকেই বলা হয় ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী। ব্রহ্মশক্তির এই অচেতন জড় অবস্থা দেখিযাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন- -

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।।"

ঘুমন্ত আদ্যাশক্তি জগন্মাতা কি ভাবে জাগেন তাহা একমাত্র সদ্‌গুরু-গোচর। যিনি অব্যক্ত আকর্ষণে শিষ্যকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু এবং প্রকৃতপক্ষে কুলগুরু। কুলগুরু মন্ত্রদানেব সাথে নিজের অন্তরের তপঃপূত শক্তি শিষ্যেব মধ্যে সঞ্চাব করিযা দেন। কুলগুরুর উপদিষ্ট ক্রিয়া করিতে করিতে শিষ্যের আধার শুদ্ধ হইলে গুরুশক্তি শিষ্যের ভিতরের ব্রহ্মচেতনা জাগাইয়া দেন। তখন শিষ্য পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতিক্রম করিয়া ভিতরের আত্মস্বরূপ দর্শন করে।

জীব বস্তুতঃ স্বরূপে চিৎশক্তিরই অংশ, তাই সে চিদণু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাষায চিৎ-কণ। কিন্তু মাযাবাজ্যে জড ভাবে ডুবিয়া গিযাছে বলিযাই জীব আত্মস্বরূপবিস্মৃত। কিন্তু জীবকে আবাব তাহাব আত্মস্বরূপে অর্থাৎ চিৎশক্তিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর কৃপাতে জীবশক্তি অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সুষুম্না নাড়ীরূপ মধ্যপথ আশ্রয করিয়া স্বতঃই ঊর্ধ্বমুখে বহিতে থাকে। এই ঊর্ধ্বমুখী গতিতেই কুণ্ডলিনীশক্তির বিকাশ হয। কুণ্ডলিনীশক্তির বিকাশের সাথে সাথে অধ্যাত্ম জ্ঞান ও ভক্তির ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে। এই বিকাশ স্তরে স্তবে সংঘটিত হয়।

স্বরূপদর্শনের দুইটি প্রধান ক্রমোন্নত স্তর আছে। এক স্তবে শিষ্য নিজের ভিতরের গুরুশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকে দর্শন করে। ইহাকে সগুণ স্তর বলা যাইতে পারে। অপর উন্নত স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিকাশ দর্শন করিতে করিতে পরিণামে গুরুর সহিত এক হইয়া যায, গুরুর শক্তিকে তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে পাবে না। ইহাকে বলা যাইতে পারে নির্গুণ স্তর। সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে "গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুবেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া। নির্গুণস্তরে শিষ্য গুরুপ্রণাম করে "গুরুরেব পরংব্রহ্ম" বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্যের নিকট গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর। ব্রহ্মা কেন বলা হইল? যেহেতু গুরুর কৃপাশক্তি শিষ্যের অন্তরে এক জ্যোতির্লোকের

সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। শিষ্য গুরুর শক্তিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্রষ্টারূপেই প্রথমে উপলব্ধি করে। গুরুর শক্তি শিষ্যের অন্তরে নানা বিচিত্র দিব্য অনুভূতির বিকাশ ঘটায়। গুরু-কৃপায় অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার কাটিয়া সেখানে এক জ্যোতির্ময় লোকের সৃষ্টি হয়। তাই গুরুকে স্রষ্টারূপী ব্রহ্মা বলিয়া শিষ্য বন্দনা করে।

অধ্যাত্ম জ্যোতির্ময় লোকে শিষ্যের দিব্য অনুভূতিগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য গুরুশক্তি ক্রিয়া আরম্ভ করে। এখানে গুরু পোষক, বর্দ্ধক ও পালক। চিত্তের প্রত্যেকটি মঙ্গলময়ী বৃত্তি বা অনুভূতি এখানে গুরুশক্তিতে পরিপুষ্ট হয়, বর্দ্ধিত হয়। এতক্ষণ গিয়াছে creation, এইবার হইতেছে Consolidation—এখন গুরুশক্তি পোষনী শক্তিরূপে কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে গুরু বিষ্ণু। এই বিষ্ণু পূর্ববর্ণিত সর্বভূতাত্মক পরমাত্মা বা পরমপদ নহে। এই বিষ্ণু পরমাত্মা বা পরমপদের অন্তর্গত ত্রিশক্তির মধ্যে একটি—পালয়িত্রী শক্তি।

সৃষ্টি থাকিলেই ধ্বংসের প্রযোজন। চিত্তবৃত্তির প্রকাশশীল সাত্ত্বিক স্বভাবের যখন সৃষ্টি হইতেছে, ঠিক সেই সঙ্গে চিত্তের তমঃ ভাবাপন্ন বৃত্তিগুলির গুরুশক্তিতে বিনাশ হইতে থাকে। গুরুশক্তি তখন ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুশক্তি একদিকে সৃষ্টি-লীলায় চিত্তে সাত্ত্বিক প্রেরণা জাগায়, অপরদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবে অসাত্ত্বিক কামনা, বাসনা, লালসা, আসক্তি প্রভৃতি ধ্বংস করিতে থাকে। সুতরাং "গুরুরেব মহেশ্বরঃ"।

এতক্ষণ শিষ্য সগুণস্তরে ছিলেন অর্থাৎ মহামাযার শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরে আবদ্ধ ছিলেন। সোনার শৃঙ্খলও শৃঙ্খল। সুতরাং মহামায়াকেও অতিক্রম করিতে হইবে, নহিলে মুক্তি নাই। এইবার গুরুশক্তি মহামায়া ভেদ করিয়া শিষ্যকে চিৎ-ভূমিতে উত্তীর্ণ করাইয়া দেন। অর্থাৎ পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবকল্প হন। সেখানে দেখেন এক চিন্ময় দুস্তর মহাসমুদ্র। যে দিকে তাকায় সেই দিকেই অফুরন্ত নিস্পন্দ 'প্রকাশ' আর 'প্রকাশ'। সেখানে কোনো তরঙ্গের স্ফুরণ নাই, অবয়ব নাই। শিবকল্প শিষ্য অনুভব করেন গুরুশক্তির মহিমার পারাপাব নাই, সীমা নাই, ইয়ত্তা নাই। বাক্য তখন মূক, বুদ্ধি তখন স্তব্ধ, অনুভূতি তখন অনির্বচনীয়। তখনই শিষ্য জানিতে পারেন—"গুরুরেব পরংব্রহ্ম"। শিবকল্প শিষ্যের জীবনে এইবার নির্গুণ স্তর আরম্ভ হইল।

নির্গুণস্তরের প্রথম অবস্থায় দ্বৈত প্রকাশমান। শিষ্য নিজেকে গুরু হইতে পৃথক দেখিতেছেন। তাঁকে পরব্রহ্ম জানিয়াও তাঁতে নিমজ্জিত হইতে পারিতেছেন না। আণব মলের অতি সূক্ষ্ম আববণ তখনও থাকে যাহা তাঁহার ও পরব্রহ্মের মধ্যে একটা ক্ষীণ ব্যবধান সৃষ্টি কবে।

যখন গুরুর অনুগ্রহ শক্তি শিষ্যকে আত্মসম করিয়া নেন তখনই প্রকৃত

অদ্বৈত অবস্থা। নির্গুণস্তরের দ্বিতীয় অবস্থায় এই অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্য পূর্বেই গুরুকে পরব্রহ্ম বলিযা উপলব্ধি করিয়াছেন, এইবার গুরর অনুগ্রহে শিষ্য সেই মহাসমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হন এবং গুরু-শিষ্যতে অভেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

এই অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপনেরও একটা প্রক্রিয়া (process) আছে। ইহা হইল সামরস্য। শিবশক্তির সামরস্যের ন্যায় গুরু-শিষ্যের সামরস্য আবশ্যক। শিষ্য যে প্রকার গুরুস্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করে, গুরুও ঠিক সেই প্রকার শিষ্যস্ববপে বিশ্রান্ত হন। শিষ্য যেমন গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে অর্থাৎ গুরুতে স্থিতি লাভ কবে, ঠিক সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন, তবেই শিষ্য গুরুস্বরূপ পাইতে পারে। যেমন একটি গ্লাসে খানিকটা গরম জল এবং অপর একটি গ্লাসে খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইযা ঢাল-উপর করিতে করিতে সমতা আসে, উহাও ঠিক সেইপ্রকার। শিষ্যেব হৃদয়ে যেমন গুরু আসীন, তেমনি গুরুর হৃদয়েও শিষ্য আসীন থাকে। ইহা সামরস্য অবস্থাতে উন্নীত হইবার সোপান। পূর্ণ সামরস্য হইযা গেলে তখন কেই বা গুরু, কেই বা শিষ্য। তখন এক অদ্বয় সর্বাত্মক বিভু পরব্রহ্মই পরব্রহ্ম। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই একটি বাউল গানে বলা হইযাছে—"চল গুরু, যাই দুজনায় পারে।"

এই সামরস্য লাভই দীক্ষার চরম লক্ষ্য। দীক্ষার প্রক্রিয়া মধ্যে পাশক্ষয় ও শিবত্ব যোজন নামে দুইটি ব্যাপার আছে। সাধনার দ্বারা এই দুইটি পূর্ণ না হইলে দীক্ষা সার্থক হয় না বা শিবত্ব লাভ হয় না। যোজন ক্রিয়া অতি কঠিন ব্যাপার, সাধারণ গুরবর্গ ইহা সম্পাদন করিতে পারেন না। যাঁহার কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে, জ্ঞান ও যোগ এই দুইটি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই শিষ্যের শিবত্ব-যোজনা ক্রিয়া সম্ভবপর। ইহা যাহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহার পক্ষে সদ্‌গুরুব পদের দাবী করা চলে না।

এই তো গেল গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা। কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া ও তাঁহার বই পড়িয়া আমার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। এইবার কবিরাজ মহাশয় নিজে গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আগমসম্মতভাবে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহারই সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গুরু ও সদ্‌গুরু

(১)

জীবের জাগরণ বা প্রবুদ্ধ, সুপ্রবুদ্ধাদি অবস্থা যাঁহার মাধ্যমে ঘটিযা থাকে, তিনিই গুরু বা সদ্‌গুরু। গুরু প্রণামের মন্ত্রের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

(২) অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ।।

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির তাৎপর্য হইল, যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বের ব্যাপক পরমপদকে প্রদর্শন করেন, তিনিই গুরু এবং যিনি অজ্ঞানতিমির প্রভাবে অন্ধ শিষ্যের চক্ষুকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন, তিনিই গুরু।

এই যে জ্ঞানচক্ষুব উন্মীলনেব কথা বলা হইল, ইহাই অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরের ব্যাপক পরমপদ দর্শনের একমাত্র উপায।

প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানচক্ষুটি কি? ইহার উন্মীলন ব্যাপারই বা কি? উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে—প্রতি মনুষ্যের মধ্যে দুইটি অজ্ঞানচক্ষু এবং একটি জ্ঞানচক্ষু আছে। যে দুইটি চক্ষুর সহিত আমরা পবিচিত তাহাদের নাম অজ্ঞানচক্ষু। অজ্ঞান অবস্থায এই দুইটি চক্ষু কার্য করে এবং জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত থাকে। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইলে সেইপ্রকার জ্ঞানচক্ষু কার্য করে এবং আমাদের পরিচিত অজ্ঞান চক্ষুর্দ্বয নিমীলিত হইয়া যায়। এই জ্ঞানচক্ষুই তৃতীয নেত্র নামে অভিহিত। অজ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যেমন অজ্ঞান জগতের যাবতীয পদার্থ ভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায, তেমনই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞান-জগতের সব কিছু অভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়ে দেওযাই গুরুর কাজ। জ্ঞানচক্ষুব উন্মীলন না হইলে শান্তি, প্রেম, সমন্বয়, মৈত্রী প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণের প্রকৃত বিকাশেরই সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহার মধ্যে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইয়া চবাচর ব্যাপ্ত ব্যাপক জ্ঞানেব প্রকাশ হইয়াছে তিনিই মাত্র শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিতে পাবেন, অন্য

কাহারও দ্বাবা ইহা সম্ভব নয। কারণ অজ্ঞান-তিমিরে যাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া রহিয়াছে সে আর এক অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবে?

জ্ঞানচক্ষুর অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানেব প্রকাশ হইলে আত্মা স্বভাবতঃই অনাত্মা হইতে পৃথক হইয়া যায়। দেহাত্মবোধ তখন থাকে না, শুধু দেহ কেন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এমন কি প্রাকৃতিক সত্ত্ব, সর্বত্র হইতে এই আত্মবোধ উপসংহৃত হইযা শান্ত প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই চিদাকাশের প্রকাশ এবং জ্ঞান-নেত্রের উন্মীলন। ইহাই আত্মচৈতন্যরূপে ব্যাপক জ্ঞানের বিকাশ। সদ্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ জীবের আত্মচৈতন্যকে এই অখণ্ড প্রকাশরূপ স্থিতিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন না। যে গুরু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে পূর্ণরূপে নিজের আযত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি শিষ্যের এই ঊর্ধ্বগতি সম্পাদন করিতে পারেন না। সর্বজ্ঞ হইলেও অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্ঞানের বিকাশ হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃত্ব লাভ করিযা ক্রিয়াশক্তিকে আযত্ত না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং মুক্ত হইয়াও অন্যেব মোচন-ক্রিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হওযা যায় না, যেমন সাংখ্যের 'কৈবল্য-প্রাপ্ত পুরুষ', হীনযান বৌদ্ধধর্মের 'অর্হৎ' ইত্যাদি। আরও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সদ্‌গুরু দীক্ষা দ্বারা জীবকে উদ্ধার করিযা দিলেও জীবন্মুক্তি লাভের জন্য জীবের নিজেরও কিছু করণীয় থাকে—তাহা হইল সদ্‌গুরু নির্দেশিত পথে সাধনা করা। কারণ, শ্রীগুরুর কৃপায় দীক্ষারূপ ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অধিকার-বিশেষে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও জীবের বুদ্ধিগত অজ্ঞান তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত সে শিবত্ব লাভ করিয়াও নিজেকে শিব বলিয়া চিনিতে পারে না এবং সেইজন্যই জীবন্মুক্তির আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না।

অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, একমাত্র সদ্‌গুরুই তাঁহার অনন্ত করুণার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণ জ্ঞানশক্তি ও পূর্ণক্রিয়া শক্তির প্রভাবে অনাদিকালের বদ্ধ জীবকে জাগাইয়া দেন। যে গুরু অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপক পদে শিষ্যকে স্থাপন করিতে পারেন না তিনি গুরুরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সদ্‌গুরু নহেন। অখণ্ডমণ্ডলরূপ পরমপদই শ্রীগুরুর প্রদর্শনীয় এবং যাহার আধার তৈরী হইয়াছে এমন অধিকারী শিষ্যের প্রাপ্য। এই অখণ্ড পদ মায়িক জগৎ, মায়াতীত বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় এবং অনন্ত শক্তিময় মহামায়া জগৎ এবং তাহারও অতীত শক্তি সমন্বিত অখণ্ডমণ্ডলাকার প্রকাশ। যিনি নিজ মহিমায় এবং অপার করুণায় বিশুদ্ধ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করাইয়া শিষ্য-আত্মাকে পরমপদরূপ অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার সহিত অভেদ উপলব্ধির দ্বার খুলিয়া দেন, তিনিই গুরু, তিনিই নমস্য।

(২)

সদ্‌গুরু বলিতে কি বোঝায়?—তাহার আলোচনা আবশ্যক। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন নাই, এমন তত্ত্বমাত্রের উপদেষ্টা আচার্যগণকে সদ্‌গুরু বলে না। এই সকল আচার্য হইতে প্রাপ্ত দীক্ষার দ্বারা সাধক আগম-শাস্ত্রোপদিষ্ট 'পরামুক্তি' লাভ করিতে পারে না, এমন কি মায়ারাজ্য অতিক্রম করিতেও সমর্থ হয় না। তাহারা যে মুক্তি লাভ করে, তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু ঐ সব সাধকদের পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না। যাহা আগমসম্মত 'পরামুক্তি' তাহাই পূর্ণত্ব। আগমমতে সাংখ্যের কৈবল্য পূর্ণত্ব নহে, বেদান্তের মুক্তিও পূর্ণত্ব নহে। বেদান্তের মোক্ষেও আণবমল সম্পূর্ণই বজায় থাকে। ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ যে সদ্‌গুরু লাভ করিতে না পারে, এমন কোন কথা নাই। ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়—ইহা সর্বত্র স্বীকৃত। ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত সাধক যখন আপনার স্বরূপ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন তাহার চিত্তে সদ্‌গুরু প্রাপ্তির জন্য শুভ ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এই ইচ্ছা শুদ্ধবিদ্যার বিকাশ। শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে সদ্‌গুরু লাভ হয়।

শুদ্ধবিদ্যার উদয় কি প্রকারে হয়? কাহারও ইহা গুরুর উপদেশ হইতে জন্মে, কাহারও বা শাস্ত্র হইতে জন্মে। কিন্তু এমন উত্তম সাধকও আছেন, যাঁহার মধ্যে শুদ্ধবিদ্যা গুরুর উপদেশ বা শাস্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনি (স্বতঃ) উদিত হয়। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধবিদ্যা স্বতঃ উদিত হয়, তাঁহার বাহ্যদীক্ষা ও বাহ্য অভিষেকের আবশ্যকতা থাকে না। তাঁহার স্বীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া প্রমাতার সঙ্গে—তাঁহার স্বীয় আত্মার সঙ্গে ঐক্য ফুটাইয়া তোলে। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়াখ্য প্রসুপ্ত চৈতন্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই তাঁহার 'দীক্ষা'। এইরূপ সাধক, সকল আচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সাধক গুরু হইতে শাস্ত্ররহস্য অবগত হয়। কিন্তু যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তিনি শুদ্ধবিদ্যা হইতে সমস্ত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন, বাহ্য গুরুর সাহায্য লওয়া তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। এমন কোন সত্যই নাই এবং থাকিতে পারে না—যাহা শুদ্ধবিদ্যার আলোকে প্রকাশিত হইতে পারে না। এইজন্য এইপ্রকার সাধক লৌকিক কোন নিমিত্ত অবলম্বন না করিয়া সমস্ত শাস্ত্রেরই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই 'প্রাতিভ' জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। প্রাতিভ-জ্ঞান স্বয়ং উদ্ভূত হয় বলিয়া 'সাংসিদ্ধিক'।

বদ্ধজীবরূপী অণু পঞ্চভূতে আচ্ছন্ন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। সেইজন্য তাহাকে

এক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যদেহ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিবেকের উদয় হওয়ার পর যখন তাহার সঙ্গে প্রতিভাব যোগ হয়, তখন ঐ জীব আর জীবরূপে পরিগণিত হয় না। সে তখন শুদ্ধবিদ্যা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধজীবকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার স্বতঃই শুদ্ধবিদ্যাব উদয় হয়, তাঁহার সকল বন্ধন শিথিল হইযা পূর্ণ শিবভাবের আবির্ভাব হয। তাঁহাকে 'সাংসিদ্ধিক' গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহার নিজের বিষয়ে কিছু করণীয় থাকে না, তাই তিনি জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্বদা প্রবৃত্ত থাকেন। এই পরানুগ্রহরূপ কার্য অনুগ্রাহ্যজনেব যোগ্যতার তারতম্যবশতঃ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে শিষ্য নির্মল সংবিদ্‌বিশিষ্ট বা শুদ্ধচিত্ত, তাহাকে অনুগ্রহ করিবার সময় 'সাংসিদ্ধিক' গুরুকে কোন উপকরণেব আশ্রয গ্রহণ করিতে হয় না। শুধু দৃষ্টিদ্বারাই তিনি ঐ প্রকার অনুগ্রহার্থী যোগ্য শিষ্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। দৃষ্টিদ্বারা নিজ বোধরূপ স্ব-শক্তির সঞ্চার দ্বাবা শিষ্যকে নিজের সহিত সমভাবাপন্ন করাই অনুগ্রহের লক্ষণ।

কিন্তু অনুগ্রাহ্য শিষ্য তাদৃশ নির্মল সংবিদ্‌বিশিষ্ট না হইলে উপকবণেব আবশ্যকতা হয। ঐ স্থলে 'সাংসিদ্ধিক' গুরুকে বাহ্য উপকরণেব এবং শাস্ত্রীয় মর্যাদার আশ্রয গ্রহণ করিতে হয়। অশুদ্ধচিত্ত অনুগ্রাহ্যগণ নানাপ্রকার বলিযা তাহাদের বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক উপকবণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঐ সকল ভিন্নভিন্ন বাহ্য উপকরণাদির বর্ণনা বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে। মনুষ্যের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া শাস্ত্র বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যেমন রোগ ভিন্ন হইলে ঔষধের ভেদ হয় ইহা তদ্রূপ—

যথৈকং ভেষজংজ্ঞাত্বা ন সর্বত্র ভিষজ্যতি।
তথৈকং হেতুমালম্ব্য ন সর্বত্র গুরুর্ভবেৎ॥

অর্থাৎ যেমন কোনও ব্যক্তি একটিমাত্র ঔষধের জ্ঞান লাভ করিয়া সকলপ্রকার রোগেব চিকিৎসক হইতে পারে না, সেইপ্রকার কোনও একটি বিশিষ্ট হেতু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যেব গুরুপদে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সেইজন্য গুরু নির্দিষ্ট শাস্ত্রানুসারে তদুচিত অনুগ্রাহ্য শিষ্যগণকে কৃপা করেন। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এইপ্রকার শাস্ত্রীয় মর্যাদা রক্ষা করা হয় বলিয়া সাংসিদ্ধিক গুরু স্বভাবসিদ্ধ প্রাতিভজ্ঞানবিশিষ্ট নহেন। বস্তুতঃ এইরূপ গুরুর নিজের জন্য কর্তব্য নাই বলিয়া তাঁহার কিছুরই আবশ্যকতা নাই। এইগুলি অশুদ্ধচিত্ত শিষ্যদের কৃপা করাব জন্য অপেক্ষিত হয়।

ইহা হইতে প্রতীত হইবে যে, গুরু স্বয়ং স্বতন্ত্র ও সাংসিদ্ধিক হইলেও তাঁহাব অনুগ্রহ-প্রদর্শন শিষ্যেব অধিকার অনুসারে নানাপ্রকার হইযা থাকে। বৌদ্ধগণও বলেন যে, গুরুগণের যে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ তাহা শিষ্যবর্গের

যোগ্যতাদি অধিকারভেদ নিবন্ধন। এই সাংসিদ্ধিক গুরুই 'অকল্পিত' গুরু। তিনি নিজে অন্য আচার্য-সাহায্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া তাঁহাকে 'অকল্পিত' বলা হয়। প্রাতিভজ্ঞান অকৃত্রিম, অকল্পিত গুরুও অকৃত্রিম। অকল্পিত গুরু ছাড়া, আরও তিন প্রকার গুরু আছেন যাঁহাদের বলা হয় 'অকল্পিত-কল্পক', 'কল্পিত' ও 'কল্পিতা-কল্পিত'। এইগুলি অবান্তর বিভাগ মাত্র। ইঁহারা সকলেই শিষ্যের পাশচ্ছেদনপূর্বক শিষ্যত্বের অভিব্যক্তি করিতে সমর্থ। কারণ, স্বয়ং পরমেশ্বরই আচার্যদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের বন্ধনমোচন করিয়া থাকেন। তবে অকল্পিত গুরুর মহিমা অধিক বলিয়া স্বীকৃত। এতদ্ব্যতীত 'সিদ্ধগুরু' ও 'দিব্যগুরু'ও আছেন। মূলে কিন্তু সর্বত্র পরমেশ্বরই একমাত্র অনুগ্রাহক। তিনি ভিন্ন আর কেহ অনুগ্রহ করিতে পারেন না।

অতএব, সদ্গুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও তাঁহারই সাধর্ম্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষ বুঝিতে হইবে।

'গুরু' শব্দের অর্থ সংকুচিতভাবে লইলে বলা যায় যে যিনি মায়া হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলেও ঊর্ধ্বলোকের ভোগৈশ্বর্য ও অজরত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি পরিমিত সিদ্ধি দিতে পারেন তাঁহাকেও ব্যবহার দৃষ্টিতে 'গুরু' বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কলাতত্ত্ব পর্যন্ত প্রতি তত্ত্বেই ভোগ্যবিষয় ও ভোগোপকরণ সমন্বিত নানা ভুবন আছে। ঐ সব ভোগলোক। ঐ স্থান হইতে ভোগান্তে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইসব গুরু শুধু ভোগপ্রদ। ইঁহারা দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। তাই মায়া পার করাইতে পারেন না। ইঁহারা পূর্বোক্ত সদ্গুরু নহেন।

আবার এমন গুরু আছেন যিনি জ্ঞান দিতে পারেন কিন্তু বিজ্ঞান অর্থাৎ শক্তিসমন্বিত জ্ঞান দিতে পারেন না। জ্ঞান দিয়া তিনি শিষ্যকে মায়া হইতে মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু জ্ঞান-শক্তির অভাবে শিষ্য নিজে মুক্ত হইলেও অপরকে মুক্ত করিতে পারেন না. তাই পরোপকার করিতে সমর্থ হন না। এই গুরু জ্ঞানী গুরু, তিনি যোগী নহেন। প্রকৃত সদ্গুরু ইনি নহেন। যিনি সিদ্ধযোগী বলিয়া একাধারে যোগী ও জ্ঞানী উভয়াত্মক, তিনিই সদ্গুরু। তিনি জ্ঞান-দানের সঙ্গে শিষ্যের মধ্যে সুপ্ত চিৎ-শক্তির অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটাইয়া দেন বলিয়া শিষ্য নিজেও মুক্ত হন এবং অপরকে মুক্ত করিবার শক্তির অধিকারী হন। পূর্ণত্বলাভ সিদ্ধ যোগীর কৃপাতেই হইতে পারে।

গুরু প্রণামে যাঁহাকে 'তৎপদে'র প্রদর্শক বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং যাঁহাকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাঁহারা উভয়ই এক। কারণ গুরুরূপী ভগবান্ অথবা গুরুদেহে অধিষ্ঠিত ভগবান্ আপন ক্রিয়াশক্তির দ্বারা (দীক্ষার দ্বারা) পশুর স্বতঃসিদ্ধ

দিব্য জ্ঞানরূপ চক্ষুর অবরোধক অনাদি 'আণব' মল অপসারণ করিয়া দেন। ফলে তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়া সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয় ও শিবসাধর্ম্যের প্রাপ্তি ঘটে।

এই ক্রিয়াশক্তি (দীক্ষা) দর্শনাদি নানা উপায়েই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং তদনুসারে দীক্ষারও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ।।
(নির্বাণ প্রকরণ)

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্বক দর্শন, স্পর্শন ও শব্দের দ্বারা শিষ্যের দেহে শিবভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই 'দেশিক' বা গুরু (এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কয়েকজনের মধ্যে স্পর্শের দ্বারাই ঐরূপ শিবাবেশ উৎপাদন করিয়াছিলেন)। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ষট্‌চক্রভেদপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে পরশিবের সঙ্গে মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসংকল্প গুরু শুধু একবার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিযাও এই সুমহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন।

যোগ্য শিষ্যকে উদ্ধার করা এবং অযোগ্যকে যোগ্য করিযা উদ্ধার করা, ইহাই সদ্‌গুরুর কার্য। ভাস্কর রায় 'ললিতাসহস্র্যনামে'র ভাষ্যে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ কবিয়াছেন—'অযোগ্যেপি যোগ্যতামাপাদ্য শ্রীগুরুসূর্যঃ বোধয়তি"—অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী সূর্য অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া প্রবুদ্ধ করেন।

নবচক্রের তন্ত্রে আছে—

"পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ং।
যো বৈ সম্যক্ বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।"

অর্থাৎ যিনি পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত—এই চারিটিকে সম্যকরূপে অবগত আছেন তিনি গুরু।

গুরুগীতানুসারে—কুণ্ডলিনী-শক্তি, হংস, বিন্দু এবং নিরঞ্জন এই চারিটিকে যথাক্রমে পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত বলা হয়। যথা—

"পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেযং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্।।"

যাঁহার কৃপাতে শিষ্যের মধ্যে অনায়াসে স্বাত্মবিজ্ঞান পূর্ণভাবে উদিত হয়, সেইরূপ সদ্‌গুরু প্রাপ্তি ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন হয় না। বস্তুতঃ সদ্‌গুরু স্বয়ং পরমেশ্বর। তন্ত্রমতে তিনিই পরমশিব। তিনি স্বাতন্ত্র্য শক্তিময়—পঞ্চকৃত্যকারিত্ব তাঁহারই অসাধারণ ধর্ম। এই পঞ্চকৃত্যের মধ্যে জীবের অনুগ্রহ অন্যতম। জীবের জগতে স্থিতিকালে তাঁহার অনুগ্রহ গুরু বা আচার্যরূপ অধিকরণে আবেশপূর্বক হয়।

সাধকগণ পতি (শিব), পশু (জীব) ও পাশ (আণবমল, মায়ামল ও কর্মমলরূপ পাশ)—এই তিন বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা আচার্যাধিকার প্রাপ্ত হন। সর্বপাশের ছেদ না হইলে আচার্যত্ব হয় না। আচার্যের দেহ পশুদেহের ন্যায় নহে। আচার্যদেহ বিন্দু হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া বোধক, পশুদেহ মায়া হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মোহক। আচার্যকে পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা মূর্তি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। স্ব-শক্তিই পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গা মূর্তি—যাহাকে শাক্ত-দেহ বলা হয়। কিন্তু বৈন্দব দেহবিশিষ্ট আচার্য পরমেশ্বরের বাহ্য দেহ—ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পশুর অনুগ্রহ-ব্যাপার সম্পাদন করেন।

(৩) **দিব্যগুরু**—আগম মতে যে সমস্ত আত্মা মলপাকবশতঃ ভগবদ্-অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহারা গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু যে সকল আত্মার মলপাক অত্যন্ত অধিক বলিয়া পরমবৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তির ফলে একেবারে পূর্ণত্ব লাভ করেন—তাঁহারা জগতের অতীত হন। আগম মতে তাঁহারা 'গুরুপদ'-রূপ অধিকারাবস্থা ও বিশুদ্ধ বাসনাময় ভোগাবস্থা ভেদ করিয়া একেবারে মুক্ত শিবরূপ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা সৃষ্টির অতীত অবস্থা। জগদ্ব্যাপারে ইঁহাদের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া ইঁহারা গুরু নন। কারণ, গুরুপদ বিশুদ্ধ বাসনাময় অধিকার-পদ। জীবোদ্ধার ও লোক-কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না থাকিলে কেহ গুরুপদ লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা পরোপকার করিতে দৃঢ়সংকল্প তাঁহারা মলপাকবশতঃ ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া গুরুরূপ অধিকার-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে এক অংশ মন্ত্রপদ লাভ করেন। বাকি অংশ জগদ্গুরু-পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মায়িক দেহ নাই। সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা জ্যোতির্ময় বৈন্দব দেহ লাভ করেন। ভগবানের পঞ্চকৃত্যকারিতা ইঁহারা প্রাপ্ত হন। মায়িক জগতের সৃষ্টি রক্ষা প্রভৃতির ভার মূলতঃ ইঁহাদেরই উপর। অনুগ্রহও ইহার অন্তর্গত। তাই ইঁহারা গুরু-পদবাচ্য। প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানাকল জীব হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভে এই সকল গুরু ও অধিকারিবর্গ ভগবানের সাক্ষাৎ অনুগ্রহের ফলে আবির্ভূত হন।

গুরুদত্ত শক্তি সুপ্তকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া দেয়, তাহার পর যাহার যেমন ব্যক্তিগত প্রকৃতি বা আধার তাহার বিকাশ তদনুরূপ মার্গেই হইয়া থাকে। এইজন্য গুরুশিষ্য সর্বপ্রকারে একই অনুভূতিক্রম প্রাপ্ত হয় না এবং একই গুরু হইতে শক্তি লাভ করিলেও বিভিন্ন সাধক অন্তর্নিহিত আধারের তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন পথে চালিত হয়। ইহার একমাত্র কারণ, প্রত্যেক সাধকের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সংস্কার ও প্রতিভা।

এই প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রী সিদ্ধিমাতার কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা উল্লেখ করিবার পূর্বে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কিরূপে শ্রীশ্রী মাতাজীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন তাঁহার সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া মাতাজীর অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তাহারই কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করিতেছি।

সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সাল। একদিন শ্রীস্বামী শঙ্করানন্দজী বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কাশীতে খালিসপুরা মহল্লায় একজন মাতাজীর অবস্থানের কথা জানাইলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ও আগ্রহে গোপীনাথজী তাঁহার সঙ্গে একদিন শ্রীশ্রী মাতাজীকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। মা তখন খালিসপুরাতে শিবালয়ের বাড়িতে ছিলেন। প্রথম দিনের দর্শনে এবং সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে গোপীনাথজী অত্যন্ত অভিভূত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে অবসর পাইলেই তিনি মাতাজীর নিকট যাইতেন ও নানা প্রকার ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। মাতাজীর সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"তিনি (মাতাজী) শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইলেও, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই অনুভূতির সাহায্যেই তিনি (মা) আমার (গোপীনাথ কবিরাজের) সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ছাড়া তিনি অপর কিছু জানিতেন না এবং মানিতেন না। তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন—ঠাকুরই তাঁহার পথ-প্রদর্শক এবং ঠাকুরই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি শাস্ত্রের উপদেশ, মহাজনগণের নির্দেশ অথবা অনুশাসন কিছুই জানিতেন না। প্রতি মুহূর্তে ঠাকুরই তাঁহাকে পরিচালনা করিতেন। ঠাকুর ছিলেন তাঁহার সাথের সাথী, তাঁহার উপদেষ্টা, তাঁহার সান্ত্বনাদাতা, তাঁহার বল-ভরসা, তাঁহার ঐশ্বর্য, তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান, তাঁহার সর্বস্ব। ঠাকুর তাঁহাকে যখন যেমনভাবে চলিতে বলিতেন, তিনি তখন তেমনিভাবেই চলিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ছিলেন তাঁহার একাধারে ইষ্ট ও গুরু।

*   *   *

স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, মা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। কারণ তিনি বলিতেন—সাধনার আগেও ভক্তি, অন্তেও ভক্তি—ভক্তিই সাধনার প্রাণ। তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে জ্ঞান, মহাজ্ঞান প্রভৃতি তিনি পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং চরম অবস্থায় পরমপদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যে অদ্বৈত ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রের বিচারজনিত নহে, তাহা নিজের সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনার সুমধুর ফলস্বরূপ।

*　　　　*　　　　*

সিদ্ধিমা প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্ত ছিলেন, যোগী ছিলেন না। বাল্য অবস্থা হইতেই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিভাবে সিদ্ধ ছিলেন। দেব-দেবীর দর্শন তাঁহার সহজ সংস্কারের ফল। যে অলৌকিক উৎকর্ষ তিনি উত্তর জীবনে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র মূল তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য-ভাব ও সরল ভক্তি। দীক্ষা তাঁহার কুলক্রমাগত নিয়ম অনুসারেই হইয়াছিল, কিন্তু সে দীক্ষায় তিনি জাগিয়া উঠিতে পারেন নাই। উহা একটি লৌকিক প্রথা পালন মাত্র হইয়াছিল। কারণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব, যতদিন তাঁহার ভক্তি-বিকাশের ফলে ঠাকুরের সবিশেষ কৃপালাভ না হইয়াছে, ততদিন হয় নাই। তিনি যোগাভ্যাস কখনও করেন নাই। সাধু-সঙ্গও করেন নাই। কাশী আসার পর অন্যান্য কাশীবাসী ভক্তের ন্যায় নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও কাশীস্থ দেব-দেবী দর্শন করিতেন এবং বাকী সময়ে নির্জনে ভগবদ্-ভজন করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। তাই দিনের পর দিন অদ্ভুত নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য সহকারে তিনি যে ভজন করিয়া যাইতেন, এক সময়ে তাহারই প্রভাবে তাঁহার জীবন ঊষর মরুভূমি হইতে শস্যশ্যামল, স্নিগ্ধ ও সরল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যে সময়ে তিনি বিভিন্ন মন্দিরে যাত্রা করিতেন, সে সময়ে তিনি সাধনার অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বাহিরের দিক্ দিয়া ভক্তি-অভিব্যক্তির ফলে দেব-দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহাদের অনেক কিছু অলৌকিক লীলাখেলা অবশ্যই হইত। কিন্তু ইহা বাহ্য ব্যাপারমাত্র। ইহাতে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের পথ তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহারা পর যখন দেহতত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেহে প্রবেশলাভ করিলেন অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের পর যখন তিনি দেহে চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রকৃত উন্নতির পথ খুলিয়া গেল।

*　　　　*　　　　*

মা বলিতেন, 'সাধকের অবস্থার তারতম্য অনুসারে গুরু মূলতঃ এক হইলেও, ক্রিয়া-ভেদে চারি প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।' তদনুসারে এই ~~চারি~~প্রকার গুরুর নাম—গুরু, বিশ্বগুরু, গুরুব্রহ্ম এবং সদ্‌গুরু দেওয়া যাইতে
নিজ
যিনি শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগাইয়া তাহাকে চক্রভেদ করিতে সাহায্য

করেন—তিনি গুরু। যাহার কুণ্ডলিনী জাগাইবার শক্তি নাই, তাহাকে তিনি (সিদ্ধিমা) প্রকৃত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ষট্‌চক্র ভেদের পর বিশ্বভেদ যাঁহার কৃপায় সম্ভবপর হয়, তিনি বিশ্বগুরু। ষট্‌চক্র ভেদের পর এবং ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বগুরুর অধিকার জানিতে হইবে। ইহার পর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়—ইহা বিশ্বের অতীত অবস্থা। যাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাতে অশেষ-বিশেষ সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তিনি ব্রহ্মগুরু নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন। মা বলিতেন, ইনিও সদ্গুরু নহেন। যাঁহার মহাকৃপাতে জীবের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরুর স্থান ব্রহ্মগুরুরও ঊর্ধ্বে। পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তৎপূর্বে নহে। পূর্বে যে আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ আভাসমাত্র।"

(সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১১১-১২)

'গুরুতত্ত্ব' প্রসঙ্গে একদিন ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'ইষ্টদেব ও গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য' কি তাহা বুঝাইতেছিলেন। আমি (লেখক) তাহা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া বিষয়টিকে মননের সাহায্যে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। নিম্নে আমার সেই প্রবন্ধটিকে উদ্ধৃত করিতেছি—

ইষ্টদেব ও গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য—সাধনার দ্বারা যখন যোগী পঞ্চদশী (পঞ্চদশ কলার অধিকারী) হন, তখন তাঁহার মধ্যে জ্যোতির্ময় জ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ তিনি চৈতন্য-পুরুষ হন। জ্যোতির্ময় জ্ঞানের নামই 'বিন্দু'। ইহা যোগী ভ্রূমধ্যে উপলব্ধি করেন। বিন্দুতে ১৫ কলা আছে, এক কলা নাই; অর্থাৎ বিন্দুতে অমৃতকলা বা ষোড়শীর (ষোড়শ কলার) অভাব আছে। ষোড়শীতে অমৃতকলা পূর্ণ থাকে, তাই ষোড়শীতে পূর্ণিমাও নাই, অমাবস্যাও নাই বা উহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। উহা নিত্য উদিত। কালচক্রের আবর্তন হয় ষোড়শীর ব্যক্ততার অভাবে। ষোড়শকল পুরুষে অমৃতকলা একটি—তাহাই প্রকৃত অমাকলা, বাকী ১৫টি কলা কালস্পৃষ্ট। সেইজন্য পঞ্চদশী সাধকের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, অর্থাৎ তখনও সাধক কালের অন্তর্গত। পঞ্চদশী সাধকের মধ্যে কালের প্রবাহ নিত্য বর্তমান; অর্থাৎ দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিনের ন্যায় সাধক তখনও প্রকৃতি-পরিণামের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পঞ্চদশী অবস্থা পাইতেই কত জন্মের সাধনার দরকার পড়ে। সাধনা বিভিন্ন প্রকার। যে যে-সাধনার মধ্য দিয়াই যাক, শ্রদ্ধা-আন্তরিকতা-যত্ন-অভ্যাসের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা করিয়া তাহাকে প্রথমে পঞ্চদশী অবস্থা লাভ করিতে হয়। পঞ্চদশী হইবার

জন্য যে-সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান, উহা বাহ্য। কারণ উহার দ্বারা আধারের প্রস্তুতি হয়, চৈতন্যের উদয় হয় মাত্র। কিন্তু উহা লক্ষ্যকে প্রাপ্তি বুঝায় না।

সব সাধনার চরম লক্ষ্য হইল 'আনন্দ'কে পাওয়া, যাহা অখণ্ড ও পূর্ণ, এবং যাহাকে পাইলে আর কিছু চাহিবার বা পাইবার অভাব থাকে না। এই বস্তুটি হইল 'ইষ্টদেব'। ইহাই ষোড়শ কলায় পূর্ণ ষোড়শী যাহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; যাহা কাল-প্রবাহের বা প্রকৃতি-পরিণামের অতীত। কিন্তু এই বস্তুটি নিষ্ক্রিয়। ইহার নিজের কিছু করিবার বা দেবার কোন ক্ষমতা নাই। ইহা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশরূপে জগদাতীত হইয়া অসাড়ের ন্যায় static হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা কালরাজ্যের অতীত এবং পূর্ণ; এবং ইহাই একমাত্র ইষ্টদেব। পঞ্চদশী যোগীকে ইহাকেই পাইতে হইবে। অর্থাৎ ষোড়শী হইতে হইবে, তাহা না হইলে সে কালের অতীত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। অথচ ষোড়শী নিজে সক্রিয় হইয়া পঞ্চদশীকে এমন কিছু দিতে পারে না যাহা পঞ্চদশী ও ষোড়শীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা করিতে পারে, কিম্বা যে সূত্র ধরিয়া পঞ্চদশী ক্রমশঃ ষোড়শীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কারণ ষোড়শী যদিও ইষ্টদেবতা, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। তাহা হইলে পঞ্চদশীর ষোড়শীকে পাইবার উপায় কি?

ষোড়শীরও উপরে এমন একটি অবস্থা আছে, যাহাকে বলা যায় সপ্তদশী। সপ্তদশী পূর্ণ হইয়াও পূর্ণের অতিরিক্ত। সপ্তদশীর এই অতিরিক্ততা অনন্ত, অপরিমিত (infinite)। এই অতিরিক্ততাই হইল উচ্ছলতা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দের বা ভরা-আনন্দের উচ্ছলতা বা উপচাইয়া পড়া আনন্দ। এইরূপ আনন্দের উপচয়ের যেন শেষ নাই, সীমা নাই—'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে'। এই সপ্তদশী নিজে পূর্ণ হইয়া পূর্ণের অতিরিক্ত যে অসীম ভাণ্ডার তাঁহার আছে, তাহা হইতে তিনি পঞ্চদশীকে 'শক্তি' দেন—যাহা 'মন্ত্রশক্তি' বলিয়া পরিচিত। এই মন্ত্রশক্তিই পঞ্চদশীকে ষোড়শী বা ইষ্টদেবের সহিত যোগযুক্ত করিয়া দেয়। তারপর পঞ্চদশী নিজের চেষ্টা বা পুরুষকারের দ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় বা ষোড়শী হইয়া যায়। অতএব সপ্তদশীই একমাত্র জগদ্‌গুরু বা সদ্‌গুরু যিনি তাঁহার অতিরিক্ত ভাণ্ডার হইতে পঞ্চদশীকে 'বস্তু' দান করিতে পারেন। এই সপ্তদশী জগতাতীত হইয়াও জগতাত্মক, অর্থাৎ জগতাতীত ও জগতাত্মক—এই দুই 'ভাব'ই তাঁহার মধ্যে যুগপৎ যুগ্ম হইয়া আছে। পঞ্চদশী, ষোড়শী ও সপ্তদশী একই 'আত্মা'রই তিনটি বিভাব—তিনটি ক্রমোন্নত স্তর-ভেদ। সপ্তদশীর মধ্যে পঞ্চদশীও আছে, ষোড়শীও আছে, অর্থাৎ তিনি একাধারে জগতাত্মক (সক্রিয়) ও জগতাতীত (নিষ্ক্রিয়) দুইই। তিনিই একমাত্র পরমগুরু

যাঁহার পঞ্চদশীকে 'মন্ত্রশক্তি' দিবার ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতার কখনও ক্ষয় নাই—'নিঃশ্বাসে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

পঞ্চদশী যাহারা তাহারা প্রকৃত সদ্‌গুরু নহে। তাহাবা কাল-রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাহাদের দেবাব মত প্রকৃত কোন শক্তিই সঞ্চিত হয নাই। তাহারা অবিদ্যাগ্রস্ত অহং-বিমূঢ় সাধারণ মানুষেব স্তর হইতে কিছুটা উন্নত হইয়াছে, কিন্তু আসল বস্তুই তো তাহারা এখনও পায নাই। অতএব যাহাদের নিজেদের মধ্যেই অভাব রহিয়াছে, তাহারা অপরের অভাব কিরূপে দূর করিবে! সপ্তদশীর কৃপায় পঞ্চদশী যখন ষোড়শীর সহিত যোগযুক্ত হয়, তখন তাহার 'বস্তু'র প্রাপ্তি-যোগ ঘটে। এবং বস্তুর পূর্ণ প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ষোড়শী হইতে পারে না। ষোড়শী না হইতেই যদি পঞ্চদশী যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করে তাহা অপরকে মন্ত্রদীক্ষার দ্বারা দান করে, তবে নিজের মধ্যে সঞ্চয়ের ভাগ কমিয়া গিয়া নিঃস্ব হইতে থাকিবে। আব ষোড়শী অবস্থায় পৌঁছাইলেও অর্থাৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও যতক্ষণ না সপ্তদশীর সহিত যোগযুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ তাহার দিবার ক্ষমতা সীমিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ যাহার ষোল আনা আছে, সে তাহা হইতে দান করিলে যে পরিমাণে দান করিবে সেই পরিমাণে তাহার পূর্ণ এক টাকা হইতে কম পড়িবে। কিন্তু যাহাব সতের আনা বা তাহার অধিক সঞ্চয় আছে, সে সেই বাড়তি অংশ দান করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ সপ্তদশী জগদ্‌গুরু কদাচিৎ মেলে। সেইজন্য সপ্তদশী পঞ্চদশীকে মন্ত্রদীক্ষার দ্বারা ষোড়শীর সহিত যুক্ত করিযা তাঁহাব প্রতিনিধি হইয়া অপরকে মন্ত্রদীক্ষা দেবার জন্য অনুমতি দেন। তাহাতে পঞ্চদশীর কিছু ক্ষতি হয় না, যেহেতু সপ্তদশী তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সপ্তদশীর অনুমতি মিলিতেছে, ততক্ষণ ষোড়শীব সহিত যুক্ত পঞ্চদশীর অপরকে দীক্ষা দেওয়ার অর্থ নিজেরই ক্ষতি সাধন করা। পঞ্চদশী যখন ষোড়শী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন স্বাভাবিক রীতিতে সপ্তদশীতে যাইবার জন্য তাহার মধ্যে প্রেরণা জাগে। তখন সপ্তদশীতে যাইবার জন্য তাহার অভিষেক হয় এবং সপ্তদশীই তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অভিষেকের পর সপ্তদশীতে উন্নীত হইলে তখন তাঁহার স্বয়ং মন্ত্রদীক্ষা দেবার স্বতন্ত্রতা আসে। এই সপ্তদশীই হইলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান। একমাত্র মানুষের আধারেই সপ্তদশীতে পৌঁছান সম্ভব। দেবতাদের পক্ষেও এই অবস্থায় যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাঁহারা অধিকারী পুরুষ। যতদিন না অধিকার ভোগের কাল পূর্ণ হইতেছে, ততকাল তাঁহাদের সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে এবং তাহা লক্ষ যুগও হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র মানুষই, যদি পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি

থাকে তবে এই জন্মেই স্বয়ং ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া পরিপূর্ণ আনন্দের সম্ভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারে। সেইজন্য সহজ সাধক চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

(১) "মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে
মানুষ চিনেছে কে!"

(২) "শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

অর্থাৎ, জীব নিজের আনন্দস্বরূপ বা স্ব-ভাবকে জানিয়া আনন্দস্বরূপ হইয়া আনন্দরস সম্ভোগ করিতে পারে। এ অধিকার মানুষ ব্যতীত আর কাহারও নাই।

কৃপাময় ও কৃপাশূন্য পুরুষকার

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় মন্ত্রদীক্ষার পর 'কৃপাময় পুরুষকার' এবং 'কৃপাশূন্য পুরুষকারে'র দ্বারা সাধন-পথে অগ্রসর হইবার কালে উভয়পথের সাধকদ্বয়ের অনুভূতির মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে তাহার আলোচনাও তিনি করিয়াছিলেন। সেই আলোচনার সারমর্ম, যাহা আমি পরে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কৃপাময় পুরুষকার—শব্দই জ্যোতিকে পরিস্ফুট করে। সদ্‌গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র দেন তাহা শক্তিপূর্ণ শব্দ। শিষ্য সেই মন্ত্রঃপূত শব্দ জপ করে। জপ যতই তীব্র হইতে তীব্রতর, তীব্রতম হয়, শব্দও তদনুপাতে সংবেগ লাভ করে। তীব্রতম সংবেগে শব্দ জ্যোতিরূপে ফুটিয়া ওঠে। জ্যোতির স্ফুরণেই জপের পূর্ণতা। কারণ, জ্যোতিই মন্ত্রের অর্থরূপে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, অর্থাৎ জ্যোতিই মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশ। একবার জ্যোতি দেখা দিলে, পুনর্বার অন্য সময়ে আসনে বসিয়া জ্যোতির দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জপ করিতে হয় এবং জ্যোতির উদয় হইলে তখন আর জপের দরকার হয় না। এইরূপ বার বার জপ করিয়া জ্যোতির উদয় করাইতে করাইতে এমন এক সময় আসিবে যখন একবার মাত্র জপ করিতেই সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির দর্শন মিলিবে। জ্যোতিই হইল শক্তিরূপিণী 'মা'য়ের করুণা। এরূপ অবস্থায় একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তৎক্ষণাৎ মা দর্শন দেন—"ডাকার মত ডাকলে পরে মা কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে" (রামপ্রসাদ)। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন—'ডাকার মত ডাকতে পারলে মা এক ডাকেই সাড়া দেন'। ডাকার অর্থ কি? না, মায়ের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করা। শুধু ডাকিলেই কি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে? না, ডাকার মত ডাকিতে হইবে অর্থাৎ ভাবের সহিত অন্তর দিয়া ডাকিতে হইবে। ভাবাশ্রু অনর্গল ধারায় প্রবাহিত হইবে, তবেই মায়ের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা যাইবে। নহিলে শুধু ভাববিহীন মা মা রবে হাজার ডাকিলেও কিছু হইবে না।

উপাসনা বা জপ করি কেন? উপাসনা অর্থে নিকটে বসা। জীব মায়ার

প্রভাবে বহির্মুখ থাকে অর্থাৎ মায়েব দিক হইতে ফিরিয়া জীবের মুখ বিপরীত দিকে থাকে। উপাসনা বা জপের উদ্দেশ্য হইল বিপরীত দিক হইতে ফিরিয়া মুখ মায়ের দিকে করা বা অন্তর্মুখ হওয়া বা মায়ের সমীপে উপবেশন করা। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও ঠিক এই প্রকার উক্তি করিযাছেন—

"কৃষ্ণ বহির্মুখ দোষ মাযা হৈতে হয।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়।।"

(চৈঃ চঃ, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

এমনও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়েব কৃপাদৃষ্টি একজনের উপরে পড়ে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিপরীত দিকে থাকায় মায়ের কৃপা অনুভব করিতে পারে না, কৃপা তাহার নিকট নিরর্থক হইয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জীব উন্মুখ হইলেও মায়ের দৃষ্টি জীবের দিকে উন্মুখ থাকে না। কারণ, জীব উন্মুখ হইলেই যে মায়ের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিকে পড়িবে, এমন হয় না। ভাবভক্তির সহিত জপ, উপাসনার তীব্র সংবেগের দ্বারা মায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে হয়। কারণ, উপাসক ও উপাস্য উভযের দৃষ্টি একমুখী না হইলে, মা ও ছেলের ন্যায় উভয়ে উভযের দিকে আকৃষ্ট না হইলে হাজার জপ বা উপাসনা কার্যকরী হয় না। ভাব-ভক্তির দ্বারা উপাস্যের কৃপা-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার নাম 'আবর্জন'।

সদ্‌গুরু যখন দীক্ষা দেন, তখন মুহূর্তের জন্য শিষ্যকে জগন্মাতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিযা দেন। পরমুহূর্তেই মা তাহাকে বাহির করিযা দেন। ইহাই শিষ্যের নব-জন্মলাভ। সদ্‌গুরুর কাজ হইল শিষ্যকে জগজ্জননীর সহিত যোগ সাধন করিযা দেওয়া, অর্থাৎ শিষ্যের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত আছে, তাহার উন্মেষ করিয়া দেওয়া বা মায়ার যে আবরণ আছে, তাহা হটাইযা দেওয়া। মায়ের দিকে অগ্রসর হওযা তখন শিষ্যের পুরুষকারেব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে মায়ের কৃপাদৃষ্টি পড়ে, সাধক তাহা উপলব্ধি করিতে পারে এবং সাধনার পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হয়। এইরূপে কৃপামযী মা সন্তানের পথ-প্রদর্শিকা হন এবং কি করা উচিৎ বা উচিৎ নয় তাহার সঙ্কেত দেন।

কৃপাশূন্য পুরুষকার হইল, সাধক পুরুষকারের দ্বারা নিয়মিত সাধনা করিলেও তাহার সাধন পথে কখনো মায়েব প্রত্যক্ষ কৃপাস্পর্শ লাভ কবে না। কোনরূপ কৃপা অনুভব করিতে না পারিলেও যাহার ক্রিয়ায় কিছুমাত্র শিথিলতা আসে না, বরং দ্বিগুন উদ্যমে নিজেকে সাধন-কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া ভাবাশ্রু বর্ষণ

করিয়া সম্পূর্ণরূপে মায়ের চরণকমলে আত্মনিবেদন করে, মা আড়ালে থাকিয়া সেই সন্তানের অনুগমন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া চলেন যদিও সাধক-সন্তান তাহা বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারে না। দশ মাইল ব্যাপী সাঁতারের প্রতিযোগীতায় সাঁতারুরা অংশ গ্রহণ করিলে যেমন তাহাদের পশ্চাতে নৌকা অনুসরণ করিতে থাকে কোন বিপদ ঘটিলে উদ্ধার করিবার জন্য, জগজ্জননীর সাধক-সন্তানের অনুগমনও ঠিক এই প্রকার। যে সাঁতারু মধ্য পথেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, সে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া বিজয়ী হইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। সেইরূপ যে সন্তান কৃপাশূন্য পুরুষকার দ্বারা অগ্রসর হয়, তাহার পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয় অথচ মায়ের কিছুমাত্র কৃপা অনুভব করিতে পারে না, যাহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সমস্ত নৈরাশ্যের তুফান অতিক্রম করিবার বল সঞ্চয় করিতে পারে। যদি সেই সন্তান নৈরাশ্যের হতাশায় নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, তবে তাহার সাধনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি পুরুষকারের দ্বারা সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বা প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং যাহা হয় হউক বলিয়া একান্তভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারে, তবে পরিশেষে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া জয়যুক্ত হয়। তখন অধ্যাত্মজগতে তাহার যে প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনেক উচ্চে। পরমেশ্বর নিজে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নেন। এইরূপ মহত্তম স্থান লাভের অধিকারী করিবার জন্য বা সর্বোত্তম কৃপা ধারণ করিবার আধার তৈরি করিবার জন্য তাহাকে সাধন-পথে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। অধ্যাত্মজগতে কৃপাপথের সাধক যে আনন্দের অধিকারী হয়, কৃপাশূন্য পথের সাধক তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আনন্দের ভোক্তা হয়। ইহাই কৃপা এবং কৃপাশূন্য পুরুষকার—উভয় পথের পার্থক্য।

(দ্রঃ সাঁতারুর দৃষ্টান্তটি কবিরাজ মহাশয় নিজেই দিয়াছিলেন।)

দীক্ষাতত্ত্ব

গুরুতত্ত্বের সহিত দীক্ষাতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, দীক্ষালাভ ভগবানকে পাইবার জন্য অত্যাবশ্যক ব্যাপাব। এই জন্যই ভারতের প্রায় সব ধর্মগুরুরাই দীক্ষাব মাহমা কীর্তন করিয়াছেন।

আণবমল, কার্মমল ও মায়ীয়মল—এই ত্রিবিধ মল জীবের পাশস্বরূপ। ইহার প্রভাবেই জীব পশুপদবাচ্য হইয়া থাকে। এই তিনপ্রকার মল হইতে মুক্তিলাভ দীক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। কর্ম ও মাযা হইতে মুক্ত হইলে সম্যকপ্রকার পাশ মুক্তি হয় না, কারণ আণবমল তখনও অবশিষ্ট থাকে। আণবমল শিব-সত্তার সঙ্কোচ আনিযা জীবভাব প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এই মল নিবৃত্ত না হইলে পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না এবং পশুত্ব নিবৃত্ত না হইলে পরমেশ্বরত্ব লাভ সুদূরপরাহত। দীক্ষায় দ্বিবিধ ব্যাপার সংঘটিত হয়—প্রথম, পশুত্ব এবং আনুষঙ্গিক আবরণ হইতে মুক্তিলাভ এবং দ্বিতীয়, পরমেশ্বরত্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ। ইহাই দীক্ষার মুখ্য ফল। সুতরাং কর্মের অতীত হইয়া, এমন কি মাযার অতীত হইয়া কৈবল্যে স্থিত হইলেও পরমপুরুষার্থলাভের কিছুই হয় না। কাবণ, আণবমল বাকী থাকে এবং তাহার পর পূর্ণব্রহ্মত্বের অভিব্যক্তি অবশিষ্ট থাকে। এইজন্যই দীক্ষার এত মহিমা।

পৌরুষ অজ্ঞান এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান—এই দুই প্রকার অজ্ঞানে জীব আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সদ্‌গুরুর দীক্ষা ব্যতিরেকে পৌরুষ অজ্ঞান কাটে না। সুতরাং দীক্ষা ব্যতিরেকে যে কোনপ্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাতে পৌরুষ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। যে অজ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর জীব সাজিয়া অভিনয় করিতে বাহির হইয়াছেন, যতক্ষণ সেই অজ্ঞান না কাটে ততক্ষণ পরমেশ্বরত্বস্বরূপ অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়। শুধু বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটার কোন মূল্য নাই। পৌরুষ অজ্ঞান কাটাইয়া বৌদ্ধ অজ্ঞান দেহাবস্থান কালেই কাটাইতে পারিলে চিদানন্দরসের অভিব্যক্তি হয় ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়। শুধু বৌদ্ধ জ্ঞানে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় মাত্র, আর কোন ফল হয় না।

দীক্ষারূপ ক্রিয়ার দ্বারাই পৌরুষ অজ্ঞান কাটিয়া যায়। তন্ত্রমতে জীব মূলত শিব। আণবমল-প্রযুক্ত শিবই জীব বা পশুভাব প্রাপ্ত হয়। জীবই শিব হইয়া যায় যে মুহূর্তে সে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারে না,

কারণ তার বৌদ্ধ অজ্ঞান তখনো কাটে নাই বলিয়া। বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটাইবার জন্য চাই বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয়—ইহা সাধন সাপেক্ষ। বৌদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হইলেই দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবের পৌরুষ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু মূলে পৌরুষ অজ্ঞান দীক্ষারূপ ক্রিয়ার দ্বারা অপসারিত না হইলে বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ করিলেও কোন ফল হইবে না, পশুত্ব ঘুচিবে না। মেঘ অপসারিত হইলেও সূর্যের দর্শন মিলিবে না যদি না উহার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু উহার উদয় হওয়ার পর যদি মেঘের আবরণবশতঃ উপলব্ধি না ঘটে, তখন আবরণ অপসারিত হইলেই সূর্য দেখা যাইবে। তাই তন্ত্র বলে—"শিবো ভূত্বা শিবং যজেত"। জীব কেমন করিয়া শিবকে ভজিবে? তাই প্রথম তাকে শিব হইতে হয়—ইহা দীক্ষা দ্বারা হয়।

বেদান্তের মতে বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী, তাই বিদ্যার উদয়েই অবিদ্যার বিনাশ। কিন্তু তন্ত্রমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বিবিধ—এক, পৌরুষ অজ্ঞান, ইহা স্বরূপগত, ইহা জীবের আণবমল বা পশুত্ব। দ্বিতীয়, বৌদ্ধ অজ্ঞান—ইহা আগন্তুক। বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটে বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা—এখানে বেদান্তের মতই ঠিক। কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান কাটানো জীবের সাধ্যায়ত্ব নয়। কারণ জীব হইল এই পৌরুষ অজ্ঞানের বা আণবমলের ফলস্বরূপ। সুতরাং সে কেমন করিয়া তাহাকে দূর করিবে? তাই এ পৌরুষ অজ্ঞান দূর হয় বিদ্যা দ্বারা নয়, ক্রিয়ার দ্বারা। এ ক্রিয়া হইল দীক্ষা। তন্ত্রমতে তাই দীক্ষা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। গুরুশক্তি—গুরুই হইলেন ঈশ্বর—এই মূল স্বরূপভূত পৌরুষ অজ্ঞানকে দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারা নাশ করিয়া দেন, পশুপাশ ছিন্ন করিয়া দেন, শিবত্ব লাভ করাইয়া দেন। শিষ্য হয় তো ইহার কোন অনুভবই পাইল না, কিন্তু মূল পাশ তাহার কাটিয়া গেল। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইহার উপলব্ধি না হওয়ার কারণ তাহার বৌদ্ধ অজ্ঞান। দীক্ষার পরও বৌদ্ধ অজ্ঞান তাহার মধ্যে যথারীতি বর্তমান থাকে। এই বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটাইতে হইলে বৌদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। এজন্য শিষ্য যদি এ জীবনে দীক্ষাব পরে সাধন-ভজনরূপ ক্রিয়া করে তাহা হইলে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারে যে কত বড় পরিবর্তন তাহার মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। আর সাধন-ভজনের পরও যদি জীবনে তাহার উপলব্ধি না ঘটে তাহা হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিবত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ যেদিন গুরুশক্তি তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয় সেদিনই তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া শিবত্বের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, শুধু যন্ত্রের দোষে উপলব্ধি-গোচর হয় না। যেমন সূর্য উদয় হইয়াই গিয়াছে তবে আকাশ মেঘে ঢাকা বলিয়া সূর্যের প্রকাশ অনুভব হইতেছে না, তেমনি শিবত্বের প্রকাশ হইয়া গিয়াছে,

কিন্তু অবিদ্যার মেঘে ঢাকা বলিয়া উহার অনুভব হইতেছে না। আবার সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজার মেঘ অপসারিত করিলেও যেমন সূর্যালোকের দেখা মিলিবে না, তেমনি শিবত্বের উদয় না হইলে হাজার বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ করিলেও জীবের শিবত্ব উপলব্ধি হইবে না। তাই গুরুশক্তি বা দীক্ষা ব্যতীত সাধন ভজন একান্ত নিষ্ফল—এ যেন তীরের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ তরণীতে দিনরাত দাঁড় বাওয়া। গুরু ঐ রজ্জু কাটিয়া দিলেই তবে দাঁড় বাওয়ার সার্থকতা। নইলে যারা নিজের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় করিয়া বৌদ্ধ অজ্ঞানকে নাশ করে তারা একটা blank abstraction অবস্থার মধ্যে গিয়া পড়ে, যথার্থ প্রকাশের অনুভব পায় না। তাই তন্ত্রমতে দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে তবে বিদ্যার উদয়।

শক্তির পরম বিকাশের পর যে transcendence তাহাই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ বা পূর্ণ শিবত্ব। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের মতে আচার্য শঙ্কর ইহাকেই ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীরা আসিয়া শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া সব জিনিস গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথম শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ, ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমা জীবনে ফুটাইয়া তোলা। কিন্তু পূর্ণিমাই শেষ কথা নয়---তাহার পর আছে সপ্তদশী কলা, পরম নির্বাণ কলা।

জ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস প্রভৃতি সাধনোপায়ের দ্বারা কর্মরাশি ক্ষীণ হইলে মায়িক সূক্ষ্ম ও স্থূল ভোগায়তন দেহের আত্যন্তিক বিশ্লেষ হয়। আত্মা তখন কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া মায়ার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া অণু রূপে অবস্থান করে। তখন কর্ম ও মায়া কাটিয়া গেলেও আণবমল অবশিষ্ট থাকে। এই মল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মার পশুত্ব ঘুচিয়া শিবত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। তাই এই সকল আত্মা মায়াতীত হইয়া কেবলীভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া বিজ্ঞানাকল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কৈবল্য তন্ত্রসম্মত মুক্তি নয়। কারণ কৈবল্য অবস্থাতে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যরূপা সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপা কুণ্ডলিনী সুপ্ত থাকে, তাই কৈবল্য অবস্থাতে পশুত্ব ঘুচিয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি ঘটে না। এই সকল কেবলী আত্মা কর্মহীন বলিয়া যেমন মায়িক জগৎকে অতিক্রম করে, অপরদিকে তেমনি শক্তিপাতের অভাববশতঃ বিশুদ্ধ অধ্বা বা মহামায়ার জগৎকে প্রাপ্ত হয় না। ইহারা মায়ার ঊর্ধ্বে এবং বিশুদ্ধ অধ্বার নিম্নে মধ্যস্থ অবস্থায় বিরাজ করে।

যোগাচার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আচার্যগণও এই প্রকার দ্বিবিধ অজ্ঞান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। একটি ক্লিষ্ট অজ্ঞান, অপরটি অক্লিষ্ট অজ্ঞান। পুদ্গল নৈরাত্ম্যের উপলব্ধি হইলে ক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। আর অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তির

মূল ধর্মনৈরাত্ম্য জ্ঞান। ক্লিষ্ট অজ্ঞান ও অক্লিষ্ট অজ্ঞান মূলতঃ আগমেরই বৌদ্ধ অজ্ঞান ও পৌরুষ অজ্ঞানেরই নামান্তর। ক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তির ফলে নির্বাণ, যাহা কৈবল্যের সমগোত্র, লাভ হয়, কিন্তু বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। ক্লিষ্ট অজ্ঞান না থাকিলেও অক্লিষ্ট অজ্ঞান তখনও থাকিয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধত্ব আসে না। কারণ, অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত মহাবোধির উদয় হয় না এবং বুদ্ধত্বও লাভ হয় না। সমস্ত বোধিসত্ত্বভূমিগুলি অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তির ক্রমনির্দেশক। ভূমিসকল পর পর জয় করিতে পারিলে অন্তে অক্লিষ্ট অজ্ঞান পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়। বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করিয়া পর পর দশটি ভূমি অতিক্রম পূর্বক সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন তখনই তিনি যথার্থ বুদ্ধ বা বিশ্বগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহাযান সাহিত্যে দশটি ভূমি স্বীকৃত। এই দশটি ভূমি হইল যথাক্রমে---প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী এবং ধর্মমেঘা। 'দশভূমিসূত্রে' ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিতে যথাক্রমে দানপারমিতা, শীলপারমিতা এবং ক্ষান্তিপারমিতার অভ্যাস করিতে হয়। তৃতীয়ভূমিতে চারিটি ব্রহ্মবিহার, পাঁচটি অভিজ্ঞা লাভ হয় এবং কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব কাটিয়া যায়। চতুর্থ ভূমিতে ৩৭টি বোধিপক্ষধর্ম এবং বীর্যপারমিতার অভ্যাস করিতে হয়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠভূমিতে ধ্যান এবং প্রজ্ঞাপারমিতার অভ্যাস আবশ্যক। ষষ্ঠ ভূমিতেই যোগী প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণভাব সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হন। সপ্তমভূমিতে যোগীর উপলব্ধি হয় যে ধর্মধাতুতে গঠিত সমস্ত বুদ্ধই এক অদ্বৈত ও অখণ্ড তত্ত্বের অন্তর্গত। এই সময়ে বুদ্ধের অনন্ত গুণ বৌদ্ধ যোগীর মধ্যে প্রকট হইতে থাকে। এই অবস্থায় মুক্তি সুলভ হয়। এই সময় বোধিসত্ত্ব ইচ্ছা করিলে নির্বাণে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু সমস্ত জগতের কল্যাণ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সেইহেতু তিনি নির্বাণ গ্রহণ করেন না। অনন্ত বৌদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া তিনি উপায়কৌশল্যপারমিতার অভ্যাস করেন। অষ্টমভূমিতে তিনি অনুপপত্তিক ধর্ম-ক্ষান্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন যাহার প্রভাবে কোনো প্রকারের কর্মই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থায় চারিদিক হইতে বুদ্ধগণ আসিয়া তাঁহাকে অনন্ত জ্ঞানে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষার প্রভাবে তিনি অনন্ত শক্তির অধিকারী হন এবং পরোপকার করিবার সামর্থ লাভ করেন। জগৎকল্যাণরূপ শুদ্ধ বাসনা যদি বোধিসত্ত্বের না থাকিত তাহা হইলে এই সময়ে নির্বাণ-প্রাপ্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। এই ভূমিতে সর্বপ্রকার

বশিত্ব লাভ হয় এবং প্রণিধানপারমিতার অভ্যাস চলিতে থাকে। নবমভূমিতে বুদ্ধত্ব লাভের দিকে বোধিসত্ত্বের গতি অব্যাহত থাকে এবং বহুপারমিতার অভ্যাস চলিতে থাকে। ইহার পর দশম অর্থাৎ অন্তিম ভূমিতে বোধিসত্ত্বের অভিষেক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তখন তিনি বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় দেহ প্রাপ্ত হন এবং ঐ দেহ হইতে রশ্মিসমূহ বিকীর্ণ হইয়া জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির সহায়ক হয়। অসংখ্য নির্মাণকায় গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপারমিতার অভ্যাস করিতে থাকেন। এইরূপে দশভূমি অতিক্রান্ত হইলে তিনি 'দশভূমীশ্বর' পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহাই বুদ্ধত্ব লাভ—ইহারই অপর নাম পূর্ণত্ব।

শৈবাচার্য অভিনব গুপ্ত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই জীবের পশুত্বের কারণ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। পশুত্বের কারণ হইতেছে অজ্ঞান। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, এই অজ্ঞান দুইরকম—এক বৌদ্ধ অজ্ঞান, দ্বিতীয় পৌরুষ অজ্ঞান। বুদ্ধিগত অজ্ঞানের স্বরূপ হইতেছে বিপর্যয় বা বিপরীত জ্ঞান। ইহা কাটে যথার্থ জ্ঞানের ফলে। কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান হইতেছে বিকল্পাত্মক। ইহা কাটাইবার একমাত্র উপায় দীক্ষা। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কারণ এই অজ্ঞানটা জীবকৃত নয়, ইহা শিবকৃত। তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এই অজ্ঞানের আবরণ পরিয়া পশু সাজিয়াছেন। তাই আবার তিনি তাঁর ইচ্ছামত এ আবরণ না সরাইলে হাজার দেবতাকে পূজা করিলে বা যোগ-তপস্যা, ধ্যান-ধারণা করিলেও এ আবরণ সরিবে না। যিনি নিজেকে 'নিগ্রহ' করিয়া পশু হইয়াছেন, তিনিই আবার 'অনুগ্রহ' করিয়া নিজের স্বরূপগত আবরণ না সরাইলে শিবত্ব ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার এই অনুগ্রহশক্তির নামই দীক্ষা এবং তাহার ফলে বিকল্প সরিয়া গেলে আত্মার যে নির্বিকল্প অবস্থা ফুটিয়া উঠে, তাহাই যথার্থ শিবাবস্থা।

এই শিবের স্বরূপই হইল প্রকাশ। এ কেমন প্রকাশ? না, স্বয়ংপ্রকাশ। এই স্বয়ংপ্রকাশের লক্ষণ কি? না, ইহা অন্যনিরপেক্ষ। অন্যনিরপেক্ষতাই স্বয়ংপ্রকাশত্ব। এই অন্যনিরপেক্ষতাকেই শৈবাগম 'স্বাতন্ত্র্য' আখ্যা দিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য শিবের স্বভাবসিদ্ধ। তাই প্রকাশ মানেই স্বয়ংপ্রকাশ। এ প্রকাশ অপরিচ্ছিন্ন। তার অবচ্ছেদক কেউ নাই অথচ নিজেকে স্বেচ্ছাক্রমে স্বাতন্ত্র্যবশত অবচ্ছিন্ন করেন। আবার স্বাতন্ত্র্যবশতই অবচ্ছেদ উঠাইয়া লন।

এই নিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্যটা তন্ত্রমতে শক্তিনিষ্ঠ। পূর্বেই বলা হইয়াছে নিরপেক্ষতা ও প্রকাশটা দুটো আলাদা জিনিষও নয়। তাই 'নিরপেক্ষ প্রকাশ'

মানেই 'শিবশক্তি-সামরস্য'। সেইজন্য স্বাতন্ত্র্যহীন প্রকাশ প্রকাশপদবাচ্যই নয়, তাহা জড়। তাই শক্তিহীন শিব শবমাত্র। তন্ত্রমতে জড় বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, শক্তির সুপ্তি ও জাগরণকেই যথাক্রমে জড ও চৈতন্য এই দুই আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকাশ ও শক্তির যোগে চৈতন্য সৃষ্ট হয।

পরম প্রকাশ নিজের স্বাতন্ত্র্যবশেই আবরণ গ্রহণ করে পশু-জীব হন। 'উপায়' অবলম্বন করিয়াই এ আবরণ উঠাইতে হয। উপায তিন প্রকার—আণব উপায়, শাক্ত উপায় ও শাম্ভব উপায়। এই তিন উপায সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার উপায় আছে তাহার নাম অনুপায়। অনুপায় মানে অল্প উপায় মাত্র দ্বারা প্রাপ্তি। অর্থাৎ একটু উপলক্ষ্য বা নিমিত্ত চাই এবং সেই উপলক্ষটা হইতেছে গুরুবাক্য। গুরুবাক্য বা মহাবাক্যের মধ্য দিয়া ভগবৎশক্তিটা কাজ করে। এই শক্তিপাতটাই হইল মূল জিনিষ। এই শক্তিপাত মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভেদে নয় প্রকার; যথা—(১) মৃদু-মৃদু, (২) মৃদু-মধ্য, (৩) মৃদু-তীব্র, (৪) মধ্য-মৃদু, (৫) মধ্য-মধ্য, (৬) মধ্য-তীব্র, (৭) তীব্র-মৃদু, (৮) তীব্র-মধ্য, (৯) তীব্র-তীব্র। ইহাদের মধ্যে তীব্র-তীব্রের পক্ষেই অর্থাৎ তীব্র-তীব্র শক্তিপাত গ্রহণ ও ধাবণ করিবাব মত আধার যাঁহার তৈরী হইয়া গিয়াছে তাঁহার পক্ষেই অনুপায়ে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুরুবাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বোধ জাগিয়া উঠে।

উপনিষদের উপাসনাতেও আমরা দেখিতে পাই সব কিছুর মূলে রহিয়াছে গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ—'সর্বে যূযং শ্রুত্বা'—এই শ্রবণই হইল ব্রহ্মবিদ্যার মূল। শোনার পর ভিতরে লইয়া গিয়া সংরক্ষণ। কানের ভিতর দিয়া মরমে লইয়া যাওয়া আর বাহির না করা, ইহাই নিয়ম ও ক্রম। তাই 'শ্রুত্বা'র পব চাই 'হৃদযে নিধায়' অর্থাৎ অন্তরে সংস্থাপন।

তান্ত্রিক সাধনার মূলে যেমন দীক্ষা, বৈদিক সাধনার মূলে তেমনি শ্রবণ। শ্রবণরহিত নিদিধ্যাসন কখনো মুক্তি আনিযা দিবে না, কেন না তাহাতে বীজ নাই, শক্তির সে potency নাই। গুরুবাক্য শ্রবণ বিনা প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, আপনার স্বরূপকে চিনিতে পারা যায় না। তাই গুরুবাক্যের এত মহিমা।

যেখানে বাহ্যগুরু হইতে জ্ঞানের উদয় না হইয়া ভিতর হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় সেখানে 'প্রাতিভ জ্ঞান'ই গুরুপদবাচ্য। বাহ্যগুরু মনুষ্যরূপে, সিদ্ধ-পুরুষরূপে, দেবতারূপে প্রকটিত হন। কিন্তু আন্তরগুরু কোন প্রকার কায়াধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন না। নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত প্রতিভারূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এইপ্রকার গুরুপ্রাপ্তি ভগবৎ-কৃপার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ইহাকেই আচার্যগণ 'শক্তিপাত' বলেন।

তীব্রমধ্যম শক্তিপাত হইলেও প্রাতিভ গুরুর কৃপা লাভ হয়। কিন্তু তীব্র-তীব্র শক্তিপাত হইলে প্রাতিভগুরুর আবশ্যকতাও থাকে না—তখন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় পূর্ণতম জ্ঞানের উদয় হইয়া পশু আত্মাকে শিবরূপে পরিণত করে এবং এইপ্রকার পূর্ণ শিবত্ব লাভের পর অজ্ঞান সংস্কার, প্রারব্ধকর্ম প্রভৃতির প্রশ্ন আর থাকে না।

এ তো গেল কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ, তাঁহার পুস্তক পঠন ও আমার মনন-জাত উপলব্ধির কথা। এইবার তাঁহার 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে 'শক্তিপাত রহস্য' ও 'দীক্ষা রহস্য' প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম প্রায় তাঁহার ভাষাতেই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

দীক্ষা-রহস্য

শক্তিপাতের তারতম্য জীবের শুদ্ধ আধারের তারতম্যবশতঃ হইয়া থাকে। অধিকার অনুসারে গুরু দীক্ষাদান করিয়া থাকেন। গুরু শব্দে বুঝিতে হইবে মানবগুরু, সিদ্ধগুরু অথবা দিব্যগুরু---এই তিনপ্রকার গুরুপংক্তির অন্তর্গত কোন মহাপুরুষ। সাধনার লৌকিক প্রণালীতে সাধারণতঃ মনুষ্যকেই গুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে 'গুরুতত্ত্বে' বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসংস্কারেরই নামান্তর। আণব, মায়ীয় ও কার্মমল অথবা 'পাশ'-দ্বারা সংসারী আত্মা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের প্রভাব বশতঃ তাহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। আণবভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর উহাতে শুভাশুভ বাসনার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল কারণের বিপাকে জন্ম (দেহ-সম্বন্ধ), আয়ু (দেহের স্থিতিকাল) ও ভোগ (সুখ-দুঃখের অনুভব) অনিবার্য হয়। ইহারই নাম 'কার্মমল'।

কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ—এই সকল দেহের আশ্রয়ভূত বিচিত্র ভুবন ও নানাপ্রকার ভোগ্যপদার্থের অনুভবের কারণ মায়ীয় মলরূপে প্রসিদ্ধ। কলা হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্বই দেহস্থিত মায়ীয় পাশরূপ জানিতে হইবে। কলা পাঁচ প্রকার, যথা—(১) নিবৃত্তি, (২) প্রতিষ্ঠা, (৩) বিদ্যা, (৪) শান্তি ও (৫) শান্ত্যতীত। পাঁচ কলাতেই কর্মসত্তা থাকে। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যা এই তিন কলাতে যে কার্মফল আছে তাহা স্থূল এবং শান্তি ও শান্ত্যতীত কলাতে সূক্ষ্ম কার্মফল থাকে। 'সমনা' পর্যন্ত কলার ব্যাপ্তি। এইজন্য 'সমনা' পর্যন্ত সমস্ত অধ্বাই পাশজালে আবদ্ধ।

যাহা বলিতেছিলাম, বদ্ধ আত্মাতে উপর্যুক্ত তিন প্রকার মল বা আবরণ বা পাশ সর্বদাই থাকে। দীক্ষার দ্বারা মলিন সংসারী-আত্মার সংস্কার হইয়া থাকে—

"দীয়তে জ্ঞানসদ্ভাবঃ ক্ষীয়তে পশুবাসনা।
দানক্ষপণসংযুক্তা দীক্ষা তেনেহ কীর্তিতা।।"

অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞান প্রদত্ত হয় এবং পশুবাসনার ক্ষয় হয়—এই প্রকার দান ও ক্ষপণযুক্ত ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। ইহাই দীক্ষার স্বরূপ। শক্তিপাতের তীব্রতাদি ভেদে এবং শিষ্যের অধিকার বৈচিত্র্যানুসারে দীক্ষা নানাপ্রকার হইয়া

যে কোন সময়ে বা যে কোন আশ্রমে[১] অবস্থানকালে অচিন্ত্য ভাগ্যোদযবশতঃ কোন কোন আত্মার চৈতন্যশক্তির অনাদি আবরণভূত আণবমল কিঞ্চিৎ পক্ব হইলে তদনুরূপ শক্তিপাত ঘটিয়া থাকে। ইহাকেই প্রচলিত ভাষাতে ভগবৎ কৃপা বলা হইয়া থাকে। ইহার মাত্রানুসারে ভগবানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাদি উৎপন্ন হয়। তখন ঐ শক্তিপাতের অনুরূপ দীক্ষার অবসর আসে। শক্তিপাতের তারতম্যবশতঃ দীক্ষার ভেদ হয়। এই মতে শক্তিপাতের তারতম্যের কারণ হইল মলপাকের বিভিন্নতা।

কেবল শক্তিপাতের প্রভাবে জীবাত্মা ভোগ অথবা অববর্গ-রূপ (মোক্ষরূপ) সিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল শুদ্ধাত্মা পূজা, জপ, ধ্যান, দেবারাধনা প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রভাবে মায়াতীত শুদ্ধ অবস্থা—মন্ত্রত্ব, মন্ত্রেশ্বরত্ব ইত্যাদি—লাভ করেন।

পর ও অপর ভেদে শক্তিপাত প্রধানতঃ দুই প্রকার। পরাশক্তিপাত হইলে পরিচ্ছিন্ন আত্মা পূর্ণ চিদাত্মারূপে প্রকাশিত হয। ইহাই উহার পরম প্রকাশ। কিন্তু অপর-শক্তিপাতে চিদাত্মার আণবমলরূপে অবচ্ছেদ্ সম্যক্‌প্রকাবে অপগত হয না। পূর্ণকৃপা পরমেশ্বর ব্যতীত আব কেহ করিতে পারে না। অপূর্ণকৃপা মন্ত্রেশ্বর প্রভৃতি অধিকারী পুরুষ করিয়া থাকেন। মায়াগর্ভে যে সকল অধিকারী পুরুষ আছেন তাহাদের অনুগ্রহ মন্দ ও তীব্র ভেদে দুই প্রকার। মন্দ অনুগ্রহের ফলে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার প্রভাবে জীব প্রাকৃতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইহাতে প্রকৃতির নিম্নভূমির যাবতীয় কর্মের ক্ষয় অবশ্য হয, কিন্তু প্রকৃতির ঊর্ধ্বস্তরের কর্ম তখনও ক্ষীণ হয না। এই প্রকার বিবেকজ্ঞানীতে আণবমল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইহা সত্য যে এই সকল সাধক পুনরায় প্রকৃতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে না। যদি ঐ অনুগ্রহ তীব্র মাত্রাতে হয, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাধকের পুরুষ-বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয। ইহাব কিছুকাল পরেই পুরুষ মাযা হইতে নিজের ভেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও মায়ারাজ্য অতিক্রম কবে। সাধন রাজ্যে এতটা অগ্রসর হইলে পুনরায় মায়াগর্ভে অবতীর্ণ হইতে হয় না। ইহাই বিজ্ঞানাকল অবস্থা। ইহাকে একপ্রকার কৈবল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানাকল পুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক তাদাত্ম্য অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র-মহেশ্বর পদ প্রাপ্ত হইয়া অন্তে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-ভাব লাভ করে। পরমেশ্বব বা পূর্ণব্রহ্মের কৃপাতে মূল অজ্ঞানরূপ আণবমল নিবৃত্ত হয় ও পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হয়। পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন মাযান্তর্গত বিজ্ঞানাকল পুরুষের কৃপাতে সাধক পূর্ণত্বলাভ করিতে পারেনা।

---

[১] আশ্রম চাব প্রকাব—১) ব্রহ্মচর্য, ২) গার্হস্থ, ৩) বাণপ্রস্থ এবং ৪) সন্ন্যাস।

শক্তিপাত বিচিত্র বলিয়া তন্মূলক অধিকারও বিচিত্র। সময়ী, পুত্রক, সাধক ও আচার্য বা গুরু এইসব অধিকারভেদ বিভিন্ন প্রকার শক্তিপাত হইতে উদ্ভূত হয়। এই সকল অধিকার কাহারও ক্রমশঃ হয় অর্থাৎ প্রথমে সময়ীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকভাবের প্রাপ্তি হয়, তারপর আচার্যভাবে স্থিতি হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও জীবনে এইসব বিনা ক্রমেই আসিতে দেখা যায়। যেমন কোন পুরুষ সময়ী অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াই পুত্রক অবস্থা লাভ করে অথবা সময়ী ও পুত্রক দুই অবস্থাই অতিক্রম করিয়াই আচার্যপদে পৌঁছিয়া যায়। শক্তিপাতের মাত্রা মন্দ হইলে জীব মায়াধিকার প্রাপ্ত হয় ও রুদ্রাংশ ভাব লাভ করে। তারপর পরমেশ্বরের বিশিষ্ট কৃপাবশতঃ পুত্রক দীক্ষার পর পূর্ণত্বে আরূঢ় হয়। ইহার নাম 'সময়ী'। অপেক্ষাকৃত তীব্রতর শক্তিপাতের প্রভাবে কোন কোন পুরুষ বিশুদ্ধ অধ্বাতে যুক্ত হইয়া, হয় দেহান্তে পূর্ণত্বলাভ করে অথবা ক্রম লঙ্ঘন করিয়া জীবিতকালেই পূর্ণত্বলাভ করে। এই সকল পুরুষকে 'পুত্রক' বলে। কেহ কেহ প্রথমে ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভ করিয়া পরে ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য হইতে পরমপদে স্থিত হয়। ইহাদের নাম 'সাধক'। কিন্তু এমন পুরুষও আছেন, যিনি নিজের কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া পঞ্চকৃত্যকারী পরমেশ্বরের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও 'গুরু' বা 'আচার্য' পদে আরূঢ় হইয়া জীবসকলকে অনুগ্রহ করেন।

শক্তিপাত-রহস্য

দীক্ষা প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের শক্তিপাত বা কৃপা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। আত্মার স্বরূপাবস্থান মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আত্মার পূর্ণস্বরূপে অবস্থানই ভগবৎতত্ত্ব অথবা পূর্ণ ব্রহ্মভাব। যতদিন মানুষ নিজের পূর্ণতম আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে না পারে, অন্ততঃ স্থিতিলাভের যথার্থ মার্গে পদার্পণ করিতে না পারে ততদিন তাহাকে তাহার শুভাশুভ কর্মের অধীন থাকিয়া সুখদুঃখরূপ ফলভোগের জন্য ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতেই হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে জন্ম-মরণের চক্রে নিরন্তর আবর্তন করিতেই হইবে। ইহারই নাম সংসার। স্বরূপে স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত ইহা হইতে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জীবের স্বরূপস্থিতির উপায় কি? তান্ত্রিক আচার্যগণের পরিভাষাতে এই উপায়ের নাম 'শক্তিপাত'। ইহার নামান্তর কৃপা অথবা ভগবদনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র পৌরুষের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবন্মুখী বৃত্তির মূলে সর্বত্রই ভগবৎকৃপার প্রভাব স্বীকার করিতেই হয়। কারণ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার দিকে চিত্তের গতিই হইতে পারে না।

শক্তিপাত অথবা কৃপা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে শুধু তন্ত্র-শাস্ত্রের দিক হইতে এই সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক আচার্যগণের মতে শক্তিপাতের প্রকৃত কারণ মলপাক। মলপাক না হইলে শক্তিপাত হইতেই পারে না। মলপাকবশতঃ দীক্ষা প্রভাবে মোক্ষলাভ হয়। পশুর চৈতন্যের বোধক অনাদি অণুমল ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পক্ক হয়। পরিপক্কতা পূর্ণ হইলে উহার নিবৃত্তির সময় উপস্থিত হয়। চক্ষুতে ছানি পড়িলে, অস্ত্রোপচারের দ্বারা উহাকে দূর করিতে হয়। কিন্তু যতদিন উহা ঠিক ঠিক পক্ক না হয় ততদিন অস্ত্রপ্রয়োগ চলে না। অপক্ক মলকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটে। এইজন্য মঙ্গলময় ভগবান জীবের মলপাকের জন্য অবসর প্রতীক্ষা করেন এবং মল পরিপক্ক হইলে দীক্ষার দ্বারা উহা অপসারণ করেন। তাঁহার জীবোদ্ধারের ক্রম ইহাই।

পশু আত্মা আণব-মল, মায়া ও কর্মরূপ পাশে আবদ্ধ। বহু জন্মের নিষ্কাম-কর্ম ও জপ, ধ্যানাদি ক্রিয়ার দ্বারা মায়ামল ও কর্মমল ছিন্ন করিলে ইহারই পুণ্য-প্রভাবে

থাকে। পাশের বিমোচন এবং শিবত্বের অভিব্যক্তির যোগ্যতা দীক্ষা হইতে উৎপন্ন হয়।

পাশের বিচ্ছেদ এবং সর্ববিষয়ক জ্ঞান ক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও কর্তৃত্বের স্ফুরণ, ইহাই সিদ্ধ পুরুষের স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানক্রিয়াত্মক সিদ্ধপুরুষ নিজের ক্রিয়াশক্তিরূপ দীক্ষার দ্বারা পশু আত্মাকে মুক্ত করিয়া থাকেন।

দ্বৈত আগম মতে আণবমল আত্মার অনাদি আবরণের কারণ। ইহার ফল অজ্ঞান। যেমন চক্ষুতে জাল (ছানি) উৎপন্ন হয়, আণবমলও সেইপ্রকার। ইহা জ্ঞান দ্বারা নষ্ট .হইতে পারে না। ইহা দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। মলের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। এই মতে অজ্ঞান দুই প্রকার —

(ক) প্রথম অজ্ঞান বুদ্ধিগত অবিবেক——রজ্জুতে সর্পভ্রম ইহার উদাহরণ। এই প্রকার অজ্ঞান বিবেকজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। "ইহা সর্প নহে, কিন্তু ইহা রজ্জু" এই প্রকার জ্ঞানই বিবেকজ্ঞানের স্বরূপ।

(খ) দ্বিতীয় অজ্ঞান বিকল্পজ্ঞান। দ্বৈত আগমের মতে আত্মার মূল অজ্ঞান বিকল্পাত্মক। মলের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার দরুণ জীবের বিকল্পাত্মক অজ্ঞান জন্মে। ইহা বুদ্ধিগত অবিবেকমাত্র নহে। দ্বৈত আগমের সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধপুরুষ দীক্ষা ব্যাপার দ্বারা এই মলরূপ আবরণকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। "দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্দ্ধং শৈবংধাম নয়ত্যপি" অর্থাৎ দীক্ষাই মুক্ত করে এবং উপরদিকে অর্থাৎ শিবধামের দিকে সঞ্চালন করে।

অদ্বৈতবাদী তন্ত্রমতে অজ্ঞান এবং জ্ঞান উভয়েই 'পৌরুষ' এবং 'বৌদ্ধ' ভেদে দুইপ্রকার। 'পৌরুষজ্ঞানে' কোনপ্রকার বিকল্প থাকে না-- উহা পূর্ণহন্তাময় বোধস্বরূপ। যতদিন পরমেশ্বরের সঙ্গে পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যলাভ না হয় ততদিন ইহার অভিব্যক্তি হয় না। এইজন্য তাদাত্ম্যলাভের পূর্বে যাবতীয় বন্ধন নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। 'পৌরুষ অজ্ঞানরূপী আণবমল' এবং কার্ম ও মায়ীয় মল ক্ষীণ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধন দূর হইতে পারে না। দীক্ষার প্রভাবে 'পৌরুষ অজ্ঞান' অথবা আণবমল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বর্তমান দেহের আরম্ভক কার্মমল (যাহাকে প্রারব্ধ বলা হয়) থাকে বলিয়া 'পৌরুষ জ্ঞানে'র উদয় হইতে পারে না। এই মলেরই নামান্তর প্রারব্ধ কর্ম। ইহা কাটিয়া গেলে দেহপাত হইয়া যায়। সেই সময় 'পৌরুষজ্ঞান' আত্মসাক্ষাৎকাররূপে উদিত হয়। তখন জীব শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শক্তিপাতের তীব্রতা অনুসারে দীক্ষাক্রম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যখন শক্তিপাত অত্যধিক তীব্র হয়, তখন যে দীক্ষা হয় তাহা 'অনুপায়' ক্রমের দীক্ষা। তাহাতে শাম্ভব, শাক্ত ও আণব উপায়ের সম্বন্ধ থাকে না। এই

অনুপায় দীক্ষার প্রভাবে একই ক্ষণে পূর্ণত্বলাভ হইতে পারে। ইহা হইল অত্যধিক মাত্রায় শক্তিপাতের ফল। যখন শক্তিপাত অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ঘটে, তখন ক্রমশঃ শাম্ভবী দীক্ষা, শাক্তী দীক্ষা এবং আণবী দীক্ষার সম্ভাবনা থাকে। অদ্বৈত আগমশাস্ত্র হইতে যে 'বৌদ্ধজ্ঞান' উদিত হয় তাহার প্রভাবে 'বৌদ্ধ অজ্ঞান' এবং উহার কার্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহা হইতে জীবন্মুক্তির প্রাপ্তি ঘটে। বৌদ্ধজ্ঞান উদিত হইলে বিকল্পসকল উন্মূলিত হয় এবং সদ্যোমুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। বিকল্পশূন্য চিত্তের যে সদ্যোমুক্তি তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। দেহে অবস্থানকালেও এই মুক্তিতে কোন বাধা থাকে না। দীক্ষাপ্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণত্বলাভ পর্যন্ত অবস্থাসকলের ক্রম এই প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে—

(১) দীক্ষা।

(২) পৌরুষ অজ্ঞানের ধ্বংস।

(৩) অদ্বয় আগমশাস্ত্রের শ্রবণবিষয়ে অধিকারপ্রাপ্তি এবং তাহার পর শ্রবণাদি সাধন।

(৪) বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়।

(৫) বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি।

(৬) জীবন্মুক্তি।

(৭) ভোগাদি দ্বারা প্রারব্ধনাশ।

(৮) দেহত্যাগের পর পৌরুষজ্ঞানের উদয়।

(৯) পূর্ণত্ব অথবা পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি।

তান্ত্রিকগণ বলেন যে, আগম প্রতিপাদিত জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যপ্রকার জ্ঞান ও যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধিতা হেতু 'মধ্যস্থ' অবস্থা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারা উপকারীর প্রতি প্রসন্নতা বা অপকারীর প্রতি ক্রোধ পোষণ করেন না—উভয় ক্ষেত্রেই সাম্যরূপ অভিন্ন বৃত্তি অবলম্বিত হয়। এই অবস্থার নাম 'মাধ্যস্থ্য'। তাঁহাদিগের পরিভাষা অনুসারে ইহারই নাম জীবন্মুক্তি—

"ন হৃষ্যত্যুপকারেণ নাপকারেণ কুপ্যতি।
যঃ সমঃ সর্বভূতেষু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি উপকাবে প্রসন্ন হন না এবং অপকারেও কুপিত হন ন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি থাকেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

তান্ত্রিকগণ বিভিন্ন গ্রন্থে দীক্ষার প্রকারভেদ বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিভিন্ন দীক্ষার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শিষ্যের যোগ্যতামূলক অধিকারভেদই এই ক্রমের মুখ্য কাবণ। নিম্নে কয়েকটি দীক্ষাব কথা বলা হইল।

সকলপ্রকার দীক্ষার মধ্যে প্রথমে 'সময়দীক্ষা'ই আলোচ্য। আত্মার অনাদি মল কিঞ্চিন্মাত্র পক্ক হইলেই যখন ভগবানের কৃপাশক্তি অত্যন্ত মন্দরূপে জীবে অবতীর্ণ হইতে থাকে, তখনই এই দীক্ষা হইতে পারে। এই দীক্ষার পর ভগবানের প্রতি ভক্তির উন্মেষ হইতে থাকে। এই দীক্ষার প্রধান ফল প্রাক্তন কর্ম-সমূহের পরিপাক। কর্ম পরিপক্ক না হইলে নষ্ট হইতে পারে না। যদিও কালরূপী অগ্নিদ্বারা নিরন্তরই কর্মসমূহ পক্ক হইতেছে তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কাল ক্রমধর্মক। ক্রমিক ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় হয় সত্য, তবে ক্রমশঃ হয়, একসঙ্গে হয় না, হইতে পারেও না। তাহা ছাড়া ভোগের দ্বারা কোনো সময়েই কর্ম নিঃশেষ হইতে পারে না। বর্তমান জন্মে প্রাক্তন কর্মের ফলভোগের সঙ্গে সঙ্গে এ-জন্মে অশুদ্ধ অহং অভিমানে কৃতকর্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়। এইরূপে এই জন্মের সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার পরিপক্কতা লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ জন্ম নিয়ন্ত্রিত করে। এইরূপে ধারাবাহিকরূপে জন্ম ও কর্মের আবর্তন চলিতে থাকে। কর্মের মূল নষ্ট না হওয়ার দরুণ নূতন কর্মের সঞ্চয় হইতেই থাকে। এইজন্য দীক্ষা আবশ্যক, কারণ দীক্ষা সমষ্টিরূপে কর্ম-বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ। দীক্ষার প্রভাবে এবং শিষ্যের প্রযত্নের ফলে জ্ঞানোদয় হইলে সেই জ্ঞানাগ্নিতে প্রাক্তন কর্মের বীজ একসঙ্গে দগ্ধীভূত হয় এবং নূতন কর্মও আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সময়দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে শাস্ত্রের অধ্যাপনা, শ্রবণাদি এবং হোম, পূজন, জপ, ধ্যানাদিতে যোগ্যতালাভ হয়। সময়ীর চিত্ত চর্যা ও ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ হয়। গুরুপদিষ্ট শাস্ত্রোক্ত আচারাদির পালনকে চর্যা বলে। ধ্যান যোগাভ্যাসের নামান্তর। এই দীক্ষার প্রভাবে পূর্ণত্ব লাভ হয় না, তবে ইহা হইতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বা অপরামুক্তি লাভ হইতে পারে এবং পুত্রকাদি দীক্ষা লাভ করার যোগ্যতা জন্মে। সময়দীক্ষার পর পুত্রকাদি অন্যান্য দীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সাধকদীক্ষা—সাধক দুই প্রকার—শিবধর্মী ও লোকধর্মী। তাই দীক্ষাও 'শিবধর্মিনী' ও 'লোকধর্মিনী' দুই প্রকার। দুই দীক্ষাকেই সাধকদীক্ষা বলে। শিবধর্মিনী দীক্ষার প্রভাবে যোগ্যতা অনুসারে সাধক তিনপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়—মন্ত্রেশ্বরপদ-প্রাপ্তি, মন্ত্রপদপ্রাপ্তি ও পিণ্ডসিদ্ধি। শিবধর্মী সাধক গৃহস্থ হইতে পারে, যতিও হইতে পারে। জ্ঞানবত্তা, অভিষেক প্রভৃতি এই দীক্ষার ফল। শিবধর্মিনী দীক্ষাতে সাধকের সাধকত্বে অভিষেক হয়। এই অভিষেক 'বিদ্যাদীক্ষা'র পরে হয়। শিবধর্মী সাধকের শিবপদে যোজনের পর যে সদাশিবপদে যোজনারূপা দীক্ষা হয়, তাহাকে 'বিদ্যাদীক্ষা' বলে। সদাশিব পদ বিদ্যাত্মক।

লোকধর্মিনী দীক্ষার প্রভাবে প্রাক্তন ও আগামী কর্মের মধ্যে অশুভ অংশ মাত্র নষ্ট হয় এবং শুভ-অংশ অণিমাদি সিদ্ধিরূপে পরিণত হয়। প্রারব্ধ

কর্ম অবশ্য ভোগিতে হয়। ভোগান্তে প্রারব্ধজাত দেহ পতিত হইলে গুরু দীক্ষিত-সাধককে অণিমাদি ভোগের জন্য উর্দ্ধলোকে সঞ্চালিত করেন। ঐখানকার ভোগ সমাপ্ত হইলেও যদি ভোগবাসনা অতৃপ্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ বাসনার অনুরূপ ভোগের জন্য উর্দ্ধতর ভুবনে গুরু তাহাকে পাঠান। এই প্রকারে শুভ-কর্মভোগের পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে ঐ স্থান হইতে অর্থাৎ অন্তিম ভোগস্থান হইতে পরমেশ্বরের নিষ্কল স্বরূপে যোজিত করেন।

সবীজ ও নির্বীজ দীক্ষা—যাহারা শাস্ত্রবিচারে কুশল নহে তাহাদের জন্য নির্বীজ দীক্ষার বিধান আছে। সাধারণতঃ নির্বীজ দীক্ষা বালক, মূর্খ, স্ত্রী ও ব্যাধিগ্রস্তাদির জন্য। তাহাদের জন্য সময়াচার পালনের আবশ্যকতা থাকে না। এই দীক্ষার প্রভাবে কেবল গুরুভক্তির ফলেই মুক্তিলাভ হয়—"দীক্ষামাত্রেণ মুক্তিঃ স্যাৎ ভক্তিমাত্রাৎ গুরোঃ সদা।" (স্বচ্ছন্দ তন্ত্র)

আচার্যের দীক্ষা হয় সবীজ। ভোগার্থী সাধক-দীক্ষাও সবীজ হয়। সবীজ দীক্ষা হইলেই অভিষেক হইতে পারে। বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে সবীজ দীক্ষা দিয়া আচার্য ও সাধকপদে অভিষিক্ত করিতে হয়। আচার্য মুমুক্ষু, কিন্তু সাধক ভোগার্থী। অভিষেক ব্যতীত ভোগ ও মোক্ষে অধিকার হয় না। যে কোন ব্যক্তি আচার্যপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি গুরু হইতে আগমের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং কায়িক, বাচিক, ও মানসিক প্রবৃত্তির সংযমশীল, যে সদাচারসম্পন্ন ও সম্যক্ প্রকারে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করে—এইরূপ ব্যক্তি আচার্যপদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য। এই অভিষেক শিবযোজন পর্যন্ত দীক্ষা সমাপ্ত হইবার পর করিতে হয়।

ক্রিয়াদীক্ষা—ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে দীক্ষা দুই প্রকার। ক্রিয়াদীক্ষা নানাপ্রকার—কিন্তু জ্ঞানদীক্ষা একপ্রকার। ক্রিয়াদীক্ষা সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুই প্রকার। আবার অসাধারণ দীক্ষা অধ্বাভেদে ভিন্ন ভিন্ন—যেমন কলাদীক্ষা, তত্ত্বদীক্ষা, ভুবনদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা ইত্যাদি। এই সমস্ত দীক্ষার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সদ্‌গুরুই শিষ্যের আধার ও যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দীক্ষা দিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা অনধিকার চর্চা। তথাপি কলাদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা বা মন্ত্রদীক্ষার বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

পৃথিবী হইতে কলাতত্ত্ব পর্যন্ত মায়ার অধিকার। ইহাই সংসারমণ্ডল। ইহার পরে আছে শুদ্ধবিদ্যার রাজ্য। শুদ্ধবিদ্যাই বাগীশ্বরী। বাগেশ্বরী-গর্ভে জন্ম বস্তুতঃ বৈন্দবদেহ মন্ত্রদেহ প্রাপ্তির নামান্তর। মন্ত্রের প্রভাবে পশু জীবের পাশ সকল বিনষ্ট হয়। ইহাই দীক্ষার প্রথম অঙ্গ বা পাশক্ষয়। দীক্ষার দ্বিতীয় অঙ্গ শিবত্বযোজন। সদ্‌গুরু যখন দীক্ষাদান করেন তখন এই দুইটি অঙ্গই পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হয়।

মায়ার অন্তর্গত ভোগই কর্মের ফল। কর্ম শুভ বা অশুভ বাসনাত্মক। এই সকল কর্ম হইতে ভোগ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অনেক জন্ম হইতে সঞ্চিত প্রাক্তন কর্ম দগ্ধ হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মের বৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কেবল দেহারম্ভক কর্মই ভোগ দ্বারা নষ্ট করিতে হয়। ভোগনিবৃত্তি হইয়া গেলে কিছু সময়ের জন্য একটি অনির্বচনীয় তৃপ্তির উদয় হয়, ইহা পরম প্রীতির অবস্থা।

শুভ অথবা অশুভ কর্ম হইতে বিভিন্ন ভুবনে জন্ম, আয়ু, ভোগ এই তিনপ্রকার ফলের অনুভব হয়। ইহাকে শুদ্ধ করার জন্য 'নিষ্কৃতি' সংস্কার আবশ্যক হয়। নিষ্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইয়া যায়। নিষ্কৃতি ভোগসমাপ্তির সূচক। ঐ সময়ে ভোক্তাতে ভোক্তৃত্ব থাকে না। আণবমলের দরুণ যে বিষয়াসক্তি বা রাগ উৎপন্ন হয় তাহারই নাম ভোক্তৃত্ব। ভোগভাব সম্পন্ন হইয়া গেলে ভূতসর্গরূপ নানাপ্রকার স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীর নষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রকারে দীক্ষার দ্বারা তিনপ্রকার পাশেরই বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে। ঐ সময় সব শরীর নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পশুজীব অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশসম্বন্ধবিমুক্ত চৈতন্য শুদ্ধ নিবৃত্তিকলার উপরে স্থিত হয় ও সুবর্ণপ্রভার ন্যায় দেদীপ্যমান হয়।

মন্ত্রোচ্চারণে উহার অঙ্গভূত বারোটি প্রমেয় জানা আবশ্যক। এই সকল প্রমেয় প্রণবের বিভিন্ন অবয়ব। এইগুলির নাম অ, উ, ম, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। এই সকল প্রমেয় জানিয়া উহাদের প্রত্যেকটি দশা ত্যাগ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ আরোহণরূপ অবস্থা লাভ করা যায়। ইহাকে উদ্ভব বলে। এই সকল দশা ত্যাগ করার ক্রম আছে। এখানে এই ক্রমের আলোচনা না করিয়া এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপিনী পর্যন্ত উপনীত হইতে পারিলে সাধকের অবস্থার নাম হয় 'প্রবুদ্ধ'। ইহারও উপরে উঠিয়া সমনা পর্যন্ত সমস্ত অধ্বা অতিক্রম করিতে পারিলে 'সুপ্রবুদ্ধ' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন পরমতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তখন মনের সংস্কারও ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া উন্মনা ভাবের প্রাপ্তি হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে এই অবস্থা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদের পর হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কালের স্পর্শ থাকে না, নিবৃত্তি প্রভৃতি কোন কলা থাকে না, প্রাণ ও অপানের সঞ্চারও থাকে না, পৃথিবী প্রভৃতি ছত্রিশটি তত্ত্বও থাকে না। ইহা পরম অদ্বয় এবং পরম শুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থার অনুভব হইলে পূর্ণ জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়।

পরমেশ্বরের বোধরূপা শক্তি বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া পরাকুণ্ডলিনীরূপে

এবং বিমর্শাত্মিকা বলিযা নাদাত্মিকা বর্ণকুণ্ডলিনীরূপে স্ফুরিত হয়। এই বিশ্বগর্ভা কুণ্ডলিনী শক্তি জীবদেহে মূলাধারপদ্মে প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ পড়িয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃই নাদময বা বিমর্শময রূপ ত্যাগ করিয়া প্রাণকুণ্ডলিনীরূপে ভাসমান হয়। এই প্রাণই 'হংস'। ইহা স্বভাবতঃই উপর ও নীচের দিকে চলিতে থাকে। ইহার এই প্রকার চলনবশতঃ 'হ'-কার ও 'স'-কার বিমর্শরূপে উহার ভান হয। এই নাদরূপী হংসের যেটা স্বাভাবিক উচ্চার তাহাই পরিস্ফুট বর্ণের উচ্চার। এই বর্ণোচ্চার যোগিগণের ভ্রূমধ্যস্থানে বিন্দুরূপে অনুভূত হয়।

কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলে যোগী শব্দরূপে স্পষ্টভাবে শক্তির অনুভব লাভ করে। ইহাই নাদ। নাদের অপরভাব বিন্দুরূপ জ্যোতি, যাহা অর্দ্ধচন্দ্র ও নিরোধিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। জ্যোতির অপরভাব হইল মন্ত্র। অ-কার, উ-কার ও ম-কাররূপ বর্ণপরামর্শই মন্ত্র।

বিন্দু অবিভক্ত জ্ঞানরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সম্পূর্ণ ভেদের বাচক অ, উ, ম, এই তিনমাত্রা। এই তিনটিকে মিলিত করিয়া একাকার করিলে যে জ্যোতির্ময জ্ঞানের উদয় হয, উহার নাম বিন্দু। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার উপলব্ধি হয় ভ্রূমধ্যে। বিন্দু অবস্থাতে বিভিন্ন জ্ঞেয়ের ভেদ বিগলিত হইয়া উহাদের অভিন্ন জ্ঞেয়রূপে ভান হয়। কিন্তু উহাতে জ্ঞেয়াংশের প্রাধান্য থাকে, জ্ঞানাংশের নহে। ইহার পর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র স্থানে উপনীত হইলে জ্ঞানাংশের বৃদ্ধির দরুণ জ্ঞেয়াংশের প্রাধান্য কম হইযা থাকে। ইহার পর যোগী নিরোধিকা অবস্থাতে উপস্থিত হইলে জ্ঞেয়ভাবের প্রাধান্য একেবারে নিবৃত্ত হয় এবং বিন্দু পরিস্ফুট রেখারূপে উর্দ্ধোন্মুখ প্রতীত হইতে থাকে। বিন্দুর নিরোধিকা পর্যন্ত ব্যাপ্তি। নাদের ব্যাপ্তি নাদান্ত পর্যন্ত। এইবার যোগী নাদান্ত ভূমি অবলম্বন করে। এখানে জ্ঞেযভাব অভিভূত থাকে এবং অভেদজ্ঞান প্রধানতঃ স্ফুরিত হয়। ইহার পর যোগী ব্যাপিনীতে প্রবেশপূর্বক ব্যাপকত্ব লাভ করে। ইহার পর সমনা অবস্থায় উপনীত হয়। ইহা বিশুদ্ধ মনের অবস্থা। ইহাও অতিক্রম করিলে যোগী শুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয। সমনার উপরে শুদ্ধ আত্মা আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ঐ সময়ে সমগ্র বিশ্ব অভেদে প্রকাশিত হয়। এই অভেদপ্রকাশ উন্মনাশক্তির ব্যাপার। উন্মনা পরমেশ্বরের সমবায়িনী শক্তি। উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ আত্মা পরমেশ্বরের অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিদানন্দময় পরমশিবের সঙ্গে আত্মার অভেদত্ব সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন শরীর ও শরীরতত্ত্ব

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ দেহ—আমরা সাধারণতঃ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহের কথা শুনিয়া থাকি। তন্মধ্যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ কেবলমাত্র স্থূলদেহের সত্তা স্বীকার করেন। সাংখ্য ও যোগের ভূমিতে স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরও স্বীকৃত হয়। সাংখ্যের পর বেদান্তভূমিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত কারণশরীর অঙ্গীকৃত হয়। ইহার পর আর কাহারও গতি নাই। বস্তুতঃ কারণশরীরের পর মহাকারণ শরীর আছে। মহাকারণশরীর বা আত্মার পরমস্বরূপ যোগপথে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ইহা ছাড়া কৈবল্যশরীর আছে। কৈবল্যশরীর নিরাকার ও বিশুদ্ধ চিন্ময়।

মায়াগর্ভে অবতীর্ণ হইলেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ--- জীবের এই তিনটি মায়িকশরীর থাকিবেই। এই ত্রিবিধ শরীরই (কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল) অশুদ্ধ জড় উপাদানে নির্মিত। তন্মধ্যে কারণশরীর মায়াময় এবং সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর মায়া হইতে উদ্ভূত তত্ত্বময়। মায়া ও প্রকৃতি অভিন্ন ধরিলে এই উদ্ভূত তত্ত্বগুলি সংখ্যাতে ২৩টি হইবে। স্থূলশরীর পঞ্চভূত নামক পাঁচটি তত্ত্বের দ্বারা রচিত এবং সূক্ষ্মশরীর অবশিষ্ট ১৮টি তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত।

মানবাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি দেহ লইয়া অবস্থান করে। মানবসৃষ্টির ধারাতে এই তিনটি দেহ পর্যায়ক্রমে অবস্থিত রহিয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণদেহ স্থূলদেহকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। কারণদেহও সূক্ষ্মদেহকে ছাড়িতে পারে। আবার কারণদেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার দেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে। কারণদেহ পূর্ণত্ব লাভ করিলে উহা আপন চৈতন্য স্বরূপে ফিরিয়া যায়। এই চৈতন্যস্বরূপই মহাকারণ দেহ। কারণদেহ হইল জীবাত্মা। আত্মবোধ জাগ্রত না হইলে কারণদেহ হইতে মহাকারণদেহে অর্থাৎ স্বরূপ-চৈতন্যে পৌঁছান যায় না। কারণদেহের বোধ অর্থাৎ আত্মবোধ স্থূলদেহে অবস্থান কালেই উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক।

"যোনেঃ শরীরম্"—যোনি হইতে শরীর উদ্ভূত হয়। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্বশেষে মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হয়। এই যে ৮৪ লক্ষ যোনির বিবর্তনের কথা বলা হইল, ইহারা স্থূলদেহের বিকাশের এক একটি ক্রমোন্নত স্তর। এই ক্রমিক উৎকর্ষসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তরে তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান। এক মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে প্রথমে অন্নময় সত্তার

আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে প্রাণময় সত্তার বিকাশ এবং প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তাব অভিব্যক্তি প্রকৃতিব ক্রমবিবর্তনের অন্তর্গত। এইরূপ ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে এবং মনোময় সত্তার অভিব্যক্তির সঙ্গে স্থূল মনুষ্যদেহের উৎপত্তি হয়।

মানুষের এই স্থূলদেহ সাধারণতঃ 'প্রারব্ধ' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ কবিবাব জন্য দেহ গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য মনুষ্যদেহকে 'ভোগায়তন' দেহ বলে। জন্মিবাব পর যতদিন দেহের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ফল-ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন দেহ ধারণ করিতে হয। ভোগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয। জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখ ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই দেহ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টি ভোগাযতন দেহের স্থিতিকাল। প্রচলিত ভাষায় ইহাকেই আয়ু বলা হয়।

আমরা নিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকাব স্বপ্ন দেখিতে পাই। স্বপ্ন সূক্ষ্মদেহেরই ব্যাপার। আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা জাগে সেই ইচ্ছা স্থূলবস্তু নহে, ইহা সূক্ষ্ম। স্থূলদেহ ইচ্ছার অধীন। আমাদের প্রবৃত্তি সু ও কু ভেদে দুই প্রকার। কু-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত ইচ্ছাই কু-ইচ্ছা। কু-ইচ্ছার বশবর্তী স্থূলদেহ অচিরে বিনষ্ট হইযা যায়। সৎ প্রবৃত্তিব দ্বারা পরিচালিত ইচ্ছার বশবর্তী দেহ বহুদিন স্থায়ী থাকে। মৃত্যুর পর যে দেহ স্থূল শরীর হইতে নির্গত হয়, তাহাকে সূক্ষ্মদেহ বা ভৌতিক আত্মা বলা হয। ইচ্ছা কু-প্রবৃত্তিব বশবর্তী হইলে শরীরের যন্ত্রগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, মস্তিষ্কেব কেন্দ্রগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে উহা প্রাণশূন্য হয। কিন্তু স্থূলদেহের পতন হইলেও সূক্ষ্মদেহের প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। তখন প্রবৃত্তিবশে সূক্ষ্মদেহ নানা প্রকার কর্ম কবিতে ইচ্ছা করে। স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু, বিষয-সম্পত্তি যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া চলিযা গিয়াছে তাহাদের প্রতি মাযিক আকর্ষণ অনুভব করে। কখনো কখনো পূর্বজন্মে অনুভূত বিরুদ্ধ ভাবের প্রবলতাবশতঃ প্রতিহিংসা লইবার উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গ উন্মুখ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থিতিতে সূক্ষ্মদেহে ভীষণ যন্ত্রণার অনুভব হয়।

শাস্ত্রে আছে, জীব যে কর্ম করে তাহার কতকটা ফল এ-জন্মে ভোগ করে, বাকী কর্মেব অণুগুলি প্রবৃত্তিরূপে চিত্তে লাগিয়া থাকে। উক্ত প্রবৃত্তিরূপ আবরণ দ্বারা আমাদের ইচ্ছা আবৃত রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা বুঝিতে না পারে যে সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারূপে জীবদেহে অবস্থান করিতেছে ততদিন পর্যন্ত তাহাকে সংসারে ঘুবিয়া ফিরিযা আসিতে হয়। এই যে প্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছাদিত ইচ্ছার কথা বলা হইল, শাস্ত্রে ইহাকে ইচ্ছা না বলিয়া সূক্ষ্মদেহরূপে বর্ণনা করিয়াছে।

মানবই একমাত্র বিবেকসম্পন্ন জীব। বিবেক আছে বলিয়াই মানুষ ধীর, স্থির ও শান্ত হইতে পারে। স্বপ্ন মনের একটি চঞ্চল অবস্থা মাত্র। ঐ অবস্থায় মন বিবেকের অজ্ঞাতে অশান্তভাবে বিচরণ করে। জাগ্রত অবস্থায় চিন্তার ফলেও কখনো স্বপ্নের উদয় হয়, সেইজন্য স্বপ্নের ভিত্তি সম্বন্ধে নানা লোক নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, স্বপ্নের ব্যাপার বিবেকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে ঘটিয়া থাকে। যেহেতু স্বপ্ন সূক্ষ্ম দেহেরই ব্যাপার, সেইহেতু স্বপ্নাবস্থায় মোহান্ধ ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ মোহ ও অবিবেকের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আকাশে বিহার করে। কিন্তু মুক্ত মহাপুরুষগণের সূক্ষ্মদেহে জ্ঞান থাকে, তাঁহারা নিজের ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্মদেহে জগতের সর্বত্র বিহার করিতে পারেন।

অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন মহাপুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগে মন ও ইচ্ছাকে সমাহিত করিয়া আসন হইতে ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, যোগে তাঁহাদের দেহ তেজোময় হওয়ার ফলে লঘু হয় বলিয়া স্বভাবতঃই উপরে উত্থিত হয়। নিবিষ্ট চিত্তে আত্মচৈতন্যে যুক্ত হওয়াকেই যোগযুক্ত বলে। লৌহ যেমন জলে ভাসে না কিন্তু পারদের উপর ভাসে, আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা। যতদিন মন অথবা ইচ্ছা বাসনায় আবৃত থাকে ততদিন উহা চৈতন্যসমুদ্রের নীচে মোহান্ধকারে পড়িয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহে জ্ঞানের উদয় হইলে উহা ভাবসমুদ্রে ভাসিতে থাকে।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ অথবা ভক্তিযোগের দ্বারা সূক্ষ্মদেহ অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া পৌঁছায় অর্থাৎ যাবতীয় আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করে। স্বপ্নাবস্থায় সাধারণ মানুষের শরীর হইতে যে সূক্ষ্মদেহ নির্গত হয় তাহা তমোরাশির দ্বারা আবৃত থাকে। গাঢ় অন্ধকারে যে বাস করে সে আলোকের কল্পনা কি প্রকারে করিবে? সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে ক্রিয়ার দ্বারা আবরণরূপ তমোরাশি বিদূরিত করিলে সূক্ষ্মদেহ জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যায়। তখন সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্ম জগতের সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের রচিত 'একটি অদ্ভুত বালকের কথা' হইতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বালকটির নাম কেদার। কেদার কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বলিল, 'আমি (কেদার) যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যাই—তখন আমার জ্ঞান থাকে, বাহিরে যাইয়া নানা স্থান দর্শণ করিয়া পুনর্বার যখন নিজ দেহে ফিরিয়া আসি তখনও বোধ থাকে এবং পূর্বের স্মৃতি বর্তমান থাকে।" (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ—১৬০)

মনই সাধনার প্রধান যন্ত্র। কোন বিষয়ে মনকে একনিষ্ঠভাবে যুক্ত করাই সাধনা। মন আত্মা নহে। আত্মা কারণদেহ। জীবাত্মাকে উহার স্বরূপে পৌঁছাইতে

হইবে। ইহা সাধনা ভিন্ন হইতে পারে না। সাধনা না করিলে প্রকৃতির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না এবং সেজন্য আত্মজ্ঞানও লাভ হয় না। সাধনার জন্য সদ্‌গুরু আবশ্যক। সদ্‌গুরুর উপদেশে দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভের পথে মানুষ দাঁড়াইতে পারে। তখন মানুষ কারণদেহে সাক্ষিরূপে নির্বিকার থাকিয়া প্রকৃতির কার্য পর্যবেক্ষণ করিতে পাবে।

কারণদেহও সাকার। উহা অপরিবর্তনীয়। উহাকে ভাবদেহও বলা যাইতে পারে। সূক্ষ্মদেহের সীমা পর্যন্ত নিযতি ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেখানে কর্মের বন্ধন আছে, তাই ঐ পর্যন্ত জীবের প্রকৃতির অধীনতা কাটে না। কারণভূমিতে জীব স্বাধীনতা লাভ করে, সেখানে কর্মবন্ধন নাই। আনন্দ, দযা, প্রেম, করুণা, বিভূতি প্রভৃতি সেখানকার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য কারণবাসিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করেন। ইহাতে বন্ধন নাই, স্বাধীনতাও যথেষ্ট আছে, তথাপি কারণে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। পূর্ণ সত্যের মুক্ত প্রকাশ সেখানেও পাওয়া যায় না—যেন একটা বিচ্ছেদের ভাব সদাই জাগিয়া থাকে। কিন্তু মহাকারণে তাহা নাই। ঐটিই নিত্য মিলনের স্থান। বিরাট সত্তার যে সত্তা বা ধর্ম, সেখানে গেলে জীবেরও তাহাই প্রাপ্তি হয়—কোন ভেদ থাকে না।

দেবতাদি সব কারণজগতের সত্তা। সাধন-ভজনের ফলে কারণ-জগতে যাওয়া যায় এবং সেখানে পরম আনন্দে অবস্থান করা যায়। কিন্তু তাহা পূর্ণতা নহে। কাবণ হইতে মহাকারণে যাইতে না পারিলে একটা অতৃপ্তিবোধ সর্বদাই লাগিয়া থাকে। আবার ইহাও সত্য যে সাধন-ভজন দ্বারা মহাকারণে যাওয়ার কোন উপায় নাই।

কাবণদেহে স্থিতিলাভ করিলে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, এমন কি ঈশ্বরত্ব লাভও হয়, কিন্তু পূর্ণতা হয় না। ঈশ্বরের পরাবস্থা পরব্রহ্ম। ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, ঈশ্বর হওয়াও যায়, কিন্তু পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। কারণ ভেদ করিয়া মহাকারণে প্রবেশ করিলে জীব পরব্রহ্মই হইয়া যায় অর্থাৎ আপন স্বরূপ-চৈতন্যে স্থিতি হয়—ইহাই মহাকারণদেহ।

যোগাদি নানা উপায়ে আমবা ঈশ্বর পর্যন্তই যাইতে পারি, কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে পারি না। ঈশ্বর পূর্ণ নন। চেষ্টা করিয়া সাধনার দ্বারা সসীম ঈশ্বর হওয়া যায়, কিন্তু অসীম পরব্রহ্ম হওয়া যায় না। চৈতন্যকে জাগাইয়া রাখিতে না পারিলে পরব্রহ্ম হওয়া অসম্ভব।

সৃষ্টির ধারায় নামিবার পর, উজান ধারায় ফিরিবার সময় ইন্দ্রিয় মনে মিশিয়া যায, মন জীবাত্মা পর্যন্ত সাধককে পৌঁছাইয়া দিয়া জীবাত্মাতে অদৃশ্য

হইয়া যায়। জীবাত্মাও সেইরূপ আপন স্বাতন্ত্র্য বাখিতে না পারিলে পরতত্ত্বে অদৃশ্য হইয়া যায়। জীবাত্মা আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে, যদি মনকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে পারে। না পারিলে মন লীন হইয়া যায় ও নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তখন সবই এক বিরাট জ্যোতিতে পবিণত হইয়া যায়। বস্তুতঃ আমিই তখন এক বিরাট জ্যোতি হইলাম। কিন্তু আমি যে ব্রহ্ম হইলাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কারণ বীজ স্বরূপ। কারণ হইতে কার্যরূপে সূক্ষ্ম ও স্থূলের বিকাশ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কারণ কাবণই থাকে। থাকে বলিয়াই তাহারই আকর্ষণে কার্য আবার তাহাতে ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাইয়া লীন হয়। দ্রষ্টা হইতে না পারিলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। মহাকাবণ দ্রষ্টা। জীবও উহার মত হইতে পারে। যদি হয় তাহা হইলে আর লয় হইবে না, তখন সৃষ্টির কৌশল ধরিতে পারিবে, ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে পাবিবে। তখন মহাকাবণের সঙ্গে সমান সমান হওয়াতে প্রেমের উদয় হইবে। ইহার পর কৃপা পাইলে একত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ।

কারণদেহই মহাকারণের প্রকৃতি। মহাকারণের ইচ্ছাতে কারণে ক্রিয়া হয় অর্থাৎ মহাকারণের ইচ্ছাতে কারণ স্পন্দিত হইয়া প্রকৃতিবিকাশবশতঃ ক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূলের বিকাশ হয়। এইভাবে অনন্ত সৃষ্টির উদয় হয়। মহাকাবণেব এই ইচ্ছাই স্বভাব—ইহাও অনাদি। মহাকারণের এক পাদে মাত্র ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়। বাকীটা দ্রষ্টা থাকে।

ইন্দ্রিয়ের কার্য যখন হয় তখন মনের বিকার হয়—উহাই জীবভাব। মনের ইন্দ্রিয়ে নামার ইচ্ছাকেই বলা হয় মনের বাসনা। মন ইন্দ্রিয়ে নামিয়া যখন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে তখন উহার দেহবদ্ধ ভাব। যখন বাসনা থাকে না তখন মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়—তখন কোন অবলম্বন থাকে না বলিয়া মন লীন হইয়া যায়। ইহাই নির্বাণ বা মোক্ষ। যাহা হইতে মন উঠে তাহাতেই উহা আবার লীন হয়, যদি উহাকে পৃথক্ করিয়া না রাখা যায়। মনকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইলে মনকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে হইবে। চৈতন্যময় মনই পরব্রহ্মের ইচ্ছা. অর্থাৎ চৈতন্যময় ইচ্ছা সত্তাই পরব্রহ্মের চিৎ-শক্তির ধারা। পরব্রহ্মের ইচ্ছায় উহা সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়।

আত্মা চৈতন্যময়, চৈতন্যময় মনও তখন তাহাই। একটি অপবটির আশ্রিত। ইহাই স্বাতন্ত্র্য। আত্মার বাহিরেই আত্মার শক্তির অপ্রতিহত প্রকাশ হয়। সেখান হইতেই একদিনে সৃষ্টির ধারা, অপরদিকে লীলা প্রভৃতির সূচনা হয়। সৃষ্টির ন্যায় লীলাটিও আত্মশক্তির দ্বারা হয়। এই লীলাভূমিটি শ্রীকৃষ্ণের স্তর। শিবস্তরও ইহাই। শিব লীলা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ভোলানাথ সাজিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে সচেতনভাবে যোগ দেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যোগাদি নানা উপায়ে সাধক ঈশ্বর পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে পারে না, অর্থাৎ কারণ হইতে মহাকারণে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পরম কৃপা সাপেক্ষ। সাধনাদি দ্বারা কারণ-জগতে গতি হয়, সেটা আনন্দের অবস্থা হইলেও একটা অতৃপ্তি সেখানে সর্বদাই অনুভূত হয়। সেখানে জ্ঞান, দয়া, প্রেম, আনন্দ অফুরন্ত। কারণ-জগতের অধিবাসিগণ ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরাফেরা করেন, জীবের দুঃখ দূর করেন, অনেক সময় অবতীর্ণও হন—তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু নাই, জরাব্যাধি নাই—তাঁহারা দিব্যদেহ সম্পন্ন। তাঁহারা পরমবস্তুর সংবাদ জানেন বটে, কিন্তু সেখান হইতে পরমধামে যাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারেন না।

মহাকৃপা ভিন্ন পরমপদে যাওয়া যায় না। যে ইচ্ছাতে জীব বাহির হয় তাহা 'নিগ্রহ'; 'অনুগ্রহ' বা কৃপা ভিন্ন তাহার নিবৃত্তি হয় না। এই মহাকৃপা লাভ করিতে হইলে মনকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে হয়। চৈতন্যময় মন চিৎশক্তির ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক শক্তিধারার সহিত যোগযুক্ত হইলেই মন আর মন থাকে না—উহা চিৎশক্তিরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তখন মহাকৃপা বর্ষিত হয় এবং জীবের মহাকারণদেহে পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপে স্থিতি হয়।

সদ্‌গুরুর দ্বারা যখন মন্ত্রবীজ বা জ্ঞানবীজ বপন হয়, তখন উহা কারণ দেহেই হয়। যে প্রাকৃত বীজ হইতে নরদেহ রচিত তাহা মলিন, অশুদ্ধ। কিন্তু গুরুদত্ত বীজে মলিনতা নাই—ইহা শুদ্ধ বীজ, অপ্রাকৃত বীজ, মহাকারণের বীজ। এই বীজ-দাতা যিনি তিনি স্বয়ং ভগবান—"অহং বীজপ্রদঃ পিতা"। ইহাই গুরুতত্ত্বের রহস্য। এই বীজবপনের প্রক্রিয়াই দীক্ষাপদবাচ্য। ইহার ফল দ্বিতীয় জন্ম, regeneration, দ্বিজত্ব লাভ। যখন মহাকারণের বীজ বা জ্ঞানবীজ মনুষ্যের কারণদেহে পতিত হয় তখন হইতেই মনুষ্যের রূপান্তরের কার্য আরম্ভ হয়।

স্থূলদেহে থাকিয়াই যোগসাধনার দ্বারা সূক্ষ্ম, কারণাদি দেহ লাভ করা যায়। এ-সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার 'দেহ ও কর্ম' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

"শরীর ব্যতীত কর্মও হয় না, ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর ধারণ আবশ্যক হয়।

যে দেহ দ্বারা কর্ম করা হয় তাহা কর্মদেহ, যে দেহদ্বারা কর্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্মও হয় ভোগও হয় তাহা মিশ্রদেহ। মানুষের দেহ কর্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার

যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইজন্য নবদেহের এত বেশী মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ—

'মন রে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,'

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম—মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানবদেহের এত মহত্ত্ব। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্বশেষে মনুষ্য-দেহই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্মযাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে।...

...দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ, মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।...

মানবদেহের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। 'God made man after His own image' যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহংভাবের প্রথম স্ফূর্তি হয় এবং এই দেহেই অহংভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহংভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ও দিব্যনেত্রের উন্মীলন ষট্‌চক্র ভেদের ফলেই হয়।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশমাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌-দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম। বলা বাহুল্য, আত্মকর্মই এখানে কর্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম না হইয়া অন্য কর্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তেমনি কর্মরূপ মন্থন-ক্রিয়ার প্রভাবে পার্থিব দেহ হইতে দেহস্থ চিদুজ্জ্বল সত্তাংশ

তড়িত শক্তিরূপে পৃথক্ হয়। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত বীজমন্ত্রের জপ এবং সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানাদি কর্মের দ্বারা সূক্ষ্মদেহের উদ্ভব হয়।

সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সূক্ষ্মদেহের অবয়ব। প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূলদেহের কর্মের অবসান না হয়। সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইলে স্থূল শরীরে অভিমানী পুরুষ স্থূলে অভিমান-রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপন ইচ্ছানুসারে স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ও ফিরিতে পাবে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণাতে স্বপ্নাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরে গতি ও সঞ্চরণ হয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবে হয়, স্বেচ্ছাতে হয় না। পূর্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হইলে স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূলদেহ লইয়া ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম জগতেও সূক্ষ্মদেহ লইয়া বিচরণ করা যায়।

সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদযের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্যশক্তি উত্থিত হইযা কারণ সত্তাকে বিগলিত করে, যাহার ফলে কারণসত্তা কারণদেহরূপে পবিণত হয। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্মদেহের কর্মের অবসান হয না। সূক্ষ্মদেহেব দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম পরিসমাপ্ত হইলে অভিমান সূক্ষ্মদেহকে ত্যাগ করিয়া কারণদেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহের কর্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মদেহে আত্মকর্মের পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণদেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। সেইরূপ স্থূলদেহের কর্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলে সূক্ষ্মদেহের কর্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে মৃত্যুব ফলে স্থূলদেহের কর্মবন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলদেহের কর্ম সমাপ্তির পর অর্থাৎ স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওযার পর মৃত্যু ঘটিলে আর মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সূক্ষ্মাভিমানী যোগী মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া আত্মকর্ম করিতে থাকে। সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরের আত্মকর্ম পূর্ণ হইলে যোগী কারণ শরীরে অভিমানী হইয়া আত্মকর্ম পূর্ণ করিতে থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে একবার আত্মকর্ম আরম্ভ হইলে আত্মকর্মের আর গতিরোধ হয় না। জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম পূণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম পূর্ণ করিতে সময অধিক লাগে। কারণ জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে—কারণ ঐ কর্ম কালের কর্ম। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহে তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, যোগীর লক্ষ্য বর্তমান জীবনে কর্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতি-জন্য কারণদেহ পর্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মদেহের কর্ম শেষ হওয়ার পর কারণে অধিষ্ঠিত হইয়া যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া 'আমি' বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে। যখন প্রকৃতি-রূপা কারণ সত্তা হইতে চিৎ-শক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন সচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে।

কিন্তু ইহাকে আমি (ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ) মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলেই তো চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও আসন করিয়া কর্ম করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতি-মুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণদেহকে আসন করিয়া কর্ম করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। অভিমানের পূর্ণাহুতি হইয়া অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে মহাযোগী উহাকে ধরিয়া রাখে। কারণ, মহাকর্ম এখনও বাকী।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষপদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম শেষ করিয়া যোগী এখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। ইহাই যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আধারে অধিষ্ঠিত হইয়াই যোগী বিশ্বকর্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহার একমাত্র

প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ---জীবের কল্যাণ সাধন। যোগী তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিবত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্যন্ত উত্থিত হইতে পাবে, অর্থাৎ তিন দেহের কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে, অথবা প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বাযত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়—উহাই মহাসিদ্ধদেহ নামে পরিচিত হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মাতৃ-গর্ভ হইতে সঞ্জাত স্থূল দেহই কর্মদেহ। মনুষ্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহ ধাবণ করিযা থাকে ততক্ষণই সে কর্ম করিতে সমর্থ হয়। এই দেহ না থাকিলে কর্ম করা যায় না। কর্মফল ভোগ মাত্র ভোগদেহেই হইয়া থাকে। কর্ম কি এবং তাহার ফল কি প্রকার, ইহার আলোচনা আংশিকরূপে আমবা পূর্বে করিযাছি। অনাত্ম-কর্মকে এই প্রসঙ্গে কর্মরূপে গণনা করা হয় নাই। অনাত্ম-কর্ম অজ্ঞান অবস্থায় হইয়া থাকে এবং উহার সংস্কারনিরন্ধন যে সুখ দুঃখরূপ ফল উদ্ভূত হয় তাহা ভোগ করিবার জন্য ঊর্ধ্বলোক, অধোলোক অথবা মনুষ্যলোকের মধ্যে কোন স্থানে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিতে হয। ভোগদেহ স্বর্গীয় হইতে পারে, নারকীয় হইতে পারে এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি অবচেতন জীবেরও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনুষ্যের কর্মদেহেও ভোগানুভূতি হয বলিয়া আংশিকরূপে মনুষ্যদেহও হইতে পাবে। কিন্তু কর্মদেহ মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহ হইতে পারে না। ইহা হইল অনাত্মকর্মের কথা। তদ্রূপ আত্মকর্মের উপযোগী দেহও একমাত্র মনুষ্য দেহই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আত্মকর্মেব দ্বারা আত্মিক স্থিতির উৎকর্ষ-সাধন ঘটিযা থাকে। আত্মকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন হইতে পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে চৈতন্য শক্তির উন্মেষ না হয। প্রতি মনুষ্যদেহে এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে নিহিত রহিযাছে। যতক্ষণ এই শক্তির উন্মেষ হইযা শিবত্বের অভিব্যক্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মনুষ্যাকারসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে পশু ভিন্ন অপর কিছু নহে। পশুত্ব-নিবৃত্তির একমাত্র উপায কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন এবং শিব-ভাবের বিকাশ। কিন্তু এই উদ্বোধন সকলের সমান মাত্রাতে হয না। সদ্গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন হইলেও শিষ্যের আধারের বলবত্তার উপর তাঁহার সঞ্চারিত শক্তির ফল-প্রকাশ নির্ভর করে। যে আধারে যে পরিমাণ শক্তির ধারণ কবা সম্ভবপর সদ্গুরু সেই আধারে তাহাব অধিক শক্তির সঞ্চার করেন না এবং তদ্ অপেক্ষা ন্যূন শক্তিরও সঞ্চার কবেন না।

আধার দুর্বল হইলে কুণ্ডলিনীর উন্মেষ কিঞ্চিন্মাত্রাতেই হইয়া থাকে। তাহার পর সাধক স্বয়ং নিজকর্মের দ্বারা ঐ উন্মেষের অগ্রগতি সম্পাদন করে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে সাধকের অন্তরে এবং বাহিরে উদ্বুদ্ধ চৈতন্যশক্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তির বিকাশের ফলে অনাত্মাতে আত্মভাব তো কাটিয়া যাযই, বিশেষতঃ আত্মাতে আত্মাভিমানের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথও খুলিযা যায়। প্রকৃতি ও মায়া হইতে আত্মস্বরূপের বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেই কর্ম সংস্কার নষ্ট হইয়া যায় এবং জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নিত্য স্থিতির উপলব্ধি হয়। কিন্তু পশুভাবের বীজ তখনও থাকিযা যায়। পশুভাব নিবৃত্ত না হইলে ভগবৎ-স্বরূপে স্থিতি দুর্ঘট। সাধকের আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন অথবা পরমাত্মার সনাতন অংশভূত এবং স্বরূপতঃ নিত্য দিব্য-ভাবাপন্ন। কিন্তু উহা পশু অবস্থার নিম্নস্তরে প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম সংস্কাররাশির আবেষ্টনে আচ্ছন্ন হইয়া বদ্ধের ন্যায বিদ্যমান থাকে। দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং ক্রমিক বিকাশ হইলে ঐ সকল সংস্কারের নিবৃত্তি তো হয়ই, উপরন্তু মৌলিক পশুবীজও কাটিয়া যায়।

সাধক কর্মদ্বারা গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গকে নিজ সত্তায় সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত করে এবং এই বিস্তারের মাত্রা অনুসারে অজ্ঞানজ কর্ম-সংস্কারগুলি নষ্ট হইতে থাকে।...সাধকের ইষ্টদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি ভিন্ন অপর কেহ নহে। সাধক যে নাম অথবা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন একমাত্র কুণ্ডলিনীই তাহার ইষ্ট। সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য ও সাধকের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, সাধকের আত্মা তখন ইষ্ট স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মায়ার আভাস ও সংস্কারের নির্মোক হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া যায়। নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপযোগ হয় না, কারণ ব্যাপক মহাসত্তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত সত্তা তখন মগ্ন। ইহা নিরাকার নিষ্ক্রিয, চিদাত্মস্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু যে আধার অপেক্ষাকৃত সবল, গুরুদত্ত অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারের ফলে তাহার অগ্রগতি অন্য প্রকারে হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই জাতীয় আধার-বিশিষ্ট উপাসককে 'যোগী' বলিয়া বর্ণনা করিব। যোগীর আধার সাধকের আধার অপেক্ষা অধিক প্রবল বলিয়াই তাহার দেহে কুণ্ডলিনীশক্তির বিকাশ প্রারম্ভ হইতেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

সাধকের সাধনা যেখানে সমাপ্ত হয় যোগীর সাধনা বস্তুতঃ সেইখান হইতেই আরম্ভ হয়। এইজন্য সাধকের কর্ম ও যোগীর কর্ম প্রথম হইতেই পৃথক্ হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ কর্মের ফলও পৃথক্। সাধকের কর্মের ফলে বিকল্পসমূহ অর্থাৎ বাসনা কামনাদি সংস্কার ও তাহাদের মূল বীজ নির্মল হইয়া চিদালোকে পরিণত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়া যায় এবং তাহাদের সত্তা চিৎ-সত্তার সঙ্গে একাকার হইয়া যায়। অতএব সাধকের সিদ্ধাবস্থাতে

দেহ মন প্রভৃতির সম্বন্ধশূন্য নির্বিকল্প চিন্ময়-আত্ম-স্বরূপে স্থিতি সম্ভব হয়। কিন্তু যোগীর কর্মের ফল অন্য প্রকার। কারণ, শক্তি পরিহার করা ও শক্তিহীন অবস্থায় স্থিতিগ্রহণ করা যোগীর উদ্দেশ্য নহে। যোগী প্রবল শক্তিশালী বলিয়া তাহার ক্রিয়ার ফলে বহিরঙ্গ শক্তি অন্তরঙ্গ শক্তির রূপ ধারণ করিয়া যোগীর আত্মাকে বলশালী করে। সাধকের আদর্শ বিদেহ-কৈবল্য—ঐ অবস্থায় কোন প্রকার বিকল্প থাকে না, ইহার কারণ—দেহ ও মনের সংযোগ ভিন্ন বিকল্পের উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যোগীর আদর্শ সাকার দেহ-সিদ্ধি। যোগী বিকল্পকে শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ বিকল্পরূপে উহার স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। সাধকের লক্ষ্য সিদ্ধ অবস্থাতে কাম বর্জন করিয়া নিষ্কাম চিৎস্বরূপে অবস্থান, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য মলিন কামকে শোধিত করিয়া বিশুদ্ধ কাম রূপে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমরূপে পরিণত করা। এই ভগবৎ-প্রেম মনুষ্যের জীবনের মুখ্য আদর্শ। এইজন্য যোগী মুক্ত অবস্থাতেও আকার বর্জিত হয় না অর্থাৎ যোগীর কায়া কখনই পরিত্যক্ত হয় না—এই নিত্য কায়া লাভ করিয়া যোগী অখণ্ড কর্মের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—যোগীর নিত্য কায়া লাভ বলিতে কি বুঝায়?

মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া কালরাত্রির রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কালের রাজ্যে জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে। মাতৃকাচক্রের ঊনপঞ্চাশৎ শক্তিই বিষম সংযোগে মাতৃকা-শক্তিরূপে জীব-হৃদয়ে বিকল্পের রচনা করিয়া থাকে। এই ঊনপঞ্চাশটি মাতৃকাশক্তি শুদ্ধ জীবাত্মাকে অশুদ্ধবৎ প্রতীত করাইয়া অনন্ত প্রকার বিক্ষেপের আশ্রয়রূপে পরিণত করে। বস্তুতঃ এই বিকল্পের শোধন না হইলে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি সম্ভবপর নহে। আত্মকর্মের উদ্দেশ্যই হইল আত্মাকে এই সকল মাতৃকাশক্তির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি দান করা এবং তাহাকে তাহার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

সাধারণ মনুষ্য আত্মকর্ম করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের এই ঊনপঞ্চাশটি শক্তি অমার্জিতই থাকিয়া যায়। সুতরাং দেহাবস্থাতে তো দূরের কথা, দেহান্তেও তাহাদের স্বরূপ-স্থিতির পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু যাহারা সাধকরূপে নিজ কর্মের প্রভাবে এই মাতৃকাশক্তিগুলির সংস্কার করিতে সমর্থ হয় তাহারা পূর্ণ শোধনের পর শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সবগুলি শক্তিরই শোধন আবশ্যক। শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অশোধিত থাকিলে স্বরূপস্থিতি হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই শক্তি অশুদ্ধ হইলেও ইহার সহযোগ ব্যতীত আত্মার পক্ষে স্থূল দেহে অবস্থান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্থূল দেহাবস্থায় থাকিতে শক্তির পূর্ণ শোধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে শক্তির পূর্ণ শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে বিদেহ-কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। সাধক সিদ্ধাবস্থাতে বিকল্পহীন মাতৃকা-

সংস্পর্শহীন, দেহহীন ও মনহীন স্থিতিলাভ করে। কিন্তু যোগী প্রবলতর নিজ কর্ম প্রভাবে এই সকল মাতৃকা-শক্তিকে অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তিরূপে বা মাতৃরূপে পরিণত করে। যখন এই স্বরূপ-শক্তিরূপে পরিণাম পূর্ণ হয় তখনই যোগীর সিদ্ধ অবস্থা আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা কিন্তু বিদেহ অবস্থা নহে। শক্তি শোধিত হইয়া নির্মল রূপে যোগীর স্বরূপকে পুষ্টিদান করে। সাধকের কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে নিজ হইতে বিযুক্ত করা অর্থাৎ পৃথক্ করা, কিন্তু যোগীর কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে অশুদ্ধি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নির্মল নিজ শক্তিরূপে পরিণত করা ও নিজের সঙ্গে যুক্ত করা। যে যোগী যত বেশী পরিমাণে এই যোজনা কার্যে অগ্রসর হন তিনি তত শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া পরিগণিত হন। প্রকৃত সিদ্ধ যোগী তিনিই যিনি ঊনপঞ্চাশটি মাতৃকাশক্তির মধ্যে সবগুলিকেই আত্মশক্তিরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন। এই প্রকার সিদ্ধ যোগী 'নিত্য কায় সম্পদ্' লাভ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য নিজেকে বিশুদ্ধ অহং বলিয়া বোধ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ইহাই যোগীর আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ সিদ্ধি। ইহা কিন্তু সাধকের বিদেহ কৈবল্য রূপ অবস্থার অনুরূপ অবস্থা নহে, কারণ এই অবস্থায় দেহ থাকে এবং ঐ দেহই কালজয়ী 'নিত্য দেহ'।...যোগে উৎকর্ষ লাভ করিলে এই লৌকিক দেহের রূপান্তর সাধন করিয়া ইহাকে আত্মার চিরসাথী করিয়া লওয়া যায়। ইহা অতি দুরূহ কর্ম এবং সাধন-বিজ্ঞানের অগোচর, কিন্তু অসম্ভব নহে। কারণ, জগতে এমন অনেক যোগী আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ কায়াকে সিদ্ধ করিয়া কাল-স্পর্শের অতীত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় চৌরাশি সিদ্ধের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। চৌরাশি সিদ্ধগণের যে কায়া-সম্পদ লাভের কথা বলা হয় তাহাতে ভৌতিক দেহের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, এবং সেইজন্যই উক্ত দেহাশ্রিত আত্মবোধ জাগ্রৎ থাকে। ভৌতিক দেহ জড় বলিয়া হেয়, কিন্তু এই দেহ যখন চৈতন্য-সংযোগে উজ্জ্বল চিদাকার লাভ করে তখন ইহা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। অতি পরিমিত সংখ্যক যোগী এই গৌরবময় স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন।

জীবের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায় আছে—প্রথম আত্মা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিচ্ছিন্ন অহংভাব সাংসারিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; দ্বিতীয় কারণবর্গ, যাহাতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্গত ভাবে বিদ্যমান আছে; এবং তৃতীয় স্থূলদেহ। জাগ্রত অবস্থাতে আমাদের অভিমান এই স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে। স্বপ্নে কারণবর্গকে আশ্রয় করে, সংস্কার-সমষ্টি ও প্রাণময় কোষ এই স্তরে নিহিত। সুষুপ্তিতে ঐ অভিমান লীনবৎ হইয়া কেন্দ্রে বিদ্যমান থাকে। সাধক সাধন বলে নিজের বোধকে

ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে উপসংহৃত করে। তাহার পর কারণ হইতেও যখন ঐ বোধশক্তি নিষ্ক্রান্ত হয় তখন উহা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়। প্রথমে কারণভাবাপন্ন অচিৎ হইতে বিবেক হয় এবং অন্তে নিজ স্বরূপভূত চিৎ সত্তাতে প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই কৈবল্য। ইহাই সাধকের সাধন। প্রচলিত বহু যোগমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু এখানে যাহাকে 'যোগ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য শুধু অচিৎ হইতে মুক্তিমাত্র নহে। উহা অতি গভীর। পূর্ণ দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্তাই স্বয়ং প্রকাশরূপে নিজের আলোকে আলোকিত হইয়া ভাসিতে থাকে, উহাই চৈতন্যময় আনন্দময় আত্মসত্তা। ঐ মহাসত্তাতে বস্তুতঃ অচিতের কোন স্থান নাই। 'অচিৎ' তখন চিন্ময় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই নাম রূপান্তর। শুধু জ্ঞানের দ্বারা ইহা হয় না—বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রকার রূপান্তর সিদ্ধ হয়।"

(দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)

শুদ্ধদেহ—শুদ্ধ চিত্তের সহিত শুদ্ধ দেহের অভেদ সম্বন্ধ। চিত্ত স্বচ্ছ পদার্থ, ইহাতে পঞ্চ ভৌতিক পদার্থের অংশ পড়িলেই ইহা মলিন হইতে থাকে। যে পরিমাণে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের অংশ চিত্তে পতিত হয়, সেই পরিমাণে চিত্তের অংশও ঐ সমস্ত ভৌতিক পদার্থে চলিয়া যায়। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে চিত্তের যে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহা চিত্তের আগন্তুক ধর্ম। কারণ, সকল সংস্কার 'বৃত্তি' হইতে উৎপন্ন হয়। অক্লিষ্ট সংস্কারও সংস্কার পদবাচ্য। চিত্ত যখন বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, তখন ঐ বৃত্তির সম্মুখে যে আত্মা উপস্থিত থাকে তাহা দ্বারা ঐ বৃত্তি রঞ্জিত হয়। বৃত্তির উপশম হইলেও রং-এর কিঞ্চিৎ আভাস রেণুরূপে চিত্তে বর্তমান থাকে। এইগুলি চিত্তকে জালের মতন জড়াইয়া রাখে এবং পুনর্বার ইহাদের সজাতীয় বৃত্তি উৎপাদনের জন্য প্রণোদিত করে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই সকল সংস্কার কুয়াশার ন্যায় চিত্তকে ঢাকিয়া ফেলে। যতদিন এই সকল কুয়াসারূপী বায়ু চিত্ত হইতে দূর না হইতেছে ততদিন চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। অন্তঃকরণ-বৃত্তির যাহা বিষয় তাহাই বিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্তক্ষেত্রে সংস্কাররূপে ন্যাস্ত হয়। ইহা বস্তুতঃ বিষয়েরই অংশ-স্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, চিত্তমধ্যে পঞ্চভূত অথবা ভৌতিক সত্তার যে অংশ রহিয়াছে তাহাই চিত্তের আবরণ। পক্ষান্তরে ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম বুঝিতে হইবে।

এই দেহ পঞ্চভূতে নির্মিত, মূলাধার প্রভৃতি পঞ্চচক্রের কেন্দ্রে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠান। সকাম সতৃষ্ণ পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে বৃত্তিরূপে যে ভোগ্য পদার্থ

উপস্থিত হয়, সেই পদার্থে চিত্ত কিঞ্চিৎ অংশে প্রবিষ্ট হয এবং সেই প্রবিষ্ট অংশ ঐ পদার্থের অংশরূপে সর্বদার জন্য বর্তমান থাকে। এই প্রকারে সকাম পুরুষের ভোগবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ভোগ্য পদার্থমাত্রেই চিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ নিহিত থাকে। চিত্তের অংশ ভূতে থাকিবার দরুণ ভূত অশুদ্ধ থাকে এবং ভূতের অংশ চিত্তে থাকিবার দরুণ চিত্ত অশুদ্ধ থাকে। এইজন্য একাগ্র সাধনার দ্বারা চিত্ত হইতে ভৌতিক অংশ অপসারণ করিলে সেই ভৌতিক অংশ পঞ্চভূতের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। ইহার ফলে পঞ্চভূতে বিদ্যমান চিত্তের অংশও ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয। এইভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে। চিত্তের যাবতীয় অংশ যাহা বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে বিকীর্ণ হইযাছিল, চিত্তে ফিরিযা আসিলে চিত্তের দুর্বলতা বিদূরিত হয এবং চিত্ত পূর্ণতা লাভ করিযা অখণ্ড বিন্দুরূপে একাগ্র অবস্থা লাভ করে। পক্ষান্তরে, পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ চলিযা যাওয়ার ফলে একদিকে যেমন পঞ্চভূত শুদ্ধ হয়, অপরদিকে তেমনি চিত্ত হইতে ভৌতিক অংশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চভূতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপে ভূত শুদ্ধ হইযা গেলে শুধু যে পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ দূর হয তাহা নহে, পঞ্চভূতের মধ্যেও পরস্পরের অসাম্য দূর হইয়া যায়। পঞ্চভূতের অশুদ্ধি নষ্ট হইলে শুদ্ধ ভূতের দেহ অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে প্রকৃত ভূতশুদ্ধি বলে। ইহাতে চিত্তের অংশ থাকে না এবং পঞ্চভূতের মধ্যেও পরস্পর সাম্যভাব স্থাপিত হয। বস্তুতঃ ইহা 'শুদ্ধদেহ' তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে চিত্ত হইতে ভৌতিক অংশ অপসৃত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধ চিত্তরূপে প্রকাশমান থাকে। এইভাবে চরম অবস্থায় ভূত এবং চিত্ত উভয়ের মধ্যেই সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্যময় দেহই শুদ্ধদেহ। এই সাম্যময় আধারে মহাজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে জ্ঞানের বিকাশ সম্পন্ন হয়।

সাধারণতঃ লোকে চিত্তশুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝে, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি তদপেক্ষা অনেক অধিক। প্রকৃত ভূতশুদ্ধিও তাহাই। প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং প্রকৃত ভূতশুদ্ধি না হইলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। প্রকৃত উপাসনার জন্য সর্বপ্রথমে শুদ্ধ আধার একান্ত আবশ্যক, নতুবা দিব্যজ্ঞানরূপ অমৃত ধারণ করিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ চিত্ত যেমন স্বভাবতঃ শুদ্ধ তেমনি ভূতও স্বভাবতঃ শুদ্ধ। ভৌতিক দেহ যতক্ষণ ভূতসমষ্টির সাম্যাবস্থারূপে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ উহা শুদ্ধ দেহ। উহাতে গুণপ্রধান ভাব নাই। সাম্যাবস্থার দরুণ একমাত্র উহাই চৈতন্যশক্তি ধারণের যোগ্য। এই শুদ্ধ দেহ লৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ঐ সাম্যময় আধারটিকে একপক্ষে যেমন শুদ্ধ দেহ বলা চলে, অপরপক্ষে উহাকে শুদ্ধচিত্তও

বলা চলে। বস্তুতঃ শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ চিত্তে কোন ভেদ নাই। আধার শুদ্ধ না হইলে তাহাতে অমৃত ঢালা যায় না।

(পত্রাবলী-১ম খণ্ড, পত্র সংখ্যা—২৩-এর সারাংশ)

আতিবাহিক দেহ—আমরা ভৌতিক জগতের অধিবাসী, সেইজন্য ভৌতিক দেহকেই আমরা একমাত্র দেহ বলিয়া ভাবি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের স্থূল সত্তার সমবায়ে ভৌতিক দেহের উৎপত্তি। স্থূলদেহ ছাড়া আছে সূক্ষ্মদেহ, প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপাদানে উহা রচিত। সাংখ্য শাস্ত্র মতে সূক্ষ্ম শরীরই লিঙ্গ শরীর। যতদিন মৃত্যু না হয় ততদিন যেমন স্থূলদেহ থাকে, সেইরূপ যতদিন 'কৈবল্য' প্রাপ্তি না ঘটে ততদিন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর অটুট থাকে। মৃত্যুকালে লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তা স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করে। স্থূলদেহ ভোগায়তন দেহ, সেইজন্য স্থূলদেহেই পার্থিব সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, লিঙ্গ শরীরে তাহা হয় না। স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করিবার পর লিঙ্গ শরীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিজে যাইতে পারে না। মৃত্যুর পর লিঙ্গ শরীর স্থূল শরীর হইতে পৃথক হইলে উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এক প্রকার দেহ আবির্ভূত হয়—উহাকে 'আতিবাহিক' দেহ বলে। মৃত্যুর পর এই দেহ কেবল মনুষ্যকেই মেলে, পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্য কোন প্রাণীকে মেলে না।

ভুবনজ দেহ—আতিবাহিক দেহও সাময়িক। উহা ভোগদেহও নহে। সাধকের আত্মকর্ম অনুসারে সাধক-আত্মা মৃত্যুর পর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া আতিবাহিক দেহ গ্রহণপূর্বক উহার সহায়তায় যথাসময়ে তাঁহার কর্মানুসারে ভোগদেহ প্রাপ্ত হন। এই ভোগদেহ প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আতিবাহিক দেহ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরকে উহার ভোগস্থান পর্যন্ত বহন করিযা লইয়া চলে। সাধকের আত্মকর্মানুসারে নির্দিষ্ট ভোগলোকে যাইবার পর ঐ স্থানের ভোগোপযোগী শরীর নির্মিত হয়। ঐ নবনির্মিত দেহে লিঙ্গ শরীর প্রবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানের ভোগ সম্পন্ন করে। তান্ত্রিক যোগিগণ ইহাকে 'ভুবনজ দেহ' বলেন। শুধু লিঙ্গ শরীরে ভোগ হয় না, লিঙ্গ শরীর ভুবনজ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভুবনের ভোগ সম্পাদন করে। এইরূপ বিভিন্ন লোকের বা ভুবনের উপযোগী অনুরূপ বিভিন্ন ভুবনজ দেহ আছে। প্রত্যেক ভুবনজ দেহই অপর ভুবনজ দেহ হইতে পৃথক। প্রত্যেক ভুবনের বিশিষ্ট ভোগ সম্পাদনের জন্য এইরূপ ভুবনজ দেহের পার্থক্য হইয়া থাকে। এক ভুবনের ভোগ সম্পাদনের পর অন্য ভুবনের ভোগ সম্পাদনের জন্য লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আবার আতিবাহিক দেহের আবশ্যক হয়।

শুদ্ধ-বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব প্রভৃতি প্রতি তত্ত্বেই 'ভুবন' আছে। এবং ভুবনের অধিবাসীদের সেই সেই ভুবনের অনুরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও ভোগ আছে। ইঁহারা শুদ্ধ জীব বা শুদ্ধ প্রমাতা। ইঁহারা যে দেহ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সকল ভোগ করেন তাহাকেই 'ভুবনজ দেহ' বলে। ভুবনজ দেহের পশ্চাতে আছে 'তত্ত্ব দেহ'। ভুবনজ দেহ ভিন্ন ভুবনের ভোগাদির নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ভোগ যে শুধু মাযিক জগতের ভোগায়তনরূপ স্থূল দেহেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, বিশুদ্ধ মহামায়ার বাজ্যেও তদনুরূপ কর্ম আছে এবং তদনুরূপ ভোগও আছে। বিশুদ্ধ ভোগ মহামায়াজগতের ব্যাপার।

ভুবনগত ভেদের জন্যই ভুবনজ দেহের ভেদ হয়। এই কারণেই বিষ্ণুলোকের ভুবনজ দেহ শিবলোকের ভুবনজ দেহ হইতে পৃথক। আবার প্রত্যেক লোকে বা ভুবনে একই ব্যক্তির ভুবনজ দেহ হইতে অন্য ব্যক্তির ভুবনজ দেহ ভিন্ন। ইহা স্বজাতীয় ভেদ। লিঙ্গ শরীর একরূপ হইলেও বিভিন্ন লোকের ভোগের জন্য সেই একই লিঙ্গ শরীরকে তত্তৎ লোকের উপযোগী বিভিন্ন ভুবনজ দেহ গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন পর্যন্ত কৈবল্য প্রাপ্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে।

বৈদান্তিক মতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ছাড়া আছে কারণদেহ। পার্থিব স্থূলদেহ 'অন্নময় কোষে' গঠিত, সূক্ষ্মদেহ 'প্রাণময', 'মনোময়' ও 'বিজ্ঞানময' কোষে গঠিত এবং কারণদেহ 'আনন্দময় কোষে'র দ্বারা গঠিত।

বৈন্দব দেহ—ইহা তো গেল স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের কথা। বৈষ্ণবাচার্য, শৈবাচার্য এবং শাক্তাচার্যগণ কারণদেহের পরেও আরও একটি দেহের কথা বলেন—ইহা হইল 'মহাকারণ দেহ'। ইহা ত্রিগুণেব অতীত 'বিশুদ্ধ সত্ত্বময়' দেহ। শৈবসিদ্ধান্তের অনুসারে ইহাকে 'বৈন্দব দেহ' বলা হয়। ভগবৎ-অনুগ্রহে 'বিন্দু' অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তায় চিৎ-শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিলে 'বৈন্দব দেহ' রচিত হয়। প্রসিদ্ধ ঈসাঈ সাধক সেন্ট পল (Saint Paul) ইহাকেই 'আধ্যাত্মিক দেহ' (Spiritual body) বলিয়াছেন। ইহা অপ্রাকৃত (supernatural) দিব্য জ্ঞান লাভ না করিলে, কিম্বা সাক্ষাৎ ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত এই দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠধামে সবই ভগবৎ-ভক্তের দেহ বৈন্দব দেহ। স্বয়ং ভগবানের দেহও এই বিশুদ্ধ বৈন্দব সত্তারই প্রকাশ।

মায়ার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ অধ্যায় যে সকল বিজ্ঞানাকল জীব অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বরগণ থাকেন তাঁহাদের দেহ বৈন্দব উপাদানে গঠিত। 'অনন্ত' নামক ঈশ্বরের শরীর বৈন্দব উপাদানে নির্মিত। মন্ত্রেশ্বররূপী গুরু মন্ত্র দান করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত মায়িক জগতে 'আতিবাহিক দেহ' গ্রহণ করিয়া নামিয়া আসেন। আতিবাহিক

দেহও যে মায়িক দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়িক দেহ বস্তুতঃ মোহক অর্থাৎ জীবের মধ্যে মোহের উৎপাদন করে, কিন্তু বৈন্দব দেহ বোধক অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ। সেইজন্য আতিবাহিক দেহ মায়িক হইলেও বৈন্দব দেহের সম্বন্ধবশতঃ মোহগ্রস্ত হয় না, বোধকরূপেই বিরাজ করে। [illegible] না হইলে আতিবাহিক দেহের সম্বন্ধ বশতঃ সাধারণ মায়িক জীবের ন্যায় মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলে ঐ সকল গুরুর দ্বারা জীবের হৃদয়ে চিন্ময় মন্ত্র বীজ বপন করা সম্ভব হইত না।

এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। সদ্‌গুরু কর্তৃক তান্ত্রিক দীক্ষারূপ অনুগ্রহের ফলে পশুত্ব বা আণবমল কাটিয়া গেলেও জীবের তাহা উপলব্ধি হয় না। ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে 'কর্ম' করিতে হইবে। দীক্ষার ফলে শিষ্য মহামায়িক দেহ বা বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ লাভ করে। কর্ম বা সাধনার ফলে শিষ্যের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ বিকাশ লাভ করে। বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত আত্মার অবস্থা প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানাকল—এই উভয় অবস্থা হইতে ভিন্ন। প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানাকল—উভয় অবস্থাই কলাহীন বা বিদেহ অবস্থা এবং বিদেহ বলিয়াই কর্মহীন বা নিষ্ক্রিয়। তাই এই অবস্থায় আত্মা বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়। কিন্তু বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত সাধক-আত্মার তখন প্রকৃত কর্ম আরম্ভ হয়। ঐ কর্ম ঈশ্বরকোটির কর্ম। বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ লাভের পর তিনটি অবস্থা—ঈশ্বরভাব, সদাশিবভাব ও শিবভাব। অন্য কথায়—অধিকার অবসর, ভোগ অবসর ও লয় অবসর। ঈশ্বরভাবে (অবস্থায়) থাকিয়া জীবের উদ্ধার করিবার বাসনা যাহাদের থাকে তাঁহারা অধিকার (duty) রূপ অবসরে নিযুক্ত থাকেন। শেষে ঐ বাসনাক্ষয়ে যখন জীব-উদ্ধার ক্রিয়াতে বিরাগ আসে, তখন ফোটে সদাশিব অবস্থা। এখানে [illegible] কর্ম অন্তের অবসরে শুধু অনাবিল আনন্দ ভোগ—তাই এটা ভোগাবসর। এর পর [illegible] [illegible] তখন এ আনন্দও আর ভোগ করিতে চায় না, সেইটা লয়াবসর। বৌদ্ধরাও ইহার অনুরূপ তিনটি 'কায়া'র কথা বলিয়াছেন। একটি নির্মাণকায় (অধিকার অবসর), দ্বিতীয় সম্ভোগকায় (ভোগাবসর), তৃতীয় ধর্মকায় (লয়াবসর)—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বৈন্দব দেহ আবার দুই প্রকার—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। কেহ স্বভাবসিদ্ধ ভাবে গুরুদত্ত বীজের অভিব্যক্তির ফলে বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া থাকেন ইহা অকৃত্রিম। কিন্তু যদি কেহ [illegible] কোনও ভুবনের [illegible] আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপায় সাময়িকভাবে বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ দেহপ্রাপ্তি কৃত্রিম। ইহা কৃত্রিম ভুবনজ দেহ বলা হয়। মায়িক দেহে অবস্থানকালে উভয় প্রকার বৈন্দব দেহ প্রাপ্তিই ঘটিতে

পারে। অর্থাৎ, কৃত্রিম হউক বা অকৃত্রিমই হউক মায়িক দেহে অবস্থানকালে বৈন্দব দেহ মায়িক দেহের সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান থাকে। যদি অকৃত্রিম বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে উহা স্থায়ী হয়। অর্থাৎ দীক্ষাজন্য বৈন্দব দেহ স্থায়ী। এই স্থায়ী বৈন্দব দেহ হইতেই ঐশ্বরিক সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে। আর ভুবনের অধিষ্ঠাতার আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপাতে যে বৈন্দব দেহ লাভ করা যায় তাহা স্থায়ী হয় না। তাহা নিজস্ব নহে, কারণ তাহা বিকাশের পথে উপলব্ধ হয় নাই। ঐ দেহ দ্বারা মহামায়ার জগতে সঞ্চরণ এবং তদুপযোগী ভোগাদির আস্বাদন হইতে পারে। ইহা আশ্রিত ভাব এবং ইহা নিজের আয়ত্ত নহে। যে খণ্ড কৃপার ফলে কৃত্রিম বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি ঘটে তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে ঐ দেহসম্বন্ধও তিরোহিত হইয়া যায়। অকৃত্রিম বৈন্দব দেহলাভ অপরা মুক্তির নামান্তর। কিন্তু কৃত্রিম বৈন্দব দেহলাভকে মুক্তি বলা চলে না। তাহার দুইটি কারণ আছে—প্রথম ইহা অস্থায়ী, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ থাকে না।

শাক্তদেহ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইল মহাকারণ দেহের উপাদান। ইহারও অতীত যে দেহ, শাক্তগণ উহাকে 'শাক্তদেহ' বা 'চিন্ময়স্বরূপ' নামে অভিহিত করেন। শাক্তদেহ চিৎ-শক্তির দ্বারা নির্মিত। পরচিৎ শক্তি হইতে নিঃসৃত অমৃত দ্বারা দিব্য শাক্তদেহ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত যোগসম্পন্ন হইলে পরাশক্তির সঙ্গে অভিন্নতা স্ফুরিত হয়। কৌল শাস্ত্রে ইহাই দিব্য শাক্তকায়। পরচিৎ শক্তি আত্মার ধর্ম, ভগবানের তিনি স্বরূপ মহিমা, শিবের প্রাণরূপ সামর্থ্য। শক্তিরূপে ব্যবহার হইলেও পরচিৎ শক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন, কেননা ইহা স্বরূপে আশ্রিত নয়—স্বরূপের সঙ্গে একরস। এই চিতিরূপ পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি আশ্রয় করিয়া যোগিগণ পরমপদের অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐরূপ 'মহাকৈবল্য দেহ' সন্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ। কবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হংস-দেহ' নামে এক সর্বোপরি দেহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেহের বর্ণনা সবই সত্য। কারণ আত্মার স্বরূপশক্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে সাধকদের জীবনে তাঁহাদের আচরিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঐ সমস্ত দেহের অভিব্যক্তি হয়।

এই সব হইতে পৃথক্ আর এক প্রকার দেহ আছে, তাহার নাম 'জ্ঞানদেহ'। সদ্গুরুর কৃপায় দীক্ষার সময় এই দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুপ্রদত্ত বীজ রূপে এই 'জ্ঞানদেহ' শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিষ্যকে যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা এই জ্ঞানদেহের বিকাশ ঘটাইতে হয়। বিকাশ পূর্ণ হইলে ইহা জ্যোতির্ময় অমরদেহ রূপে প্রকাশিত হয়।

সিদ্ধদেহ—'সিদ্ধদেহ' এই সব দেহ হইতে পৃথক্। তপস্যা আর যোগের

প্রভাবে লৌকিক স্থূল দেহই কালেব অতীত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইলে উহা 'সিদ্ধদেহ' নামে কথিত হয়। পাতঞ্জল যোগী সম্প্রদায়ে ইহা 'কায়-সম্পদ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা স্থূল হইলেও সূক্ষ্মদেহের ধর্ম প্রাপ্ত হয এবং তদনুসার কার্য করে। শ্রী অরবিন্দের অনুরাগী যোগনিষ্ঠ সাধকগণ ইহাকে 'Integrated body' বলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই দেহ রচিত হয়। আরও উচ্চতব সত্তার সহিত সাম্য স্থাপিত করিতে পারিলে সিদ্ধদেহের উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত হয়। উৎকর্ষতার তারতম্য অনুসারে সিদ্ধদেহ বিভিন্ন প্রকার হয।

দেহ বলিতে আমরা শুক্র-শোণিতের দ্বারা রচিত যোনিজ শরীরকে বুঝিয়া থাকি। সাংখ্যমতে 'সপ্তদশৈকং লিঙ্গং' সূত্রের দ্বারা লিঙ্গ শরীর স্বীকৃত হইয়াছে; এবং পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ স্বীকৃত হইয়াছে। ভূতসমূহের জযলাভ হইলে যোগীর অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সম্পৎ-এর অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ভূতজয হইলে যোগীর যেমন একদিকে রূপলাবণ্যের বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তেমন শরীরটি বজ্রবৎ দৃঢ় হয়। ইহাই মুখ্য কায়সম্পৎ। ভৌতিকদেহ বিকারিস্বভাব। সিদ্ধদেহ ভৌতিক-ধর্মের দ্বারা অভিভূত হয না। ইহাই সিদ্ধদেহের লক্ষণ।

দেহ সিদ্ধ হইলে উহা জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিকার হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্য সিদ্ধদেহ একই সঙ্গে অজর ও অমর উভয়ই। যখন অজরত্ব ও অমরত্ব এই দুটি ধর্ম একই দেহে একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে তখন ঐ সিদ্ধদেহকে দিব্যতনুও বলা হইয়া থাকে।

ষোড়শকল পুরুষের যে ষোড়শী নামক কলা বিদ্যমান, উহাই অমৃত কলা এবং পূর্ণ সোম কলা। উহা দ্বারা দেহের আপূরণ হইলে কালানল ঐ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহার ফলে দেহের ক্ষয় বা শোষণ ঘটে না। ঐ অবস্থায় দেহ ও আত্মা অভিন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুঞ্জয়তা লাভ। সম্যক্‌প্রকারে দেহসিদ্ধি সম্পন্ন হইলে ঐ সিদ্ধদেহ চিন্ময়রূপ ধারণ করে, তখন সিদ্ধ যোগীর চিন্ময় দেহ তাহার শক্তিরূপ হইয়া সিদ্ধস্বরূপেরই অন্তর্গত হয়। পূর্ণ সামরস্য দশায় দেহ ও আত্মা শিব-শক্তিরূপ ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে সমরস হয়। উহা অদ্বয় স্বরূপ ও নিত্য স্বপ্রকাশ থাকে।

যোগীর মধ্যে যখন চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হয় তখন সেই চিদাগ্নিতে শরীরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত সত্ত্ব (ষট্‌চক্র) বিগলিত হয় এবং আসল শরীরের যে 'ছাঁচ' সেটা থাকিয়া যায়—ইহাই 'সিদ্ধদেহ'। চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার অর্থ হইল, 'বামাবর্ত্ত' ও 'দক্ষিণাবর্ত্ত' গতির ফলে (ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে বিন্দুর আবর্ত্তন-জনিত) কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ এবং সুষুম্না নাড়ীর পথ উন্মুক্ত হওয়া। সুষুম্না নাড়ীই 'সরল গতি'—ইহাই মধ্যপথ। বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তের আবর্ত্তনের ফলে বিন্দু সামরস্য লাভ করে অর্থাৎ ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে ভালও থাকে না, মন্দও থাকে না—উভয়ের

অতীত এক নির্বিকার ভাবরূপ বিরাজ করে। যেমন উত্তপ্ত ও শীতল জলের ঢাল-উপরের দ্বারা উত্তপ্তও নয়, শীতলও নয়, এক মধ্যম অবস্থা উৎপন্ন হয়।

সিদ্ধদেহ হইলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। সমুদ্র-মন্থনের ফলে অমৃত ও বিষ উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল। দেবতারা অমৃত পান করে অমর হন, আর শিব বিষ পান করে মৃত্যুঞ্জয় হন। লৌকিক ভাষায় বলা হয় অমর, অজর হওয়া। যোগ সাধনার প্রথম অমরত্ব লাভ হয় অর্থাৎ মৃত্যুর অতীত হওয়া বুঝায়। চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অমরত্ব লাভ হওয়া বুঝায়, কিন্তু তখনও দেহ থাকে—ইহাকে 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা বলে। কারণ, চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে প্রাক্তন কর্ম-সংস্কার-বীজ ভস্মীভূত হয় এবং পুনর্জন্ম লাভের কোন আশঙ্কাই আর থাকে না; তথাপি বর্তমান জীবনের কর্মফল ভোগ করিবার জন্য যে কর্মবীজ পরিপক্ক হইয়া বর্তমান জীবনকে গঠিত করিয়াছে, সেই কর্মবীজ বা প্রারব্ধ প্রজ্বলিত চিদাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না। সুতরাং বর্তমান জীবনের কর্মফল ভোগ করিবার জন্য চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও দেহ থাকে এবং সেই দেহে বর্তমান জীবনের অবশিষ্ট কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু চিদাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের পর যোগী যে সমস্ত লৌকিক কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না বা কর্ম-সংস্কার-বীজরূপে সঞ্চিত হয় না। তাহার কারণ, তখন তাঁহার মধ্যে সূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমান থাকে না। দেহাত্মাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম যোগীকে স্পর্শ করিতে বা সংস্কাররূপে সঞ্চিত হইতে পারে না। দেহাত্মাভিমানী হইয়া কর্ম করিলেই সকল কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। আত্মজ্ঞানী হইবার পরও অবশিষ্ট কর্মফল ভোগ করিবার জন্য যে দেহ থাকে তাহাকে যোগীর জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। ইহাই অমর হওয়া বা কালরাজ্যের বা মৃত্যুর অতীত হওয়া বুঝায়। শ্রুতিতেও এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীরে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অভাবের কথা শ্রুত হইয়া থাকে—

"ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।।" (শ্বেতাশ্বতর ২—১২)

দেহসিদ্ধির উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তি লাভ। কিন্তু সিদ্ধযোগীগণের জীবন্মুক্তি বেদান্তের জীবন্মুক্তি হইতে ভিন্ন। বেদান্তমতেও জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধের অধীন থাকে। জ্ঞানের ফলে সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয় না। উহা ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। তখন দেহপাত হইলে বিদেহ কৈবল্য লাভ হয়। কিন্তু সিদ্ধযোগীগণ এই জাতীয় কৈবল্যমুক্তির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন—দেহ থাকিতেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া চাই, দেহ ও মন অস্তমিত হইলে আস্বাদ কিভাবে উপলব্ধ হইবে? সুতরাং প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহাকেই বলা চলে যিনি জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। জরা ও মৃত্যু

হইতে দেহকে মুক্ত করাই দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। উপায়ভেদে দেহসিদ্ধির স্বরূপেও কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। দেহ-সাধনা অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য সাধনা। তাই অতি অল্প ব্যক্তিই ইহাতে সফলতা লাভ করে। কিন্তু অল্প হইলেও প্রাচীনকাল হইতে এই দেশে ইহার প্রচার আছে। গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি নাথযোগীগণ সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। হঠযোগীরা বায়ু ও বিন্দু জয় করিয়া দেহ সিদ্ধ করেন। রাসায়নবিদ্‌গণ পারদকে ১৮ প্রকার সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া উহার দৈহিক প্রয়োগদ্বারা দেহসিদ্ধি লাভ করেন। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ভাবসাধনা দ্বারা, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীর্য দ্বারা, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতে যত্ন করেন। গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধি প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

জীবন্মুক্ত সিদ্ধির দুইটি অবস্থা—(১) প্রথমতঃ মায়িক দেহ শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ-মায়ার দেহলাভ। ইহাই সিদ্ধ-দেহ; (২) তারপর ঐ দেহ ক্রমশঃ জ্যোতির্ময় হইয়া প্রণবতনু রূপে পরিণত হয়। সন্তগণ বলেন যে প্রথম অবস্থাটি অমর দেহ, দ্বিতীয়টি অবিনাশী দেহ। উভয় দেহই মৃত্যুজয়ী। প্রণবদেহ বস্তুতঃ কুণ্ডলিনীস্বরূপ। সিদ্ধদেহই যোগদেহ। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণের প্রবর্তক দশার অবসানে যে ভাবদেহের বিকাশ হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ দেহেরই প্রকারভেদমাত্র। তবে ধারাগত পার্থক্য আছে।

মায়া তিন প্রকার; যথা—(১) কালরাজ্যের জনয়িত্রী অশুদ্ধ মায়া। এখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—কালের এই তিন অবস্থা বিদ্যমান। অতীত বর্তমানের মধ্যে, বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হইতে থাকে—ইহাকে কালের 'আবর্ত' বলে। ইহার মধ্যে জীবের জন্ম, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু পর পর কালের প্রভাবের দ্বারা অবস্থান্তরিত হইয়া সংঘটিত হয়। পুনরায় কালের আবর্তনের ফলে পুনর্জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবদশা একই চক্রে ঘূর্ণিত হয়।

যে যোগী মৃত্যুর অর্থাৎ কালের বা অশুদ্ধ মায়ার প্রভাবের অতীত হইয়া অমরত্ব লাভ করে, সেই যোগী শুদ্ধ মায়া বা মহামায়ার রাজ্যে উত্তীর্ণ হন। (২) ইহা দ্বিতীয় প্রকারের মায়া। এখানে কাল আছে, কিন্তু কালের আবর্ত নাই। সুতরাং কালের আবর্তের প্রভাব নাই। কালের আবর্ত নাই বলিয়া এখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একটি 'বিন্দু'তে মিলিত। এই বিন্দু শুদ্ধ বিন্দু বা শুদ্ধ সত্ত্ব। ইহা মহামায়ার চিন্ময় সত্তায় গঠিত। মহামায়ার অনুগ্রহে এই শুদ্ধ চিন্ময় বিন্দু বা সত্তায় যোগীর দেহ গঠিত হয় এবং অমর হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করে। অমর হইলেও অজর হয় না অর্থাৎ

সম্পূর্ণ কালের অতীত হইতে পারে না। এই অবস্থার যোগী জরাজীর্ণ দেহে হাজার হাজার বৎসর জীবিত থাকিতে পারে এবং মহাপ্রলয়ে তাঁহার শরীর বিনষ্ট হয়। দেবতারা অমর হইলেও মহাকালের অধীন, সুতরাং তাঁহারাও মহাপ্রলয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মহামায়ারও অতীত একটা নিত্য অবস্থা আছে---(৩) ইহা যোগমায়ার রাজ্যের অধীন। যে যোগী মহামায়ার অতীত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনি 'নিত্যদেহ' বা 'সহজ' অবস্থা লাভ করেন। ইহা যোগীর উৎকৃষ্ট 'সিদ্ধ দেহ', ইহা মহাপ্রলয়েও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ সিদ্ধদেহ প্রাপ্তিকেই বলা হয় 'মৃত্যুঞ্জয়' হওয়া। সিদ্ধদেহই অজর হয় অর্থাৎ চির কিশোর অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ সিদ্ধদেহীর মধ্যে ষোড়শ কলার বিকাশ হয়।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রথম অমরত্ব প্রাপ্তি এবং বিশেষ সাধনায় আরও অগ্রগতি হইয়া অজরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। শক্তি-সাধনায় যোগীর পর পর তিন অবস্থা লাভ হয়; যথা—বাল্য, কৈশোর ও যৌবন। এই তিন অবস্থায় তিন ভাব; যথা, প্রথম বাল্য অবস্থায় বা সাধনার প্রথম ভাগে 'শিশু-ভাব'। মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য শিশুসুলভ আবেগ-ব্যাকুলতা—উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। এইরূপ তীব্র আবেগ-মিশ্রিত সাধনায় সিদ্ধ হইলে কৈশোর অবস্থা, তখন কান্ত-ভাব—মাতৃ-ভাব তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন 'কান্ত-কান্তা' বা পুরুষ-প্রকৃতি ব্যবহার---এই সময় যোগী বীরাচারী তান্ত্রিক। ইহাই যোগীর প্রকৃত 'স্বামী' হওয়া বুঝায় অর্থাৎ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্ব-বশে আনয়ন বুঝায়। ইহার পরের উন্নতাবস্থায় 'বাৎসল্য' ভাব। তখন সকল বিশ্ববাসীই যোগীর সন্তান। সন্তানের দুঃখ দেখিয়া বাৎসল্যের উদয় হয় এবং সন্তানের দুঃখ-মোচনের জন্য করুণার স্ফূর্তি হয়। এই অবস্থায় যোগীর মধ্যে শুদ্ধ 'অহং'-এর বিকাশ হয় অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই আমি-- আমার অতিরিক্ত কিছুই নাই—এই উপলব্ধি হয়। সিদ্ধার্থ বোধি লাভ করিয়া নির্বাণ-মুক্তি গ্রহণ করিলেন না। জগতের আর্ত্ত ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জগৎবাসীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে যে সঙ্কল্প জাগিল তাহাতে তিনি নির্বাণকে পরিহার করিলেন। জগৎবাসীর দুঃখে বিগলিত চিত্তে করুণার স্ফূর্তি হইতে তাঁহার মধ্যে জগৎবাসীর দুঃখমোচনের সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। এই শুভ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য 'দশভূমি' অতিক্রম করিয়া 'বোধিসত্ত্ব' হন। ইহার পর তিনি 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়া 'পরিনির্বাণ' বা মহানির্বাণ লাভ করেন। অতএব হীনযানের নির্বাণমুক্তি ও মহাযানের বুদ্ধত্বের মধ্যে বিরাট প্রভেদ। মহাযানের 'বোধিসত্ত্বে'র সহিত শাক্ত-যোগীর 'সিদ্ধদেহে'র তুলনা করা যাইতে পারে। নির্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হয়, কিন্তু 'বোধিসত্ত্ব' মহাপ্রলয়েও বিনাশ

প্রাপ্ত হয় না। নির্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ অমর হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ কালের অতীত হইতে পারে না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভূমিতে আরূঢ় বুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় হয়।

রস সম্প্রদায়ের মতে শিব-শক্তি বীজরূপ পারদ ও অভ্র উভয়েব সাংঘট্টবশতঃ রসদেহের অভিব্যক্তি ঘটে। অনাদিকাল হইতে বহু যোগী এই রসসিদ্ধ দেহলাভ করিয়া সিদ্ধরূপে পরিচিত হইয়াছেন---তন্মধ্যে মহেশ্বর, দত্তাত্রেয়, শুক্রাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পাবে। এইরূপ মন্থানভৈরব, সিদ্ধবুদ্ধ, নাগার্জুন, নিত্যনাথ, বিন্দুনাথ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। ইঁহারা অমর দেহলাভ করিয়া কালের প্রভাবের অতীত হইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মের মাত্র এক পাদ মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, অন্য পাদত্রয় "অমৃতম্ দিবি" অর্থাৎ মৃত্যুহীন ও দিব্য। সমগ্র জগৎ এক পাদে স্থিত, উহা ক্ষর-স্বভাব বলিয়া হেয়, কিন্তু ত্রিপাদ-বিভূতি উপাদেয় ও মনের অগোচর। ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র যোগগম্য। যোগ বলিতে এখানে আগম-সম্মত যোগ বুঝিতে হইবে। যোগের দ্বাবা আত্মসংবেদন হয় ও সমগ্র জগতের উদ্ভাসক চিদ্ জ্যোতির আবির্ভাব হয়। দেহের কালগ্রাস শঙ্কা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহ ও আত্মার যোগ সম্ভবপর নহে এবং উপযুক্ত চিদ্ জ্যোতির স্ফুরণ হয় না। ঐ জ্যোতিঃ সর্বক্লেশ হইতে মুক্ত, বিকল্পহীন, শান্ত, এক, স্বয়ং বেদ্য। মনের যোগের ফলে বিশ্ব চিদ্রূপে প্রতিভাসমান হয়, সর্বকর্ম ছিন্ন হয়। বহিঃপ্রবণ ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই প্রত্যাহৃত হয় এবং চিরকালের জন্য রাগ-দ্বেষের পরিহার হয়। মানব-জীবনের পূর্ণ সফলতা ইহাতে নিহিত। তখন দেহ তেজোরূপ হইয়া নিজের শক্তিরূপে পরিণত হয়।

বসবিদ্‌গণের প্রথম কর্তব্য স্থূল ও সূক্ষ্মের পৃথক্‌করণ। তারপর স্থূলে তদনুরূপ সূক্ষ্ম সত্তার সঞ্চার করা। ইহারই নামান্তর যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা। রসবিদ্যায় নিষ্ণাত ও কর্মকুশল এবং ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি স্থূল সত্তা হইতে নির্গত সূক্ষ্ম সত্তাকে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া স্থূলে স্থাপন করিতে পারে। সূক্ষ্ম সত্তার এতদূর শুদ্ধির প্রয়োজন যাহাতে উহা তেজোরূপ ধারণ করিয়া সবেগে নিজের অনুরূপ স্থূল সত্তাতে প্রবেশ করিতে পারে এবং নিজ তেজস্ক্রিয়া দ্বারা স্থূল সত্তার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এই বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে রসতত্ত্ববিদ্‌গণের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃত সত্তাকে অপ্রাকৃত সত্তাতে বা বিশুদ্ধ সত্তাতে পরিণত করা। এই অপ্রাকৃত সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব অন্য দুই রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা আদৌ সংশ্লিষ্ট নহে এবং উহা ঘনীভূত। সুতরাং উহা অখণ্ড-স্বভাব।

নাথ-যোগিসম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক আদিনাথ হইলেও প্রকৃতপক্ষে মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক নাথ-ধর্ম প্রচারিত হয়। পরে গোরক্ষনাথ, জলন্ধর, চৌরঙ্গী, ভর্তৃহরি

প্রভৃতি বিশিষ্ট যোগী ঐ সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হন। ইঁহারা সিদ্ধ যোগী ছিলেন। নাথযোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ দেহসিদ্ধির জন্য রস প্রয়োগ, কেহ কেহ বায়ু প্রক্রিয়া, অন্য কেহ কেহ বিন্দুসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেন। ঐ সব উপায় যোগপ্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। উক্ত নাথযোগিগণ লোকোত্তর যোগসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে মহাজ্ঞান ভিন্ন কার্যসিদ্ধির কোন উপায় নাই। ইহাই তাঁহাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত।

জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ দূর করিয়া জ্ঞানকে জ্ঞেয় আকারে পরিণত করার শক্তিই মহাজ্ঞানের লক্ষণ। মনুষ্যশরীরে অনাদি কাল হইতে অসংখ্য শক্তি সুপ্ত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। ঐ শক্তিসমূহকে জাগরিত না করিতে পারিলে জ্ঞান মহাজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। ফলে আত্মবিকাশও হয় না এবং তাহার অভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না। শক্তিজাগরণের উপায় অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন। উন্মীলিত শক্তিসমূহের দ্বারাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লাভ হয় এবং জরা-মরণাদি বিকার-বর্জিত এবং আণব-মায়া-কার্য মলহীন ও পাপলেশহীন দিব্যদেহের উদয় ঘটে।

মহাজ্ঞানের দ্বারা পরমশূন্যযোগ লাভ হয়। আদিনাথ শ্রীশঙ্কর হইতে এই জ্ঞান মৎস্যেন্দ্রনাথের ন্যায় গোরক্ষনাথও লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ নাথযোগিগণের নামাবলীতে বহু নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সব নাম রসসম্প্রদায়ের গ্রন্থেও উপলব্ধ হয়। সুতরাং সিদ্ধ যোগিদের মধ্যে কেহ কেহ রসমার্গে সিদ্ধ, কেহ কেহ হঠযোগের দ্বারা সিদ্ধ আবার কেহ বা তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কিংবা বিন্দুসাধনের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত মার্গেই সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একটি মার্গ লক্ষিত হয়। উহা ব্রহ্মমার্গ। উহাই শূন্যপদবী নামে প্রসিদ্ধ সুষুম্নানামক মধ্যমা প্রতিপৎ।

প্রাচীন যুগের অব্যবহিত পরে বৌদ্ধ বজ্রযান মার্গে গমনশীল সাধকগণের ভাবে ভাবিত বাউল সাধকগণের ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নাথযোগমার্গ কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা লাভ করে। তাহার ফলে তাহারা কায়সিদ্ধির জন্য অতিগুহ্য চারি-চন্দ্রের সাধন নামক উপায় অবলম্বন করেন। চারি প্রকার চন্দ্র হইল—(১) আদিচন্দ্র, (২) নিজচন্দ্র, (৩) উন্মাদচন্দ্র, (৪) গরলচন্দ্র। এই মতে অধোমুখ সহস্রদল-কমলকে উর্ধ্বমুখ করিয়া ঐ কমলে স্থিত অমৃত দ্বারা মনের অভিষেক করা প্রয়োজন। ঐখানে প্রণবের ধ্যান করা আবশ্যক। ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বার এবং ত্রিবেণীর দ্বার রোধ করা আবশ্যক। ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে সুধাধারা আর অধোদেশে পতিত হইতে পারে না। নাথযোগিগণের মতে এই ক্রিয়া আকাশচন্দ্রভেদ নামে পরিচিত। রসাত্মক নিজচন্দ্রকে উর্ধ্বে আকর্ষণপূর্বক

আকাশচন্দ্রে যোজনা করা কর্তব্য। ঊর্ধ্বগতির ফলে ঐ রস অমৃতরূপে পরিণত হইয়া সহস্রারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। আকাশচন্দ্র সহস্রারে সংলগ্ন। এইরূপে যোগী গরলচন্দ্রকে পান করেন। গরলচন্দ্রের পান এবং প্রণবের ধ্যান আবশ্যক। গরলচন্দ্রের দ্বারা দেহ ও মনের শোধন এবং সঞ্জীবন সম্পন্ন হইলে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে।

মহাযানী বৌদ্ধগণও কায়-সাধনের বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরপ্রজ্ঞা লাভের জন্য বোধিসত্ত্বভূমি প্রবেশ করা কর্তব্য এবং ভূমিভেদ করাও প্রয়োজন। উহা সম্পন্ন হইলে প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্তি ঘটে এবং উহাই বুদ্ধত্ব-সম্পাদক মহাজ্ঞান।

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে কেহ কেহ রসাত্মক বিন্দুকে বোধিচিত্ত বলে। চতুর্দল কমল হইতে ইহাকে ঊর্ধ্বে উষ্ণীষ কমলে স্থাপন করা যোগসাধনার ফল। ষট্‌চক্রভেদের ন্যায় এই উত্থাপন ক্রিয়া অতি কঠিন। প্রথমে বিন্দুর নিম্নতল চক্রে স্থিতি আবশ্যক। তারপর নির্মাণচক্র হইতে উহাকে মহাসুখচক্রে উত্থাপিত করিতে হয়। সেখানে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। উদ্ভবের তাৎপর্য ক্ষোভ। তখন ঐ ক্ষুব্ধ বিন্দুকে 'অবধূতী' নামক মধ্যমার্গ দিয়া সঞ্চালিত করিতে হয়। ক্ষুব্ধবিন্দুর ঊর্ধ্বগমন পথে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ আস্বাদিত হইয়া থাকে। বিন্দুর অধোগমনেও আনন্দের অভিব্যক্তি অবশ্যই হয়, কিন্তু তাহা অস্থায়ী এবং মলিন বলিয়া উহা ত্যাজ্য। বিন্দুর অধোগতির ফলে যেরূপ কামদেহের বা স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ উহার ঊর্ধ্বগমনে দিব্যদেহ প্রকটিত হইয়া থাকে।

কায়সাধন বিষয়ে যোগিগণ বলিয়াছেন—'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ', অর্থাৎ বিন্দুর অধঃস্খলন যেন কোন প্রকারেই না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিন্দুর ঊর্ধ্বগতির ফলে কায়সাধনসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মলিন বলিয়া উহা অধোগতিসম্পন্ন। ঐ অশুদ্ধ বিন্দুকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সংবৃতি-বোধিচিত্ত নামে অভিহিত করেন। অশুদ্ধ বিন্দুর ভূমিপ্রবেশে অর্থাৎ চিত্তকে একাগ্র করিতে সার্মথ্য নাই, সুতরাং উহার দ্বারা ভূমিভেদও অর্থাৎ একাগ্রতা সাধনও সম্ভব নয় এবং তাহার ফলে প্রজ্ঞারও শুদ্ধি ঘটিতে পারে না—বুদ্ধত্ব লাভ তো সুদূরপরাহত। সেইজন্য সর্বপ্রথমে শোধন-শক্তি ও নিরোধ-শক্তি দ্বারা বিন্দুর অধোগতি রোধ করা প্রয়োজন। তারপর কর্মমুদ্রার দ্বারা ঊর্ধ্বস্রোত খুলিলে অমরতার মার্গ সিদ্ধ হয়। এইখানেই বুদ্ধভাবের উদয় হয়। নির্মাণচক্রে বিন্দুর গতি ও স্থিতির ফলে যে কায়ের উদয় হয় তাহার নাম নির্মাণকায়। বিন্দুর ঊর্ধ্বগমনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও তারতম্য হয়। 'অবধূতি' মার্গ আশ্রয় করিয়া বোধিচিত্ত যখন ধর্মচক্র পর্যন্ত উত্থিত হয় তখন পূর্বোক্ত আনন্দ পরমানন্দরূপে পরিণত হয়। নির্মাণচক্রে

যাহা কর্মমুদ্রা, ধর্মচক্রে উহা ধর্মমুদ্রা। এ অবস্থায় বোধিচিত্ত যোগীর শিরোদেশে থাকে। ইহার পর উৎকর্ষ লাভ হইলে সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দের অনুভব হয়—এই সময়কার মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। এখানে ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের নিবৃত্তি ঘটে বটে এবং ভব ও নির্বাণ একাকার হইয়া যায় বটে, কিন্তু তথাপি ইহাও পূর্ণতা লাভ নয়। ইহার ঊর্ধ্বে মহাসুখচক্রে সহজানন্দের উপলব্ধি হয়।

আনন্দই অমৃত, চন্দ্রকলা হইতে ইহার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। অবধূতি মার্গ দিয়া যখন বোধিচিত্ত ঊর্ধ্বে গমন করিতে থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আনন্দের উন্মেষ হয়। ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্রের প্রথম পাঁচটি কলা হইতে ধর্মচক্রে আনন্দের আবির্ভাব হয়, ষষ্ঠকলা হইতে দশম কলা পর্যন্ত পরমানন্দের এবং একাদশ হইতে পঞ্চদশকলা পর্যন্ত বিরমানন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে। 'অমৃতা' নামক ষোড়শী কলা মহাসুখচক্রে সহজানন্দরূপে অনুভূত হয়। বস্তুতঃ আনন্দ, পরমানন্দ ও বিরমানন্দের সাম্যাবস্থাই হইল ষোড়শ কলা। ইহারই নাম সহজানন্দ। এই অমৃতকলাই মানবদেহের অমরতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ত্রিকায়—আমরা দেখিতে পাই, দ্বৈত আগমে যেরূপ বিশুদ্ধ অধ্বাতে অধিকার-অবসর, ভোগাবসর ও লয়াবসর আছে, সেইরূপ বৌদ্ধাগমেও নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায় আছে। তিনটি কায়ারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই সব কায়া বুদ্ধের, অবুদ্ধের নহে। অর্থাৎ যিনি সত্যে জাগ্রত হন নাই, তাঁহার এই সব কায়া হয় না। বস্তুতঃ যিনি তত্ত্বাতীত, তাঁহারই এই সব শুদ্ধ তত্ত্বরূপ কায়া। কেহ কেহ স্বভাবকায় বা সহজকায় নামে ধর্মকায়ারও অতীত একটি কায়া স্বীকার করেন। আগমে সপ্তদশী কলার অনুরূপ এই স্বভাব-কায়া স্বীকারের যুক্তি। নির্মাণচক্রে বুদ্ধের নির্মাণকায়, ধর্মচক্রে ধর্মকায়, সম্ভোগচক্রে সম্ভোগকায় এবং মহাসুখচক্রে মহাসুখকায় বা সহজকায় প্রকটিত হয়। নির্মাণকায় থেকে সহজকায় পর্যন্ত আরোহনের ইহাই স্তর।

সম্ভোগকায়টি হইল সিদ্ধদেহ, ইহা জীবন্মুক্ত দেহ কিন্তু চিন্ময়দেহ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহ নহে। এই সিদ্ধদেহ দ্বারাই জগতের মঙ্গল কার্য করা হয়। উহা শুদ্ধ কায় বলিয়া অমর দেহ বা জরামরণবর্জিত দেহ, কিন্তু উহাতে শুদ্ধ মায়া আছে, তাই উহা দ্বারা জগতের সঙ্গে ব্যবহার চলে। সম্ভোগকায় সিদ্ধদেহ বলিয়া উহা সাধারণ লোকের অদৃশ্য। তবে জগৎ কল্যাণ কার্য করার সময় উহা নির্মাণকায়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে শক্তির দ্বারা উহা হয় তাহা বুদ্ধের 'উপায়-কৌশল'। বৈষ্ণবাচার্য বলেন—'যোগমায়া'।

সম্ভোগকায়টি আনন্দময়—উহা পুণ্য সম্ভারের ফলস্বরূপ। ধর্মকায় জ্ঞানসম্ভার হইতে অভিব্যক্ত হয়। পুণ্য সম্ভার ও জ্ঞান সম্ভার পূর্ণ না হইলে বুদ্ধত্বের

প্রাকট্য হইতে পারে না। 'সুখাবতীতে' যে 'অমিতাভ'স্বরূপ আছেন তাহাও এক হিসাবে বুদ্ধের সম্ভোগকায় রূপেই পরিগণিত হয়। আনন্দ ও করুণা সম্ভোগকায়ের বৈশিষ্ট্য। সম্ভোগকায় এক হিসাবে নিত্য, কারণ উহার মৃত্যু হয় না। আর এক হিসাবে অনিত্য, কারণ ধর্মকায়ে প্রবেশকালে উহার সঙ্কোচ হয় অর্থাৎ গুটাইয়া যায়।

ধর্মকায় বস্তুতঃ পরমার্থ সত্য। ধর্মকায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ যাহাতে বাসনার স্পর্শমাত্র নাই। কিন্তু সম্ভোগকায়ে ক্লেশ না থাকিলেও ক্লেশহীন বাসনা থাকিতে পারে। ক্লেশ নাই বলিয়া সম্ভোগকায় লোকোত্তর কিন্তু শুদ্ধ বাসনা আছে বলিয়া উহা আনন্দরূপ। ধর্মকায় বিকল্পের অতীত। সকল বুদ্ধেরই ধর্মকায় একই। সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় সম্বন্ধে বৈচিত্র্য আছে।

মন্ত্রযানের লক্ষ্য বজ্রযোগ-সিদ্ধি। পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য এই যোগই শ্রেষ্ঠ। বজ্রযোগ-মার্গের চারিটি স্তর। এক-একটি স্তরে পূর্ণ যোগের এক-একটি রূপের আবরণ উন্মোচিত হয়। চারিটি স্তরের সাধনায় পূর্ণতা লাভ করিবার পর যোগ পূর্ণ হইয়া যায়।

প্রথম বজ্রযোগের নাম বিশুদ্ধ-যোগ। এই যোগে প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সাম্যাবস্থা হইলে সহজকায়ের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় বজ্রযোগের নাম ধর্মযোগ। চিত্ত-বজ্র-ধর্মকায় নামে এর প্রসিদ্ধি। ইহা জগতের কল্যাণসাধক নির্বিকল্প চিত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যোগও প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সমরসে অভিষিক্ত। ইহা হইতে ধর্মকায়ের উৎপত্তি হয়।

তৃতীয় বজ্রযোগের নাম মন্ত্রযোগ। মনের ত্রাণ হওয়ার মধ্যেই মন্ত্রের উপযোগিতা, একেই বাগবজ্র বা সম্ভোগকায় বলে।

চতুর্থ বজ্রযোগের নাম সংস্থান-যোগ। এর থেকে কাযবজ্র লাভ করা যায়। ইহাতে অনন্ত নির্মাণকায়ের স্ফূরণ হয়।

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণও কায়সাধনকে সাধনার উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, দেহে চারিটি সরোবর বিদ্যমান। কায়সাধনে সিদ্ধ হইলে এই সরোবর অভিব্যক্ত হয়। সরোবরের দুইটি বামাঙ্গে এবং দুইটি দক্ষিণাঙ্গে। ইহারা প্রকৃতি-পুরুষরূপ। 'কাম সরোবর' এবং 'মান সরোবর' বাম অঙ্গে, 'প্রেম সরোবর' এবং 'অক্ষয় সরোবব' দক্ষিণ অঙ্গে বর্তমান। সন্তযোগিগণ বলেন যে মান-সরোবরে স্নান সম্পন্ন হইলে ব্যাপক মনোময় রাজ্য লাভ হয়, পরে তাহা অতিক্রম করিয়া মহাশূণ্য ভেদ করিতে হয়। অন্যথায় চিদানন্দময় ভগবদ্ধাম লাভ ঘটে না। অক্ষয় সরোববই ভগবদ্ধাম। মহাপ্রলযে সমস্ত জগতের নাশ হইলেও একমাত্র অক্ষয় সরোবরই বিদ্যমান থাকে। মানবদেহে এই স্থান মস্তকস্থিত সহস্রদল কমলে অবস্থিত। ইহা সহজপুর।

ইহা অধিগত হইলে কালকে অতিক্রম করা যায়, ফলে জরা-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণ কায়সিদ্ধি বিষয়ে তিনটি 'ভূমি' স্বীকার করেন। প্রথম প্রবর্তক ভূমি, দ্বিতীয় সাধক ভূমি, তৃতীয় সিদ্ধভূমি। প্রথম ভূমিতে নাম ও মন্ত্র সাধনা। যতক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি না হয় ততক্ষণ প্রবর্তক অবস্থার অতিক্রম সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ভূমিতে ভাবসাধনা ও প্রেমসাধনা। 'ভাবদেহ' প্রাপ্তির পর সেই দেহে সাধন চলে। সিদ্ধাবস্থায় তৃতীয় ভূমিতে 'রসময় তনু' লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের নিত্য লীলামণ্ডলে প্রবেশ লাভ ঘটে।

ভাবদেহ, প্রেমদেহ ও রসদেহ—ভাবদেহ অত্যন্ত গভীর ও রহস্যপূর্ণ। সেইজন্য ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। ভাবদেহ সাধারণ লোকের জ্ঞানের অগোচর এবং বুদ্ধির অগম্য। প্রথমে সদ্গুরু প্রাপ্তির জন্য নাম-সাধনা করিতে হয়। নাম-সাধনার প্রভাবে সদ্গুরু প্রাপ্তি হইলে সেই সদ্গুরু মন্ত্রদান করেন। গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র-সাধনা নাম-সাধনারই মহত্তর রূপ। মন্ত্র-সাধনার প্রভাবে নিজ 'স্বভাব'কে ফিরিয়া পাওয়া যায়। অভাবরূপী মায়া আমাদের সত্তাকে ঘিরে থাকে। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয়ে মায়ার আবরণ অপসারিত হয়। তখন আত্মা অনাবৃত স্বরূপ হইয়া আপন প্রচ্ছন্ন স্বভাবকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই ধারার গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের মহিমা। ইহাকে একপ্রকার 'আত্মজ্ঞান'ও বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক আত্মার একটি অন্তরঙ্গ 'স্বভাব' থাকে। কিন্তু আত্মার এই অন্তরঙ্গ স্বভাব মায়ার আবরণে ঢাকা থাকে বলিয়া প্রকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় না। আমরা মায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া আনন্দপ্রাপ্তির জন্য ঘুরিয়া মরি, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ পাই না। মায়ার আবরণ দূর না হইলে ইহা পাওয়া যায় না। আত্মা যখন নিজ 'ভাব' ফিরিয়া পায় তখন উহার মায়িক ভাব বা পরকীয় ভাব দূর হইয়া যায়। পরকীয় ভাবের তাৎপর্য হইল মায়িক বা মায়াজনিত ভাব। বস্তুতঃ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের প্রভায় মায়ার নিবৃত্তি না হইলে আত্মার প্রকৃত সাধন আরম্ভই হয় না। এই ধারার গুরুর একমাত্র কার্য হইল আত্মার স্বরূপাচ্ছাদক আবরণ হটাইয়া শিষ্যকে আপন 'স্বভাবে' প্রতিষ্ঠিত করা। সাধারণ মানুষ জানেই না যে সে কে এবং কি চায়; তাহার অভাব কি এবং কি প্রকারে তাহা নিবৃত্ত হইতে পারে। মায়ার আবরণে আবৃত থাকার ফলে সত্যের স্বরূপ তাহার নিকট অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যায়। সদ্গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র-সিদ্ধির পর তাহার স্বরূপ-আচ্ছাদক আবরণ সরিয়া যায়। তখনই আত্মা নিজেকে চিনিতে পারে এবং তাহার অভাব কি তাহা অনুভব করিতে পারে এবং অভাব-নিবৃত্তির উপায়ও অনাবৃত আত্মার নিকট প্রকটিত হয়।

এই তত্ত্বটিকে আরও পরিস্ফুট করা যাইতেছে। মন্ত্র-সাধনার প্রভাবে জ্ঞানের উদয় হইবার পর অনাদি কালের আবরণ নষ্ট হইয়া যায। আববণ নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ামুক্ত জীব আপন স্বরূপ দেখিতে পায। এই অনাবৃত স্বরূপের দুইটি নিত্য সম্পর্কযুক্ত সত্তা থাকে—একটি উহার 'আশ্রয়-সত্তা' এবং অপরটি 'বিষয়-সত্তা'। মায়ার অপসারণের পর যখন 'স্বভাবে'র উন্মেষ হয় তখন মায়াতীত নিজ স্বরূপের এই দুইটি দিক খুলিযা যায়। ইহারই নাম ভাবের বিকাশ অথবা 'ভাবদেহ-প্রাপ্তি'। ইহাই 'স্বভাব'। মাযার আবরণে এই 'স্বভাব' অনাদিকাল থেকে ঢাকা থাকে। স্বভাব উন্মুক্ত হইবাব পর ভাবদেহী শিশু নিজের অনাদিসিদ্ধ 'মা'কে পাইবার জন্য আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে। এই ব্যাকুল ক্রন্দনই 'ভাব-সাধনা'। মাযার আবরণ অপসারিত হইবাব পর নিত্য নিরন্তর মা-মা-মা রবে ক্রন্দনরূপ ভাব-সাধনা চলিতে থাকে। একদিকে যেমন ভাবদেহী শিশুর আবির্ভাব হয়, অপরদিকে সেইরূপ ভাবময শিশুব মাযেরও আবির্ভাব হয়। একদিকে শিশুর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন, অপরদিকে মাযের করুণাঘন স্নিগ্ধ দৃষ্টি। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকে। বাস্তবিকপক্ষে এই অবস্থাতেই প্রকৃত ভাব-সাধনার আরম্ভ হয। মায়া-নিবৃত্তির পূর্বে যে সাধনা তাহা কৃত্রিম সাধনা—প্রকৃত সাধনা নয়। কাবণ, তখন কর্তৃত্বাভিমান থাকে, তথাপি উহা ব্যর্থ হয না। কারণ উহার ফলস্বরূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়। ভাবসাধনা অকৃত্রিম—ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয না এবং ইহাব জন্য গুরুরও আবশ্যক হয় না। মন্ত্র-সাধনারও দরকার হয় না বা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিধিবিধান পালনেরও প্রয়োজন হয় না। সাধকের অহংভাব এই ভাবদেহে যুক্ত হইয়া যায়। মায়াদেহ বা ভৌতিকদেহও ঐ সময থাকে। মায়াদেহ কর্মজগতের বস্তু, উহা প্রারব্ধ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয এবং প্রারব্ধকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। সাধক একই সঙ্গে ভাবদেহ ও মাযাদেহ—উভয দেহেই অধিষ্ঠান করে। মায়াদেহ কর্মজগতের নিয়মের অধীন। সাধকের অহং-ভাব বা অভিমান যখন মায়িক দেহে থাকে তখন মাযিক দেহের কর্ম হয়, যখন ভাবদেহে থাকে তখন ভাবদেহের কার্য হয। একই সময়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে অভিমান দুই দেহেই থাকিতে পারে।

ভাবদেহের বিকাশের ধারা স্বতন্ত্র। ভাব-সাধনার ফলস্বরূপ ভাবের বিকাশ হয় এবং উহার প্রভাবে মাতৃসত্তা ভাব-সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয। ভাব প্রেমের অপরিণত অবস্থা। ভাব পরিপক্ক হইলে উহা প্রেমে পবিণত হয়। ভাব যেন পুষ্প-কলিকা আর প্রেম পূর্ণ প্রস্ফুটিত সুগন্ধিত পুষ্প। ভাবের বিকাশ হইতে মাতৃসত্তা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সামনে প্রকট হয়। ভাবের বিকাশ পবিপূর্ণ হইলে মা আর সন্তানেব মিলন হয, অর্থাৎ প্রেমের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা সন্তানকে নিজের কোলে তুলিয়া লন—তখন আর কোন

ব্যবধান থাকে না। প্রেম ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইলে মা ও সন্তান ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইয়া পূর্ণ বিগলিত অবস্থায় এক হইবার দিকে অগ্রসর হয়। ভাব প্রেমের পূর্বাবস্থা—ইহাই যোগের সূচনা। প্রেমাবস্থায় যোগ অচ্ছিন্ন থাকে। মায়ের কোলে শিশু হওয়া—ইহা এক অবস্থা। আর মা ও শিশু ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া 'একাকার' হওয়া—ইহা আর এক অবস্থা। এই 'একাকার' প্রাপ্তিই রসভাবের উদয়। ভাবুক, প্রেমিক এবং রসিক—ক্রমবিকাশের এই তিন স্তর। ভাবাবস্থায় বালকভাব, প্রেমাবস্থায় কিশোরভাব এবং রসাবস্থায় নবযুবকভাব।

ভাবদেহ, প্রেমদেহ ও রসদেহ—ভাবসাধনার ও প্রেমসাধনার ফলস্বরূপ এই তিন দেহের ক্রমিক বিকাশের মধ্যে আরও অনেক রহস্য আছে। শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার যদিও প্রত্যেক জীবেরই আছে, তথাপি ভাবসাধনায় যতদিন প্রেমের উদয় হইয়া রসের বিকাশ না হয়, ততদিন কাহারও রসঘনতনু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার মেলে না। রসাবস্থায় প্রবিষ্ট হইবার পর প্রথমে মঞ্জরী, মঞ্জরী হইতে সখী এবং শেষে সখী হইতে রাধাভাবের স্পর্শ হয়। মহাভাবের স্পর্শ রাগানুগাভাব থেকেই হোক বা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার বিশিষ্ট কৃপায় রাগাত্মিকা ভাব থেকেই হোক—যেভাবেই হোক না কেন, ইহার জন্য চাই রসের বিকাশ তথা রসিক অবস্থার প্রতিষ্ঠা। ভাবাবস্থায় ভাবদেহ নিত্য বালভাবময়, প্রেমাবস্থায় প্রেমদেহ নিত্য কিশোরভাবময় থাকে এবং প্রেমের পূর্ণ পরিণতিতে কিশোর-অবস্থা পার হইয়া নবযৌবনে প্রবেশ হয়। ইহা কালাতীত নিত্য ভূমির কথা।

মায়াদেহ বা ভৌতিক দেহ যাহা কালরাজ্যে জীর্ণ ও স্থবির হইয়া যায়, উহা সাধারণতঃ কর্মজগতের নিয়ম অনুসারে চলে। বিশিষ্ট উচ্চকোটির অধিকারী হইলে মায়িক দেহই সিদ্ধদেহে পরিণত হয়। তখন উহা কালের প্রভাবের অতীত হইয়া যায়, অর্থাৎ এই মায়িক দেহে থাকিয়াই সাধক-যোগী জরা মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠিয়া লীলারাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তথাপি লীলারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সিদ্ধদেহী যোগীকেও ভাবদেহ, প্রেমদেহ ও রসদেহের বিকাশ ঘটাইতে হয়। কারণ, ভাব হইতে উৎপন্ন প্রেমের দ্বারা রসে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত লীলারাজ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। কারণ, 'রসময় দেহে'ই আত্মার রসাস্বাদন হয়; আর জাগতিক ব্যাপার সংঘটিত হয় 'সিদ্ধদেহে'। সিদ্ধদেহ যে 'যোগদেহ' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা যে কালাতীত তাহাও সত্য, তথাপি ইহা কর্মময় মায়িক দেহেরই পরিণতি। রসদেহের ধারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, ইহা নিত্য ধামের লীলারস আস্বাদনের উপযোগী। 'সিদ্ধদেহ'

মহামায়া-রাজ্যের বস্তু। 'রসদেহ' মায়া ও মহামায়ার অতীত যোগমায়া-রাজ্যের নিত্য চিদানন্দ ধামের বস্তু।

(গোরখপুর হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণী' পত্রিকায় ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত "দেহ-বিবেচন" হিন্দী প্রবন্ধের অনুসরণে এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে দেহ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা বিশ্লেষণ শুনিয়া ও তাঁহার নানা প্রবন্ধ পড়িয়া আমার যাহা উপলব্ধি হইয়াছে সেই উপলব্ধির সাহায্যে 'বিভিন্ন শরীর ও শরীরতত্ত্ব' প্রবন্ধটি রচিত হইল।)

যোগতন্ত্র ঃ

বিভিন্ন প্রকার যোগ

প্রস্তাবনা

আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধান করাব নামই যোগ। আত্মাব পূর্ণ জাগরণই ইহার লক্ষ্য। এই স্বরূপ-অনুসন্ধানের বা যোগের বিভিন্ন প্রকাবভেদ ও পথের নির্দেশ দিয়াছেন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় তাঁহাদের নিজস্ব ধর্মাচরণেব বৈশিষ্ট্য অনুসারে। উক্ত বিভিন্ন প্রকার যোগের আলোচনার প্রারম্ভে আমরা পৃথিবীতে কেন জন্মিলাম? জন্মজন্মান্তর ধরিয়া শুধু দুঃখ ভোগই কি আমাদের চরম ভাগ্যলিপি? উহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি?—সে সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি—আমাদের এই তিন সাধাবণ অবস্থা। প্রাকৃত জগতে বিষযের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের এবং মনের সহিত আত্মার ঘনিষ্ঠ যোগ। ইন্দ্রিয় বিষযকে গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মনে সংবেদিত হয়। আত্মা যদিও স্বরূপে শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ, নির্বিকার, নির্বিকল্প, সাক্ষী ও দ্রষ্টা তথাপি মায়ার আবরণে নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মনের সঙ্গে তাদাত্ম্য হইয়া যায়। এই তাদাত্ম্যহেতু মনের ধর্ম আত্মার উপর আরোপিত হইয়া তাহা আত্মার ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মনের বিষয় হওয়ায় তাদাত্ম্যের ফলে আত্মাই যেন মন-গ্রাহ্য বিষয়ের ফলভোগী হইয়া পড়ে—ইহাই জীবাত্মা। ইহারই ফলে দেহাত্মবোধ জাগ্রত হয়। এই দেহাত্মবোধের জন্যই অশুদ্ধ অহং অভিমান জাগিয়া উঠে যাহার ফলে জীব অপর হইতে নিজেকে বিবিক্ত (পৃথক্) জ্ঞান করে। অহংকাবের বেড়া দিয়া নিজের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ করে বলিয়াই তাহার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বোধ খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ—ভূমার আনন্দ সে লাভ কবিতে পারে না। যে ঔদার্য বা স্বচ্ছ দৃষ্টিব বলে 'বসুধৈব কুটম্বকম্' জ্ঞান হয়, তাহার সে দৃষ্টি আচ্ছাদিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ 'আমিই সব করিতেছি' ইত্যাকার অহং-বিজড়িত অভিমান-স্ফীত কর্মের যাবতীয় ভালমন্দ ফল তাহাকে স্পর্শ করে এবং এইরূপে সঞ্চিত কর্মফলের জন্য তাহার সুখ-দুঃখের অনুভব হয়—ইহাকেই বলে কর্মফল-ভোগ। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সে যে কর্মফল সঞ্চিত করে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সঞ্চিত কর্মফল বীজাকারে মহাকালেব গর্ভে নিহিত থাকে

এবং যখন যে সমস্ত বীজ পরিপক্ক হয় অর্থাৎ ফলোৎপাদনের উপযোগী হয়, তখন সেই সমস্ত কর্মবীজের প্রকৃতি ও ধর্মানুসারে জীবের কোথায় কিরূপ পরিবেশে কোন অবস্থার মধ্যে জন্ম হইবে নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং জন্মলাভ করিয়া সেই কর্মফল ভোগ করিতে থাকে। সেই কর্মফল ভোগের কাল পূর্ণ হইলে তাহার আয়ুস্কাল নিঃশেষিত হয় এবং স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে আকাশ-মার্গে অর্থাৎ শূন্যে বিচরণ করিতে হয়। আবার তাহার সঞ্চিত অন্য কর্ম-বীজের প্রভাবে স্থূলদেহ ধারণ ও সেই কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। এইরূপ জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহার একদিকে যেমন সঞ্চিত কর্মবীজের ক্ষয় হইতে থাকে, তেমনি প্রত্যেক জন্মের জীবৎকালে অহংস্ফীত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পুনবায় সে কর্মবীজ সংগ্রহ করিতে থাকে। এইরূপে জীবের জন্মমৃত্যুর নিরন্তর আবর্তন চলে—কোথাও উহার শেষ সীমা আসিয়া পৌঁছায় না। ইহাই যদি মানুষের নিয়তি হয়, তবে মানুষের দুঃখের অন্ত কোথায়? মানুষের এই সীমাহীন দুঃখ দেখিয়াই তো দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানুষের দুঃখ মোচনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে কি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় লোককে বুদ্ধের মত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বিজন বনে যাইতে হইবে? তবে তো দুনিয়ার গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে? সংসার কি এতই অসার যে সকলে মিলিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে? আর তাহা কি কখন সম্ভব? সকলের প্রকৃতিই কি সমান? সকলেই কি সিদ্ধার্থ? সিদ্ধার্থের মত প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় না হইলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কি এতই সহজ? যদি তাহাই হইবে তবে ঈশ্বর সংসার রূপ মায়ার হাট বসালেনই বা কেন? উপনিষদে বলে—তিনিই বহু হইয়াছেন, এই যে জীব জগৎ দেখিতেছ উহা তাঁহা হইতেই সৃষ্ট। আবার তাঁহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইলেও তিনি স্ব-স্বরূপে বা স্বভাবে অবিকৃত অবিকল্পই আছেন। তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতের অধিষ্ঠাতা, কর্তা। তিনিই নির্বিকার দ্রষ্টা ও সাক্ষীরূপে বিশ্বমানবের সকল কর্ম ও ভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বীয় মায়ায় আবৃত হইয়া জীব-জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বহু হইয়া বিরাজিত হইলেন কেন? আবার অণু-আত্মা রূপে মনুষ্যদেহ গ্রহণ করিয়া অনন্ত মনুষ্য হইয়া নিজেই বা কেন অহংস্ফীত হইয়া কর্ম করিতেছেন, কর্মফল ভোগ করিতেছেন, আবার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাই বা সহ্য করিতেছেন কেন? এ তাঁহার কিরূপ খেলা? কি উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে লইয়া এরূপ খেলা খেলিতেছেন? উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। সেই উদ্দেশ্য হইল, আমরা যাহারা তাঁহার অণু-অংশ, স্বরূপে যে তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন—বহু জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়া সেই

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া। প্রশ্ন হইতে পারে, বিশ্বের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা যখন তাঁহার সহিত এক হইয়াছিলাম, তখন কি আমাদের সে জ্ঞান ছিল না? না, ছিল না। যদিও আমাদের চিৎ সত্তা আনন্দে ডুবিয়া ছিল, কিন্তু আনন্দের কোন বোধ ছিল না। আমরা অসাড়ের ন্যায় তাঁহাতে নিমগ্ন ছিলাম, অচিৎ জড় যেমন নিশ্চল হইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকে সেইরূপ। তাই তো পরমেশ্বরের একলা থাকিতে ভাল লাগিল না। 'ম্যায় হুঁ'---আমি যে আছি---ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি বহু হইলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়---

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ চাওয়া;
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন ছেঁড়া হাওয়া॥

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম---
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে॥

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক;
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ---
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে ---
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।"

(বলাকা, ২৯)

তিনি নিজে এইরূপে বহু এবং বৈচিত্র্যময় হইলেও স্বরূপে তিনি অবিকৃতই

থাকিয়া গেলেন। কারণ তিনি তো অসীম, অনন্ত। দেশ ও কালের দ্বারা তাঁহার পরিমাপ হয় না। আমাদের এই জগৎটার মত এমন অসংখ্য জগৎ শূন্য মণ্ডলে ভাসিতেছে---এই সকলের সমষ্টিতে যে বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাহা তাঁহার অসীম সত্তার তুলনায় একটি বালুকণা-সদৃশ। সমুদ্রের অগাধ বারিধি হইতে কয়েক ঘটি জল তুলিয়া লইলেও সমুদ্র যেমন ছিল তেমনি থাকে। অতএব সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই অবিকৃত স্বভাবে স্থিত আছেন এবং চিরকাল সেই একই স্বভাবে অটল থাকিবেন। সৃষ্টির প্রলয়-উদয়েও সেই স্বভাবের কোনদিন কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটিবে না। মধ্যখান থেকে আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ার আবরণে স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া অহংস্ফীত হইয়া নিজ কর্মজালে জড়াইয়া পড়িয়া জন্মজন্মান্তরের আবর্তনে ঘুরপাক খাইতেছি। চক্রাকারে আবর্তিত হওয়াই কি মানুষের বিধিলিপি? উহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি? তবে কি পরম করুণাময় ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন? গীতা তো তাই বলে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (৪র্থ অঃ ৭/৮)

তাহাও তো দেখিয়াছি, যুগে যুগে বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট (যিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন), চৈতন্যদেব (যাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার বলিয়া মনে করেন) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার প্রতিভূ হইয়া ধরাধামে লৌকিক দেহ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই মুক্তিপথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু অগণিত জনসাধারণের তাহাতে কি উপকার হইয়াছে? তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। তাহা হইলে তাহাদের উপায়? উপায় আছে এবং সে উপায় তাহাদের নিজেদের হাতেই। কথায় বলে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে—'God has created man after His Own image' -কথাটা খুবই সত্য। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মানব আত্মসচেতন হইয়া অর্থাৎ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম পিতার নিকট ফিরিয়া যাউক। তাহা হইলেই তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দের সম্ভোগ করিতে পারিবে। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই যোগ-সাধনা। আত্মসচেতন হইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে না। সংসারে থাকিয়াই আত্মসচেতন হইবার অন্যতম উপায় হইল, লৌকিক সুখ-দুঃখের ভোগায়তন যে স্থূল শরীর যাহা অনিত্য, তাহাতে 'আত্মবুদ্ধি স্থাপন না করিয়া

আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। এবং তাহা কবিতে হইলে দেহাত্মবোধ জনিত যে আত্ম-অহংকার স্ফুরিত হয় এবং যাহা হইতে অপর সকলকে আমা হইতে পৃথক্ অনাত্মীয় মনে কবি, সেই অহংকারকে ধীরে ধীবে বিলুপ্ত করিতে হইবে। অহং বিলুপ্তির পদ্ধতি হইল পরমেশ্বরের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং গভীর বিশ্বাস—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিবেন অধিগচ্ছতি।।"

(গীঃ ৪র্থ অঃ ৩৯)

শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস হইতেই পরমেশ্বরের প্রতি পবম নির্ভরতা আসে এবং পরম নির্ভরতা হইতেই ভক্তির ভাব অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্তরূপে উত্থিত হয়। সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় এবং সর্বকর্মে পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ-ভাব হইতে 'অহং' স্তিমিত হইতে থাকে এবং ভক্তিভাবে চিত্ত তাঁহার চরণকমলে অবনমিত হইতে থাকে। যতই অহংকার ক্ষীণ হইতে থাকে ততই ভক্তি-ভাব গভীর হইতে থাকে। এইরূপে আত্মসমর্পণ-ভাব অভ্যাস করিতে করিতে এক সময় আসিবে যখন আমার সকল চিন্তা, ভাবনা, কর্ম 'তুমিময়' হইয়া যাইবে। একমাত্র তুমিই আছ, তুমিই আমাকে সকল কর্মে প্রণোদিত করিতেছ, তুমিই আমার মধ্যে থাকিয়া সকল ভাবনা-চিন্তার উদয় কবাইতেছ। এইভাবে দেহে-মনে-কর্মে 'আমি' যখন 'তুমিময়' হইয়া যাইবে তখন আর আমিত্ববোধ থাকিবে না— সকল অহংকারের নিবৃত্তি হইয়া এক পরমা প্রশান্তির অনুভব হইতে থাকিবে। সে এক নূতন জীবন, সেখানে মায়ার প্রভাবে চিত্ত আর বিক্ষিপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেছে না, সমগ্র চিত্ত ব্যাপিয়া শুধু অবিচল শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই নব জীবনে প্রতিভাত হইবে, তুমিই সর্ব ঘটে সর্ব জীবে বিরাজিত রহিয়াছ। তখন পৃথিবীর সকলকে আত্মীয় মনে হইবে, আপনজন হিসাবে সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বোধ জাগরিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমার যাবতীয় কর্ম অহং-স্পর্দ্ধায মলিন না হইয়া পরমেশ্বরেই সমর্পিত হওয়ায কর্ম আর বন্ধন হইযা আমাকে বাঁধিতে পারিবে না বা বীজরূপে মহাকালের গর্ভে সঞ্চিত হইবে না। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যষি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।।
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাং উপৈষ্যসি।।"

(৯ম অঃ ২৭/২৮)

তুমিই আমাকে সর্বক্ষণ সর্বকর্মে প্রেরিত করিতেছ—প্রথম হইতে যিনি এই

উচ্চ ভাব-কোটিতে অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন না, তাঁহার জন্যও শ্রীভগবান বলিযাছেন,"কর্মণ্যেবাধিকাবস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (২য অঃ ৪৭) অর্থাৎ 'আমি করিতেছি'---এই মনোভাব যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পার তো ক্ষতি নাই। অহং-অভিমানে কর্ম করিবার অধিকাব ভগবান্ তোমাকে দিতেছেন, কিন্তু তোমাব ভালমন্দ সকল কর্মের শুভাশুভ ফল নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া তাঁহাতে অর্পণ কব। এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিরাসক্ত চিত্তে কর্ম করিলে কর্মফল মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না বা কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহাকেই বলে কর্মশুদ্ধি। কর্মশুদ্ধি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে যখন চিত্ত পরিপূর্ণ মল-শূন্য হইযা পড়ে তখন উহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছতা শুভ্রতা লাভ করে। এবং চিত্তের যতই মলিনতা দূর হইতে থাকে, ততই আত্মজ্যোতি যাহা বিশুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ, তাহাতে প্রতিফলিত হইতে থাকে। পূর্ণ প্রতিফলন যখন হয় তখন প্রজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সেই প্রজ্ঞাগ্নিতে প্রাক্তন কর্মবীজ যাহা মানুষের ভবিষ্যৎ জন্ম নিয়ন্ত্রিত করে, ভস্মীভূত হইয়া যায। ফলে পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রশ্নই আব উঠিতে পারে না। এই মানুষের সংসারে থাকিয়া জীবিত অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত হইয়া যায। যে প্রারব্ধ কর্মফলের দ্বারা তাহার বর্তমান জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, তাহার ভোগকাল পূর্ণ না হওযা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিযা সংসাব-ধর্ম পালন করিলেও কোন কর্মই আর তাহাব বন্ধনের কারণ হয় না। সংসারে থাকিয়াই ঐরূপ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগ অভ্যাসের দ্বারা পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা সুরু হয়। পরমেশ্বরের পরমধামে গিযা পৌঁছাইবার জন্য তখন হইতেই প্রকৃত 'যোগে'র আরম্ভ হয়।

এইবাব আমরা পূজনীয ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়েব অনুসরণে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকাব যোগ ও যোগপন্থা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বিভিন্ন প্রকার যোগ

(ক)

যোগ বলিতে সাধারণতঃ পাতঞ্জল যোগদর্শনকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই বহু প্রকাব যোগের দর্শন এবং সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালেব ষডঙ্গ যোগ, সাংখ্য যোগ, শৈবাগম যোগ, শাক্ত বা তান্ত্রিক যোগ, মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত যোগ, হীনযান বৌদ্ধদের যোগ, মহাযানী সম্প্রদায়ের-বিজ্ঞানবাদীদের এবং শূন্যবাদীদেব অনুমোদিত যোগ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার যোগ-সাধনার প্রণালী এবং তদনুরূপ যোগবিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে।

সাংখ্য যোগ—প্রথমেই উল্লেখ কবিতে হয় সাংখ্য যোগের কথা। সাংখ্যশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক আচার্য কপিল মুনি। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয পাতঞ্জল যোগের কথাই বেশী করিয়া বলিযাছেন, এবং আমরা যে কয়জন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইযা যাইতাম, তিনি আমাদিগের সেই কয়জনকে পাতঞ্জল যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এমন কি, কাশ্মীর শৈবদর্শন বুঝাইবার জন্য তাহার প্রস্তুতি হিসাবে পাতঞ্জল যোগের 'সমাধিপাদে'র প্রতিটি শ্লোক ধরিয়া ধবিযা প্রথমে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য যোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। অন্যান্য যোগের কথা বলিতে গিয়া তিনি বিক্ষিপ্তভাবে ইতঃস্ততঃ সাংখ্য যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করেন নাই। 'বিভিন্ন প্রকার যোগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়া যদি সাংখ্য যোগকে বাদ দিই, তাহা হইলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই আমি আমার জ্ঞানগম্যমত নিম্নে সাংখ্য যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলাম।

সাংখ্যের মতে পুরুষ অনাদি এবং অসংখ্য। অনাদিকাল হইতে পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইযা বিষয়সুখে লিপ্ত হইয়া জন্মজন্মান্তর অনন্ত দুঃখ ভোগ করে। লৌকিক উপাযে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। যাহা হয় তাহা ক্ষণিক। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। কারণ, মানুষ নিরন্তর দুঃখ পাইলেও দুঃখের স্বরূপ ও অবস্থান জানে না এবং

উহার নিরোধের প্রকৃত উপাযও তাহার অজানা। যে উপায়ে দুঃখমূল নষ্ট হয় সাংখ্যকার কপিল মুনি তাহাব নির্দেশ দিয়াছেন। সে উপায় হইল 'তত্ত্বজ্ঞান'। 'আমি' বলিতে মহৎ-অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কোনটি 'আমি' নহি এবং ঐ সকল আমার নহে। 'আমি' ঐ সকল হইতে ভিন্ন কেবল চিৎস্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানেব নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হওয়া আবশ্যক। আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যখনই পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তখনই পুরুষ আপন চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইযা কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে।

অতএব বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই সর্বদুঃখবিধ্বংসের বা মুক্তির উপায়। সাংখ্য শাস্ত্রে ইহা তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা (পুরুষ) ও প্রকৃতি—উভযের প্রকৃত রূপ বা তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস।

অতএব আত্মা ও প্রকৃতি উভয়ই বিচার্য। সাংখ্যমতে প্রকৃতির মূলতত্ত্ব চতুর্বিংশতি। তদ্ভিন্ন আত্মতত্ত্ব এক। সব মিলিযে পঁচিশ তত্ত্ব।

তরঙ্গের ন্যায় সর্বদাই মানুষের অন্তবে লৌকিক জ্ঞানের প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে। 'সর্বং জ্ঞানং সবিষযং'—জ্ঞানমাত্রেই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। জ্ঞানমাত্রেরই যেমন কোন না কোন বিষয় আছে, সেইরূপ বিষয়-মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই, বিষয় আছে জ্ঞান নাই—এইরূপ হয় না। শব্দ ও অর্থের যেমন অবিনাভ সম্বন্ধ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ।

সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর সমুত্থিত নানাবিধ জ্ঞানের কোনটি যথার্থ বা সত্য জ্ঞান এবং কোনটি অযথার্থ বা মিথ্যা জ্ঞান, তাহা চিনিতে হইবে।

অহংবুদ্ধি—সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির মূল অহংভাব। সমুদায় বুদ্ধি অহং-এর পরিণাম। কেন না, এ জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় সেই সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে 'আমি', 'আমার' এই প্রকার অহংভাব অনুস্যূত থাকে। শাস্ত্রকারেরা 'অ' এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বা মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। 'অ' যেমন সমুদায় বর্ণের বীজ, সেইরূপ অহংতত্ত্বও প্রত্যেক বিভিন্ন জ্ঞানের বীজ। সর্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উপাদান বা মূল কারণ ইন্দ্রিয। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানমাত্রই অহংভাব সম্পৃক্ত।

স্মৃতি—যে কোন প্রকারেই হউক, একবার কোন বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ অন্তঃকরণে একটা বস্তুর ছাপ লাগিলে তাহার সংস্কার অন্তঃকরণে চিরকালই থাকে। বৃক্ষের জ্ঞান একবার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইলে বৃক্ষের

অভাব হইলেও, চক্ষু নিমীলিত করিলেও, প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও, দ্রষ্টা কালান্তরে দেশান্তরে অবস্থিত হইলেও, পূর্বদৃষ্ট বৃক্ষের স্বরূপ বা আকার সংস্কারবলে সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'স্মৃতি'। স্মৃতি সংস্কারবলেই উদিত হয়। আত্মাকে জানিয়া মুক্তি লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রকার সংস্কার হইতে নির্মুক্ত হইতে হইবে অর্থাৎ স্মৃতি পরিশুদ্ধ করিতে হইবে।

ভ্রম—এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নাম ভ্রম। ইহাকে দর্শনশাস্ত্রে মিথ্যাজ্ঞান, বিপর্যয় জ্ঞান, অজ্ঞান, অবিদ্যা ও অবিবেক বলে। সাংখ্য ও বেদান্তের মতে ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম মিথ্যা, কিন্তু ভ্রম হইতে যে ভয়, হৃৎকম্পন জাগে তাহা সত্য। ভ্রম মাত্রেই অসৎ বস্তু। এই ভ্রম আবার সোপাধিক হইতে পারে। যদি এক বস্তুর গুণ বা ধর্ম অন্য বস্তুতে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্য বস্তুতে সংক্রান্ত হয় তাহাকে 'উপাধি' বলে। যে স্থলে উক্তপ্রকার উপাধির সংসর্গে একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার রূপে প্রতীত হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম উৎপন্ন হয়। যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ, কিন্তু যখন কোন লাল বা পীত বর্ণের পদার্থের সন্নিধানে আসে তখন তাহা লাল বা পীত বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রতীতিই সোপাধিক ভ্রম। ঐ আরোপিত বর্ণই উপাধি। আমাদের লৌকিক জ্ঞান এইরূপ শত শত ভ্রম বা প্রমাদে বেষ্টিত।

সংস্কার—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বা 'শুক্তিতে রজতভ্রম' বলিতে সর্প বা রৌপ্য জ্ঞানের সংস্কার পূর্বেই জন্মিয়াছে। এখানে রজ্জু বা শুক্তি রূপ সদৃশ বস্তুতে পূর্ব স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় এই ভ্রম উৎপন্ন হয়। শঙ্করাচার্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। সাংখ্য মতে ভ্রমের উৎপত্তির কারণ অধ্যাস। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহাই মনে করা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। দেহেতেই আত্মবোধ স্থাপনের নাম দেহাত্মাধ্যাস। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীব 'আমি গেলাম, আমি মরিলাম' বলিয়া কাতর হয়—ইহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। এইরূপে দেহেতে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি কৃশ, আমি স্থূল' ইত্যাদি বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ যাহা আমি, তাহা স্থূলও নহে বা কৃশও নহে। স্থূলত্ব, কৃশত্ব দেহের ধর্ম—আত্মধর্ম নয়।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি? সাংখ্যদর্শনে বলে, যে-অধিষ্ঠানে ভ্রম হয় তাহার যথার্থরূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ অধিষ্ঠানের স্বরূপ জ্ঞানই ভ্রম নিবৃত্তির উপায় এবং যথার্থ জ্ঞানের উদয়।

আমাদের অধ্যাস ভ্রম দূর করিবার জন্য সাংখ্যে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে। অনাদি কালের অধ্যাস ভ্রম বিদূরিত করিতে হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিন শ্রেণীর জ্ঞান আবশ্যক। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ঐ জাতীয় জ্ঞান উদ্‌পাদনের সহায়ক। নিদিধ্যাসনটি প্রত্যক্ষ শ্রেণীভুক্ত। আত্মা ঐরূপ সাধন-সংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন মালিন্যমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ শুদ্ধ নির্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে। অর্থাৎ তখনই আত্মার অনধ্যস্ত রূপ দর্শন হয় বা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

চক্ষু হইতে ঘ্রাণ পর্যন্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় বাহ্য জ্ঞানের জনক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়। মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান জন্মায়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাত্রেই বৃত্তি নামে অভিহিত। সাংখ্য মতে জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণনিষ্ঠ। যাহা মুখ্য জ্ঞান তাহা ঐ মতে চিদাত্মা। তাহার উৎপত্তি, বিনাশ ও কোন প্রকার বিকার নাই।

সাংখ্য মতে মনও ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইহা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মিকা বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার----এই তিনটি অন্তঃকরণ নামে পরিচিত। যাহা অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান-ক্রিয়া নির্বাহ করে, তাহাই অন্তঃকরণ। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু ব্যাপার, সমস্তই অন্তঃকরণের মহিমা। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটি অন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য সমাধা করে, সুতরাং তিনটিই অন্তঃকরণ। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এই দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এই তিন অন্তরিন্দ্রিয় মিলিয়া সাংখ্যমতে মোট ১৩টি ইন্দ্রিয়।

প্রাতিভ জ্ঞান—সাংখ্যমতে জগতের যাবতীয় দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টির মূলে দুইজন---প্রকৃতি ও পুরুষ। তথাপি সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতির। পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষই স্বরূপবিস্মৃত জীব---ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। অজ্ঞ জীব প্রকৃতির কর্তৃত্বে কর্তা সাজিয়াছেন। প্রকৃত কর্ত্রী হইলেন প্রকৃতি। সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানই যোগ। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না। সেই কারণে আত্মা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের গ্রাহ্য না হইয়া প্রাতিভ জ্ঞানের গ্রাহ্য হন। প্রাতিভ জ্ঞান সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশে আবির্ভূত হয়।

বুদ্ধির বিশেষ উন্মেষ দেখিলে তাহাকে আমরা 'প্রতিভা' বলি। প্রতিভার চরমোৎকর্ষতাই প্রাতিভ জ্ঞান। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ বা তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি যৌক্তিক বা আপ্তবাক্যজন্য ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে নিরন্তর ধ্যান-ধারণার অনুশীলন করিতে করিতে প্রাতিভ জ্ঞান সহসা প্রাদুর্ভূত হয়। পরিমার্জনে নির্মল ও

মসৃণ হইলে কাচ যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ ধ্যানে ও একাগ্রতা সাধনে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্মলীকৃত শুদ্ধ সত্ত্ব চিত্তে কোন এক সময়ে প্রাতিভ-জ্ঞান হঠাৎ আলোর ঝলকানির ন্যায় উদিত হয়। পুনঃ পুনঃ আধ্যাত্মিক চিন্তা, মনন ও নিদিধ্যাসন চিত্ত পরিমার্জনার কার্য করে। পুনঃ পুনঃ পরিমার্জনে বুদ্ধির অজ্ঞান-আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্ব একান্ত নির্মল হয়। সত্ত্ব নির্মল হইলেই সর্বভাসক প্রাতিভ জ্ঞান শুদ্ধ চিত্তে সহসা উন্মিষিত হয়। ইহাই যোগীদের যোগজ প্রত্যক্ষ। প্রাচীন যোগী পতঞ্জলি মুনি "প্রাতিভাৎ বা সর্বম্ বিজানাতি যোগী"- এই সূত্রে প্রাতিভ জ্ঞানের প্রভাব বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি—সাংখ্যমতে জগতের মূলতত্ত্ব বা উপাদান হইল দুইটি—প্রকৃতি আর পুরুষ। তাত্ত্বিক প্রমেয় (প্রমাণের বিষয়ীভূত তত্ত্ব) পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যথা—প্রকৃতি **এক**—ইহাই মূল প্রকৃতি; প্রকৃতি-বিকৃতি **সাত**—মহৎ, অহঙ্কার আর পাঁচ তন্মাত্রা; কেবল বিকৃতি **ষোল**—একাদশ ইন্দ্রিয় এবং স্থূল পাঁচ ভূত; আত্মা **এক**—ইহাকে নির্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বলা হইয়াছে। জগৎ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে রচিত। সেশ্বর সাংখ্য বলে, ইহা ছাড়া আছে ঈশ্বর তত্ত্ব—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট ঈশ্বরঃ"। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখাদি ক্লেশ বিবর্জিত এবং কর্মজনিত পাপপুণ্যে অলিপ্ত অথচ সমস্ত জগতের নিয়ন্তা এমন এক নিত্য তত্ত্ব আছে যাহাকে ঈশ্বর বলা হয়। ইহা বৈদান্তিকের মায়াকবলিত ব্রহ্মের সহিত তুলনীয়।

সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, কার্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া জগতের মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম 'নিমিত্ত' কারণ, অন্য প্রকারের নাম 'উপাদান' কারণ। এই মতে জগতের উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম বীজরূপে অব্যক্ত ছিল, তাহা অভিব্যক্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর তাহারই ব্যক্তাবস্থা জগৎ।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রান্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চ বিংশতির্গণঃ" (সাংখ্য সূত্র)। অর্থাৎ সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। যখন ঐ ত্রিবিধ গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া যে কোন একটি গুণের প্রাধান্য ঘটে এবং অন্য দুই গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে তখন প্রকৃতির পরিণাম হইতে আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হইতে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহৎতত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে স্থূল পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। পুরুষ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব

হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব। সাংখ্যমতের এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ অপরিণামী, গুণাতীত, সাক্ষী বা দ্রষ্টা, কোন কার্যের কর্তা বা ভোক্তা নহেন। পুরুষের সান্নিধ্যে কিম্বা তাঁহার দ্বারা মূল প্রকৃতি ইক্ষিত হইলে প্রকৃতির গুণসাম্য ভঙ্গ হইয়া যায এবং প্রকৃতি বিকৃতি-ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি তত্ত্ব উৎপন্ন করে। অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বিকৃত হইয়া প্রথমে মহৎ তত্ত্বরূপ পরিণাম হয়। এই মহৎতত্ত্ব অহংতত্ত্বের কারণ, আর অহংতত্ত্ব মহৎতত্ত্বের পরিণামরূপ কার্য। অহংতত্ত্ব পঞ্চ তন্মাত্রার কাবণ, আর পঞ্চ তন্মাত্রা অহংতত্ত্বের পরিণাম রূপ কার্য। এইজন্য ইহারা সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি। এই সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোড়শ প্রকার কেবল-বিকৃতি উৎপন্ন হয়।

তন্মাত্রা—বৈশেষিক দর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, মনে হয় তাহাই সাংখ্যদর্শনের তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা স্থূল পঞ্চভূতের ও ভৌতিক জগতের উপাদান কারণ। অতি সূক্ষ্ম বস্তুর নাম পরমাণু। পুঞ্জীভূত পরমাণু স্থূল পদার্থের উৎপত্তি করে। সেইজন্য পরমাণু বা তন্মাত্রা সূক্ষ্মভূত নামে অভিহিত হয। সাংখ্যের মত এই যে, তন্মাত্রা আমাদের অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু যোগীদিগের প্রত্যক্ষ।

ইহ জগতে যা কিছু আছে সমস্তই মানবেন্দ্রিয়ের ভোগ্য। কারণ, যাহা আছে তাহা কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সংস্রবে মানবীয় জ্ঞানের বিষয় হয়। মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; যথা—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হইল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুব গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ।

প্রকৃতি পরিণামশীলা। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দ্বিবিধ—এক, সদৃশ পরিণাম এবং দ্বিতীয় বিসদৃশ পরিণাম। সত্ত্বঃ সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা হয়। যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয অর্থাৎ সত্ত্ব প্রধান হইয়া রজঃ বা তমঃ গুণের বা রজের কিছু অংশ ও তমের কিছু অংশের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ঐরূপ রজঃ বা তমঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে মিশ্রিত হয় (মিশ্রণের পরিমাণগত বৈচিত্র্য অনন্ত), তখনই জগৎ রচনার সূচনা হয়।

প্রকৃতি জড, অচেতন ও ইচ্ছাশক্তি রহিত, অথচ জগতের নির্মাণকর্ত্রী। প্রশ্ন হইল, এমন নিয়মযুক্ত সুশৃঙ্খল জগতের নির্মাণ কি ইচ্ছা-জ্ঞানাদি শক্তিশূন্য জড়স্বভাবা প্রকৃতির দ্বারা সম্ভব? জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতি জগতের কর্ত্রী হইলে এত দিন ইহা বিশৃঙ্খল হইয়া উচ্ছন্নে যাইত। অতএব নিয়মের পারিপাট্য দেখিযা মানিতে হয় যে অবাধ ইচ্ছাশক্তিযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন সর্বশক্তিমান্ কোন

এক কর্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিযামক আছেন। তিনিই প্রকৃতির দ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিযাছেন এবং স্থিতি ও লয় বিধান করিতেছেন।

সাংখ্যকার কপিল মুনি বলেন—না। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয বলিয়া বোধ হয না। প্রকৃতিকে পরিণামিত করিবার জন্য সর্বশক্তিমান্ কোন এক পৃথক বিশিষ্ট পুরুষকে স্বীকার করিবার যৌক্তিকতা নাই। তাঁহার মতে পুরুষ অনাদি এবং অসংখ্য। এই অনাদি অনন্ত পুরুষগণই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এবং প্রকৃতির নিজ শক্তিই তাহার পরিণামের প্রযোজক। সান্নিধ্যবশতই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়স্বভাব অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র চুম্বকের আকর্ষণে লৌহশরীরে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও এবং প্রকৃতি জড় হইলেও সন্নিধানের বলে প্রকৃতি-শরীরে পরিণাম শক্তির উদয হইযা থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক। কেন না, নিযমিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধি ভিন্ন তাল-রসে পরিণাম হয় না। সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিযাছেন, "সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ"। মেঘ হইতে পৃথিবীতে জল বর্ষিত হইয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যে জল আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার রস হইল, নারিকেলবৃক্ষ যে জল আকর্ষণ করিল তাহা অন্য রস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে কটু, তিক্ত, কষায, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রযের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের প্রাবল্য হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্বল গুণগুলি আপনা হইতে বিকৃত হইযা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা অকল্পনীয়।

মহৎতত্ত্ব হইল বুদ্ধি এবং অহংতত্ত্ব হইল বুদ্ধির বিকার। স্থূল জগতের মূল পঞ্চভূত। পঞ্চভূতের মূল পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের উপাদান অহংতত্ত্ব। অহং তত্ত্বের মূলে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের মূলে অব্যাক্তা প্রকৃতি যাহাতে জগৎ-বীজ সংলগ্ন থাকে। প্রকৃতি এই জড় জগতের বীজ, অর্থাৎ যাহা এই জগতের সূক্ষ্ম বীজ তাহাই প্রকৃতি। যাহা তাহার বিকার বা পরিণাম তাহা জগৎ।

প্রকৃতির আবেশে জীবাত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। জীবমাত্রেরই 'অহং' এই অভিমান আছে। অহং-অভিমানের পশ্চাতে বুদ্ধি ক্রিয়া করে। বুদ্ধিতত্ত্ব

ও মহত্তত্ত্ব একই জিনিস এবং মহত্তত্ত্বই বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির বীজ। প্রকৃতি এই জড় জগতের বীজ। কিন্তু সংসারী আত্মার জ্ঞান ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। কারণ, আত্মা এখন সংসারী, স্বরূপে অবস্থিত নহে। প্রকৃতির আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কাল কাটাইতেছে। আত্মা যখন অসংসারী অবস্থায় স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, কেবল ও চিৎস্বরূপ। আত্মা ও জগৎ—এই দুই তত্ত্বের যাথার্থ্য অনুভব করাইয়া বিবেক জ্ঞান জন্মানই সাংখ্যকারের উদ্দেশ্য।

সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ গুণের মিশ্রিত প্রভাব মানব-চিত্তের উপর দৃঢ়মূল হইয়া আছে। সত্ত্বের গুণ প্রকাশ। সত্ত্ব উৎকর্ষতা লাভ করিলে চিত্ত স্বচ্ছ হয়, প্রকাশাত্মক হয় যাহার দ্বারা স্বরূপ জ্ঞানের আবরণ (অজ্ঞান) নষ্ট হয়। রজঃ গুণের দ্বারা উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্যোন্মুখতা জন্মায়। মন যে চঞ্চল হয়, বিক্ষিপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়—তাহা রজঃ গুণের প্রভাবে হয়। তমঃ গুণ মোহরূপী। বুদ্ধিভ্রংশ করা মোহের ধর্ম। আবরণ, অন্ধকার, অজ্ঞান—এই তমোগুণের ধর্ম। ইহা প্রকাশকে প্রকাশ হইতে দেয় না, অভিভূত করিয়া রাখে।

সত্ত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রজঃ তাহাদিগের পরিচালিত করে। রজঃ পরিচালক সত্য, কিন্তু তমঃ উহার গুরুভারের দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে। অর্থাৎ রজঃ গুণ তমোগুণের দ্বারা নিয়মিত হইয়া সত্ত্বকে এবং তমোকে পরিচালনা করে। সত্ত্বের পরিচালনা হয় ঊর্ধ্ব দিকে, আর তমের পরিচালনা হয় নিম্ন দিকে।

সত্ত্বাদি তিন গুণ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে সত্ত্ব বা রজঃ নাই, সত্ত্ব আছে রজঃ বা তমঃ নাই, এরূপ হয় না। কিন্তু ইহারা সমভাবে থাকে না—অল্পাধিক প্রবল বা ন্যূন পরিমাণে থাকে। সত্ত্ব প্রবল হইলে রজঃ ও তমঃ যথাসম্ভব অভিভূত থাকে। তমঃ প্রবল হইলে তাহা রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করে। তমোকে যথাসাধ্য ক্ষীণ করিয়া রজঃগুণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্থাপন করা সাধকের প্রাথমিক কাজ। বিষয়-নিরপেক্ষ সত্ত্বপরিণামজনিত শুদ্ধ চিত্ত এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে। সমাধি অবস্থায় এই প্রকার নির্লিপ্ত আনন্দের অনুভব হয়। কারণ অন্তঃকরণনিষ্ঠ সত্ত্বাংশ এক প্রকার আনন্দাকার বৃত্তি (যাহা সত্ত্বগুণান্বিত মনেরই বৃত্তি) প্রসব করে। এই যে আনন্দ—ইহা শুদ্ধ সত্ত্ব চিত্তের ধর্ম, আত্মার নহে—ইহাই সাংখ্যমত।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহত্তত্ত্ব। ইহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে অশরীরী আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম স্ফুরিত হয়। কথিত আছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, পূর্বে

গুণত্রয়ের সাম্যভঙ্গে সর্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। তাই সত্ত্বগুণ সর্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহত্তত্ত্ব বলিতে নির্মল বিকাশ বুঝায়। মহত্তত্ত্ব হইল বুদ্ধির বীজ। বুদ্ধির এক পরিণাম 'মনন', অপর পরিণাম 'অহং-অভিমান'। পূর্ণজ্ঞানের (বুদ্ধির) বিকাশই সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক পূর্ণজ্ঞান মানবদেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে।

বিশুদ্ধ বুদ্ধিই (জ্ঞান) মহত্তত্ত্ব। প্রথমে 'কেবল' চিৎ পুরুষ ছিলেন। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিৎ-পুরুষের অনুরঞ্জনা ব্যতীত অন্য কোন পরিচ্ছেদক না থাকায় তাহা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই সূক্ষ্ম স্থূল বিকার বা পরিণাম হইয়াছে ততই বুদ্ধি (জ্ঞান) বিষয়-পরিচ্ছিন্ন ও মলিন হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম বিকার বা পরিণাম তাহার সাঙ্কেতিক নাম মহত্তত্ত্ব, তাহাই জগৎ-বীজ। সৃষ্টির আরম্ভ ও মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি সমান কথা। জ্ঞেয় না থাকিতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্তত্ত্বের অপর লক্ষণ। জ্ঞেয় না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ — এই বিষয়টি অনুভব করিতে হইবে।

এ জগৎ আগে প্রকৃতিলীন ছিল। প্রকৃতিলীন থাকাই লয় বা প্রলয়। প্রলয়কে প্রগাঢ় সুষুপ্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র চক্ষু উন্মীলিত হইলে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া আলোর প্রকাশ দেখা যায়। সেইরূপ প্রলয়রূপ জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর স্বরূপ) সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

দ্বিতীয় পরিণাম—অহংতত্ত্ব। পূর্বেই বলিয়াছি বুদ্ধির এক পরিণাম 'অহং-অভিমান'। অহং-অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। অহং-এর প্রধান লক্ষ্য আত্মার জীবভাব। অহং-অভিমানই জীবাত্মার স্বরূপ।

যে বস্তু জন্মে তাহারই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন ও বিনাশ আছে—ইহাই বস্তুর পরিণাম বা বিকার ধর্ম। সাংখ্য বলে মনও ভাববিকারগ্রস্ত। সাংখ্যমতে আত্মা ব্যতীত নির্বিকার পদার্থ জগতে নাই। মনের সহিত আত্মার নিকট সম্বন্ধ। মন ও আত্মা পরস্পর পৃথক। সাংখ্য মতে মন অনিত্য। তাই বলিয়া মন অন্য পদার্থের ন্যায় ক্ষণবিনাশী নয়। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইহা থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত উহার স্থায়িত্ব থাকে। কারণ, মন সাক্ষাৎ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেকের হৃদয়াকাশে বিরাজ করে। মানুষ মনের দ্বারা যা কিছু ধ্যান বা চিন্তা করে সেই সমস্ত ধ্যেয় বস্তু হৃদয়াকাশেই প্রতিবিম্বিত হয়।

আত্মা—আত্মা চক্ষুর অগোচর ও মনের অগম্য বলিয়া প্রবাদ আছে। অথচ আত্মা প্রত্যেকেরই ভিতর যে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আত্মা আছে এবং তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে। পরন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। 'আমি আছি' এইমাত্র জ্ঞান আছে, কিন্তু 'আমি কি? আমার স্বরূপ কি?' তাহা কাহারও বিদিত নাই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে আসক্ত-স্বভাব হওয়াতেই সাধারণ মানুষ যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত। ভ্রমবশতঃ মানুষ স্থূল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া 'আমি কৃশ, আমি স্থূল', 'আমি গেলাম, আমি মরিলাম' বলিযা চীৎকার করে। পুত্র, কলত্র, বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মমত্ব আরোপ করিয়া আমার আমার বলিয়া ব্যাকুল হয়। কারণ, মানুষ আপনাকে চিনে না। চিনিলে ঐরূপ করিত না। পুরাকালের লোকেরা আত্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া যাঁহারা আত্মবিদ্, সেই সমস্ত যোগী ঋষি অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপনীত হইতেন। পরে ব্রহ্মচর্যের ও প্রবল আত্মানুসন্ধানের বলে গুরুর উপদেশ-কৌশলে তাঁহারা অনারোপিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

আত্মা অজ্ঞানে সর্বদাই আবৃত। সেই কারণে অযোগী, অব্রহ্মচারী ও অবিবেকী পুরুষের নিকট "গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে" অর্থাৎ আত্মা প্রকাশিত হয় না। "নাযমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"—আত্মাকে তর্কে-বিতর্কে, বাগবিতণ্ডায় পাওয়া যায় না। আত্মা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এ সকলের অতিরিক্ত। আত্মার সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় ধ্যান। ধ্যানের আলম্বন আপ্তবাক্য। শিষ্য আত্মবিদ্ গুরুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া অনুকূল তর্কে বিঘ্ন দূর করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে বিপরীত ভাবনাদি হইতে বিচ্যুত করিযা ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ার পরে প্রাতিভ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা দ্বারা আপনাব স্বরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয়।

স্থূল শরীর, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়—এ সকল আত্মা নহে সত্য; কিন্তু মন যে আত্মা নহে তাহাব প্রমাণ কি? জ্ঞান, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি যাবতীয় চেতন ধর্ম মনেই উদিত হয়। মন কখন নিবৃত্ত থাকে না। স্বপ্ন, স্মৃতি ও অনুধ্যানাদি কার্যে মন ব্যাপৃত থাকে। মন যদি বিলীন হয় বা ধ্বংস হয, তাহা হইলে সমুদায় ব্যবহারিক জগৎই লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়—মনই বুঝি আত্মা, আত্মা তদতিরিক্ত নহে। এ-স্থলে ঋষিরা বলেন, মন আত্মা নহে। মন জড়বস্তু, অচিৎ। আত্মা শবীরে চৈতন্য নামে বিকশিত হয়। শবীরস্থ চিৎশক্তি যখন লুপ্ত হয় তখন জ্ঞান থাকে না, ইচ্ছা থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয় থাকে না, শরীরে তাপ থাকে না, বল থাকে না, বীয থাকে না, কিছুই থাকে না। দেহ পচিতে আরম্ভ হয়। ঋষিরা ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা প্রজ্ঞা উৎপন্ন করিয়া জানিয়াছিলেন—আত্মা নিত্য, শুদ্ধ স্বভাব ও চিৎস্বরূপ। মন সক্রিয় ও সবিকার, কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। কোনও কালে বা কোনো অবস্থায় আত্মার বিকার হয় না। আত্মা মনের ক্রিয়ার দর্শক বা সাক্ষী মাত্র। আত্মার সহিত

মনের দ্রষ্টৃদৃশ্যসম্বন্ধ। আত্মা দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। চৈতন্যই প্রকৃত 'আমি' এবং তদনুসারে 'আমার' নাম আত্মা।

আত্মা চৈতন্যরূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ। আত্মার এই প্রকাশ স্বভাব কোনও সময়ে তিরোহিত হয় না। মন যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, তখনও চৈতন্যরূপী আত্মা প্রকাশিত থাকে। আত্মা তখন দেখে মন গাঢ় নিদ্রায় তমসাচ্ছন্ন। আত্মা তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখে বলিয়াই সুপ্তিভঙ্গের পর মানুষ কি গভীর ঘুম ঘুমাইয়াছে তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে চৈতন্যরূপী আত্মা অপরিণামী, মনের অতিরিক্ত নিত্য বস্তু।

সাংখ্যমতে চিদাত্মা অসংখ্য। এবং প্রতি শরীরে আত্মা বিভিন্ন। এইরূপ জীবভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মা বিরাজ করিতেছে। এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল সাংখ্যের সহিত একমত। বৈদান্তিক বলেন—আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা অণুরূপে বা বৈষ্ণবদের ভাষায় 'চিৎকণ'রূপে প্রত্যেক শরীরে প্রকাশিত। এক টুকরা স্বর্ণখণ্ডের যে গুণ, এক তাল স্বর্ণেরও সেই গুণ। গুণধর্মে একটুকরা স্বর্ণ একতাল স্বর্ণের সমান। সেইরূপ অণু আত্মারও যে ধর্ম, পরব্রহ্মেরও সেই ধর্ম—উভয়ের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নাই। সেইজন্য পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছে—"অনুরোঽপি অণীয়ান্, মহতোঽপি মহীয়ান্"—তিনি অণু হইতেও অণীয়ান্ আবার মহৎ হইতেও মহীয়ান্। পরব্রহ্মের এই স্বরূপ অধ্যাত্ম অনুভূতি গোচর। যাহা বলিতেছিলাম—বেদান্তে জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে অণু হইয়া নানা দেহে ভেদ-প্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

সাংখ্যকার কপিল নিরীশ্বরবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু পতঞ্জলি সেশ্বরবাদী। ঈশ্বরলক্ষণ বুঝাইতে পতঞ্জলি একটি সূত্রে বলিয়াছেন—

"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম যাহাতে নাই বা ঐ সকল যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বরপদবাচ্য।

সাংখ্যের মুক্তি—সাংখ্যমতে জীবাত্মাতে যে সুখদুঃখ-মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহা তিরোহিত হইলেই জীবাত্মার মুক্তি হয়। মহর্ষি কপিল গ্রন্থশেষে সেই কথাই বলিয়াছেন—"তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড় সম্বন্ধ রহিত হইয়া 'কেবল আত্মা' হওয়াই সাংখ্যমতের মুক্তি।

মুক্ত হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা

অনুভবগম্য করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তটি সুষুপ্তির। সুষুপ্তিকালে জীবের যেমন প্রাকৃতিক সুখদুঃখের বোধ থাকে না, মুক্তিকালেও ঐরূপ কোন বোধ থাকে না। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিকালে আত্মা তমসাবৃত থাকে, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না। সুষুপ্তির ভঙ্গে জাগ্রদাবস্থা। জাগ্রত্ হইলে আবার সুখদুঃখের অনুভব হয়, পরন্তু মুক্তি হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সুখদুঃখবর্জিত হওয়াই সাংখ্যের মুক্তি—ইহা দেহ থাকিতে হয় না, দেহপাতের পর মুক্তি নিষ্পন্ন হয়। দেহ থাকা অবস্থায় বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হয় বটে, কিন্তু তাহার আভাস বা সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে। যে সংস্কার দেহপাতের পর বিলুপ্ত হইয়া যায়। অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মা তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়- ইহা 'কেবলী' অবস্থা। কৈবল্যপ্রাপ্ত আত্মা ত্রিগুণের অতীত। বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আত্মার 'প্রকৃতি' দর্শন হয়, আত্মা তখন প্রকৃতির কোন গুণে কলুষিত হয় না। অর্থাৎ মুক্ত আত্মা দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাসীন থাকে, প্রকৃতিতে লিপ্ত হয় না। সাংখ্যের ঐরূপ 'কৈবল্য' হীনযান বুদ্ধের 'নির্বাণের' সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বেদান্তের মুক্তির ধারণার সঙ্গে ইহার কিছু পার্থক্য আছে। বেদান্তমতে আত্মা এক এবং উহার স্বরূপ স্বভাবতই আনন্দময়, সুতরাং জীবাত্মা মুক্ত হইলে নির্বিকার, নির্বিকল্প ও আনন্দঘন আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত অভেদে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে।

"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষমিতি"— এই পুরুষ বা আত্মা মূল প্রকৃতির যাবতীয় পরিণামের সহিত পরিণামী নহে। কারণ, তিনি অসঙ্গ। পুরুষ স্বরূপতত্ত্বে অসঙ্গ হইয়াও যখন প্রকৃতির সংসর্গে আসেন, তখন "কুসুমবচ্চ মণি"—যেমন শুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ মণি রক্তবর্ণ কুসুম সংযোগে অরুণ বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ধর্মে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানী হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হন। আর প্রকৃতিও ক্ষোভিতা হইয়া অর্থাৎ গুণসাম্য হারাইয়া জগৎ প্রসব করেন। এইরূপ পরস্পর ধর্মে পরস্পরের উপরাগ হওয়ার নাম ধর্মাধ্যাস। "উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎ-সান্নিধ্যাচ্চিত্ত সান্নিধ্যাৎ" (কপিল সূত্র)—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা রূপ মূল প্রকৃতির সহিত উপরাগ বশতঃ পুরুষের কর্তৃত্ব জ্ঞান অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই মহত্তত্ত্বই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টির প্রজ্ঞাস্বরূপ! ক্রমে তাহা হইতে অহংভাবের উদয় হয়। এই মহত্তত্ত্বই চৈতন্যস্ফুরণের আধার, অর্থাৎ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণের আদর্শ দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণ অতিশয় স্বচ্ছ। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ। প্রকৃতির সেই শুদ্ধাংশে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া মহান্ বুদ্ধির ও অহংজ্ঞানের উদয় হয়। প্রকৃতির মলিনাংশে অর্থাৎ সাম্যভঙ্গ জনিত রজঃ তমঃ অংশে যে প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব নামে অভিহিত হয়। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

রজস্তমোগুণের দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত সত্ত্বগুণের পরিণাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাংশে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অবিদ্যার বশীভূত হইয়া জীবত্ব ভাব প্রাপ্ত হয়। যাহা বাস্তবিক অনিত্য তাহাতে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি, যাহা পরিণামে দুঃখপ্রদ তাহাতে সুখ জ্ঞান, আর যাহা অনাত্ম তাহাতে আত্মবুদ্ধি করাই জীবের ধর্ম। এই অবিদ্যাই শুদ্ধ আত্মার জীবত্ব-ভাবের ভ্রান্তির কারণ। এই অবিদ্যা হইতেই অস্মিতারূপ "অহং, মম" জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই জীবের বিষয়াভিমুখী বহির্মুখী গতি। স্বরূপে ফিরিবার মুখে অস্মিতানুগত সমাধি অবস্থায় অন্তর্মুখ হইয়া যোগীর চিত্ত-বৃত্তি অহং তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে এবং বাহ্য ও অন্তর অর্থাৎ প্রকৃতির তত্ত্ব সমূহের জ্ঞাতারূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় যোগী অবিদ্যার মিথ্যাস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া তজ্জনিত ভ্রান্তি জ্ঞান হইতে মুক্ত হন এবং অবিদ্যার কুহকে আর মুগ্ধ হন না। অবিদ্যার বন্ধন হইতে মোচন হইলে যোগীগণ প্রকৃতির অষ্ট ঐশ্বর্য, যথা-- অণিমা, লঘিমা, মহিমাদির অধিকারী ও ভোক্তা হন এবং পঞ্চ ভূতকে জয় করিতে পারেন।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিনিষ্ঠ যোগী এইরূপে প্রকৃতির অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কারণ, বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহংতত্ত্ব জগতের বীজ বা অঙ্কুর স্বরূপ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কালে সংসারের বীজ থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা সবীজ সমাধি নামে কথিত হয়।

বীজ থাকিয়া যাইলে পুনরায় কালান্তরে সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া যোগিগণ নির্বীজ সমাধির অভ্যাসে বিশেষরূপে যত্নবান হন। দীর্ঘকাল সবীজ সমাধির অভ্যাসে যোগিগণের চিত্ত রজঃ ও তমোগুণ শূন্য হইয়া অত্যন্ত শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান হইয়া থাকে এবং জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়। যে জ্ঞান কেবল সত্যকেই ধারণ করে অর্থাৎ যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ তাহার যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং যাহাতে বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না, তাহাকেই প্রজ্ঞা কহে। কিন্তু ঐ জ্ঞানের বিষয়সমূহ প্রাকৃতিক জগতের হওয়াতে নির্বিকল্প সমাধি লাভেচ্ছু সাধকগণ এই প্রাকৃতিক জ্ঞান ও অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা পরবৈরাগ্যের অর্থাৎ বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা ইহলোকের ও পরলোকের বিষয়সমূহের ভোগ হেয় ও নশ্বর বোধে তাহাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া থাকেন। পরবৈরাগ্যের আশ্রয়ে সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপজ্ঞান লাভের জন্য অধিকতর যত্নবান হন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিনিষ্ঠ যোগীর যতই স্বরূপ-সত্তা বা আত্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয় ও বৈরাগ্যের সহযোগে বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়। বিবেকখ্যাতি কাহাকে বলে? বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ বিবেক দ্বারা আত্মার শুদ্ধ স্বরূপত্বের

খ্যাতি হইয়া থাকে। সত্তা মাত্র আত্মা। 'আমি আছি'—এইরূপ অস্তিত্বমাত্র ভান। যে অস্তিত্ব দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, তাহাই স্বরূপ-পুরুষ। প্রকৃতি হইল পুরুষের আশ্রিতা সৃষ্টি উৎপাদিকা শক্তি বিশেষ। উভযে উভযের ধর্মে পরস্পর আক্রান্ত হইলে সৃষ্টি উৎপন্ন হয। প্রকৃতি পুরুষধর্মে ধর্মিনী হইযা সৃষ্টি উৎপাদনে সমর্থা হন এবং পুরুষ প্রকৃতিধর্মে ধর্মী হইয়া স্বরূপতত্ত্বে অসঙ্গ, নির্লিপ্ত হইযাও প্রকৃতির পরিণাম ধর্মে নিজেকে পরিণামী জ্ঞানে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। এই আরোপিত জ্ঞানই মহৎ তত্ত্ব বা বুদ্ধি তত্ত্ব। তাহা হইতে অহং তত্ত্বের উদয় হইয়া পুরুষকে আমি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, শ্রোতা, কর্তা ইত্যাদি মিথ্যা দেহাত্মাভিমানী কবিয়া থাকে। এইরূপ দেহাত্মাভিমানী পুরুষকে জীব বলা হয়। এই মহত্তত্ত্বরূপ বুদ্ধিই জীবের সংসার-ভোগ ও অপবর্গরূপ মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতু। পুরুষ-প্রকৃতির অবিবেক বশতঃই জীবের সংসার ভোগ, আর পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক হইতেই জীবের কৈবল্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল যোগ—সাংখ্য যোগের সহিত পাতঞ্জল যোগের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মনে হয, সাংখ্য যোগকে ভিত্তি করিযাই পাতঞ্জল যোগ রচিত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগের আলোচনা কালে ইহাব পরিচয় পাওয়া যাইবে। পাতঞ্জল যোগ-নির্দিষ্ট 'ক্লিষ্ট' ও 'অক্লিষ্ট' কর্মের বিষয়ে প্রথমে সংক্ষেপে আলোচনা করিযা লইয়া ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করিযা এই যোগের বিশ্লেষণে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব।

মানুষ অবিবেক বা অজ্ঞানের বশে যে সমস্ত কর্ম করে, সেই সমস্ত অজ্ঞানমূলক কর্মেব প্রভাবে তাহাকে সংসার জীবনে নানা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয। পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে অজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলা হইয়াছে। এই অবিদ্যাই সংসারের মূল কাবণ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এই পাঁচটি হইল ক্লেশ। এই পাঁচ ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই মূল ক্লেশ। অবিদ্যা হইতে অস্মিতা অর্থাৎ অহংভাবের উদয় হয়। অস্মিতার উদযের ফলে অবস্থা বিশেষে চিত্তে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ইহাব পর অভিনিবেশ অর্থাৎ মৃত্যুভয় উৎপন্ন হয়।

অবিদ্যাই অবিবেক। যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহাই ভাবার নাম অবিদ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান হইতেই অস্মিতা বা অহংভাবের উদয় হয়। স্থূল দেহ আর আত্মা বা চৈতন্য দুই পৃথক সত্তা, তথাপি দুইকে এক ভাবাই অর্থাৎ দেহকে আত্মা ভাবাই 'অস্মিতা'। অস্মিতারই নামান্তর অহংভাব। ইহারই ফলে মিথ্যা দেহাত্মবোধ জাগে। এই ভ্রান্ত অহংভাব হইতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ দুইই উৎপন্ন হয়।

স্থূল দেহের মৃত্যুর আশঙ্কা বা ভয়কেই 'অভিনিবেশ' বলে। এই অবিদ্যাদি পাঁচ ক্লেশ হইতে কর্ম উৎপন্ন হয় এবং কর্ম হইতে 'বিপাক' উৎপন্ন হয়। 'বিপাকে'র অর্থ—জন্ম, আয়ু ও ভোগ এবং শেষে 'কর্মাশয়' নামক সংস্কার উৎপন্ন হয়। কর্মাশয় অনুসারে সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও কর্মাশয়—সবই সাংসারিক জীবের হয়। অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহের প্রভাব হইতে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই 'ক্লিষ্ট' কর্ম।

অবিদ্যার মূল স্বরূপ অবিবেক, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ জ্ঞানের অভাব। যোগ-সাধনায় রত সাধক 'বিবেকখ্যাতি'র অভ্যাস করেন। কারণ, পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদজ্ঞান-প্রসূত অবিবেক বশতঃ যে সমস্ত কর্ম করা হয়, সেই সমস্ত 'ক্লিষ্ট কর্ম'। কিন্তু বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন সাধক যে সমস্ত কর্ম করে তাহা 'অক্লিষ্ট কর্ম'। অবিবেকমূলক কর্ম সাংসারিক কর্ম। এই সব কর্মের ফলে সংসারবন্ধন দৃঢ়তর হয়। কিন্তু বিবেকখ্যাতিমূলক কর্ম হইতে সংসার-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়।

অনাদিকাল হইতে ক্লিষ্ট কর্মের ধারা চলিয়া আসিতেছে। যতদিন না বিবেকখ্যাতির পূর্ণ উদয় হয়, ততদিন পর্যন্ত ক্লিষ্ট কর্মের ধারার বিরাম হয় না। কর্মাশয় ও বাসনা—দুইই সংস্কার, দুইটি সংস্কারই ক্লিষ্ট কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুইটি সংস্কার এক প্রকার নয়। কর্মাশয় হইতে সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, কিন্তু পাতঞ্জল যোগের দৃষ্টিতে বাসনা হইতে ভোগ উৎপন্ন হয় না। বাসনার ফল 'স্মৃতি', পরন্তু কর্মাশয়ের ফল সুখ-দুঃখ। এই দুই সংস্কার এক যোগে কাজ করে। কর্মাশয় হইতে তিন প্রকার বিপাক উৎপন্ন হয়। প্রথম বিপাক 'জাতি' অথবা জন্ম। জন্ম মানেই জীবের স্থূলদেহ প্রাপ্তি। ইহা ভোগায়তন দেহ; দেহেতেই সুখ-দুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। যতদিন ভোগ থাকে ততদিন দেহ থাকে, ভোগ শেষ হইলেই দেহের পতন ঘটে। অতএব দেহের স্থিতিকালকেই আয়ু বলা হয়। যে কর্মের ফলে দেহ উৎপন্ন হয়, সেই কর্মই ঐ দেহের ভোগ ও আয়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রকার কর্মের নাম 'প্রারব্ধ কর্ম'। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষের কর্ম দুই প্রকার। বর্তমান কর্মকে 'ক্রিয়মাণ' কর্ম বলে। জীব কর্তৃত্বের অভিমান বশে কর্ম করে। দেহাত্মবোধ ব্যতীত কর্ম উৎপন্ন হয় না এবং কর্মের ভোগানুকূল সংস্কারও উৎপন্ন হয় না। প্রাক্তন কর্ম অনাদিকাল হইতে ক্রমশঃ চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। উহাকে 'সঞ্চিত কর্ম' বলে। এই সঞ্চিত কর্ম অনেক জীবনের সংস্কারের সমষ্টি। এই সঞ্চিত কর্ম হইতে 'প্রারব্ধ কর্মে'র উৎপত্তি হয়। শুধু সঞ্চিত কর্ম নহে, সঞ্চিত কর্ম এবং ক্রিয়মান কর্মের সহযোগে দেহত্যাগ করিবার সময় 'প্রারব্ধ কর্মে'র আবির্ভাব হয়। মৃত্যুর সময় বা অন্তিমকালে যে চিন্তাধারা

থাকে, তাহাকেই 'ক্রিযমাণ কর্ম' বলে। অন্তিম চিন্তাধারাব (স্মৃতি) অনুসারে সঞ্চিত কর্মের ভাণ্ডার হইতে অনুরূপ কর্মের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া প্রারব্ধ কর্মের রচনা কবে।

ক্রিয়াযোগ—নানা সুখ-দুঃখপূর্ণ সাংসারিক জীবনের ক্লেশভোগ হইতে জীবের মুক্তিব জন্য পাতঞ্জল যোগসূত্রের সমাধি পাদে 'সমাধি-যোগ' বা জ্ঞান-যোগের কথা বিশ্লেষিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মন অন্তর্মুখ হইয়া সমাহিত চিত্ত হওয়া বা চিত্তের একাগ্রভূমিতে উন্নত হওয়াই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞা লাভ বা জ্ঞান-যোগই সমাধিপাদে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রজ্ঞা-লাভের পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিভূমিতে আরূঢ় হইযা ক্রমশঃ 'বিবেকখ্যাতি', 'পুরুষখ্যাতি' অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির বা চিৎ ও অচিতের জ্ঞান লাভের দ্বারা অচিৎ হইতে চিৎকে ক্রমশঃ পৃথক কবিতে করিতে পরিশেষে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া 'দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান'রূপ কৈবল্য প্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে উদ্দিষ্ট সমাধিপাদে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত বহির্মুখ, তাহাদের চিত্তকে অন্তর্মুখ করিযা সমাধিভূমিতে কি করিযা লইযা যাইতে পারা যায় তাহারই প্রণালী বা জ্ঞানযোগের প্রস্তুতি হিসাবে আর একটি যোগের কথা পাতঞ্জল যোগসূত্রের 'সাধন-পাদে' বিশ্লেষিত হইয়াছে। সেই যোগটির নাম হইল 'ক্রিয়াযোগ'।

ক্রিয়াযোগ কি কি?—তাহা হইল তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান—"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (সাধন-পাদ, সূত্র-১)। প্রথম তপস্যা। তপস্যা শব্দের অর্থ হইল উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিযগ্রামকে সংযত করিয়া শরীরকে শুদ্ধ করা। শুধু কৃচ্ছ্র-সাধনা করিলেই কোন ফল লাভ হয না যদি তাহার সহিত মন ঈশ্বর-ভাবনায় যুক্ত না থাকে। ঈশ্বর-চিন্তায় চিত্তের সংযোগ না হইলে বা তদ্‌ভাবে ভাবিত না হইয়া পার্থিব সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিলে বা ঐহিক কিংবা পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কৃচ্ছ্র-সাধনা করিলে ঐহিক বা পারলৌকিক শুভফল পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই শুভফলের ভোগকাল সমাপ্ত হইলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে ঈশ্বব-সান্নিধ্যের দিকে যাওযা যায় না। অতএব ঐরূপ তপস্যা 'যোগ' নহে। ঈশ্বরের সহিত চিত্তের সংযোগ ঘটাইতে হইলে বা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবাত্মার মুক্তি ঘটাইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হইলে তাহার প্রাথমিক সাধনা হইল তপস্যা। তপস্যা ব্যতীত বহির্মুখ জীবের সহিত ঈশ্বরের যোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। অনাদিকাল হইতে জীব বাসনা-কামনার দ্বাবা কর্ম করিয়া বীজরূপে কর্ম-সংস্কার সঞ্চিত করে এবং সেই সঞ্চিত প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট

প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করে, আবার এই জন্মে কর্তৃত্বাভিমান মিশ্রিত বাসনা কামনাময় কর্ম করিয়া সংস্কার উৎপন্ন করে এবং এইরূপে অনবচ্ছিন্ন বিষয়জালে জড়িত হইয়া চিত্ত কলুষিত থাকে। অতএব সর্ব কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য, কর্মজাল ভেদ করিয়া কর্মশুদ্ধির জন্য এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন অন্তর্মুখ করার এবং ঈশ্বরের যোগে যুক্ত হওয়ার জন্য উদ্ধৃত সূত্রে 'তপঃ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব অবিদ্যার অবরোধ উন্মোচন করিয়া চিত্তকে অবাধ, নির্মুক্ত ও শুদ্ধ করণার্থে ক্রিয়াযোগের উপযোগিতা স্বীকৃত। তবে কৃচ্ছ্র-সাধনায় শরীরের পক্ষে যাহা সাধ্য তাহাই করা উচিৎ। সাধ্যাতীত ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এমন অতিরিক্ত কিছু করা ঠিক নয়। শরীরানুপাতে তপস্যার অনুষ্ঠান ও অভ্যাসই সাধনার অনুকূল। অত্যধিক অভ্যাস করিতে যাইয়া শরীর ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তাহা সাধনার প্রতিকূলই হইয়া দাঁড়ায়।

তপস্যার ব্যাপারে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে কোনরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান না করিয়াও বা কৃচ্ছ্রসাধনা ব্যতিরেকেও শুধু জ্ঞান-সাধনা বা ভক্তি-আচরণের দ্বারা অথবা জ্ঞান-ভক্তির মিশ্রিত পথে চলিয়া ঈশ্বরের কৃপায় কেহ এই জন্মেই জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। এই জন্মের পর আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তথাপি এই জন্মে যে সংস্কারের আবরণ তাঁহার জীবনকে আবৃত করিয়া আছে তাহা ক্ষয় করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে নানাদিক থেকে পীড়িত, ক্লিষ্ট করেন এবং দুঃখ, কষ্ট, অসম্মান, গ্লানি প্রভৃতিতে নিপাতিত করেন। তাই বাস্তব জগতে কখন কখন এক একজন সাধু-প্রকৃতির ব্যক্তিকে অসম্ভবরূপ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করিতে দেখা যায়। ঈশ্বর তাঁহাকে কৃপা করিলেও এবং ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার প্রারব্ধ সংস্কার হইতে তাঁহাকে বিনা ভোগে অব্যাহতি দিতে পারেন না। ঈশ্বরের নিজের সৃষ্ট নিয়ম ঈশ্বর নিজেও লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় হইল স্বাধ্যায়। প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র-জপ ও মোক্ষপথ নির্দেশক শাস্ত্রপাঠই স্বাধ্যায়। শাস্ত্র বলিতে এখানে বিতর্কমূলক শাস্ত্র বুঝায় না। যে সব শাস্ত্র তর্কবুদ্ধিশাণিত ও যুক্তিশাণিত, তাহা পাঠের উপযোগীতা অন্যত্র বুদ্ধির ক্ষেত্রে; এখানে সেই সব শাস্ত্র অধ্যয়নই নির্দেশ করা হইয়াছে যাহা শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্বক পাঠ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে আলোকিত চিত্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরমনির্ভরতায় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।

আর তৃতীয় হইল 'ঈশ্বর প্রণিধান'। প্রণিধান অর্থে কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া সর্বকর্ম পরমগুরুতে সমর্পণ। তাহা না করিতে পারিলে অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান একেবারে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম না হইলে নিজেকে কর্তা

ভাবিয়া কাজ করিয়া অনাসক্তভাবে কর্মফল পরমগুরুতে অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। গীতায় অর্জুনের প্রতি ভগবানের দুইটি মুখ্য উপদেশের একটি হইল, 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', গীতার শেষ অধ্যায়ে দ্বিতীয় উপদেশ, 'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিম্নাধিকারী ব্যক্তির কর্তব্য হইল ফলাসক্ত না হইয়া নিরাকাঙ্ক্ষভাবে কর্ম করিয়া যাবতীয় কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করা। কোন ব্যক্তি প্রথম হইতেই একেবারে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করিয়া নিরাসক্তভাবে কাজ করিলে কর্মশুদ্ধি ঘটে অর্থাৎ কর্মপাশ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্মশুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তখন উচ্চাধিকারীর যোগ্য হইয়া কর্তৃত্বাভিমানও ত্যাগ করে। অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার মধ্য দিয়া করেন—ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সে মাত্র দ্রষ্টারূপে তখন অবস্থান করে। এই সত্যটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে। চিকাগোর মহাধর্মসম্মিলনে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া তিনি শুধু 'Sisters and Brothers of America' বলিয়া শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তখন তাঁহার মুখ দিয়া কথা বলিতে থাকেন, তিনি উহার সাক্ষীমাত্র।'

ক্রিয়াযোগের উপযোগীতা দ্বিতীয় সূত্রে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—'সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ" (সাধন-পাদ, ২)। ক্রিয়াযোগের দ্বারা সমাধি-প্রজ্ঞার পথ পরিষ্কৃত হইয়া উহার প্রাপ্তিকে নিকটবর্তী করে এবং ক্লেশ উৎপাদক বৃত্তিসমূহকে 'তনু' করে, অর্থাৎ বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হয় এবং রূপও পরিবর্তিত হয় (reduced quantitatively & qualitatively)।

ক্লেশ চার প্রকার, যথা—সুপ্ত, বিচ্ছিন্ন, উদার ও তনু। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি উত্তেজক কারণের (provocation) অভাবে 'সুপ্ত' থাকে। ইন্ধন পাইলেই তাহারা জাগ্রত হইয়া উঠে। অতএব ইন্ধনের অনুপস্থিতিতে বৃত্তির বিনাশ বা লয় বুঝায় না। আবার এক বৃত্তির প্রবল থাকাকালীন অন্য বৃত্তিগুলির নিস্তেজ অবস্থাকে 'বিচ্ছিন্ন' বলে। যেমন, ক্রোধবৃত্তি প্রবল হইলে কাম, লোভ বৃত্তিগুলি ক্রোধ বৃত্তি হইতে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যখন এক বা একাধিক বৃত্তি ক্রিয়াশীল (active) থাকে তাহাকে 'উদার' বলে। 'তনু' বলিতে বুঝায় মাত্রার হ্রাস বা ক্লেশের ক্ষীণতা সাধন।

ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি প্রকৃষ্টরূপে 'তনু' প্রাপ্ত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত বিবেকের উদয়ে বা প্রজ্ঞাগ্নিতে সমস্ত ক্লেশ বা সংস্কার-বীজ দগ্ধীভূত হইয়া কর্মফল প্রসবে অসমর্থ হইয়া পড়ে। বৃত্তিগুলি তনু-কৃত না হইলে কখনই সমাধি-প্রজ্ঞার উদয় হইতে পারে না বা সংস্কার-বীজও বিনষ্ট হয় না। যেমন আর্দ্র কাষ্ঠখণ্ডকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে না, কিন্তু রৌদ্রের

উত্তাপে শুষ্ক হইলে অগ্নি সহজেই উহাকে দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ ক্রিয়াযোগের দ্বারা বৃত্তিসমূহ 'তনু' প্রাপ্ত হইলে সহজে সমাধি-প্রজ্ঞার উদয় হইয়া ক্লেশ উৎপাদক বীজকে নিঃশেষে দগ্ধ করে। এইরূপে ক্লেশের দ্বারা অস্পৃষ্ট সংস্কারাতীত প্রজ্ঞাবান্ যোগীর মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞানরূপ 'বিবেকখ্যাতি' উৎপন্ন হয় এবং এইখান থেকেই 'সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা' উদয়ের সূচনা হয়। ইহার ফলে অর্থাৎ কর্মবীজ ও সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদে চিত্তের ভোগ ও অপবর্গ রূপ গুণাধিকার ক্ষয় হওয়ায় চিত্ত কর্মহীন হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই চিত্তের তখন আর প্রয়োজন থাকে না। তখন চিত্ত আপন 'কারণে' অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ইহাকে পাতঞ্জল যোগে 'প্রকৃতিলয়' বলা হইয়াছে। প্রকৃতিলয় যোগী অস্মিতা ভূমি পর্যন্ত যায়। 'অস্মিতা' পর্যন্ত যে সমাধি-প্রজ্ঞা, তাহা স্থূল প্রজ্ঞা—ক্রিয়াযোগের দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয়। তারপর সূক্ষ্মপ্রজ্ঞা বা পুরুষ-প্রকৃতির ভিন্নতা-বোধরূপ 'বিবেকখ্যাতি'র সূচনা হয়।

একাগ্রভূমি—সমাধি-প্রজ্ঞা লাভের উপায় কি তাহাই পাতঞ্জল যোগের সমাধিপাদে বর্ণিত হইয়াছে। সমাধি-প্রজ্ঞা লাভের প্রধান উপায় হইল চিত্তকে একাগ্র করা। জড় প্রকৃতি হইতে চিত্তের উৎপত্তি। সুতরাং চিত্ত জড়াত্মক এবং সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক। চিত্ত যখন সত্ত্ব-প্রধান, তখন রজঃ ও তমঃ গুণ অপ্রধান অবস্থায় চিত্তে সমাসীন থাকে। সত্ত্বঃ তখন ধর্মী, রজঃ ও তমঃ উহার ধর্ম। সত্ত্বঃ বিন্দু, রজঃ ও তমঃ উহার বিকাশের সহায়ক। সত্ত্ব-ধর্মী পুরুষের মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, তখনও সেই পুরুষ কখন কখন তমঃ ও রজঃ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তথাপি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় তাঁহাকে সাত্ত্বিক পুরুষই বলা হয়। এইরূপে যার চিত্তে তমো গুণের প্রাধান্য, তার মধ্যেও সত্ত্বঃ ও রজঃ গুণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। তথাপি তার চিত্তে তমোগুণের প্রাবল্যের জন্য তাকে তামসিক ব্যক্তিই বলা হয়। অবিমিশ্র খারাপ বা তামসিক ব্যক্তি কাহাকেও বলা যায় না। কারণ তার মধ্যেও ভাল বৃত্তির স্ফুরণ মাঝে মাঝে ঘটিতে দেখা যায়।

চিত্তের পাঁচটি ভূমি—(১) মূঢ় (তমো), (২) ক্ষিপ্ত, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, (৫) নিরোধ। চিত্ত যখন অজ্ঞানতা ও জড়ত্বের গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন 'তমো' ভূমি। চিত্ত যেখানে সর্বদাই চঞ্চল, এক মুহূর্ত স্থির নহে, উহা চিত্তের 'ক্ষিপ্ত' ভূমি। চিত্তের চঞ্চল বা ক্ষিপ্ত অবস্থাতেই যখন মাঝে মাঝে একাগ্রতার স্ফুরণ হয় অথচ উহার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ থাকে না, তখন উহা চিত্তের 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থা। সমস্ত চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া চিত্ত

যখন কোন একটা বিষয়ে স্থায়ীভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন চিত্তের 'একাগ্রভূমি'। আর একটি অবস্থা হইতেছে চিত্তের 'নিরোধ ভূমি' অর্থাৎ চিত্ত যেখানে নিরুদ্ধ, চিত্তের অস্তিত্বই সেখানে নাই। ইহা নিরুপাধি বা তুরীয় অবস্থা।

মূঢ, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত—চিত্তের এই তিন ভূমিতে যোগসাধনা হইবে না। পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রের সমাধিপাদের দ্বিতীয় সূত্রে বলিযাছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।—চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। কিন্তু শুধু চিত্তবৃত্তিনিরোধে যোগ হইবে না। সেইজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে এর পরের সূত্রে বলিলেন—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (সূত্র ৩)। যে বৃত্তিনিরোধের ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান ঘটে, তাহাই যোগ। কারণ, বৃত্তিনিরোধ হইলেই যে স্বরূপাবস্থান ঘটিবে তাহা নহে; তার প্রমাণ ভবপ্রত্যয়, প্রকৃতিলয়ের অবস্থা। এখানে বৃত্তি সব নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু চিত্ত মহাজডত্বের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, পুরুষের প্রকাশ হয় না। উপায-প্রত্যয় ইহার বিপরীত।

সেইজন্য একাগ্রভূমি হইতে যোগ আরম্ভ হয়। এই 'ভূমি'টা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। ভূমিটা হইল original status, the fundamental ground, natural poise of our being, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থা। এই স্বভাবসিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে সর্বপ্রথমে চিত্তে বৃত্তির সর্বপ্রকার বিক্ষেপ নিবৃত্ত করিয়া বৃত্তিকে একমুখী করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইলে একাগ্রভূমিতে সাধক উন্নীত হয়। এই একাগ্রভূমি হইতে যোগ আরম্ভ হয। কারণ ভূমিটা একাগ্র না হইলে কিছুতেই যোগ হইবে না।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্তের পরিণাম তিন প্রকার, যথা—সমাধি-পরিণাম, একাগ্র-পরিণাম, নিরোধ-পরিণাম। ইহার পর ব্যুত্থান। চিত্তের সাধারণতঃ তিন অবস্থা—মূঢ়, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। চিত্তের মূঢ় অবস্থা গাছ-পাথরের, ক্ষিপ্ত অবস্থা পশুর এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থা মানুষের। মানুষের বিক্ষিপ্ত চিত্তে মূঢ় ও ক্ষিপ্ত অবস্থাও যুক্ত থাকে অপ্রধানরূপে। সমাধি-পরিণামে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা হইতে একাগ্রতার দিকে অগ্রগতি আরম্ভ হয। সমাধি-পরিণামের পূর্ণতায় একাগ্রবৃত্তির উদয় হয—ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। একাগ্রচিত্ত হইতেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞা উদিত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞা গ্রাহ্য অথবা গ্রহণ অথবা গ্রহীতাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। কিন্তু অবলম্বনের ক্রম শ্রেষ্ঠতা অনুসারে প্রজ্ঞারও বিশুদ্ধির ভেদ হইয়া থাকে। গ্রাহ্য বা বিষয়কে অবলম্বন করিলে যেরূপ প্রজ্ঞার উদয হইবে গ্রহণকে অবলম্বন করিলে প্রজ্ঞা উহা অপেক্ষা আরও উন্নত হইবে এবং গ্রহীতাকে অবলম্বন করিলে প্রজ্ঞা তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হইবে। ইহারা চিত্তের একাগ্র-পরিণাম। একাগ্র-পরিণামে একটি বৃত্তি থাকিয়া যায়। কারণ, অবলম্বনটাই বৃত্তি। একাগ্র-পরিণাম পূর্ণ

হইলে নিরোধ-পরিণামের আরম্ভ হয়। চিত্তের পূর্ণ নিরোধ অবস্থায় কোন অবলম্বন থাকে না, অতএব বৃত্তিও থাকে না। বৃত্তি তরঙ্গস্বরূপ। সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেমন অবিরত উঠিতেছে, পড়িতেছে, বিক্ষুব্ধ অবস্থায় চিত্তে তেমনি বৃত্তির পর বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তার পর চিন্তার ঢেউ অবিরাম উঠিতে থাকে, এমন কি, একটি চিন্তার শেষ হইবার পূর্বেই আর একটি চিন্তা আসিয়া অনুপ্রবেশ করে। চিত্তের এইরূপ বিক্ষিপ্ততা হইতে চিত্তকে একমুখী করার জন্য একাগ্রতার সাধনা। একাগ্র-পরিণামের পূর্ণতায় অন্য সকল প্রকার বৃত্তির নিরোধ হইয়া একটিমাত্র বৃত্তি বা তরঙ্গ থাকে। চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ নিরোধ সাধনায় একটিমাত্র বৃত্তিও আর থাকিবে না। চিত্ত তখন নিস্তরঙ্গ হইয়া প্রশান্ত-বাহিতা হইবে। কারণ, এইরূপ অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলেও চিত্ত থাকে; কারণ তখনও বৃত্তির সংস্কার থাকিয়া যায় অর্থাৎ তখনও চিত্ত সংস্কার রূপে থাকে। নিরোধ-পরিণামের পূর্ণতায় 'অস্মিতা'র উদয় হয়। অস্মিতা-সমাধির সিদ্ধিতে যোগী সকল বিভূতির অধিকারী হয় অর্থাৎ সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া উহার ভোক্তা হয়----ইহাকেই বলে ঈশ্বরত্ব লাভ। এইরূপ অনন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী ঈশ্বর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আপন ঐশ্বরিক শক্তি সম্ভোগ করে। ঐরূপ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন যোগীকে বলা হয় 'কার্য ঈশ্বর'। তিনি 'কারণ-ঈশ্বরে'র প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সেই ক্ষমতার পরিচালনা করেন—ইহাই ঐশ্বর্যের সম্ভোগ। কিন্তু এই যে অনন্ত ঐশ্বর্য---ইহা সবই 'ইদন্তা', এবং মায়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে যোগী আত্মস্বরূপের দর্শন পায় না, স্বরূপে অবস্থান তো আরও দূরের কথা। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া উহার সম্ভোগে যদি যোগী মোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার গতি এইখানেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, যোগ-সাধনার পরিপূর্ণ ফল-প্রাপ্তি না ঘটিয়া অর্দ্ধপথেই থামিয়া যায়। কিন্তু যে যোগী সম্ভোগে সন্তুষ্ট না হইয়া আত্মস্বরূপের সন্ধান করে, তাঁহার ঊর্ধ্বগতির পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞান মার্গ খুলিয়া যায়—ইহাই বিবেকজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি-মার্গ। ঐশ্বর্য-সম্ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া ঐশ্বর্য ত্যাগ করিলেই বিবেক জাগিয়া উঠে—ইহাই 'অপরা বৈরাগ্য'। অপরা বৈরাগ্যের দ্বারা বিবেক উন্মুক্ত হইলেও 'পরা-বৈরাগ্যের' বা 'গুণ-বিতৃষ্ণা' সাধনের তখনও অপেক্ষা থাকে। বিবেকখ্যাতির উদয় হইলে চিৎ ও অচিৎ যাহা এই অবস্থা পর্যন্ত যুক্তভাবে ছিল, তাহা আলাদা হইতে থাকে। এইরূপ পৃথক্ হইতে হইতে যখন চিৎ বা পুরুষের সহিত অচিৎ বা চিত্তের লেশমাত্র সম্বন্ধ থাকে, তখন আত্মদর্শন হয়। আকাশ দর্শন করিলে যেমন নক্ষত্রও দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনের সাথে সাথেই 'প্রকৃতির'ও দর্শন হয়—ইহাই 'পুরুষ-খ্যাতি' নামে কথিত। পুরুষ (আত্ম)

দর্শন হইলেই তখন প্রকৃতির যে লেশটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়। কারণ, প্রকৃতির কণামাত্র যুক্ত না থাকিলে যোগীর পুরুষ বা আত্মদর্শন হয় না। কারণ, প্রকৃতি হইতে পরিপূর্ণরূপে পৃথক পুরুষ নিজেকে নিজে দেখিতে পায় না। কারণ, উহা কৈবল্য অবস্থা। কৈবল্য অবস্থায় আত্মা আপনিই শুদ্ধ চিৎরূপে প্রকাশমান, সেখানে কে কাহাকে দেখিবে? শুদ্ধ প্রকাশমান যে কেবলী আত্মা, উহা নির্গুণ আত্মা, আর প্রকৃতির সহিত কিঞ্চিৎ যুক্ত থাকিয়া যে আত্মদর্শন যোগীর হয়, সেই আত্মা সগুণ আত্মা। এইরূপ স্বচ্ছ (transparent) চিত্ত বা প্রকৃতির সহিত যুক্ত পুরুষই প্রকৃত যোগী নামে অভিহিত। এইরূপ যোগাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"। কিন্তু যেই পুরুষ-দর্শনের পর প্রকৃতির প্রয়োজন ফুরাইল, অমনি প্রকৃতিও পরিত্যক্ত হইল—ইহাই পরা-বৈরাগ্য বা গুণ-বিতৃষ্ণা। তখন কৈবল্য অবস্থা বা ব্যুত্থান।

বিষয়টিকে আর একটু বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয় তাহাও সাক্ষাৎকার। কারণ, প্রজ্ঞামাত্রই সাক্ষাৎকারাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারেও উৎকর্ষের ন্যূনাধিক ভাব থাকে। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাতে 'সবিকল্প' ও 'নির্বিকল্প' দুইটি ভেদ থাকে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য্য থাকিলে বিকল্পের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ঐ জ্ঞানকে 'সবিকল্প' জ্ঞান বলে। কিন্তু শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য্য না থাকিলে অর্থাৎ যাহাকে যোগিগণ স্মৃতিপরিশুদ্ধি বলেন তাহা সিদ্ধ হইলে ঐ জ্ঞান নির্বিকল্পরূপে পরিণত হয়।

অর্থের সহিত শব্দের যেমন সম্বন্ধ আছে, তেমনি অর্থের সহিত জ্ঞানেরও সম্বন্ধ আছে। একটি বাচ্যবাচক ভাব এবং অপরটি বিষয়বিষয়ীভাব। এই সম্বন্ধসূত্রে শব্দ ও জ্ঞানের সঙ্গেও সাধারণতঃ একটি সম্বন্ধ থাকে। এইজন্যই সাধারণ অবস্থায়, এমন কি সমাধিরও নিম্নাবস্থায়, জ্ঞান সবিকল্পই থাকিয়া যায়, কারণ ঐ অবস্থায় জ্ঞানের শব্দানুবিদ্ধতা নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞান যখন সম্যক্ প্রকারে শুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে শব্দের অনুবেধ থাকে না বলিয়া সেই জ্ঞান বিকল্পহীন বলিয়া গৃহীত হয়। এইজন্যই পাতঞ্জল দর্শনের নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধিজনিত প্রজ্ঞা নির্বিকল্প। কিন্তু এইরূপ নির্বিকল্প জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ অস্মিতা সমাধি আয়ত্ত হইলে প্রজ্ঞার চরম বিকাশ সিদ্ধ হয়। এই প্রজ্ঞা একপ্রকার আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে, কারণ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়ের উপসংহার

হইলেও গ্রহীতারূপে অস্মিতাতে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব অস্মিতা যে শুদ্ধ আত্মা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শুদ্ধ অস্মিতারূপে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম উৎকর্ষজনিত জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহাকে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান বলা যায় না। আত্মা বা পুরুষের সহিত গুণাত্মিকা প্রকৃতির অবিবেক অস্মিতা অবস্থাতেও থাকিয়া যায। বস্তুতঃ ইহাই চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি। এক হিসাবে ইহাকে 'হৃদয়গ্রন্থি'ও বলা চলে। এই গ্রন্থি মোচন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ গুণের সহিত পুরুষের বিবেক সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। যখন গুরুকৃপাতে অস্মিতাগ্রন্থি ভিন্ন হইতে থাকে, তখন ইহার অন্তর্গত চিৎ ও অচিৎ উভয় অংশ অর্থাৎ পুরুষাংশ ও গুণাংশ পরস্পর পৃথক হইতে থাকে। ইহাই 'বিবেকখ্যাতি'র আরম্ভ। দীর্ঘকাল যথাবিধি অভ্যাসের ফলে এই বিবেকখ্যাতি নির্মল হইতে থাকে। এই বিবেকখ্যাতিতে পুরুষের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। পুরুষ গুণ হইতে পৃথক্‌রূপেই সাক্ষাৎকৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণকে বাদ দিয়া নহে, কারণ গুণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে পুরুষের সাক্ষাৎকার আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। এই পুরুষ-সাক্ষাৎকার গুণবিরহিত না হইলেও অস্মিতা-প্রজ্ঞারূপ আত্মজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কারণ অস্মিতাজ্ঞানের মূলে অবিবেক বিদ্যমান থাকে, যাহাকে যোগিগণ অবিদ্যা নামে আদি ক্লেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যারূপ এই বিবেকখ্যাতিতে বিবেকজ্ঞান আরম্ভ হয় বলিয়াই গুণ হইতে পৃথকরূপেই পুরুষের দর্শন হয়। যদিও এই দর্শনে গৌণভাবে গুণও বিদ্যমান থাকে। এই সাক্ষাৎকার পুনঃপুনঃ হইতে হইতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় এবং গুণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় গুণের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের ক্ষীণতম দশাতে যে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই চরম সাক্ষাৎকার এবং তাহাই যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার। ইহার ফলে পরক্ষণেই ক্ষীণ অন্তিম গুণটুকুও অপসৃত হয় এবং সাক্ষাৎকারও আর থাকে না। তাহাই পুরুষ বা আত্মার স্বরূপস্থিতি। তখন বুঝা যায় আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা, বিষয়রূপে তাহার আর সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। যদি এবং যখন তাহা হয়, তখন উহাকে গুণযুক্ত আত্মার সাক্ষাৎকারই বলিতে হইবে, গুণাতীত শুদ্ধ আত্মার নহে। এই চরম সাক্ষাৎকারের ফলেই শুদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি হয় বলিয়া উহাকেই কৈবল্যের হেতুভূত আত্মসাক্ষাৎকার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান যে ইহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা বলাই বাহুল্য। পাতঞ্জলের উপদিষ্ট কৈবল্য অবস্থাতেও পুরুষের বহুত্ব থাকিয়াই যায়, কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে এবং প্রারব্ধ কর্মের অবসানে যে স্থিতিলাভ হয় তাহাতে বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মূলে মহাবাক্যের বিচার, কিন্তু পাতঞ্জল যোগের মতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ

করিতে হইলে সম্যকপ্রকারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ের আবশ্যকতা হয় না।

পূর্বোদ্ধৃত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিশুদ্ধ চিত্তরূপ প্রকৃতির অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা সগুণ আত্মার সহিত প্রকৃতির যোগ। এমতাবস্থায় যোগ-আত্মা দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করেন। অর্থাৎ এই অবস্থায় যোগী একমাত্র স্বচ্ছ শুভ্র নির্মল চিত্তকে ধরিয়া রাখেন। কৈবল্য অবস্থায় চিত্ত আর থাকে না। তখন চিত্তের কি গতি হয়? তখন উপাদান-বিনির্মুক্ত (disintegrated) চিত্তের 'রাগ' (colour) অবশিষ্ট থাকে। উহা পরাশক্তির মধ্যে গিয়া অবস্থান করে। যদি কখন কোন প্রয়োজনে বা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষকে ধরাধামে আসিতে হয়, তখন পরাশক্তিতে স্থিত ঐ চিত্র যাহা তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের (individuality) পরিচায়ক, তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতে হয়। কাশ্মীর শৈবাগম মতে শৈব বা শাক্ত যোগী কৈবল্যের পথে না গিয়া ঐ স্বচ্ছ (transparent) চিত্তকে ধরিয়া থাকে এবং চিন্ময়ী পরাশক্তির সহিত বারংবার তাহার চিত্তের সংযোগ ঘটাইয়া (ঐরূপ করাই শৈব বা শাক্ত যোগীর তখনকার সাধনা) উহাকে ক্রমশঃ চিন্ময়ী করিয়া তোলে। এইরূপে উহা যোগীর আত্মচিৎশক্তিতে পরিণত হয়। যোগীর ঐরূপ চিৎশক্তির সহিত শুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশরূপী শিবের পূর্ণ সংযোগ হইলে যোগীই পরাশক্তিসমন্বিত শিবে পরিণত হয় এবং তাঁহার মধ্যে পূর্ণাহন্তা-বোধ জাগ্রত হয়, অর্থাৎ আমিই যে সবকিছু হইয়াছি এবং সবকিছু যে আমাতেই অবস্থিত এই বিশ্বাত্মক-ভাব জাগিয়া উঠে অর্থাৎ 'শিবোঽহং' জ্ঞান হয়।

সাংখ্য যোগ অনুসারে ব্যক্তিত্বের আধার স্থূল শরীর নয়, সূক্ষ্ম শরীর। "ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্"—ইহা সাংখ্য সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক পুরুষের উপাধিস্বরূপ এই লিঙ্গ কৈবল্য পর্যন্ত থাকে। ইহা প্রত্যেক পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাংখ্যদৃষ্টিতে পুরুষ অনন্ত অর্থাৎ নানা। কৈবল্যাবস্থাতেও তাঁহারা পৃথক পৃথক থাকে। ন্যায় বৈশেষিক দৃষ্টিতেও আত্মা নানাপ্রকার। মুক্ত হইবার পরও এই নানাত্ব লোপ পায় না। বৈশেষিক আচার্যগণ মুক্ত আত্মাতে এক 'বিশেষ' পদার্থের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রত্যেক আত্মার পরস্পরে বিভেদ প্রতীত হয়। বৈশেষিক মতানুসারে মনেও 'বিশেষ' আছে। এই মতে মন নিত্য ও অনেক। মুক্তাবস্থাতেও মনের বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে মুক্তিতেও যে আত্মার যেরূপ মন, সেই মনের সহিত সেই আত্মার সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। পাতঞ্জল যোগমতেও সাংখ্যের ন্যায় কেবলী পুরুষ নানাপ্রকার। প্রত্যেক পুরুষেরই আপন আপন সত্ত্ব আছে। এই সত্ত্ব কৈবল্যতে অত্যন্ত নির্মল হইয়া যায়—"সত্ত্বপুরুষযো—শুদ্ধি সাম্যে কৈবল্যম্"।

প্রাকৃত সত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়—"প্রলযং বা গচ্ছতি"। কিন্তু অত্যন্ত শুদ্ধ সত্ত্ব লীন না হইয়া আত্মার ন্যায় থাকিয়া যায়—"আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে"। ইহাতে মনে হয়, আত্মাব সদৃশ হইয়া শুদ্ধ সত্ত্ব নিত্য আত্মার সাথে সাথেই থাকিয়া যায়। যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয়, তবে পাতঞ্জল যোগমতে কৈবল্যেও বৈশেষিকের ন্যায সত্ত্ব থাকে। অদ্বৈত শৈবাগমে লিখিত আছে যে, যখন শিব-ভাব হইতে স্বাতন্ত্র্যমূলক আত্মসঙ্কোচ দ্বাবা পশুত্ব বা জীবত্বেব আবির্ভাব হয়, তখন সঙ্কোচের তারতম্য হইতে পশুভাবেও তারতম্য হয়। একদিকে পূর্ণ অহন্তা শিব থাকে আর অপরদিকে অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন পশু অহম্ বিবাজ করে। এই পরিচ্ছিন্ন অহং-এর রচনা মাতৃকা চক্রেব এক গভীব রহস্য যাহা পূর্বেই কাশ্মীর শৈবাগমে বিশ্লেষিত হইয়াছে। গৌড়ীয বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিব বৈশিষ্ট্য অনুসাবে ভক্তজীব ভক্তিভাবের চরম উৎকর্ষতায় নিত্য বৃন্দাবনে প্রবেশ কবিয়া আপন আপন স্বভাব অনুসারে 'রসানাং রসতমঃ' শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরস আস্বাদন করেন। এখানেও পুরুষ মাত্র একজন, তিনি হইলেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর সব ভক্তজন তাঁরই অংশকলা। এই অংশকলায অসংখ্য তারতম্য আছে।

তন্ত্রমতে মন্ত্র-যোগ—সমাধির লক্ষ্য বিকল্পশূন্যতা। শব্দ ও অর্থেব মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অর্থেব সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। শব্দ ও জ্ঞানের মধ্যেই বিকল্পের অবসর আসিয়া যায়। জাগতিক সমস্ত জ্ঞানই এই বিকল্পে সমাচ্ছন্ন। এই বিকল্প দূর করার জন্য পাতঞ্জল যোগ নির্দেশ দিলেন একাগ্রতাসাধনের আর তন্ত্র উপদেশ দিলেন মন্ত্র-সাধনার। কাবণ তন্ত্রমতে শব্দ দ্বারাই মানুষ বদ্ধ হইয়াছে, আবাব শব্দ দ্বারাই সে মুক্ত হইবে। তবে এ শব্দ লৌকিক অশুদ্ধ শব্দ নহে, মন্ত্রঃপূত শুদ্ধ শব্দ, বিশুদ্ধা বাক্। এই মন্ত্রঃপূত শুদ্ধ শব্দের আশ্রয়ে অশুদ্ধ শব্দের রাজ্য অতিক্রম কবিতে হইবে। এই শুদ্ধ শব্দ বা মন্ত্র প্রথমে থাকে অক্ষরাত্মক, ক্রমশঃ মন্ত্রজপের অভ্যাসের ফলে তাহা পরিণত হয় নাদে, তখনই নাদ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং মনকে তাহাতে অভিনিবিষ্ট করিবার অভ্যাস করিতে হয়। মন যখন নাদে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইয়া যায তখন সেই নাদ বা ধ্বনিই তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেই ধ্বনির উৎসমূলে (source এ)। ঐ ধ্বনিই বৈষ্ণবদের বংশীধ্বনি যাহা পথ দেখাইয়া লইয়া যায় বংশীবিহারীর কাছে, সেই জ্যোতির্ময চিন্ময় আনন্দঘন বিগ্রহেব কাছে। এইরূপে নাদই ধ্যেয সাক্ষাৎকাব করাইয়া দেয়। তাই নাদের পরে ফুটিয়া উঠে জ্যোতি। ইহাই মন্ত্রের পথ।

পাতঞ্জল যোগে সাধনার প্রস্তুতি হিসাবে যমাদি ক্রিয়াযোগের কথা বলা হইয়াছে। ক্রিয়াযোগেব ক্রমটি ধাপে ধাপে ফুটিয়া উঠে। যম-নিয়মের পর

আসন হইতেই সাধন সুরু হয়। সর্বপ্রথম বাহ্য জিনিষ হইল দেহ, তার ভিতরে প্রাণ, তার অন্তরে ইন্দ্রিয়, তারপর বুদ্ধি, শেষ আত্মা। গুরু শিষ্যকে তাহাই শিখাইতে পারেন যাহার বীজ শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত হিসাবে আছে, অর্থাৎ nature এর অনুকূলেই শিক্ষা দেওয়া চলে নতুবা কোনো ফল ফলে না। তাই গুরু প্রথম উপদেশ করেন দেহ-স্থৈর্যের জন্য। মন দৌড়ায় দৌড়াক, প্রাণের গতি যেমন হয় চলুক—কিছুই দেখিবার দরকার নাই, শুধু দেহটাকে স্থির রাখিবার চেষ্টা কর। এইরূপ করিতে করিতে দেখা যাইবে মাঝে মাঝে প্রাণের গতি স্থির হইয়া আসিতেছে। তখন বুঝা যাইবে সে দ্বিতীয় সাধনের জন্য উপযোগী হইয়াছে। এখন যে প্রাণের সূক্ষ্মতা কখনো কখনো আসিয়া যাইতেছিল, তাহাকে নিজের ইচ্ছাধীন করার জন্য গুরু প্রাণায়ামের কৌশল শিখাইয়া দেন। এইরূপে প্রাণের ক্রিয়া করিতে করিতে আবার কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গুলি আপনি গুটাইয়া আসিতে থাকিবে, প্রত্যাহৃত হইতে থাকিবে। তখন গুরু তাকে প্রত্যাহারের সাধন দেন। প্রত্যাহারের ফলে মন কেন্দ্রীভূত হইয়া আসে। তখন আসে ধারণার উপদেশ। তারপর বুদ্ধির কেন্দ্র ক্রিয়াশীল হইলে ফোটে ধ্যান। শেষে তার চরমতায় আসে সমাধি।

পাতঞ্জল শাস্ত্রে ক্রিয়াযোগের মধ্যে "তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধানের" কথা বলা হইয়াছে। স্বাধ্যায়ের দ্বারা শব্দব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা হয়। শব্দব্রহ্মের বা নাদের সহিত যোগসাধিত হইলে ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। নাদের শুরু হয় হৃদয় হইতে। তাই চিত্তে বহির্মুখী গতিকে রুদ্ধ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। তখন ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা হৃদয়োত্থিত নাদের সহিত চিত্তকে যোগ করিতে পারিলে ঊর্ধ্বগতি হয়। এই ঊর্ধ্বগতি হয় শব্দব্রহ্মরাজ্য বা শক্তিরাজ্য পর্যন্ত। তাহার পর শিবরাজ্য—এখানে নাদ নাই। ইহা নির্বিকল্প অবস্থা। এখানে পৌঁছাইতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন তাহা শুধু 'ভাবনাত্মক'—"চৈতসৈব চিন্তয়িত্বা ভাবয়েৎ"। তখন 'মহাকৃপা' বর্ষিত হইয়া সাধক নির্বিকল্প মুক্তি লাভ করে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি বা শিবত্ব-সংযোজন। এই নির্বিকল্প শিবত্ব-সংযোজনের ফলে সেখানে ধাতা, ধ্যেয়, ধ্যান—সব কিছুরই অবসান হয়।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের 'জীবন্মুক্তি'র ধারণার সহিত আগমশাস্ত্রের 'জীবন্মুক্তি'র ধারণার পার্থক্য সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন প্রসঙ্গতঃ তাহা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—

"পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা আছে। চিত্তের বৃত্তি একাগ্র হইলেই তাহা সমাধিতে পরিণত হয়। এই একাগ্রভূমিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। প্রজ্ঞার প্রভাবে চিত্ত-নিহিত অনাদিকালের সঞ্চিত অবিদ্যা

নষ্ট হইয়া যায। অবিদ্যাবশতঃ জীবের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান জাগে এবং কর্তৃত্বাভিমানে কৃতকর্মের ফলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং মৃত্যুরাজ্য পরিভ্রমণই সার হয। অবিদ্যাই মূল ক্লেশ। সুতরাং অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান কাটিয়া যায়। এই জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা সালম্বন চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। আলম্বন যেমন যেমন বর্হিজগৎ হইতে অন্তর্জগতে পবিবর্তিত হয়, তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা ক্রমশঃ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্মুখ হইয়া 'অস্মিতা'রূপে পরিণতি লাভ করে। বাহ্য বিষয় স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। ইহাই 'বিতর্কসমাধি'র বিষয়। তদ্রূপ সূক্ষ্মবিষয় 'বিচারসমাধি'র আলম্বন। এই উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাঙ্কর্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। সাঙ্কর্য থাকিলে ঐ জ্ঞানটি 'সবিকল্প' জ্ঞানরূপে পরিচিত হয়। সাঙ্কর্য না থাকিলে উহা হয় 'নির্বিকল্প' জ্ঞান। সবিতর্ক এবং সবিচার—এই উভয় জ্ঞানই সবিকল্পক। তদ্রূপ নির্বিতর্ক ও নির্বিচার—এই উভয় জ্ঞানই নির্বিকল্প। স্মৃতি পরিশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প দূর হয না। অর্থের সহিত শব্দ ও জ্ঞান—উভয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার—শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। তদ্রূপ অর্থের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও রহিয়াছে। ঐ স্থলে অর্থ বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী। বিতর্ক ও বিচার—উভয় সমাধিতেই সমগ্র জগৎ সম্পূর্ণ আযত্ত হইয়া যায়। ইহার নাম 'গ্রাহ্য সমাপত্তি'। ইহার পর 'গ্রহণ সমাপত্তি'তে অর্থের ভান থাকে না। ইহা 'সানন্দ-সমাধি' নামে পরিচিত। ইহাব পর 'অস্মিতা' তত্ত্ব আলম্বন করিয়া 'গ্রহীতৃ সমাধি'র উদয় হয। এই প্রকারে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য—এই তিনের সমষ্টিরূপ বিশ্ব আয়ত্ত হয়। ইহাই 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধির ক্রমবিকাশেব ইতিহাস। 'অস্মিতা' সমাধিতে উপনীত হইলে যোগী অতুলনীয ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সর্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বরূপ মহাসিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশের ফলে এইপ্রকার অনুপম ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার এই অবস্থায় হয় না, কারণ এই প্রজ্ঞার মূলে অবিবেক থাকিয়া যায। এইজন্য বিভূতি মার্গে পরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও 'কৈবল্য' পথে চলিবার সামর্থ্য জন্মে না। কোন ভাগ্যবান্ যোগী যখন এই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্যের উপরে বিতৃষ্ণ হয়, তখন সে বিবেকের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করে। চিত্ত বর্হিমুখ থাকিতে 'বিবেকখ্যাতি'র উদয হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যদিও ভোগ-বিতৃষ্ণারূপ বৈবাগ্য পূর্বেই সম্পন্ন হয়, তথাপি অধিকার-বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত বিবেকখ্যাতিব পথে অগ্রসর হওয়া যায না। বিবেকখ্যাতি বলিতে ইহাই বুঝায যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত প্রজ্ঞার অবয়বস্বরূপ চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ সত্ত্ব পরস্পর পৃথক এই বোধের উদয়। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাতেও

অবিবেক থাকে। এইজন্য চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ সত্ত্ব এই উভয়কে পৃথক করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। বিবেকখ্যাতির সাতটি স্তর আছে। এই সাতটি স্তরে বিবেকজ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, তখন চিৎ অর্থাৎ পুরুষ এবং সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি বা গুণ এই উভয়ের সংমিশ্রণ থাকে না। কিন্তু ইহা কি প্রকারে আবির্ভূত হয় তাহা বিবেচ্য।

ঐশ্বর্যের দিকে বিতৃষ্ণা জন্মিলেই 'আত্মা' যোগীর দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য স্ফুরিত হন। এই স্ফুরণের আলোকে গুণরূপী প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয়, তখন প্রকৃতি যে পরিণামশালিনী এবং আত্মা অপরিণামী তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয় না -'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথং ঋচ্ছতি।' এইজন্য পুরুষখ্যাতির অবস্থায় আত্মা নিজের আলোকে নিজের নিকট নিজেকে ধরা দেন। এই আলোকেই গুণরূপী প্রকৃতির দর্শন হয়, প্রজ্ঞার আলোকে নহে। ইহার পর খ্যাতির পূর্ণতায় পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এদিকে চিত্ত একাগ্রভূমি হইতে নিরোধভূমিতে উপনীত হয়। একাগ্রভূমিতে জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কারও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তখনও চিত্ত সংস্কারাত্মক অবস্থায় থাকে। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। তখন দ্রষ্টা পুরুষের নিকট চিত্ত সংস্কাররূপে তাহার দৃশ্য হইয়া বিদ্যমান থাকে। ইহাই পতঞ্জলিসম্মত দ্রষ্টার স্বরূপ-অবস্থিতিরূপ যোগ। নিরোধের অবস্থায় এরূপ হয়, তখনও কৈবল্য সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য সংস্কাররূপে হইলেও চিত্তের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। এই সংস্কারও যখন কাটিয়া যায়, তখন চিত্ত থাকে না। আত্মা তখন যোগী না হইয়াও কেবল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 'পর' বা শ্রেষ্ঠ যোগ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 'অপর' যোগ। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানকে অতিক্রম করা—ইহাই যোগের লক্ষ্য। জ্ঞানপ্রাপ্তির ফলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কার কাটিয়া যায়। তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান—সবই সংস্কারসহিত নির্মূল হইয়া যায়। যতক্ষণ চিত্ত থাকে ততক্ষণ দেহ থাকে। চিত্ত না থাকিলে দেহও থাকে না। যাহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয় তাহা চিত্ত না থাকিলে হয় না, কারণ চিত্ত না থাকিলে দেহকে ধরিয়া রাখিবে কে? তবে প্রারব্ধ কর্মের অবসান হইয়া গেলে চিত্তও থাকে না, দেহও থাকে না।

এই প্রসঙ্গে বেদান্তসম্মত জ্ঞানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেদান্ত জ্ঞানের সপ্তভূমি স্বীকারের আনুষঙ্গিকরূপে বলা হইয়াছে যে, চতুর্থভূমি আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের উদয়ের অবস্থা এবং পঞ্চমভূমি জীবন্মুক্তির অবস্থা। পঞ্চম,

ষষ্ঠ এবং সপ্তম—এই তিনটি ভূমি জীবন্মুক্তির। পঞ্চমভূমিতে জীবন্মুক্তকে বলে ব্রহ্মবিদ্, ষষ্ঠভূমিতে তাহার নাম হয় ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্, সপ্তমভূমিতে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ভূমিকে তুরীয় বলা যাইতে পারে। সপ্তমভূমি তুরীয়াতীত তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তমতে মূল অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি আছে—একটি আবরণ, অপরটি বিক্ষেপ। যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন আবরণটি কাটিয়া যায়, কিন্তু বিক্ষেপ তখনও থাকে। ইহা প্রারব্ধ কর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম থাকে, তাই দেহ থাকে এবং প্রারব্ধকর্মজন্য সুখ-দুঃখের ভোগও থাকে। কিন্তু এই ভোগ, ভোগমাত্র। ইহাতে অভিনব কর্মের বীজ বপন হয় না, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে নূতন কর্ম আর উদ্ভূত হয় না।

আত্মসাক্ষাৎকাররূপী জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিকল্প জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞানের পরে উদিত হয়। খাঁটি নির্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হইলে মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনের সম্যক্‌প্রকার লয় হইয়া গেলে দেহ থাকে না—ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। জীবন্মুক্ত জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি দুই-ই হইতে পারে। ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্তের পক্ষে নির্বিকল্প জ্ঞানের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত দেহ সংরক্ষণ করা সম্ভব। কারণ, প্রারব্ধকর্ম কাটিয়া গেলেও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন যোগীর দেহধারণ সম্ভবপর। কিন্তু জীবকোটি জীবন্মুক্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। জীবকোটি জীবন্মুক্ত ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন না হওয়ার দরুণ শুধু প্রারব্ধ কর্মের বলেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধের অবসানে দেহপাত হয়। তাহা ছাড়া জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন কথা বলিবার আছে। সিদ্ধমার্গ, রসায়নমার্গ এবং প্রাচীন আগমমার্গ অনুসারে জীবন্মুক্তের চিত্তে অবিদ্যার লেশ থাকিতে পারে না এবং জীবন্মুক্ত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া স্বেচ্ছা অনুসারে যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিন দেহ ধারণ করিতে পারেন। সিদ্ধদেহ কালের অতীত, এইজন্য সিদ্ধযোগী ইচ্ছামৃত্যু হইয়া থাকেন। তিনি প্রারব্ধের অধীন নহেন। এই ইচ্ছামৃত্যু তিরোধান মাত্র, প্রচলিত অর্থে মৃত্যু নহে। আবার এমন জীবন্মুক্তও আছেন, যিনি কল্পান্তকাল অথবা মহাকল্পান্তকাল পর্যন্ত ঐ একই শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারেন।" (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা-৮২)

এক্ষণে "বিভূতি ও যোগশক্তি" শিরোনামায় ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণ-সংঘ-বার্তা' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিভূতি ও যোগশক্তি—"সাধারণতঃ অনেকেরই ধারণা আছে যে যোগাভ্যাস

করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে নানা প্রকার বিভূতির প্রকাশ হয়। এ সকল বিভূতি বুত্থান অবস্থায় সিদ্ধিরূপে গণ্য হইলেও নিরোধের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে বিভূতিপাদে কতকগুলি যোগবিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং কি প্রকার সংযমের ফলে কোন্ বিভূতির উদয় হয় তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগ বলিতে 'ক্রিয়াযোগ' ও 'সমাধি যোগ' দুই-ই বুঝিতে হইবে। চিত্ত যখন বহির্মুখ থাকে তখন তপস্যা, স্বাধ্যায় বা মন্ত্রজপ এবং ঈশ্বর প্রাণিধান—এইগুলি ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হয। ক্রিয়াযোগের অভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ চিত্ত অন্তর্মুখ হইলে সমাধিযোগের অধিকার জন্মে। সমাধির ফলে ধীরে ধীরে আত্যন্তিক নিরোধ হয।

সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুইপ্রকার। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই ক্রম ধরিযা সমাধি ক্রমশঃ প্রমেয হইতে প্রমাতা পর্যন্ত অগ্রসর হয। প্রত্যেক সমাধিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। ইহা একটি স্থির আলোক-স্বরূপ। ইহাকে ক্রমশঃ শোধন করিতে হয। বিতর্ক-সমাধির প্রজ্ঞালোক হইতে বিচার-সমাধির প্রজ্ঞালোক শ্রেষ্ঠ। কারণ একটি স্থূল অপরটি সূক্ষ্মসত্তাকে গ্রহণ করে। আনন্দ-সমাধির প্রজ্ঞা তাহাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কাবণ, ইহা কারণকে গ্রহণ করে। অস্মিতা সমাধির প্রজ্ঞালোক সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই তিন ভাগে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে গ্রহণ করিযা থাকে। অস্মিতা সমাধিতে উপস্থিত হইলে যোগীর সম্মুখে দুইটি পথ খুলিয়া যায়। একটি বিবেকের পথ এবং অপরটি প্রকৃত যোগের পথ। সাধারণতঃ বিবেকের পথই অধিকাংশ লোকে ধারণা করিতে পারে। অস্মিতা সমাধির প্রজ্ঞালোকে মলিনতা আছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই মলিনতার পরিহার বিভিন্ন প্রণালীতে সম্ভবপর। এই মলিনতার দৃষ্টিভেদে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে অস্মিতাতে গুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ এবং চিৎ বা পুরুষ মিশ্রিত রহিয়াছে। এই সত্ত্ব ও পুরুষকে পৃথক করিযা বিবেকখ্যাতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই পথে চলিতে চলিতে পুরুষ বা আত্মা বিদ্যুৎ চমকের মত অকস্মাৎ নিজ স্বরূপ দেখিতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিণামশীল প্রকৃতির খেলাও দেখিতে পায়। পরিণামী ও অপরিণামী উভয় সত্তার দর্শন এক সঙ্গেই হয়। তখন পরিণামী প্রাকৃতিক সত্তা ত্যাগ করিয়া অপরিণামী চিৎ-সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় অবশ্য ধীরে ধীরে। ইহার অন্তিম লক্ষ্য—কৈবল্য। এইটি হইল বিবেকের পথের বিবরণ। যোগেব পথ ইহা হইতে ভিন্ন। যে যোগের কথা বলিতেছি ইহাই প্রকৃত যোগ। অস্মিতা পর্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও ইহাকে বিশুদ্ধ যোগ বলা যায় না। প্রকৃত যোগের পথে চলিতে গেলে অস্মিতা অবস্থাতেও দুইটি দোষ লক্ষিত হয়। অস্মিতা-প্রজ্ঞার আলোকে দুইটি কারণে

মলিন এবং মলশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত উহা প্রকৃত যোগের পথে চলিতে সাহায্য করে না। এই দুইটি মলের মধ্যে একটির নাম আসক্তি এবং অপরটির নাম গর্ব বা অহংকার। অস্মিতা সমাধি পর্যন্ত যে যোগ নিষ্পন্ন হয় তাহা বিশুদ্ধ যোগ নহে, কারণ তাহাতে দেহশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি সম্যক প্রকারে হয় না। এইজন্যই মধুমতীভূমিতে যোগীকে নানা প্রকার অলৌকিক বিঘ্ন এবং উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। আসক্তি না থাকিলে এবং অহংকারের উদয় না হইলে আশঙ্কার কোনো কারণ থাকে না। বিবেকমার্গী সাধক এইজন্য প্রথম হইতেই মলিনতার মূল কারণ প্রাকৃতিক সংসর্গ বর্জন করিয়া বিবেকখ্যাতির পথে চলিয়াছেন, কিন্তু যোগীর পথ ইহা হইতে ভিন্ন। যোগী প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না বরং নিজের সহিত যুক্ত করেন। যোগমার্গে যখন আসক্তি ও অহংকার নিবৃত্ত হইয়া প্রজ্ঞার আলোক বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পায় তখন ঐ আলোকের সাহায্যে যোগী পঞ্চভূতাত্মক নিজের দেহ এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় (বাহ্য ও আভ্যন্তর) ঐ আলোকের দ্বারা শোধিত করেন। কায়শুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি এই প্রকারে সম্যক্‌ভাবে সিদ্ধ হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয়। তখন পাতঞ্জল-দর্শন বর্ণিত খণ্ডবিভূতির কোনো প্রশ্ন তাঁহার নিকট থাকেই না, কারণ খণ্ডবিভূতি সংযম ব্যতীত জন্মে না। শুধু ইচ্ছা হইতে খণ্ডবিভূতির উদয় হয় না। ইচ্ছাকে আশ্রয় করিয়া অনুরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় ভিন্ন কোনোরূপ খণ্ডবিভূতির আবির্ভাব হয় না—যেমন ভুবন জ্ঞানের জন্য সূর্যে সংযম আবশ্যক হয় ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিভূতি সংযমমূলক এবং সংযম প্রযত্ন সাপেক্ষ। কিন্তু কায়শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইয়া গেলে প্রকৃত যোগমার্গে সংযমের আবশ্যকতা মোটেই থাকে না। সংযমের প্রয়োজন হয় দেহ অশুদ্ধ বলিয়া এবং ইন্দ্রিয় অশুদ্ধ বলিয়া। দেহেন্দ্রিয়ের সম্যক্‌ শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে ইচ্ছামাত্রই তদনুরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ইচ্ছারূপা শক্তি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় কলায় কলায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঠিক পূর্ণিমাতে উপনীত হইয়া ইহার সম্যক্‌ পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয়। ইহার পর ক্রমশঃ ইচ্ছা কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় কলায় কলায় ক্ষীণ হইতে থাকে। অমাবস্যাতে যেমন কোনো কলারই অবশিষ্ট থাকে না, তদ্রূপ যোগীর ইচ্ছা চরমস্থিতিতে একেবারে শূন্য হইয়া যায়। ঐ ইচ্ছা তখন যাহা তাহার পূর্ণ সম্পদ বিশ্বজননীকে যোগী অর্পণ করেন। তখন যোগীর নিজের কোনো ইচ্ছা থাকে না। মহা-ইচ্ছা তাঁহাকে পালন পোষণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌"। ইহার পরও অবস্থা আছে। তখন মহা ইচ্ছাও অতিক্রান্ত হইয়া যায়—তখন শুধুই স্বভাবের খেলা।"

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে বিভূতি কৃত্রিম এবং যোগশক্তি স্বাভাবিক। চরমে অবশ্য এক অদ্বয় পরমতত্ত্ব যাহা তত্ত্ব হইয়াও তত্ত্বাতীত।

(দ্রষ্টব্যঃ--- শ্রীকৃষ্ণ-সংঘ-বার্তা পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৫)

পাতঞ্জল যোগের কৈবল্য-প্রাপ্ত পুরুষ আর শৈব-যোগের মুক্ত পুরুষ— একদিন আমাদের নিকট কবিরাজ মহাশয় পাতঞ্জল যোগের কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ আর শৈবযোগের মুক্ত পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তারই ফলশ্রুতি। তিনি যেভাবে আলোচনা করেছিলেন সেইভাবেই বিষয়টি উত্থাপিত করা হ'ল।

কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্তের একগ্রতা সাধনের ফলে একাগ্রভূমিতে সেই অবলম্বিত বিষয়ই এক জ্যোতির্মণ্ডলে পরিণত হবে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি আলম্বন-শূন্য এক অখণ্ড প্রকাশ সত্তা—যাহা কৈবল্যাবস্থা। এই একাগ্রভূমিতে সাধকের সম্মুখে কি দৃষ্ট হবে? শুধু ঐ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হবে না। একসময় সেই জ্যোতির্মণ্ডলে সমগ্র বিশ্ব দৃষ্ট হবে। ইহাই অস্মিতা-সমাধি। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এই জ্যোতির্মণ্ডলে দৃষ্ট হবে। এই জ্যোতির্মণ্ডল সৎ এবং চিতের মিলিত সত্তা। জ্যোতির্মণ্ডলই বিভিন্ন ধর্মসাধক গুরুর বিভিন্ন ধাম। শৈবসাধক গুরুর শিবধাম, বৈষ্ণবসাধক গুরুর বিষ্ণুধাম, শাক্তসাধক গুরুর শক্তিধাম, বৌদ্ধসাধক গুরুর বোধিধাম প্রভৃতি। এই সমস্ত গুরু তাঁদের আশ্রিত শিষ্য-সাধকদের যাদের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে কর্ম সম্পূর্ণ হয়নি বা কর্মমল পরিপাক হয় নি, তাদের নিজ নিজ ধামে টেনে তুলে নেন। সেখানে মায়ার শক্তি নেই যে তাদের মর্তে টেনে এনে মর্ত-শরীর বা প্রপঞ্চময় শরীর গ্রহণে বাধ্য করে। কারণ, এ ধাম মায়ার ঊর্ধ্বে। এখানে স্থান-প্রাপ্ত সাধকের অসম্পূর্ণ কর্মের পরিপাক হতে থাকে নিজেদের প্রযত্ন ব্যতীতও। কিন্তু এই জ্যোতির্মণ্ডল মলিন। কারণ, ইহা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। পুরুষখ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি লাভ করিলে আকাশ দেখার সঙ্গে যেমন নক্ষত্রও দৃষ্ট হয়, তেমনি যোগীর পুরুষ-স্বরূপ-দৃষ্টের সঙ্গে প্রকৃতিও দৃষ্ট হয়। তারপর প্রকৃতিও সরে যায়। তখন পুরুষই পুরুষ অর্থাৎ কেবল পুরুষ-অবস্থা—উহাই কৈবল্য মুক্তি। কৈবল্যাবস্থা-প্রাপ্ত পুরুষ তখন কি দেখে? এখানে পুরুষের তিনটি অবস্থা—এক, আত্মগত ভাব—নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখে না; দ্বিতীয়, উদাসীনবৎ প্রকৃতি দর্শন। এই দর্শন হইতে প্রকৃতি পরিণামশীল হয়; তৃতীয়, প্রকৃতিতে সকাম দৃষ্টি। ইহার দ্বারা সৃষ্টি হয়, সৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত হয়। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয—ইহার অধীশ্বর ঈশ্বর। ইনিই হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল থাকে। অস্মিতা সমাধি-প্রাপ্ত সাধক হিরণ্যগর্ভ-জ্যোতির্মণ্ডলে স্থান পায়। তারপর ধীরে ধীরে যখন জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্রে উপনীত হয তখন একই সঙ্গে একই সময়ে সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে যে সাধনোপায় তাহা

বৈরাগ্যমূলক। ইন্দ্রিয়, মন-চিত্তকে অবদমিত করিয়া বা অবরোধ করিয়া বা নিগ্রহ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পন্থা। এখানে ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির পরিচালক যে শক্তি উহাকে বিসর্জন দেওয়া বা পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু শক্তি তো আমারই শক্তি। আমার শক্তিকে আমার অনুগত না করিয়া যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে তো আমাকে অসম্পূর্ণ থাকিতে হয়। আমার যে কৈবল্য-মুক্তি, সে তো অসম্পূর্ণ মুক্তি। তাতে শুদ্ধ প্রকাশময় চিৎ-স্বরূপে লীন হইয়া কেবলী জ্ঞানের ফলস্বরূপ স্বরূপে অবস্থান হয়, কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানা হয় না। অর্থাৎ 'আমি কে'—এ বোধ জাগ্রত হয় না। সেইজন্য শৈব বা শাক্ত পন্থী যাঁরা তাঁরা কৈবল্য মুক্তিকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, পরমব্রহ্মকে পরমশিব বা পরাশক্তি যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তিনি শিব ও শক্তির সামরস্যজনিত এক অভিন্ন সত্তা—শিব ও শক্তির মিলিত যুগল-সত্তায় গঠিত এক অদ্বয় সত্তা। সুতরাং শক্তিকে বাদ দিলে তো আমার অখণ্ডত্বের হানি হয়। সুতরাং কেবল পুরুষ-জ্ঞানে তো আমার অখণ্ড পূর্ণত্বের উপলব্ধি হয় না। কৈবল্যাবস্থায় আমার পূর্ণ স্বরূপ তো সঙ্কুচিতই থাকে। অতএব আমি পশুই থাকিয়া যাই। পশুত্বের মোচন হয় না যতদিন না পরম করুণাময়ের কৃপা পতিত হয়। অতএব শৈব বা শাক্তগণ শক্তিকে বাদ দিয়ে কৈবল্য মুক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁরা শক্তিকে অধিগত করে, অনুগত করে স্বাতন্ত্র্যময় পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

তাঁরা বলেন, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে কি হবে? ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর মন। মনই তাদের চালিত করে। অতএব প্রথমে মনকে বশীভূত কর। মনকে বশীভূত করতে পারলে ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য আসবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় হবে। মন বশীভূত হওয়াই তো সমাধি। সমাধি অন্য কিছু নয়। কিন্তু মনকে বশীভূত করবো কি করে? নিগ্রহের দ্বারা? না, তা কেন? মনের যে চাঞ্চল্য তার জন্য মনের কি দোষ? মনকে যে চালিত করছে তাকে ধরো, তাকে বশ মানাও? সে কে? সে নিজেরই শক্তি। নিজের ঘরণীর সঙ্গে তোমার বনিবনা নেই তো অপরে (ইন্দ্রিয়, মন) তোমার কথা শুনবে কেন? তুমি নিজ শক্তিকেই যখন চেন না, তখন তো তুমি অজ্ঞানী। প্রথমে নিজেকে চেন, নিজের স্বরূপ জ্ঞান লাভ কর, তখন শক্তি তোমার বশীভূত হবে। আমি কে—এ স্বরূপজ্ঞান যদি লাভ করতে পার তো দেখবে তুমিই বিশ্ব। বিশ্ব তোমা হতে পৃথক নয়। তখন আর কোন ভেদ-জ্ঞান থাকবে না। বিশ্বের মধ্যে তোমাকে এবং তোমার মধ্যে বিশ্বকে দেখতে পাবে। এই যে স্বরূপ জ্ঞান—এই হচ্ছে শুদ্ধ জ্যোতি, চিন্ময় জ্যোতি, শুধুই চিতের অখণ্ড প্রকাশ যাহার আলোকে সমগ্র বিশ্ব ভাসমান্ প্রতিফলিত দর্পণবৎ। এই শুদ্ধ

প্রকাশ বা জ্যোতি পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলব্ধ জ্যোতির্মণ্ডল হইতে ভিন্ন। পাতঞ্জল যোগের জ্যোতির্মণ্ডল সত্ত্বঃ ও চিৎ-এর মিলিত সত্তা—উহা মলিন, যেহেতু উহা প্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু শৈব বা শাক্ত দর্শনে এই প্রকাশ বা জ্ঞানালোক শুদ্ধ চিৎ, প্রকৃতির অধিকারের ঊর্ধ্বে—নির্মল। কিন্তু এই আলো স্বচ্ছ, নির্মল হইলেও ঘনীভূত এক আলোর আবরণ যা সব কিছু আবৃত করে, যেমন অন্ধকার আবৃত করে সব কিছু। এই ব্রহ্ম-জ্যোতিতে ডুবে থাকলেও পূর্ণ স্বরূপ জ্ঞান হবে না। সুতরাং এই জ্যোতিকেও ভেদ করতে হবে। তখনই পূর্ণ অনাবৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

পূর্বে যাহা বলিয়াছি, সেই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে সৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা আসে। স্বরূপ-জ্ঞানযুক্ত যে ইচ্ছার উদয় হয় তাহাই ইচ্ছাশক্তি। ইহাই আপন শক্তি—স্বাতন্ত্র্যধর্মী যদিও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময় নয়। কারণ তখনও পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থান হয়নি। এ সময়ে ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সৃষ্টি হয়। এই যে সৃষ্টিক্ষমতা বা শক্তি—ইহাই ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি তখন আপনার বশীভূত। অজ্ঞান অবস্থায় যে ইচ্ছার উদয় হয়, সেটা ইচ্ছাই, তার দ্বারা কোন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু স্বরূপজ্ঞান যখন উদয় হয়, তখন ইচ্ছাই ইচ্ছাশক্তি।

এখানে আলোচনা শেষে আত্মা কি ভাবে নীচে নেমে আসে দু-এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন। যখন পরমাত্মা-সত্তা হইতে সম্ভূত আত্মা পরমাত্মারই প্রেরণায় জাগ্রত হয়, তখন সেই আত্মার নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না। জাগ্রত হয়ে দেখে পরমাত্মার জ্যোতি যেটা, সেটা তারও জ্যোতি, তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। তখন বলে 'এই জ্যোতিই আমি'। তখন সে জ্যোতির আবরণে পরিচ্ছিন্ন হয়ে পরিমিত প্রমাতারূপে পরিণিত হয়। পরিমিত প্রমাতার সম্মুখে কি ভাসতে থাকে অর্থাৎ কি সে দেখে? সে দেখে অনন্ত শূন্য—ইহাই শূন্য প্রমাতা। এই শূন্য প্রমাতায় পরাবাক্ চেনের (chain) মত পর পর দৃশ্যের অবতারণা করে যায়। পরিমিত প্রমাতার দৃষ্টি যখন কোন একটি দৃশ্যে বদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে তদ্ভাবাপন্ন হয়ে 'অপর প্রমাতা'র স্তরে নেমে আসে। এইরূপে যিনিই কর্তা, তিনিই করণ, আবার তিনিই কার্য। পরাবাক্ অনাদি নিত্য, কারণ উহা পরমাত্মার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যশক্তিরই এক দ্বিতীয় সত্তা।

পতঞ্জলির কৈবল্য যোগ ও বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ—

পাতঞ্জল যোগে চিত্তের পাঁচটি ভূমি—(১) মূঢ়, (২) ক্ষিপ্ত, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, (৫) নিরোধ। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব—ত্রিগুণের সমবায়ে চিত্ত গঠিত। তমঃ হইল তামসিক বা অচিৎ, রজঃ হইল ঐশ্বর্যভাব, সত্ত্ব হইল

আত্মভাব। এই তিনটি গুণ বা উপাধি প্রকৃতিব অন্তর্গত। যখন চিত্তে একটির প্রাধান্য তখন অন্য দুইটি গুণও যদিও প্রকট হয় না, কিন্তু শূন্য হইয়া যায় না; প্রাধান্যপ্রাপ্ত গুণের মধ্যে অন্তর্লীন অবস্থায় সমাবিষ্ট থাকে।

চিত্তের একাগ্র বৃত্তিও যোগ—সম্প্রজ্ঞাত যোগ। চিত্তের একাগ্র বৃত্তিতে যোগী যখন তমোগুণ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বজোগুণের প্রাধান্য লাভ করে তখন বিভূতি বা ঐশ্বর্যেব অধিকারী হয। রজোগুণকে ক্ষীণ করিয়া তাহা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া যখন শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখন যোগী আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিয়া স্থিতি লাভ করে অর্থাৎ প্রজ্ঞা লাভ কবিয়া আত্মস্বরূপে সমাহিত বা সমাধিষ্ঠ হয়—ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিয়া আত্মার স্বরূপে স্থিতি হইলে হয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিয়া অর্থাৎ নিজের মধ্যে আত্মশক্তিকে জাগ্রত না করিয়া তাকে পাশ কাটাইয়া আত্মস্বরূপে স্থিতির ফলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তাহা কৈবল্য মুক্তি। কৈবল্যমুক্তি জীবের নিম্ন স্তরের আত্মসিদ্ধি। কারণ, এখানে জীবের ব্রহ্ম-সত্তায় প্রবেশ ঘটে বটে, কিন্তু ব্রহ্মকে জানা হয না, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সেই সঙ্গে আত্মস্বরূপেরও কোন পরিচয বা জ্ঞান লাভ হয় না।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাতঞ্জল যোগে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণের অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের ক্রম পরিবর্জনে এবং অবশেষে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণেব লীলাভূমি যে-চিত্ত সেই চিত্তের সকল বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া হয় কৈবল্য যোগ।

বৈষ্ণবধর্মে চিত্তের নিরোধ নাই। ঐ ধর্মে শুদ্ধ সত্ত্বের পরেও অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা নিত্য সত্ত্ব লাভের কথা আছে। বৈষ্ণবধর্মে ভক্ত প্রাকৃত ভূমিতে ইষ্টদেবতার সহিত মিলনের লাগি আকুল ক্রন্দন করে। প্রাকৃত ভূমিতে ভক্তের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন যখন পরিপক্ক হয়, তখন গুরুর কৃপা লাভ করে। গুরু ইষ্টদেবতাই। গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ করে আত্মজ্ঞান লাভ করে। গুরুদত্ত মন্ত্রই চিন্ময় শক্তি-বিশিষ্ট এবং উহার অবিচ্ছিন্ন জপে ঐশ্বরিক শক্তিরও বিকাশ হয়। আত্মজ্ঞান ও সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মজ্ঞানেরও (যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে) উর্ধ্বভূমিতে ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা নিয়ে তীব্র ভাব-সাধনায় অগ্রসর হয়, তখন ভক্তের শরীর রূপান্তরিত হয়ে ভাবদেহে পরিণত হয়। এই ভাবদেহ লাভই হল অপ্রাকৃত সত্ত্বের অধিকারী হওয়া। এও এক প্রকার উপাধি, কিন্তু নিত্য উপাধি। নিত্য সিদ্ধ ভক্ত নিত্য সিদ্ধ উপাধির অধিকারী হয়ে নিত্য সিদ্ধ ব্রজলোকে প্রবেশ কবে নিত্য লীলায় অংশ গ্রহণ করে রস আস্বাদন করে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যে সত্ত্বগুণ, অপ্রাকৃত সত্ত্ব উহার বহু উচ্চে অবস্থিত। এ হল প্রাকৃত ভূমির প্রকৃতির

ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ স্বরূপ শক্তিরই গুণ। প্রাকৃত ভূমির প্রকৃতির তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব গুণের বিলয়-সাধনে যে কৈবল্য লাভ হয় তাহাতে সাধকের আত্মস্বরূপে প্রবেশ ঘটে বটে, কিন্তু আত্মশক্তির বিকাশ না ঘটায় পরমস্বরূপের উপলব্ধি হয় না।

বৈষ্ণব মতে যোগী কে? পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলে, 'প্রকৃতি-লয়' যাঁহাদের হয় তাঁহারা এবং 'ভব-প্রত্যয' দেবতারা যোগী নহেন। প্রকৃতিলয যাঁহাদের হয়, তাঁহারা কালের অতীত হন, পুনর্বার জন্ম নিতে হয় না, সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আত্ম-সাক্ষাৎকারও হয় এবং তাহাতেই সাধক নিমজ্জিত হয়ে যান, চিত্ত প্রকৃতিতে লয় হয়ে যাওয়ায় নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে চিৎ-সত্তায লয হয়ে যান। সুতরাং বৈষ্ণব মতে তাঁহারাও যোগী নন। ভব-প্রত্যয়রূপ দেবতারা কালাতীত হয়ে অর্থাৎ কালের পরিণাম থেকে অব্যাহত থেকে পরমেশ্বর-প্রদত্ত নিজ নিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁহাদের অধিকার-কাল পূর্ণ না হওযা পর্যন্ত স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবস্থান করতে থাকেন, পরমেশ্বরের অর্পিত কর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারেন না। কার্যকাল পূর্ণ হলে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করে তাঁদের তাঁর সদর মহলে স্থান দেন। তাঁহারা তাঁর বহির্মহলের পার্ষদ। পরমেশ্বরের সহিত তাঁদের দূরত্ব থেকেই যায, কখন তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে অন্দর-মহলে প্রবেশের অধিকার পায় না। সুতরাং তাঁরাও যোগী নন। একমাত্র মানুষকেই তাঁর অন্তরঙ্গ হবার এবং অন্তরঙ্গভাবে লীলা করে তাঁর স্বরূপানন্দ আস্বাদন করবার ধিকার দিয়েছেন। এ দিক থেকে দেখলে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। চণ্ডীদাসের নিজ সাধন-জীবনের উপলব্ধির ভাষায় বলি—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার অন্তরঙ্গ নিবিড় যোগই প্রকৃত যোগ এবং যে মানুষ সেই যোগ স্থাপন করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী। তাহলে যোগীর লক্ষণ কি হবে? সেই লক্ষণটি হল, যোগী সাধনার দ্বারা আত্ম-অভিজ্ঞ হয়ে সেই অবস্থায চিত্তকে প্রকৃতি-লীন হতে না দিয়ে অর্থাৎ কৈবল্যের দিকে না গিযে চিত্তকে ধরে রেখে আপন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য (individuality) রক্ষা করে প্রেমভক্তির আশ্রয়ে পরমেশ্বরের সহিত একাত্মরূপে অভিন্ন হয়ে সচ্চিদানন্দের চিদানন্দরস আস্বাদনের জন্য উচ্চতর সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া। শেষ পর্যন্ত নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁহার সমীপে উপনীত হতে পারলে বলতে পারবে—'তুমি আমার, একান্ত আমারই'। তাই রাসলীলায় দেখতে পাই,

প্রত্যেক গোপী আপন স্বভাবে কৃষ্ণানন্দবস আস্বাদন করছেন এবং প্রত্যেকেবই এই মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণ শুধু তাঁহাবই, আর কাহাবও নয়। অবশ্য এখানেও গোপীবা কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ভাবে পায়নি। কাবণ এখনও 'কৃষ্ণ যে আমাব'—এই আমিত্ব-বোধ—ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ অহংবোধ হলেও, আছে। এই বিশুদ্ধ অহংকেও এইবার বিসর্জন দিতে হবে। তাই কৃষ্ণ আত্মগোপন করলেন, বিচ্ছেদের মধ্য দিযে তাঁদেব অহংবোধেব নিবৃত্তি ঘটিয়ে তাঁহাতে পবিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব জাগিয়ে তোলবার জন্য। অর্থাৎ 'আমি তোমাবই' এই ভাব যতক্ষণ না উদয় হচ্ছে ততক্ষণ পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ সম্ভব নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয প্রীতি ইচ্ছা তাবে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব 'তুমিময়' হতে হবে। তোমার ইচ্ছাই আমাব ইচ্ছা, তোমার প্রীতিতেই আমার আনন্দ—ইহাকেই বলে ভাব-সাম্মিলন। ইহা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রকৃত যোগ হয় না এবং প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন হয় না।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করাব জন্য এখানে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত কবছি (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্র সং-৫৭)।

"এই বিচ্ছেদ বেদনা যতই তীব্র হইযা উঠিবে ততই উহার মধ্য হইতেই একটা অপূর্ব মধুব রস ফুটিয়া বাহির হইবে। তখন মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদকেই অধিকতব সহনীয বোধ হইবে। কাবণ ইহার ফলে যে প্রিযজনকে মিলনাবস্থায নির্দিষ্ট দেশে ও নির্দিষ্ট কালে আংশিকভাবে পাওযা যায, তাহাকে সর্বদেশ ও সর্ব কালব্যাপীরূপে পূর্ণভাবে সাক্ষাৎকাব করা যায। ইহাই মহামিলনের পূর্বসূত্র। এইপ্রকার তীব্র বিচ্ছেদ বোধ না থাকিলে অনন্ত মিলন সম্ভবপর হয না। তাই ভক্ত বিচ্ছেদ কাটিয়া গেলে ব্যাকুল হইযা পড়েন।

'বিচ্ছেদ সুমধুর হল দূব কেন বে
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন বে।'

পক্ষান্তরে যে মিলনকে আপনারা অভিনন্দন করেন ভক্ত সে মিলনে বিচ্ছেদই দেখিতে পায়, কারণ 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিযা'। দুইটি লোক একটি প্রদেশে অবস্থিত হইলেও যে মিলন হয়, তাহা নহে। ভাবের সঙ্গে ভাব, গুণের সঙ্গে গুণ, এবং স্বরূপের সহিত স্বরূপের যোগ না হইলে মিলন কোথায়? তাই লৌকিক মিলনের মধ্যেও বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায। কিন্তু সে বিরহও তো রস। তাহাব মাধুর্য অনুপম। কিন্তু সকলে তাহা আস্বাদন করিতে পারে না, কারণ সে বিবহেব বোধ সকলের হয় না। এ বিরহও তাঁহাকেই অর্পণ কবিতে হয। এ রস তাঁহারই জন্য—ইহাই প্রকৃত সমর্পণ। ইহা ঠিক ভাবে করিতে পাবিলে হৃদযেব সকল খেদ মিটিযা যায়।

তাই কবি বলিয়াছেন—

'মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়
অর্পিনু হাতে তাঁর
খেদ নাই আর মোর খেদ নাই।'"

বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা এলেই যোগী হওয়া যায় না। অর্জুনের মধ্যে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার নিদর্শন পাই, কিন্তু তাই বলে অর্জুন যোগী নয়। ইষ্টদেবতার মূর্তি বা পটের সামনে একাগ্র হয়ে ধ্যান করলেই ইষ্টদেবতার সহিত সাধকের যোগ হয় না। সমস্ত জীবন ধরে ধ্যান করলেও ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ মেলে না। ইষ্টদেবতার দর্শন পেতে হলে শুধু চিত্তবৃত্তির একাগ্রতায় সম্ভবপর নয়, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ভূমির একাগ্রতা। ভূমির একাগ্রতার অর্থ হল 'স্থায়ী ভাব'। অর্থাৎ সাধকের সর্বদাই মনে হবে যে তার ইষ্টদেবতাকে না পেলে বুঝি তার এক মুহূর্তও চলে না, তাঁকে ভিন্ন প্রাণ-ধারণ করা তার কাছে বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁকে ছাড়া জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। তাঁর বিরহ-ব্যথায় চিত্ত সর্বদাই বিমর্ষ। ব্যবহারিক জগতের বা সংসারের নানা কর্মের মধ্যে নিযুক্ত থাকলেও তার অন্তরাত্মা তাঁর জন্য সর্বদাই আকুল ভাবে ক্রন্দনরত। প্রাণের এই স্থায়ী ব্যাকুলতা বা প্রবেগেরই নাম হল 'স্থায়ী ভাব'। স্থায়ী ভাবাপন্ন সাধকই বৈষ্ণবধর্মে 'মঞ্জরী' বলে কথিত। মঞ্জরীরাই হল পার্থিব জগতে বৈষ্ণব গুরু (সুফি সম্প্রদায়ের সাকিয়াদের ন্যায়)। ভাব-সাধনার পথে মঞ্জরীই প্রথম অবলম্বন। তারপর হ্লাদিনীশক্তির সহচরী সখিবৃন্দের অবলম্বন। তারও পরে রাগাত্মিকা পথ।

স্থায়ীভাবই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে একান্ত লভ্য বস্তু। স্থায়ীভাবে সমাধিস্থ হবার অধিকারী হওয়াই তাদের সাধনার প্রধান কাম্য, সাধকের লক্ষ্য। এই স্থায়ীভাবে আরূঢ় হতে পারাই অর্থাৎ ভাব-সমাধিস্থ হতে পারাই হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। স্থায়ীভাবেরও পরে সাধকের দেহ যখন ভাবদেহে পরিণত হয় অর্থাৎ ভক্ত সাধক যখন সিদ্ধভক্তে পরিণত হয়, তখন আর বৃত্তি থাকে না—স্বভাবেই তখন সাধনা চলতে থাকে (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত গ্রন্থ 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে' করা হয়েছে)।

এরও পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সেখানে স্বভাবের খেলাও নিরুদ্ধ। সেখানে প্রেমের বিষয়-বিষয়ী বা আশ্রয়-আশ্রিত ভাব নেই। এক অখণ্ড সত্তায় উভয়ের মিলন—ইহাই 'নিকুঞ্জ' লীলা।

প্রেম-সাধনার সর্বোচ্চ ভূমিতে রাধা হলেন প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। Radha lover and Krishna beloved। প্রেমের এরূপ ঘনীভূত

অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে ভালবাসেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীরাধা বিষয়। প্রেম এখানে receprocal বা relative। প্রেমের এই ঘনীভূত অবস্থায় আশ্রয় শুধু আশ্রয়ই থাকে না, বিষয়েও রূপান্তরিত হয়; আবার বিষয়ও শুধু বিষয় থাকে না, আশ্রয়ে রূপান্তর ঘটে। বিষয়ের মধ্যে আশ্রয়, আশ্রয়ের মধ্যে বিষয়। তখন ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ভেদও নেই, আবার অভেদও নয়। এক অনির্বচনীয় অচিন্তনীয় ভেদাভেদ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য জেনে এবং জীব ও জগৎকে মায়ার বিভ্রান্তি জ্ঞানে জীব ও জগৎকে পরিহার পূর্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণার দ্বারা ব্রহ্মে লয় হওয়াই বৈদান্তিকযোগ। অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্মের মধ্যে লয় হওযাই জীবের পূর্ণতা। কিন্তু একটা বস্তু আর একটি বস্তুর মধ্যে লীন হলে পরে সেখানে পূর্ণতাবোধ কোথায় থাকে? এরূপ অবস্থায় লীয়মান্ বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকছে না। সুতরাং এই পর্যায়কে পূর্ণতা না বলে শূন্যতা (nihilism) বলা যেতে পারে। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি অসংখ্য নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তাতে সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সমুদ্র যেমন তেমনিই থাকে। অথচ গঙ্গা, যমুনা সমুদ্রে মিলিত হবার পর তাদের আর গঙ্গা, যমুনা বলে পৃথক সত্তা থাকে না। তারা সমুদ্রই হয়ে যায়। সুতরাং তাদের পূর্ণতা বোধের প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। কিন্তু গঙ্গার যদি গঙ্গা থেকেই অর্থাৎ নিজ ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেই অনন্ত সমুদ্রের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, সেখানেই গঙ্গার পূর্ণতা। পরমব্রহ্মের দুটি বিভাব—সর্বভূতাত্মক এবং সর্বাতীত। জীবরূপ ভূতাত্মক ব্রহ্ম নিজ স্বাতন্ত্র্যে বা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তারই আধারে যখন সর্বাতীত পরমব্রহ্মের অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়, তখনই জীবের পূণতা। এই ভূমিতে চিন্ময় জীব-ব্রহ্মের সহিত সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের অর্থাৎ সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত সর্বাতীত ব্রহ্মের যে নিবিড় যোগ, ভক্ত ও ভগবানের যে রসাত্মক মিলন, সেখানে দ্বৈতও লুপ্ত, অদ্বৈতও নাই। সে এক অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় জ্যোতির্ময় সত্তা।

প্রসঙ্গতঃ এখানে পত্রাবলীর ১ম খণ্ড হইতে কবিরাজ মহাশয়ের ৪০ সংখ্যক পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে সমাধিপ্রজ্ঞা, আত্মসাক্ষাৎকার ও পূর্ণ আত্মসাক্ষাৎকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে সমাধি অবস্থায় আত্মদর্শন হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ সমাধি চিত্তের অবস্থা বিশেষ। যথার্থ আত্মদর্শন হইল চিদ্রূপী সংবিদের স্ব-সাক্ষাৎকার। ইহা চিত্ত থাকিতে হয় না। চিত্তের আত্যন্তিক নিরোধ ব্যতিরেকে উহা সম্ভবপর নহে। আত্মসাক্ষাৎকার বস্তুতঃ আত্মশক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। আত্মশক্তি চিৎশক্তি—উহা চিত্ত নহে। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারের অর্থ আত্মা নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন।

ইহা বস্তুতঃ সমাধি অবস্থা নহে, সমাধিজনিত প্রজ্ঞাও নহে। কারণ সমাধিজনিত প্রজ্ঞা চিৎস্বরূপ ও অচিৎ সত্ত্বগুণ উভয়ের গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থা মাত্র। চিৎ ও অচিতের গ্রন্থিমুক্ত হইয়া গেলে সমাধিপ্রজ্ঞা থাকিতে পারে না। কারণ সত্ত্বগুণ তখন মূল প্রকৃতিতে অস্তমিত হইয়া যায়। চিদ্রূপ পুরুষ আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুরুষের স্বরূপই স্বপ্রকাশ বলিয়া সাক্ষাৎকারাত্মক। অতএব সমাধি অবস্থার পর যদি আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহা হইলে উহা পুনর্বার নিবৃত্ত হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া গেলে বাস্তবিক পক্ষে সমাধি ও ব্যুত্থান এই উভয় অবস্থায় ভেদ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কার ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার সত্ত্বেও সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই দর্শন বস্তুতঃ দর্শন নহে। ইহা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিভাস। যাহা দর্শন হয় বলিয়া মনে করা যায় অর্থাৎ জগতের ভান তাহা পূর্বদৃষ্ট জগতের সংস্কারজনিত স্মৃতিরূপে পুনরুদ্বোধন মাত্র। আত্মা একবার দৃষ্ট হইলে সেই দর্শনটাই থাকিয়া যায়। উহাই সত্য। ঐ দর্শনটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ দর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের সম্যক ক্ষয় না হয়। সংস্কার ক্ষীণ হইয়া গেলে উহা শুদ্ধ দর্শন রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধ আত্মদর্শনে অর্থাৎ কৈবল্য অবস্থায় মিথ্যা জগতের ভান থাকে না। ইহা কেবলী অর্থাৎ প্রকৃতি-বিযুক্ত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার (এই পর্যন্তই পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিচার শেষ)। কিন্তু শুদ্ধ হইলেও উহা পূর্ণ আত্মার দর্শন নহে। কারণ এই আত্মদর্শনে সর্বভূত দর্শন অন্তর্গত থাকে না। পূর্ণ আত্মদর্শন তখনই সম্ভবপর যখন সর্বভূতকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করা যায়। আত্মশক্তি বা চিৎশক্তির স্ফুরণরূপে সর্বভূতের দর্শন কৈবল্যাবস্থার পরই সম্ভবপর। কিন্তু এইরূপ পূর্ণ আত্মদর্শন যাহা পরাবস্থার নামান্তর, চিৎশক্তির উন্মেষ ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

আত্মার পূর্ণ স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে জগতের পৃথক্ সত্তা থাকে না। সবই তখন অখণ্ড চিদাত্মায় চৈতন্যময়ী শক্তির উল্লাসরূপে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, পূর্বানুভবের স্মৃতিরূপে নহে। অতীত ও অনাগত যতক্ষণ নিত্য বর্তমানে অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার বিকাশ সম্ভবপর নহে। ইহাই সর্বাত্মভাব—ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতভাব। এই মহানুভূতিতে দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের পৃথক সত্তা থাকে না। এক এবং অনন্ত সমানার্থক প্রতীত হয়। ইহাই উপনিষদের "যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ"।

সকল বস্তুই বস্তুতঃ আত্মা ইহা শুধু জানিয়া রাখিলে হইবে না। ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুভবে পরিণত করিতে হইবে। যখন সমাধিজনিত প্রজ্ঞা আভাসময় আত্মজ্ঞানরূপে উদিত হয় তখন ব্যুত্থান অবস্থায় উহা বর্তমান থাকে না, কিন্তু উহার স্মৃতি বর্তমান থাকে। তখন সাধক, 'আমি সমাধিকালে ক্ষণেকের

জন্য আত্মদর্শন করিয়াছিলাম, এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন।' কিন্তু যখন সমাধির অতীত অবস্থায় সত্য সত্যই আত্মদর্শন হয়—আভাসময় নহে, তখন বাস্তবিক পক্ষে সাধক জ্ঞানী। এই জ্ঞানলাভ হইলে আর ব্যুত্থান থাকে না এবং সমাধি অবস্থাও থাকে না। তবে চিত্তের দিক দিয়া সমাধি ও ব্যুত্থান এই দুইটি অবস্থার পার্থক্য তখনও থাকে, কারণ তখনও সংস্কার রহিয়াছে। এই অবস্থায় যে আত্মদর্শন হয় তাহা নিত্য দর্শন। তাহা কখনই নিবৃত্ত হয় না। জগতের ভান চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায় তখনও থাকে বটে কিন্তু উহা মিথ্যা প্রতীতিরূপে মাত্র প্রকাশ পায়। প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষীণ হইয়া গেলে এই মিথ্যার আভাসও বিগলিত হইয়া যায়। তখন একমাত্র আত্মাই থাকেন এবং নিজেই নিজের নিকট প্রতিভাসমান হন। তখন প্রারব্ধ সংস্কার থাকে না—ইহা বিদেহ কৈবল্য। বিদেহ কৈবল্যের পর 'পরাবস্থা'। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে বিদেহ কৈবল্যের পর পরাবস্থা লাভ হয় না। ভগবদনুগ্রহে স্বরূপস্থ চিদ্রূপী আত্মার চিদ্রূপা শক্তি জাগিয়া উঠে। তখন দর্পণে যেমন সমগ্র নগর দৃশ্যমান হয় তেমনি শুদ্ধ আত্মরূপী দর্পণে আত্মশক্তির স্ফুরণরূপী অনন্ত ভূতরাশি ঐ দর্পণের সহিত অভিন্নরূপেই প্রতিভাসমান হয়। তখন নিজের মধ্যেই নিজ শক্তির বিলাসরূপ জগৎকে দেখিতে পাওযা যায়। ইহাই গীতার 'সর্বভূতানি চাত্মনি'—অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সর্বভূতের দর্শন।"

শৈবাগম ও শাক্তাগম মতে যোগ—আগম মতে যোগ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়—এই তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা দরকার। নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বিশ্লেষণা করা যাইতেছেঃ—
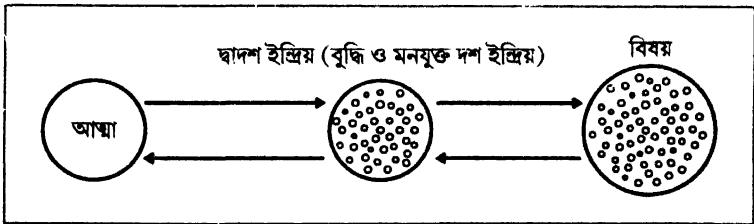
আত্মার আলোকে মন ও বুদ্ধি সহ দশ ইন্দ্রিয় আলোকিত হয়। আর এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেই আলোকে প্রতিফলিত হয় বাহ্য জগতের বস্তুনিচয়। মন ও বুদ্ধি পূর্ব সংস্কার অনুসারে বিষয়ের উপর কল্পনা আরোপ করে বিকল্পের সৃষ্টি করে যাহাকে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি বিষয়-জ্ঞান।

আত্মা ও ইন্দ্রিয় পরস্পর পবস্পবকে আকর্ষণ করে এবং ইন্দ্রিয় আত্মার আকর্ষণে সাড়া দিতে উন্মুখও হয়। আবার বাহ্য বিষয ও ইন্দ্রিয় পরস্পর পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। মন ইন্দ্রিযের মাধ্যমে বাহ্য বিষযকে উপভোগ করিতে চায় আর বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট বাখিতে চায়।

ঈশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিযা সৃষ্টি কবিয়াছেন। অতএব জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের দিকে ইন্দ্রিয় স্বভাবতই ধাবিত হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে। চক্ষু তো রূপ দেখিবাব জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য জগতে চক্ষু যে রূপ দেখে তাহাতে সাময়িক তৃপ্তি হইলেও পরম নিত্য তৃপ্তি লাভ হয় না। একটা রূপ দেখিবার পর আর একটার দিকে ধাবিত হয়, সেটাকে পরিত্যাগ করিযা আর একটার দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে পর্যাযক্রমে সে একটার পব একটা রূপেব পিছনে ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাব কাবণ কি? না, সে কোন রূপের মধ্যেই তৃষ্ণার পরিপূর্ণ নিবৃত্তির সন্ধান পায না। এই যে অতৃপ্তি এই অভাব বোধই মানুষকে সারা জীবন মাযা মৃগেব পশ্চাতে ধাবিত করাইয়া দুঃখ-কষ্ট-মনস্তাপে জর্জরিত করে। এই যে উপশমহীন অতৃপ্তি, কামনা বাসনা-আকাঙ্ক্ষা ইহাই মায়াব বা অশুদ্ধ বিদ্যার খেলা। এই অবিদ্যার প্রভাব মনের উপব ক্রিযা করে। অবিদ্যার আবরণে মন যতদিন আচ্ছন্ন থাকে ততদিন জীব পশুই থাকিয়া যায়। কিন্তু যেদিন হঠাৎ একটা মুহূর্তে ভগবৎ-কৃপায় মনের এই অস্বচ্ছ পর্দাটা সরিয়া যায়, সেই ক্ষণেই জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। মন কি করে? সে কোন একটা রূপ দেখিলেই পূর্ব সংস্কার বশতঃ তাহার উপর কল্পনাব আরোপ করে বিকল্প বা ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মন অবিরিত এরূপ ভ্রান্তির জাল রচনা কবিযা চলিযাছে, এবং জীব নানা বিভ্রান্তির মধ্যে পডিযা প্রাণান্ত হইতেছে।

সাধক যাঁরা, তাঁরা রূপ দেখিয়া নির্বিকার থাকেন। অর্থাৎ কোন একটা রূপ দৃষ্টে সাধকের মনের মধ্যে কোন বিকল্পের স্পন্দন উত্থিত হয় না। নিস্তরঙ্গ মনের পটে চক্ষুরিন্দ্রিযেব মাধ্যমে যে রূপই আভাসিত হোক না কেন, আমাদের কাছে তাহা রূপ-বৈচিত্র্য মনে হইলেও সাধকের নিকট আমাদের মন-কল্পিত রূপ-বৈচিত্র্য একাকার হইয়া গিযা শুধু এক জ্যোতি বা আলো বিরাজ করে। সাধকের নির্বিকল্প মনের এই যে জ্যোতি বা রূপ দর্শন, তাহাই ক্রমশঃ অন্তবাবৃত্ত হইয়া আত্মাব সহিত যোগযুক্ত হয়। তখনই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রমাতা ও প্রমেয এক হইযা যায়। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনের বিকল্পের দ্বারা বাহিরে যে রূপ মলিনতাপ্রাপ্ত, বিকল্পেব নিবসনেব দ্বারা সেই রূপই আবার অন্তরাবৃত্ত হইয়া আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। মনোবিকল্পের অন্তরায় দূরীভূত হইয়া নির্বিধায় বাহিবের রূপ ও আত্মার আলো যখন এক ও অভিন্নরূপে যুক্ত হইয়া যায় তখন সেই অখণ্ড রূপদর্শনে সাধকের চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়,

আর কোন তৃষ্ণা থাকে না বা সে রূপ দর্শনের পর আর কিছু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ, সে রূপ তার আত্মারই রূপ বা ইষ্টদেবতার রূপ। এইরূপে শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ই নয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সাধক সেই এক আত্মাকেই অনুভব করেন এবং তাঁর প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই তাহাতে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখন আত্মাব সহিত পরমাত্মার যোগ সাধিত হয়। পরমাত্মা রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে শব্দে নিরন্তর নিজেকে প্রকাশিত করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার সেই অখণ্ড রূপ-রস-গন্ধকে ভোগ করিয়া 'আপ্তকাম' হইবার জন্য তিনি মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধনার দ্বারা 'ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলেই এই দিব্যানন্দের ভোগ সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিযগুলিকে পবিহার (elimination) কারয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সাধনা হইতে ইহা ভিন্ন। এই যোগ সম্ভোগের যোগ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ-রূপ রিক্ত যোগ নহে।

আগম মতে যোগসাধনা—আগম মতে যোগসাধনা তন্ত্র-সাধনাবই নামান্তর। এই মতে তিন প্রকার 'সমাবেশ'-এর কথা বলা হয়েছে, যথা—(১) আণব সমাবেশ, (২) শাক্ত সমাবেশ, (৩) শাম্ভবী সমাবেশ।

(১) আণব সমাবেশ—চিত্ত যখন লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বহির্জগতেব দ্বন্দ্ব-কোলাহল, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিক্ষোভ, অশান্তি, সুখ দুঃখের অনুভূতি, বাসনা-কামনা প্রভৃতির যখন নিবৃত্তি ঘটে তখন সাধক এক শান্ত সমাহিত অবস্থায় উপনীত হয় এবং সমাধি-মগ্নও হয়। এখানে চিত্ত সমাধি-মগ্ন হয়, কিন্তু চিত্তের অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটে না। সমাধি-ভগ্ন হইলেই অর্থাৎ শান্ত-অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলেই (যাহা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা) চিত্ত আবার পার্থিব জগতের মলাকর্ষণে অভিভূত হয়।

(২) শাক্ত সমাবেশ—এখানে চিত্ত সমাধিমগ্ন হইবার পব প্রকৃতিতে লীন না হইয়া ঊর্ধ্বে বৈন্দব জগতে জাগিযা উঠে। তখন ইহার স্বরূপ হয় চিন্ময়। ইহা সাধকের সম্বোধ অবস্থা। এখানে শক্তির উন্মেষ। সাধকের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার ও উহার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধক সেই পবিমাণে শিব-ভাব অর্থাৎ 'শিবোঽহং'-এর দিকে অগ্রসর হয়।

(৩) শাম্ভব সমাবেশ—সাধকেব মধ্যে শক্তির বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে শক্তি ও শিবের পূর্ণ মিলনে সাধক 'পরমশিব' অবস্থা প্রাপ্ত হন।

মাতৃকা ও মাতৃকাশক্তি—শিব যখন শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তখন বিন্দুর মধ্যে স্পন্দন জাগিল এবং তাহা হইতে একদিকে চিন্ময় প্রকাশ বা জ্যোতির বিচ্ছুরণ হইল, অপরদিকে নাদ বা শব্দের উদ্ভব হইল। উভয়

সত্তাই ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর ও স্থূলতম হইয়া নাম-রূপে স্থূল জগতের সৃষ্টি করিল। তাই জগতে যা কিছু শব্দার্থ বাচক।

'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত বর্ণমালাব প্রতিটি বর্ণ হইল 'মাতৃকাশক্তি' এবং বর্ণমালার সমষ্টি হইল 'মাতৃকা'। যখন সদ্‌গুরুর কৃপায় মাতৃকাশক্তিগুলির বিকাশ হয় এবং সূত্রে মালা গাঁথার ন্যায় বিকশিত মাতৃকাশক্তিগুলি গ্রথিত হইয়া একত্রে সমাবিষ্ট হয় অর্থাৎ মাতৃকাব পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন বিকশিত 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত শক্তিগুলি একত্র মিলিত হইয়া শুদ্ধ 'অহং' অর্থাৎ আমিই এই সব কিছু হইয়াছি—"অহং ব্রহ্মোস্মি"—এই জ্ঞান জাগ্রত হয়। 'আমি শিব নয়' এইরূপ অবস্থায স্থিত জীবই পশু। তখন জীব পার্থিব মলের দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছাদিত থাকে। আর 'আমিই শিব' এই অবস্থায় যখন উন্নীত হয়, তখন জীব মাযার আবরণ, আণব মলের আবরণ ভেদ করিয়া প্রারব্ধ কর্মেব ভোগের অবসানে শুদ্ধ চিৎ-সত্তা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিন্ময় জ্যোতির্ময হয়—এক কথায জীব আপন চিৎ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরমশিব বা পরব্রহ্মকে বলা হয সচ্চিদানন্দময়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম রূপ একই সত্তার বা স্বরূপের দুইটি দিক্—এক চিৎ-স্বরূপ, আর দ্বিতীয আনন্দস্বরূপ। দুইটি স্বরূপই অভিন্ন অবিনাভাবে যুক্ত। অতএব পরব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বেচ্ছায় দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—এক অংশ চিদ্‌রূপী শিব এবং অপর অংশ চিৎ-শক্তি। পরব্রহ্মের এই দ্বিধা বিভক্ত রূপই বৈষ্ণবের নিকট 'যুগল মূর্ত্তি', শৈবের নিকট 'যামল', বৌদ্ধদের নিকট 'যুগনদ্ধ' নামে পরিচিত। এই চিৎশক্তি একদিকে যোগমায়া রূপে ষোডশ কলাযুক্ত স্বযং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার নিত্য লীলা অনুষ্ঠানের জন্য নিত্য বৃন্দাবন-ভূমি রচনা করিলেন। এই চিন্ময় নিত্য বৃন্দাবন-ভূমি পরব্রহ্মের 'সৎ'রূপ বিশুদ্ধ সত্তায় গঠিত। এখানে মায়া বা মহামায়া বা কালের প্রবেশাধিকার নাই। অপরদিকে চিৎশক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে ত্রিধা শক্তিতে পরিণত হইলেন—ইহাই আগম মতে ত্রিকোণ। তাহা হইতে সৃষ্টির ধারা নির্গত হইল। 'সৃষ্টি তত্ত্বে' এ বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনা করা হইয়াছে।

'ইদন্তা' বা জগৎরূপে যে প্রকৃতি-শক্তি প্রকটিত তার প্রতিটি ক্রিয়া-কলাপ ঈশ্বরের বিদিত। কিন্তু ঈশ্বর ও প্রকৃতি-শক্তি এখানে পরস্পর ভিন্ন। এখানে 'অহন্তা' ও 'ইদন্তা'র ভেদ। কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বে শিবভাবে 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত যে চিন্ময সৃষ্টি প্রকটিত সেখানে শক্তি ও শিবে কোন ভেদ নাই—অগ্নি ও উহার দাহিকা শক্তির ন্যায় পরস্পর যুক্ত। শিব ও শক্তির সামরস্য জনিত সেখানে অহন্তা ও ইদন্তা মিলিত হইয়া এক হইযা আছে। সেখানে শিব ও শক্তি মিলিত এক সত্তা—দুই বলিয়া, ভিন্ন বলিয়া সেখানে কিছু নাই। ইহা তো হইল সৃষ্টির উৎস ও ধারাব দিকেব কথা। এবার উজান বাহিয়া

জীবকে তাহার উৎসে পৌঁছাইতে হইবে। কুণ্ডলিনী-শক্তির যেখানে জাগরণ নাই তাহা জড়, যেখানে ইষৎ উন্মেষ তাহা পশু, সেখানে আরও উন্মেষ সেখানে শিব, আরও উন্মেষে মহাশিব এবং পূর্ণ উন্মেষে অসীম, অনন্ত ও অখণ্ড পরব্রহ্মঃ

জড় → পশু → শিব → মহাশিব → অখণ্ড।

ষোড়শ কলা—আগম মতে ষোড়শ কলা হইল বিন্দু। বিন্দুই হইল কেন্দ্র, তাহা হইতেই অবিরত অনন্ত রস বিচ্ছুরিত। আগম মতে সাধক পঞ্চদশ কলায় উপনীত হইলেও তাহা হইতে স্খলনের সম্ভাবনা। কিন্তু ষোড়শ কলায় উত্তীর্ণ হইলে সেখান হইতে বিচ্যুত হইবার বা কালাগ্নির গ্রাসে পতিত হইবার আর কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, তাহা হইল অবিমিশ্র 'সোমে'র রাজ্য। সোমরস বা অমৃত পান করিয়া চিরজীবি বা নিত্য-সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোমরস অবিরত ক্ষরিত হইতেছে জীবের পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্য। কিন্তু জীব কালরাজ্যের অধিকারভুক্ত থাকায় সে তাহার নিমিত্ত ক্ষরিত সোমরস পানে বঞ্চিত হয়। কালাগ্নি সেই সোমরস গ্রাস করিয়া জীবকে নিত্য অতৃপ্ত, অশান্ত অবস্থায় রাখিয়া দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জর্জরিত করে। অতএব ষোড়শ কলায় অর্থাৎ অবিমিশ্র সোমকলায় আবিনশ্বর স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত জীব পরিপূর্ণ পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হয় না। কারণ, পঞ্চদশ কলায় সোমের প্রাধান্য থাকিলেও সেখানে কালাগ্নির লেশ থাকিয়া যায় এবং সোমের ক্রম ক্ষয়িষ্ণুর ফলে কালাগ্নির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু ষোড়শ কলায় একবার উপনীত হইতে পারিলে সাধকের আর কোন ভয় থাকে না। তখন পরম কারুণিকের করুণার স্রোতের আকর্ষণে সাধক আপনি ভাসিয়া চলে পূর্ণতার দিকে। করুণার স্রোতের টানের মধ্যে পড়াই সাধকের আসল উদ্দেশ্য। সেই স্রোতের টানের মুখে আনিয়া জীবকে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত করিয়া দেন 'পরম গুরু'। বিগত অসংখ্য জীবন-পরম্পরায় পার্থিব গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে উহার সাধনার দ্বারা আমরা যে সুকৃতিসমূহ সঞ্চয় করি, সেগুলি আহরিত পুষ্প-সমূহের ন্যায় আমাদের বর্তমান জীবনে আমাদের অজ্ঞাতে সঞ্চিত থাকে। আমাদের আধার যখন তৈরী হইয়া যায় তখন পরমগুরু নানা জীবনে আহরিত সেই পুষ্পগুলি লইয়া মালা গাঁথিয়া অর্থাৎ সুকৃতিগুলির একত্র সমাহার করিয়া পরব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত করিয়া দেন। তখন সাধক যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাই শুদ্ধ বিদ্যা। তখন সাধক দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। পরমগুরুর কৃপায় একবার পরব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইলে তাঁহারই অমোঘ আকর্ষণে সাধক তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। পরমগুরু আর কেহ নয়, তিনিই সাক্ষাৎ

পরব্রহ্ম। আবার এই পরমগুরু আমার মধ্যেই আছেন। আধার প্রস্তুত হইলে অর্থাৎ সময় হইলেই তিনি দেখা দেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে বলা হয় পার্থিব জীবনের সহিত নিত্য বৃন্দাবনের দিব্য জীবনের যোগ-সাধন যাঁরা করিয়া দেন তাঁরা হইলেন 'মঞ্জরী'। পার্থিব জীবনের কাণ্ডারী হিসাবে মঞ্জরীরাই হইলেন বৈষ্ণব মতে গুরু।

ব্রহ্মচর্য বা বিন্দু-সাধনা—তন্ত্র-সাধনার প্রাথমিক স্তরে বিন্দু-সাধনা। বিন্দু-সাধনার দ্বারা একাগ্রতা সাধিত হয় এবং বীর্য অটল স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর বিন্দুর টলাটল সাধনা। ইহাতে বীর্য শোধিত হয়, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, মধ্যপথ বা সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বিন্দু-সাধনার কথা বলিবার পূর্বে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে দু-চার কথা বলিয়া লওয়া যাইতেছে।

বৈদিক ধর্মে চারিটি আশ্রম। প্রথম ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এই আশ্রম-জীবনের লক্ষ্য সংযম পালন এবং ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা। পূর্বকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবস্থানের অবসানকালে তাঁহারা দুইটি ভাগে বিভক্ত হইতেন, যথা—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বান। ব্রহ্মচর্য পালনের অভ্যাসের ফলে যাহাদের বীর্যের অধোগতি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহারা নৈষ্ঠিক বলিয়া চিহ্নিত হইত। তাহাদের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের কোন প্রশ্নই উঠে না। সেইজন্য তাহারা আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিত বা সন্ন্যাস অবলম্বন করিত। তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিল। যাহাদের ঐরূপ হইত না, তাহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্বক নীতি ও সংযমপূর্বক গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিত। তাহাদের বলা হইত উপকুর্বান। গার্হস্থ্য আশ্রমে ভোগ। শিথিল ভোগ নহে, বৈধী ভোগ অর্থাৎ বিধিপূর্বক নিয়ন্ত্রিত ভোগ। বৈধী ভোগে অসংযম বা শিথিল কামনা-বাসনার স্থান নাই। মানুষের তিনটি ঋণ—ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ঋষি-ঋণ পরিশোধ, গৃহস্থাশ্রমে পিতৃ-ঋণ শোধ অর্থাৎ পূর্বপুরুষের ধারা অব্যাহত রাখা এবং পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনে দেব-ঋণ পরিশোধান্তে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ। সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে বাণপ্রস্থ গ্রহণ।

যাহারা নৈষ্ঠিক তাহাদের ধারা আলাদা। তাহারা গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈদিক ধর্মে ভোগেরও একটি বিশেষ স্থান আছে, কিন্তু সে ভোগ বৈধী-ভোগ। ভোগ না হইলে ত্যাগের ভাব আসে না। বিধি-নিয়ন্ত্রিত ভোগ করিতে করিতে ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। তখন জাগে বৈরাগ্য। বিষয়-প্রপঞ্চের প্রতি আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে হইতে যখন শূন্য হইয়া যায়, তখন সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ। সন্ন্যাস জীবনে সাধনার দ্বারা স্বরূপানন্দে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। বৈদিক ধর্মের পথ বৈরাগ্যের পথ। অনাসক্ত বৈরাগ্য সাধনার দ্বারা পরমানন্দ

প্রাপ্তি। বৈদিক ধর্মে প্রথমে সংযম, দ্বিতীয় বৈধীভোগ, তৃতীয় বৈরাগ্য, চতুর্থে বৈরাগ্যের পূর্ণ অবস্থা সন্ন্যাস।

বৈদিক ধর্মে অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার বিধি আছে। জীবনধারণের জন্য আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহাও অগ্নিতে আহুতি দান। খাদ্যই হইল সোম। আমাদের ভুক্ত অন্ন অগ্নি জীর্ণ করে, পরিপাক করে। অন্ন থেকে হয় রস, রস থেকে শোণিত, অস্থি, মেদ, মজ্জা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে সর্বোত্তম যে বস্তু তৈরী হয, তাহা হইল বিন্দু (বীর্য)। সূর্যের ভাতি এবং চন্দ্রের স্নিগ্ধতা বীর্যের মধ্যে আছে।

আমাদের শরীরের মধ্যে পাঁচটি কোষ আছে, যথা—অন্নময কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। অন্ন অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া যে শুদ্ধ বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণময় কোষ। সেই বস্তু আবার দ্বিতীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া আরও পরিশুদ্ধ রূপে যে বস্তু উৎপন্ন হয, তাহা মনোময় কোষ। আবার তাহা তৃতীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া সেই বস্তু আরও বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হইযা বিজ্ঞানময় কোষে পরিণত হয়। পুনরায় সেই বস্তু চতুর্থ অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আনন্দময কোষ। শরীর তখন আনন্দময় কোষে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আনন্দময কোষে উত্তীর্ণ হইয়াও ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায না। কারণ, শরীর তখনও আনন্দময় হইলেও কোষে আবদ্ধ। আনন্দময় কোষকেও অতিক্রম করার পরের অবস্থায অমৃত বা পরমানন্দ লাভ করা যায়। বৌদ্ধদেরও নির্মাণকায়, সম্ভোগকায়, ধর্মকায়, সহজকায় প্রভৃতি পর্যায়ের বর্ণনা আছে।

তন্ত্র-সাধনায় কোষের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অন্নময় কোষ। কুণ্ডলিত শক্তি যখন সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহা প্রাণময কোষ। শক্তি যখন সুষুম্না মধ্যস্থ আরও সূক্ষ্ম বজ্রানী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহা মনোময় কোষ। আরও সূক্ষ্ম চিত্রাণী নাড়ীতে প্রবেশ করিলে উহা বিজ্ঞানময় কোষ। আরও সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণী নাড়ীতে প্রবেশ করিলে উহা আনন্দময় কোষে পরিণত হয। ইহারও পরে শক্তির চরম ঊর্ধ্ব গতি আছে যাহা এক ও অদ্বয় সত্তায় পৌঁছিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত যাঁরা, তাঁরা আনন্দময় কোষে পৌঁছাইয়া ভাব সাধনার দ্বারা ভাবদেহ লাভান্তে নিত্য বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিয়া সখীর অনুগত হইয়া নিত্য নব নবোন্মেষিত লীলারস আস্বাদন করাকে চরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তান্ত্রিক বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক যাঁরা, তাঁরা অদ্বয় সত্তায় প্রবেশ করিয়া সাধ্য ও সাধক একীভূত হইয়া যান। অর্থাৎ আপন স্বাভাবিক বা সহজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহানন্দরস আস্বাদনের জন্য সেই অদ্বয় সত্তা

দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ‘বড় আমি’ ও ‘ছোট আমি’ বা ‘তুমি’ ও ‘আমি’ এই দুই সত্তা ধারণ করিয়া আশ্রয় ও বিষয় রূপে আমি তুমির সহিত নিত্য প্রেমঘন লীলানন্দরস আস্বাদনে মগ্ন হয়।

তান্ত্রিক বৈষ্ণব সহজিয়াদের যুক্তি হইল, শিব না হইলে শিবকে জানা যায় না; আবার শিবকে না জানিলে শিব হওয়া যায় না। দুইটি অবস্থাই পরস্পর সাপেক্ষ। দেবতা না হইয়া দেবতার উপাসনা করা যায় না। পাশবদ্ধ জীব শিবকে জানিতে পারে না। সাধনার দ্বারা প্রথমে আণব মলকে ক্ষীণ করিয়া নিজেকে শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তারপর শিবকে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হইবে। তবেই ধ্যান-ধারণার দ্বারা শিবকে জানিয়া শিবত্ব লাভ করা যায়। ইহাই হইল ‘শিবোঽহম্’ তত্ত্বের রহস্য। সেইরূপ রাধাকে জানিতে হইলে রাধা হওয়া চাই, আবার রাধা হইতে গেলে রাধাকে জানা চাই। প্রথম স্তরে নিজেকে রাধা রূপে ভাবনা করিয়া ভাব-সাধনার দ্বারা রাধার স্বরূপকে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। এইরূপে রাধা তত্ত্বে অনুপ্রবেশ হইলেই তখন স্বয়ং রাধাই বনিয়া যাইবে। অবশ্য ইহা ভাবদেহ লাভের পর দীর্ঘ সাধন-সাপেক্ষ।

যাহা বলিতেছিলাম, বিন্দুই (বীর্য) হইল আসল বা মূল বস্তু। সুতরাং প্রথম কাজ হইল বিন্দুকে শোধন করা। বিন্দু অচঞ্চল, স্থির, অক্ষোভ হইলে মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, চিত্ত অচঞ্চল স্থিরতা লাভ করে। বিন্দুকে শোধন করিবার উপায় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি বিষয় পঞ্চের দ্বারা বিন্দুকে ক্ষুব্ধ না করা। শুধু স্পর্শ নয়, বিষয় প্রপঞ্চের যে কোন একটির দ্বারাই বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। একটি সুন্দর গোলাপ ফুল দর্শন করে যদি মনের মধ্যে জেগে ওঠে সুন্দর ফুলটির ভোগেচ্ছা তবে এই ভোগেচ্ছার দ্বারাই বিন্দু বিক্ষুব্ধ হয়। কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী যে কোন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়; যেমন সর্প সুমধুর শব্দে আকৃষ্ট হয়, পতঙ্গ রূপে আকৃষ্ট হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রপঞ্চের দ্বারাই সমভাবে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বিন্দুকে শোধন করিতে হইলে বিষয়-প্রপঞ্চের মালিন্য হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইহা অভ্যাস বা সাধনা সাপেক্ষ। বিন্দুকে শোধন করার অর্থই বিন্দুকে ধারণ করিবার ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন করা। গৃহিত অন্নের সর্বোত্তম সার ভাগ বীর্যে পরিণত হয়। সুতরাং আহার-পর্বটা সাত্ত্বিক হওয়া দরকার। রাজসিক বা তামসিক আহারের দ্বারা যে বীর্য উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তপ্ত বীর্য। উত্তপ্ত বীর্য বড় চঞ্চল, উহাকে অচঞ্চল বা দৃঢ় করা কঠিন। বিন্দু যখন বিষয়-প্রপঞ্চের মালিন্য হইতে শোধিত হইয়া অচঞ্চল স্থিরতা লাভ করে, তখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়। বিন্দুর অটল অবস্থাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ। বিষয় প্রপঞ্চের মালিন্য দূর হইয়া কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ

না হইলে জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা তপস্যা কিছুই কাজে আসে না। সমস্ত চেষ্টাই বিফলতায় পর্যবসিত হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলেই উহা ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে।

সকলের লক্ষ্য হইতেছে 'আনন্দ'। উপনিষদের বাণী, ''আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।'' (তৈত্তিরীয়, ৩/৬)—'আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয, জাত হইয়া আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন কবে ও আনন্দে বিলীন হয়।' অতএব পরম আনন্দস্বরূপ হইতেই সমস্ত জীব ও জড় জগতের উৎপত্তি। জীবের স্বরূপ বা স্বভাব আনন্দময় হইলেও মধ্যখানে মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া বিষয়-প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হইযা অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়। জীবের বিচ্যুত আনন্দময় স্বরূপকে অর্থাৎ স্ব-স্বভাবকে ফিরিয়া পাওয়া বা মালিন্যমুক্ত সহজ অবস্থায় পৌঁছাইয়া পরমানন্দময় অমৃত পান করার জন্যই পথের সন্ধান। পথ ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু লক্ষ্য এক—সেই আনন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্তি।

বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম মতে বিন্দুই হইল বজ্র। বিন্দু যখন দৃঢ়, অটল হয, তখনই উহা বজ্র। বিন্দু যখন অটল তখন কিন্তু ভাবের স্ফুরণ হয় না। অটলীকৃত বা দৃঢ়ীভূত বিন্দুর মধ্যে যখন স্পন্দন উঠে, তখন বিন্দুর দ্বিমুখী গতি হইতে পারে। এক ঊর্ধ্বমুখী আর এক নিম্নাভিমুখী। বিন্দু যখন অটল থাকে বা নিম্নাভিমুখী হয়, তখন ভাব উৎপন্ন হয় না। বিন্দু যখন স্পন্দিত অবস্থায় নিম্নাভিমুখী হইযাও স্খলিত না হইয়া সাধনাব দ্বারা ঊর্ধ্বমুখী গতি সম্পন্ন হয, তখন ভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অটল বিন্দুর নিম্নাভিমুখী ও ঊর্ধ্বাভিমুখী গতির অভ্যাসের ফলে ভাবের বিকাশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী বিন্দু যখন চক্রের পর চক্র ভেদ করিযা পূর্ণ শোধিত হইয়া আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করে তখন আর যোগীর পতনের আশঙ্কা থাকে না। মূলে ক্ষিতি তত্ত্ব। ক্ষিতি ভেদ করিবার পর বিন্দুর ক্ষিতিত্ব থাকে না। ক্ষিতির পর অপ, অপের পর তেজ, তেজের পর মরুৎ। প্রত্যেকটি অবস্থা ভেদের পর বিন্দু ক্রম পরিশুদ্ধ হইয়া যখন মরুৎ তত্ত্বকেও ভেদ করিয়া যায় তখন আর সেই পরিশুদ্ধ বিন্দুর বিচলিত হইবার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া ব্যোম-তত্ত্বে গিয়া অচল স্থিতিত্ব লাভ করে। মরুৎ পর্যন্ত আশঙ্কা। কারণ, বায়ুর দ্বারাই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মরুৎ স্তর অতিক্রম করিবার পব নিস্তরঙ্গ ব্যোমে স্থিতি স্থাপকতা লাভ করে।

বিষয় প্রপঞ্চের মালিন্য হইতে শোধিত হইয়া বিন্দু অচঞ্চল স্থিরতা লাভ করে। বিন্দুর অচঞ্চল স্থির অবস্থায় উহার নিম্নগতিও হয় না, ঊর্ধ্বগতিও

হয় না। বিন্দুর অটল অবস্থা প্রাপ্তিই কৈবল্য মুক্তি। কৈবল্য মুক্তি মানেই চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধ। ইহা উত্তমর্ণ সাধকের কাম্য হইতে পারে না। তাহারা আনন্দ-স্বরূপের আনন্দকে পাইতে চায়——দিব্যানন্দের আস্বাদন চায়। সচ্চিদানন্দের যে আনন্দরূপ স্বরূপ-শক্তি তাঁহাকে পাইতে হইলে কৈবল্য মুক্তিকে দূরে পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তের সহিত পরাশক্তির করুণা লাভের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন 'চিৎ'-ই চিত্ত। সুতরাং চিত্তকে নিরোধ করিযা নহে, পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত করিয়া আবরণমুক্ত বিশুদ্ধ চিত্তে সচ্চিদানন্দস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। চিত্তকে মায়া মালিন্য হইতে মুক্ত করিযা শুদ্ধ চিৎ-সত্তায পরিণত করিতে হইলে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিন্দুকে ঊর্ধ্বগামী করিতে হইবে। শক্তি আসিবে প্রকৃতির কাছ থেকে। যে শক্তি প্রকৃতির কাছ থেকে আহৃত হইবে তাহাও বিষয়-প্রপঞ্চের মালিন্য মুক্ত পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। অপরিশুদ্ধ প্রকৃতির সংযোগ হইতে বিন্দুর পরিশুদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতি হইতে পারে না।

শাক্তধর্মে 'পশ্বাচার' অবস্থা সম্পূর্ণ সংযম সাধনার অবস্থা। সংযম সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরের অবস্থা 'বীরাচার'। বীরাচারে ভোগের বিধান আছে। সে ভোগ গার্হস্থ্য আশ্রমের স্ত্রীগ্রহণপূর্বক ভোগ নহে। বীরাচার সাধকের উপর কোন সামাজিক নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থার বা বিধি নিয়মের বাহিরে। বীরাচার সাধক সাধিকা গ্রহণ করে সাধন পথে অগ্রগতির জন্য অর্থাৎ দিব্যভাবে উপনীত হইবার জন্য। সেইজন্য এখানেও সাধিকা গ্রহণে বিশেষ সতর্কতা বা সুনির্বাচনের প্রয়োজন। গার্হস্থ্য জীবনে যেমন বিবাহের পূর্বে উভয়ের ঠিকুজি, কুষ্ঠি, গণ প্রভৃতি মিলাইযা বিবাহ-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে, এখানেও ঠিক সাধকের উপযুক্ত নায়িকা নির্বাচনের অপেক্ষা রাখে। ধীরোদাত্ত সাধকের পদ্মিনী সাধিকার প্রয়োজন। উভয়েই সমান জাগ্রত। সুতরাং পরস্পরের মিলনে দিব্য জীবনের স্ফুরণ তরান্বিত হয়। কিন্তু ধীরোদাত্ত সাধকের সহিত পদ্মিনী নায়িকার বা পদ্মিনী নায়িকার সহিত ধীরোদাত্ত সাধকের যদি মিল না হইয়া অন্য কাহারো সহিত মিল হয, তাহলে সাধন জীবনে অগ্রগতি তো হয়ই না বরং অবনতি ঘটে।

পরিশুদ্ধ প্রকৃতি-শক্তির সহিত মালিন্য মুক্ত বিন্দুর সংযোগ হওযা মাত্রই পঞ্চভূতে গঠিত পার্থিব শরীর বৈন্দব শরীরে পরিণত হইবে। এবং চিত্ত চিৎ-শক্তিতে পরিণত হইযা ঊর্ধ্বগামী হইয়া সহস্রারে বিরাজিত শিবের সহিত মিলিত হইবে। এইরূপে শিব-শক্তির সামরস্য হেতু রসময় তনুতে পরিণত হইযা জীব "রসং হ্যেবাযং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয, ২/৭)—'জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়'।

বৌদ্ধধর্মেও ঐরূপ বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি যান অতিক্রম করিয়া শেষে

সহজযানে পৌঁছাইতে হয়। বজ্রযানে বোধিচিত্তকে অর্থাৎ বিন্দুকে বজ্রের মত কঠিন করিতে হয়। পরে সাধন-বলে সহজযানের যে লক্ষ্য পরম মহাসুখ, তাহা লাভ করা যায়।

প্রাণায়ামে কুম্ভক ও রেচক প্রক্রিয়া। কুম্ভক বহিরাকাশ বিন্দু এবং রেচক অন্তরাকাশ বিন্দু। এই দুই বিন্দু বা বিসর্গ যখন এক বিন্দুতে পরিণত হয়, তখন চিত্তের বহির্মুখীতা খর্ব হয় ও বিন্দু শোধিত হয়। চিত্ত অন্তর্মুখী হইয়া একাগ্রতা লাভ করে এবং মন passive হইয়া পড়ে। যতক্ষণ মন active থাকে, ততক্ষণ চিত্ত-চাঞ্চল্য থাকে। মন যখন active, তখন উহার বহির্মুখী অবস্থা, বিষয়প্রপঞ্চের ভোগে লিপ্ত থাকার অবস্থা, উহাই জীবের জাগ্রৎ অবস্থা। জীব যখন অন্তর্মুখী হয় অথচ চিত্ত জাগ্রৎ থাকে, তখন জীবের স্বপ্নাবস্থা বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা। আবার জীবের অন্তর্মুখীন অবস্থায় চিত্ত যখন জাগ্রৎ থাকে না, তখন সুষুপ্তি অবস্থা বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা। চিত্তের যখন নিরুদ্ধ অবস্থা তখন কোন অনুভূতিই থাকে না। তখন কৈবল্য মুক্তি। কিন্তু আগমে কৈবল্য মুক্তি অগ্রাহ্য।

ব্রহ্মকৈবল্য ও শিবত্ব—বেদান্তে জীব ব্রহ্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই শিবত্ব লাভ হয় না। চিৎশক্তির উন্মেষ হইলে তবে শিবত্বলাভ হয়, শুধু অচিৎশক্তির বা মায়াশক্তির অবসানে তাহা হয় না। সুতরাং তন্ত্রমতে প্রথম অচিৎশক্তির নিবৃত্তি, তারপর চিৎশক্তির প্রবৃত্তি। স্বরূপভূতা চিৎশক্তি সাধকের মধ্যে চরম বিকাশ ঘটাইয়া তাহাকে স্বরূপে অর্থাৎ শিবত্বে স্থিতি আনিয়া দেয়। তখন চিৎশক্তিরও নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং শিবস্বরূপে অনুস্যূত থাকে। ইহাই শৈবাগম যোগের ক্রম।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'পত্রাবলীর ১ম খণ্ডে ৭৯ সংখ্যক পত্রে' দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে 'যোগী' শব্দের অর্থের বিশ্লেষণ করিয়াছেন—একটি পাতঞ্জল দৃষ্টি অনুসারে এবং অন্যটি শাক্ত অদ্বৈত দৃষ্টি অনুসারে। প্রসঙ্গ বিধায় বিশ্লেষণটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ

পাতঞ্জল যোগের লক্ষ্য সমাধিমার্গ অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনপূর্বক চিত্তবৃত্তিকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করার পর প্রকৃতির স্তর হইতে বিবেকখ্যাতির দ্বারা কেবল চিদাত্মকরূপে স্বরূপস্থিতি লাভ করা। জ্ঞান একাগ্র না হইলে প্রজ্ঞারূপ ধারণ করে না এবং বাহ্যভূমি হইতে ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে প্রজ্ঞাও সম্যক্ প্রজ্ঞারূপে পরিণত হয় না। কারণ সম্যক্ প্রজ্ঞা না হইলে চিৎ ও অচিতের অবিবিক্ত সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সম্যক্ প্রজ্ঞাও খ্যাতিরূপে পরিণত হয় না এবং আত্মসাক্ষাৎকারও হয়

না। আত্মসাক্ষাৎকারের পর এই বিশুদ্ধ খ্যাতিও নিরুদ্ধ না হইলে আত্মস্বরূপে স্থিতি এবং ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি হয় না।

পাতঞ্জল যোগে প্রথমতঃ লৌকিক বৃত্তিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞারূপী সমাধিজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রজ্ঞা একাগ্রভূমিতে অধিগত এবং ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হইয়া বিশুদ্ধ অস্মিতাপ্রজ্ঞারূপে পবিণত হয়। ইহাই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। ইহা বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত ঐশ্বর্যের দিকে অগ্রসব না হইয়া বিবেকের দিকে অগ্রসব হয়। যে আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রার্থী সে ঐশ্বর্যেব পথে না যাইয়া বিবেকের পথে অগ্রসর হয এবং তাহার ফলে গুণবিতৃষ্ণারূপ পববৈরাগ্য লাভ করে। এই পববৈরাগ্যের ফলে প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ দ্রষ্টারূপে আত্মা স্বরূপ-স্থিতি প্রাপ্ত হয।

অস্মিতা প্রজ্ঞার মধ্যে চিদংশ ও অচিদংশ অবিবিক্তরূপে মিশ্রিত থাকে। যাহাব এই অবস্থায় ভোগবিতৃষ্ণা থাকিলেও গুণবিতৃষ্ণা থাকে না তাহাব মধ্যে পরবৈরাগ্যের আবির্ভাব এই অবস্থায় সম্ভবপব হয না। তদনুসারে কৈবল্যের পথে গতি হয় না বলিযাই তাহার ঐশ্বর্যেব দিকেই প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় দেহ ত্যাগ হইলে কার্য-ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা থাকে। ইহা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃভাবে স্থিতি।

অস্মিতাসমাধি পর্যন্ত আযত্ত হইলে যোগীর ক্রমিক চারিটি স্থিতির মধ্যে প্রথম স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় জ্যোতি আযত্তে আসে এবং শক্তির বিকাশও অনেকটা অধিগত হয়। ইহার ফলে এমন একটি অবস্থার আবির্ভাব হয় যাহাকে এক হিসাবে গ্রন্থি বলিলেও অত্যুক্তি হয না। এই অবস্থা লাভের অব্যবহিত পরেই যোগীর জীবনে একটি সংকটময় স্থিতির উদয হয়। কারণ যোগী জ্যোতিকে আয়ত্ত করিয়াছেন সত্য এবং এই জ্যোতি, প্রজ্ঞা-জ্যোতি তাহাও সত্য কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নির্মল নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থাব প্রাপ্তি ইহা হইতে হয় না। কারণ বিশ্বেব মধ্যে যে সকল দিব্যশক্তি বা পুরুষ আছেন তাঁহারা ঐ জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যোগীর নিকট সমাগত হন এবং তাহাকে নানা প্রকার শক্তির প্রলোভন দেখাইযা মোহিত করার চেষ্টা করেন। এই জ্যোতি নির্মল হইলেও কিঞ্চিৎ মন ইহাতে বিদ্যমান থাকে, যাহার ফলে এই পরিস্থিতির উদয হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকমার্গে প্রস্থান করেন, তাঁহাদের এই মলিনতা থাকে না। চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি হইতেই এই মলিনতার উদয় হইযা থাকে। যাহাদের গ্রন্থিভেদ হইয়াছে এবং যাহারা গ্রন্থিভেদের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের এই আশঙ্কা নাই। গ্রন্থিভেদ না হইয়া যোগশক্তির কিঞ্চিৎ স্ফুরণ হইয়াছে পাতঞ্জল যোগ এই অবস্থাকে 'মধুমতী-ভূমি' বলিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম অবস্থায় উন্নীত হইলেও যোগীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় যোগীর চিত্ত আপেক্ষিকভাবে

নির্মল হইলেও তাহাতে দুইটি মল থাকিয়া যায়, তাহার মধ্যে একটির নাম আসক্তি এবং অন্যটির নাম অহংকার। আসক্তি-বর্জিত হইয়া নিরহংকার না হইতে পারিলে কৈবল্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁহারা বিবেকের পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা এই দুইটি মল হইতে মুক্ত হন।

যাহার এই গ্রন্থিভেদ হয় নাই সেই যোগীর পক্ষে এই স্থিতিটা একটি পরীক্ষাস্থান। এই অবস্থায় যোগীর নানাপ্রকার বিভূতির উদয় হইলেও উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যিনি এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ আসক্তি ও অহংকার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত জ্যোতি মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্মলভাব ধারণ করে। তখন এই নির্মল জ্যোতিই যোগীর অধ্যাত্মমার্গে পরম অস্ত্ররূপে পরিণত হয়। পূর্বে যোগী বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু উহা কল্পিত শক্তি, নিজ শক্তি নহে, ঐ সব বিভূতি লাভ করার জন্য যোগীর সংযম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। একই বিষয় অবলম্বন করিয়া যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করার নাম সংযম। এই সংযম অবলম্বন ভেদে নানাপ্রকার। যোগ বিভূতির ইহা কৃত্রিম অবলম্বন। সংযম ব্যতীত বিভূতি প্রকাশিত হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে পূর্বোক্ত জ্যোতি নির্মল নহে। কিন্তু জ্যোতি নির্মল হইলে সংযমের প্রয়োজন নাই। জ্যোতির নির্মলতার সঙ্গে সঙ্গে উহা দেহ ও ইন্দ্রিয় সত্তাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলে ভৌতিক দেহের উপাদান শুদ্ধ হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়েরও উপাদান শুদ্ধ হয়। ইহাই physical transformation-এর যথার্থ স্বরূপ। সমগ্র চিত্তই তখন বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। বলা বাহুল্য, পূর্বে ইন্দ্রিয়গুলি এই প্রকার বিশুদ্ধি লাভ করে নাই, কারণ যোগীর অস্মিতা-ভূমিতে প্রাপ্ত জ্যোতি সম্যক্ নির্মল ছিল না। নির্মল না থাকার কারণ উহার সঙ্গে আসক্তি ও অহংকার মিশ্রিত ছিল। বর্তমানে জ্যোতি এত নির্মল হইয়াছে যে উহাতে আসক্তি ও অহংকারের লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। এইটি যোগীর তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ভূতেন্দ্রিয় শুদ্ধির ফলে বিভিন্নপ্রকার শক্তির স্ফুরণ হয়। ইহা আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়। ইহার জন্য সংযমের আবশ্যকতা নাই। তখন এই শুদ্ধ আধারে ইচ্ছাশক্তির উদয় হয় এবং যোগীর ইচ্ছানুসারে কার্যসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সংযম প্রয়োগ করিতে হয় না এবং দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণও আবশ্যক হয় না। ইহাই ইচ্ছাশক্তির উদয়ের ইতিহাস। এই ইচ্ছাশক্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তাহারও একটি ক্রমবিকাশ আছে। শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার যেমন ক্রমিক বিকাশ হয় ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশও সেইরূপ। পূর্ণিমাতে যেমন চন্দ্রের সমস্ত কলা পূর্ণ হয় সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিরও ক্রমবিকাশের একটি স্থিতি আছে। ইহাই পূর্ণতার স্থিতি। ইহার পরে ইচ্ছার উদয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় ইচ্ছা মোটেই থাকে না। এই অবস্থাই আত্মার

স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্যে প্রবেশের পূর্ববর্তী অবস্থা। যতদিন দেহ-সম্বন্ধ থাকে এবং কৈবল্যের উদয় না হয় ততদিন মহা-ইচ্ছার দ্বারা সকল ব্যাপার নির্বাহিত হয়। শিশু যেমন ইচ্ছা না করিলেও মায়ের ইচ্ছাতে তাহার সকল কার্য হয়, যোগীও তখন নিজে ইচ্ছা না করিলেও মহা-ইচ্ছার দ্বারা তাহার সকল কার্য নির্বাহিত হয়। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন এই অবস্থা। তাহার পর কৈবল্য। তখন মহা-ইচ্ছারও কোন প্রশ্ন থাকে না।

এইটিই হইল ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়া কৈবল্যে প্রবেশের মার্গ। যাহারা ঐশ্বর্যকে অবলম্বন না করিয়া প্রথমেই বিবেক ও পরবৈরাগ্যের পথে যায়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা বিভূতির প্রলোভনে ভোলেন না, সুতরাং তাহাদের পতনের আশঙ্কা থাকে না।

এই হইল পাতঞ্জল যোগী সম্প্রদায়ের যোগরহস্যের কথা এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার ইতিহাস। এইবার অদ্বৈত শাক্ত-সম্প্রদায়ের যোগের কথা বলা যাইতেছে।

শৈবাদ্বৈতের ন্যায় শাক্তাদ্বৈতের মতেও জীবভাব বা পশুভাব পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যমূলক আত্মসংকোচের ফলেই আবির্ভূত হয়। ইহা তিরোধান শক্তির ফল। এই তিরোধান শক্তিই স্বাতন্ত্র্য শক্তির একটা দিক্, যাহা পূর্ণ সত্ত্বাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে তিরোধান শক্তির ব্যাপার অনাদি কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীব অথবা পশুমাত্রেই এই দৃষ্টি অনুসারে অনাদিকাল হইতেই সংকুচিত অবস্থায় সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। কর্মপ্রভাবে ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি হইলেও মায়া ও মহামায়ার আবরণ একই প্রকার রহিয়াছে। কারণ মূলগত সংকোচ অনাদিসিদ্ধ। কৌলগণ বলেন, অকুল বোধসমুদ্র যখন কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার জন্য তরঙ্গিত হইয়া উঠে তখন উহার এই তরঙ্গই পশুজীবনের পরিবর্তন সাধনের মূলসূত্র হয়। এই তরঙ্গকে ঊর্মি বলিয়া কৌলগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীব যখন হইতেই জীবরূপে প্রকটিত হইয়াছে তখন হইতেই সে কালের অধীন। পরমেশ্বরে অথবা মহাপ্রকাশস্বরূপে আবরণ অথবা নিমীলন এবং আবরণ-উন্মোচন অথবা উন্মীলনের খেলা স্বভাবসিদ্ধ। নিমীলন অবস্থায় জীব বা পশু কালের অধীন থাকে এবং উন্মীলন অবস্থা গুরুকৃপাসাপেক্ষ। এক অখণ্ড সত্ত্বাই কালরূপে জীবকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে। কালের প্রভাবের সময় মহামায়া, মায়া, প্রকৃতি এবং পঞ্চভূতের খেলা চলিতে থাকে। এ সবই আবরণের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাপার। অনুগ্রহশক্তি গুরুশক্তিরূপে উন্মীলনের কার্য করিয়া থাকে। অকুল নামক বোধসমুদ্রের ঊর্মি যখন অনুগ্রহের পাত্র জীবের উপর পতিত হয়, তখনই উক্ত জীবের জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ হয়। যাহার ফলে জীব ক্রমশঃ জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। শুদ্ধ বিদ্যার

খেলাটি অকুলের আদিস্পন্দন রূপ ইহা মনে রাখিতে হইবে। জীব অনাদি কাল হইতেই অজ্ঞানমূলক বিকল্পদৃষ্টির আশ্রয়। যখন অনুগ্রহাত্মক চিদূর্মি পূর্ববর্ণিত ঐ বিকল্পদৃষ্টিকে আঘাত করে তখন হইতে জীবসত্তার ভিতরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই যে ঊর্মির কথা বলা হইল ইহা চিৎ-শক্তিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই উন্মেষিত চিৎ-শক্তি সর্বপ্রথম কালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। ইহার স্বভাবই কালকে গ্রাস করা। জীব কালের অধীন থাকিয়া বিকল্প রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। সুতরাং কাল-গ্রাস সম্পন্ন হইলে তাহার প্রভাবে জীবের দৃষ্টি হইতে বিকল্পজালের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। এই যে বিকল্পজালের নিবৃত্তি ইহা পূর্ণ হইতে সময় লাগে এবং ক্রম অনুসারে ধীরে ধীরে এই নিবৃত্তি সংঘটিত হয়। শুদ্ধ বিদ্যারূপা চিৎ-শক্তির প্রথম কার্য মলকে শোধিত করা। এই শোধন ব্যাপারে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ প্রতি স্তরই শোধিত হয়। প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই ত্রিপুটীতে জীব আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রমাতা অন্তরতম, প্রমাণ মধ্যবর্তী এবং প্রমেয় বাহ্য। বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রমশঃ এই শোধন কার্য চলিতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে সর্বপ্রথম প্রমেয় শুদ্ধির ব্যাপার সংঘটিত হয়। যাহার ফলে জীবাত্মার অধ্যাত্মমার্গ বিমল আলোকে আলোকিত হইতে থাকে। ভগবান শংকরাচার্য গুরুকৃপালব্ধ এই প্রাথমিক শুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন---বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং মায়য়া বহিরিব উদ্ভূতম্।

গুরুর কৃপাদৃষ্টি সঞ্চারের ফলে এই ভাবটি উন্মীলিত হয় অর্থাৎ প্রমেয়শুদ্ধির ফলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্ব বাহ্যরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য নহে। দ্রষ্টা জীব মায়ার অধীন বলিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবোধে স্থিত বলিয়া নিজের অন্তর্গত বিশ্বকে বাহ্যরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ তাহার বাহিরে বাহ্য বলিয়া কিছুই নাই। ইহা মায়ার খেলা। প্রমেয়শুদ্ধি মায়া-নিবৃত্তির প্রথম ব্যাপার। জীবমাত্রই দেহাত্মভাবসম্পন্ন। যখন সদ্গুরুর কৃপায় এই দেহাত্মভাব কাটিতে আরম্ভ করে তখন প্রথমে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্ব তাহার বাহিরে নহে, উহা তাহারই মধ্যে। বিশ্ব দেহের বাহিরে হইলেও আত্মার বাহিরে এ-কথা বলা চলে না। গুরু-কৃপায় মায়া ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিলে সর্বপ্রথমে দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায় যে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কিছুই তাহার বাহিরে নাই। চিৎ-শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে যতদিন নিদ্রিত থাকে ততদিন দেহাত্মবোধও থাকে এবং বাহ্য জগতের সত্তা সত্যরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু চিৎ-শক্তি জাগ্রত হইলে এই ভাবের পরিবর্তন ঘটে। তখন চিৎ-শক্তি বহির্মুখ হইয়া এই তথাকথিত বাহ্য সত্তাকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইয়া আসে। জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর অন্তরাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বিশ্ব আত্মার ভিতরে সমানীত হয়

অর্থাৎ বিশ্ব যে আত্মস্বরূপের অন্তর্গত একটি আভাসমাত্র তাহা তখন বুঝিতে পাবা যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে গুরুকৃপার সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মভাব শিথিল হইতে আরম্ভ হয়।

এই অবস্থাটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রিয়ের কার্য নিজ নিজ বিষয়কে ভোগ করা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় প্রপঞ্চরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই বিষয়-ভোগ সম্পন্ন হয়। যে সকল ইন্দ্রিয় এই সকল ভোগ আস্বাদন করে তাহারা চিৎ-শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত নয় বলিয়া বিষয়ভোগরূপ তৃপ্তি স্থায়ীভাবে আত্মাতে সঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার ফলে ভোক্তা-আত্মাতে তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিই থাকিয়া যায। এইজন্য ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ইহাব ফলে ভোগেব আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায। শাস্ত্রে বলিযাছেন—ন জাতু কামানামুপভোগেন শাম্যতি। ইহার চরম ফল এই হয় যে চিত্ত নিরন্তর বিষয়ভোগের দিকে লোলুপ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়শক্তি গুরুকৃপার প্রভাবে সংবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন পূর্বোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয। কারণ যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়শক্তি বলি তাহা সংবিৎ-শক্তিরই অংশস্বরূপ। এই সংবিৎ সদ্গুরুর দ্বারা জাগ্রত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে সংবিৎশক্তি বিষয়কে ভোগ করিয়া থাকে। তখন এই বিষয়ভোগরূপ জ্ঞান 'রাগ'-রূপে পরিণত হয। ইহার ফলে ভোক্তা-আত্মার তৃপ্তি সাধন হয় এবং এই তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য বিষয়ভোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া যায। এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই শ্রেষ্ঠ ভোগ। সংসারী-জীব পশু-ভাবাপন্ন বলিয়া এই প্রকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কৌলগণ বলেন—বীরসাধক ভিন্ন কেহ ভোগকে রাগরূপে পরিণত করিতে পারেন না। বীবসাধক বীর্যসম্পন্ন এবং এই বীর্য জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী অথবা উন্মেষপ্রাপ্ত চিৎশক্তির প্রভাবসম্পন্ন। ইহাই বীরসাধকের মুখ্য অবলম্বন। শিবসূত্রে বলা হইযাছে—"ত্রিতয়ভোক্তা বীরেশঃ"। অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ বীর তিনিই তিনটিকে অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে তুরীয় আনন্দরূপে ভোগ করিতে পারেন। পশু অর্থাৎ সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

চিৎশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐরূপ বিষয় ভোগই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। উৎপলাচার্য বলিযাছেন যে—

"তত্তদিন্দ্রিয়মুখেন সন্ততং যুষ্মদর্চনরসায়নাসবম্।
সর্বভাবচষকেসু পূরিতেষু আপিবন্নপি ভবেয়মুন্মদঃ।।"

এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই বস্তুতঃ ভগবানের অর্চনা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েব দ্বারা শ্রীভগবানেব পূজারসায়ন রূপ যে আসব তাহা যাবতীয় ভাবরূপ চষক বা পাত্রে পূর্ণরূপে ভরিতে পারিলে নেশা অথবা গাঢ় তন্ময়তা আবির্ভূতা

হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা বস্তুতঃ চক্ষুর দ্বারা রূপ নামক ভাবে বা চষকে পূজারস পান করা বা তন্ময় হওয়া। কানে শব্দ শুনা, ইহাও তাহাই। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য যে ভোগ ইহাই উপাসনা। জীব যখন যে অবস্থাতেই থাকুক অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাহার সর্ব অবস্থাতেই ইহা হইযা থাকে। ইহা সবই শ্রীভগবানের পূজা। ইহা দুর্বল জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা যে সম্পাদন করিতে পারে সে দুর্বল নহে, তাহাকেই বীর বলে। ভগবান্ শংকরাচার্য এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্"।

অর্থাৎ আমি যে কোন কর্ম করি সবই ভগবানের আরাধনা।

এইপ্রকার বিষয় ভোগের পর অর্থাৎ ভগবদর্চনার ফলে তৃপ্তির উদয় হয়। তখন অন্তর্মুখ দশা আরম্ভ হয়, বহির্মুখ ভাব আর থাকে না। যখন গ্রাহ্য পদার্থ গ্রহণের স্থিতিতে পরিবর্তিত হয তখন চিন্ময়প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সকল বিষয়-ভোগের ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর তৃপ্তি লাভ করিয়া অন্তর্মুখ হয়। এই অবস্থা উদিত হইলে চিন্ময়ী ইন্দ্রিয়শক্তি সকল চিদাকাশরূপী ভৈরবের সঙ্গে আলিঙ্গিত হয। অন্তর্মুখ হওযার পব ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। প্রথমে প্রমেয় প্রমাণের সহিত একত্ব লাভ করে, তাহার পর প্রমাণ প্রমাতার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। আলিঙ্গনের পর যে অবস্থার উদয হয তাহা একটি বিশ্রামের অবস্থা। তাহাকে শয়ন অবস্থা বলে। সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তি সকল চিদাকাশের সহিত আলিঙ্গিত হইতে পারে না, কারণ সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিযশক্তি সকল বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত থাকে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে ততক্ষণ দেহমধ্যে ৭২০০০ হাজার নাড়ীর কার্য চলিতে থাকে। ঐ অবস্থায় ভিতরে ও বাহিরে একটি ক্রিয়া চলিতে থাকে যাহা স্বরূপতঃ অন্তর্দ্বাদশান্ত ও বহির্দ্বাদশান্তের মধ্যে সঞ্চরণ ক্রিয়া। এই ক্রিয়াতে যে অন্তর্মুখ গতি হয় তাহার ফলে ভিতরের দ্বাদশান্তে প্রবেশ হয় এবং যে বহির্মুখ গতি হয় তাহার ফলে বাহ্য দ্বাদশান্তে স্পর্শ হয়। এই দুইটি সংঘট্টস্থান পরস্পর মিলিত হইয়া যখন সন্ধিতে উপস্থিত হয় তখনই আত্মার পরপ্রমাতৃভাব খুলিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার। এই অবস্থাটি সন্ধিস্থানমাত্রেই সংঘটিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। প্রমেয় ও প্রমাণের সন্ধিতেও ইহা ঘটে এবং প্রমাণ ও প্রমাতার সন্ধিতেও ঘটে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই অবস্থার স্বরূপ কি—অর্থাৎ এই অবস্থা ঘটিলে কি হয়? ইহার উত্তর এই যে, ঐ সন্ধিকালে পরাসংবিৎ পরিমিত প্রমাতাকে অর্থাৎ জীবকে নিজশক্তির প্রভাবে নিজের স্বরূপে মগ্ন করেন। মিত প্রমাতা যখন অমিত প্রমাতাতে মগ্ন হইয়া যায় তখন দুইটি অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত

হয়। এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষজনিত ক্ষোভনিবৃত্তি প্রথম, অর্থাৎ এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসেব ক্রিয়া থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটি প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ হইতে জন্মে। ইহাই হইল একদিকের কথা। অন্যদিকে প্রমাণ ও প্রমেযের সংঘর্ষও নিবৃত্তি হয়। এইটিই দ্বিতীয় অবস্থা। সুতরাং এটি যে শান্ত ও নির্বিকল্প অবস্থা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় প্রাণ স্থিব। অধ্যাত্মজগতে চরণশীল পথিকের পক্ষে ইহাই প্রকৃত শিবরাত্রি। এই সমযে চন্দ্র প্রভৃতির সহিত সূর্যও অস্তমিত হন। চন্দ্র মন, সূর্য প্রাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে পারিলে একটি বিশিষ্ট স্থিতির উদয় হয়। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলা হইল তাহা অতি উচ্চ অবস্থা হইলেও চরম অবস্থা নহে, একথা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থাটি মহাব্যোমে প্রবেশরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ যে ব্যোম বা আকাশকে জানি তাহাতে চন্দ্র সূর্যের সঞ্চার থাকে। মহাব্যোমে চন্দ্র ও সূর্যের সঞ্চার নাই। ইহাকে আচার্যগণ 'প্রলীনশশিভাস্করঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্র মনঃস্বরূপ। চন্দ্রের সঞ্চার না থাকার মানেই মনের ক্রিয়া তখন থাকে না। তখন প্রমাণ-প্রমেযভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। সূর্য বলিতে বুঝায় প্রাণশক্তিকে।. সূর্য থাকে না বলিতে ইহাই বুঝায় যে প্রাণ-অপানের ক্রিয়া সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলাও আর থাকে না। এই অবস্থাটি বস্তুতঃ খুবই উচ্চাবস্থা কিন্তু উচ্চ অবস্থা হইলেও ইহা নিরাপদ স্থান নহে। কারণ এই অবস্থায় সর্বদাই জাগিয়া থাকিতে হয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই স্বরূপ অনুসন্ধানের দিকে সতর্ক থাকার আবশ্যকতা হয়, কারণ স্বরূপ অনুসন্ধানে জাগ্রৎ না থাকিলে এই অবস্থা হইতে স্খলিত হওয়া অনিবার্য। প্রকৃত নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইলে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় না। শিবসূত্রে 'উদ্যমো ভৈরবঃ' বলা হইয়াছে তাহা এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই। প্রাচীন যোগিগণের পরিভাষাতে এই অবস্থাই 'অনাখ্যা' নামে পরিচিত। এই অনাখ্যা অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। সেইগুলি ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে না পারিলে নিরাপদভূমি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সুতরাং জানিতে হইবে চিদাকাশ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার করিলেই সব কিছু হয় না। চিদাকাশে উত্থিত হইয়াও নিজ সত্তাবোধ সর্বদা জাগাইযা রাখিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে পূর্ণহন্তাস্বরূপ পরপ্রমাতৃভাবে স্থিতিলাভ ঘটে না।

অতএব বুঝিতে হইবে এই চিদাকাশকে আশ্রয় কারিয়াই পরপর বিভিন্ন দশার অনুভব করা আবশ্যক। সাধনার প্রভাবে ঊর্ধ্বগতি লাভ করা তত কঠিন নয কিন্তু স্বরূপস্থিতি রক্ষা কবা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্যই আত্মবিমর্শ আবশ্যক। ইহার প্রভাবে বিকল্পরূপী সমগ্র জগৎ অন্তর্মুখ হইয়া ধীরে ধীরে

লীন হইয়া যায়। এই বিকল্পরূপী জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে চরাচর গ্রাস সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ"। অর্থাৎ আত্মা চর ও অচর সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ঐ গ্রাসের উল্লাসে একটি রসময় স্থিতিলাভ করে। এই স্থিতি হইলেই আত্মা তখন পরপ্রমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। উহা এই যে স্বাতন্ত্র্যময় আত্মস্বরূপে স্বরূপের উন্মীলন ও নিমীলন ব্যাপার সব সময়েই থাকে। যাহাকে স্বরূপের নিমীলন বলা হইল তাহারই নাম অনাদি মূল আবরণ। ইহাই তিরোধান ব্যাপার। আর যাহাকে উন্মীলন বলা হইল তাহাই অনুগ্রহের ব্যাপার। স্বরূপের উন্মীলন হইলে মহামায়া নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বহির্মুখী বৃত্তি যাহাকে সংসারচক্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা নিজ আত্মারূপী অগ্নিতে অভেদ জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে। ইহাই অদ্বয়স্বরূপ স্থিতি। এই পর্যন্ত অদ্বৈত শাক্ত বা শৈব যোগীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। ইহার পর আর বিশেষ চেষ্টা বা উদ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাহার কারণ এই যে, এই অবস্থা আয়ত্ত হইলে স্বরূপ বিস্মৃতি কখনও ঘটে না। তাই বহির্মুখ ভাবেরও শঙ্কা থাকে না। এই যে অবস্থার কথা বলা হইল ইহা যোগিদের পরিভাষাতে 'উন্মনা' অবস্থার নামান্তর। কেহ কেহ ইহাকে 'ভাবসংহার' বলিয়া বর্ণনা করেন। ভাব বলিতে ভাবময় সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে হইবে। পূর্বে যে পরিস্থিতির কথা বলা হইয়াছে তখন প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতৃরূপ বাহ্য বিশ্বের উপসংহার হইয়াছিল কিন্তু ভাবময় বিশ্ব তখনও ছিল। এইবার যাহা বলা হইল তাহা ভাবময় বিশ্বের নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। পরাসংবিৎরূপী জগদম্বার কৃপায় ইহা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় ভেদজ্ঞান তো থাকেই না, পক্ষান্তরে হেয় ও উপাদেয় বোধও থাকে না। ইহা পরম নির্বিকল্প স্থিতি। কিন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নহে। কারণ, ভাবসংহার হইয়া গেলেও ভাবের সংস্কারটা তখনও থাকে। অদ্বৈত শাক্ত বা শৈব যোগীর একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণহন্তা লাভ করিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ। এই ভাব-সংস্কারের মধ্যে ইদন্তার লেশ থাকিয়া যায়। অহন্তা তখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। যতক্ষণ ভাব-সংস্কার থাকে ততক্ষণ কালের কলনা সূক্ষ্মভাবে হইলেও কিছু না কিছু থাকেই। কালের কলনা সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত না হইলে স্বভাবসিদ্ধ অহংকে পাওয়া যায় না। এই সময়ে শাক্ত বা শৈব অদ্বৈত যোগী অনুভব করেন, 'সবই আমি'। বস্তুতঃ ইহা তখন তাঁহার দিক হইতে আত্মারূপী শিবেরই পূজা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থা পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইবার পর যোগীকে আরও গভীর স্তরে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্বে যে ভাব-সংহারের স্থিতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকপক্ষে প্রমেয় পর্যন্ত সংহার, তাহার উপরের কোন অবস্থা নহে।

আত্মরূপী শিবের পূজা যাহা বলা হইল তাহা আরও গভীরতর অবস্থা। ইহা প্রমাণের সংহার, শুধু প্রমেয়ের নহে। ইহা অতি গভীর ব্যাপার সন্দেহ নাই। মহাকল্পের পর যে সংহার ইহা তাহাই। এই সময়কার স্থিতিতে প্রমেয় ও প্রমাণ চিৎ-সত্তাতে অথবা চিদগ্নিতে সম্যক্‌প্রকারে লীন হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের সমাধান আবশ্যক। পূর্বে যে বিশ্ব-সংহারের কথা বলা হইয়াছে এবং এখন যে ভাব-সংহারের কথা বলা হইল এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য আছে। একটি নিম্নভূমির এবং অপরটি উচ্চভূমির। প্রতি অবস্থাতেই আভাসরূপে হইলেও শঙ্কা উদয়ের সম্ভাবনা আছে। নিম্নভূমির অবস্থাতে ব্যক্তিগত প্রযত্ন বা স্বরূপ অনুসন্ধান দ্বারা ঐ শঙ্কা দূর করিতে হয় এবং শঙ্কা নিবৃত্ত না হইলে সেখান হইতেই পতন ঘটিয়া থাকে। এই শঙ্কানিবৃত্তি নিম্নভূমিতে ব্যক্তিগত প্রযত্নের দ্বারা করা হয়। উপরের ভূমিতে শঙ্কার উদয় হইলে উহার জন্য ব্যক্তিগত প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না। ঐ শঙ্কা আপনা আপনিই কাটিয়া যায়। এস্থলে শঙ্কা শব্দের অর্থ কর্তব্যাকর্তব্য বিচার। সুতরাং পূর্বোক্ত বিবরণের তাৎপর্য এই যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় আপনা-আপনি হইয়া যায়। এই উচ্চাবস্থায় শঙ্কা ও গ্লানি উদিত হইলেও তাহাতে যোগীর পতন ঘটে না। এই উচ্চাবস্থাটি সদাশিবের অনুরূপ। এই অবস্থায় প্রমেয় তো থাকেই না, তবে প্রমাণের মধ্যে প্রমেয়ের জীবনীশক্তিটি তখনও থাকিয়া যায়। এই জীবনীশক্তিটি অপর কিছুই নহে, ইহাই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে যোগীর পরিভাষাতে সূর্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে অহঙ্কারে লয় করা আবশ্যক। অহঙ্কারই পরম-আদিত্যস্বরূপ। এইবার আমরা প্রমেয় ও প্রমাণ অতিক্রম করিয়া প্রমাতৃতত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। এই পরম-আদিত্যকেই গায়ত্রীমন্ত্রে ভর্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই নামান্তর ভর্গশিখা। পরাসংবিৎ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি আত্মসাৎ করিয়া উপসংহারের চরম দশায় উপনীত হয়। এই অবস্থায় তাহার সব কলাই উপসংহৃত হয়, কেবলমাত্র ‘অমাকলা’ অবশিষ্ট থাকে। এই অমাকলাই শিবকলা। ইহারই নাম পরপ্রমাতা। মনে রাখিতে হইবে ইহাও কিন্তু কলাই, নিষ্কল নহে। ইহারই নামান্তর শিবকলা, যাহা আমাদের পূর্ববর্ণিত পরপ্রমাতার সহিত অভিন্ন।

কিন্তু এই যে অহংকাররূপী প্রমাতার কথা পরমাদিত্যরূপে বর্ণনা করা হইল ইহা প্রমাতৃরূপ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। পরমাদিত্য হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থার উদয় হয়। পরমাদিত্যের ঊর্দ্ধবর্তী যে প্রমাতা তাহার পারিভাষিক নাম কালাগ্নিরুদ্র। পরমাদিত্য হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় আত্মা হইতে সংসারভাব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় কিন্তু লেশমাত্র পশুত্ব তখনও থাকে। বলা বাহুল্য, তখন বিষয় সংস্কার নাই এমন কি

ইন্দ্রিয়সংস্কারও নাই। একমাত্র নির্বিকল্প প্রমাতাই বর্তমান, যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই পর্যন্ত প্রগতি সিদ্ধ হইলে রুদ্র অবস্থা হইতে ভৈরব অবস্থাব উদয় হয। ভৈরব অবস্থাতে সর্বপ্রথম মহাকালভৈরবের আবির্ভাব হয়। যাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে মহাকালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই মহাকালভৈববের শক্তি। মনে রাখিতে হইবে মহাকালীও কিন্তু জগদম্বা নহেন। মহাকালভৈরব বিশ্বসংস্থানে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় আছেন কারণ ইঁহার পঞ্চকৃত্যের অধিকার আছে কিন্তু পঞ্চকৃত্যের অধিকার থাকিলেও ইনি পূর্ণ নহেন কারণ ইঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বযং জগদম্বার ইচ্ছায এবং তাঁহারই আদেশে ইনি পঞ্চকৃত্য করেন। এই অবস্থায় একটি পরম তেজের সাক্ষাৎকার ঘটে। ঐ তেজের মধ্যে যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন অহন্তা ডুবিয়া যায়। পরিচ্ছিন্ন অহন্তা নানাপ্রকার। দেহগত অহন্তা একপ্রকার, প্রাণগত অহংকার তাহা হইতে ভিন্ন প্রকাবের, পুর্যষ্টকগত অহংকার অন্যপ্রকার এবং শূন্যগত অহংকার ইহা হইতে পৃথক। এই সকলই পরিচ্ছিন্ন অহন্তা। এইগুলি তখন মহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একমাত্র পূর্ণ অহন্তাতে স্থিতি লাভ করে। এই পূর্ণ অহন্তা বিশ্বের সহিত সর্বপ্রকারে অভেদভাবাপন্ন। এই অবস্থায যোগী যখন উপনীত হন, তখন পরমশিবের ন্যায অবস্থা তাঁহার আয়ত্ত হয়! এই অবস্থায় কোন সংস্কার বিদ্যমান থাকে না। আত্মসংবেদন ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ফুটিয়া উঠে এবং চরমে উহা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে যে ভগবতী মহাকালীর কথা বলা হইয়াছে, তখন তিনি না থাকার মত, কারণ তিনি তখন অকুলে প্রবিষ্ট হওযার জন্য উন্মুখ। অকুলই তাঁহার নিজধাম। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কালের দ্বারা কলিত নহে। তখন সৃষ্টি সংহাররূপে কাল থাকে না। একমাত্র সাম্যরূপ কাল থাকে। এই অবস্থায় একটি ক্ষণমাত্র থাকে এবং উহা অনন্ত কালরূপে প্রতীত হয। ইহাই প্রাচীন পাশ্চাত্য Mystic গণের Eternity অথবা Eternal Moment। উহাতে কোন ক্রম থাকে না। এই পর্যন্ত ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হইলে যোগী পবমশিব অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন পরাসংবিদ্রূপা জগদম্বার সাক্ষাৎকার ঘটে। ইনি একদিকে যেমন পূর্ণরূপা অপরদিকে তেমনি কৃশরূপা। ইনিই অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি। ইনি সমস্ত চক্রের বিকাশ করেন বলিয়া ইনি পূর্ণা এবং সকলের সংহার করেন তাই ইনি কৃশা। যখন সকলকে সংহার করেন তখন তিনি নিজস্বরূপে স্থিত হন, তখন তাঁহার নাম কালসংকর্ষিনী। কৃশা অবস্থা ইহারই নামান্তর। এই পরমপদে উন্নীত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে অখণ্ড মহাযোগের পথে যোগীর স্বরূপ এবং তাৎপর্য কি। প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতারূপ ত্রিপুটির নিবৃত্তি হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ স্থিতিতে প্রবেশ লাভ হয় না। কারণ ঐ সময়ে আত্মানুসন্ধান জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে পতন অসম্ভব

নহে। চিদাকাশ অথবা মহাব্যোমে বাহ্যপ্রপঞ্চ হইতে উপশম লাভ করা যায় সত্য কিন্তু উহা আত্মস্বরূপ নয় বলিয়া ক্রমশঃ ভাবরূপী প্রমেয়কেও সংহার করিতে হয়। ইহা আন্তর প্রমেয়। ইহা আত্মস্বরূপের অন্তর্গত বিশ্বের স্বরূপ। এই আন্তর প্রমেয় ও প্রমাণ উভয়ই পরম অদ্বৈত স্থিতির বাধক। তারপর প্রমাতৃভাবে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বসংস্কার বর্জিত হওয়া আবশ্যক। প্রমাতৃভাব ক্রমশঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তাহাও পরম স্থিতি নহে, কারণ সেখানেও স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয় না। ইহার পর বিশ্বের সহিত অভিন্নরূপে পূর্ণাহন্তার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যেরও উন্মেষ হয়। ইহাই নিরাপদ স্থান। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে পাতঞ্জল যোগীর নিরাপদ ভূমি এবং অদ্বৈত শাক্ত যোগীর নিরাপদভূমির পার্থক্য কোথায়।"

(খ)

স্পন্দ যোগ—কাশ্মীর শৈবাগমের একটি অন্যতম আগমশাস্ত্র হইল 'স্পন্দকারিকাঃ'। এই শাস্ত্রমতে যোগ সাধনার তিনটি ক্রমোন্নত স্তর, যথা—ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছা। সাধনার এই ক্রম অনুসারে প্রথম হইল ক্রিয়াত্মক সাধনা। ক্রিয়াত্মক সাধনা বলিতে বুঝায় গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের অভিনিবেশ সহকারে জপ। এইরূপ ক্রিয়াত্মক সাধনায় চিত্তের বহির্মুখী গতি অন্তর্মুখী হয় অর্থাৎ চিত্ত ক্রমশঃ স্থিরতা লাভ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তের বিষয়াকর্ষণ-জনিত যে বিক্ষেপ, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের বহির্মুখী গতি স্তব্ধ হইলে উহা স্বাভাবিকভাবে অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে।

বহির্চেতনা অবলুপ্ত হইলে চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া স্থিতি লাভ করে। চিত্তের এরূপ অবস্থায় বাহ্য জগতের স্পন্দন চিত্তের মধ্যে কোন বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং এই দিক হইতে বিচারে চিত্তের তখন অস্পন্দ অবস্থা।

চিত্তের এরূপ অস্পন্দ অবস্থায় সাধকের দেহাভ্যন্তরে মূলাধারে চিদগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যরূপ সম্বোধি বা সংবিদ্ বা তন্ত্রোক্ত মতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয় এবং মূলাধার হইতে সেই চৈতন্যশক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় এবং সাধনার বলে উহা ক্রমশঃ চক্রভেদ করিতে করিতে আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইয়া আত্মস্বরূপ-জ্ঞান উৎপন্ন করে। পরে আজ্ঞাচক্রও ভেদ করিয়া সহস্রারে অবস্থিত প্রকাশরূপী শিবের সহিত সম্মিলিত হয়। সাধনার প্রভাব থাকিলে সহস্রারকেও ভেদ করিয়া শিব ও শক্তির সামরস্য ঘটাইয়া যোগী পরমশিবত্ব লাভ করিতে পারে।

আত্মসংবিদরূপী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও ঊর্ধ্বমুখী গতিই হইল

চিত্তের অন্তর্মুখী স্পন্দনাবস্থা। চিত্তের যখন বহির্মুখী গতি, তখন উহা চিত্তের অশুদ্ধ অবস্থা; আর যখন অন্তর্মুখী গতি, তখন চিত্তের বিশুদ্ধিতার দিকে ক্রম অগ্রগতি। বহির্মুখী গতি হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখী গতির দিকে চিত্তের উন্মুখীনতার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ বহির্মুখী গতির অবসান ও অন্তর্মুখী গতির সুরু হইবার অন্তবর্ত্তী সময়ে চিত্তের যে বিরামকাল, উহাই চিত্তের অস্পন্দ অবস্থা। অতএব বহির্মুখ স্পন্দন হইতে প্রত্যাবৃত্ত চিত্তের অস্পন্দ অবস্থা, আবার অস্পন্দ হইতে অন্তর্মুখ স্পন্দনের দ্বারা ঊর্ধ্বদিকে যাত্রাই হইল যোগীর অধ্যাত্মজীবনের যোগ সাধনা।

প্রাণায়ামে এই বিষয়টিকেই অন্যরূপে বর্ণনা করিতে দেখিতে পাই। প্রাণ ও অপান বায়ুর নিয়ন্ত্রণই প্রাণায়াম অভ্যাসের লক্ষ্য। প্রাণ বহিঃ বায়ু, অপান অন্তর বায়ু—ইহা নাভিকুণ্ডলের নিচে অবস্থিত। নিঃশ্বাস গ্রহণ দ্বারা প্রাণ বায়ু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অপান বায়ুকে আকর্ষণ করে, অপান বায়ুও প্রাণ বায়ুকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন প্রাণ ও অপান বায়ু তুল্য বলশালী হয় তখন উহাদের সংযোগে 'সমান' বায়ু উৎপন্ন হয়। ঠিক এই অবস্থায় চিদগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, বাহ্য জগত চেতনায় লুপ্ত হইয়া যায়। অন্তর বায়ুই এই সময় জীবনের ক্রিয়াকে সচল রাখে। এই সময়ে যে বায়ু জাগ্রত চিৎ-শক্তিকে বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে হৃদয়পুর হইতে সহস্রপুরে চালিত করে উহা 'উদান' নামে অভিহিত। সহস্রারের উপরে 'ব্যান'।

স্পন্দযোগে আরোহ ক্রম এইরূপঃ নিম্নে শুদ্ধবিদ্যা থেকে উপরে চিৎ পর্যন্ত—

চিৎ
↑
আনন্দ
↑
ইচ্ছা
↑
জ্ঞান
↑
ক্রিয়া
↑
শুদ্ধবিদ্যা

দেহাত্মাভিমান দেহীর অবিদ্যা (অশুদ্ধ বিদ্যা)। অহংজ্ঞানী দেহী অন্তরাবৃত্ত হইয়া যখন দেহ হইতে আলাদা করিয়া নিজেকে দেখিতে পায় তখন দেহাত্মবোধ

হইতে মুক্তি পাইয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করে। শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। শুদ্ধ বিদ্যা কি? শুদ্ধ বিদ্যা হইল ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মের সহিত জীবেব যোগ স্থাপিত হয়। এই শক্তিই জীবকে অধ্যাত্মের পথে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের অভিমুখে পরিচালিত করে। এই অগ্রগতির ক্রম বা স্তর আছে। এক একটি ক্রম বা স্তরে জীবের এক একপ্রকার উপলব্ধি হয়। প্রথমে ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হয়। ক্রিয়ার ক্রমশঃ বিকাশ হইতে হইতে যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তখন জ্ঞানের বিকাশ আরম্ভ হয়। ক্রিয়ার বিকাশেব সাথে সাথে জ্ঞান থাকে, কিন্তু জ্ঞান তখন dormant—বীজাবস্থায় থাকে। জ্ঞানের ক্রম বিকাশের সঙ্গে ক্রিয়ার কার্যকারিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। শুক্লপক্ষে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা বিকাশের পর যেমন হ্রাস পাইতে পাইতে কৃষ্ণপক্ষে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ হইলে ক্রিয়া জ্ঞানের মধ্যে লীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশে ইচ্ছার আবির্ভাব। ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে ক্রিয়া ও জ্ঞানের লীন। ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ হইতে আসে আনন্দ। আনন্দের পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে ইচ্ছার বিলয়। আনন্দের পূর্ণ প্রকাশই চিৎ বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আবাব পূর্ণ ব্রহ্ম এবং অপূর্ণ ব্রহ্মে দ্বিধা বিভক্ত। অপূর্ণ ব্রহ্ম হইলেন সদাশিব যিনি স্বচ্ছ দর্পণের মত শুধু প্রকাশস্বরূপ। সেখানে শুধু বিশুদ্ধ অহং বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রাধান্য। এখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বোধ অস্ফুট বা নিরাভাস। অপূর্ণ ব্রহ্মের বিপরীত হইল অপূর্ণশক্তি যাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রাধান্য, যিনি সৃষ্টিশক্তির অধিকারিণী। যাঁহার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব আভাসিত। অপূর্ণ শিব ও অপূর্ণ শক্তির সামরস্য হইলেন পূর্ণ ব্রহ্ম যিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। ইহাই অদ্বয় জ্ঞান। এই পূর্ণ ব্রহ্মে বা অদ্বয় জ্ঞানে ক্রিয়া, জ্ঞান, ইচ্ছা, আনন্দ ও চিৎ সকল শক্তিরই একত্র সমাবেশ। পূর্ণ ব্রহ্মের যে শক্তি তাহাই পরাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্য শক্তি।

অন্তরাবৃত্ত হইয়া ভৌতিক দেহের আবেষ্টন থেকে মুক্তি পাইলে মাযার আবরণও খসিয়া পড়ে। মায়ার আবরণমুক্ত নিজ স্বরূপের (আত্ম-স্বরূপের) উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় সেই একই আত্মা বিরাজমান্—ইহা যোগীর দৃষ্টিগোচর হয়। আত্মা এক। ব্যষ্টি জীবের মধ্যে ও বিশ্বভূত সমষ্টি বস্তুব মধ্যে যে সেই একই আত্মা সর্ব ব্যাপকরূপে প্রকাশিত যোগী তাহা দেখিতে পায়। অর্থাৎ ব্যষ্টি আত্মা যে সমষ্টি আত্মার মধ্যে এবং সমষ্টি আত্মা যে ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে বিধৃত তাহা যোগদৃষ্টিতে গোচরীভূত হয়। কিন্তু স্বরূপের আবরণ খসিয়া পড়িলেই যে যোগীর সম্মুখে পূর্ণ-ব্রহ্মের স্বরূপের আবরণ উন্মোচিত হয়, তাহা নহে। এই অবস্থায় জীব ব্রহ্মভূত হয় বটে এবং সমস্ত বৈষম্যের অবসান ঘটে, পবমা শান্তির উপলব্ধি হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু জীবেব সেই প্রথম অদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুতে

পৌঁছাইতে এখনও অনেক পথ বাকী। জীবের এরূপ অবস্থা দেশ ও কালের অতীত। ব্রহ্মভূত অবস্থায় জীব দেশ ও কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন এবং নানা বিভূতিরও অধিকারী। এই পরম শান্তির ধামে যোগী যদি নিজেকে হারাইয়া ফেলে, পরম চাওয়া এবং পরম পাওয়ার অবসান হইয়াছে মনে করিয়া যদি এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাঁহার আরও ঊর্ধ্বগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানে জীবের চরম চাওয়ার নিবৃত্তি হইযাছে, চাইতেও আর সে জানে না, ছোট্ট শিশুর মত কি তাঁর প্রযোজন, সে বোধও তখন তাঁর নাই। চাওয়ার নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু পরম পাওয়া এখনও পূর্ণ হয় নাই। পরমা শান্তির মধ্যে অভিভূত, নিমজ্জিত এবং তলাইয়া না গিয়া পূর্ণকে পাওয়ার যদি আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখা যায়, পরম প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছার সংবেগ যদি তাঁর ভিতর থেকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, তবে পথের সর্বশেষ লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয। এইখানেই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ। এ সাধনা ভাব-সাধনা। অবোধ শিশুর যেমন মায়ের প্রতি পরম নির্ভরতার ভাব থাকে, সাধকেরও তেমনি এই অবস্থায় তাঁর অন্তর্দেবতার উপর পরম নির্ভরতা আসে। একান্ত বিশ্বাসে প্রাণের ঠাকুরের শরণ নেয়। অবোধ শিশু যেমন চাইতে জানে না, শুধু আকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদে, সাধকও তেমনি সুতীব্র আবেগে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকে, তাঁর বিরহে আকুল হইয়া চোখের জলের বন্যায় ভাসে। বিরহের তীব্র দাহ যতই বাড়ে, ততই বাঞ্ছিত দেবতাকে না পাইলে জীবন অসার নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ যখন বিরহের ব্যথা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, প্রাণের ঠাকুরকে না পাইলে এক মুহূর্তও চলে না, তখনই ভাবের পরিপাক হয়। ভাব পরিপক্ক হইলে পরাভক্তি লাভ হয়। পরাভক্তিই ভগবানের পরাশক্তি। পরাশক্তিই পরাপ্রেম। পরাপ্রেম স্নেহ, মান, প্রণয় প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া রসে পরিণত হয়। রসের পরিপাক হইলে ভক্ত-ভগবান, অংশ-অংশী, বিষয়-বিষয়ীর আর ভেদ থাকে না, অভেদে এক রসে পরিণত হয়। আবার নিত্য ব্রজলোকে রসোল্লাসের আস্বাদনের জন্য ভক্ত নিজ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিত্য সিদ্ধ রস-তনু লাভ করিয়া নিত্য লীলা-বিস্তারের সহায়তা করে। এই ভাবরাজ্যে ভক্ত-জীবের নিকট পূর্ণ ব্রহ্ম অনাবৃত স্বরূপে প্রকাশিত হন। এই স্তরে ভক্ত-জীব ও ব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান স্বরূপতঃ এক হইলেও জীব পূর্ণ ব্রহ্ম বা ভগবান নহে। জীবের নিজ স্বাতন্ত্র্যের আধারে ভগবানের অনন্ত রসের আস্বাদন হয়। অনন্ত রসের সহিত যুক্ত থাকিয়াও নিজ স্বাতন্ত্র্য সত্তার বিলুপ্তি হয় না। অনন্ত রসের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত রসের ধারণা হয়, কিন্তু অনন্ত রসের মধ্যে বিলীন হইয়া নিজে শূন্য হইয়া যায় না। সমুদ্রে মিলিত হইয়া গঙ্গার যদি

সমুদ্রের ধারণাই না হইল, অস্তিত্বশূন্য হইয়া সমুদ্রই হইয়া গেল তবে গঙ্গার পূর্ণত্ব উপলব্ধির সার্থকতা কোথায়?

ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-বিন্দু-লীলা—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—পরমশিবের এই পঞ্চমুখ বা পঞ্চকোটি। তন্মধ্যে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া পর্যন্ত মহামায়ার বা বিন্দুর অধিকার সীমা। ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্য দিয়া প্রথমে ত্রিপুটির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বিষয়টি একটি ত্রিকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যাইতেছে—

শব্দব্রহ্ম অ-উ-ম হইল ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রতীক। অ-উ-ম এই ধ্বনি নিত্য উত্থিত হইয়া বিন্দুর মধ্যে লয় হইতেছে। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিন্দু বা মহামায়ারই শক্তি। সেইজন্য ইহারা শক্তি-সমন্বিত ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সাধনার দ্বারা ক্রিয়ার স্পন্দন সুরু হইলে জ্ঞেয় বা পার্থিব স্থূল বস্তু যাহা জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই জ্ঞেয় জ্ঞানের মধ্যে মিলিত হইয়া যায়। জ্ঞানের স্বরূপ হইতেছে প্রকাশ বা আলো। সিনেমায় পর্দার উপর প্রতিফলিত আলোকে (focus) যেমন বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানালোকে পার্থিব বৈচিত্র্যময় সকল বস্তুই দৃষ্ট হইবে, কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে নয়, প্রকাশরূপে অর্থাৎ দর্পণে প্রতিফলনের ন্যায় সমস্ত কিছুই জ্ঞানালোকে ভাসমানরূপে প্রতীয়মান হইবে। স্পন্দনের বেগ আরও তীব্র হইলে কিছুই দেখা যাইবে না, শুধু এক আলো বা জ্যোতিই যোগীর সম্মুখে নিত্য বিরাজমান থাকিবে। স্পন্দন আরও তীব্রতর হইলে যোগী বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেখানে দেখিবে অনন্ত বিশ্ব বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে এবং অনন্ত বিশ্ব বিন্দুর মধ্যে একাকার (dissimilated) হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত 'ইদন্তা' বিন্দু হইতে স্ফুরিত হইতেছে এবং সমস্ত ইদন্তা বিন্দুতেই পর্যবসিত রহিয়াছে। যোগী এই বিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ মায়াধীশ হইলে তাঁহার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়। তিনি

তখন ইচ্ছার প্রয়োগে অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহাই যোগীর ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য পরমেশ্বরেরই ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে ভুলিয়া থাকিলে যোগীর গতি ঐখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ঐশ্বর্যবান্ যোগী পুরুষ পরমেশ্বরের সদরমহলেই স্থান পায়, তাঁহার অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না। কারণ, সদরমহল ও অন্দরমহলের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করিয়া বিরাজ করিতেছে 'নিরোধিকা' শক্তি, যাহাকে বৈষ্ণবেরা বলেন বিরজা নদী। কিন্তু যে যোগী অন্দরমহলে পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গ আপন-জন হইতে চাহেন, তিনি বিন্দুকেও ভেদ করিয়া যাইবেন। অর্থাৎ ইচ্ছাকেও পরিত্যাগ করিবেন। ইচ্ছাকে ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণরূপে পরমেশ্বরে শরণাগত হইলে পরমেশ্বর যোগীকে আপন-জন করিয়া লইবেন এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছাই তখন যোগীভক্তের ইচ্ছারূপে ফুটিয়া উঠিবে। তখন ভক্ত যোগীর দুইটি জিনিসের অনুভব হইবেঃ প্রথম ইদন্তার লোপ হইয়া শুদ্ধ অহন্তার উদয় হইবে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইবে এবং সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যে 'আমিই আছি, আমার মধ্যেই যে সমস্ত বিশ্ব রহিয়াছে, আর আমিই যে বিশ্ব হইয়াছি'—ইত্যাকার তাদাত্ম্যবোধ আসিবে, অর্থাৎ বিশ্ব এবং আমি অভিন্ন—এইরূপ বিশুদ্ধ অহন্তা জাগ্রত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছার ত্যাগে চিন্ময় আনন্দের উদয় হইবে। এরপর বিশুদ্ধ অহন্তাও বর্জন করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি পরম নির্ভরতা আসিলে অনাবিল আনন্দের আকর্ষণে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হইবে। এই ধাবমানতাই স্পন্দন বা নদন। নদন হইতে নাদ তত্ত্বের উৎপত্তি। এইখান হইতেই প্রেমভক্তির সাধনার প্রকৃত আরম্ভ। এইখান থেকেই যে যার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী রতির সাধনা করে। ব্রজগোপীগণের পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই সমর্থা রতি। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া পরম অনুরাগে তাঁহার সেবা করে। অনুরাগরঞ্জিত প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহারা আর আনন্দের দিশা পায় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ॥" (চৈঃ চঃ)

যে রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগেচ্ছা প্রবল, তাহাকে সাধারণী রতি বলে। এই রতিতে কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ লাভ করিবার বাঞ্ছা প্রধান, তাহা গোপীগণের বাঞ্ছাশূন্য আত্মহারা প্রেম নয়—তাই তাহা সাধারণী। যে রতিতে ধর্মজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান সজাগ থাকে যাহা সত্যভামা, রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীদের মধ্যে দেখা যায়, তাহাকে সমঞ্জসা রতি বলে। কিন্তু ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণরতি স্বতঃস্ফুর্ত। নিজেদের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত আত্মাবিলোপকারী প্রেম

ইহার লক্ষ্য। এই রতিতে ভক্তের নিকট পাপ-পূণ্য, সমাজ-সংস্কার, ধর্মাধর্ম, ছোট-বড় জ্ঞান তুচ্ছ হইয়া যায়। ব্রজ ছাড়া এ রতির সন্ধান কোথাও পাওযা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃতকারের ভাষায় বলিতে হয়—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে কবে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥' (চৈঃ চঃ)

পূর্বের কথায় ফিরিযা আসি। স্পন্দন যখন চরমে গিয়া পৌঁছায়, তখন শক্তি ও শক্তিমানে আর কোন ভেদ থাকে না। তখন শক্তি ও শক্তিমানের যুগনদ্ধ রূপে শুধু চিৎ-ই থাকে। লীলা বা আনন্দ-বিলাসের জন্য এক অদ্বয় চিৎ-ই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতিতে দ্বিধা বিভক্ত হইযা পড়ে। এক চিৎ-ই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় বিভক্ত হইয়া অষ্টকালীন কুঞ্জলীলা করেন আবার নিকুঞ্জ লীলায় উভয়ে এক হইযা গিয়া একমাত্র চিৎ-সত্তায় বিরাজ করেন। সেখানে চিৎ-ই চিৎ, আর কিছু নাই। নাদ-সাধনায় নাদই পর্যবসিত হয় পরাবাকে বা পরাশক্তিতে। শিব ও শক্তির সম্মিলনে ঐ নাদকে ভেদ করিতে পারিলে এক অদ্বয় চিৎ-স্বরূপে পরমস্থিতি হয।

এখানে প্রাসঙ্গিক ক্রমে পরমশিব ও শিবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যাইতেছে। শিব হইলেন তত্ত্বাতীত, ইনি চিৎস্বরূপ, কিন্তু শক্তি-বিরহিত বলিয়া ইনি রিক্ত। তাই নিজের স্বরূপের মহিমা তাঁর নিজের গোচর নয় বলিয়া এখানে আনন্দের স্ফুরণ নাই। স্বরূপের বোধেই আনন্দের বিকাশ হয়। শক্তি-বিরহিত শিব বোধহীন রিক্ত অহংস্বরূপে মগ্ন থাকেন—ইহা একপ্রকার চিৎ-জড়। ইদংরূপ জগৎটা তাঁর বাহিরেই থাকিয়া যায়। শক্তি নাই বলিয়া ইদংকে আত্মসাৎ বা কবলিত করিতে পারেন না।

কিন্তু পরমশিব ইদংকেও আত্মসাৎ করেন। কারণ ইদংটাও অহংএরই রূপ। ইদংকে কবলিত করিয়া পরমশিব পূর্ণহন্তারূপে বিরাজ করেন। তন্ত্রের লক্ষ্য এই পূর্ণাহন্তা-স্বরূপ লাভ করা। এই পূর্ণাহন্তা মানে ইদংকে অহংএর কুক্ষীভূত করা, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'—তাই ইদংকে অহং দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা যে অহংএব সঙ্গে পরিচিত, এ অহং অশুদ্ধ অহং, ইদং এর অপর pole রূপ অহং। ইহাব বিনাশ বা বিলয় আছে। কিন্তু শুদ্ধ অহং নিত্য, অবিনাশী।

এই পরমশিবের আলোচনা প্রসঙ্গে ম. ম গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গীতার 'পুরুষোত্তমে'র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'যস্মাৎ ক্ষরমতীতো অক্ষরাদপি চোত্তম'। এ কথা গীতা বলিলেন কেন? এক জায়গায় 'অতীত', অপর

জায়গায় 'উত্তম' বলার তাৎপর্য কি? দুই জায়গাতেই অতীত বলিলেই চলিত। তাৎপর্য হইল, ক্ষরের অতীত যেমন অক্ষর, ক্ষরেব অতীত তেমনি পুরুষোত্তমও। তবে অক্ষরের অপেক্ষা পুরুষোত্তমের উত্তমত্ব এইখানে যে তিনি ক্ষরের অতীত হইয়াও জানেন যে তিনি ক্ষরাত্মকও। তাই গীতাব দ্বাদশ অধ্যায়েও অক্ষর উপাসনার প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিলেন, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'—কারণ তাঁর স্বরূপ হইল অক্ষরাত্মক।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। পূর্ণ সত্তা বা পরাসত্তা শিব-শক্তির সামরস্যাত্মক। উহা একই অখণ্ড সত্তা—শৈবগণ উহাকে পরমশিব বলেন, শাক্তগণ উহাকে পরাশক্তি বলেন। ঐ সত্তাতে পরা সংবিদ্ বা চিৎশক্তি পরম শিব হইতে অভিন্ন এবং পরমশিবও ঐ শক্তি হইতে অভিন্ন। শিব অস্পন্দ, শক্তি স্পন্দময়ী অর্থাৎ পরা সত্তা নিত্য অস্পন্দ থাকিয়াও নিত্য স্পন্দময়ী অথবা নিত্য স্পন্দরূপ হইয়াও সর্বদা অস্পন্দ। উহাই অদ্বয় তত্ত্ব, শুধু অদ্বয় নহে, পরমাদ্বয়। এই পরাসংবিৎ-ই স্বাতন্ত্র্যময়ী চিতি, যাহার কথা কাশ্মীর শৈবাগম শাস্ত্র 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে' বলা হইয়াছে। এই দৃষ্টি বেদান্তের নিস্পন্দ শান্ত ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে পৃথক।

এখানে কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিধায় পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ আগমানুসারে বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। ক্ষর ও অক্ষর বা স-কল ও নিষ্কল এই উভয়কে আত্মসাৎ করিয়া উভয়ের অতীত যিনি তিনিই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম।

ষোড়শ কলা হইল সগুণ, সোপাধিক, স-কল ব্রহ্ম। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইনি সদা পূর্ণ। ইনিই পুরুষোত্তম। যখন এক কলার হ্রাস হইয়া পঞ্চদশ কলায় তিনি নামিয়া আসেন, তখন তিনি ক্ষর ব্রহ্ম। আর যখন তাঁহার মধ্যে কোন কলারই বিকাশ থাকে না, সমস্ত কলাকে সংহরণ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি নিমগ্ন হইয়া কূটস্থরূপে থাকেন, তখন তিনি অক্ষর ব্রহ্ম। অতএব একই পরমতত্ত্বের তিন অবস্থা। এক অবস্থায় তাঁহার মধ্যে পূর্ণ কলার বিকাশ। অন্য অবস্থায় তাঁহার মধ্যে যখন এক কলার হ্রাস হয় তখন তিনি ক্ষর ব্রহ্ম এবং যে অবস্থায় তাঁহার কোন কলারই বিকাশ থাকে না তখন তিনি অক্ষর ব্রহ্ম। পুরুষোত্তমই ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ক্ষর ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ ষোড়শ কলার এক কলার হ্রাস হইলে স-কল ব্রহ্ম তাঁহার নিরাবরণ রূপকে সঙ্কুচিত করিয়া পশু হন এবং নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হন। এই পঞ্চদশ কলা হইতেই সৃষ্টির ধারা নামিয়া আসে। এবং কলা শূন্য হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়। আবার জীব যখন সাধনার দ্বারা কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া

পঞ্চদশ কলায় উপনীত হয় তখন জীবাত্মাই বিশ্বের অধীশ্বর হয়, অর্থাৎ সে-ই তখন ক্ষর ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে।

ষোড়শ কলা পূর্ণ। ইহা ছাড়া, একটি উদ্বৃত্ত কলা আছে, যাহাকে বলা হয় সপ্তদশ কলা। কলারাজ্যে আসিয়া কলার বিকাশসাধনপূর্বক কলা পূর্ণ করিতে পারিলে অর্থাৎ ষোল কলার বিকাশ পূর্ণ হইলে যোগীর চিদাকাশে স্থিতিলাভ হয়। তাহার পর উদ্বৃত্ত সপ্তদশী কলা জাগরূক হইলে যোগী চিদাকাশ ভেদ করিয়া মহাভাবে প্রবেশ করে অর্থাৎ মহাভাবরূপ যোগভূমিতে প্রবেশ করে। নিত্য বৃন্দাবন চিদাকাশের ঊর্ধ্বে মহাভাব হইতে পরমা প্রকৃতি পর্যন্ত প্রসারিত।

মানব চিত্তে যে সকল ভাবরাজি বিরাজ করে, তাহার মূল 'কলা'। কলাই প্রকৃতি। সুতরাং যাহার যে প্রকার প্রকৃতি বা স্বভাব, তাহাব সত্তাতে সেই জাতীয় কলারই প্রাধান্য। কলার বিকাশেব যেমন মাত্রাগত ভেদ আছে, তেমনি স্বভাবগত ভেদও আছে। উত্তম যোগী হইলেও সকলের কলা বা ভাব এক প্রকার নহে বলিয়া সকলেব প্রকৃতি এক প্রকার হয় না। সুতরাং যাহার যে প্রকার প্রকৃতি তদনুরূপ কলারাজ্যই তাহার পক্ষে চিদাকাশের প্রবেশের দ্বার। কলার মাত্রাগত বিকাশ পূর্ণ হইলে চিদাকাশে নিজেব স্বরূপের উপলব্ধি অক্ষুণ্ণ রাখা যায। অর্থাৎ এই প্রকারের যোগী চিদাকাশে যাইয়াও আত্মবোধ রক্ষা করিতে পাবেন। অর্থাৎ ষোড়শ কলাতে পূর্ণ হইয়া সপ্তদশী কলারূপে উদ্বৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের কলার বিকাশ অপেক্ষাকৃত ন্যূন তাহাদের অধিকার এতটা হয় না। যাঁহারা মধ্যম সাধক তাঁহারা একাদশ কলা পর্যন্ত আয়ত্ত করিযা থাকেন। একাদশ কলার নাম চিন্ময়রাজ্য। অতএব তাঁহাদের চিন্ময় অবস্থায় স্থিতি হয তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের আত্মবোধ বা স্বরূপবোধের উদয় হয় না। যাঁহারা সাধারণ সাধক তাঁহারা পাঁচ কলা পর্যন্ত নিজের করিয়া নিতে পারেন। পঞ্চম কলার নাম সদানন্দলোক। এই অবস্থাতেই তাঁহাদের স্থিতি হয়। চিন্ময় রাজ্য হইতে চিদাকাশ দর্শন হয়। চিন্ময় রাজ্যের অধিকাংশ সাধক এইখানে থাকিয়াই কলাব বিকাশ সাধন করিয়া চিদাকাশে প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপবোধের অবস্থায় স্থিত হন।

দেখা যাইতেছে, সাধকের উত্তম অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট স্থিতি চিদাকাশ এবং চিদাকাশেই আত্মস্বরূপবোধের উদয়। যে সাধক চিদাকাশে থাকিয়া কলার বিকাশ পূর্ণ করার বলে ষোলকলায় অবস্থান করিয়াও এক কলায় উদ্বৃত্ত হইতে পারেন তিনি চিদাকাশ হইতে একটি স্বভাবের যোগপথ প্রাপ্ত হন। চিদাকাশ হইতে যে যোগপথটি গিয়াছে সেটি স্বভাবের পথ, এবং সেটি পরমাপ্রকৃতি পর্যন্ত প্রসারিত। চিদাকাশে স্থিতির তাৎপর্য সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়

বলিয়াছেন, "সাধক বীজ প্রাপ্ত হইয়া কর্মশক্তি দ্বারা ঐ বীজকে গুরু কায়ারূপে অর্থাৎ স্ব-কায়া রূপে কিম্বা ইষ্টরূপে পরিণত করে। ইহার পর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ সে নিজেই ইষ্টরূপে অথবা প্রকৃতিরূপে পূর্ণতা লাভ করে। ইহাই চিদাকাশের স্থিতির প্রকৃত তাৎপর্য। যখন সপ্তদশী কলারূপ উদ্বৃত্তভাবের উদয় হয় অর্থাৎ মহাভাবে প্রবেশ হয় তখন সাক্ষীরূপে পুরুষভাবের উদয় হইল বুঝিতে হইবে। উহা যোগীভাব। প্রকৃতি অথবা শক্তি ব্যতিরেকে যোগ সম্ভবপর হয় না। নিজেই শক্তি এবং নিজেই শক্তিমান্—ইহাই যোগভাবের তাৎপর্য। শক্তি বলিতে এখানে চৈতন্যময় স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং শক্তিমান্ বলিতে শক্তির অতীত শিবভাব জানিতে হইবে। সুতরাং মহাভাবের অবস্থায় বা যোগীর অবস্থায় চিন্ময় স্বরূপটি আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে অথচ নিজে তাহার অতীত।...

...যে সকল যোগী মহাভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাহাদের মধ্যে যতক্ষণ নাভিচক্র উদ্বুদ্ধ না হয় ততক্ষণ তাহারা শিবরূপী। নাভিচক্র উদ্বুদ্ধ হইলেই পরমশিব অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। শিবভাব এবং পরমশিবভাবে অনেক পার্থক্য। শিব বিশ্ব প্রপঞ্চের অতীত, বিশ্বাতীত। বিশ্ব এবং শিব উভয়ের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান থাকে যাহা কখনই অপসারিত হয় না। কারণ বিশ্ব জড় এবং শিব চৈতন্যময়। তিনি বিশ্বের অতীত কিন্তু বিশ্বাত্মক নহেন। ব্রহ্ম এবং মায়িক প্রপঞ্চের সহিত মায়া—এই উভয়ের যেমন একটি ব্যবধান আছে যাহার জন্য ব্রহ্মকে মায়াতীত বলা হয় কিন্তু মায়াময় বলা চলে না, ঠিক সেই প্রকার শিব এবং শক্ত্যাত্মক সমগ্র বিশ্ব—এই উভয়ের মধ্যে একটি অনিবার্য ব্যবধান রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ শিবের অভ্যন্তরে শক্তির স্ফুরণের অভাব। শক্তি ও তাহার কার্য বিশ্ব। শক্তি অচিৎ তাহার কার্যও অচিৎ। শিব চিৎ-স্বরূপ। কিন্তু চিৎ নিজের মধ্যে হইতেই যখন শক্তির স্ফুরণ অনুভব করিতে পারেন তখন অচিৎরূপ। তখন শক্তি ও তৎকার্য বিশ্বের সহিত চিৎরূপী শিবের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষের মধ্যে যেমন উত্তম পুরুষের দ্বারা সমন্বয় স্থাপিত হয়, ঠিক সেই প্রকার চিৎরূপ শিব ও অচিৎরূপা শক্তির মধ্যে চিৎশক্তির উন্মেষ দ্বারা সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহারই নাম নাভিকেন্দ্রের জাগরণ।" (অখণ্ড মহাযোগের পথে, পৃঃ ৩২, ৩৪/৩৫)।

শৈবাগম যোগে প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ—উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় শৈবাগম-যোগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কাশ্মীর শৈবাগম গ্রন্থমধ্যে 'স্পন্দকারিকা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পাতঞ্জল

যোগশাস্ত্রে যোগীর সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার ন্যায় স্পন্দকারিকাতেও যোগীর দুই প্রকার অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, যথা—প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ। তবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা হইতে যোগীর প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা অনেক উন্নত।

আমরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় যে বিশাল জগৎকে বাহ্য জগৎরূপে নিরন্তর অনুভব করিয়া থাকি তাহা যে বিপুল আলোকে প্রকাশিত হইয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহা চিত্তের আলোক। ঐ আলোক বহিরালোক নহে, অন্তরালোক। চিত্তের বৃত্তিসকল যতক্ষণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ঐ অন্তরালোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিত্ত বহির্মুখ থাকা পর্যন্ত ঐ আভ্যন্তরীণ আলোক কি প্রকারে অনুভূত হইবে? কিন্তু চিত্তের বৃত্তিসকল ক্রমিক অভ্যাসের ফলে একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে ঐ একমুখী চিত্তবৃত্তি বহির্মুখতা পবিহার করিযা অন্তর্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় স্বভাবতঃই অন্তরালোক প্রকাশিত হয। বস্তুতঃ ইহাই চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ আলোক। বিক্ষিপ্ত বৃত্তি শান্ত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে রজোগুণ ও তমোগুণের অভিভববশতঃ চিত্তস্থিত সত্ত্বগুণ প্রবলতা লাভ করে এবং তৎপ্রতিফলিত চিত্তালোক প্রজ্ঞালোকরূপে ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ এই আলোকেই সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইযা রহিয়াছে। লোক লোকান্তর এই আলোকেই প্রকাশিত। চিত্তের পরিকর্ম দ্বারা এবং ক্রমিক অভ্যাসের ফলে দীর্ঘকাল পরে এই আলোর পূর্ণ বিকাশ হয়। ইহা হইতে জাগতিক দৃষ্টিতে যাহাকে সর্বজ্ঞতা বলে তাহারও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই আলোকে দেব-দেবী দর্শন ও নানাপ্রকার সিদ্ধির উদয় হয়। ইহারই নাম বিভূতি। ইহাতেই মজিয়া না গিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইলে ঐ আলোক ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে। শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষে যেমন চন্দ্রমার কলা সকলেব হ্রাস হইয়া থাকে তদ্রূপ ঐ আলোকের বিকাশের পর ক্রমশঃ উহার হ্রাস হয। যে সময ঐ আলো সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় তাহাকেই কৈবল্যপন্থী যোগীগণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অথবা নির্বিকল্প সমাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আলো নিভিয়া গেলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম কৈবল্য। উহা জ্ঞানের অতীত অবস্থা বিবেকখ্যাতির পরবর্তী অবস্থা। কৈবল্যপন্থী যোগীগণ এইপ্রকার বিভূতি পাদ হইতে কৈবল্য পাদে প্রবিষ্ট হইয়া গুণাতীত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। জ্ঞানী, ভক্ত, আগম-যোগী সকলকেই আপন আপন ভাবেব ভিতব দিয়া ঐ একই চিত্তের আলো অবলম্বন করিয়া চলিতে হয় এবং ঐ আলোক ভেদ করিয়া কৈবল্যের সম্মুখীন হইতে হয। কিন্তু আগম যোগী কৈবল্য গ্রহণ না কবিযা গুরু-শক্তির বলে উহাকে অতিক্রম করিয়া যান।

আগম যোগীর পথ চিত্তালোকের অতীত চৈতন্যরাজ্যের মধ্যে নিহিত। চিত্তালোক নির্বাপিত হওয়ার পর যে চিদালোকের আবির্ভাব হয় সেই মহান্ চিদালোকের মধ্যেই আগম যোগীকে পর পর পথ কাটিয়া অখণ্ড মহাযোগের লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হয়। কৈবল্যপন্থী যোগীর নিকট এ পথ উন্মুক্ত হয় না। কৈবল্য যোগী নিজেকে জড় সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া নিজে নিরাকার চৈতন্যময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যেহেতু কৈবল্য যোগী দেহ হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন, সেইহেতু কৈবল্যাবস্থায় জাগতিক দুঃখের অনুভূতি তাঁহার থাকে না। উপলব্ধি ব্যতিরেকে নিজ সত্তার বাহিরে যে বিরাট জগৎ রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বাহ্য জগতের সন্ধান না পাইলে অন্যের সুখ-দুঃখ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা জন্মে না বা অন্যকে মুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার মধ্যে জাগে না। সুতরাং নির্বাণ অথবা কৈবল্য পাতঞ্জল যোগীর বা বৌদ্ধ অর্হৎ-এর চরম সম্পদ হইলেও আগম যোগীর পক্ষে উহা আদরের বস্তু নহে। আগম যোগী মাত্রই নির্বাণভেদী। আগম যোগী শুদ্ধ কায়া বা বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আগম যোগী একদিকে যেমন চিন্ময় আকার ধারণ করেন, অপরদিকে তেমনি সেই আকারকে অবলম্বন করিয়া অহংভাবকে পোষণ করেন। ইহা বিশুদ্ধ অহং, মায়িক শরীরের অহঙ্কারবর্জিত অহং। চিন্ময় জগতে এই বিশুদ্ধ অহংরূপে জাগিয়া উঠিলে পার্থিব জগতের সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয় এবং জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য অনুকম্পা জাগিয়া উঠে। অপরদিকে বিশুদ্ধ অহং জাগিলে আগম যোগীর পক্ষে পরপর ভূমি অতিক্রম করিয়া চরম ভূমিতে অবস্থান করা সম্ভবপর হয়। কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগী নিজের মধ্যেই নিজে তৃপ্ত। সে কায়া-বিরহিত ও একাকী। আগম যোগী কায়ামুক্ত নহেন এবং কোন অবস্থাতেই একাকী থাকেন না। শক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই আগম যোগীর নিত্যসাথী। শক্তির সহিত আত্মার যোগই প্রকৃত যোগ। কৈবল্য যোগী শক্তিহীন বলিয়া কখনই যুক্ত হইতে পারে না। শক্তি অর্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মলাভ হয় না। শক্তির কৃপা লাভ করিয়া শক্তিকে পুষ্ট করিতে না পারিলে শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না অর্থাৎ শক্তির সহিত নিজের যোজনা সিদ্ধ হয় না। বিদেহ-কৈবল্যের দিকে লক্ষ্য যে যোগীর তাহার পথ বিবেকমার্গ। শিবত্বের দিকে লক্ষ্য যে যোগীর তাহার পথ শক্তির সহিত যোগমার্গ।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এইবার আমরা 'স্পন্দকারিকা'-মতে প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ যোগীর যোগমার্গের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব।

অপ্রবুদ্ধ, প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ—অপ্রবুদ্ধ যাহারা তাহারা দেহাত্মাভিমানী। তাহারা

মূঢ়। দেহাদি ইন্দ্রিয়, চিত্ত, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে তাহারা আমি (অহং) বলিয়া মনে করে। অপ্রবুদ্ধ বা সুপ্ত অবস্থায় তাহাদের আত্মবোধ থাকে না, প্রবুদ্ধ অবস্থায় সেই আত্মবোধ জাগিয়া উঠে। সুতরাং অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় জীবের আত্মবোধ টুটিয়া যায়, আবার প্রবুদ্ধ অবস্থায় তাহা ফুটিয়া উঠে। বাস্তবিক বিশুদ্ধ অহংরূপ যে আত্মা তাহা সদা জাগ্রত। প্রকৃতপক্ষে অপ্রবুদ্ধেরা মূঢ় অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান্ অনিত্য জগতের মায়ায় ঘুমাইয়া থাকে। কারণ তাহারা তাহাদের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে অচেতন।

কিন্তু যাহারা জগৎগুরুর কৃপায় শক্তিপাতের ফলে নিজ স্বভাবকে দেখিতে পায়, তাহারাই প্রকৃত জাগ্রত। স্বভাব বলিতে নিজ আত্মারই চিন্ময় জ্যোতি যাহা স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করিয়া এই চিৎ-জ্যোতি বা আলো নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। দেহাত্মাভিমানী যাহারা তাহাদের নিকট এই আলো প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। দেহাত্মাভিমান্ ভুলিয়া অন্তরাবৃত্ত হইলে শক্তিপাতের ফলে একটি ক্ষণের মধ্যে সেই আলো দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা একবার দৃষ্টিগোচর হইলে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়, একটা কিছু আছে এই 'অস্তি'তে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইহাই প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধি। কিন্তু এই আলো ক্ষণস্থায়ী, একবার দৃষ্টিগোচর হইয়াই অন্তর্হিত হয়। তখন এই আলোটিকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রকৃত সাধনার সুরু হয়। সাধনাব দ্বারা আলো স্থায়ী হইলে সাধকের ইহা নিত্য সহচর হইয়া যায়। বাহ্য জগতে সাধারণ লোকের ন্যায় সে আচরণ করে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই অন্তরাবৃত্ত হইয়া সেই নিত্য প্রকাশমান আলোটিকে প্রত্যক্ষ করে। ইহার মধ্যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি জগতের সমুদয় বস্তু ও ঘটনা দৃষ্ট হয়। কারণ, ইহা চিন্ময়ী মহাশক্তিরই স্বরূপ যাহা অনবচ্ছিন্ন মহাপ্রকাশ, যাহার আদিও নাই অন্তও নাই, যাহার মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। এই আলোই জীবের স্বভাব বা স্বরূপ। এরূপ নিজ স্বভাবের পুনঃ প্রাপ্তিই বা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের পরম কাম্য বা পরমপুরুষার্থ। এই যে পরমপ্রকাশ উহা অভিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়া—ইহাই চিৎশক্তি বা পরাশক্তির স্বরূপ—ইহাকেই 'সামান্য' স্পন্দ বা শক্তি বলে—ইহা পূর্ণ। এই মহাপ্রকাশ হইতে সর্বদা এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে যে 'আমি আছি, আমি আছি'---ইহাই 'অহং' প্রতীতি। মহাপ্রকাশরূপী যে সামান্য শক্তি উহা হইতে যে স্পন্দ উত্থিত হয উহাই 'বিশেষ' স্পন্দ বা বিশেষ শক্তি। এই বিশেষ স্পন্দ বা শক্তি হইতেই 'ইদং'রূপী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয বস্তুর যে প্রতীতি, তাহাই ইদং প্রতীতি। বিশুদ্ধ অহং-ই ইদং রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। দেহাত্মাভিমানী অপ্রবুদ্ধের নিকট এই ইদং-ই অহংরূপে ভাণ হয়। বস্তুতঃ ইদংকে আবৃত

করিয়া মহাপ্রকাশ-অহং বিরাজমান। এই শুদ্ধ মহাপ্রকাশই বিশুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মের জগতাত্মক একটা রূপ আছে।

ব্রহ্ম-চৈতন্য অভিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপী। এখানে বেদক আছে বেদ্য নাই, ক্রিয়া আছে কার্য নাই। এখানে শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞান স্বপ্রকাশিত। প্রবুদ্ধ যোগীর মধ্যে এই জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়, তাই সে প্রবুদ্ধ। ইহা তৃতীয় নেত্র। সদ্‌গুরু কৃপা করে এই জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়া দেন। এই জ্ঞান চক্ষু ইন্দ্রিয় চক্ষু বা দিব্য চক্ষু হইতে ভিন্ন। ইন্দ্রিয় চক্ষু দ্বারা স্থূল জগৎ দৃষ্ট হয়। দিব্য চক্ষু অপ্রাকৃত সত্ত্বের দ্বারা গঠিত এবং ইহার দৃষ্টিক্ষমতা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত। এই দিব্য চক্ষুর দ্বারা সমগ্র বিশ্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্ব-দৃষ্টি হয় না। একমাত্র জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তত্ত্ব-দৃষ্টি হয়।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বিবেক-দৃষ্টি, জ্ঞান-দৃষ্টি, ভাব-দৃষ্টি এবং দিব্য-দৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতেছেঃ

(ক) বিবেক দৃষ্টি—বিচার বিতর্কের দ্বারা সব কিছু অনাত্ম বলিয়া পরিহার করিতে করিতে সাধক বিবেক-দৃষ্টি বা বিবেকখ্যাতি লাভ করে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা চিত্ত সত্ত্বপ্রধান হয় বটে কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না, মায়িক মলের আবরণ থাকিয়াই যায়। কারণ, বিবেক সাধনার পথে সাধকের চিৎ-শক্তির স্ফুরণ হয় না। অতএব শক্তির অধিকারী না হওয়ায় চিত্তকে চিন্ময়ী করিতে পারে না বা মায়া-মল হইতে মুক্ত করিতে পারে না। তাই বিবেকী সাধক চিত্তকে পরিত্যাগ করিয়া চিৎ-স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ প্রকাশময় ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু তাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ না হওয়ায় সে যে স্বরূপে ব্রহ্ম—এই উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা একপ্রকার স্বাতন্ত্র্যহীন চিৎ-জড় শিবাবস্থা।

(খ) জ্ঞান-দৃষ্টি—শিব ও শক্তির অভেদাত্মক পূর্ণ ব্রহ্ম-দৃষ্টি বা তত্ত্ব-দৃষ্টিই জ্ঞান-দৃষ্টি। স্বাতন্ত্র্যশক্তি বিশিষ্ট অখণ্ড চিৎস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম বা পরমশিবই হইল স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্তার চিন্ময় প্রকাশ। ষট্‌চক্রে ভেদের অর্থ হইল ষট্‌চক্রের প্রতি চক্রে যে অক্ষরসমষ্টি তাহা গলিয়া গিয়া নাদে পরিণত হওয়া এবং নাদের বিন্দুতে পরিণত হওয়া। অর্থাৎ প্রতি চক্রভেদের পর আজ্ঞাচক্রে নাদ বিন্দুতে পরিণত হয়, তখনই জ্ঞান-নেত্র খুলিয়া যায়। শাক্ত দৃষ্টিতে পূর্ণ ব্রহ্ম বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত এই উভয় কোটিতে যুগপৎ বিরাজমান এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। আগম যোগীর মধ্যে বিশ্বাত্মক ভাবনায় বিশ্বের সহিত তাদাত্ম্যভাবজনিত অধ্যাত্ম অনুভব এবং বিশ্বোত্তীর্ণ সদ্ভাব সহিত তাদাত্ম্যবোধজনিত অখণ্ড অদ্বয় বোধ—এই উভয় বোধ মিলিত হইলে পূর্ণ জ্ঞানদৃষ্টির উন্মেষ হয়। জ্ঞান-দৃষ্টিতে পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্তা (সৎ) ও বিশুদ্ধ চিৎ-সত্তার উপলব্ধি হয় বটে কিন্তু তাঁর আনন্দ-স্বরূপের সাক্ষাৎ পায় না।

(গ) ভাব-দৃষ্টি—জ্ঞান-নেত্র উন্মোচনের পর ভাব-ভক্তির পথে সাধনা করিলে

ভাবের পরিপুষ্টিতে প্রেমের উদয়ে পরব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপ বা তাঁর প্রেমঘন আনন্দ সত্তা প্রেমসিদ্ধ যোগীর নিকট প্রকাশিত হয এবং ভক্তের সহিত প্রেমেব লীলায যে রসোল্লাস হয়, প্রেমিক যোগী উহার আস্বাদনে তৃপ্ত হয়।

(ঘ) দিব্য-দৃষ্টি—দিব্য-দৃষ্টিতে দেশ-কালের পবিচ্ছিন্নতা থাকে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এক অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক লক্ষ্য যোজন দূরের বস্তুকেও দেখিতে পায় এবং লক্ষ যুগের অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাও তার চোখের সামনে বর্তমানের ন্যায় ভাসিতে থাকে; দেশ ও কালের কোন ব্যবধান তার দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারে না। ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই বর্তমানের মধ্যে অবারিত। যোগ-বিভূতির অধিকারী না হইলে ঐ যোগৈশ্বর্যকে ধারণ করা যায় না। দিব্য-দৃষ্টির ফলে সাধক সব কিছু দেখিতে পায় বটে, কিন্তু তাতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য-দৃষ্টি দিযাছিলেন, কিন্তু তত্ত্ব-দৃষ্টি দেন নাই। অর্জুন দিব্য-দৃষ্টিতে সব কিছুরই দর্শন পাইয়াছিলেন, কিন্তু সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার বিশ্বরূপ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিযাছিলেন। জ্ঞান-চক্ষু বা তত্ত্ব-দৃষ্টি লাভ করিলে তিনি ভীত হইতেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান পাইলে অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপের তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইলে তিনি নিজেই আত্ম-স্বরূপে সব কিছু হইয়াছেন বুঝিতে পারিতেন।

(দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫)।

পুনরায় আমরা পূর্বের আলোচনার ধারায় ফিরিযা আসি। জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন অর্থে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলেই প্রবুদ্ধ অবস্থা আর কুণ্ডলিনী নিদ্রিত থাকিলেই অপ্রবুদ্ধ অবস্থা। আমাদের শরীরের মধ্যে অসংখ্য নাড়ী আছে। মন ও প্রাণ এই নাড়ীসমূহের মধ্যে বিচ্ছুরিত। এইরূপ বিচ্ছুরিত, বিক্ষিপ্ত মন ও প্রাণকে গুটাইয়া আনিযা কেন্দ্রিভূত করিলে সুষুম্না নামক ব্রহ্মনাড়ী বা মধ্যপথের মুখ উন্মুক্ত হইয়া যায়—ইহাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ। কুণ্ডলিনীই মহাশক্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরণেই যোগী এক অভূতপূর্ব স্পন্দ অনুভব করে এবং অপূর্ব জ্যোতি বা আলো দর্শন করে। এই স্পন্দই 'সামান্য' স্পন্দ। ক্ষণিকের জন্য যোগীর উপলব্ধি হইয়াই অন্তর্হিত হয়। বার বার চেষ্টায় ইহাকে স্থায়ী করিতে হয়। তারপর কুণ্ডলিনী-শক্তিকে ঊর্ধ্বে পরিচালিত করিয়া সহস্রারে মহাচৈতন্যস্বরূপ শিবেব সহিত যোগ-সাধন করিতে হয়। কিন্তু এই যোগ বেশীক্ষণ স্থাযী হয় না। মন ও প্রাণের সংহত রূপই কুণ্ডলিনী। অতএব জীব-কুণ্ডলিনী মহাচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হইলেও মহাচৈতন্য তাহাকে ঠেলিয়া দেয়। কারণ, মন তখনও নির্মল হয় নাই বলিযা। যোগী বার বার তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিলে মনের সমস্ত মল বিধৌত হইয়া যায় এবং তখন মহাচৈতন্য মনকে নিজের মধ্যে টানিয়া লন। এই যে মনকে

ধরিয়া লওয়া ইহাই পরব্রহ্মের মহাকরুণা। এবং ইহাই 'উন্মনী' অবস্থা। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইতে মহামিলন পর্যন্ত সাধন-পথের মধ্যে পরাভক্তির উদ্বোধন ও পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে। এরূপ মহামিলনকে বলা হয় 'উন্মীলন' সমাধি। পাতঞ্জল যোগ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত কিংবা সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি—সবই 'নিমীলন' সমাধি। একমাত্র শাক্ত বা তন্ত্র পথেই 'উন্মীলন' সমাধি সম্ভব।

পরমপ্রকাশ মহাচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেই সুপ্রবুদ্ধের অবস্থা। এরূপ অবস্থায় আগম যোগীর যে 'প্রত্যভিজ্ঞা' হয়, তাহাতে সে বুঝিতে পারে, সে-ই সব কিছু হইয়াছে। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, প্রবুদ্ধ অবস্থা হইল বিশ্বাতীত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ—ইহা শুদ্ধ আত্মস্বরূপ—ইহা রিক্তাবস্থা। আর সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা হইল বিশ্বাত্মক ব্রহ্মের উপলব্ধি অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র স্বরূপ উপলব্ধি—ব্রহ্মের এই উভয় দিকের উপলব্ধিই হইল প্রকৃত পূর্ণ স্বভাব উপলব্ধি—ব্রহ্মের এই উভয় দিকের উপলব্ধিই হইল প্রকৃত পূর্ণ স্বভাব-প্রাপ্তি। অতএব আপন আত্মার বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক উভয় রূপকে জানাই জ্ঞানের পূর্ণতাসাধন—পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। বিশ্বাত্মককে বাদ দিয়া শুধু বিশ্বাতীতকে জানা হইল জ্ঞানের অপূর্ণতা। উভয়কেই জানিতে হইবে। উভয়ের জ্ঞানই পরব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান বা পূর্ণ জ্ঞান।

প্রবুদ্ধ অবস্থায় একটি ক্ষণের জন্য যে আত্মস্বরূপ-জ্যোতির বা শুদ্ধ প্রকাশের অপরোক্ষ দর্শন হয়, উহা একটি ক্ষণের জন্য দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেও উহা কখন অবলুপ্ত হয় না। উহা যোগীর চিরকালের পথনির্দেশক সঙ্গী হইয়া সাথে সাথে থাকে। তখন যোগীর কাজ হইল উহাতে অবধান বা মনোযোগ করা। সেই শুদ্ধ প্রকাশরূপী মহাচৈতন্যের সহিত মন বেশিক্ষণ লগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না বটে, বার বার মন তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তথাপি যোগীর বার বার তাহাতে মন লগ্ন রাখিবার চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকে অর্থাৎ মন ক্রমশঃ চিন্ময় হইয়া চিৎ-শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে। এইরূপে ধীরে ধীরে চিন্ময়তা লাভ করিতে করিতে একেবারে যখন পূর্ণ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন মন আর মন থাকে না। অর্থাৎ যতই মন চিন্ময় হইতে থাকে ততই ইদন্তার লোপ হইয়া শুদ্ধ অহন্তার উদয় হইতে থাকে। মন পূর্ণ চিন্ময় হইলে ইদন্তা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, সমস্ত বিভেদ জ্ঞান অন্তর্হিত হয় এবং পূর্ণ অহন্তার উদয় হয়। তখন সমগ্র বিশ্ব বা বিশ্বের যা-কিছু সবই যে আমি, আমিই সর্বঘটে বিরাজ করছি চিন্ময় প্রকাশরূপে—ইহা উপলব্ধি হয়। ইহারই নাম প্রকৃত জাগরণ বা সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থায় অশুদ্ধ প্রকৃতির সর্ব মালিন্যমুক্ত হইয়া এবং শুদ্ধ বিদ্যা বা মহামায়ারও অতিক্রান্ত হইয়া চিত্ত পরাশক্তিতে পরিণত হইয়া যায়—ইহাই উন্মীলন বা উন্মনা অবস্থা। শুদ্ধ বিদ্যার ব্যাপ্তি পর্যন্ত সোমনা অবস্থা। মন পরাশক্তিতে পর্যবসিত হইলেই অর্থাৎ 'বিশেষ স্পন্দ' 'সামান্য স্পন্দে' পরিণত

হইলেই জীবাত্মাও শিবরূপী হইয়া যায় অর্থাৎ 'শিবোঽহং' অভিজ্ঞা হয়। যে শিব সৃষ্টির প্রাক্‌কালে স্বেচ্ছায় আপন স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে সঙ্কুচিত ও আচ্ছাদিত হইয়া পশু জীবে পরিণত হইয়াছিল, এখন সেই পশু জীবই যোগসাধনার বলে আণব মলরূপ পশুত্বের অপসারণ দ্বারা চিত্তকে পরাশক্তিতে পরিণত করিয়া শিব হইয়া যায়। অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তির ন্যায় শিব ও শক্তি অভিন্ন। এরূপ অবস্থায় শিবও চিন্ময় এবং শক্তিও চিন্ময়। উভয়ে সমধর্মী না হইলে যোগ হয় না। যতক্ষণ মন অশুদ্ধ বিদ্যা এবং শুদ্ধ বিদ্যা অর্থাৎ মায়া এবং মহামায়ার প্রভাবাধীন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত বিশুদ্ধ চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে না। চিত্তের অশুদ্ধ অচিৎ অবস্থায় জীবাত্মা স্বরূপে শিবরূপী হইলেও মলিন চিত্তের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ উহা আপন স্বভাব বিস্মৃত হইয়া অজ্ঞানীই থাকে। আবার যোগী উন্মনী অবস্থায় উন্নীত হইলে বা পরাশক্তির কৃপা লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার আত্মাও শিবরূপ ধারণ করে। এই চিন্ময় উন্মনী ভূমিতে উভয়ের তাদাত্ম্য বা সামরস্য হয়। এরূপ সামরস্যজনিত যে আনন্দের আস্বাদ হয়, সেই অনাস্বাদিতপূর্ব অনির্বচনীয় মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদনই যোগীর পরমকাম্য।

সংক্ষেপে আগম মতে যোগীর পরম স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম প্রয়োজন পরমগুরু পরমেশ্বরের শক্তিপাত যাহা হইতে সামান্য স্পন্দের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা যোগীর প্রবুদ্ধ অবস্থা লাভ হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই সামান্য স্পন্দরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশই যে যোগীর প্রকৃত স্বরূপ উহা সদ্‌গুরু উপদেশের দ্বারা শিষ্যকে জ্ঞাত করান—ইহাই 'প্রত্যভিজ্ঞা'। আর তৃতীয়তঃ যোগীর কাজ হইল সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সেই ক্ষণ-প্রকাশই যে আপন স্বরূপ তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই চিন্ময় প্রকাশকে অবধান করা বা উহাতে নিবিষ্ট চিত্ত থাকা। চিত্ত সেই প্রকাশে বেশীক্ষণ লগ্ন থাকিতে পারে না। তথাপি যোগী চেষ্টা করিবে বার বার চিত্তকে উহাতে নিবদ্ধ রাখিতে—ইহাই হইল 'প্রত্যবমর্শন'।

নিমীলন সমাধিতে চিত্তের নিরোধ। আর উন্মীলন সমাধিতে চিত্তকে নিরোধ না করিয়া সাঙ্গীকরণ দ্বারা চিন্ময় স্বরূপশক্তিতে পরিণত করিয়া সেই চিন্ময় শক্তি ও আত্মার অধ্যাত্ম যোগে যোগীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া। নিমীলন সমাধির লক্ষ্য নিজের মুক্তি, উন্মীলন সমাধিতে নিজের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের মুক্তি।

প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ পর্যন্ত আগম যোগীর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের বিষয়টি সুপরিস্ফুট করিবার জন্য এখানে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত ১ম খণ্ড' হইতে অংশ বিশেষের সারাংশ উদ্ধৃত করা হইলঃ

প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ

"পূর্ণত্বের উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক অনাদি নিদ্রা হইতে জাগরণ। তান্ত্রিক সংস্কৃতির উদাত্ত ঘোষণা এই যে মানুষকে জাগিতে হইবে—"প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ"। তান্ত্রিক যোগ সাধনার লক্ষ্য সুপ্ত আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা না হইলে আত্মা প্রবুদ্ধ হয় না।

সমগ্র বিশ্ব অখণ্ড প্রকাশমাত্র এবং আত্মার অন্তঃস্থিত। তথাপি সুপ্ত আত্মা মনে করে যে বিশ্ব তাহার বাহিরে। এই সকল সুপ্ত আত্মাই সংসারী আত্মা। কুণ্ডলিনীর জাগরণের সাথে সাথে যখন আত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবিদ্যাস্থিতিব পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহা শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে হইয়া থাকে। সদ্য সুপ্তোত্থিত আত্মার তৎকালিক অবস্থা ঠিক সুপ্তিও নহে অথচ জাগরণও নহে। এই অবস্থাতে আত্মার সুপ্তিজনিত ভেদের প্রতীতিও থাকে অথচ জাগবণের ফলে অভেদজ্ঞানও হয়। কোনো কোনো অংশে এইসকল আত্মা পাতঞ্জল-দর্শনে বর্ণিত সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অনুরূপ, কারণ এই অবস্থায় অবিবেক থাকিয়া যায়। ইহার পর শুদ্ধ চিত্তের প্রকাশ হয়—এই অবস্থা কোনো কোনো অংশে পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিবেকখ্যাতির অনুরূপ। ইহাও স্বপ্নবৎ অবস্থা। এইজন্য ইহাকে ঠিক প্রবুদ্ধ অবস্থা বলা হয় না। এই অবস্থায় কর্মক্ষয় সিদ্ধ হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে আত্মার মুক্ত অবস্থা বলে। কিন্তু তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ইহা মুক্ত অবস্থা নহে। এই সকল আত্মার এখনও পশুত্ব সম্পূর্ণ কাটিয়া শিবত্ব-যোজন হয় নাই।

ইহার পর যথার্থ জাগরণের সূত্রপাত হয় অর্থাৎ আত্মা প্রবুদ্ধ হয়। তখন ভেদদৃষ্টি মোটেই থাকে না। এই সকল আত্মা সমগ্র জগৎকে নিজের শরীর বলিয়া অনুভব করে। এই অবস্থাতেও ভেদ ও অভেদের সংস্কারটা সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায় অর্থাৎ ইদং প্রতীতি থাকে।

ইহার পর আত্মার জাগরণ আরও স্পষ্ট হয়। তখন প্রবুদ্ধভাবের বৃদ্ধি হয় এবং উহার ফলে ইদং অহংরূপে আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিমেষবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু ইহাকেও সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। ইহা যে প্রবুদ্ধ অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নহে।

এই প্রকার সুদীর্ঘ মার্গ অতিক্রম করিবার পর যথার্থ পূর্ণতার উদয় হয়। কিন্তু উহা উদয়মাত্র। উহা স্থায়ী হয় না, কারণ তখনও উন্মেষ-নিমেষের

ব্যাপার চলিতে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বের ভান কখনও থাকে, কখনও থাকে না। তবে উভয় অবস্থাতেই মহাপ্রকাশ অনাবৃত থাকে। যখন বিশ্বের ভান থাকে, তখন প্রকাশাত্মক রূপেই উন্মেষ থাকে। আর যখন বিশ্বের ভান থাকে না তখন প্রকাশাত্মক রূপেই নিমেষ থাকে। ইহার পর আত্মার পূর্ণতা স্থায়ী হয়।

পূর্বে যে পূর্ণত্ব স্থায়ী হয় না বলা হইয়াছে, তাহার কারণ তখন আত্মার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ থাকে। মন থাকিলে মনের অবস্থানকালে উন্মেষ হয় এবং মনের সম্বন্ধ না থাকিলে নিমেষ হয়। ঊর্ধ্বগতিতে মন যত সূক্ষ্মই হোক্ তার থাকা পর্যন্ত উন্মেষ ও নিমেষের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহার পর মন আর থাকে না। তখন উন্মনী অবস্থার আবির্ভাব হয়। উহার প্রভাবে পূর্ণত্ব সুসিদ্ধ হয় বলা যাইতে পারে। আগমবিৎ আচার্য ইহাকে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। এইবার আত্মার পূর্ণ জাগরণ বলা চলে। পূর্ণত্বের অবস্থায় অনাশ্রিত শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ছত্রিশ তত্ত্বাত্মক সমগ্র বিশ্বই আত্মার রূপ বা শরীরভাবে প্রকাশিত হয় (৩৬ তত্ত্বের মতে সাংখ্যসম্মত ২৫ তত্ত্ব আছে; তদ্ব্যতীত শিবশক্তি, ঈশ্বর, প্রাণাদিপঞ্চক ও গুণত্রয় অন্তর্গত)। ইহাই আত্মার পরম জাগরণ। অদ্বৈত আগম সাধনা ইহাকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'সামান্য-স্পন্দ' ও 'বিশেষ-স্পন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

শাস্ত্রের উপদেশ হইল, পূর্ণত্বলাভের জন্য ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত যোগীকে সর্বদাই প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব নিজ শিষ্যবর্গকে 'অপ্রমত্ত' থাকিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন—'প্রমাদ' মৃত্যুপদ এবং 'অপ্রমাদ' অমৃতের পদ। অপ্রমত্ত থাকার তাৎপর্য এই যে, যোগীকে সর্বদাই নিজের লক্ষ্যের প্রতি সাবধান অথবা নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে হয়। স্পন্দবাদী শাক্ত যোগিগণ এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন।

শাক্ত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা এক ও অভিন্ন। আত্মাই শিব এবং আত্মাই পরমশিব। যাহাকে ভগবৎতত্ত্ব (অথবা পরমেশ্বর) বলা হয় তাহাও বাস্তবিকপক্ষে আত্মা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আত্মার দুইটি স্থিতি আছে। একটি পরমশিবরূপ—ইহা স্বাতন্ত্র্যশক্তিসম্পন্ন। অপরটি শিবরূপ—ইহা স্বাতন্ত্র্যহীন চিদাত্মক প্রকাশমাত্র। স্বাতন্ত্র্যশক্তি পরাবাক্, পূর্ণাহন্তা, পরম ঐশ্বর্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। আত্মা পরম স্থিতিতে কখনও শক্তিশূন্য হয় না। এই শক্তি যাহার অপর নাম স্পন্দ, 'সামান্য' ও 'বিশেষ' ভেদে দুই প্রকার। সামান্য শক্তি সামান্য স্পন্দ নামে অভিহিত হয় এবং বিশেষ শক্তি বিশেষ স্পন্দ নামে পরিচিত। সামান্যশক্তি হইতেই বিশেষ শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহার

কারণ আত্মার স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস। যখন আমরা বিশ্বসৃষ্টির দিক হইতে আত্মার স্বরূপের আলোচনা করি তখন আমরা এই বিশেষ শক্তির উদ্ভব ও ক্রিয়া অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাব পশ্চাতে সৃষ্টির ইচ্ছারূপ স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিলাস বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অবস্থায় আত্মার সামান্য স্পন্দ অক্ষুণ্ণই থাকে, কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত বিশেষ স্পন্দের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। আমরা জগতে বাহিরে ও ভিতরে বাহ্য পদার্থ ও ভাবরূপে যাহা কিছু অনুভব করিয়া থাকি তাহা পূর্ববর্ণিত সামান্য স্পন্দ হইতে আবির্ভূত বিশেষ স্পন্দের ফল। সামান্য স্পন্দ বিশুদ্ধ 'অহং'-রূপে স্ফুরিত হয় কিন্তু বিশেষ স্পন্দ 'অহং'-রূপে স্ফুরিত না হইয়া 'ইদং'-রূপে স্ফুরিত হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে 'ইদং'-রূপে স্ফুরণ কাহার নিকট হয়? ইহা যে সামান্য স্পন্দাত্মক পূর্ণ অহং-এর নিকট হয না তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, পূর্ণ অহং অপরিচ্ছিন্ন। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" ইহাই উহার স্বরূপ; উহা অদ্বৈত। ঐ বিরাট 'অহং' হইতে পৃথকভাবে বিশ্ব বা জগৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ইদং'-রূপী অর্থ ও ভাব পরিচ্ছিন্ন 'অহং'-এর নিকটই প্রকাশিত হয। এই পরিচ্ছিন্ন 'অহং'-ই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব ও পশু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যদিও অপরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা পরমাত্মা এবং পরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা জীবাত্মা মূলতঃ একই আত্মা, তথাপি উভয়ে পার্থক্য আছে। পরমাত্মাতে সংকোচ নাই, কিন্তু তিনি লীলাচ্ছলে সৃষ্টিকালে সংকোচ গ্রহণ করিয়া জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন দেহাদি উপাধি অবলম্বনে তাঁহার 'অহং' ভাবের প্রকাশ হয় বলিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা বা জীব বলিয়া গ্রহণ করা হয়। শূন্য হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির প্রকাশ অবস্থাভেদে এই জীবের নিকটেই হইয়া থাকে।

এক্ষণে বেদ্য ও বেদকের সম্বন্ধটি জানিয়া রাখা আবশ্যক। বেদ্য বলিতে বুঝায় জ্ঞেয় এবং বেদকের অর্থ জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বীকার কবিলেই উভয়ের সংযোজকরূপে জ্ঞানও স্বীকার করিতে হয়। এইভাবে আমরা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটির সন্ধান লাভ কবি। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা স্বয়ং। পূর্বে বলা হইয়াছে, পরমাত্মাই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জীবাত্মার রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মা দেহাদিতে অভিমানশীল। জ্ঞান ও জ্ঞেয়, পরমাত্মারই পরাশক্তির দুইটি রূপ। একটি জ্ঞানশক্তি ও অপরটি ক্রিয়াশক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন 'অহং'-রূপে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ক্ষীণ আভাস তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলে জীবাত্মার দেহাদিতে অভিমান বিগলিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ক্রমশঃ পূর্ণ বিকশিত

হইয়া একাকার হইযা গিয়া সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় পরাশক্তিতে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা জ্ঞানের বা যোগেব পূর্ণ উন্মেষ অবস্থা।

জীবমাত্রেরই সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা থাকে—(১) জাগ্রৎ (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। এই তিনটি অবস্থার পরস্পর পার্থক্য কি তাহা বলা যাইতেছে। সাধারণতঃ জ্ঞাতা জীবাত্মার নিকটে যে জ্ঞেয় অর্থের ভান হয, তাহা স্থির ও অস্থিরভেদে দুই প্রকার। জ্ঞেয়রূপ স্থির অর্থের সহিত জীবাত্মার জ্ঞানের যে স্থির সম্বন্ধ, সেইটিই জীবের জাগ্রত অবস্থা। এই অবস্থায যে সত্তা প্রকট হয় তাহার নাম ব্যবহারিক সত্তা। আর জ্ঞেযরূপ অস্থির অর্থের সহিত জীবাত্মার জ্ঞানের যে অস্থির সম্বন্ধ তাহাই স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায় প্রকাশমান সত্তা প্রাতিভাসিক। স্বপ্নাবস্থা বলিতে স্বপ্ন জাতীয় সকল অনুভূতিই বুঝিতে হইবে। এই হইল একদিকের কথা। অপরদিকে জীবাত্মার এমন অবস্থাও আছে যেখানে বেদ্য (জ্ঞেয়) পৃথক্‌ভাবে প্রতিভাসিতই হয় না। ইহাকে সাধারণতঃ সুষুপ্তি বলা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত—ইহা মোহের অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞেয়ের ভান থাকে না বলিযাই জ্ঞাতা অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাহার ভান হয় না। সুষুপ্তিতে 'অহং'রূপে জ্ঞাতার ভান না হওয়ার একমাত্র কারণ মোহের আবরণ। পরমেশ্বরের কৃপায যখন এই মোহ কাটিয়া যায় তখন এই তথাকথিত সুষুপ্তিই যেন অবস্থান্তররূপে প্রকাশিত হয়। তখন সে অবস্থার নাম তুরীয়। বস্তুতঃ সুষুপ্তি ও তুরীয় এক নহে।

তুরীয় একটি স্বতন্ত্র অবস্থা এবং তাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইতে বিলক্ষণ। তুরীযাবস্থার উদয় হয় পরমেশ্বরের চিদ্‌ভাবের প্রকাশে। কিন্তু পরা চিৎশক্তির উন্মেষ হইলে, যে অবস্থা আবির্ভূত হয় তাহাই প্রবুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। তুরীয়াবস্থার সহিত প্রবুদ্ধাবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য। তুরীয়াবস্থার উদয় হয় শুদ্ধ চিৎ-এর প্রকাশে----ইহা কৈবল্যমুক্তির পথ, কিন্তু প্রবুদ্ধাবস্থার উদয় হয় 'চিৎশক্তি'র উন্মেষে—-ইহা পূর্ণতম আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভের পথ।

সুষুপ্তি ও তুরীয় উভয় অবস্থাতে আত্মা বিশুদ্ধ বেদকরূপে অবস্থান করে ইহা সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মোহবশতঃ বেদক-আত্মা যখন নিজেকে বেদক বলিয়া চিনিতে পারে না তখন সেই অবস্থার নাম হয় সুষুপ্তি। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপায় ঐ মোহ অপসারিত হয এবং বেদক-আত্মা নিজে বেদক-স্বরূপে স্থিত হয় তখন তাহার নাম হয় তুরীয়। ইহা একপ্রকার প্রকাশাত্মক চিৎ-স্বরূপ শিবরূপ যাহা শক্তিহীন বলিযা চিৎরূপ হইয়াও জড় বা 'শব'। তান্ত্রিক যোগসাধনার মতে তুরীয়েব পরিবর্তে আমরা পাই শুদ্ধবিদ্যাব উদয ও শুদ্ধ অহন্তার উন্মেষ, যাহার ক্রমবিকাশে পরম শিবরূপ পূর্ণতম পারমার্থিক স্থিতির উদয় হয় অর্থাৎ

প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইযা আত্মার পূর্ণতম বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত একই সঙ্গে যুগপৎ অবস্থায স্থিতি হয়।

এই যে শুদ্ধ অহন্তার উন্মেষ ইহাই বাস্তবিকপক্ষে সামান্য স্পন্দের স্ফুরণ। শুদ্ধ অহন্তার উদয় অর্থাৎ সামান্য স্পন্দের সন্ধান পাইলেও অনেক সময় শৈব বা শাক্ত যোগী ইহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। মন যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে লগ্ন না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের বহির্মুখ ক্রিয়া চলিতেই থাকে। এইজন্য পুনঃ পুনঃ সামান্য স্পন্দে মনকে লাগাইয়া রাখিতে হয। মন ঐ স্পন্দে লগ্ন হইলেও একটি ক্ষণের অধিক কাল স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ, ঐ সামান্য স্পন্দ অশুদ্ধ মনকে স্বভাবতঃই বিকর্ষণ করে, যেন ঠেলিয়া দেয়। বিশ্বসৃষ্টি প্রসঙ্গে পূর্বেই যে বিশেষ স্পন্দের কথা বলা হইয়াছে, সেই বিশেষ স্পন্দের দিকেই মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, এজন্য মন বহির্মুখ হয়। বহির্মুখ হইলেও যোগীর কর্তব্য পুনঃ পুনঃ উহাকে ইদন্তাব দিক হইতে প্রত্যাহার করিয়া শুদ্ধ অহন্তারূপে সামান্য স্পন্দের দিকে উন্মুখ করা। ইহাই উন্মেষতত্ত্বের রহস্য। মন পূর্ববৎ সামান্য স্পন্দে লগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু উহা পূর্বের ন্যায় একটি ক্ষণের জন্য স্থিত হইয়া পুনর্বার বহির্মুখ হইযা পড়ে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ চলিতে চলিতে মনও চিদাত্মক হইয়া যায় এবং আত্যন্তিকী বিশুদ্ধি লাভ করে। তখন মন থাকিযাও না থাকার মত হইয়া পড়ে—সামান্য স্পন্দের সহিত লগ্ন হইয়া সামান্য স্পন্দই হইয়া যায়। ইহাই উন্মনী অবস্থার স্বরূপ।

মন তখন আর বহির্মুখ থাকে না, বিশেষ স্পন্দকে 'ইদং'-রূপে ভানও করিতে পারে না। একই সঙ্গে মনের নিবৃত্তি সাধিত হয় এবং চিন্ময় 'অহং'-এর স্ফুরণ হয়। তখন ঐ বিরাট 'অহং'-প্রতীতিই অখিল বিশ্বকে গ্রাস করিয়া বিরাজমান থাকে। ইহারই নাম পূর্ণহন্তা অর্থাৎ ভগবানের আত্মপ্রকাশ। এই অবস্থাই সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা। প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থার প্রাপ্তিই শাক্ত যোগীর সাধনার লক্ষ্য। শ্রীভগবানের মহাকৃপার প্রথম উন্মেষের ফল প্রবুদ্ধ দশা লাভ এবং তাঁহার চরম অনুগ্রহের ফল সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাই পরমশিবত্ব প্রাপ্তি বা শাক্তমতে জীবন্মুক্তি (যাহা দেহে অবস্থান কালেই হইতে পারে)। মধ্যে যোগীর শুদ্ধ মার্গ বিস্তৃত রহিয়াছে, যেখানে অবস্থিত হইয়া চিদণু যেমন শক্তিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, তেমনই শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চরম অবস্থায় পূর্ণত্ব লাভ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা যেমন শিবরূপী অর্থাৎ বিশ্বাতীত পরমপ্রকাশ, তেমনই উহার সঙ্গে পরাশক্তি অভিন্ন হইয়া গেলে আত্মা বিশ্বাতীত হইযাও পরিপূর্ণ বিশ্বাত্মক প্রকাশ। কারণ, পূর্ণাবস্থায় শিব ও শক্তি ভিন্ন থাকে না, সামরস্য প্রাপ্ত হয়।

প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় আসিতে হইলে সর্বদা প্রবুদ্ধ ভাবটিকে রক্ষা করিতে হয়—"**প্রবুদ্ধ সর্বদা তিষ্ঠেৎ**"। প্রতিক্ষণই প্রবুদ্ধ থাকিতে পারিলে মহাশক্তির কৃপায় সুপ্রবুদ্ধ স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। প্রবুদ্ধ অবস্থার মূলে যে সমাধি কার্য করিয়া থাকে, তাহার নাম "নিমীলন সমাধি"। "উন্মীলন সমাধি"র ফলে প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত অখণ্ড স্থিতিলাভ ঘটে।"

(দ্রষ্টব্যঃ তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯-৪৪, ৫৮-৬৪)

উদ্ধৃত বিষয়টির অংশ বিশেষ "প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ" শিরোনামায় প্রবন্ধ আকারে "হিমাদ্রি" পত্রিকার শারদীয়া ১৩১৩ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অমনস্ক যোগের প্রস্তাবনা

সিদ্ধ সাহিত্য সংশোধন প্রকাশন মণ্ডল কর্তৃক পুণা হইতে প্রকাশিত "অমনস্ক যোগ" গ্রন্থটির প্রস্তাবনায় ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, কবিরাজ মহাশয় হিন্দিতেই রচনা করিয়া ছিলেন, এখানে রচনাটির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম।

অধিকাংশ তন্ত্র গ্রন্থের ন্যায় অমনস্ক যোগও বক্তা ও শ্রোতার প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত। এই পুস্তকে মুনি বামদেব শ্রোতা এবং কৈলাসবাসী শংকর মহাদেব বক্তা। অনেকের ধারণা এই যে, এই গ্রন্থ গোরক্ষনাথ কর্তৃক বিরচিত, কিন্তু এই ধারণা সঠিক কিনা বলা যায় না। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্তঃ—পূর্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধ। পূর্বার্দ্ধে ৬৮টি শ্লোক আছে এবং উক্ত শ্লোকগুলিতে তারকযোগের বিবরণ দেওয়া আছে। উত্তরার্দ্ধে ১১৩টি শ্লোক আছে যাহাতে অমনস্ক যোগের সবিশেষ ব্যাখা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতানুসারে অমনস্কযোগই জীবন্মুক্তির সোপান। যোগ দুই প্রকারঃ পূর্ব এবং উত্তর। পূর্বযোগ অর্থাৎ তারকযোগে মন থাকে পরন্তু উত্তরযোগ অর্থাৎ অমনস্কযোগে মন একেবারেই থাকে না। উত্তরযোগই মুখ্য যোগ। প্রচলিত পাতঞ্জল যোগ দর্শনে যেরূপ দুই প্রকারের যোগের বিবরর পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই প্রকাবের।

ভগবান্ পতঞ্জলির অনুসারে যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামে দুই প্রকার। অসম্প্রজ্ঞাত যোগই মুখ্য যোগ, কারণ ইহাতে সর্বপ্রকাব চিত্ত-বৃত্তির পূর্ণ নিরোধ হইয়া যায়। এইরূপ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ ভবপ্রত্যয়-অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে ভিন্ন। ভবপ্রত্যয়-অসম্প্রজ্ঞাত-যোগ প্রকৃতিলয নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকে বলা হয় উপায়-প্রত্যয। উপায় শব্দে প্রজ্ঞা বুঝায়। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি এবং সমাধি হইতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। এই প্রজ্ঞার নিরোধ হইতে উপায়-প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সমাধি উৎপন্ন হয়। এইরূপ উপায়-প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ-সমাধিই যোগীপদ বাচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত এবং মূঢ় বৃত্তি সমূহের নিরোধ হইয়া একাগ্রভূমিতে স্থিতি হয়। এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও গৌণ দৃষ্টিতে যোগীপদ বাচ্য, কারণ, এই একাগ্রভূমিতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায। কিন্তু মুখ্য দৃষ্টিতে ইহাও পূর্ণ যোগ নহে। একাগ্রভূমিতে উপলব্ধ প্রজ্ঞার যখন নিরোধ হইয়া যায়, তখন সর্বচিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগেব উদয হয। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে ইহা প্রতীত

হয় যে পতঞ্জলির প্রক্রিয়া এবং অমনস্ক যোগ গ্রন্থের প্রক্রিয়া সর্বোতভাবে অনুরূপ। সম্প্রজ্ঞাত ভূমিতে যেমন মন থাকে, ঐরূপ পূর্বযোগ বা তারকযোগেও মন থাকে। পক্ষান্তরে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে যেমন মন থাকে না, ঐ প্রকার উত্তরযোগ অথবা অমনস্ক যোগেও মন থাকে না। শুধু মনের নিবৃত্তি হইলেই যোগ হয় না, কারণ প্রকৃতিলয়ের অবস্থাতেও মনের লয় হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে মনের লয়কে যোগ বলা যায় না। মনের লয় হওয়া তো আবশ্যকই, ইহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু সত্যজ্ঞানেরও উদয় হওয়া আবশ্যক। মনের লয় এবং সত্যজ্ঞানের উদয় এই উভয় প্রকৃত যোগের লক্ষণ। অমনস্কযোগেও এই কথাই বলা হইয়াছে, কারণ অমনস্কতে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

লয়ের প্রসঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ বিচারণীয। হঠযোগী সাধক বলেন প্রাণের লযের সঙ্গে মনেরও লয় হইয়া যায। তাঁহারা ইহাও মানেন যে মনের লয় হইয়া যাইবার সাথে প্রাণেরও লয় হইযা যায়। এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ। হঠযোগী সম্প্রদায় প্রাণের লয হইতে মনের লয় পর্যন্ত পৌঁছাইবার উদ্যম করিতেন। ইঁহারা মনে করেন, প্রাণের লয ক্রিয়াসাপেক্ষ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির ক্রিয়াসমূহ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। দেহ ও প্রাণের নিরোধ হইয়া যাইবার পর মনের নিরোধ হইতে পারে। এইজন্য ইঁহারা চেষ্টাসাপেক্ষ হঠযোগরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের নিরোধ করিবার জন্য উদ্যম করেন। এইরূপ নিরোধ লযাত্মক। তারকযোগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে লয়ের বিভিন্ন প্রকার মাত্রানুসারে বিভিন্নপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়। কালগত তারতম্য অনুসারে এইরূপ লয়ের সিদ্ধিতেও তারতম্য ঘটে। অল্প সময়ের জন্য প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে যে প্রকার সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, অধিক সময়ের জন্য নিরুদ্ধ হইলে পূর্বাপেক্ষা উন্নত কোটির সিদ্ধি সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ প্রাণের নিয়ন্ত্রণকালের ক্রম ব্যাপকতার উপর বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধির উদয় হয়। এমন কি, ২৪ বৎসর কাল পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রাণের নিরোধ হইলে শক্তিতত্ত্ব পর্যন্ত আয়ত্ব হইতে পারে। প্রাণের এইরূপ ক্রমিক লয়ের স্তর অনুসারে মনেরও ক্রমিক লয় হয়। অর্থাৎ প্রাণের যে স্থান পর্যন্ত লয় হয়, মনেরও সেই স্থান পর্যন্ত লয় হয়। এইজন্য সিদ্ধির উদযের ব্যাপারে প্রাণের লয়ের সহিত মনের লয়ও সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু বিচার্যবিষয় এই যে, প্রাণ ও মনের লয় এক সাথে সম্ভব হইলেও অন্তিমভূমি না পৌঁছান পর্যন্ত মনের লয় পরিপূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, তারকযোগের দ্বারা অন্তিমভূমিতে পৌঁছান সম্ভব নয়। প্রাণের লযস্থানে মনেবও লয় হইয়া যায়—ইহা সত্য। পরন্তু ইহা (তারকযোগ) অপরা সিদ্ধি। এরূপ সিদ্ধি কোন না কোন সময়ে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মন পুনরায ফিবিযা আসিবে। যথার্থ মনের লয তখনই

বলা যাইতে পারে, যখন উহার পুনরাবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—

"যদ্ গত্বান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (২৫।৬)

এইরূপ লয়স্থান কোন খণ্ড তত্ত্বের অন্তর্গত নহে। ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব ভুক্ত। ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের মধ্যেই মনের লয় করা আবশ্যক। কারণ, উহার প্রভাবে মন চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তথা হইতে মনের আর পুনরাবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অমনস্কযোগেরও ইহাই লক্ষ্য। কেবল শক্তি পর্যন্ত প্রাণের লয় হয়। ইহা প্রকৃতি লয়ের অনুরূপ আর মনের লয় ব্রহ্ম পর্যন্ত হয়। ইহাই যথার্থ যোগ। পূর্ব-যোগে কেবল শক্তি পর্যন্ত স্থিতি হয়। উত্তরযোগে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে স্থিতি হয়। মনের পুনরাবৃত্তি আর হয় না। ইহা মন-নিবৃত্তির সহজ ও সরল উপায়। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত এই সহজ অবস্থার উদয় হয় না। মনের লয় হইয়া যাইবার সঙ্গে অনন্ত প্রকারের বিকল্পজাল আপনা-আপনি শান্ত হইয়া যায়। প্রাণও শান্ত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উপশম হয়। অমনস্ক গ্রন্থ-রচয়িতার মতানুসারে ইহাই রাজযোগ, ইহার পূর্বের যে যোগাবস্থা তাহা প্রাণযোগ বা হঠযোগ নামে অভিহিত।

এখানে এক প্রশ্নের উদয় হয়। ইহা বিচার্যবিষয় হইলেও এখানে এই সময় ইহার মীমাংসা করা কঠিন। মনে হয়, মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কিছু অংশে বৈলক্ষণ্য ছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ যিনি মছন্দ নামে প্রসিদ্ধ এবং যাঁহার উল্লেখ আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার তন্ত্রালোকে করিয়াছেন, কৌলমতের প্রবর্তক ছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কৌলমতের আদি প্রবর্তক ঋষি দুর্বাসা ছিলেন, পরন্তু বর্তমান যুগে ঐ মতের পুনরুত্থান মৎস্যেন্দ্রনাথই করেন। হঠযোগ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ ভৈরবী হইতে আগম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌল সাহিত্যের উপর মৎস্যেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে দৃষ্ট হয়। কৌল মতে দূতীযোগের বিশেষ আবশ্যকতা মানা হয়। ইহা শাক্তধর্মের অনুকূল মার্গবিশেষ। পরন্তু অমনস্ক-গ্রন্থে গুরুতত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে দূতীযোগের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কৌল মার্গের গুরু যথার্থ গুরু হইতে পারে না—ইহাই অমনস্ক গ্রন্থের অভিপ্রায়। প্রাচীন হঠমার্গঃ যাহা মার্কণ্ডেয় ঋষির দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরন্তু মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত হঠযোগ বর্তমানে প্রচলিত। এই হঠমার্গ প্রাণের নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেয়। ইহার তৎকালিক লক্ষ্য হইল শক্তিকে আয়ত্ত করা। পরন্তু অমনস্কসম্মত রাজমার্গের উদ্দেশ্য হইল মনের নিয়ন্ত্রণ। কেবল নিয়ন্ত্রণ নয়

প্রত্যুত মনের আত্যন্তিক লয়, যাহা ব্রহ্মতত্ত্বেই সম্ভব, শক্তিতত্ত্বে নয়। গোরক্ষ শিবভাবের অনুগামী ছিলেন এরূপ প্রতীত হয়। এইজন্য অমনস্কসম্মত গুরু আপন স্বাতন্ত্র্যবলের দ্বারা শিষ্যের আত্মার মনোলয়ের বিষয়ে সহায়তা করেন। মনের লয় হইয়া যাইবার পর প্রাণের লয় আপনা হইতেই হইয়া যায়। ইহার জন্য বিশেষ পৃথক চেষ্টার আবশ্যক হয় না।

ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই তারকযোগ পতঞ্জলিনির্দিষ্ট তারক-জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ং অক্রমং চ ইতি বিবেকজং জ্ঞানম্"—এই তাবকজ্ঞান হইল অক্রমজ্ঞান। বিবেকজ্ঞানেরই ইহা একদেশ। অক্রম শব্দে ইহাই বুঝায যে, ইহা কালের অধীন থাকে না, কারণ মনের ক্রিয়াতেই ক্রম থাকে। মনের অতীত হইলে সেখানে কালও থাকে না, অতএব কালাধীন ক্রমও থাকে না।

পূর্বোক্ত অমনস্কযোগ প্রচলিত 'উন্মনী'র সহিত অভিন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু আগমোক্ত উন্মনীতে যে বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে অমনস্কযোগে তাহার নির্দেশ নাই। তথাপি অমনস্ক ও আগোমক্ত উন্মনী এই দুই-এর স্বরূপ অভিন্নরূপে প্রতীত হয়, কারণ আগম বর্ণিত উন্মনী-স্থিতি প্রণবের পূর্ণ বিকাশের পর শব্দাতীত পরমস্থিতি বুঝায়। অ, উ, ম, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, ব্যাপিনী, সমনা, উন্মনা—এই সমস্তই প্রণবের কলা। এই সমস্ত কলার মধ্যে অ, উ, ম, হইতে সমনা পর্যন্ত আবরণ বুঝিতে হইবে। বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা রূপে গ্রাহ্য। বিন্দুর পর প্রত্যেক স্থিতিতে কাল সম্বন্ধরূপ মাত্রা ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপভাবে ক্ষীণ হইতে হইতে সমনা ভূমিতে কালের পরম অপকৃষ্ট মাত্রার সম্বন্ধ থাকে। এই মাত্রা এক মাত্রার ২৫৬ অংশ $\left(\frac{১}{২৫৬}\right)$ অথবা কোন কোন মতে এক মাত্রার ৫১২ অংশ $\left(\frac{১}{৫১২}\right)$ রূপে গণ্য হয়। ইহার পর মনেব অংশ অর্পণ হইয়া যায়। মনের অংশ অর্পণ হইয়া যাইবার পর সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দাংশ সাধকের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। ত্রিপুটি হইল ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। ক্রিযা হইল সর্বনিম্ন ধাপ। ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয়। শুদ্ধ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে ইচ্ছার উদয় হয়। এই ইচ্ছা প্রতিবন্ধকহীন। দেশ ও কালের পরিচ্ছিন্নতার দ্বারা এই ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। সাধকের মধ্যে যখন যা ইচ্ছার উদয় হয়, এক সেকেন্ডের সময় লাগে না, সে ইচ্ছার পূরণ হইতে। কারণ স্যধক তখন বিন্দুর কেন্দ্রে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত হয়। তখন সাধক সর্বজ্ঞত্ব হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞত্ব তখনও লাভ হয় না। কারণ, তখন সমগ্র বিশ্ব সাধকের নিকট 'ইদং'রূপে ভান হয় এবং 'অহং'রূপে নহে। পরিপূর্ণ জ্ঞান বা অহন্তার বিকাশে সমগ্র বিশ্বই আমি বা আমার শরীব ইহা সাধকের গোচবে আসে। অর্থাৎ

বিশ্ব তখন 'ইদং' রূপে নহে, 'অহং' রূপে ভান হয়। সাধক যখন সর্বজ্ঞত্ব হয় এবং তাহার সহিত যদি ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ হয়, তবে সেই সাধক ঈশ্বর-পদবাচ্য হয়। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়া ঈশ্বরত্ব ক্ষমতার ভোক্তা হয় বা অধিকার-ভোক্তা হয়। এই ভোগাকাঙ্খা রূপ ইচ্ছাকে পরমপিতার চরণে অর্পণ করিলে বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দের অনুভব হয় এবং পরমপিতার কৃপায় আণবমল-রূপ আবরণের যে লেশটুকু তখনও থাকে তাহা উন্মোচিত হইয়া অহন্তার বা পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ সাধন হয়। এই অবস্থাই পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব।

যখন মনের অংশ অর্পণ হইয়া যায়, তখন সমনা ভূমি সমাপ্ত হইয়া যায়। পরন্তু সমনাভূমি অতিক্রম করার দ্বারা অর্থাৎ সমনাভূমি অতিক্রম করার পরও, অর্থাৎ মনোনিবৃত্তি পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার পরও উন্মনার উদয় হয় না। মনের না থাকা অর্থাৎ মনের সম্যক্ লয় আত্মশুদ্ধির চরম উৎকর্ষ নির্দেশ করে। অমনস্কার বলেন, এইখানেই পূর্ণতা, পরন্তু আগমের মতে এখানে পূর্ণতা সাধিত হয় না। কারণ আগমের দৃষ্টিতে আত্মার তিন প্রকার আবরণ বিদ্যমান থাকে—১। প্রকৃতির গুণাবরণ, ২। নির্গুণ আত্মাতে মায়ার আবরণ, ৩। মায়াতীত অবস্থাতেও শুদ্ধ মায়া বা মহামায়ার আবরণ—-ইহাকে কোথাও কোথাও বৈন্দব আবরণ নামেও উল্লেখ করা হয়। সমনা ভূমি ভেদ হইয়া যাইবার পর এইসব আবরণ থাকে না। কিন্তু আণবমলের নিবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বাবরণের মূল থাকিয়াই যায়। যে ভূমিতে আণবমলের নিবৃত্তি হইয়া যায় তাহাই পরম কৈবল্য নামে প্রসিদ্ধ। আত্মা এখানে পরম শুদ্ধ কেবলী রূপে প্রকাশমান হয়। ইহা নির্বাণপদ, ইহা পরিনির্বাণ পদ, ইহাই সত্য (সৎ), পরন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নহে, কারণ এখানে এখনও সর্বাবরণের মূল আণবমল আভাস রূপে থাকিয়া যায়। এইজন্য এখানে শিবত্বের উদয় হয় না। অবিদ্যানিবৃত্তি, দুঃখনিবৃত্তি (ঐকান্তিক, আত্যন্তিক) এবং ক্লেশনিবৃত্তি—সব কিছুই হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ অবস্থারও অতিক্রম হইয়াছে তথাপি ইহা পূর্ণত্ব নহে, কারণ ইহাতে উন্মনী শক্তির বিকাশ হয় নাই। মনোনিবৃত্তি এবং উন্মনী শক্তির বিকাশ এক বস্তু নহে। কাহারও কাহারও মনোনিবৃত্তি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার পরও উন্মনী শক্তির বিকাশ হয় না। যাহার মধ্যে এইরূপ উন্মনী শক্তির বিকাশ হয় না, তাহার পক্ষে পরম শিবময় ধামে প্রবেশ অসম্ভব। উন্মনী শক্তিতে প্রবেশই শ্রীভগবানের অনুগ্রহের চরম নিদর্শন। পরন্তু আগম অনুসারে উন্মনীতে প্রবেশ হইলেই চরম স্থিতি লাভ হয় না, কারণ উন্মনী কলাসমূহের অন্তর্গত। উন্মনীকলাও তো কলাই। উন্মনী স্থিতিকেই ত্রিশূল পদ বলা হয় যাহার উপর কাশী নিত্য প্রকাশরূপে বিদ্যমান

থাকে। এইজন্য পরিশেষে উন্মনীরও নিবৃত্তি হইয়া যায। ইহাই নিষ্কল পরমপদ। বর্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োগবিজ্ঞানে 'Supermind' এবং 'Overmind'-এর যে ভেদ দর্শিত হইয়াছে উহার সহিত সমনা ও উন্মনাব প্রভেদ তুলনা করা যাইতে পারে। উন্মনা নিবৃত্তি হইবার পর 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বযম্' অবস্থা—ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

বেদান্তের তুরীয় যোগ—সাধারণ মানুষের তিন অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীবাত্মার আলোকে আলোকিত চিত্ত ও ইন্দ্রিযসকল সক্রিয় হয় বলিয়া জীবের যে বাহ্য জ্ঞান হয় তাহা জাগ্রত অবস্থা। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়সকল ক্রিয়া করে না বটে, কিন্তু চিত্ত সক্রিয় থাকায় হৃদয়েই জাগ্রতের ন্যায জীব আচরণ করে ও অনুভব করে। সুষুপ্তিতে চিত্ত একাগ্রভূমিতে থাকে, কিন্তু জীব অজ্ঞান থাকায় অর্থাৎ তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের বিকাশ না হওয়ায় প্রগাঢ় অজ্ঞান অন্ধকারে সুপ্ত থাকে।

সাধনার দ্বারা চিত্তের মধ্যে একাগ্রতা আনিতে পারিলে জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জ্ঞান—স্বরূপ জ্ঞান। এরূপ অবস্থায় চিত্তের নিরোধ করিলে যাহা থাকে তাহা হইল নির্বিকাব, নির্বিকল্প আত্মা। এই নির্বিকল্প আত্মজ্যোতিতে মগ্ন হইলে সাধকের যে অবস্থা হয় তাহাও এক প্রকার সুষুপ্তি। তবে জীবের সুষুপ্তি ও সাধকের আত্ম-সুষুপ্তিতে পার্থক্য হইল এই যে জীবের সুষুপ্তি অজ্ঞান-সুষুপ্তি, সাধকের সুষুপ্তি সজ্ঞান-সুষুপ্তি। জীব সুষুপ্তির ভঙ্গে জাগ্রত হইযা মায়াচ্ছন্ন অজ্ঞানের রাজ্যে ফিরিয়া আসে এবং কর্মফল ভোগ করে। সজ্ঞান-সুষুপ্তিতে সাধকের মায়ারাজ্যে ফিরিযা আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং কর্মফল ভোগেরও কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ একাগ্রতা সাধনের ফলে জ্ঞানের উদয়ে সমস্ত প্রাক্তন কর্ম-সংস্কারের বীজ ভস্মীভূত হইয়া যায। তথাপি সাধকের এইরূপ সজ্ঞান-সুষুপ্তিও একপ্রকার জড় অবস্থা। কারণ চিত্তের নিরোধের ফলে কোন প্রকার অনুভূতির বালাই থাকে না। কারণ, চিত্ত ব্যতীত অনুভব করিবে কে? আত্মা তো নির্বিকার, নির্বিকল্প। আত্মার মধ্যে যদি অনুভব হয় তবে তো তাহা আর নির্বিকার, নির্বিকল্প থাকিতে পারে না। চিত্তের সংযোগেই আত্মার মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি হয়, তাহার নির্বিকারত্ব ঘুচিযা যায়। সেই চিত্তই যদি সাধক নিরোধ করে তবে সাধকও নির্বিকার, নির্বিকল্প ভূমিতে প্রবেশ করিযা স্বরূপ-জ্যোতিতে লীন হইয়া যাইবে। নির্বিকার, নির্বিকল্প ভূমিতে প্রবেশই সাধকের তুরীয অবস্থা। তুরীয়ে প্রবেশের পূর্বে সুষুপ্তি-সমাধিতে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে কিন্তু শূন্য হইয়া যায় না। সুষুপ্তি-সমাধি হইতে সাধক স্বপ্ন ও জাগ্রত ভূমিতে অবতরণ করিলে চিত্তের ক্রিয়া আবার

সুরু হইয়া যায়। চিত্তের ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর কাল-পরিণামী। সাধক কাল-জয়ী তখনও পর্যন্ত হইতে পাবে না। সুষুপ্তি ভেদ করিয়া তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হইলে চিত্ত শূন্য হইয়া যায়, চিত্তের ক্রিয়ার কোন লেশ থাকে না, সাধক আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন। আত্মা অজর ও অমর। অতএব আত্মায় অধিষ্ঠিত সাধক স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

তুরীয় সাধনার আর একটি ধারা আছে, তাহা হইল শক্তি-সাধনা। এই সাধনায় শাক্ত সাধক প্রজ্ঞার উদয়ে চিত্তের নিরোধ করে না। এরূপ সাধক চিত্ত-বৃত্তির একাগ্রতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-বৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানের বিকাশের সাথে স্বরূপ-শক্তিরও বিকাশ সাধন করেন। এইরূপ সাধনায় অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তির ন্যায় জ্ঞানাগ্নি ও জ্ঞানশক্তির সমভাবে বিকাশ হয় অর্থাৎ চিত্ত 'আত্মসংস্থ' হইয়া আত্মার সাথে সাথে জাগিয়া উঠে। ইহাই আগম সাধকের শক্তিসমন্বিত তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তুরীয়ের মধ্যে একাকার হইয়া যায়। অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে তুরীয় সমভাবে ব্যাপ্ত থাকে বা তুরীয়-সাধক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই সমভাবে বিরাজ করিতে পারেন। যেমন এক গ্লাসে গরম জল এবং অপর গ্লাসে ঠাণ্ডা জল লইযা ঢাল উপর করিতে থাকিলে উভয় গ্লাসের জল এক সময়ে সাম্য অবস্থায় উপনীত হয় উহাও সেইরূপ। সাধনার এই বিশেষ ধারাটিকেই ঋষি অরবিন্দ প্রকটিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ধারাটি হইল 'Integral' যোগ। Integral মানে সমন্বয়। সাধক বার বার নিম্নভূমি হইতে ঊর্ধ্বভূমিতে উত্থিত হইয়া আবার নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিয়া নিম্ন ভূমিকে ঊর্ধ্বভূমির শক্তিদ্বারা ক্রমশঃ প্রভাবিত করিতে করিতে অবশেষে নিম্ন ও ঊর্ধ্বভূমির সমন্বয় সাধন করে।

সাধকের এইরূপ তুরীয় অবস্থায় পরমেশ্বর স্বয়ং বা পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই সাধককে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষার ফলে সাধকের হৃদয়াকাশ চিদাকাশে পরিণত হয়। সাধনার প্রাগ্রসরতার সাথে সাধকের মধ্যে বিকশিত শক্তি সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে যাহার ফলে সম্মুখ-পশ্চাৎ, ঊর্ধ্ব-অধঃ চতুর্দিকে সাধকের প্রজ্ঞা-দৃষ্টি ব্যাপকতা লাভ করে এবং শুধুমাত্র একটি ব্রহ্মাণ্ড নয়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। আত্মার পূর্ণ জাগরণে এবং শক্তির পূর্ণ বিকাশে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও সাধক তখন অভিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সাধকের অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং তখন সাধকের মধ্যে প্রকৃত পূর্ণাহন্তা জাগ্রত হয়। এইরূপ অবস্থাতেও সাধক অপূর্ণ—প্রকৃত পূর্ণত্ব লাভ তখনও

বাকী। পরম পূর্ণত্ব লাভ করিবার জন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী সাধক তখন পরমেশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে—ইহাই প্রকৃত শেষ আত্মসমর্পণ। গীতায় সর্বধর্মের পথ নির্দেশের পর অষ্টাদশ পর্বে এইরূপ আত্মসমর্পণেরই বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ।" এইরূপ আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর সাধককে আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লন। ইহাই পরমেশ্বরের সঙ্গে সাধকের পরম যোগ। তখন আর বিশ্ব থাকে না, সাধক আর পরমেশ্বরের যোগে এক অদ্বয় অবস্থা লাভ হয় যাহা বিশ্বাতীত।

আগমসম্মত তুরীয়-সাধন সঙ্কেত—জাগ্রতে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ইত্যাদি গ্রহণ করে। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্মুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ থাকে। এই অবস্থায় মন দিয়াই সব কিছু গৃহীত হয়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় তো নিষ্ক্রিয় থাকেই, মনও নিষ্ক্রিয (functionless) হইয়া যায়। মন হইল বায়ু-বহা নাড়ী—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে উহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুষুপ্তিতে মন অচঞ্চল হইয়া পুণ্ডরীক বা হৃদয়পুর বা দহর আকাশে অবস্থান করে। হৃদয় হইতে সহস্রার পর্যন্ত ৩৬ (ছত্রিশ) অঙ্গুলি ব্যবধান। তুরীয়ের উদয় হইলে হৃদয়ে অবস্থিত অচঞ্চল মনের অনৈসর্গিক স্পন্দন শুরু হয় এবং সহস্রার দিকে উহার ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি হইতে থাকে। মনের মধ্যে ঐ অনৈসর্গিক স্পন্দন কিরূপে আরম্ভ হয়? সুষুপ্তিতে জাগিয়া উঠারই নাম তুরীয়। সুষুপ্তিতে মানব নিদ্রিতই থাকে। কিন্তু যদি কেহ সুষুপ্তিতে দ্রষ্টা বা সাক্ষী চৈতন্যরূপে জাগিয়া উঠিতে পারে, সে তখন তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তুরীয় একবার জীবের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে তাহা আর কখন লোপ পায় না। প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে মগ্ন থাকিয়াও যখনই তুরীয়ের প্রতি অভিনিবেশ হয় তখনই তুরীয় যোগীর দৃষ্টিগোচর হয়। তুরীয় হইল জাগ্রত জীবচৈতন্য, অতএব প্রকাশাত্মক জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতিই যোগীর প্রত্যক্ষ হয় এবং যোগীর নিত্য সহচর হইয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি—জীবের এই তিন ভিন্ন অবস্থা। এই তিন অবস্থার কোন মিল নাই। জাগ্রতে স্বপ্ন বা সুযুপ্তি থাকে না, স্বপ্নে জাগ্রৎ বা সুষুপ্তি থাকে না এবং সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ বা স্বপ্ন থাকে না। কিন্তু আগম পন্থায় তুরীয় উদয় হইলে তখন আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা তুরীয় যতই প্রবল হইতে থাকে ততই উহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তিকে গ্রাস করিতে থাকে এবং যোগীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্পূর্ণরূপে বরাবর হইয়া যায় অর্থাৎ জাগ্রতেও তুরীয়, স্বপ্নেও তুরীয় এবং সুষুপ্তিতেও তুরীয সমান থাকে অর্থাৎ সাধকের সর্বাবস্থায তুরীয় সমভাবে বর্তমান থাকে। ইহাকে তুরীয়াতীত

বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, বিহারী, আসামী, কাশ্মীরী, রাজস্থানী, উত্তর প্রদেশী, মধ্যপ্রদেশী প্রভৃতির পরস্পর ভেদ। কিন্তু যখন বলা হয় ভারতবাসী (Indian), তখন বাঙ্গালীও ভারবাসী, পাঞ্জাবীও ভারতবাসী, মাদ্রাজীও ভারতবাসী প্রভৃতি। ভারতবাসীত্বে অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানত্বে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতির কোন ভেদ নাই। সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে পরস্পর ভেদ, কিন্তু তুরীয়ের সমসূত্রে উহারা এক। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এরূপ তুরীয় জাগে কিরূপে?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুষুপ্তিতে মন অচঞ্চল হইয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থান করে। সদ্‌গুরুর কৃপায় সুষুপ্তিতে জীব মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ মন বা প্রকৃতি বা স্বভাব, সদ্‌গুরু তাহাকে সেই মনের উপযোগী মন্ত্র দেন অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনের গঠন বা বৈশিষ্ট্য (individuality), সেই বৈশিষ্ট্যের উদ্‌ঘাটনকারী মন্ত্র গুরু দেন। এক কথায়, আধার প্রস্তুত হইলে সদ্‌গুরু নিজে আসিয়া তাহার মনের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়া যান অর্থাৎ মায়াজনিত অবিদ্যার আবরণে যে-মন নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন ছিল, মন্ত্র দ্বারা তাহাকে আত্মসচেতন করিয়া দেন। ইহাকেই বলে 'অভিষেক' বা দ্বিজত্বপ্রাপ্তি, ইংরাজীতে 'consecration', ইসলাম ধর্মে 'কল্‌মা পড়া'। এখন ইহারা অন্তর্নিহিত অর্থ হারাইয়া বাহ্য-অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। যাহাই হউক, অবিদ্যার আবরণ হটাইয়া মনের স্বরূপ উন্মোচন করিয়া দেওয়াই মন্ত্রের কাজ। সদ্‌গুরু যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি অনুযায়ী মন্ত্র দেন যাহাতে তাহার প্রকৃতি বা মন আপন স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হইতে পারে। এইরূপে মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত স্থির মনে অনৈসর্গিক স্পন্দন সুরু হয় এবং সেখান থেকেই মনের (চিত্তের) অধ্যাত্ম জীবনের পথে যাত্রা শুরু হয়। ইহাই হইল জীবের তুরীয় অবস্থায় উন্নয়ন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সুষুপ্তি অবস্থা ছাড়া কি জাগ্রতে গুরু মন্ত্র দেন না? বাস্তব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্র দেন তখন তো শিষ্যের জাগ্রদাবস্থা। তাহা হইলে মন্ত্র-দীক্ষার সঙ্গে সুষুপ্তির কি সম্বন্ধ? ইহার উত্তর এই যে সুষুপ্তি অবস্থায় মন অচঞ্চল না হইলে মন্ত্র-দীক্ষা হয় না। গুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্র দেন, তখন সেই মুহূর্তের জন্য গুরু শিষ্যের মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করিয়া তাহার স্থির চিত্তে বীজ-মন্ত্র বপন করেন। মন্ত্রের সঙ্গে সুষুপ্তি অবস্থার সম্বন্ধ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মন্ত্র লাভের পর মনের যে অনৈসর্গিক স্পন্দন সুরু হইয়া তুরীয় অবস্থার উদয় করায়, সেই তুরীয় অবস্থায় কি অনুভব হয়?

তুরীয় অবস্থায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে দ্রষ্টারূপে সাধকের সাক্ষী-চৈতন্য জাগিয়া

উঠে। জাগ্রতেও সাক্ষীচৈতন্য থাকে ; স্বপ্নেও সাক্ষীচৈতন্য থাকে এবং সুষুপ্তিতেও সাক্ষীচৈতন্য থাকে অর্থাৎ সাধকের এই তিন অবস্থায় চৈতন্য নিত্য জাগ্রত থাকিয়া ব্যবহারিক জীবনের সর্বকর্ম ও জৈবিক সুখ-দুঃখাদির দ্রষ্টা হইয়া সাক্ষীরূপে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় সাধকের যে ব্যবহারিক সত্তা যাহা বহিশ্চর মনের ক্রিয়া, তাহার সহিত ঐ জাগ্রত সাক্ষীচৈতন্য তাদাত্ম্য না হইয়া গিয়া পৃথক থাকিয়া বহিশ্চর মনের ক্রিয়া-কলাপের দ্রষ্টা হইয়া থাকে। এই বহিশ্চর জীব-চৈতন্যকে মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জীবাত্মা এবং ঐ দ্রষ্টা সাক্ষী-চৈতন্যকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। একই শরীরে উভয়ে বাস করে। সাধনার দ্বারা যতই তুরীয় অবস্থার পুষ্টি হইতে থাকে, ততই সাধকের মধ্যে দ্রষ্টাস্বরূপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং বহিশ্চর মনের গতি ক্রমশই ক্ষীণ হইতে থাকে অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ ও লৌকিক জীবন ক্রমশই পরিত্যক্ত হইতে থাকে। দ্রষ্টাস্বরূপ যখন সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ শুধু চৈতন্যই চৈতন্য থাকে, প্রকৃতি লেশমাত্র সেখানে থাকে না তখন ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহা বৈরাগ্যের পথ—বিবেকের পথ। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল এই বিবেকের পথই নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শাক্ত পথ ঠিক ইহার বিপরীত। শাক্তমতে বিবেকের পথ ধরিয়া যে ব্রহ্মাবস্থা বা কৈবল্য লাভ হয়, উহাও একপ্রকার সুপ্ত অবস্থা, কারণ উহাতে চিৎ-শক্তির জাগরণ হয় না। চিৎ-শক্তি জাগ্রত না হইলে অর্থাৎ চিত্তকে পরিহার না করিযা চিত্তকে চিন্ময়ী শক্তিতে পরিণত না করিলে কেবলী-মুক্তি বা ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তিতে ব্রহ্মের একদেশমাত্র লাভ হয়, পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না। কারণ, ব্রহ্মের আর একদেশে যে ব্রহ্মই সব কিছু হইয়াছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সেই সর্বাত্মক ব্রহ্মকে অনাত্মা বলিয়া পরিত্যাগ না করিয়া সব কিছুকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সর্বব্যাপক সর্বাত্মক বিশুদ্ধ অহং-চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটানোতেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয।

এই বিষয়টি লইয়া ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশ্লেষণের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রবন্ধটি 'জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি ভেদে আত্মার অবস্থাভেদ' এই শিরোনামায় ভূষিত করা হইল।

জাগ্রত, স্বপ্নাদি ভেদে আত্মার অবস্থাভেদ

স্বরূপদৃষ্টিতে আত্মা সর্বভাবের অতীত, ইহা সর্বভাবেব মধ্যে সর্বাত্মক হইয়াও সর্বত্র নিজ-স্বভাবে স্বযংরূপে অবস্থিত। ইহাই আত্মার স্বরূপস্থিতি। ইহা নির্বিকার, দ্বন্দ্বাতীত, নির্দোষ ও সমরস। কিন্তু ব্যবহার-ভূমিতে ও প্রতিভাস ক্ষেত্রে আত্মার অবস্থাগত ভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল অবস্থা বা দশার অবান্তর বিভাগ অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের মুখ্য বিভাগ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীত ভেদে পাঁচ প্রকার। এই পাঁচটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সকলেরই সুপরিচিত। অন্য দুইটিকে অধ্যাত্ম জ্ঞানের উদয় ও পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত কেহই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না।

আত্মার এই অবস্থাভেদেব প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের পরস্পব সম্বন্ধগত বৈশিষ্ট্য হইতেই এই সকল দশার উদয় হইয়া থাকে। আত্মা বলিতে এখানে দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মার কথাই বুঝিতে হইবে, বিদেহী কেবলাত্মার কথা নহে। আত্মা ও মনের সংসর্গ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ যে অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয। কিন্তু যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়েব সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটি সম্বন্ধ পূর্বের ন্যায অক্ষুণ্ন থাকে, তাহার প্রচলিত নাম স্বপ্নাবস্থা। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, এবং মন ও ইন্দ্রিযের সম্বন্ধও থাকে না, একমাত্র আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সুষুপ্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অজ্ঞান-আচ্ছন্ন জীব নিরন্তর এই তিনটি অবস্থার আবর্তন অনুভব করিয়া থাকে। এই আবর্তন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। যতদিন তাহা না হয় অর্থাৎ যতদিন আত্মার সম্যক্ জ্ঞান উদিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুষুপ্তি দশাতে আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকে। ইহা অনাদি সংযোগ এবং মূল অজ্ঞান হইতে প্রসূত। সুষুপ্তিকালে মন হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে। ঐটি আকাশ স্থান। ওখানে কোন প্রকার নাড়ী নাই এবং বায়ুরও কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। সুষুপ্তিকালে মন হৃদয়মধ্যে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে বলিয়া ঐ সময় কোন প্রকার লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, মন মনোবহা নাড়ীতে সঞ্চরণ না করিলে লৌকিক জ্ঞান

আবির্ভূত হয না। নাড়ীমাত্রই বায়ু-ঘটিত সংস্থান—সমগ্র মানবদেহ নাড়ীজালে আচ্ছন্ন রহিযাছে, কিন্তু দেহের মধ্যে একমাত্র ঐ হৃদযস্থ দহরাকাশই নাড়ীশূন্য, বায়ুশূন্য এবং মনের ক্রিযাশূন্য স্থান। দেহেব সর্বত্রই মনের সঞ্চবণ এবং বাযুব ক্রিয়া সম্ভবপর, কিন্তু হৃদযে বায়ু, মন প্রভৃতি কিছুই ক্রিয়া করে না। মন যখন হৃদযে প্রবিষ্ট হয তখন ওখানে স্তব্ধ হইয়া বিদ্যমান থাকে—উহা মনেব লয়াবস্থা। মনের ক্রিয়া না থাকাতে ঐ সময়ে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লৌকিক গুণেব উদ্ভব হয না।

কিন্তু যখন গুরু কৃপাতে এবং নিজের প্রাক্তন মলের পরিপাকবশতঃ অলৌকিক জ্ঞানেব উদয হয তখন ঐ আত্মা ও মনের সংযোগেব হেতুভূত অনাদি অজ্ঞানটি কাটিয়া যায। তখন ঐ আত্মা ও মনের সংযোগও থাকে না। তখন হৃদয়াকাশ নবোদিত জ্ঞান-সবিতার স্নিগ্ধ কিরণমালায় আলোকিত হয়। এই অবস্থাটিকে সাধারণতঃ আত্মার তুরীয় দশার পূর্ব সূচনা বলিযা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই অবস্থার উদয হইলে এবং ইহা স্থাযী হইলে ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই সমভাবে অনুস্যূত থাকে। ইহা পূর্ণাবস্থা হইলেও ইহার উন্মেষ প্রথমেই সাধারণতঃ পূর্ণভাবে পাওযা যায় না। তাই জ্ঞানেব উদয়ের পবেও জাগ্রৎ প্রভৃতি অজ্ঞান-দশা কিছু সময পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে উহা ক্রমশঃই অধিকতর হীনশক্তি হইযা পড়ে। দেহ থাকা পর্যন্ত অথবা প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা কাটিয়া না যাওযা পর্যন্ত সাধারণতঃ এইভাবে চলিতে থাকে। প্রারব্ধ কাটিয়া গেলে দেহাভিমান আভাসরূপেও থাকে না। জাগ্রৎ-আদি অবস্থা-ভেদও থাকে না। তখন একই অবিচ্ছিন্ন স্থিতি বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে তুরীয অবস্থা তুরীয়াতীত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বস্তুতঃ ঐটি নিত্যাবস্থা হইলেও তুরীয় অবস্থার উদয় ও পরিপাক না হইলে উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। জাগ্রৎ-আদি তিনটি পৃথক দশা যতদিন থাকে ততদিন পর্যন্ত চতুর্থ বা তুরীয় নামেব সার্থকতা—যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানের অর্থ আছে। কিন্তু যখন জাগ্রৎ আদি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না, তখন ঐ তুরীযই তুবীয়াতীত বা স্বরূপস্থিতি নামে পরিচিত হয়।

জাগ্রত অবস্থাতে ইন্দ্রিযসকল বহির্মুখ থাকে এবং রূপবসাদিময় বিষয়-পঞ্চকের সহিত সংস্রবযুক্ত হইয়া উহাদিগকে গ্রহণ করে। এইভাবে আমাদের বাহ্য জগতের জ্ঞানের উদয় হয। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে এই বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ইন্দ্রিয়ের বহিরুন্মুখভাব তখন উপশম প্রাপ্ত হয়—ইন্দ্রিয তখন অন্তর্মুখ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইলেও মন তখনও বহির্মুখ থাকে। অর্থাৎ ঐ সময়ে ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ না থাকিলেও মনের ইন্দ্রিযাভিমুখী প্রবণতা নিবৃত্ত হয় না। ইহারই ফলে

স্বপ্নানুভবের উদয় হয়। ইহা সংস্কার-জন্য জ্ঞান। তাছাড়া ঐ সময়ে মন দেহের মধ্যেই মনোবহা নাড়ী অবলম্বন করিয়া অন্তঃস্থিত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণ করে ও নানাপ্রকার দর্শন-স্পর্শনাদির অনুভব করে। ইহার পর মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মনের ইন্দ্রিয়মুখী গতি নিবৃত্ত হয় ও মন বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। ঐ সময়ে স্বভাবতঃ উহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার লাভ করে। মন বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, কারণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমিতরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সর্বব্যাপক। মন যখন যেখানেই থাকুক না কেন, উহা নিত্যই তাহার সন্নিহিত থাকে। তথাপি মন সব সময়ে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মন বাহ্য-উন্মুখ ভাব হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর মনের আর সঞ্চরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, কারণ ঐ আকাশে চলিবার কোন পথ নাই। তাই মন নিশ্চল হইয়া ঐখানে অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য এই—মন ক্লান্ত হইয়া নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট হইলেও মনের দিকে আত্মার উন্মুখ-ভাব নষ্ট হয় না। সেইজন্যই উভয়ের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকে। যতদিন অনাদি অবিদ্যা প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত না হয়, ততদিন আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার এই মনের অভিমুখতা নিবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্যই মন কিছুক্ষণের জন্য সুষুপ্তিতে স্থির হইলেও এই স্থিতি দীর্ঘকাল থাকে না। পূর্ব-সংস্কারের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখ হয় এবং পূর্ববৎ নাড়ী-মার্গে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব-সংস্কারের উদয়ের প্রকৃত হেতু কাল। সুতরাং বুঝিতে হইবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মন কালাতীত হইতে পারে না। সেইজন্যই মন স্থির হইলেও সুষুপ্তিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। জাগতিক জ্ঞান মনের ক্রিয়া সাপেক্ষ। হৃদয়াকাশে সেইজন্য লৌকিক জ্ঞানের উদয় সম্ভবপর নহে। যে সময় মন স্থির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে লোকত্তর জ্ঞানের প্রকাশ জাগিয়া উঠে, সেই সময়েই তুরীয় অবস্থার উন্মেষ হয়। সুষুপ্তিতে যে স্থিরতা তাহা তামসিক। ঐ অবস্থায় সত্ত্ব থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে, সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় ও বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মূল অজ্ঞানকে কাটানো যায় না, এবং লোকোত্তর জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয় না। গুরুকৃপাতে যদি আত্মার মনোমুখী দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয় অথবা ততোধিক গুরুকৃপাতে যদি ঐ দৃষ্টি পরমাত্মমুখী হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত অনাদি অজ্ঞান কাটিয়া যায় এবং আত্মা ও মনের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় মন নিষ্ক্রিয় এবং চেতন-ভাবাপন্ন হয়। ইহারই নাম মনের অধ্যাত্ম জাগরণ, অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষ। আমরা যে তুরীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইহারই নামান্তর।

ইহার পর এই চেতন ও শুদ্ধ মনও আর থাকে না। তাহাই তুরীয়াতীত। তখন একমাত্র আত্মাই আপন স্বরূপে বিরাজ করেন এবং নিজেব সহিত নিজে ক্রীড়া করেন।

যাঁহারা দেহ বিজ্ঞানে নিষ্ণাত, তাঁহারা বলেন যে আমাদের এই মানব-দেহ সর্বময়—ইহাতে সব কিছু আছে। শুধু তাহাই নহে, সব. কিছুর অতীত যাহা তাহাও ইহাতে আছে। পিণ্ড যে শুধু ব্রহ্মাণ্ড হইতে অভিন্ন তাহা নহে—ব্রহ্মাণ্ডাতীত বা বিশ্বাতীত সত্যও পিণ্ডের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি দশা জীবভাবসংসৃষ্ট, তাই এই তিনটিকে জীবদশা বলে। তুরীয় অবস্থার নাম শিব-দশা। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তিনটি জীব-দশা ও একটি শিব-দশা অর্থাৎ মোট চারিটি দশা প্রকাশিত হয়। জাগ্রৎ একটি সক্রিয় অবস্থা—ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের অনুসন্ধানই ইহার স্বরূপ। সুপ্তি অবস্থা নিবৃত্ত হইলে এই প্রকার যে বাহ্য অর্থের অনুসন্ধান উদিত হয়, ইহাই জাগ্রৎ। জাগ্রত অবস্থায় ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সুপ্তি অবস্থাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না—উহা জড়ত্ব-প্রধান নিষ্ক্রিয়াবস্থা। এই উভয় অবস্থার অন্তরালে আর একটি অবস্থা আছে। তাহার নাম স্বপ্ন। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পূর্বে নানাপ্রকার মানসিক ভেদময় বিকল্পজ্ঞানের উদয় হয়—উহাই স্বপ্ন নামে পরিচিত। জীবের সংসারদশা বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি দশার সহিতই আমরা পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহাকে সুপ্তি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাই সংসারের বীজ দশা, যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইযাছে তাহা সংসারেব উন্মেষ দশা এবং যে দশাকে আমরা জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি তাহা সংসারের গাঢ় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা। আত্মার সংস্কারের ক্রমিক আধিক্য অনুসারে পর পর এই তিনটি অবস্থার নির্দেশ করা হইল।

কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই তিনটি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে পরস্পর ভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে, ইহাদের যে কোন দুইটি অবস্থা একসঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারে না, পর পর হয়। অর্থাৎ যখন জাগ্রৎ থাকে তখন স্বপ্ন বা সুষুপ্তি থাকে না এবং যখন সুষুপ্তি থাকে তখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন থাকে না। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই প্রকার নহে। কারণ উহা উক্ত তিন অবস্থার প্রত্যেকটির সহিত ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে। তুরীয, জাগ্রততে থাকে, স্বপ্নে থাকে এবং সুষুপ্তিতেও থাকে। তুরীয়ের প্রকাশের জন্য অন্য কোন অবস্থা নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক নহে। চিৎ-এর অনুসন্ধানই তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য। উক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি চিৎ হইতে উদ্ভূত—তাই চিৎ উহাদের কারণ ও উহারা চিতের কার্য। কার্যে যেমন কারণ ব্যাপকরূপে বর্তমান থাকে, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তুরীয় ব্যাপকরূপে

বিদ্যমান থাকে। তুরীয় অবস্থা শুদ্ধ ও নির্মল হইলেও উহাতে জাগ্রৎ প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থার কলঙ্ক স্পর্শ হয়। ইহা স্পর্শমাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য। কিন্তু তুরীয়াতীত অবস্থাতে এই স্পর্শও থাকে না।

শাক্ততন্ত্রমতে তুরীয়াতীত অবস্থা পরাশক্তির হৃদয়রূপে পরিকল্পিত। ইহাই সকল অবস্থার প্রাণভূত। বাস্তবিক পক্ষে তুরীয়াতীত অবস্থা সাক্ষাৎ মহাশক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে অবস্থার বিচার প্রসঙ্গে তুরীযাতীত অবস্থারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তুরীয় ও তুরীয়াতীত উভয় দশাতেই চিদ্-ভাবের প্রকাশ থাকে, তথাপি তুরীয় অবস্থাতে সংসার-কলঙ্কের ক্ষীণ আভাস থাকিয়া যায়, কিন্তু তুরীয়াতীতে তাহাও থাকে না। ইহা পরমশিবের অবস্থা—অখণ্ড ও ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও পরম-শিব হইতে পরাশক্তিরই উৎকর্ষ কীর্তিত হইবার যোগ্য, কারণ পরম-শিবের সত্ত্বা চিৎ-সারভূতা বিমর্শরূপা পরাশক্তির অধীন। এইজন্য শিব-শক্তিতে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীভূত হয়।

'অ' হইতে বিসর্গ পর্যন্ত স্ববর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক। 'ক'-কার হইতে 'ম'-কার পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শবর্ণ জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। 'য', 'র', 'ল', 'ব'—এই চারিটি অন্তঃস্থবর্ণ স্বপ্নাবস্থাব পরিচাযক। 'শ', 'ষ', 'স'—এই তিনটি উষ্মবর্ণ তুরীয় বাচক এবং কূটাক্ষর 'ক্ষ'-তুরীযাতীত রূপে কল্পিত হয়।

(দ্রষ্টব্যঃ তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, পৃঃ ২৫৪--২৬৪)

তুরীয় ও তুরীয়াতীতের সহিত প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধের পার্থক্য—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অজ্ঞান-আচ্ছন্ন জীবের এই তিন অবস্থা। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব বেদক, স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বেদ্য। স্বপ্নে জীব সূক্ষ্ম শরীরে বেদক, মন-গ্রাহ্য বিষয় বেদ্য। সুষুপ্তিতে বেদকও থাকে না, বেদ্যও থাকে না—আত্মা তখন ঢাকা থাকে। আবার তুরীয অবস্থায় আত্মস্বরূপে বেদক জাগ্রত হয়। আত্মা জ্যোতির্ময়। তুরীয় অবস্থায় নিজ আত্মজ্যোতিই প্রকাশমান হয়। তখন কোন বেদ্য থাকে না—শুধুই প্রকাশ। তবে তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত। ইহা একবার একটি ক্ষণের জন্য উদিত হইলে আর কখনো লুপ্ত হয় না। তুরীয় যোগী উহার দিকে উন্মুখ হইলেই উহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে। তবে তুরীয় যোগী মনযুক্ত হইয়াই উহা দর্শন করে অর্থাৎ মনযুক্ত হইয়া নিজ আত্মাকেই নিজে দেখে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রত্যেক অবস্থাতেই তুরীয় যোগী উন্মুখীন হইলে জ্যোতি তাঁহার দৃষ্ট হইবে—ইহাই উন্মুখী অবস্থার আরম্ভ। উন্মুখ হইয়া যতবার এই জ্যোতি দর্শন করা যাইবে, ততবারই মন ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইতে থাকিবে এবং শেষে মন একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তখন মন থাকা

আর না থাকা সমান। ইহাকেই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে মন-শূন্য বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়া বলে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মনশূন্য বা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া স্বরূপ জ্যোতিতে স্থিতি লাভ হয়। ইহাকেই অর্থাৎ মনের অতীত হইয়া স্বরূপে অবস্থানকেই বেদান্তে তুরীয় এবং পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে কৈবল্য বলা হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি প্রথম প্রথম তুরীয় অবস্থায় পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। কিন্তু বারংবার তুরীয়ের স্পর্শ পাইতে পাইতে যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রত্যেক অবস্থায় তুরীয় সমানভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে তুরীয় গ্রাস করে তখন তুরীয়াতীত অবস্থা। তখন জাগ্রৎ-ই বা কি, স্বপ্নই বা কি আর সুষুপ্তিই বা কি—সকল অবস্থায় তুরীয় ভাব থাকে। সর্বাবস্থায় তুরীয় ভাবে থাকাই তুরীয়াতীত। গরম জল আর ঠাণ্ডা জল মিশাইতে মিশাইতে যেমন সমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তুরীয়তে সমতা প্রাপ্ত হইলেই তাহা তুরীয়াতীত। তুরীয়াতীত অবস্থায় মন হইতে আলাদা হইয়া যাওয়ায় যোগী শুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশস্বরূপ শিবভাব প্রাপ্ত হয়। তুরীয়াতীতে জীবই স্বরূপে শিব হইয়া যায় বটে কিন্তু 'আমি যে শিব' এই বোধ জাগ্রত হয় না। কারণ, প্রকৃতি হইতে আলাদা হইয়া যাওয়ায় শক্তিহীন হইয়া পড়ে। শক্তিহীন শিব শবমাত্র। মায়ার ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিৎরূপে কেবলি প্রকাশময় হইয়া অসাড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। তুরীয়াতীতে কর্মের, জন্মমৃত্যুর ও মায়ার অতীত হইয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় ও আনন্দময় শিব বা ব্রহ্ম হওয়া যায় ইহা ঠিক কথা, কিন্তু ইহাতে শক্তির বা স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন হয় না অর্থাৎ আমিই যে শিব বা ব্রহ্ম—এই বোধের (consciousness) উদয় হয় না। এক কথায় তাহার অণু (আণব) মল বিনষ্ট হয় না, সে পশুই থাকিয়া যায়। চিন্ময় প্রকাশরূপী হয় কিন্তু বিমর্শ হয় না, যাহার ফলে 'স্বভাব' খোলে না।

কিন্তু শৈব বা শাক্ত যোগে যোগী কখনো শক্তিহীন হইয়া পড়ে না। শক্তিযুক্ত হইয়াই তাঁহার 'শিবোঽহং' ধারণা হয়। স্পন্দশাস্ত্রানুযায়ী প্রবুদ্ধ অবস্থা পূর্বোক্ত তুরীয় অবস্থার সমান। প্রবুদ্ধ ও তুরীয়ের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তবে প্রবুদ্ধ অবস্থার উদয় হইলে প্রবুদ্ধ যোগীর সাধনার সহিত তুরীয় যোগীর সাধনায় পার্থক্য ঘটে। বৈদিক ধারায় তুরীয় যোগী শিবাবস্থা প্রাপ্তির পথে মনকে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করে। তাই মনকে ক্রমশঃ বর্জন করিতে করিতে পরিশেষে প্রকৃতি হইতে আলাদা হইয়া কেবল চিৎরূপী শিবভাব বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শৈব বা শাক্ত তন্ত্রমতে 'প্রকৃতি' আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। কারণ 'এক' ছাড়া তো দ্বিতীয় বস্তু জগতে নাই। প্রকৃতি বা চিত্ত মায়ার স্পর্শে আসিয়া মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া অপরা প্রকৃতি

বনিয়া যায়। অপবা প্রকৃতিকে পরা-প্রকৃতিতে পরিণত করিয়া উহাকে সাঙ্গীকরণ করিয়া শক্তিযুক্ত শিবভাবে অবস্থিত হওয়াই শৈব বা শাক্ত যোগীর লক্ষ্য। অতএব প্রবুদ্ধ অবস্থায় যে আত্মজ্যোতির দর্শন হয়, সেই জ্যোতিতে চিত্তকে পরিহার নয়, সংলগ্ন করাই প্রবুদ্ধ যোগীব সাধনা। চিত্ত মলিন ও বহির্মুখ, তাই উহা শুদ্ধ জ্যোতির সহিত বেশীক্ষণ লগ্ন থাকিতে পারে না, জ্যোতিই যেন উহাকে ঠেলিযা দেয। এইরূপ বারংবাব চিত্তকে জ্যোতির সহিত লগ্ন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা ধুইয়া মুছিযা যায। চিত্ত স্বচ্ছ হইলেই জ্যোতি উহাকে চিরকালের জন্য আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া নেয় এবং তখন শক্তিযুক্ত প্রবুদ্ধ যোগী আপন প্রকাশরূপী শিবস্বরূপে অচঞ্চল স্থিতি লাভ করে। ইহাকেই সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা বলে যাহাকে তুরীযাতীতেব সহিত তুলনা করা চলে। তবে উভয অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তুরীয়াতীতে প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত চিৎরূপী শিবভাব বা ব্রহ্মভাব মাত্র থাকে আর সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইযা চিৎশক্তি সমন্বিত 'শিবোঽহং'-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠে অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু যে আমিই হইয়াছি এবং সবকিছু যে আমাতেই অবস্থিত এই উপলব্ধি হয। ইহাই শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ ভাব, ইহাই উভয়ের সম্মিলিত রূপ। এই যুগ্ম সত্তাকেই বৌদ্ধেরা নাম দিয়াছে 'যুগনদ্ধ', শাক্তেরা 'যামল' এবং বৈষ্ণবেরা 'যুগল'।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষ হইতে আলাদা হইয়া যায়, কিন্তু লুপ্ত হয় না। কিন্তু বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে মায়া একেবারে নিবৃত্ত হইযা যায় বা মাযাব বিলুপ্তি ঘটে। পাতঞ্জল যোগে প্রকৃতির পৃথক অবস্থান স্বীকৃত, কিন্তু বেদান্তে মাযার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র মতে কোন কারণবশতঃ বা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মুক্ত পুরুষকে যদি পৃথিবীতে আসিতে হয় তবে পরিত্যক্ত নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আসিতে হয। কিন্তু বেদান্তের মতে পুরুষ একবার মুক্ত হইলে বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিলে মায়া চিরকালের জন্য তাহাব নিকট নিবৃত্ত হইয়া যায়, দেহ ধারণের কোন সম্ভাবনাই তাহার থাকে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিযের সহিত মনের এবং মনেব সহিত আত্মার যোগ। (১) আত্মার যখন বহির্মুখ গতি, তখন আত্মা নিজ শক্তি বিকীর্ণ করে। সেই শক্তি গিয়া মনকে ধাক্কা দেয়, মন ইন্দ্রিযকে ধাক্কা দেয, ইন্দ্রিয বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করিযা গ্রহণ করে। এইরূপে গ্রাহ্য বিষয ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিত হইয়া মনে আসে এবং মন ও আত্মার তাদাত্ম্যজনিত বিষয়েব সম্ভোগ আত্মার উপর আরোপিত হয়। ইহা হইতেই দেহাত্মবোধেব উদয হয়, অনাত্মায আত্মবোধ

জাগরিত হয়। আত্মা বহির্মুখ বলিয়া জীব এইরূপে মায়ার মোহে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। ইহাই জীবের সাধারণ অবস্থা। (২) আবার আত্মার শক্তির যখন তটস্থ অবস্থা অর্থাৎ বহির্মুখ নয়, অন্তর্মুখও নয়, তখন আত্মশক্তি বহির্মুখ না হওয়ার ফলে মনকে গিয়া ধাক্কা দেয় না। আত্মশক্তির অভিঘাতে মন স্পন্দিত না হওয়ায় মন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ মনের থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে। নিষ্ক্রিয় মন ইন্দ্রিয়কে চালিত করে না, অতএব ইন্দ্রিয়ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ফলে ইন্দ্রিয়ও বাহ্যবিষয়কে গ্রহণ করে না। এইরূপে পরিত্যক্ত জগৎ জীবের নিকট মিথ্যা হইয়া যায়। এইরূপ যোগীদের নিকট বহির্জগতের কোন সত্তাই নাই। এমন অবস্থায় আত্মা শুদ্ধ প্রকাশময় চিৎ-স্বরূপে অবস্থান করে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে ইহাই কৈবল্যাবস্থা, বৈদান্তিকের জীবন্মুক্তি হইয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। (৩) আবার আত্মশক্তির যখন অন্তর্মুখ গতি, তখন ইন্দ্রিয় ও মন উহার আকর্ষণে অন্তর্মুখ হইয়া আত্মাতে সমাবিষ্ট হয়। তখন স্থূল বাহ্য পদার্থ বলিয়া কিছু থাকে না, সমস্তই আত্মজ্যোতিতে বা জ্ঞানালোকে অবভাসিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানই জ্ঞেয়রূপে ফুটিয়া উঠিয়া জ্ঞানালোকে প্রতিফলিত হয। ইহাই জ্ঞানশক্তি সমন্বিত আত্মা। অন্তর্মুখ অবস্থায় ইন্দ্রিয় সক্রিয়ই থাকে, নিষ্ক্রিয হইযা পড়ে না। সুতরাং তখন যোগী যেদিকে চাহিবে সেদিকেই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে—উপনিষদে যাহাকে বলা হয় "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞাত আত্মাকেই পরমাত্মা আকর্ষণ করে। পরমাত্মার আকর্ষণে জ্ঞানাত্মা তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। তখন যোগীব যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেইদিকেই পরমাত্মাকে দেখে, অনুভব করে, তাঁহার সাড়া শুনিতে পায়। বৈষ্ণব মহাজন এইরূপ উপলব্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বলিযাছেন—"যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে"। অবিমিশ্র ভক্তিপরাযণ বৈষ্ণবগণ আত্মার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ আপন স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞাতা বা অভিজ্ঞা না হইযা প্রাকৃত মনের দ্বারাই অবিমিশ্র ভাবভক্তির সাধনা করেন। প্রত্যেক প্রকার সাধনাই তাহার নিজস্ব অর্থ বহন করে। অতএব বৈষ্ণবদের এই মনোনিবিষ্ট ভাব-সাধনার দ্বারা প্রথম মানস-বৃন্দাবনের সন্ধান পায়—ইহাকে 'imaginary vision' বলা চলে। ভাব-সাধনা তীব্রতা ও গভীরতা লাভ করিলে চিন্ময় বৃন্দাবনে গিয়া পৌঁছায়। সেখানে কৃষ্ণের চিন্ময় মূর্তির অপরোক্ষ সাক্ষাৎ হয এবং নিজ নিজ ভাব অনুসারে রাগানুগা ভক্তিতে সখীর অনুগা হইয়া তাঁহার সেবা কবিযা চিন্ময আনন্দ সম্ভোগ কবে—ইহাকে বলা হয় 'Corporeal vision'। কিন্তু অবিমিশ্র ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ ভগবানের দিব্য নিত্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ বিষ্ণুলোকের যে জ্যোতির্ময় পরিধি আছে, সেই পরিধির মধ্যে স্থান পায়, কিন্তু কেন্দ্রে (centre) যেখানে তাঁহার

অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত নিত্য লীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না। যে রাসলীলায় অসংখ্য গোপী অংশগ্রহণ করে তাঁহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি। অতএব ভগবানের অন্তরঙ্গা না হইলে সেখানে জীব কিরূপে প্রবেশ করিবে? আত্মাই পরমাত্মার স্বাংশ কলা এবং স্বভাবে অভিন্ন, মন তাহা নহে। মনোনিবিষ্ট ভাব-সাধনার প্রভাবে মন বা চিত্ত যতই স্বচ্ছ, শুভ্র ও নির্মল হউক, তথাপি উহা প্রকৃতিরই অংশ, পরমাত্মার নহে। ভগবানের প্রতি চিত্ত যতই ভাবতন্ময় হউক, তথাপি কখনো তাদাত্ম্য লাভ করিবে না। তাদাত্ম্য লাভ করিবার অধিকার একমাত্র আত্মার। তাদাত্ম্য লাভ করিতে হইলে প্রথম আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে হইবে। চিৎ-শক্তি সমন্বিত নিজ প্রকৃত স্বরূপ জীব যেই মুহূর্তে অবগত হইবে, সেই মুহূর্তে পরমাত্মা তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিই সেই দুর্নিবার আকর্ষণ। আত্মার পরমাত্মার দিকে অভিসারের পথেও নানা বিঘ্ন আসে। সেই বিঘ্নগুলি তাঁহার পরীক্ষা। অভিসার যাত্রাই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভক্ত যোগীর প্রকৃত সাধনা। সেই সাধনায় বিঘ্নগুলি অতিক্রম করিযা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই পরমাত্মা তাঁহাকে অন্তরঙ্গা করিয়া লন। তখন যোগীভক্ত ও ভগবান্—শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদে এক হইয়া যান। এই যুগল তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করিযা দিলাম, "প্রাচীনকালে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেমন বলিয়াছেন ঠিক সেই প্রকার যোগমার্গেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় সর্বপ্রথম ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগী ভাবদেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ যোগীর স্বরূপ। সুতবাং যাহাকে ইষ্ট বলা হইয়াছে যোগী স্বয়ং তদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। শিব হইয়া যেমন শিবের উপাসনা করিতে হয় তেমনি নিজে চিদানন্দময়ী প্রকৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়া, জরামরণবর্জিত অখণ্ড তারুণ্যময় অনন্ত উল্লাসে উল্লাসময়ী প্রকৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়া নিজেরই পরমস্বরূপ বা পরমাপ্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, অংশ যেমন অংশীকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করে ঠিক সেই প্রকার ভাবরাজ্যে নিজে অগ্রসর হইতে থাকে। এই গতির অবসান যে বিন্দুতে হয সেইটি মহাভাব অথবা পরমাপ্রকৃতি যাহাই হউক না কেন বস্তুতঃ ইষ্টস্বরূপ অর্থাৎ নিজেরই পরমস্বরূপ অর্থাৎ অংশের যাহা অংশী তাহাই এইখানেই লক্ষ্যের অবসান। ইহাব পব অলক্ষ্য। উহা আনন্দের অতীত ইষ্টের অতীত, সুতরাং কর্মেরও অতীত অথচ উহাতে সবই আছে। প্রথমে আশ্রয়তত্ত্ব এবং অন্তে বিষয়তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পরাবস্থায় আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের মিলনে যে সাম্যরসের উদয় হয় তাহার প্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। প্রচলিত বৈষ্ণব পরিভাষায় বলিতে

গেলে বলা যায় আশ্রয় ভক্ত বা যোগী স্বয়ং এবং বিষয় ভগবান স্বয়ং। উভয়ের মিলন সিদ্ধ হইলে ভক্ত ভগবানের পৃথক্ ভাব থাকে না। উভয়ের পৃথক্ সত্তা বিগলিত হইয়া একটি অখণ্ড রসময় সত্তায় পর্য্যবসিত হয়।"
(অখণ্ড মহাযোগের পথে, পৃঃ ৫৮)।

অবিমিশ্র ভক্তি সাধনায় ভগবানের অন্তরঙ্গ হইতে পারা যায় না, আবার শুধু অবিমিশ্র জ্ঞান সাধনাতেও তাহা সম্ভবপর নয়। একমাত্র শক্তি সাধনায় আত্ম-অভিজ্ঞ হইয়া স্বভাবে প্রেম-ভক্তির আচরণের দ্বারা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে পরিণত হইবার প্রশস্ত উপায়। ইহাতেই ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়।

'ব্রহ্মানন্দ' ও 'ব্রহ্মরস' এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চিত্ত থেকেই ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মরসের উৎপত্তি। ব্রহ্মানন্দ ভাবের অতীত এবং অস্পন্দ। এখানে আনন্দে মগ্নতা আছে কিন্তু বোধ নাই, সুতরাং আস্বাদনও নাই।

চিত্ত হইল ভাবের প্রতিষ্ঠাভূমি। ভাব চিত্তের উপর রেখাপাত (impression) করিতে থাকে। ভাব তিন প্রকার, যথা—সঞ্চারী, ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাব। সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব থেকে রস উৎপন্ন হয় না। ভাব যখন স্থায়ী হয় অর্থাৎ ভাবদেহের বিকাশ হইয়া প্রেম সাধনার আরম্ভ হয় তখন হইতে রসের উৎপত্তির সূত্রপাত। নামসাধনাই রূপাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া ভাব-সাধনার পথে রসে পর্যবসিত হয়। রসের পথই নিত্যলীলার পথ। "নাম হইতে ভাব-সাধনার পথে প্রথমে সদ্গুরু প্রাপ্তি ও মন্ত্রসাধনার অধিকার জন্মে। মন্ত্রসাধনার ফলে দৈহিক উপাদান বিশুদ্ধ হয় ও মন্ত্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবদেহের বিকাশ হয়। তখন স্বভাবের পথ উন্মুক্ত হয় ও বিধি-নিষেধের গণ্ডি কাটিয়া যায় বলিয়া রাগমার্গে ভজনের অধিকার জন্মে। ইহাই প্রকৃত ভাব-সাধনা। ভাব-সাধনার আরম্ভে আশ্রয়-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, তাই রাগসাধনা সম্ভবপর হয়—ইহা ভাবরাজ্যের ব্যাপার। ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হইলে প্রেমের বিকাশ হয়। তখন বিষয়তত্ত্ব প্রকট হয়। ভাব-সাধনা একপ্রকার বিরহের ক্রন্দন, কিন্তু প্রেমসাধনা মিলনের উল্লাস। পরে আশ্রয় ও বিষয় পরস্পর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। এই একসত্তাই রস—এই সমরসতা সিদ্ধাবস্থা বা রসাদ্বৈত। এই মহাস্থিতিতে অনন্ত লীলার স্ফুরণ সম্ভবপর হয়। তখন এক সত্তা অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠে ও নিজের আনন্দ অনন্তকাল, অনন্তভাবে নিজেরই মধ্যে আস্বাদিত হইতে থাকে, কিন্তু স্থিতি থাকে সেই একে।" (তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত পৃঃ ৩৫২)। অতএব ভাবদেহের বিকাশ বিনা রসিক হওয়া যায় না।

এইবার ডাঃ শান্তিপ্রসাদ আত্রেয়ের 'যোগ-মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থের ভূমিকায় ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় হিন্দীতে বিভিন্ন প্রকার যোগ ও যোগপন্থার

যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহার সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়া বিভিন্ন প্রকার 'যোগ' সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার করিব।

(ক) 'প্রাচীনকালে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকার আচার্য ভাস্কর তাঁহার গীতা-ভাষ্যে যে ষড়ঙ্গ যোগের কথা বলিয়াছেন, মনে হয় তাহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই ষড়ঙ্গ যোগ লোকোত্তর সিদ্ধির অসাধারণ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইত। তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ যোগীও প্রকারান্তরে ষড়ঙ্গ যোগকেই অনুসরণ করিতেন এবং মনে করিতেন যে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনার দ্বারাই যোগীর মধ্যে নিরাবরণ প্রকাশের স্ফুরণ সম্ভব। 'সমাজোত্তর' নামক গ্রন্থে এই ছয় যোগাঙ্গের নির্দেশ এই প্রকার পাওয়া যায়—

"প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়মোঽথে ধারণা।
অনুস্মৃতি সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে।।"

ইহার বিশেষ বিবরণ বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থে যথা—গুহ্যসমাজ, কালচক্রোত্তর তন্ত্র, সেকোদ্দেশ ও উহার টীকা (তিলোপা ও নড়োপা কৃত) ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

'বহৃতি কল্যাণায় বহৃতি পাপায় চ'। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক সাধকের অন্তঃস্থলে একটি ঊর্ধ্ব স্রোত বিদ্যমান আছে, আছে ঠিকই, তবে উহা রুদ্ধ হইয়া আছে। এই ঊর্ধ্ব স্রোতের জাগরণ ব্যতীত ইহা কার্যকরী হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিশ্লেষণ পাতঞ্জল যোগে নাই, কিন্তু বৌদ্ধদের পালি সাহিত্যে ও আগমে আছে। এইজন্য প্রাচীন বৌদ্ধগণ 'কামচিত্ত' এবং 'ধ্যানচিত্তে' ভেদ স্বীকার করিতেন। ধ্যানচিত্ত লৌকিক অথবা লোকোত্তর দুই-ই হইতে পারে। রূপ এবং আরূপ্য ধাতু আলম্বন হইলে লৌকিক ধ্যানচিত্ত হয়। কিন্তু আলম্বন যদি নির্বাণ হয় তো ঐ চিত্ত লোকোত্তর হয়। কামধাতুর নিম্নতর চিত্তও উপদেশ এবং তপস্যার প্রভাবে কিম্বা 'উপাচার' সমাধির মাধ্যমে উচ্চতর ধ্যানচিত্তে পরিণত হইতে পারে। স্থির ও অচঞ্চল চিত্ত হইলে উপচার ধ্যান নিষ্পন্ন হইতে পারে। নিরন্তর উপচার ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে জ্যোতির্ময় শুভ্র প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার প্রভাবে চিত্তের পাঁচ প্রকার আবরণ ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার পর সমাধি অবস্থার উদয় হয়। ইহাই উপচার সমাধি। এই সময় কামচিত্ত ধ্যানচিত্তে পরিণত হইয়া যায়, কিন্তু ধ্যানচিত্ত হইলেও উহা কামধাতুর ঊর্ধ্বে ততদিন যাইতে পারে না, যতদিন না পাঁচ আবরণ হইতে মুক্ত হয়। আবার পাঁচ আবরণ হইতে মুক্ত হইলেও আরূপ্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে যাইতে পারে না অথবা সাকার হইতে নিরাকারে প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ লোকচিত্ত লোকোত্তর

হইতে পারে না। আসল কথা হইল যে, যে পৃথক জন সে পৃথক জনই থাকিয়া যায়, আর্য হইতে পারে না অর্থাৎ নির্বাণ লাভের অধিকারী হয় না।

পাতঞ্জল যোগ-সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আরূঢ় হইবার সময়ে চিৎ-অচিৎ গ্রন্থিভেদ হইতে শুরু হয় এবং বিবেকখ্যাতির মার্গ খুলিয়া যায়। বিবেক মার্গে চলিতে চলিতে পুরুষখ্যাতি এবং তজ্জনিত গুণ-বিতৃষ্ণারূপ পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। পরিশেষে উহারও নিরোধ হইয়া ধর্মমেঘ সমাধি প্রাপ্তি ও কেবল্য লাভ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনায় প্রসিদ্ধ আছে যে নির্বাণমার্গে যাইতে হইলেও 'উপচার' সমাধির মাধ্যমেই যাইতে হইবে। কথিত আছে যে ভবাঙ্গ স্রোতের সূত্র উচ্ছেদ হইবার পর কামধাতুবিশিষ্ট কুশল চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য ক্ষণিক পরিণাম অনুভব করে। এক একটি ক্ষণের পরিণাম 'জবন' নামে প্রসিদ্ধ। তদনুসারে অন্তিম ক্ষণের নাম 'গোত্রমূ জবন'। ইহার আলম্বন হইল নির্বাণ। পরিকর্ম ও উপচার অবস্থা পূর্বে ছিল, এখন লৌকিক চেতনা হইতে লোকোত্তর চেতনার বিকাশ হয়। যে প্রথমে পৃথক জন ছিল, সে-ই এখন আর্যরূপে পরিণত হয। গোত্রসূর পরবর্তী ক্ষণের নাম 'অর্পণ' ক্ষণ। এই ক্ষণ চেতনার পরিবর্তনের সূচক। যথার্থ conversion বা transformation হইল ইহারই স্বরূপ। পাতঞ্জল যোগে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় ভূমির সন্ধিক্ষণ অর্থাৎ অস্মিতা ভূমির অন্তিম ক্ষণে ইহার (চেতনার পরিবর্তনের) আরম্ভ হয়। অবিদ্যাকার্যরূপী অস্মিতার দ্বার দিয়াই জীবকে সংসারে ভোগের জন্য প্রবেশ করিতে হয়। আবার ভোগভূমি সংসার হইতে অপবর্গের জন্য ঐ অস্মিতার দ্বার দিয়াই নির্গমও হয়। ঐ সময় বিবেকখ্যাতির সূচনা হয়। যে পরিমাণে অস্মিতা বিনষ্ট হইতে থাকে, সেই পরিমাণে চিৎ-রূপ পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান নিকটবর্তী হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'নির্মাণ চিত্তে'র স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে সৃষ্টির আদিকালে আদি বিদ্বান্ ভগবান্ মহর্ষি কপিলদেব নির্মাণ চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসু আসুরিকে তন্ত্রের অর্থাৎ ষষ্ঠি তন্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। জন্ম, ঔষধি, তপস্যা অথবা ধ্যান বা সমাধি হইতে সিদ্ধ অবস্থার উদয় হইতে পারে, অস্মিতা হইতে নির্মাণ চিত্তেরও উদয় হইতে পারে। পূর্বোক্ত কারণ অনুসারে চিত্ত নানা প্রকারের হইতে পারে, পরন্তু যদিও সকল চিত্তই অস্মিতা হইতেই উৎপন্ন হয এবং সকল চিত্তই নির্মাণ চিত্তরূপই হয়, তথাপি সকল চিত্ত একপ্রকার নহে। কারণ সকল চিত্তে কর্মাশয় থাকে। একমাত্র সমাধিজাত নির্মাণ চিত্তে কর্মাশয় থাকে না।

এইরূপ চিত্তই জ্ঞানোপদেশ দান করিবার উপযোগী আধার। মহর্ষি কপিলদেব দ্বারা পরিগৃহিত চিত্ত ঐ প্রকারই ছিল—ইহাই মানিতে হয়।

নির্মাণ চিত্ত এবং নির্মাণ কায় অভিন্ন। বুদ্ধদেবের নির্মাণ কায় পরিগ্রহণের বিবরণ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, সম্প্রদায় প্রবর্তক পরমেশ্বর স্বয়ং নির্মাণকায় পরিগ্রহ করিয়া তৎ তৎ সম্প্রদায় বা জ্ঞানধারার প্রবর্তন করেন। তন্ত্রেও সৃষ্টির আদিতে জ্ঞানোপদেশের জন্য পরমেশ্বরের গুরু ও শিষ্যরূপে দেহদ্বয় পরিগ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গ্রন্থেও এই প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

(খ) ভারতীয় সাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যোগের স্থান সর্বোচ্চ। যোগের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সাধনাই সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে মনুষ্য-চিত্ত স্বভাবতই বহির্মুখ। এই বহির্মুখ চিত্তকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য যে সক্রিয় প্রচেষ্টা তাহাই যোগের প্রাথমিক রূপ। কর্মমার্গের দ্বারাই হোক, জ্ঞানমার্গের দ্বারাই হোক বা ভক্তিমার্গের দ্বারাই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারাই হোক চিত্তের একাগ্রতা সাধন আবশ্যক। একাগ্রতা যতদিন না সম্পাদিত হয়, ততদিন সফলতার আশা দুরাশামাত্র। বহিরঙ্গ সাধন প্রণালীর সার্থকতা নির্ভর করে চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উপর। ঐ সময় একাগ্রতার ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে বাহ্য সত্তার বোধ ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকে। পরিশেষে নিজ সত্তার বোধই কেবলমাত্র থাকে। এই বোধের যে প্রকাশ হয় তাহাতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিভাসমান হইতে থাকে। অস্মিতা সমাধিতে ইহার পূর্ণ পরিণতি হয়।

অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির সহিত যুক্ত পুরুষের যে অবিবেক চলিয়া আসিতেছে, সেই অবিবেক হইতে সর্বপ্রথম অস্মিতার আবির্ভাব হয়। উহার পরে রাগ, দ্বেষ আদি ক্লেশসমূহের আবির্ভাব হয়। এই ক্লেশসমূহের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্ত বদ্ধ পুরুষের নিত্য সাক্ষী হয়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তে গুণসমূহের প্রাধান্য ভেদে এই চিত্ত কখন মূঢ়, কখন ক্ষিপ্ত এবং কখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এইরূপ স্থিতি সংসারী জীবেরই হইয়া থাকে। মূঢ় অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, ক্ষিপ্ত অবস্থায় রজোগুণের এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রজের প্রাধান্য থাকিলেও কদাচিৎ সত্ত্বগুণের স্ফূর্তি হয়। যোগীর চিত্ত দুই প্রকার—(১) একাগ্র চিত্ত, আর (২) নিরুদ্ধ চিত্ত। একাগ্র চিত্তে সত্ত্ব গুণের উৎকর্ষ থাকে। সংসারী চিত্ত মূঢ়াদি বৃত্তি বহুল। কিন্তু যোগীর একাগ্র চিত্তে একমুখী বৃত্তি থাকে, এক আলম্বন ভাব থাকে যাহার প্রভাবে যোগীর চিত্তে প্রজ্ঞার উদয় হয়। অতএব সব একাগ্র চিত্তই প্রাজ্ঞ চিত্ত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ভূমির চিত্ত আলম্বন

ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। গ্রাহ্য (স্থূল এবং সূক্ষ্ম), গ্রহণ এবং গ্রহীতা চিত্তের আলম্বন হইতে পারে। তদনুসার বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতার অনুগম হয়। প্রজ্ঞা সর্বত্রই থাকে, পরন্তু গ্রাহ্য ভূমিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য থাকার ফলে সবিকল্পক দশার উদয় হয়। আর স্মৃতি-পরিশুদ্ধির প্রভাবে সাঙ্কর্য দূরীভূত হইবার পর ঐ ভূমি নির্বিকল্পক দশা নামে অভিহিত হয়। গ্রহণ এবং গ্রহীতার স্থলে বিকল্পের প্রশ্নই উঠে না।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সমাধি ও যোগ সমানার্থক শব্দ নহে। সমাধিমাত্রই যোগ নহে, কিন্তু যোগমাত্রই সমাধি তাহাতে সন্দেহ নাই। চিত্তের বৃত্তি যে কারণেই হোক একাগ্র হইলেই তাহা সমাধিতে পরিণত হয়। এমন কি একাগ্র না হইয়া নিরুদ্ধও যদি হয় তাহা হইলেও উহা সমাধি পদবাচ্য, কিন্তু উহা যোগ নহে। কারণ, ভূমি একাগ্র না হইলে সমাধি যোগপদবাচ্য হয় না। যখন একাগ্র ভূমিতে বৃত্তি একাগ্রতা লাভ করে তখন ঐ একাগ্রবৃত্তিই যোগরূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। যোগরূপী সমাধিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে প্রসিদ্ধ। এই একাগ্রভূমিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। প্রজ্ঞার প্রভাবে চিত্তনিহিত অনাদিকালের সঞ্চিত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান কাটিয়া যায়, তবে উহা ক্রমশঃ সংঘটিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রজ্ঞাই জ্যোতিঃস্বরূপ। অস্মিতা ভূমিতে ইহার চরম বিকাশ হয়। বিভূতিসমূহেরও চরম প্রকাশ ঐ ভূমিতে হয়। ভূত সমূহের জয় হইতে লভ্য সিদ্ধিসমূহ অষ্টসিদ্ধি বা কায়-সম্পদ্ নামে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয় সকলের জয় হইতে 'মধুপ্রতীক' সিদ্ধিসমূহের উদয় হয়। প্রধানের জয় হইতে 'বিশোকা' সিদ্ধির উদয় হয়। ঐ সময় সর্বগত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব আয়ত্ত হইয়া যায়। এইসব উচ্চ কোটির সিদ্ধিসমূহ সিদ্ধি হইবার পরও নিরোধ দৃষ্টিতে উহারা হেয় বলিয়া গণ্য হয়। অস্মিতা ভূমিতেও চিৎ-অচিৎ গ্রন্থির ভেদ হয় না। বস্তুতঃ অস্মিতার দ্বার দিয়া সংসারে প্রবেশ হয় এবং সংসার হইতে নির্গমও ঐ দ্বার দিয়া হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিভূতিসমূহের প্রতি বা ভোগ ঐশ্বর্যের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত না বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবেকমার্গে প্রবেশ হয় না। ভোগ বিতৃষ্ণারূপ অপর বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিবেকখ্যাতির উদয় হয় না।

যখন গ্রন্থির উন্মোচন হইতে আরম্ভ হয় এবং বিবেকখ্যাতির বিকাশ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে নিরোধ মার্গে অগ্রগতি হইতেছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একাগ্রবৃত্তিও বৃত্তি, উহার নিরোধ হওয়া আবশ্যক। বিবেকখ্যাতিব আলোকে সত্য মার্গ ক্রমশঃ অধিক স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে থাকে।

সমগ্র বিভূতিরাজ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিবেকী পুরুষ কৈবল্যের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাই বাস্তবিকপক্ষে নিবৃত্তি মার্গ। এই মার্গে চলিতে চলিতে পুরুষ-খ্যাতির উদয় হয় অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। মনে রাখিতে হইবে এই আত্মা বিশুদ্ধ আত্মা নহে, গুণযুক্ত আত্মা। ঐ সময় আত্মা ও গুণ পরস্পর সংযুক্ত ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহাই পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল রূপের দর্শন। গুণযুক্ত আত্মার দর্শনের ফলে একদিকে গুণ-বিতৃষ্ণারূপ পর বৈরাগ্যের উদয় হয়, অপরদিকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতির যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ আত্মা দ্রষ্টামাত্র, দৃশ্য নহে। অতএব শুদ্ধ আত্মার দর্শন ঐ প্রকারে হইতে পারে না। এদিকে গুণও স্বরূপতঃ অব্যক্ত হওয়ার দরুণ দর্শনযোগ্য নহে।

গুণ পরিণামী, পরন্তু আত্মা অপরিনামী। যখন দর্শন হয়, তখন একসঙ্গে উভয়েরই দর্শন হয়। ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। গুণ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-বিতৃষ্ণার উদয় হয়। ইহাকেই বলে পর বৈরাগ্য। ইহার পর বিবেকখ্যাতি পূর্ণ হয়। অবশেষে উহার প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মায়। তখন সমস্ত সংসার বীজ ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার ফলে 'ধর্মমেধ' সমাধির আবির্ভাব হয়। এই সময় ক্লেশ কর্ম নির্মূল হইয়া যায় এবং গুণের পরিণাম-ক্রম সমাপ্ত হইয়া যায। ভোগ ও অপবর্গ—এই দুই পুরুষার্থ সম্পাদনেই চিত্তের অধিকার। ঐ সময় অধিকার সমাপ্ত হইয়া যাওয়ায় চিত্তও আর ব্যক্ত থাকে না, মূলা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। চিদাত্মক পুরুষ তখন আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই কৈবল্য।

চিত্ত যে পর্যন্ত থাকে, সেই পর্যন্ত কৈবল্য হইতে পারে না। চিত্ত একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 'অপর যোগ' সম্পন্ন হয়, যাহার পারিভাষিক নাম হইল সম্প্রজ্ঞাত। কিন্তু যখন চিত্ত নিরুদ্ধ ভূমিতে থাকে তখন 'পর যোগ' ভূমির উদয় হয়। ইহারই নামান্তর হইল 'উপায় প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'। এই অবস্থায় চিত্ত সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। উহাতে বৃত্তি তো থাকে না, পরন্তু বৃত্তি সমূহের উদয়ের স্বরূপ-যোগ্যতাও থাকে। ঐ সময় চিত্তে একাগ্রতা পরিণাম থাকে না, কেবল নিরোধ পরিণাম থাকে। ইহাই আত্মার দ্রষ্টা অবস্থা।

(গ) কিন্তু এই স্থিতিও আত্মার পরম স্থিতি নহে। যে যোগ হইতে এইরূপ স্থিতি লাভ হয়, সেই যোগও যোগের পরম স্বরূপ নয়। এই অবস্থা অচিৎ হইতে বিবিক্ত (মুক্ত) চিৎ-এর প্রকাশমাত্র। চিৎ তত্ত্বই আত্মা। প্রকৃতি, মায়া এমন কি মহামায়া হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া উহার নির্মলতম স্বরূপের সাক্ষাৎকার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাও আত্মসাক্ষাৎকার নহে। কারণ ঐ সময়েও যথার্থ পরমেশ্বর-রূপের উন্মেষ হয় না। কারণ, আণব

মল রূপ সঙ্কোচ আত্মাতে যে পর্যন্ত থাকিবে সেই পর্যন্ত আত্মসুলভ স্বাতন্ত্র্যের উন্মীলনের আশা নাই। জীবাত্মা অচিৎ ভাব হইতে রহিত হইয়া বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইলেও আণব মল রূপ সঙ্কোচ থাকার দরুণ তখনও তাহার শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না এবং আত্মার পরম ঐশ্বর্যেরও বিকাশ হয় না। আসল কথা হইল এই যে আত্মার পরাশক্তি ঐ সময়েও এক প্রকার সুপ্তই থাকে। ঐ শক্তির জাগরণ হইবার পর সমগ্র বিশ্ব আত্মার স্বশক্তির স্ফুরণরূপে প্রতীত হইতে থাকে। ঐ সময় বিশ্বও শক্তিরূপ হওয়ার ফলে শিবরূপী আত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীতি হয়। ঐ সময়েই উপলব্ধি হয় যে আত্মা দ্রষ্টাই শুধু নয়, কর্তাও। পাণিনির সূত্রে আছে, "স্বতন্ত্রঃ কর্তা"—এই স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব। ইহাই আত্মার পরমেশ্বরত্ব। ইহা আত্মার আগন্তুক ধর্ম নয়—কোন উপাধির সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত ধর্ম নয়। সাংখ্যে পুরুষের ঈশ্বরত্ব এবং বেদান্তে ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব দুইই ঔপাধিক। চিৎস্বরূপে চিৎশক্তির উন্মেষ না হইলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরত্ব লাভ হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরত্ব হইল আত্মার নিজ স্বভাব।

এই কারণে যোগের পূর্ণতা তখনই হইতে পারে যখন আত্মা স্বীয় ঈশ্বররূপকে পরামর্শন করিতে সক্ষম হয়। শাক্ত ও শৈব অদ্বৈত আগমে এই বিষয়ে বিস্তৃত পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। আত্মা অখণ্ড প্রকাশস্বরূপ। উহার স্বীয় শক্তি এই প্রকাশকে অহংরূপে পরামর্শন করে। দৃষ্টিভেদ হেতু এই পরাশক্তিকে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে; যথা—স্বাতন্ত্র্য, পরাবাক্, পূর্ণ অহন্তা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। শক্তিহীন প্রকাশ অপ্রকাশতুল্য এবং প্রকাশহীন শক্তি জড় বা অচিৎরূপা। শিবহীন শক্তি বা শক্তিহীন শিব হইতে পারে না। ভর্তৃহরি নিজ গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন—

"বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সাহি প্রত্যবমর্শিনী॥"

ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অবিদ্যার আধারে প্রকাশ যখন শক্তিহীন হয় এবং শক্তিও প্রকাশহীন হয়, তখন শিব এবং শক্তি এই দুই পৃথক তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই পরস্পর ভিন্ন উভয় স্বরূপে সঙ্কোচ থাকে। প্রকাশ তখন স্বপ্রকাশ নহে এবং শক্তিও ঐ সময় চিদ্রূপ থাকে না। ইহাই আণব মলের দ্বিবিধ আদি সঙ্কোচ। পূর্ণ পরমপদ হইতে এই সঙ্কোচের দ্বারাই বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হয়। যাঁহারা বিবেকের পথে চলেন তাঁহাদের বিবেকখ্যাতির পূর্ণতার পর কৈবল্যে স্থিতি হয়। যদিও এই অবস্থাতে মায়া বা কর্ম থাকে না, তথাপি আত্মার সঙ্কোচরূপ মল নিবৃত্ত হয় না এবং আত্মাতে চিৎশক্তির উন্মেষও হয় না। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা শুদ্ধ বিদ্যা লাভ করিয়া শুদ্ধ অধ্বাতে গুপ্তভাবে অগ্রসর হন। 'গুপ্তভাবে'

শব্দের প্রয়োগ এই অর্থে করা হইয়াছে যে কর্মফলের ভোগ পূর্ণ না হওয়ার কারণে তাঁহাদের মায়িক শরীরের পাত হয় না এবং তাঁহাদের প্রারব্ধজন্য ফলভোগ যথাবিধি করিতে হয়। দীক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়, দীক্ষার পর উপাসনাদি যোগক্রিয়ার দ্বারা বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় যাহার দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বভাবসিদ্ধ শিবত্বের অনুভব করিতে থাকেন। ইহা এক প্রকার জীবন্মুক্ত অবস্থা। মৃত্যুর সঙ্গে প্রারব্ধের ভোগ শেষ হইবার পর পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হয়। 'শিবোঽহম্' জ্ঞান পূর্বেই হইয়াছিল, এখন শিব-স্বরূপে স্থিতি হয়।

এই সব যোগী বিবেকজ্ঞানের পথে চলেন না, কিন্তু শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে তাঁহাদের বিবেক নিষ্পত্তি হইয়া যায়। শুদ্ধ বিদ্যার মার্গ সমগ্র মহামায়া পর্যন্ত বিস্তৃত। কেবল বিবেক জ্ঞানের প্রভাবে এই মার্গের পথিক হওয়া যাইতে পারে না। ইহা যথার্থ যোগমার্গ। অধিকার, ভোগ এবং লয় বা বিশ্রান্তি—ইহারা এই মার্গের তিনটি স্তর বা ক্রম। বিশ্ব মানবের উদ্ধার রূপ শুদ্ধ বাসনা যদি না থাকে তাহা হইলে আত্মার জাগরণের ক্রম থাকে না এবং অধিকার বাসনা যদি নিবৃত্ত হইয়া যায় তবে বিশ্ব মানবকে মুক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে না। ভোগ-বাসনার অভাবে শুদ্ধ ভোগ লাভ হয় না। বৌদ্ধ যোগাচার্যদের অক্লিষ্ট অজ্ঞান যে প্রকারের হয়, উক্ত শুদ্ধ বাসনা প্রায় ঐ প্রকারের। ক্লিষ্ট অজ্ঞান নিবৃত্ত হইবার পর যেরূপ বোধিসত্ত্ব ভূমি লাভ হয় এবং উহাতে সঞ্চরণ হয়, ঐরূপই অনাত্মায় আত্মবোধ রূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবার পর এবং আরও পরে শুদ্ধ বিদ্যারূপ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান গুরুকৃপায় প্রকট হইবার পর আত্মাতে অনাত্মবোধরূপ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। ক্রমশঃ ঈশ্বরদশা এবং সদাশিব দশা অতিক্রম করিয়া আত্মা শিবশক্তি-সামরস্যপূর্ণ আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করে এবং উহাতে স্থিতিলাভও করে। পূর্ণ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর ভেদ থাকে না। ঐ সময় আত্মা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক রূপে এবং বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতীত রূপে নিত্য অবস্থান করেন তাহা অনুভব হয়।

আত্মার জাগরণের একটি ক্রম আছে। সেই ক্রম অনুসারে প্রবুদ্ধকল্প, প্রবুদ্ধ, সুপ্রবুদ্ধকল্প ও সুপ্রবুদ্ধ—এই অবস্থাগুলির চিন্তা করিতে হইবে। যতদিন আত্মাতে ভেদজ্ঞান প্রবল থাকে ততদিন ঐ আত্মাকে সংসারী বলা হয়। অভেদ জ্ঞানের উন্মেষ হইবার পরই জাগরণের সূচনা হয়। যখন অভেদ জ্ঞান পূর্ণ হইয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে সুপ্রবুদ্ধ বলে।

আত্মার জাগরণের ক্রম অনুধাবনই যোগ। আত্মা যে পর্যন্ত সুপ্ত থাকে, সেই পর্যন্ত উহাতে স্ব-বিমর্শ থাকে না। এইজন্য দেহেতে অভিমান বিদ্যমান

থাকে। এই দেহাভিমান থাকার দরুণ আত্মা নিজের বিশ্বশরীর অথবা বিশ্বরূপ অনুভব করিতে পারে না এবং উহার জাগরণও হইতে পারে না। আসল কথা এই যে বিশুদ্ধ আত্মা হইল অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং অশুদ্ধ আত্মা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহার নামান্তর গ্রাহক। বিশুদ্ধ আত্মাই পরমশিব। অনাশ্রিত তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ছত্রিশ তত্ত্বই উহার শরীর। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য আর গ্রাহক চৈতন্য ঠিক এক প্রকার নহে। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ আত্মা বিশেষরূপ গ্রাহ্যের দিকে উন্মুখ থাকে না। ঐ প্রকার উন্মুখতা যাহার হয় তাহার নাম গ্রাহক চৈতন্য। উহার চৈতন্য অবচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ গ্রাহ্যের দ্বারাই এই অবচ্ছেদ হয়। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপী আত্মার প্রতিনিয়ত 'বিশেষরূপে'র ভান হয় না। উহার 'অখণ্ড সামান্য সত্তা'র ভান হয়। এই 'সামান্য সত্তা'র অনুসন্ধানই 'স্বভাব' বলিযা কথিত হয়। ইহারই নাম সর্বত্র বহুর ভিতর একেকে অনুসন্ধান। আগম সাধনার দ্বারাই যে কোন আত্মা নিজের গ্রাহকত্ব বা প্রতিনিয়ত খণ্ডিত দর্শনাদি হইতে মুক্ত হইয়া অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ও বিশ্বশরীর হয়। যদি শিবাদি হইতে ক্ষিতি পর্যন্ত সব বস্তুতে নিত্য সিদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা অনুসন্ধান করা যায় তবে সাধারণ আত্মাও নিজেকে বিশ্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে।

শুদ্ধ আত্মা অথবা শিবের অভিনিবেশ বিশ্বের সর্বত্র নিরন্তর হইতেছে। কারণ শিব গ্রাহক অথবা অবচ্ছিন্ন প্রকাশরূপ নহে। এই অহন্তা বিন্দু হইতে শরীর পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপক। বিন্দু হইল সূক্ষ্মা অহংপ্রতীতি যাহা গ্রাহক, গ্রহণ আদি প্রতীতি বিশেষের উদয়ের পর হয়। অভিমান অধ্যবসায় আদি অন্তঃকরণের ক্ষোভক সত্তার নাম প্রাণ। বুদ্ধি তথা অহঙ্কারের নামান্তর শক্তি। ইহাদের পরে মন, ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহ যাহাদেব তাৎপর্য সুস্পষ্ট। বিন্দু হইতে শরীর পর্যন্ত ছয়কে আবিষ্ট করিয়া যে অহন্তা ব্যাপক রূপে বিদ্যমান আছে তাহার ধারণা হওয়া আবশ্যক। ভাবনার দ্বারা অহন্তার বিকাশ হয়। ইহাই কর্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব, ইহাই স্বাতন্ত্র্য বা চিৎ-স্বরূপতা। সিদ্ধিমাত্রই অহন্তাময়। প্রয়োজন একমাত্র দৃঢ় প্রত্যভিজ্ঞা।

(ঘ) জাগরণের ক্রম—এইবার জাগরণের ক্রমের বিষয়ে কিছু বিচার করা যাইতেছে। প্রমাতার (আত্মার) বিভিন্ন প্রকার প্রতীতি হয়। সুপ্ত আত্মার লক্ষণ এই যে ইহার দৃষ্টিতে গ্রাহক হয় চিদাত্মক এবং গ্রাহ্য ইহা হইতে ভিন্ন অচিদাত্মক। সমগ্র বিশ্ব অখণ্ড সত্তা বা প্রকাশের অন্তঃস্থিত, কারণ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তথাপি সুপ্ত আত্মা মনে করে যে এই বিশ্ব তাহা হইতে বহির্ভূত। এইরূপ আত্মা সংসারী। পরন্তু যে আত্মা সুপ্ত নয় আবার ঠিকমত জাগ্রতও নয়, তাহাকে জাগ্রৎকল্প বলে। শুদ্ধ বিদ্যাপ্রাপ্ত প্রমাতা

(আত্মা) যাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইয়াছে, ঐরূপ প্রমাতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রমাতা (আত্মা) সুপ্ত নহে, কারণ তাহার মধ্যে ভেদ জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ অভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন প্রতীতি হয় না। তথাপিও তাহার জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয় নাই। ভব বা সংসার না থাকিলেও উহার সংস্কার থাকে। এখন পর্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিব অবস্থা। অবিবেক এখনও তাহার মধ্যে বিদ্যমান। ইহার পরে বিবেকখ্যাতির উদয় হয়। তাহারও পরে শুদ্ধ চিৎ-এর প্রকাশ হয়। এই সিদ্ধান্ত পাতঞ্জল যোগ সম্প্রদায়ের। এই অবস্থাকে স্বপ্নবৎ বলা যাইতে পারে। ইহা সুপ্তিও নয়, আবার প্রবোধও ঠিক ঠিক নয়। প্রবুদ্ধ হইবার পর ভেদ সংস্কার থাকে না। এই প্রকার যোগীদের ধর্মাধর্ম বা কর্মের ক্ষয় হইয়া যায়। এইজন্য দৃষ্টি বিশেষে তাঁহাদের মুক্তও বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদেরও মুক্ত বলা উচিৎ নয়। আগমের পরিভাষায় এই সব আত্মা রুদ্রাণু নামে পরিচিত। ইঁহারা পশুকোটিতেই থাকে।

ইহার পর জাগ্রৎ বা প্রবুদ্ধ প্রমাতার (আত্মার) প্রতীতি সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। ইহাতে ভেদ সংস্কার এবং অভেদ সংস্কার দুইই থাকে। প্রবুদ্ধ আত্মা যোগীদের জড় বস্তুর প্রতীতি ইদংরূপে হয়। এইসব প্রবুদ্ধ-আত্মা যোগীদের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব স্বশরীর-কল্প প্রতীত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ঈশ্বর অবস্থার নামান্তর যাহার মধ্যে দুই বিভিন্ন রূপের প্রতীতি যুগপৎ থাকে।

ইহার পর সুপ্রবুদ্ধকল্প আত্মার প্রতীতির বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। এইরূপ আত্মাতে ইদং প্রতীতির বিষয় বেদ্য অহমাত্মক 'স্বরূপে' নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহা অহন্তা-আচ্ছাদিত অস্ফুট ইদন্তার অবস্থা। শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইহার নাম সদাশিব অবস্থা। ইহাও পূর্ণ আত্মার স্থিতি নহে।

ইহার পরে পূর্ণ অবস্থার উদয় হয়। পূর্ণ হইলেও ইহা অস্থায়ী অবস্থা। এই অবস্থায় নিমেষ ও উন্মেষ দুইই থাকে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গসমূহের উঠা (উন্মেষ) এবং পড়া (নিমেষ) দুইই থাকে। প্রকাশ সর্বদাই অবিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু শিবাদি হইতে বিশ্ব পর্যন্ত কদাচিৎ ভান হয় এবং কদাচিৎ ভান হয় না। যখন ভান হয়, তখন প্রকাশাত্মক রূপেই উহার উন্মেষ হয় এবং যখন ভান হয় না, তখনও প্রকাশাত্মক স্বরূপেই উহার নিমেষ হয়।

সর্বশেষে স্থায়ী পূর্ণাবস্থার উদয় হয়। যতক্ষণ পূর্বের উন্মেষ-নিমেষযুক্ত পূর্ণত্ব ছিল, ততক্ষণ মনও ছিল এবং মন থাকার জন্য উন্মেষ-নিমেষ উভয়ই সম্ভব ছিল। স্থায়ী পূর্ণাবস্থায় মন থাকে না, কারণ উহা উন্মনী অবস্থা। ইহারই প্রভাবে পূর্ণত্ব সিদ্ধির উদয় হয়। ইহাই সিদ্ধ সুপ্রবুদ্ধ স্থিতি। এই প্রকার

যোগীদের ইচ্ছামাত্রেই ইচ্ছানুরূপ বিভূতিসমূহের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় আত্মার জাগরণ পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

(ঙ) সিদ্ধি বিজ্ঞান—এখন সিদ্ধি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। সিদ্ধি অর্থমূলক ও তত্ত্বমূলক ভেদে দুই প্রকারের হইতে পারে। তত্ত্বমূলক সিদ্ধিও অপরা ও পরা ভেদে দুই প্রকার। প্রত্যেক অর্থমূলক সিদ্ধির পৃথক্ পৃথক্ কর্ম আছে। ইহাকে Cosmic function বলা যাইতে পারে। ইহারা নিত্য সিদ্ধ। যোগী যে সময়ে যে অর্থে আত্ম-ভাবনা করেন, ঐ সময় তিনি ঐ অর্থের রূপে স্বয়ং-ই অবস্থিত হন এবং সেই সেই কর্ম নির্বাহ করেন, যেমন—সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। প্রত্যেকের মধ্যে যে অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে তাহা এক ক্ষণের মধ্যে উপলব্ধি-গোচর হইয়া যায়। যে দেবতা যে অর্থের সম্পাদন করে, ইচ্ছা করিবার পর ঐ অর্থ ঐ যোগীর মধ্যে অহংকার ধারণ করিবার পর উপলব্ধ হইতে পারে। একটি ক্ষণের ভিতর অর্থের স্বতঃই আগম হইয়া যায়। ইহারই নাম অর্থমূলক সিদ্ধি।

এখন তত্ত্বমূলক্ সিদ্ধির কথা বলা যাইতেছে। পৃথিবী হইতে লইয়া শিবতত্ত্ব পর্যন্ত অহন্তার অভিনিবেশমাত্রেই যোগী সেই সেই সিদ্ধিসমূহ প্রাপ্ত হয়। মায়া পর্যন্ত ৩১ (একত্রিশ) তত্ত্ব হইতে যে সমস্ত সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, ঐ সমস্ত সিদ্ধির নাম হইল 'গুহান্ত সিদ্ধি'। গুহা—মায়া। তত্ত্বসিদ্ধির মধ্যে ইহা অপরা সিদ্ধি। শুদ্ধ বিদ্যা আদি সিদ্ধিসমূহ পরা সিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ।

পরাসিদ্ধির উপরও দুই মহাসিদ্ধির স্থান আছে। প্রথম সিদ্ধি হইল 'সকলিকরণ', আর দ্বিতীয় সিদ্ধি—'শিবত্বলাভ'। সকলিকরণ কোন কোন অংশে পূর্ণ অভিষেকের স্থলাভিষিক্ত। প্রথমে কালাগ্নি সদৃশ তীব্র জ্বালায় ষড-অধ্বার পাশ জ্বলিয়া যায়। ইহা যোগীর স্বশরীরেই হয়। ইহার প্রভাবে শরীর জ্বালা করিতে থাকে। তাহার পর স্নিগ্ধ শীতল অমৃত ধারায় সমগ্র সত্তা প্লাবিত হয়। ইষ্ট দেবতার দর্শন এই সময়ে হয়, এবং তিনি শোধিত অধ্বা বা সমগ্র বিশ্বের অনুগ্রাহক হইয়া যান। যোগী এই অভিষেকের দ্বারা জগদ্গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরন্তু ইহা পূর্ণ অবস্থার অন্তর্গত হইলেও ইহা অপূর্ণ স্থিতি। ইহার পর পূর্ণ খ্যাতির উদয় হয় এবং শিবত্ব অবস্থার লাভ হয়। ইহা পরমশিবের অবস্থা। ঐ সময় ইচ্ছানুরূপ ভুবনাদিব সৃষ্টি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং পঞ্চকৃত্যকারিত্বও অধিগত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে অমিতাভ বুদ্ধ দুঃখী জীবদের জন্য সুখাবতী ভুবন রচনা করেন। ইহাও এই পরমশিব অবস্থার ব্যাপার মাত্র। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি ও ভণ্ডাসুরের অভিনব ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের কথা ইহাই প্রতিপন্ন করে।

প্রত্যেক মুক্ত শিবই পরমশিব। এইজন্য পঞ্চকৃত্যকারিত্বের অধিকাব সকলেরই হয়। অধিকারী হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অধিকার প্রয়োগ করে না। কারণ নিত্য সিদ্ধ পরমশিব হইতেই উহাদের নির্বাহ হয।

এই সব ঐশ্বর্যের মূল হইল যোগীর অপ্রতিহত ইচ্ছা। পরম যোগী এখানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ইচ্ছাশক্তি পরিহার করিয়া ভক্তির দিকে অগ্রসর হয়। এই ভক্তি দ্বৈত ভক্তির কোটিতে পড়ে না। শ্রীশঙ্করাচার্য বলিযাছেন, 'সত্যঽপি ভেদাপগমে নাথ তবাহম্' ইত্যাদি। ইহা পরাভক্তি। কাহার কাহার দৃষ্টিতে ইহা সমাবেশময়ী ভক্তি। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা পুরুষ যে পরাভক্তি লাভ করে, ইহা ঐ কোটির ভক্তি। উৎপলাচার্যের স্তোত্রাবলীতে যে ভক্তির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, ইহা সেই ভক্তি। জ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভবে' যে অদ্বৈত ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায, ইহা সেই ভক্তি। ইহারই পরাকাষ্ঠা হয় প্রেমে। ইহা মায়িক বা মহামায়িক বৃত্তি নহে। ইহা অনন্ত রসাস্বাদস্বরূপ। ইহার পর উহাও অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয় যাহার অব্যর্থ ফল হইল পরমপদে প্রবেশ—'বিশতে তদনন্তরম্'।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিভূতিপাদে যে সমস্ত বিভূতির বিবরণ মেলে সেই সমস্ত বিভূতি অর্থমূলক ও তত্ত্বমূলক উভয় কোটির। অর্থমূলক সিদ্ধিসমূহ সংযম সাপেক্ষ এবং তত্ত্বমূলক সিদ্ধিসমূহ উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত সিদ্ধি তত্ত্ব জয় হইতে হয়। আর একটি কথা আছে, পাতঞ্জলে পুরুষ বিশেষ পরমেশ্বরকে 'সদামুক্ত' ও 'সদা ঈশ্বর' বলা হইয়াছে। পরন্তু সামান্য পুরুষ ঐরূপ নহে। কারণ এই সব পুরুষ যতদিন ঐশ্বর্য লইয়া খেলা করে ততদিন মুক্ত হয় না এবং যখন মুক্ত হয় তখন তাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য থাকে না। পরমেশ্বরের উপাধি হইল প্রকৃষ্ট সত্ত্ব, আর সাধারণ পুরুষের উপাধি হয় প্রাকৃত বা লৌকিক সত্ত্ব যাহাতে রজঃ ও তমঃ গুণ মিশ্রিত থাকে।

পাতঞ্জল যোগে 'আণব উপায়ে'রই বিবরণ আছে, কিন্তু 'শাক্ত' বা 'শাম্ভব' উপায়ের প্রসঙ্গ মাত্রও নাই। 'অনুপায়'-এর বিবরণের বিষয় তো অনেক দূরের কথা। ঐরূপ ইহাতে 'শাক্ত ও শাম্ভব সমাবেশে'র বিবরণও নাই।

(চ) বৌদ্ধ যোগসাধনা—বৌদ্ধ যোগসাধনার লক্ষ্যে এবং প্রক্রিয়াংশে বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। আবার কোন কোন ধারা প্রক্রিয়াংশে বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্যের দিক থেকে একই ভূমির অন্তর্গত। প্রাচীন বৌদ্ধ যোগে শ্রাবকযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাণ এবং মার্গও উহার অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক-বুদ্ধযানের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত বুদ্ধত্ব লাভ এবং বোধিসত্ত্ব যানের লক্ষ্য ছিল বোধিসত্ত্ব জীবন প্রাপ্ত হইয়া উহার উৎকর্ষ সম্পাদন করা। অবশ্য চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হইবার

পর অন্তিম ভূমিতে বুদ্ধত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী ছিল। বুদ্ধযানের লক্ষ্য ছিল সাক্ষাৎ ভাবে বুদ্ধত্বলাভ, বোধিসত্ত্ব ভূমি অতিক্রম করিবার পরে নহে। পারমিতা নয়ের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া হইতে মন্ত্র নয়ের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রনয়ে বোধিসত্ত্ব লাভের মাধ্যমে বুদ্ধত্বলাভ লক্ষ্য নহে, সাক্ষাৎ বুদ্ধত্বলাভই লক্ষ্য। বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের যোগ রহস্য পারমিতা মার্গের যোগরহস্য হইতে অধিকতর গম্ভীর। সেইজন্য বিশুদ্ধি মার্গ ও অভিধমার্থসংগ্রহ দ্বারা প্রদর্শিত লক্ষ্য ও প্রণালী হইতে তিলোপা, নারোপা প্রভৃতি সিদ্ধ যোগীদের প্রণালী ভিন্ন। যে ব্যক্তি তিব্বতীয় মহাযোগী তিলোপার জীবন-বৃত্তান্ত জানেন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে একই জন্মে বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা কিরূপ। বুদ্ধত্ব শব্দের অর্থ সম্যক সম্বোধি অথবা নিরাবরণ অখণ্ড প্রকাশ। এই মহাপ্রকাশকেই লক্ষ্য ঠিক করিয়া কৌল, ত্রিক, মহার্থ প্রভৃতি বিভিন্ন শৈব ও শাক্ত অদ্বৈত যোগী আপন আপন সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্মে বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক সকল সাধক যোগেরই অনুসরণ করিয়াছেন। লঙ্কাবতার সূত্র, সটীক অভিধর্মকোষ, বিংশিকা ও ত্রিংশিকা (সভাষ্য), সূত্রালঙ্কার, অভিসময়ালঙ্কার, প্রমাণবার্তিক, সেকোবেশ (সটীক), হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রখ্যাত বিদুষী ইটালীয় মহিলার (Maris & Careth) প্রকাশিত বজ্রযান বিষয়ে আলোচনাত্মক নিবন্ধ এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রাচীন তান্ত্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সোমানন্দ, বসুগুপ্ত, উৎপলাচার্য, অভিনব গুপ্ত, ক্ষেমরাজ প্রভৃতি আচার্যদের মূল ও টীকাগ্রন্থ এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য। শৈব ও শাক্ত আগমসমূহের যোগ ও জ্ঞান পাদও দর্শনীয়। মূল ও প্রকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বচ্ছন্দ তথা নেত্রতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়, কামকলাবিলাস, ত্রিপুরারহস্য (জ্ঞানখণ্ড), চিদ্‌গুণমচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের নামও উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে তুলনার জন্য শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শারদাতিলক, প্রপঞ্চসার, কঙ্কালমালিনী আদি গ্রন্থও আলোচ্য।

নাথ সম্প্রদায়ের যোগধারা পৃথক্। সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি, সিদ্ধ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ আদি গ্রন্থসমূহ নাথযোগের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

বীর শৈবসম্প্রদায়ের যোগ বিষয়েও বিভিন্ন উৎকৃষ্ট নিবন্ধ বিদ্যমান আছে। মহাসিদ্ধ প্রভুদেব বিশিষ্ট কোটির যোগী ছিলেন। সম্প্রতি কাশী নাগরী প্রচারণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহার বচনামৃত কন্নড় ভাষা হইতে হিন্দীতে ব্যাখ্যা সহ ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মায়িদেব কৃত অনুভব সূত্রও বিশিষ্ট গ্রন্থ।

পাশুপত যোগের বিষয়ে মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহে যে পাশুপত দর্শনের বিবরণ আছে তাহা ছাড়া পাশুপত সূত্র ও কৌণ্ডিন্য ভাষ্য দর্শনযোগ্য। ভাসর্বজ্ঞের গণকারিকা এই বিষয়ে প্রবেশার্থীদের জন্য উপাদেয় গ্রন্থ।

সন্তদের সাহিত্যেও বিভিন্ন স্থলে যোগের বিবরণ পাওয়া যায়। নানকদেবের 'প্রাণসংগলী' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা ব্যাখ্যা সহ তরণতারণ নামক স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কবীর, দাদূ, সুন্দরদাস, তুলসীদাস (হাথরসবাসী), শিবদয়াল (রাধাস্বামী মতের প্রবর্তক) প্রভৃতিদের গ্রন্থেও যোগতত্ত্ব বিভিন্ন স্থলে বিবেচিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে যে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদের সহিত যোগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাঁহাদের রচিত সাহিত্য হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে অমৃতানুভব ও জ্ঞানেশ্বরী টীকাকার যোগী জ্ঞানেশ্বরের পরিচয় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। উৎকলের 'পঞ্চসখা ধর্ম' ও 'মহিম্না ধর্মে'র প্রভাবে প্রভাবিত এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত উৎকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্যে যোগমার্গের অনেক গুপ্ত রহস্যের ইঙ্গিত মেলে।

বৌদ্ধাগম ঃ

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন প্রকার যান বা মার্গ

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যে বৌদ্ধধর্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রেরণা লাভ করিয়াই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিও বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের প্রসার প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ মানবের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখিয়াই দুঃখে অভিভূত হন এবং সেই সার্বজনীন দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ও উহার উপশমের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য গৃহত্যাগ করেন। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর তিনি যে বোধিজ্ঞান বা অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ করিলেন, সেই প্রজ্ঞালোকে জগতের সকল দুঃখের রহস্য তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল এবং তিনি জীবের দুঃখের কারণ ও উহার উপশমের উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা চারিটি সত্যে বিভক্ত। এই চারিটি সত্য হইল—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। বৌদ্ধধর্মের ভাষায় ইহাদিগকে 'চারিটি আর্যসত্য' (চত্বারি আর্যসত্যানি) বলা হয়। এই চারিটি সত্যই হইতেছে সমগ্র বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা করিতে গিয়া বুদ্ধদেব কতকগুলি কার্যকারণ-পরম্পরা নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহাকে বৌদ্ধধর্মের ভাষায় বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। দুঃখের এই হেতু নিরোধের উপায় হইল 'নির্বাণ'। এই নির্বাণলাভই সকল বৌদ্ধ সাধকের প্রধান কাম্য। এই নির্বাণের স্বরূপ ও নির্বাণলাভের পথ নির্ণয় করিতে গিয়া পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে নানা 'যানে'র উদ্ভব হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের বোধিলাভ ও ধর্মচক্রের প্রবর্তন—বুদ্ধদেবের বোধির উদয় ক্ষণ-মুহূর্তেই হইয়াছিল। নিমাই-এর চৈতন্যলাভও সেইরূপ গয়ায় বিষ্ণুপদ-দর্শনে ক্ষণ-মুহূর্তেই হইয়াছিল। অশুদ্ধ বিদ্যা হইতে শুদ্ধ বিদ্যার প্রকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞার উন্মীলন পর্যন্ত একটি 'ক্ষণ'। এই 'ক্ষণ' এক সেকেণ্ড হইতে পারে, এক ঘণ্টা হইতে পারে, এক দিন হইতে পারে, এক বৎসর হইতে পারে আবার সহস্র সহস্র বৎসরও হইতে পারে। এই ক্ষণ নির্ধারিত

হয় সাধকের আধারের বিশুদ্ধিতার উপর। বিদ্যুতের চমকের ন্যায় চৈতন্য বা বোধের চকিত বিকাশ এক ক্ষণ-মুহূর্তেই হয়। বোধি বা প্রজ্ঞা বা চৈতন্য কখন ধীরে ধীরে বিকশিত হয না, এক ক্ষণ-মুহূর্তেই হয। বিকাশের ক্ষণটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যতপ্রকার জপ, তপ, ধ্যান, ধারণামূলক সাধনা।

বুদ্ধদেব গয়ায় বোধিলাভ করিবার পর নির্বাণ-মুক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন সম্মুখে অপার শান্তি, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন জগৎময় অনন্ত দুঃখ। দুঃখের পশ্চাতে দেখিলেন 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা)। তৃষ্ণাই (বাসনা) সব অনর্থের মূল। নির্বাণ-মার্গের সন্ধান তিনি যখন পাইলেন তখন নির্বাণ তাঁহার করতলগত। কিন্তু নির্বাণ গ্রহণ করিয়া নিজে মুক্ত না হইয়া জগৎ-কল্যাণরূপ মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন। জগৎ সমক্ষে নির্বাণলাভের মার্গ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি 'ধর্মচক্রে'র প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার প্রথম ধর্মচক্রের প্রবর্তন কাশীর নিকট সারনাথে। এখানে তিনি নির্বাণ-মার্গের উপদেশ প্রচার করিলেন। এইখান হইতেই হীনযান মতের উৎপত্তি। শিষ্যেব আধার প্রস্তুত হইলে গুরু দীক্ষার দ্বারা তাহার ভিতর খুলিয়া দেন। তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শিষ্য অর্হত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হয এবং গুরুর উপদেশ অনুযায়ী কৃচ্ছ্র-সাধনার দ্বারা শিষ্য সেই অগ্রগতিকে তরান্বিত কবিয়া অর্হত্ব লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধদেব অনুভব করিলেন যে তাঁহার জীবৎকালের মধ্যে যে কয়জন তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে, শুধু তাহারাই উপকৃত হইবে, অন্যে ইহার ফল ভোগ করিতে পারিবে না। কারণ যাহারা 'অর্হৎ' লাভ করিবে, তাহারা নিজেরাই মুক্ত হইবে, জগৎকে কিছু দান করিতে পারিবে না। সুতরাং মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্রই তাঁহার উপদেশে দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ করিবে, তাহাতে জগৎবাসীর দুঃখ-দুর্দশা নিবারিত হইবে না। অথচ জগতের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বোধি লাভ করিলেন, তাহা কি বিফল হইবে? ইহা ছাডা, যাহারা অর্হত্ব-রূপ নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিবে, তাহারা তো 'বোধিসত্ত্ব' হইযা প্রকৃত বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবে না? কারণ, অর্হত্ব অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ।

সেইজন্য তিনি রাজগৃহের (রাজগীর) গৃধ্রকূট পর্বতে দ্বিতীয ধর্মচক্রেব প্রবর্তন করিলেন। সেখানে তিনি অর্হত্ব লাভের দিকে দৃষ্টি না দিয়া বোধিসত্ত্ব বা সম্যক্ সম্বোধি লাভের পন্থা নির্দেশ করিলেন। এখান হইতেই মহাযান ধর্মের উৎপত্তি। দশভূমি অতিক্রম করিয়া বোধিসত্ত্ব ভূমি লাভ করিতে হয়। ইহা 'পারমিতানয়'। দশভূমির প্রথম ভূমি perfection লাভ করিলে সেই ভূমি অতিক্রম করিয়া সাধক দ্বিতীয় উচ্চ ভূমি লাভ করে। এইরূপ পর পর perfection দ্বারা নবম ভূমি অতিক্রান্ত হইলে দশম ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়। দশম ভূমির perfection সম্পন্ন হইলে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' লাভ হয়। ইহাই বোধিসত্ত্ব লাভ। বোধিসত্ত্ব

লাভ করিলে প্রাক্তন কর্ম ক্ষয় হইয়া যায়। ফলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে বহুকাল যাবৎ জীবিত থাকিয়া অপর সকলকে বোধিসত্ত্ব লাভে সাহায্য করিতে পারে। দশভূমি অতিক্রম করিবার পর প্রজ্ঞা লাভ করিলে নির্বাণের সম্মুখীন হয়; কিন্তু তাঁহারা নির্বাণের দিকে না গিয়া বা নির্বাণ গ্রহণ না করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য বোধিসত্ত্ব অবস্থায় থাকেন। এক একজন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবের এক একটি 'নির্মাণকায়'। কারণ, বোধিসত্ত্ব যোগী এই সময় বুদ্ধদেবের সহিত যোগযুক্ত হয়। বুদ্ধদেবই স্বয়ং যেন এই সমস্ত বোধিসত্ত্বের মধ্য দিয়া অপরকে উপদেশ দান করেন। অতএব বুদ্ধদেবের 'নির্মাণকায়' অনেক। পরিশেষে এই সমস্ত বোধিসত্ত্বেরাও এক এক করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া 'সম্ভোগকায়ে'র অধিকারী হন।

দ্বিতীয় ধর্মচক্রে 'পারমিতানয়' প্রবর্তন করিয়াও বুদ্ধদেব ভাবিলেন যে ক্ষেত্রভেদে এক একজনের দশভূমি পার হইয়া বোধিসত্ত্ব লাভ করিতে দুই জন্ম, তিন জন্ম, এমন কি কাহারও কাহারও অনেক জন্ম লাগিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহার দ্বারাও জগতের কল্যাণ-সাধন বিলম্বিত হইবে। সেইজন্য তিনি অমরাবতীর নিকট শ্রীধান্যকটকে তৃতীয় ধর্মচক্রের প্রবর্তন করিলেন। এই ধর্মচক্রে তিনি 'মন্ত্রনয়'-এর অবতারণা করিলেন। এইখান হইতেই 'মন্ত্রযানে'র উদ্ভব। অর্থাৎ মন্ত্রজপ ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়া যাহাতে এক জন্মেই বোধিসত্ত্ব লাভ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। মন্ত্র হইল বীজ। মন্ত্র দানের ভিতর দিয়া বুদ্ধদেব নিজের বিশুদ্ধ সত্তাকেই বা বৌদ্ধ-জ্ঞানকেই (পৌরুষ জ্ঞান) বীজরূপে শিষ্যের হৃদয়ে বপন করেন। শিষ্য তাহার পরিকর্মরূপ পুরুষকারের দ্বারা সেই বীজরূপী পৌরুষজ্ঞানকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া এক জন্মের মধ্যেই বোধিসত্ত্ব লাভ করিতে পারে। অতএব 'পারমিতানয়' অপেক্ষা 'মন্ত্রনয়' যে শ্রেষ্ঠতর তাহা অবিসংবাদিত। ইহাও মহাযানেব অন্তর্গত।

মন্ত্রযান হইতেই কালক্রমে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি বিভিন্ন 'যানের' পরবর্তীকালে উদ্ভব হয়। এ সবই মহাযানের অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্র হইতে একেবারে সোজাসুজি বোধিসত্ত্ব ভূমি পাব হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পন্থার নির্দেশ বুদ্ধদেব নিজেই দিয়া যান। পরবর্তীকালে মন্ত্রযানের মধ্যেই উপরোক্ত তিনটি পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

হীনযান ও মহাযান—তিনটি বিভিন্ন স্থানে তিন ধর্মচক্রের প্রবর্তন করিয়া বুদ্ধদেব নিজে যে সমস্ত উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই সমস্ত তত্ত্বোপদেশের ব্যাখায় ও অনুসরণে পরবর্তীকালের বৌদ্ধ আচার্যগণের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে বুদ্ধ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে—একটি হীনযান, অপরটি মহাযান। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের

ধর্মমত বা আদর্শ সঙ্কীর্ণ ছিল না এবং সেই জন্যই বহু শতাব্দী ধরিয়া সেই ধর্মমত প্রসার লাভ করিয়াছিল। যুগে যুগে প্রতিভাবান্ বৌদ্ধ আচার্যদের যুক্তি-তর্কপূর্ণ ব্যাখার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মমত নব নব আদর্শে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধসংঘের একাংশ সারনাথে প্রচারিত বুদ্ধদেবের মতাদর্শের বরাবরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহারাই প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিয়া হীনযান নামে পরিচিত হইলেন। ইঁহারা ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্ত হইবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। এইজন্য ইঁহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ছিল। হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল বুদ্ধদেব প্রদর্শিত আচারব্যবহার পালন করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া পুণ্যসম্ভার অর্জন করিতে তৎপর হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধত্বলাভ সুদূরপরাহত ছিল। তাঁহাদের পথকে বিশেষভাবে 'শ্রাবকযান' বলা হইত। হীনযান সম্প্রদায়েরই আর একদল বুদ্ধত্বলাভ করিবার চেষ্টা করিতেন, বুদ্ধত্ব লাভও করিতেন, কিন্তু সে শুধু নিজের জন্যই। জগৎবাসীর উদ্ধারের জন্য পরার্থসেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার শুদ্ধ বাসনা তাঁহাদের ছিল না। সেইজন্য তাঁহাদের পথকে বিশেষভাবে 'প্রত্যেকবুদ্ধযান' বলা হইত। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযান—হীনযানের এই দুই পর্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর হিসাবে নির্দিষ্ট হইত। বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে হীনযানই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের (ভিক্ষু) আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি লইয়া সেই প্রাচীনকালেই বৌদ্ধসংঘের ভিতর মত-পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে রাজা অশোকের পূর্বেই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের ভিতর নানা শাখা গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে দশটি কালক্রমে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই দশটি শাখার নাম হইল—স্থবিরবাদ (পালিতে থেরবাদ), হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূলসর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এই দশটিকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম আটটিকে এক শ্রেণীতে, বাকি দুইটিকে আর এক শ্রেণীতে। প্রথম আটটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু বাকী দুইটি মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ খুব প্রাচীনকালেই প্রথম আটটি হইতে বেশ পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ—এই দুইটি শাখার দার্শনিক দৃষ্টির সহিত মহাযান দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য অনেকে মনে করেন, মহাযান সম্প্রদায় এই দুই শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের নিকট বোধিসত্ত্বলাভই পরম কাম্য হইয়া উঠে। মহাযানের আচার্যগণ পারমিতানয়-এর চর্চাকেই বোধিসত্ত্বলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র—বুদ্ধদেব নিজে কোন ধর্মশাস্ত্র লিখিয়া যান নাই বা তাঁহার

জীবৎকালে কোন শাস্ত্র রচিত হয় নাই। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ অবলম্বন করিয়া যে বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহাকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয। এই তিন ভাগকে তিন 'পিটক' বা 'ত্রিপিটক' বলা হয়। এই তিন পিটকের নাম যথাক্রমে সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক। বুদ্ধদেব কথাচ্ছলে যে সমস্ত ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন সেগুলি সূত্রপিটকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে, তিনি শিষ্যদের যে সমস্ত বিনয় বা ধর্মাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন সেগুলি বিনয়পিটকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আর অভিধর্মে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দর্শন বিশ্লেষিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে অশোকের পূর্বে বা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে ত্রিপিটক তো দূরের কথা, একটি পিটকও রচিত হয় নাই। অশোক তাঁহার অনুশাসনে কতকগুলি বৌদ্ধ সূত্র অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার সময় যদি ত্রিপিটক থাকিত তাহা হইলে তিনি উহার নামোল্লেখ করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া সাতটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। মনে হয়, অশোকের পূর্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা শুরু হইয়াছিল এবং সংঘের বৌদ্ধাচার্যগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধার জন্য ছোট ছোট শাস্ত্রের একত্র সন্নিবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রাচীন শাস্ত্রের এক প্রধান গ্রন্থ হইল 'ধম্মপদ'। 'ধম্মপদ' পালি সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃতে লিখিত হইয়াছিল।

অশোকের সময়েও মহাযানের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্বে হীনযানের যে দশটি শাখার নামোল্লেখ করিয়াছি তখন তাহাদেরই প্রাধান্য। তখনও বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ হীনযান ও মহাযান—এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায় নাই। পরবর্তীকালে দেখা যায়, হীনযানের যে দশটি শাখার নাম করিয়াছি তাহাদের প্রত্যেকেরই ধর্মশাস্ত্র ছিল ত্রিপিটক। পালি ভাষায় যে ত্রিপিটক লেখা হইয়াছিল তাহা হইল থেরবাদ বা স্থবিরবাদের শাস্ত্র। হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দের ত্রিপিটক মূলতঃ কোন্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কারণ তাহাদের ত্রিপিটক শুধু চীনা অনুবাদেই পাওয়া গিয়াছে। সর্বাস্তিবাদ ও মূলসর্বাস্তিবাদের ত্রিপিটকের যে যে অংশ নেপালে পাওয়া গিয়াছে সেই সেই অংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তবে ইহাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র চীনা তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদেই পাওয়া যায। মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয়দের শাস্ত্র সম্পূর্ণ চীনা অনুবাদে আছে।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার—বুদ্ধদেবের তিরোধানেব তিন শত বৎসর পরেও তাঁহার ধর্ম ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। একমাত্র অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের সীমান্তদেশ ব্রহ্ম সিংহল ও নেপালে বৌদ্ধধর্ম

উহার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছে। ভারতের বাহিরে শ্যাম, কম্বুজ, চীন, জাপান, তিব্বত ও মঙ্গোলীয় দেশে উহার প্রভাব এখনও অক্ষুন্ন আছে।

ত্রিপিটক হীনযানদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র হইলেও মহাযানদের নিকট উহা ততখানি সমাদরনীয় ছিল না। মহাযানরা হীনযানের বিনয়পিটক মানিয়া লইলেও যাঁহারা বোধিসত্ত্বমার্গ অবলম্বন করিলেন তাঁহারা বাইরের আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি যথাযথভাবে পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবিলেন না। সুতরাং কালক্রমে মহাযান শাস্ত্রে এক নূতন বিনয়পিটকের সৃষ্টি হইল। মহাযানের প্রাচীন শাস্ত্র কতকগুলি সূত্র লইয়া গঠিত। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হইল 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র'। 'প্রজ্ঞা' পারমিতানয়ের মধ্যে অন্যতম। বোধিসত্ত্বমার্গে উন্নীত হইতে হইলে প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চা অপরিহার্য। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র লেখা হইয়াছিল সংস্কৃতে, পরে নানা ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র রচনার কাল সঠিক নির্নীত হয় নাই। মনে হয়, কনিষ্কের সময় বা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই এই সূত্র রচিত হইয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে উহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন করিয়াই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী কিংবা তাহারও কিছু পরে নাগার্জুন তাঁহার 'মাধ্যমিক দর্শন' এবং ইহারও বেশ কিছুকাল পরে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু 'বিজ্ঞানবাদ ও যোগাচার দর্শনে'র ভিত্তি স্থাপনা করেন। মাধ্যমিক দর্শন শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইজন্য ইহাকে Nihilistic School বলে। বিজ্ঞানবাদ ও যোগাচার দর্শন মূলতঃ একই। বিজ্ঞানবাদে সিদ্ধান্তের আলোচনা করা হইয়াছে এবং যোগাচারে সাধন-আচারের নির্দেশ করা হইয়াছে—উভয়ই মহাযান ধর্মের অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান দেয়। এইজন্য ইহাকে Idealistic School বলা হয়। অতএব মহাযানে Idealism এবং Nihilism দুইই আছে। হীনযানে শুধুই Nihilism। মহাযানের Nihilism এবং হীনযানের Nihilism এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হীনযানের Nihilism শুধুই নির্বাণ, কিন্তু মহাযানের Nihilismকে বলা হয় মহানির্বাণ বা পরিনির্বাণ। ইহা ঠিক কৈবল্য-মুক্তি ও আগমের পরামুক্তির মত পৃথক্।

মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব রাজগৃহে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে অমরাবতীতে। নাগার্জুনের সর্বপ্রধান গ্রন্থ হইল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের টীকা। এই টীকা অমরাবতীর অদূরে ধান্যকটকের মহাবিহারে বসিয়া তিনি রচনা করেন। এই টীকা রচনা করিয়াই তিনি তাঁহার নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

কনিষ্কের সময় গান্ধার মহাযানের একটি বড় কেন্দ্র হইয়া উঠে। শুনা যায়, মহাযানের প্রধান কবি অশ্বঘোষ তাঁহার অনেক গ্রন্থ গান্ধারে বসিয়াই লিখিয়াছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু গান্ধারের লোক। যোগাচারের উপর অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সূত্রালঙ্কার' এবং 'মহাযান-বিংশতিকা'

ও 'ত্রিংশতিকা'। নাগাজুর্নের টীকার মূল পাওয়া যায় নাই, তবে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় উহার অনুবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি নেপালে পাওযা গিযাছে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁহাদের গ্রন্থগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কাব্য ও ভাস্কর্য—মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই দর্শনের পুঁথিপত্র ছাড়া মহাযানদের মধ্যে কতকগুলি সরস কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, 'ললিতবিস্তর' এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'। শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার'কে কাব্য হিসাবেই ধরা যাইতে পারে। ললিতবিস্তর কাহার লেখা তাহা বলা যায় না। অশ্বঘোষেব বুদ্ধচরিত কাব্যরসে সমৃদ্ধ। অশ্বঘোষ নিজেই বুদ্ধচরিতকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়াছেন। অশ্বঘোষ 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামে একটি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটক বুদ্ধদেবের জীবনী লইয়া রচিত। ইহা ছাড়া, কয়েকটি বৌদ্ধস্তোত্র রচিত হইয়াছিল; যেমন—সর্বজ্ঞমিত্রের স্রগ্ধরাস্তোত্র, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সুপ্রভাতস্তোত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্রগ্ধরাস্তোত্র কাব্যরসে ভরপুর। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে দেবকন্যারা মহাযানের দেবতাকে বরণ করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়াছেন। এখানে কবি দেবকন্যাদের যেরূপ বর্ণনা দিযাছেন তাহা মহাকবি কালিদাসের বর্ণনাকেও হার মানায়।

এই কাব্যরসই আবার অন্যদিকে ভাস্কর ও চিত্রকরের হাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ ভাস্কর্যের নিদর্শনস্বরূপ অজন্তার চিত্রকলায় সেই সমস্ত অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী দেবকন্যাদের সন্ধান মিলিবে। অজন্তার চিত্রকরেরা শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার কাব্য গ্রন্থ হইতেও অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। শান্তিদেব ছিলেন বলভীর অধিবাসী এবং তিনি কাব্যগ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

মহাযানের শেষ যুগে একদল বৌদ্ধ আচার্য প্রতিপন্ন করিলেন যে বোধিচর্যা মন্ত্রবলেই সম্পন্ন হইতে পারে। ইঁহারা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেই বেশ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন এবং নূতন নূতন শাস্ত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তবে ইঁহাদের দর্শনের মূল যে যোগাচারের মধ্যেই নিহিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত আচার্যগণের মতপার্থক্য হেতু মহাযানের বিবর্তনের শেষযুগে তিনটি সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হয়। এই তিন সম্প্রদায় হইল বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। এই তিন সম্প্রদায়ের রচিত শাস্ত্রের বেশীর ভাগ আছে নেপালী পুঁথিতে এবং তিব্বতী অনুবাদে। বজ্রযান ও কালচক্রযানের শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল। অপভ্রংশে লিখিত শাস্ত্র-রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। তাঁহাদের মধ্যে সরহপাদ, কাহ্নপাদ,

তিল্লোপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের ভাষার প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী ভাষা গড়িয়া উঠে।

হীনযান ও মহাযানের চারিটি দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা—বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কালক্রমে চারিটি দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়। এই চারিটি দর্শনের নাম—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিককে হীনযান সম্প্রদায়ের এবং মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান সম্প্রদায়ের বলিতে হয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অদ্বয়বজ্র নামক একজন বৌদ্ধসাধক তাঁহার রচিত 'তত্ত্বরত্নাবলী' গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের নানা যানের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যান তিন প্রকার—শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান ও মহাযান। এই তিনটি যান চারিটি দার্শনিক মতবাদে বিভক্ত; যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযান বৈভাষিক মতকে অবলম্বন করিয়াছে। শ্রাবকযান তিন প্রকারের—মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র।

মহাযানের দুইটি ধারা—পারমিতানয় এবং মন্ত্রনয়। সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার পারমিতানয়কেই প্রচার করিয়াছে। মন্ত্রনয় শুধু যোগাচার অবলম্বন করিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

সর্বাস্তিবাদের সাতটি অভিধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থের নির্যাস অবলম্বনে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতের প্রতিষ্ঠা। সর্বাস্তিবাদের এই সাতটি গ্রন্থের নাম হইল জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্মস্কন্ধ, সংগীতিপর্যায়, বিজ্ঞপ্তিবাদ, প্রকরণপাদ, প্রজ্ঞপ্তিসার ও ধাতুকায়পাদশাস্ত্র। জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র কাত্যায়ণীপুত্রের রচিত। তিনি ছিলেন সর্বাস্তিবাদের প্রধান আচার্য। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাব কাল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই বৈভাষিক মতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে গণ্য হয়। অভিধর্মকোষ জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রেরই টীকা। সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মগ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত প্রাচীন টীকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল সেইগুলিকেই 'বিভাষা' বলা হইত। বিভাষা হইতেই বৈভাষিক নামের উৎপত্তি। বৈভাষিক মতের সৃষ্টি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বসুবন্ধু প্রথমে বৈভাষিক ছিলেন। পরে তিনি যোগাচারবাদ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা নামে এক বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপনা করেন। সেই সময়ে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেইগুলিই বিজ্ঞানবাদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈভাষিক মত প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু কাল পরে সৌত্রান্তিক মতের উৎপত্তি হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে সর্বাস্তিবাদের আচার্য কুমাররাত ও

তাঁহার শিষ্য হরিবর্মণ এই দার্শনিক মত স্থাপন করেন। অভিধর্ম ও বৈভাষিক গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে বুদ্ধদেবের বাণী সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে মূল সূত্রগ্রন্থগুলি অনুধাবন করিতে হইবে। কারণ, সূত্রগ্রন্থগুলিতেই বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ আছে। কুমাররাতের রচিত কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তবে হরিবর্মণের রচিত 'সত্যসিদ্ধি' শাস্ত্রগ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও উহার চীনা অনুবাদ গ্রন্থটি পাওয়া গিয়াছে।

মহাযান সম্প্রদায়ের মাধ্যমিক দর্শনেব প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন। মনে হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল বিদর্ভ দেশে। নাগার্জুনের পর যে সব আচার্য মাধ্যমিক মতের পুষ্টিসাধন করেন তাঁহাদের মধ্যে আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি ও শান্তিদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। আর্যদেব তৃতীয় শতাব্দীতে, শান্তিদেব সপ্তম শতাব্দীতে এবং চন্দ্রকীতি এই উভয়ের মধ্যবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিদেবের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বৈভাষিকেরা ছিলেন অস্তিবাদী (realist)। তাঁহারা পঞ্চস্কন্ধ ও ধর্মের (phenomenon) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের আপেক্ষিক (relative) অস্তিত্বে ও বস্তুতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা ধর্মকে মনে করিতেন শূন্যস্বভাব বা অলীক। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানপ্রবাহেই ধর্মের অস্তিত্ব। আর সে ধর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়। বৈভাষিক মতে পুদ্গল বা আত্মার কোনো অস্তিত্ব নাই। রূপ ও অরূপ ধর্মের অর্থাৎ স্কন্ধ ও মহাভূতের সংযোগে জীবের উৎপত্তি। তাঁহারা বলেন, পুদ্গল নাই বটে কিন্তু ধর্মের অস্তিত্ব আপেক্ষিক হইলেও আছে। ইহাতে বৈভাষিকেরা ধর্মকে ক্ষণিক বলিলেন বটে, তবে তাঁহাদের মতে ক্ষণিকের অর্থ হইতেছে অল্পক্ষণ স্থায়ী। প্রতি ধর্মেরই তাঁহাদের মতে উৎপত্তি, স্থায়িত্ব ও বিনাশ আছে। সুতরাং ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ সমকালীন নয়, পূর্বাপর। সৌত্রান্তিকেরা ইহার কিছুই স্বীকার করেন না। পুদ্গলশূন্যতা ও ধর্মশূন্যতাই হইতেছে তাঁহাদের মতের দুইটি মূল সূত্র। তাঁহারা বলেন ধর্মসমূহের লক্ষণ হইল অনিত্যতা। নদীর ঢেউয়ের মত যে মুহূর্তে তাহাদের উৎপত্তি সেই মুহূর্তেই তাহাদের বিনাশ। পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্মের কোন অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নাই, ধর্ম হইতেছে শূন্য স্বভাব। ধর্ম শূন্যস্বভাব এইজন্য যে উহা ক্ষণিক, উহার অতীত অস্তিত্বও নাই, ভবিষ্যৎ অস্তিত্বও নাই। অর্থাৎ উহার পূর্বাপর বলিয়া কিছু নাই। উহার ক্ষণিক স্থায়িত্বের প্রধান কারণ হইল এই যে, ধর্মের প্রকৃত স্বভাব প্রতি মুহূর্তেই বিনষ্ট হইতেছে ও তাহার নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে। ইহাতে শুধু ধর্মের প্রবাহই সৃষ্টি হইতেছে, সেই প্রবাহের প্রত্যেক ধর্মই অনিত্য বা ক্ষণিক। উদাহরণস্বরূপ একটি দড়ির এক প্রান্তে আগুন ধরাইয়া অপর প্রান্ত ধরিযা ঘুরাইলে একটি অগ্নিময় বৃত্তের

সৃষ্টি হয়। এই অগ্নিময় বৃত্ত বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র জ্যোতিকণার সমষ্টিতে তৈরী। জ্যোতিকণাসমূহ একটি বৃত্তরূপে অনুমিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নাই। ধর্মপ্রবাহও সেইরূপ continuous phenomena মাত্র। এই ধর্মপ্রবাহের মধ্যে প্রকৃত কোনো যোগসূত্র নাই, সুতরাং উহার অস্তিত্ব জ্যোতিকণার ন্যায় ক্ষণিক। আমরা ধর্মসমূহের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করি তাহা অলীক, ভ্রান্তি, মায়ামাত্র। এই ধর্মসমূহকে বলা যায় শুধু প্রতিবিম্ব-প্রবাহ, যাহা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয় (a series of images not directly perceptible)। এইখানেই বৈভাষিকের সঙ্গে সৌত্রান্তিকের প্রভেদ। বৈভাষিকেরা ধর্মসমূহের আপেক্ষিক (relative) অস্তিত্বে এবং প্রত্যক্ষীকরণে (direct perception) বিশ্বাস করে। উভয়েই ধর্মকে ক্ষণিক বলিয়াছেন। তবে ক্ষণিকত্বের লক্ষণের চুলচেরা বিচারে উভয়ের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

পুদ্‌গলশূন্যতা সম্বন্ধে সৌত্রান্তিকরা বলেন, শূন্য ঘটের ভিতর যেমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নাই, স্কন্ধ ও ভূতাত্মক দেহের ভিতরেও তেমনি কোনো আত্মা নাই। ঘটের অস্তিত্বও ব্যবহারিক সত্যমাত্র, পরমার্থতঃ উহার কোনো সত্তা নাই। সৌত্রান্তিক মতে সত্য দুই প্রকার—সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য (relative truth ও absolute truth)। কোনো ধর্ম বা বস্তুকে যখন পরিচ্ছিন্ন করা যায় তখন পরমার্থতঃ তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। তখন তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস শুধু সংবৃতি সত্য মাত্র।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বৈভাষিকগণ ধর্মসমূহের ক্ষণিক অস্তিত্বে ও বস্তুত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে ধর্মের প্রত্যক্ষীকরণ (direct perception) সম্ভবপর। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ ধর্মসমূহকে শূন্য স্বভাব বা অলীক মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান-প্রবাহেই ধর্মের অস্তিত্ব। সে ধর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয় (deductive)। তবে উভয়েই স্বীকার করেন যে আত্মা নাই, সেখানে আছে শুধু শূন্য। 'নির্বাণে'র স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৈভাষিকগণ বলিয়াছেন, নির্বাণ অনাস্রব আনন্দময় অবস্থা ও ভাব-স্বভাব, আর সৌত্রান্তিকগণ বলিয়াছেন, নির্বাণ অবস্তুক (unreal) ও অভাব-স্বভাব (negative)। এই দুইটি মতের একটিকে বলা হয় 'শাশ্বতবাদ', অপরটিকে 'উচ্ছেদবাদ'। কিন্তু মাধ্যমিকগণ এই দুইটি মতবাদের কোনোটিই গ্রহণ করিলেন না। নাগার্জুন বলিলেন, পরমার্থ সত্যকে অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য প্রভৃতি বাক্যের সাহায্যে ব্যাখা করা যায় না। তাঁহার মতে নির্বাণ এমন একটি শূন্যতা যাহা অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্যের ঊর্ধ্বে। কারণ, 'অস্তি' বলিলে ইহার শাশ্বতত্ব স্বীকার করিতে হয়, আর 'নাস্তি' বলিলে ইহাকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দেওয়া হয়—"অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীত্যুচ্ছেদ-দর্শনম্"। অতএব "শাশ্বতোচ্ছেদনির্মুক্তং তত্ত্বং সৌগতসম্মতম্" —অর্থাৎ শাশ্বত ও উচ্ছেদ বিনির্মুক্ত

তত্ত্বই বুদ্ধের অনুমোদিত মত। নির্বাণ ভাব-স্বভাব নয়, কারণ ভাবের পরিণতি আছে। অথচ নির্বাণ অভাব-স্বভাবও নয়, কারণ অভাবের কোনো অস্তিত্ব নাই। তাঁহার মতে স্বভাবশূন্যতাই হইতেছে নির্বাণ। ইহাই মধ্যপথ। বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থে যে 'মধ্যমা প্রতিপদে'র উল্লেখ পাই, ইহা তাহাই। ইহাই বুদ্ধবচনের সত্য অর্থ।

মহাযান সম্প্রদায়ের আর একটি প্রধান দার্শনিক মত হইল যোগাচার। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু কর্তৃক এই মতবাদের প্রবর্তন হয়। অসঙ্গ ইহার নাম দেন যোগাচার, আর বসুবন্ধু নাম দেন বিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ। দুইজনের সিদ্ধান্ত একই। তবে বিজ্ঞানবাদে দর্শনের দিকটাই বেশি আলোচনা করা হইয়াছে, আর যোগাচারে সাধনার আচার-অনুষ্ঠান বা প্রক্রিয়ার উপরই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগাচার হইতেই একপ্রকার বৌদ্ধতন্ত্রের সূত্রপাত।

অসঙ্গের প্রধান গ্রন্থ হইল মহাযান 'সূত্রালঙ্কার'। গ্রন্থটির মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। অসঙ্গের জীবনী হইতে জানা যায়, তিনি মৈত্রেয়ের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মৈত্রেয় কে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা এই মৈত্রেয় হইলেন মৈত্রেয় বুদ্ধ স্বয়ং। তিনি আবির্ভূত হইয়া অসঙ্গকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবাদ অলৌকিক। অনেকের মতে এই মৈত্রেয় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহার আসল নাম মৈত্রেয়নাথ। ইনি একজন শাস্ত্রকারও ছিলেন। ইঁহার নামে প্রচলিত 'অভিসময়ালঙ্কার' নামক একখানি গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস অসঙ্গের সূত্রালঙ্কারের সূত্র বা কারিকাগুলি মৈত্রেয়নাথের রচিত। তথাপি আমাদের স্বীকার করিতে হয়, যোগাচারের প্রবর্তক অসঙ্গ এবং তিনিই যোগাচারের প্রথম আচার্য। দ্বিতীয় আচার্য হইলেন বসুবন্ধু। অসঙ্গ বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বসুবন্ধুর প্রধান দুই গ্রন্থের নাম 'বিংশক-কারিকা-প্রকরণ' ও 'ত্রিংশিকা-প্রকরণ'। বসুবন্ধুর পরে যোগাচার সম্প্রদায়ের যে সমস্ত আচার্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে দিঙ্‌নাগ স্থিরমতি ও ধর্মপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মপাল ছিলেন নালন্দা মহাবিহারের একজন প্রধান আচার্য। তাঁহার শিষ্য শীলভদ্রের নিকট প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক হিউয়ানসাং শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

যোগাচার দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। কারণ, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে ধর্মসমূহ অলীক, উহাদের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ প্রভৃতিও অলীক। ধর্ম যখন অলীক তখন দেশ ও কালের কোনো পরিচ্ছেদ নাই, ক্ষণপ্রবাহও নাই—কিছুই নাই। ধর্মসমূহ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বা চিত্তমাত্র। বসুবন্ধু বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহাই

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকমিতি" অর্থাৎ হে জিনপুত্রগণ ত্রিধাতু বা সমস্ত জগৎ চিত্তমাত্র।

অসঙ্গের মতে পারমার্থিক সত্য হইল অদ্বয়। এই অদ্বয় পারমার্থিক সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"ন সন্ন চাসন্ন তথা ন চান্যথা
ন জায়তে ব্যেতি ন চাবহীয়তে।
ন বর্ধতে নাপি বিশুধ্যতে পুন
বিশুধ্যতে তৎপরমার্থলক্ষণং।।"

(সূত্রালঙ্কার, ষষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ 'পরমার্থ সৎও নয় অসৎও নয় এবং অন্যরূপও কিছু নয়। উহার উৎপত্তি, বিনাশ এবং ক্ষয়বৃদ্ধিও নাই। এই পরমার্থের শোধন হয় একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি শোধন হয় না এ কথাও বলা যায় না। কারণ প্রাকৃতিক ক্লেশ তাহাকে যেমন একদিকে স্পর্শ করে না, অপরদিকে আগন্তুক ক্লেশের প্রভাব হইতেও তাহা মুক্ত নয়।' একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে পরমার্থের এই যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা মাধ্যমিক মত হইতে পৃথক্ নয়।

অসঙ্গ আরও বলিয়াছেন যে সাধকগণ যখন বুঝিতে পারেন যে বস্তুর সত্যকার কোনো অস্তিত্ব নাই, সমস্তই অলীক তখন তাঁহারা চিত্তমাত্রে অর্থাৎ বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। এই চিত্তমাত্রতাই হইল ধর্মধাতু। এই ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হইলে বিকল্পের বিনাশ হইয়া অদ্বয় জ্ঞানের বিকাশ হয়—

"নাস্তীতি চিত্তৎপরমেত্য বুদ্ধ্যা
চিত্তস্য নাস্তিত্বমুপৈতি তস্মাৎ।
দ্বয়স্য নাস্তিত্বমুপেত্য ধীমান্
সংতিষ্ঠতেঽতদ্গতিধর্মধাতৌ।।" (ঐ)

অর্থাৎ চিত্ত ব্যতীত সমস্তই অলীক বুঝিতে পারিলে এই চিত্তেরও যে অস্তিত্ব নাই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বিকল্প জ্ঞান (দ্বয় জ্ঞান) বিনষ্ট হইলে ধর্মধাতুতে স্থিতি হয়।

অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি সাধকের। তাই তিনি পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা শুধু দার্শনিক আলোচনা নয়, তাহা সাধকের সাধনমার্গের কথা। সাধক প্রথমে বুঝিতে পারেন গ্রাহ্য (object) এবং গ্রাহক (subject) উভয়ই চিত্তমাত্র। তখন সমস্ত বিকল্প জ্ঞান বিনষ্ট হয়, থাকে শুধু জ্যোতিস্মান্ চিত্তমাত্র (illuminated mind)। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন এই চিত্তমাত্রতা অদ্বয়। পরে সাধক অনুভব করেন এই চিত্তমাত্রতারও কোনো

অস্তিত্ব নাই, তখন থাকে শুধু পরমার্থ সত্য। এই পরমার্থ সত্যের স্বরূপ কি? তাহা কি শূন্য? অসঙ্গ বলিয়াছেন যে না, তাহা শূন্য নয়। কারণ চরম অবস্থায় চিত্তমাত্রতা থাকে না বটে, কিন্তু ধর্মধাতু থাকে।

বিজ্ঞানাবাদে 'বিজ্ঞানমাত্রতা'ই হইল পারমার্থিক সত্য। এই বিজ্ঞান হইতে কি করিয়া ধর্মসমূহের উদ্ভব হইতেছে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বসুবন্ধুর রচিত 'ত্রিংশিকাকারিকায়'। বসুবন্ধু বলিয়াছেন, ধর্মসমূহের সমস্তই বিজ্ঞানের পরিণাম। এই পবিণাম তিন প্রকারঃ—(১) আলয়বিজ্ঞান, (২) আলম্বন, (৩) বিষয়বিজ্ঞপ্তি। আলয়বিজ্ঞান সমস্ত ধর্মের বীজস্বরূপ। সমস্ত সাংক্লেশিক ধর্ম যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাহার বীজ এখানে নিহিত থাকে বলিয়া ইহাকে আলয় বলা হয়—'সর্বসাংক্লেশিকধর্মবীজস্থানত্বাৎ আলয়'।

আলয়-বিজ্ঞানের পরিণতি হইতে যে ধর্মসমূহের নিরন্তর উৎপত্তি হইতেছে তাহাদের কোন স্থায়িত্ব নাই। বসুবন্ধু তাহাদের নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—'স্রোতসৌঘবৎ'। এই প্রবাহ হইল কার্যকাবণের নিরন্তর প্রবাহ। জলপ্রবাহের যেমন পূর্বাপর ভাগ করা যায় না, ধর্মসমূহের প্রবাহও সেইরূপ। এই প্রবাহের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিই হইল অর্হত্ব।

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পরিণতি হইল আলম্বন। এই আলম্বনের ব্যাখায় বসুবন্ধু বলিয়াছেন—'তদাশ্রিতা প্রবর্ততে' (ত্রিংশিকা-কারিকা), অর্থাৎ আলম্বন আলয়-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। এই আলম্বন হইল মননাত্মক—'তদালম্বং মনোনাম বিজ্ঞানং মননাত্মাকম্'। সুতরাং এই আলম্বনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই আলম্বনের পরিণতিতেই ক্লেশের উৎপত্তি।

বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি হইল বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় ছয় প্রকার—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাত্মক এবং ধর্মাত্মক। সুতরাং বসুবন্ধুর মতে 'সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্' অর্থাৎ সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র। বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব। আর সেই কারণেই ত্রিজগৎ অলীক। ত্রিজগৎ যে মিথ্যা, মায়া, বিজ্ঞপ্তিমাত্রের বিজৃম্ভণ মাত্র, তাহা না হয় বুঝা গেল; কিন্তু নির্বাণ কি? বসুবন্ধুর মতে নির্বাণ হইল বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় অবস্থিতি। যতক্ষণ বিজ্ঞানে চিত্তমাত্রতায় অবস্থান না করে ততক্ষণ গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব থাকে, ধর্মসমূহের উৎপত্তি ও উহার প্রবাহ চলে। আলয়-বিজ্ঞানে উক্ত গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব ও ধর্মসমূহের বীজ নিহিত থাকে। সুতরাং ধর্মসমূহের প্রবাহের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অলীক জগতের ব্যবহারিক সত্যের বা সংবৃতি সত্যের ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অদ্বয় লক্ষণ-বিশিষ্ট। সুতরাং যোগীর চিত্ত যখন সেই অদ্বয় চিত্তমাত্রতায় নিবিষ্ট হয় তখনই আলয়বিজ্ঞানে

নিহিত সৃষ্ট্যোন্মুখ ধর্মসমূহের বীজ বিনষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় যোগীর চিত্তের কি অবস্থা হয় তাহা বসুবন্ধু ত্রিংশিকাকারিকার শেষ দুইটি শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, তখন চিত্তে লোকোত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর চিত্তও থাকে না। চিত্ত না থাকায় গ্রাহ্য-গ্রাহক সম্বন্ধে বিজ্ঞান থাকে না এবং দুই প্রকারের 'দৌষ্ঠুল্য' বিনষ্ট হইয়া 'আশ্রয়ে'র 'পরাবৃত্তি' ঘটে।

পরাবৃত্তি যোগাচারের একটি পারিভাষিক শব্দ। অসঙ্গ তাঁহার সূত্রালঙ্কারের নবম অধ্যায়ে পরাবৃত্ত অবস্থার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরাবৃত্তির সাধারণ অর্থ হইল বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসা। অর্থাৎ যেখান হইতে উৎপত্তি সেখান হইতে জীব বৃত্তাকারে ঘুরিয়া পুনরায় উৎপত্তি স্থানে ফিরিয়া আসিবে, তবেই বৃত্ত পূর্ণ হইবে। যোগশাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যোগশাস্ত্রে বলে চিত্তের গতি উভয়মুখী। একটি বহির্মুখী বা অনুলোম গতি, অপরটি অন্তর্মুখী বা প্রতিলোম গতি। অনুলোম গতির শেষ পরিণতিতে জীবজন্মলাভ। এইবার প্রতিলোম গতি অবলম্বন করিয়া নিজের কারণ শরীরে প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং প্রতিলোম গতির সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ পরাবৃত্ত হওয়া। এই গতি আরম্ভ হইলে সাধকের সমস্ত বৃত্তি অন্তর্মুখী হয়। এই পরাবর্তনকে retroversion বা transformation বলা হয়। পূর্ণ পরাবৃত্ত অবস্থাই নির্বাণ। আবার বৌদ্ধ তন্ত্রমতে এই অবস্থাকে বলা হয় বুদ্ধের ধর্মকায়।

এই পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের একটি পর্যায়। ইহার পর বৌদ্ধধর্মের আর একটি পর্যায়ের আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও উত্তর ভারতে মাধ্যমিক ও যোগাচার মত প্রবল ছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়ান সাং যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের নিকট যোগাচার দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রবর্তন হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতেই নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি মহাবিহারের বৌদ্ধাচার্যদের দ্বারা যে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা অভিনব। এই অভিনব বৌদ্ধধর্মের সাধারণ সংজ্ঞা হইল তন্ত্রযান।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই বৌদ্ধতন্ত্রযান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এইবার আমরা উঁহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। উপরে হীনযান ও মহাযানের যে চারিটি দার্শনিক মত অতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিলাম তাহা সম্পূর্ণ আমার বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া।

বৌদ্ধতন্ত্রযান—বৌদ্ধ তন্ত্রযানের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তিনটি হইল বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। প্রত্যেক মতেরই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং সেই গ্রন্থগুলি তিব্বতী অনুবাদে রক্ষিত আছে। সংস্কৃতে রচিত কতকগুলি মূল গ্রন্থ নেপালে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে গুহ্যসমাজতন্ত্র, অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহ, দোহাকোষ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুহ্যসমাজতন্ত্র—বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার উল্লেখ সর্বপ্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাই। গুহ্যসমাজের প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ, তাহাদের পাঁচটি শক্তি এবং তাহাদের মণ্ডলের চারিটি দ্বারপালের উৎপত্তির কথা এবং মন্ত্রাদি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থটি 'সঙ্গীতি' বা উক্তির সঙ্কোলনমাত্র। সেইজন্য গ্রন্থটির রচয়িতার নাম নাই। অনেকে মনে করেন গ্রন্থটির সঙ্কোলনে আচার্য অসঙ্গের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কারণ অসঙ্গ কর্তৃক প্রবর্তিত যোগসাধনার সঙ্গে গুহ্যসমাজতন্ত্রের যোগসাধনাব অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চতুর্থ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায। ইহার পূর্বে 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামে মন্ত্রযানের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, মুদ্রা ও মণ্ডলের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থটিতে কোথাও পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের ও তাঁহাদের হইতে উদ্‌ভূত পঞ্চ কুলের কোনো উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থটি গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থের পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই গ্রন্থটির উপর উহার প্রভাব পড়িয়াছিল। অনেকে মনে করেন মঞ্জুশ্রীমূলকল্প খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং মনে কবা যাইতে পারে যে বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তাঁহার তিরোধানের দুই তিন শত বৎসর পরে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল এবং কঠোর অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত ভিক্ষুসংঘের কৃচ্ছ্রসাধনার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপনে তন্ত্রের চর্চা হইত এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণেব সময় পর্যন্ত বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমশঃ উন্নত হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। অগণিত দেবদেবীর কল্পনা করা হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ-সাধক তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধাচার্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হইযাছিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় একখানি বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ হইতে। গ্রন্থটির নাম 'সাধনমালা'। পুঁথিখানি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সাধনমালায় ৩১২ প্রকার সাধনায় অগণিত দেবদেবীর বর্ণনা, মূর্তির ধ্যান

এবং পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রযোগের বিবরণ দেওয়া আছে। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের প্রেরণার উৎস যে কোথায়, এই গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ধান মেলে। এই গ্রন্থটি বরোদার গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের আর একটি মূল্যবান্ তন্ত্রগ্রন্থ হইল 'নিষ্পন্নযোগাবলী'। অভয়াকর গুপ্ত নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই গ্রন্থটির রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রায় ছয় শত দেবদেবীর বিবরর দেওয়া আছে।

ভারতের যে সমস্ত স্থানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিংবা যে সকল অঞ্চলে বৌদ্ধপন্থী রাজাদের রাজত্ব ছিল সেই সকল অঞ্চল বা স্থান হইতেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সারনাথ, ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, পাহাড়পুর, কুশীনগর, শ্রাবস্তী প্রভৃতি বহু স্থানে খননকার্যের ফলে অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ বুদ্ধদেব কোথাও মূর্তিপূজার কথা বা দেবদেবীর উপাসনার কথা বলিয়া যান নাই বা তাঁহার সময়ে কোনো মূর্তিপূজার প্রচলন হয় নাই।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার কথা সর্বপ্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই গ্রন্থটির রচনার কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। তখন হইতেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের একাংশ গোপনে তন্ত্রের অনুশীলন করিত। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে উহার অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে আরম্ভ হইয়া অচিরে প্রবল আকার ধারণ করিল। লামা তারানাথ নামক এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পাল-রাজত্বের সময় সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা উহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল।

বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি উৎপত্তিস্থল হইল শূন্য। এই শূন্যের স্বরূপ হইল বিজ্ঞান ও মহাসুখ অর্থাৎ এই শূন্য চিন্ময় ও আনন্দস্বরূপ, ঠিক বেদান্তের সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের মত। এই শূন্য ঘনীভূত হইয়া প্রথমে শব্দরূপে আবির্ভূত হন এবং পরে শব্দ হইতে পুনরায় ঘনীভূত হইয়া দেবতা রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থের প্রথমেই এই বিবর্তনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, কায়বাক্চিত্তবজ্রধর সমাধি গ্রহণ করিতেছেন। এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ হইবার পর এক-একটি শব্দ উত্থিত হইতেছে। এবং এই ধ্বনি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢতর হইয়া এক-একটি ধ্যানী বুদ্ধ-আকারে পরিণত হইতেছে। এই কায়বাক্চিত্তবজ্রধর হইলেন অসীম শক্তিশালী বুদ্ধ।

কায় (শরীর), বাক্ (ধ্বনি) এবং চিত্ত এই হইল তাঁহার তিন মৌলিক উপাদান, এবং তিনি বজ্র ধারণ করেন বলিয়া বজ্রধর। এই অনন্য শক্তিশালী বুদ্ধ পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধে পরিণত হইলেন এবং প্রত্যেকটি ধ্যানীবুদ্ধের সঙ্গে একটি করিয়া 'শক্তি' সংযোজন করিলেন। গ্রন্থের অন্যত্র বুদ্ধের পরিবর্তে সর্বোচ্চ মহিয়সী শক্তিকে শূন্য বা বজ্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বজ্রের ধারণা হইতে বজ্রযান মতের উদ্ভব হইয়াছে।

জগতের কারণ-রূপেও বলা হইয়াছে, এই শূন্য আপনাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলি স্কন্ধ নামে পরিচিত এবং সাংখ্যোক্ত পঞ্চভূতের ন্যায় জগৎকারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবই এই পঞ্চ স্কন্ধের নাম নির্দেশ করিয়া গিযাছিলেন। এই নামগুলি হইল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চ স্কন্ধও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান এবং ইহাদের স্বভাবও শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পাঁচ স্কন্ধের একত্র সমাবেশ হয় তখনই দৃশ্যমান জীবে পরিণত হইয়া থাকে। দৃশ্যমান বলিলাম এইজন্য যে, যেহেতু পঞ্চ স্কন্ধ শূন্যাত্মক সেইহেতু জীব-জগৎও শূন্যাত্মক অর্থাৎ অলীক মিথ্যা মায়া বা ভ্রম। সুতরাং জীব-জগতের প্রকৃত কোন সত্তা নাই—পঞ্চ স্কন্ধের বিজৃম্ভনমাত্র।

যাই হোক, গুহ্যসমাজতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে উক্ত পাঁচ স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধ। এই পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের নাম যথাক্রমে—বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এই পাঁচটি ছাড়া আরও একটি ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধের কল্পনা করা হয়। ইহার নাম বজ্রসত্ত্ব। ইনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পুরোহিতরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বজ্রসত্ত্বের বিগ্রহ দুই প্রকারের—-একক এবং যুগনদ্ধ। যুগনদ্ধরূপে ইনি শক্তিব দ্বারা আলিঙ্গিত থাকেন। সেই শক্তির নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধেরও একটি করিয়া শক্তি কল্পিত হইয়াছে। এই পাঁচ বিভিন্ন শক্তিরও বিবরণ প্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শক্তি সমন্বিত পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধের প্রত্যেকটি হইতে একটি করিয়া 'কুল'-এর উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি কুলের নাম যথাক্রমে দ্বেষকুল, মোহকুল, রাগকুল, চিন্তামণিকুল, এবং সময়কুল। দ্বেষকুলের প্রবর্তক ও অধিপতি অক্ষোভ্য, মোহকুলের বৈরোচন, রাগকুলের অমিতাভ, চিন্তামণিকুলের রত্নসম্ভব এবং সময়কুলের অমোঘসিদ্ধি। পঞ্চকুলের উৎপত্তির সন্ধানও প্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। কুল বা বংশ হিসাবে বজ্রযানে এই পাঁচটি কুলই প্রচলিত ছিল। ব্রজসত্ত্বের কোনো কুল ছিল না। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ কুল হইতে অসংখ্য দেবদেবীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই অগণিত দেবদেবীর পরিচয় 'সাধনমালা'য় পাওয়া যায়। নিষ্পন্নযোগাবলীতে প্রায ছয় শত দেবদেবীব বিবরণ দেওয়া

আছে—ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেবদেবীর পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে—

হেরুক—বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘে হেরুক একজন অতি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দেবতা। ইঁহার জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। হেরুক যখন শক্তির সহিত যুগনদ্ধ মূর্তিতে থাকেন তখন তাঁহার নাম হয় হেবজ্র।

কালচক্র—কালচক্র আদি যানের এক প্রধান দেবতা। তাঁহার নামানুসারে এই যানকে কালচক্রযান বলা হয়। কালচক্রের উপর একখানি পৃথক তন্ত্র লেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের ইহা একটি মৌলিক তন্ত্র গ্রন্থ। এই তন্ত্র গ্রন্থটির উপর একটি টীকাও রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম বিমলপ্রভা।

মহাচীনতারা—ইনি অক্ষোভ্যকুলের স্ত্রীদেবতা। এই তারার উপাসনা-পদ্ধতি মহাচীন হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া মহাচীনতারা নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করা হয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। অনন্যমনা হইয়া এই মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিলে উগ্রতারা সিদ্ধ হন। চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট এই দেবীর মূর্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শবোপরি দণ্ডায়মান হইয়া ইনি দুইটি দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং কর্ত্রি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে উৎপল ও কপাল ধারণ করেন। ইঁহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্যমূর্তি বিরাজ করে। এই তারার ধ্যান ও সাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত আছে। মনে হয় হিন্দু তান্ত্রিকগণ মহাচীনতারার উপাসনা ও মূর্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাঙ্গুলী—বজ্রযানী বৌদ্ধদের ভিতর জাঙ্গুলীদেবীর পূজা সাধনা মন্ত্রাদি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। ইহার প্রধান কারণ, এই দেবীকে তাঁহারা বিপদ-আপদের ত্রাণকর্ত্রীরূপে মনে করিতেন। সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিতে এবং সর্পদংশন করিলে তাহার বিষ নষ্ট করিতে জাঙ্গুলীদেবী ছিলেন অদ্বিতীয়। জাঙ্গুলীর নাম শুনিলে সাপ পলাইয়া যায়, এ বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সাপের বিষ শরীরে সঞ্চার করে না বলিয়াও তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এই সমস্ত বিবরণ ও জাঙ্গুলীর মন্ত্র 'সাধনমালা'য় লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দুদের মনসাদেবী জাঙ্গুলীদেবীরই প্রতিরূপ।

একজটা—সাধনমালায় কথিত আছে যে আর্য নাগার্জুন ভোট দেশ হইতে একজটার সাধনা উদ্ধার করিয়া আনেন। ইঁহার নাম একজটা হইবার কারণ এই যে, ইঁহার মস্তকের কেশরাজি জড়িত হইয়া একটি জটার আকারে মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া থাকে। ইঁহার মূর্তির বিবরণও অনেকটা মহাচীনতারার মত।

পর্ণশবরী—অক্ষোভ্যকুলের অন্তর্গত পর্ণশবরী দেবীর মহত্ত্ব বড় কম নয়। ইনি মহামারীর দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। ইঁহার পূজাপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ, প্রজ্বলিত হোম হইতে উদ্গত ধূম ইত্যাদির মহামারীর দূষিত হাওয়া শুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল বলিয়া মারীকালে ইঁহার পূজার প্রচলন হইয়াছিল।

প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদের একটি ধর্মগ্রন্থের নাম। মহাযান সম্প্রদায়ের এবং মহাযান হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার যানের অনুবর্তীদের নিকট প্রজ্ঞাপারমিতা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অথচ প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটিকে বজ্রযানে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য কুলের অন্তর্গত। কারণ ইঁহার মাথায় অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্রমূর্তি দেখা যায়।

নৈরাত্মা—অক্ষোভ্য কুলের এই দেবীকে নৈরাত্মা বলা হয়। যাহার আত্মা নাই তিনিই নৈরাত্মা। নৈরাত্মা জগৎকারণ স্বভাবশূন্য পরমশূন্যেরই একটি গুণ। এই গুণটিকে রূপায়িত করা হইয়াছে দেবীরূপে। ইঁহার আকৃতি ভয়ঙ্কর। গলায় মুণ্ডমালা পরিহিত হইয়া ইনি শবোপরি অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি এবং বাম হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল। একটি খট্টাঙ্গ তাঁহার বাম স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। নৈরাত্মাকে হেরুকের শক্তিরূপেও কল্পনা করা হয়।

ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিপতি। তাঁহার কুলের অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে উপরে কয়েকটিরই মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। গুহ্যসমাজে দেখা যায় অক্ষোভ্য "বজ্রধৃক" মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন হন, এবং তাঁহার শক্তি মামকী "দ্বেষরতি" মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া দেবতাকারে প্রকাশিত হন।

বৈরোচন কুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন। ইনি পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে রূপস্কন্ধের অধিপতি। বৈরোচনের শক্তি লোচনা বা রোচনা। গুহ্যসমাজতন্ত্রে দেখা যায় বৈরোচন "জিনজিক্" মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তি "মোহরতি" মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইযা দেবীরূপে আবির্ভূতা হন। বৈরোচন কুলোদ্ভব কযেকটি দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়। নিম্নে এই কুলের দুইটি দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মারীচী—মারীচী বৈরোচন কুলের মুখ্য দেবী। ইনি বৌদ্ধদিগের সূর্যদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। হিন্দুদের সূর্যদেবতা যেমন সপ্তাশ্বরথে বিচরণ করেন, মারীচী তেমনই সপ্তশূকর রথে আরূঢ়া। মারীচীর বিবরণ বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। মারীচীর পূজা নেপালে এবং তিব্বতে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।

বজ্রবারাহী—বৈরোচন কুলের দেবী বজ্রবারাহী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের অতি প্রিয় দেবী। ইঁহার পূজা ও সাধনার জন্য পৃথক্ তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইনি দিগ্‌বসনা হইয়া শবের উপর অর্ধপর্যাঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার বর্ণনা অক্ষোভ্য কুলের নৈরাত্মা দেবীর অনুরূপ। ইঁহার মাথার পার্শ্বদেশ হইতে একটি বরাহমুখ বহির্গত হয়। এই বিকৃতির জন্যই দেবীর নাম হইয়াছে বজ্রবারাহী। নেপালে ও তিব্বতে বজ্রবারাহী খুব জনপ্রিয়।

রত্নসম্ভব কুলেব প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব। ইনি পৃথ্বী-তত্ত্বের দ্যোতক।

পৃথিবীর যাবতীয় শস্য ধন রত্নাদির উৎপত্তিস্থল ইনি। ইঁহার বর্ণ পীত। ইঁহার শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী। ইনি পঞ্চস্কন্ধের ভিতর বেদনা নামক স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহার কুলের নাম রত্নকুল। রত্নচ্ছটা এই কুলের প্রতীকাচিহ্ন। গুহ্যসমাজতন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি "রত্নধৃক" মন্ত্রপদের স্পন্দন হইতে ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিও "ঈর্ষ্যারতি" মন্ত্রপদের তরঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই কুলের দেবতার সংখ্যাও বেশী নয়। পুরুষ-দেবতা অপেক্ষা স্ত্রী দেবতারই আধিক্য এই কুলে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে মাত্র দুইটি দেবীব উল্লেখ করা হইল।

বজ্রতারা—বজ্রতারার মূর্তি নানা রকমের পাওয়া যায়। তাঁহার মূর্তির আধিক্য দেখিয়া মনে হয় বজ্রতারা শক্তিশালী দেবী ছিলেন। এবং তাঁহার মূর্তি, মন্ত্র, উপাসনা সমাজের নানা কাজে ব্যবহৃত হইত। তাই বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ভিতর তিনি জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বজ্রতারার একটি পূর্ণ মণ্ডলের বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে তাঁহার সমস্ত আবরণ-দেবতার খবর পাওয়া যায়। তাঁহার মন্ত্র দশাক্ষর—"ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা"। এই দশ অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে এক একটি দেবীর উৎপত্তি হয় এবং এই দশ দেবী দ্বারা তিনি পরিবৃতা থাকেন।

বজ্রযোগিনী—রত্নসম্ভব কুলের এই দেবী অত্যন্ত প্রভাবশালী। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। বলা হয়, ইঁহার মন্ত্র এক লক্ষ বার জপ করিলে দেবী সিদ্ধ হন এবং সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইঁহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দু দেবী ছিন্নমস্তার মত। মনে হয়, কালক্রমে বৌদ্ধ বজ্রযোগিনী হিন্দু ছিন্নমস্তাতে পরিণত হইয়াছিলেন। কারণ ধ্যানে তাঁহার যে মূর্তি কল্পিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দেবী স্বয়ং নিজ মস্তক দক্ষিণ হস্তধৃত কর্ত্রি দ্বারা কর্তিত করিয়া বাম হস্তে বক্ষের নিকট ধারণ করেন এবং তাঁহার কবন্ধ হইতে নিঃসৃত একটি রক্তধারা তাঁহার কর্তিত মুখে প্রবেশ করে। অপর দুইটি রক্তধারা দুই পার্শে অবস্থিত দুইটি যোগিনীর মুখে প্রবেশ করে। এই দুইটি যোগিনীর নাম বজ্রবর্ণনী ও বজ্রবৈরোচনী। বজ্রযোগিনীর নামে পৃথক্ তন্ত্র লিখিত হইয়াছিল।

অমোঘসিদ্ধি কুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি। যাঁহার সিদ্ধি অমোঘ অর্থাৎ অব্যর্থ, তিনিই অমোঘসিদ্ধি। তাঁহার শক্তির নাম তারা, তারিণী বা আর্যতারা। এই কুলের প্রতীক চিহ্ন হইল বিশ্ববজ্র।

অমোঘসিদ্ধি পঞ্চস্কন্ধের ভিতর সংস্কারস্কন্ধের অধিষ্ঠাতা। গুহ্যসমাজতন্ত্র হইতে জানা যায় যে তিনি "প্রজ্ঞাধৃক" এই বজ্রপদের স্পন্দন হইতে ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিও "বজ্ররতি"

এই মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন। একজন পুরুষদেবতা এবং অনেকগুলি স্ত্রীদেবতা এই কুলের অন্তর্ভুক্ত।

অমিতাভ কুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ। অমিতাভের অর্থ অমিত বা অপরিমিত আভা বা দীপ্তি যাহার আছে, তিনিই অমিতাভ। তাঁহার শক্তির নাম পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী। পদ্মই এই কুলের প্রতীক চিহ্ন। গুহ্যসমাজতন্ত্রে দেখা যায় অমিতাভ "আরোলিক্" মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন হন এবং পাণ্ডরবাসিনী "রাগরতি" মন্ত্রাক্ষর হইতে ঘনীভূত হইয়া দেবতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। কয়েকটি পুরুষদেবতা এবং কয়েকটি স্ত্রীদেবতা এই কুলের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে পঞ্চ কুলোদ্ভূত অসংখ্য দেবদেবীর বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদিও গুহ্যসমাজতন্ত্রে এই সমস্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীদের সাধনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি মনে হয় পাল রাজত্বের সময় হইতেই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ঐ সমস্ত দেবদেবীদের সাধনা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এবং ঐ সমস্ত দেবদেবীর ধ্যান-মন্ত্র হইতে মূর্তিশিল্পের বা ভাস্কর্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

গুহ্যসমাজতন্ত্র বৌদ্ধধর্মে দুইটি অভিনব উপাদানের সংযোজন করে—একটি প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের সঙ্গে একটি করিয়া শক্তির কল্পনা এবং অপরটি কুলের অবতারণা অর্থাৎ প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের কুল বা বংশের সন্তান-সন্ততি রূপে বিভিন্ন অগণিত দেবদেবীর পরিকল্পনা। এই সকল দেবতা স্ব স্ব কুলের পরিচয় হিসাবে সেই সেই কুলের প্রবর্তকের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকের উপর ধারণ করিয়া থাকেন। এইভাবে কুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

কুল বা বংশ হিসাবে বজ্রযানেও পাঁচটি কুলই প্রচলিত ছিল। হীনযান বা মহাযানে কুলেব কোনো উল্লেখ নাই। গুহ্যসমাজতন্ত্রেই প্রথম কুলের উল্লেখ পাই এবং পরবর্তী বৌদ্ধতন্ত্র-যানগুলিতে সাধকদের কুল-নির্ধারণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। স্ব স্ব কুলের পূজা-পদ্ধতি আচার-ব্যবহার মান্য করিয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহাদের 'কৌল' বলা হইত এবং তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি বা সাধন-প্রক্রিয়াকে 'কুলাচার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে কুলদেবতা অনেক এবং মন্ত্রও অনেক। সকল সাধকের জন্য এক মন্ত্র কার্যকরী নয়। সাধকের প্রকৃতি ও গুণানুযায়ী মন্ত্রের প্রয়োজন। এই কারণে সাধকের কুল নির্ণয়ের আবশ্যক। প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধই সংসারের বীজস্বরূপ। এই পঞ্চস্কন্ধ যতক্ষণ নষ্ট না হয় ততক্ষণই পুনর্জন্ম সংসার ও দুঃখকষ্ট। পঞ্চস্কন্ধ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের সূক্ষ্মাবস্থা। বৌদ্ধতন্ত্রমতে পঞ্চস্কন্ধাত্মক শক্তিই কুলের প্রতীক। সুতরাং কুলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই বৌদ্ধ তন্ত্র-সাধক তাঁহার গুণানুযায়ী কুলকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসব

হন। সুতরাং সাধকের অন্তর্নিহিত কর্মবীজের দ্বারাই কুলের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

তন্ত্র সাধনায় শক্তির প্রচলন গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রথম প্রবর্তন করে। শুধু বুদ্ধতন্ত্রে নহে, সমস্ত তন্ত্রসাহিত্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। গুহ্যসমাজতন্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার অভিষেকের বর্ণনার সঙ্গে 'প্রজ্ঞাভিষেকে'র বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রজ্ঞাভিষেক অর্থে প্রজ্ঞা অর্থাৎ শক্তির প্রতীক সাধিকার সহিত শিষ্যের অভিষেক বা দীক্ষা। সেখানে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে গুরু যোগবিদ্যায় পারদর্শী এবং শিষ্যের উপযোগী এরূপ এক সুন্দরী সাধিকার হস্ত ধারণ করিয়া শক্তিরূপে সেই শিষ্যের হাতে সমর্পণ করিবেন। সমর্পণকালে সাক্ষীস্বরূপ 'তথাগত'দেব আবাহন করিবেন। তাহার পর তিনি শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিবেন, যেহেতু অন্য উপায়ে বুদ্ধত্বলাভ সম্ভব নয় সেইহেতু এই বিদ্যারূপী শক্তিকে শিষ্যগ্রহণ করিয়া আজীবন তাঁহার সহিত একসঙ্গে যোগসাধনা করিবে। জীবনে সে যেন বিদ্যাকে পরিত্যাগ না করে। ইহাই 'বিদ্যাব্রত' বা বিদ্যার ব্রত পালন বলিয়া বৌদ্ধতন্ত্রে প্রচলিত। ইহার প্রত্যবায় ঘটিলে শিষ্য কখন উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধতন্ত্র চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) চর্যাতন্ত্র, (২) ক্রিয়াতন্ত্র, (৩) যোগতন্ত্র এবং (৪) অনুত্তরযোগতন্ত্র। শিষ্যদের আধারভেদ অনুসারে তন্ত্রের এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম দুই শ্রেণী শিষ্যদের প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে এবং সেখানে শিষ্যের হস্তে শক্তি সমর্পণের কোন প্রশ্নই উঠে না। পরের দুই স্তরে শিষ্যদের আধারের যোগ্যতা বিচার করিয়া উত্তম সিদ্ধি লাভের জন্য শক্তি প্রদান করা হয়।

মন্ত্রযান—মন্ত্রযান বলিতে মন্ত্র, যন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বুঝায়। ধারণী, মালা মন্ত্র, হৃদয় মন্ত্র প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রযান-সাধনপদ্ধতিতে ইহারাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে মন্ত্রের দ্বারা বিকশিত ও আয়ত্ত করিতে না পারিলে সাধক বোধিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সুতরাং চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে মন্ত্র, মুদ্রা, ধারণী ও মণ্ডলের প্রয়োজন।

মন্ত্র শব্দবীজ। সুতরাং সেই মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা ও আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। এই শব্দবীজ যখন সাধকের নিকট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় তখনই নানা দেবদেবীর পরিকল্পনা হয়। শক্তির বিকাশ অসংখ্যভাবে হইতে পারে, তাই দেবদেবীও অসংখ্য। দেবদেবীরা যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁহারা তাঁহাদের গুণানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপে দেবদেবীদের সমাবেশে মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। এই মণ্ডলের

কেন্দ্রে উপবেশন করেন মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর তাঁহার চারিদিকে বৃত্তাকারে তাঁহারই মণ্ডলের দেবদেবীগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। মন্ত্র যখন এই ভাবে মূর্ত হইয়া উঠে তখন দেবতাদের আবাহন হয় মুদ্রায়। মুদ্রা বিভিন্ন ভঙ্গীতে করন্যাস মাত্র। সুতরাং করন্যাসের ভঙ্গীতেই সাধক দেবতাদের আবাহন করেন। অতএব করন্যাসই সাধকের মূক ভাষা। বজ্রযানে দেখিতে পাওয়া যায় মুদ্রা বহু প্রকারের।

মন্ত্রযানের প্রচলন যে কবে হইয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন। 'মন্ত্র' এবং 'ধারণী'সমূহ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয়। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে নাগার্জুনই প্রথম মন্ত্রযানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করেন। কথিত আছে, নাগার্জুন ইহা ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের নিকট হইতে বোধিসত্ত্ব বজ্রসত্ত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত হন। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থটি মন্ত্র, মণ্ডল এবং ধারণীসমূহের বিবরণে পরিপূর্ণ। সেইরূপ 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' ও 'সদ্ধর্ম-পুণ্ডরিকা' গ্রন্থদ্বয়েও মন্ত্র, মণ্ডল ও ধারণীসমূহের পর্যাপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইযাছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বৌদ্ধতন্ত্রসাধকদের মধ্যে মন্ত্রযান দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অর্থাৎ তিব্বতীয প্রবাদ অনুসারে নাগার্জুনের সময় হইতে বুদ্ধত্বলাভের একটি নির্দিষ্ট মার্গ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছিল।

বজ্রযান—গুহ্যসমাজতন্ত্রে বর্ণিত মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ও তাঁহাদের শক্তি এবং পঞ্চকুলের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিযা মিষ্টিক যোগ ও হঠযোগ সহকারে যে একটি পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধতন্ত্রযানের প্রবর্তন হইল তাহার নাম 'বজ্রযান'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ধর্মে দেবদেবীই শুধু অসংখ্য নহে, এই সমস্ত দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে মিষ্টিক যোগ ও হঠযোগের অবতারণা করিয়া বৌদ্ধ সাধকগণ বৌদ্ধতন্ত্রযানে একটি নূতন কলেবর দান করিলেন। বজ্রযানের অনেক তন্ত্রসাধকই মিস্টিক যোগ ও হঠযোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং 'সিদ্ধাচার্য' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই বজ্রযান ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। সুতরাং বজ্রযান যে সেই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখানে বলা অসংঙ্গত হইবে না যে নাথধর্ম ও নাথসম্প্রদায় বজ্রযান হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ নাথযোগিগণ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদেরই শিষ্য ছিলেন এবং নয়জন নাথযোগী তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ

করিয়া চুরাশিজন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্র প্রভাবিত নাথধর্মেব উৎস হিসাবে হব-পার্বতীর ভূমিকার অবতাবণা করিয়া পরবর্তীকালে নাথধর্মকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস অনুধাবন কবিলে সহজেই বুঝা যায় যে বজ্রযানধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ নিকটতর। তবে নাথধর্মে আচরিত হঠযোগ ও যোগ সাধনায় অনেক নূতন নূতন পদ্ধতির আমদানি করা হইয়াছিল। সেইজন্য ইহা বজ্রযানের হঠযোগ ও যোগ সাধনার প্রণালি হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। নাথযোগিদের সাধন-সংক্রান্ত বিবরণ ও পরিচয় সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, যেমন—গোরক্ষ সংহিতা, গোরক্ষ-শতক, হঠযোগ-প্রদীপিকা, শিব সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা এবং সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ।

নাথযোগীদের প্রধান লক্ষ্য হইল 'মহাজ্ঞান' লাভের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া অমর হওয়া। হঠযোগের আশ্রয় ভিন্ন মহাজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাঁহাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল মন্ত্র-সিদ্ধি বা কায-সাধনার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করা। তাঁহারা দেহ-ভাণ্ডকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া মনে করিতেন অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহা এই ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডেও আছে। সুতরাং কায়া সাধিলে শুধু অজর, অমরই হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব—এই অষ্ট যোগ-বিভূতিরও অধিকারী হওয়া যায়। যোগ-বিভূতির অধিকারী হইলে বাহ্য প্রকৃতির উপর বিজয় লাভ করিয়া নানা অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের দ্বারা বিরুদ্ধ পবিবেশকে বশীভূত করিয়া সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

বজ্রযানের সঙ্গে নাথযোগের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার জন্য উপরে নাথযোগিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। পুনরায় আমাদের বজ্রযানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

শূন্যকে বজ্রযানে 'বজ্র' আখ্যা দেওয়া হয। তাহার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অবিনাশী। অতএব শূন্যের নামই বজ্র এবং যে মার্গ অবলম্বনে শূন্যের সহিত মিলিত হওয়া যায় সেই মার্গই শূন্যযান বা বজ্রযান।

বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধ। ইনিই সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র। অতএব আদিবুদ্ধ শূন্যেরই রূপকল্পনা। আদিবুদ্ধ হইতেই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের উদ্‌ভব। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা।

আদিবুদ্ধ বা শূন্য যখন দেবতার মূর্তিতে কল্পিত হন তখন তাঁহার নাম হয় 'বজ্রধর' এবং তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার দুইটি হস্ত বক্ষের উপর বজ্রহুঙ্কার মুদ্রায় অবস্থান করে এবং হাত দুইটিতে

বজ্র ও ঘণ্টা থাকে। বজ্র থাকে দক্ষিণ হস্তে এবং ঘণ্টা থাকে বাম হস্তে। তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত কোনো কোনো মূর্তিতে তাঁহাকে যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে—একটি একক বা শূন্যমূর্তি এবং অপরটি যুগনদ্ধ বা বোধিচিত্ত-মূর্তি। একটি শূন্যতা ও অপরটি করুণা। বজ্রযানের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ 'জ্ঞানসিদ্ধি'তে উক্ত হইয়াছে—'বোধিচিত্তং ভবেৎ বজ্রং' অর্থাৎ বোধিচিত্তই হইতেছে বজ্র। পারমার্থিক অর্থে বোধিচিত্তের সেই অবস্থা বুঝায় যাহা হইতে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। তান্ত্রিক যোগ-সাধনায় বোধিচিত্ত যখন স্থির স্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন তাহা বজ্রের মত কঠিন, অভেদ্য ও অবিনাশী হয়। এইজন্যই যে সমস্ত বজ্রযানাবলম্বী যোগী বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাহাকে বজ্রাসন বলা হয়। এরূপ ধারণা যে খুব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে যে আসনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা সেই যুগেই বজ্রাসন আখ্যা পাইয়াছিল।

বোধিচিত্ত বজ্রস্বভাবসম্পন্ন হইলে বৌদ্ধ সাধক বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সেইজন্যই জ্ঞানসিদ্ধি গ্রন্থের অন্যত্র বলা হইয়াছে—'সর্বতাথাগতং জ্ঞানং বজ্রযানমিতি স্মৃতং।' অর্থাৎ বুদ্ধগণ যে জ্ঞানলাভ করেন তাহাকে বলা হয় 'তথাগত' জ্ঞান। বজ্রযান বৌদ্ধদের মতে পারমার্থিক সত্য যাহা তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাঁহারা সেই সত্য উপলব্ধি করেন তাঁহারা উপনিষদের ঋষিদের 'নেতি নেতি' বচনের ন্যায় সেই সত্যকে 'তথা' বা 'সেই রকম' বলিয়া উহার আভাস দেবার চেষ্টা করেন। সেই সত্যের বা শূন্যের ধারক ও বাহক হইয়া বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই তাঁহারা 'তথাগত'। সুতরাং বজ্রযানের শেষ প্রতিপাদ্য বিষয় যদি সেই বোধিজ্ঞানই বুঝায়, তাহা হইলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উহার মূলতঃ কোনো প্রভেদ নাই। শুধু সেই সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য বজ্রযানপন্থীরা এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন মাত্র।

এই নূতন সাধন-পদ্ধতি তাঁহাদের মতে অত্যন্ত গুহ্য। সেই কারণে কোনো গ্রন্থেই সুস্পষ্ট, সরল ভাষায় তাহার ব্যাখা পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে যে পরিভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করা বর্তমানে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুরূহ। যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, এই নূতন সাধন পদ্ধতিতে 'হঠযোগ, মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডল' প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধক মনে করিতেন যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে না পারিলে চরম সত্যের

অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া দেবদেবীর আবাহনের জন্য তাঁহাদের মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের প্রয়োজন হইত।

দেবদেবীর মূর্তি দর্শন ও তাহাদের পূজা বজ্রযানের এক বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগের পরে পাল রাজত্বের সময় বাংলায় এবং বিহারে নানা প্রকারের মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই বজ্রযানের দেবতামণ্ডলের। এই মূর্তিগুলি হইতেই বুঝা যায় যে পালযুগেই বজ্রযান পূর্ণবিকাশলাভ করিয়াছিল। পালযুগেই নালন্দা এবং বিক্রমশীলা মহাবিহারে তন্ত্রের রীতিমত অনুশীলন হইত এবং চর্যাতন্ত্র, ক্রিয়াতন্ত্র, যোগতন্ত্র এবং অনুত্তর যোগতন্ত্র—-এই চারি প্রকার তন্ত্রের শিক্ষা দানের জন্য অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বজ্রযানের যোগ, মন্ত্র, তন্ত্র ও চর্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উপর সহস্র সহস্র পুঁথি এবং স্তোত্রাবলী রচিত হইয়াছিল। সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বজ্রযানের প্রভাব অধিক মাত্রায় পড়িয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের পর মহাযান ও বিভিন্ন তন্ত্রযান বিশেষতঃ বজ্রযান নেপালে স্থানান্তরিত হয়। বিভিন্ন মঠ ও বিহারের আচার্যগণ তাঁহাদের পুঁথিপত্র, দেবতার বিগ্রহাদি লইয়া নেপালে পলায়ন করেন। সেইজন্য সর্বাপেক্ষা বেশি ও বিভিন্ন প্রকারের দেবতামূর্তি, চিত্র, প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য দর্শন ও তন্ত্রের সংগ্রহ নেপালেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রযান হইতেই পরবর্তীকালে কালচক্রযান ও সহজযানের উৎপত্তি। এই দুই যানকে বস্তুতঃ বজ্রযানেরই অন্তর্ভুক্ত দুই শাখা সম্প্রদায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং ইহাদেরও মূল গুহ্যসমাজতন্ত্রে নিহিত।

কালচক্রযান—কালচক্রযানের একটি পুঁথি নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুঁথির নাম হইল 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজ টীকা'। ইহার অপর নাম 'বিমলপ্রভা'। সুচন্দ্র এই টীকার রচয়িতা। কালচক্রযানের আর একজন প্রচারক ছিলেন অভয়াকর গুপ্ত। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, খুব সম্ভব বাঙ্গালী এবং পালবংশীয় রাজা রামপালের সমসাময়িক। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধকপালতন্ত্র টীকা' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বিমলপ্রভায় কালচক্রের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে কালচক্র শূন্যতা ও করুণার মিলিত বিগ্রহ। এই বিগ্রহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে শক্তিরূপিনী ভগবতী প্রজ্ঞা। কালচক্র এই সম্প্রদায়ে আদিবুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। তিনিই সমস্ত বুদ্ধের জনকস্বরূপ। ত্রিকাল এবং ত্রিকায় তাঁহারই মধ্যে নিহিত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালের এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে পরম সত্যের জ্ঞান হয়। কালচক্রের মধ্যে সেই পরম সত্যের জ্ঞান নিহিত।

মহাযানপন্থীগণ পারমার্থিক এবং সাংবৃতিক—এই দুই সত্যে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং বুদ্ধও দুই প্রকারের—পারমার্থিক বুদ্ধ ও সাংবৃতিক বুদ্ধ। পারমার্থিক বুদ্ধ হইলেন ধর্মকায় বুদ্ধ। সাংবৃতিক জগতের বুদ্ধ দুই রকমের—নির্মাণকায় এবং সম্ভোগকায়। যখন তিনি সাধারণ শিষ্যদের শিক্ষার জন্য সূত্র অবদান প্রভৃতি ব্যক্ত করেন তখন তিনি নির্মাণকায় বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বদের নিকট যখন তিনি গূঢ় ধর্মার্থ ব্যক্ত করেন তখন তিনি সম্ভোগকায়ে বিচরণ করেন। যখন পারমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন তখন তিনি ধর্মকায়ে অবস্থান করেন। ধর্মকায় একটি; নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায় বহু। কালচক্রযান মতে কালচক্রে যখন প্রবেশ হয় তখন কায়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তাহাকে ধর্মকায়াত্মক মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং কালচক্র অদ্বয় জ্ঞানবিশিষ্ট। কিন্তু ইহাকে ঠিক বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। কারণ কালচক্র করুণাত্মক, প্রজ্ঞারূপ শক্তিসংযুক্ত এবং সমস্ত বুদ্ধের জনক বলিয়া উল্লেখিত। সুতরাং কালচক্র হইলেন আদিবুদ্ধ, ভগবতী-প্রজ্ঞা তাঁহার শক্তি। উভয়ে সম্মিলিত হইয়া লোকহিতকল্পে করুণাবশতঃ অসংখ্য বুদ্ধ সৃষ্টি করেন যাঁহারা সম্ভোকায় ও নির্মাণকায়ে অবস্থিত থাকিয়া জগৎ-কল্যাণ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই প্রসঙ্গে মহাকরুণার অবতার বোধিসত্ত্ব 'অবলোকিতেশ্বরে'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর করুণার অবতার, মহাকারুণিক। তিনি জগতের দুঃখ দেখিয়া এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের মোক্ষ বা নির্বাণ নিজের যোগ্যতায় অর্জন করিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন না পৃথিবীর সকল প্রাণী সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে ততদিন তিনি নির্বাণ লাভ করিবেন না, তথাগতরূপে তাহাদের পরিত্রাণের জন্য ধর্মোপদেশ দিয়া যাইবেন। এই দিব্য ত্যাগের বাণী গৌতম বুদ্ধের পর অবলোকিতেশ্বর প্রচার করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের এই আদর্শই মহাযানের সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শ। তাঁহার মহাকরুণাই মহাযানের মূল তত্ত্ব। প্রত্যেক বৌদ্ধমার্গীর করুণার উদয় হওয়া আবশ্যক। কারণ মহাযান বৌদ্ধদর্শনে বলে, মোক্ষের পথে দুইটি অচ্ছেদ্য আবরণ থাকে—একটির নাম ক্লেশাবরণ এবং অপরটির নাম জ্ঞেয়াবরণ। শূন্যতার উপলব্ধি হইলে ক্লেশের আবরণটি অপসারিত হয়। কিন্তু নিজের মোক্ষরূপ কাম্যবস্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া পরার্থে তৎপর না হইলে জ্ঞেয়াবরণকে ছিন্ন করা যায় না এবং তাহার ফলে প্রকৃত মুক্তিলাভও হয় না।

সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী এবং অপরাপর বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে অবলোকিতেশ্বরের নানাপ্রকারের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। তাঁহাব সেই সমস্ত রূপ বিভিন্ন বৌদ্ধ

সাধক যেভাবে সমাধির সময় মানসচক্ষে দর্শন করিয়া ধ্যানমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সমস্ত ধ্যান মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পীরা মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের নানাবিধ মূর্তি ভারতের নানাস্থানে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে, মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি দেশে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা কালচক্রযান সম্বন্ধে ফিরিয়া আসি। কালচক্রযান সম্প্রদায়ের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা সাধন বিষয়ের কথাই বেশী। কালচক্র-বিগ্রহ দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তিনি শক্তির দ্বারা আলিঙ্গিতা। কালচক্র-বিগ্রহের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বা মণ্ডলাকারে যে সমস্ত দেবতা বিরাজ করেন তাঁহারা সকলেই গ্রহ ও নক্ষত্র। অভয়াকরগুপ্ত 'কালচক্রাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি' প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ কালচক্রপন্থী সাধকগণ গ্রহনক্ষত্রের গতি অনুসারে যোগসাধনার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের মতে সে গতি অতিক্রম করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এই কারণেই হয়ত এই সম্প্রদায়কে কালচক্রযান আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। সাধনায় ইঁহারা বজ্রযানের যোগতন্ত্র এবং অনুত্তরযোগতন্ত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং দেহ-ভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া মনে করিতেন।

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীকে কালচক্রতন্ত্রের আদি প্রবর্তক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে। বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলের মধ্যে মঞ্জুশ্রী অগ্রগণ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, মঞ্জুশ্রীর পূজাপদ্ধতি সংক্রান্ত পুঁথি 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে ছাপা হইয়াছে। এই পুঁথিটি গুহ্যসমাজতন্ত্রেরও পূর্ববর্তী গ্রন্থ। কারণ গুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীর নাম বহুবার পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রী নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'অমিতায়ুঃ সূত্রে'। বইটির অপর নাম 'সুখাবতী ব্যূহ'। এই বইটির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ চীনা ভাষায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তর্জমা হইয়াছিল। এই সকল তথ্য হইতে মনে হয় মঞ্জুশ্রীর দেবমূর্তি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কল্পিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে মঞ্জুশ্রীর প্রভাব খুবই বিস্তৃত হইয়াছিল।

ভারতে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে, মাঞ্চুরিয়ায় মঞ্জুশ্রীর প্রস্তরমূর্তি এবং ধাতুমূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মঞ্জুশ্রী পরাবিদ্যার ও পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁহার দক্ষিণ করে উদ্যত অসি এবং বাম করে হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। অসি দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা ছেদন করেন এবং পুস্তক দ্বারা পরাপ্রজ্ঞা বা পূর্ণ শূন্যের জ্ঞান জগতে প্রচার

করেন। সাধনমালায় মঞ্জুশ্রীর অনেকগুলি ধ্যান-স্তোত্র পাওয়া যায়। স্তোত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি অনেক রূপে এবং অনেক বর্ণে কল্পিত হইয়াছিলেন।

কালচক্রযানে প্রাচীন বৌদ্ধধারা কতটা অক্ষুন্ন ছিল তাহা বলা কঠিন। তবে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না যে প্রাচীন 'ধর্মচক্রে'র সঙ্গে কালচক্রের একটা গূঢ় সম্বন্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করিবার পর সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করিলেন। প্রাচীন সূত্রকারেরা এই ধর্মপ্রচার কার্যকে বলিয়াছেন—'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'। এই ধর্মচক্র দ্বাদশ অরবিশিষ্ট। এই দ্বাদশটি 'অর' কি, সে সম্বন্ধে সূত্রকারেরা নীরব। সূর্য যে দ্বাদশটি রাশির সঙ্গে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন তাহা প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরা জানিতেন। সূর্যের এই পরিভ্রমণ কালচক্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

সহজযান—কথিত আছে উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতির ভগ্নী লক্ষ্মীঙ্করা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সহজযান মার্গের প্রবর্তন করেন। তিনি শক্তি-সাধনার উপরই অধিক জোর দেন এবং এই শক্তি-সাধনা দেহভিত্তিক। সুতরাং যোগ-তন্ত্রের উপর এই যান প্রতিষ্ঠিত। বজ্রযান এবং কালচক্রযানও যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি সহজযান হইতে উহাদের পার্থক্য হইল এই যে উহারা যোগ-সাধনার সঙ্গে মন্ত্র ও মণ্ডলেরও প্রাধান্য দান করিয়াছে, কিন্তু সহজযানে মন্ত্রের স্থান গৌণ।

সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্রের বেশীর ভাগ তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। কয়েকটি মূল গ্রন্থ নেপাল হইতে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসার ফল। শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে চারিখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই চারিটি গ্রন্থের নাম হইল (১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, (২) দোঁহাকোষ—সরোজবজ্রকৃত, (৩) দোঁহাকোষ—কৃষ্ণপাদাচার্য-কৃত (সহজাম্নায় পঞ্জিকা) ও (৪) ডাকার্ণব। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে (কলিকাতা) সংরক্ষিত হস্তলিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডঃ বিনযতোষ ভট্টাচার্য বরোদা হইতে 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করিযাছেন। ইহা ছাড়া আছে অদ্বয়বজ্রকৃত সংগ্রহ, ইন্দ্রভূতির জ্ঞানসিদ্ধি, অনঙ্গবজ্রেব প্রজ্ঞোপাযবিনিশ্চয়সিদ্ধি প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থ হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তথ্যেব সন্ধান পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রাচীন বৌদ্ধ গানগুলি চর্যাপদ নামে প্রকাশ করিযাছেন সেগুলি বৌদ্ধ সহজযানপন্থীদের গান। এইসব গানের রচয়িতা

আর্যদেব, ভুসুক, কাহ্ন, সরহ, লুই প্রভৃতি আচার্য্যগণ তিব্বতী সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, সিদ্ধাচার্য্যদের হাতেই সহজযান গড়িয়া উঠিয়াছিল। চর্যাপদগুলির মধ্যে সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে-সব ইঙ্গিত আছে তাহা এমন একটি পরিভাষার মধ্যে আবদ্ধ যাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু সহজযানপন্থার বিশদরূপ আলোচনা আমরা দেখিতে পাই দোঁহাকোষ গ্রন্থসমূহে। তিল্লোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্নপাদের রচিত তিনখানি সম্পূর্ণ দোঁহাকোষও পাওয়া গিয়াছে। ঐ তিনজনই ছিলেন সহজসিদ্ধ। দোঁহাকোষের ভাষা অপভ্রংশ বা দশম-একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত প্রাকৃত। দোঁহাকোষগুলি হইতে সহজযানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এই যে, সহজযানে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন স্থান ছিল না। সেইজন্য সরহপাদের দোঁহাকোষে ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক, একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী, জটাধারী, ক্ষপণক প্রভৃতি প্রত্যেককেই উপহাস করা হইয়াছে। সহজযানের হঠযোগীগণ পূজা-অর্চ্চনা বা মন্ত্রজপে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে যে-সব বৌদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সূত্র বা শাস্ত্রপাঠে সময় অতিবাহিত করে, তাহারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না—

"মোক্ষ কি লব্ভই ঝান পবিট্টো।
কিন্তহ কিজ্জই কিন্তহ নিবেজ্জঁ।
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ॥"

প্রব্রজ্যা, শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, পূজা-অর্চ্চনা—এ সবই যখন নিরর্থক, তখন কিসে মোক্ষ লাভ হয়? সরহপাদ স্পষ্ট ভাষাতেই সে কথার উত্তর দিয়াছেন—

"জহি মন পবন ন সঞ্চরই রবি সসি নাহ পবেস।
তহি বঢ় চিত্ত বিসাস করু সরহেঁ কহি অ উএস॥
এক্কু করুরে মা করু বেন্নি জানে ন করহ বিন্ন।
এহুঁ তিহু অন সঅল মহারাএঁ এক্কু করু বন্ন॥
আই ন অন্ত ন মজ্ঝ নউ নউ ভব নউ নিব্বান।
এহুঁ সো পরম মহাসুহ নউ পর নউ অপ্পান॥
ইন্দিঅ জত্থু বিল অ গউ ন ঠিউ অপ্প-সহাবা।
সো হলে সহজ তনু ফুড় পুচ্ছহি গুরু পাবা॥"

অর্থাৎ, 'যেখানে মন-পবন সঞ্চরণ করে না, রবি-শশী প্রবেশ করে না, সেখানে চিত্তকে বিশ্রাম করিতে দাও। সমস্তই এক। দুই বা ভেদজ্ঞান পোষণ করিও না। যান বা পথও এক। সমস্ত ত্রিভুবন এই একেই পূর্ণ। আদি অন্ত বা মধ্য কিছুই নাই, জন্ম নাই, নির্বাণও নাই। পরমমহাসুখই একমাত্র সত্য, আত্ম-পর নাই। যখন ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হয়, আত্মজ্ঞানের স্থিতি নষ্ট

হয়, তখনই সহজকায়ের স্ফূর্তি হয়। এ রহস্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাওয়া যায়।'

অতএব বুঝিতে পারা যায়, সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সহজকায়ের স্ফূর্তি হইলে সমস্ত কিছুই বিলুপ্ত হয়। ভাব এবং অভাব কিছুই থাকে না। শূন্যতা ও করুণা উভয়ে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া সমরস উৎপন্ন করে। চিত্ত শূন্যতা-জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয। এই অবস্থাকে অদ্বয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কালজ্ঞান তিরোহিত হয়, আদি অন্ত বা মধ্য থাকে না। সহজকায়ের স্ফূর্তির জন্য সহজযানীরা হঠযোগকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমতে মন্ত্রযানের পরে বজ্রযান এবং বজ্রযানের পরে কালচক্রযানের আবির্ভাব হইয়াছিল। সহজযান বজ্রযানের প্রায় সমকালীন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে লক্ষ্মীঙ্করা কর্তৃক সহজযানের প্রবর্তনের কথা মানিয়া লইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বজ্রযানের সাধন-প্রণালীতে হঠযোগের অবতারণা করা হয় এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে বজ্রযোগের সঙ্গে নাথযোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নাথমার্গেও হঠযোগের প্রাধান্য ছিল এবং নাথগণ নিজেদের যোগী বলিয়া পরিচয় দিতেন। সুতরাং বজ্রযান ও উহার সমসাময়িক নাথমার্গ ও সহজযান এবং উহাদের কিছু পরবর্তী কালচক্রযানের সাধন-প্রণালীতে একটি মূলগত ঐক্য দেখা যায়—তাহা হইল হঠযোগ।

আধুনিককালে বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান—এই তিন বৌদ্ধতন্ত্রযানের অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি বৌদ্ধতন্ত্রযানের ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণও করিয়াছেন। এই সমস্ত বিশ্লেষণকারীদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ শহীদুল্লা, ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ডঃ তুসী, ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হঠযোগের বিশ্লেষণে তথা বৌদ্ধতন্ত্রের তত্ত্ব-বিচারে তাঁহাদের কেহই বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। আচার্য নরেন্দ্রদেবের 'বৌদ্ধধর্ম-দর্শন' একটি স্মরণীয় এবং মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু ইহাতেও তিনি বৌদ্ধ-সাধন সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই বলিয়াছেন। একমাত্র ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ই তাঁহার বিভিন্ন বাংলা ও হিন্দী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে সহজ সম্প্রদায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে পথে আগম ও সিদ্ধ মার্গের উদ্ভব হইয়াছে, সহজযানও সেই পথের প্রদর্শক। যাঁহারা হঠযোগের অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে হঠযোগের মূল কথাই

চন্দ্র ও সূর্যকে একীকরণ করা। তন্ত্রেব সাঙ্কেতিক ভাষায 'হ'-কাব ও 'ঠ'-কার চন্দ্র ও সূর্যের বাচক। সুতরাং 'হ'-কার ও 'ঠ'-কাবের যোগ বলিতে চন্দ্র-সূর্যের একীকরণ বুঝায়। পরিভাষার ভেদে ইহাই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীব অথবা অপান ও প্রাণবায়ুর সমীকরণ বলা হইয়া থাকে। হঠযোগিগণ বলেন যে দুই শক্তির বৈষম্যের ফলেই জগতের উৎপত্তি। যে দুই শক্তির সংঘর্ষ হইতে জগৎ ফুটিয়া উঠে যতক্ষণ তাহারা সাম্যাবস্থায় থাকে ততক্ষণ জগৎ থাকে না। তাহা অদ্বৈত অবস্থা। সাম্য ভঙ্গ হইলেই বৈষম্য, দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতভাবের উদয় হয়—ইহাই সৃষ্টিবীজ। যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সাম্যভাব পরিত্যাগের ফলে সৃষ্টি-ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেই দুই শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন—শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি। জীবদেহে প্রাণ ও অপানরূপে এই বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধ শক্তিযুগলেরই বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাণ এবং অপান উভযে উভযকে আকর্ষণ করে, আবার প্রত্যাকর্ষণও করিয়া থাকে। উভয়ে মিলিযা এক হইতে চায়, অথচ হইতে পারে না। কারণ, প্রাণ যে অনুপাতে জাগিয়া উঠে সেই অনুপাতে অপান সুপ্ত হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে অপানের জাগরণের অনুপাতে প্রাণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। সুতরাং কোন সময়েই উভয় শক্তি সমজাগ্রৎ না থাকার দরুণ পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। যদি প্রাণকে জাগাইয়া অপানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অথবা অপানকে জাগাইয়া প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উভয়কে মিলিত করা যায় তাহা হইলে উভয়ের সাম্য হইতে পারে। স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাসই পূরক ও রেচক, এবং উভয়ের সমীকরণ কুম্ভক। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য চলিতে থাকে ততক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলা মার্গ ক্রিয়াশীল থাকে। শ্বাস ও প্রশ্বাস সমান হইলে সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যায়। অতএব প্রাণ ও অপানের সমতা, ইড়া ও পিঙ্গলাব সাম্য, পূরক ও রেচকের সমানতা বা কুম্ভক—এ সবই সুষুম্না দ্বারের উন্মোচনেব পক্ষে সমান কার্যকরী।

সুষুম্না পথই মধ্যপথ—শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাডী। চন্দ্র ও সূর্যকে যদি প্রকৃতি ও পুরুষস্থানীয় মনে করা যায় তাহা হইলে চন্দ্রসূর্যের মিলন বলিতে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনই বুঝায়। এই মিলন ভিন্ন শূন্যপথ খুলিতেই পারে না। আর, শূন্যপথ খুলিবামাত্রই প্রকৃত শূন্যে স্থিতি লাভ হয় না। শূন্যতাও আপেক্ষিক। হঠযোগিগণ এই আপেক্ষিকতা বুঝাইবার জন্য শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ শূন্যই নির্বাণপদ। অতএব প্রকৃত শূন্য বা নির্বাণপদ বলিতে বুঝায় প্রকৃতি-পুরুষের অভেদে মিলনের পূর্ণতা। তখন থাকে কি? ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায় বলি, "সিদ্ধাচার্যগণ বলেন যে, তখন একটি অদ্বয়তত্ত্ব মাত্র বিরাজমান থাকে, কিন্তু তাহাকে 'তত্ত্ব'

না বলিয়া 'তত্ত্বাতীত' বলাই অধিকতর সঙ্গত। তাই শিব ও শক্তি নামক বিন্দুদ্বয় যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য পরিহার করিয়া সমরূপতা প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ ঐক্যলাভ না করে ততক্ষণ শূন্যাবস্থার উদয় হইয়াছে বলা চলে না। ভেদ বা দ্বৈতলেশ থাকা পর্যন্ত নির্বাণপ্রাপ্তির আশা নিষ্ফল। সাম্য এবং নিরঞ্জনতাই নির্বাণের স্বরূপ—তাহাতে ভেদ থাকিতে পারে না। বাম ও দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা ত্যক্ত হইয়া—সমান হইয়া—শূন্যপদবী মধ্যাবস্থার অর্থাৎ সুষুম্নার পূর্ণ বিকাশই নির্বাণ। হঠযোগিগণ সহস্রারস্থ মহাবিন্দুতে এই মহামিলন অনুভব করেন এবং তৎপ্রসৃত রসধারায় নিজেকে প্লাবিত করেন। মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী যখন ইড়া ও পিঙ্গলা নামক নাড়ীদ্বয় সংঘর্ষণজনিত সমীকরণের ফলে জাগ্রৎ হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উত্থিত হয় তখন স্বভাবতই ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সরল পথে ধাবিত হয়। এই উত্থানকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিরাজি চারিদিক হইতে আকুঞ্চিত হইয়া আসে এবং ঐ ধারায় পতিত হয়। এই সব শক্তি দ্বারাই স্তরে স্তরে জগতের যাবতীয় পদার্থ নির্মিত হইয়াছে। এইগুলি উপসংহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদ্রচিত ও তৎপ্রকাশিত জগজ্জাল ইন্দ্রজালের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। চারিদিক্ মহাশূন্যে পরিণত হয। এইপ্রকারে ক্রমশঃ লোক-লোকান্তর সংহারানলে দগ্ধ করিয়া, অঙ্গীভূত করিয়া, নাদরূপা মহাশক্তি কুণ্ডলিনী সিংহনাদ করিতে করিতে উঠিতে থাকেন। ইহার ফলে ভূত ও চিত্ত সংহৃত হয়, ষট্‌চক্র ভেদ হয় ও আজ্ঞাচক্রেব ঊর্ধ্বে স্থিতি হয়। পরে সেখান হইতে অতি সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া চৈতন্যশক্তিরূপে প্রকাশমানা কুণ্ডলিনী চৈতন্যসমুদ্রে—পরমশিবের বক্ষে—মিশিবার জন্য ধাবমান হন। তদাশ্রিত জীব তাঁহারই আকর্ষণে তাঁহারই সঙ্গে চলিতে থাকে। তার আর পৃথক সাধন কিছু থাকে না—সে আশ্রিত ও শরনাগতরূপে নিঃশঙ্ক মাতৃ-অঙ্কে বিরাজ করিতে থাকে। যখন সহস্রারস্থ পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনী যুক্ত হন, তখন ঐ আলিঙ্গন হইতে বিচিত্র আনন্দের উদয় হয়। জীব তাহা আস্বাদন করে। শিবশক্তিব মিলন ভিন্ন আনন্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে না। মহাবিন্দুতে যখন এই মিলনের সূত্রপাত হয় তখনও দুইটি বিন্দু থাকে—পরে ক্রমশঃ বিন্দুদ্বয় এক মহাবিন্দুতে পরিণত হয়। এই মহাবিন্দু অখণ্ড পরমানন্দময এবং যুগলভাবাপন্ন হইয়াও অদ্বয়।

বৌদ্ধ সহজযানের হঠযোগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কি তাহা একবার সংক্ষেপে দেখিয়া লওয়া যাক্। সহজিয়াগণের মতে সহজ অবস্থালাভই পূর্ণতাসিদ্ধি। ইহার নামান্তর নির্বাণ, মহাসুখ, মহামুদ্রাসাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এই অবস্থায় বাচ্য-বাচক, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ও ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব থাকে না। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীই বিকল্পজাল—ইহাকে ভেদ করিয়া নির্বিকল্প পদের উপলব্ধি সহজ অবস্থা।

'জহি মন পবন ন সঞ্চরই, রবি শশি নহে পবেশ'—এখানে মন ও প্রাণের সঞ্চার নাই এবং চন্দ্র, সূর্যেরও প্রবেশাধিকার নাই। চন্দ্র-সূর্য ইড়া-পিঙ্গলাময় আবর্তনশীল কালচক্রের নামান্তর। শান্তিময় নির্বাণপদ কালের অতীত বলিয়া সেখানে চন্দ্র-সূর্যের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। প্রাণ স্থির বলিয়া সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না। সেখানকার বায়ুতে লহর খেলে না—তাই সেই স্থির বা স্তিমিত বায়ু শাস্ত্রে 'গগন' বলিয়া বহু স্থলে আখ্যাত হইয়া থাকে। সহজিয়াগণ বলেন যে এই নির্বাণই প্রত্যেকের 'নিজ স্বভাব' (নিজ সহাব)—ইহাই পরমার্থ। এখানকার যে আনন্দ, যাহাকে মহাসুখ বলে, তাহাই সহজ অবস্থা। বস্তুতঃ জগতের সর্ব কার্য স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার স্বভাবেই বিলীন হয়—কর্তা কেহই নাই। সুতরাং কর্তৃত্ববোধ অজ্ঞানের বিলাসমাত্র। বায়ু স্থির হইয়া গেলে সঙ্কল্পজাল কাটিয়া যায়,—জ্ঞানমুদ্রা উপলব্ধ হইয়া মিথ্যাজ্ঞান ও কর্তৃত্বাভিমান বিলুপ্ত হয়। 'স্বভাবই সকলের মূল, কর্তা কেহই নাই'—এই বোধই শুদ্ধবোধ বা জ্ঞানমুদ্রা। এই বোধের উদয় হইবামাত্র সঙ্কল্প-বিকল্পের অতীত নির্বিকার নিরঞ্জন পদপ্রাপ্তি ঘটে।

একমাত্র গুরুপদেশই এই অবস্থা লাভের উপায়। ইহার জন্য অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু গুরুর স্বরূপ কি? সহজিযাগণ বলেন, শ্রীগুরু 'যুগনদ্ধরূপ'—মিথুনাকার। ইনি শূন্যতা ও করুণার মিলিত মূর্তি—উপায় ও প্রজ্ঞার সমরস বিগ্রহ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই নির্বাণ। অনঙ্গবজ্র তাঁহার 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রজ্ঞার লক্ষণ নিঃস্বভাব এবং উপায়ের লক্ষণ স্বভাব। শুধু প্রজ্ঞার দ্বারা অথবা শুধু উপায়ের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ ঘটে না—বুদ্ধতা প্রাপ্তির জন্য প্রজ্ঞা এবং উপায় উভয়ের সাম্য বা অভিন্নতা সম্পাদন করিতে হয়।

প্রজ্ঞা ও উপায় এই উভয়ের যুগলরূপই পরমার্থ-রূপ, মহাসুখের আলয়। ইঁহার আশ্রয় ভিন্ন সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া—শুধু তাহাই নহে, সংসার ও নির্বাণে সমদৃষ্টি লাভ করা, অসম্ভব। সহজিয়া মতে মৌনমুদ্রাই শ্রীগুরুর উপদেশ—বাক্য দ্বারা সহজ বা অনুত্তর জ্ঞানের সংবাদ দেওয়া যায় না। যাহা কিছু মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচর, মন ও ইন্দ্রিয় যতদূর যাইতে পারে, সবই বিকল্পের অন্তর্গত। যাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়পথে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া থাকেন তাঁহারা 'পৃথগজন', তাঁহাদের দেহ বাক্য ও চিত্ত সহজতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। সহজিয়াগণের মতে মহাসুখ অথবা সহজানন্দময় শ্রীগুরুদেবই 'জিনরত্ন' পদে আখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনি আনন্দ অথবা রতির প্রভাবে শিষ্যের অন্তরে মহাসুখ বিস্তার করেন বলিয়াই তাঁহার এত গৌরব—'সদ্গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বভাবেন মহাসুখং তনোতি'।

কিন্তু কি প্রণালীতে এই মহাসুখ প্রাপ্তি ঘটে? ইহার উপলব্ধি কোথায় হয়? সেখানে যাওয়ার পথ কি? ইহার উত্তরে সহজিয়াগণ বলেন যে, উষ্ণীষকমলেই মহাসুখের অভিব্যক্তি হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে এবং হঠযোগের গ্রন্থাদিতে এই কমলকে সহস্রদল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বজ্রগুরু অর্থাৎ যিনি বজ্রমার্গ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করতঃ বজ্রধর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আসন এই উষ্ণীষকমলের কর্ণিকামধ্যে। ঐখানে উঠিবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। সাধনাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যাঁহাদের বিন্দু সিদ্ধ হয় নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐখানে উঠিয়া স্থিতিলাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। মধ্যপথকে অবলম্বন করিয়া বিন্দুর স্থৈর্যসাধনপূর্বক তাহাকে ঊর্ধ্বে চালনা করিলে ক্রমশঃ মহাসুখপদ্মের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হওযা যায়। জীব সংসার-অবস্থায় দক্ষিণ ও বাম মার্গে অহর্নিশি ভ্রমন করিতেছে, সে দুর্গম মধ্যপথে সঞ্চরণ করিতে সাহস পায় না এবং সমর্থও হয় না। পুরুষকারের দ্বারা মধ্যপথের আশ্রয় লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ঐ পথে প্রবেশ করিবার পক্ষে গুরুকৃপাই একমাত্র সদুপায়। সহজিয়াগণ এই বামশক্তিকে ললনা এবং দক্ষিণ শক্তিকে রসনা বলিয়া বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ললনাকে চন্দ্র বা প্রজ্ঞা এবং রসনাকে সূর্য বা উপায়রূপে নির্দেশ করিযাছেন। তাঁহাদেব মতে উভয়ের মধ্যদেশে যে শক্তির ক্রিয়া হয় এবং যাহা বর্তমান অবস্থায় অবরুদ্ধপ্রায় রহিয়াছে. তাহার পারিভাষিক নাম 'অবধূতী'। চন্দ্র ও সূর্যের মিলন অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের আলিঙ্গন হইতে মধ্যপথের উন্মীলন হয়। অবধূতীমার্গই অদ্বয় মার্গ, শূন্যপথ, আনন্দ স্থান। এখানে গ্রাহ্য ও গ্রাহকের ভেদ নাই,—উভযই সমরস হইয়া শূন্যাকারে বিরাজমান। এই পথে না আসিতে পারিলে ক্লেশ নির্মুক্ত বা দ্বন্দ্বাতীত হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। চন্দ্র ও সূর্যের আলিঙ্গন ভিন্ন অবধূতী বিশুদ্ধ হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে ললনা ও রসনা অবধূতীরই অশুদ্ধ রূপ। ইহারা শোধিত হইলে দুই-ই একাকার হইয়া যায়—তখন বৈষম্য অথবা মলিনতা কিছুই থাকে না। ইহাকে অবধূতীর উন্মীলন বা শোধন বলা যাইতে পারে। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেন যে, চন্দ্র শুদ্ধ হইয়া 'আলি' নাম প্রাপ্ত হয়, এই শোধনের ফল 'ধবন' বা 'ধমন'। সূর্য শুদ্ধ হইয়া 'কালি' নামে আখ্যাত হয়—ইহার ফল 'চবন' বা 'চমন'। দ্বিকল্পতন্ত্রে আছে যে আলি ও কালির সংযোগই বজ্রসত্ত্বের অধিষ্ঠানভূমি অর্থাৎ বিশুদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য মিলিত হইযা যখন ঐক্য লাভ করে তখন সেই অদ্বৈতভূমিতে সিদ্ধ-বিন্দু বজ্রসত্ত্বের আবির্ভাব হইযা থাকে—'আলিকালিসমাযোগঃ বজ্রসত্ত্বস্য বিষ্টরম্'। এই সংযোগ আরব্ধ হইযা ক্রমশঃ চলিতে থাকে—সংযোগের গাঢ়তা অনুসাবে অবধূতীর সঙ্গও নিবিড় হইতে থাকে এবং সেই অনুপাতে শূন্যতা, অদ্বয়ভাব,

আনন্দ বা রতি, ও নৈরাত্ম্যবোধ বা বোধি গভীরভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে। যখন চন্দ্র ও সূর্য মিলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ নিজের স্বরূপ ও ধর্ম হারাইয়া বসে, যখন চন্দ্র আর চন্দ্র থাকে না সর্যও সূর্য থাকে না, উভয়ে মিলিয়া একরস ও একাকার হয়, সেই নিঃস্বভাব বা নৈরাত্ম্য অবস্থাই শূন্যাবস্থা। ইহাই যথার্থ সাম্য। যাহা এই শূন্যময় অদ্বয়ভাবকে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাই বজ্রগুরুর স্বরূপ। এই অবস্থাপ্রাপ্তি একদিনে হয় না—ভূমির পর ভূমি ক্রমশঃ জয় করিতে করিতে ত্রয়োদশ ভূমি অতিক্রমপূর্বক ইহার পূর্ণ সিদ্ধি আয়ত্ব হইয়া থাকে। সহজিয়া সাহিত্যে 'বজ্রধর' পদে এই চতুর্দশ ভূমির অধীশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে।

পারমার্থিক অবস্থা যে শূন্য এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সহজ সাধকগণ বিশুদ্ধির তারতম্য অনুসারে এই শূন্যকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য—এই তিন অবস্থায় উপাধি আছে, ক্লেশাদিমল সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তুরীয়শূন্য যাহার পারিভাষিক নাম 'প্রভাস্বর', তাহাই নিরুপাধিক শূন্য। বলা বাহুল্য, ইহা পূর্বোক্ত অদ্বৈতভূমি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই চতুর্থ শূন্যই যে বজ্রগুরুর অধিষ্ঠান তাহাও প্রসঙ্গতঃ পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে প্রথম তিন শূন্যের যাবতীয় দোষ অপগত হয়। তখন একমাত্র নিরুপাধিক বিশুদ্ধ শূন্যই বর্তমান থাকে। সম্ভোগচক্রে নৈরাত্ম্যধর্মের উপলব্ধি এই বিশুদ্ধ শূন্যে স্থিতি ভিন্ন অপর কিছু নহে। প্রথম তিন শূন্যে যে আনন্দের বিকাশ হয় তাহাকে কায়ানন্দ, চিত্তানন্দ ও রাগানন্দ বলে। যখন এই তিন আনন্দ একরস হইয়া জ্ঞানানন্দরূপ চতুর্থ আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন সিদ্ধিসমূহ করায়ত্ত হইয়া পড়ে। চতুর্থানন্দের উদ্বোধন এবং অনুত্তরবোধি লাভ একই কথা। অনুত্তরবোধিতে গ্রাহ্য ও গ্রাহকের পরস্পর ভেদ থাকে না, উপায় ও প্রজ্ঞা একাকার হয়, নাদ ও বিন্দুর মিলন হয়, দ্বৈত ভাব অদ্বৈত হইয়া দেখা দেয় ও সর্বধর্মের অনুপলব্ধিরূপ নির্বাণপদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

স্বাধিষ্ঠান শূন্য তৃতীয় এবং বজ্রগুরুর অধিষ্ঠানরূপ শূন্য চতুর্থ। তৃতীয় শূন্য ও চতুর্থ শূন্যের যে মিলন তাহাই 'যুগনদ্ধ ফলের' প্রকাশ বা অনাদি দিব্য মিথুনাবস্থা। তৃতীয় ও চতুর্থ শূন্যে ভেদ তিরোহিত হইয়া অদ্বয়সিদ্ধি হয়।

মহাসুখকমলে যাইতে হইলে বা যথার্থ সামরস্য প্রাপ্ত হইতে হইলে মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে, বিরোধের সমন্বয় করিতে হইবে, দ্বন্দ্বের মিলন করাইতে হইবে। দুইকে এক করিতে না পারিলে সৃষ্টি ও সংহারের অতীত নিরঞ্জন পদলাভ সম্ভবপর নহে। সুতরাং মিলনই অদ্বয় শূন্যাবস্থা বা পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। সহজিয়াগণ বলেন—অকুশলের পরিহার এবং ইন্দ্রিয়নিরোধ যে সকল সমাধির উদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা নির্বিকল্পদশা উদিত হইতে পারে

না। বিষয় ত্যাগ অথবা বৈরাগ্য সাধন করিয়া কোন ফল নাই, কারণ তাহার দ্বারা যুগল অবস্থা লাভ হয় না। যুগলপ্রাপ্তির পথে যাইতে না পারিলে মিলন ও তাহার ফল সামরস্য বা অদ্বয়তা সংঘটিত হয় না। এইজন্য সহজপন্থা রাগপথ,—বৈরাগ্যের পথ নহে। এই পথে দুষ্কর উপবাসাদি নিষ্ফল শ্রমমাত্র। 'শ্রীসমাজ' নামক তন্ত্রে আছে—'পঞ্চ কামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ। সুখেন সাধয়েৎ বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ।।' অর্থাৎ পঞ্চবিধ কাম ত্যাগ করিয়া এবং তপস্যা দ্বারা নিজেকে পীড়িত না করিয়া যোগতন্ত্রানুসারে সুখের সহিত বোধির সাধন করিতে হয়। রাগই বন্ধনের কারণ, মুক্তিও রাগ হইতেই হইয়া থাকে। মহারাগ বা অনন্যরাগই মুক্তির সহজ সাধন—বৈরাগ্য নহে। 'হেবজ্রতন্ত্রে' একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে—'রাগেন বধ্যতে রাগেণৈব বিমুচ্যতে'। 'জ্ঞানসম্বোধি'তে আছে, চিত্তই ভব ও নির্বাণের মহাবীজ—ইহা সংবৃতিতে সংবৃতিময় আকার ধারণ করে এবং নির্বাণে স্বভাবহীন হইয়া পড়ে—

'চিত্তমেব মহাবীজং ভবনির্বাণয়োরপি।
সংবৃতৌ সংবৃতিং যাতি নির্বাণে নিঃস্বভাবতাম্।।'

বিশুদ্ধ অবধূতিকাকে সহজিয়াগণ 'ডোম্বী' শব্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ললনা এবং রসনাকে একত্র না করিতে পারিলে অবধূতিকার শোধন সম্ভবপর নহে। সুতরাং যখন অবধূতিকা বিশুদ্ধ হয় তখন ললনা ও রসনা এক হইয়া ঐ অবধূতিকারই রূপ ধারণ করে। ইহাই শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট শক্তির অদ্বয় অবস্থা বা নাড়ীশুদ্ধি। এই বিশুদ্ধ অদ্বয়মার্গ বা ব্রহ্মনাড়ীই যে 'ডোম্বী' পদের অভিধেয় তাহা এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাই বজ্রমার্গ বা বজ্রযান অর্থাৎ শূন্যপথ। বামশক্তি ও দক্ষিণশক্তির মিলন হইতে যে অগ্নি অথবা তেজঃ উৎপন্ন হয়, নাভি বা নির্মাণচক্রে তাহার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নিকে মহাসুখরাগাগ্নি বলে। সহজিয়াগণের সাঙ্কেতিক ভাষায় ইহার নাম 'চণ্ডালী'। প্রাথমিক অবস্থায় ইহা সম্যক্ শুদ্ধ থাকে না। সাধনার পরিপাক অনুসারে ইহা ক্রমশঃ শোধিত হইয়া ডোম্বীরূপে পরিণত হয়। তখন বিষয়সমূহ দগ্ধ হইয়া যায়—অদ্বয়ভাব পূর্ণতা লাভ করে। অবধূতী, চণ্ডালী ও ডোম্বী—একই শক্তির তিনটি অবস্থামাত্র। অবধূতী অবস্থায় দ্বৈত থাকে, ললনা ও রসনার পার্থক্য থাকে, ইড়া ও পিঙ্গলা স্ব স্ব কার্য সাধন করে এবং প্রাণ ও অপান যথানিয়মে স্পন্দিত হয়। যখন উভয়ের সম্মিলন হয় তখন অদ্বয়াগ্নি—রাগানল প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু ইহা হইলেও দ্বৈতকে পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করা এক নিমিষের কর্ম নহে—ইহা ক্রমসাধ্য। এই সম্মিলন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে। চরমে দ্বৈত আর থাকে না—তখন দুইটি পৃথক্ শক্তি এক হইয়া যায়। ইহাই অবধূতীর পূর্ণ বিশুদ্ধি বা চণ্ডালী হইতে

ডোম্বীভাব প্রাপ্তি। এই অবস্থায় রাগাগ্নির দ্বারা বিষয়-জাল দগ্ধ হইলে পরে নির্মল নৈরাত্ম্যভাব অসীম ও অনন্ত আকাশের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠে। অবধূতী, চণ্ডালী ও ডোম্বী দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের সূচক মাত্র। তন্ত্রে যে শক্তির অপরা, পরাপরা ও পরা এই তিন প্রকার ভেদ আছে তাহারও ইহাই তাৎপর্য।

অবধূতীর দ্বৈতাবস্থায় অর্থাৎ যতদিন চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ না হয় ততদিন বায়ুর প্রবেশ নির্গম হইয়া থাকে এবং শক্তি বক্রপথে সঞ্চরণ করে। ইহারই প্রচলিত নাম সংসার। শক্তিকে সরল পথে চালনা করা অথবা ইহার বক্রতা দূর করা সাধনার উদ্দেশ্য। মধ্যমার্গই সরল পথ—ঋজুমার্গ, 'উজুবাট'। দক্ষিণ ও বাম পথ—বক্রমার্গ। সেই জন্য বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া মধ্যপথ ধরিবার উপদেশ আছে। সরহপাদ বলিয়াছেন, 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক'। সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদ বলেন—

'বাম দহিন দো বাটা ছাড়ী
শান্তি বুগথেউ সংকেলিউ'

অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথ গ্রহনীয়। এই পরিশুদ্ধ অবধূতিমার্গ বা বজ্রমার্গ ব্যতীত বুদ্ধত্ব, তথাগতভাব, নির্বাণ বা মহাসুখ প্রাপ্ত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। 'রতিবজ্রে' আছে—'নান্যোপায়েন বুদ্ধত্বং শুদ্ধঞ্চেদং জগৎত্রয়ম্।'

সহজিয়াগণ বলেন, 'জ্ঞানবহ্নিঃ...ভাবাভাবং দগ্ধা সুমেরুশিখরাগ্রে গগনমিতি মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতি'। জ্ঞানানল ভাব ও অভাব উভয়কে দগ্ধ করিয়া সুমেরু শিখরের অগ্রভাগে গগনমণ্ডলে বিলীন হইয়া যায়। পূর্বে যে মহাসুখচক্রের কথা বর্ণন করা হইয়াছে ইহাই তাহার স্বরূপ। রাগবহ্নি নিবৃত্ত হইলে যে আনন্দের প্রকাশ হয় তাহার নাম বিরমানন্দ। তখন চন্দ্র স্বভাবস্থিত, মন স্থির এবং বায়ুর গতি স্তম্ভিত। যাঁহার বিরমানন্দের উদয় হইয়াছে তিনিই যথার্থ যোগীন্দ্র, সহজিয়াগণের মতে তিনিই 'বজ্রধর' পদবাচ্য সদ্‌গুরু।

প্রত্যেক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধনার মূখ্য লক্ষ্য হইল বিন্দুসিদ্ধি। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পরিভাষায় বিন্দুই বোধিচিত্ত নামে প্রসিদ্ধ। বিন্দুসিদ্ধি না হইলে অদ্বয় পদের প্রাপ্তি দুর্ঘট। যতদিন বিন্দু চঞ্চল থাকে ততদিন শূন্য অথবা নির্বিকল্প অবস্থার সিদ্ধি কথার কথা মাত্র। এই চঞ্চল অথবা ক্ষরণশীল বিন্দুকে সহজিয়াগণ 'সংবৃতি বোধিচিত্ত' বলিয়া থাকেন। প্রথমে বিন্দুর শোধন, তারপর বিন্দু-প্রতিষ্ঠা। বিন্দুর শোধন অর্থে বিন্দুকে ঊর্ধ্বগামী করা। বিন্দুর ঊর্ধ্বগামী হওয়া মানেই ঊর্ধ্বরেতা হওয়া। ঊর্ধ্বরেতা অবস্থায় মানুষের অন্তঃস্রোত খুলিয়া যায়। ইহাই দিব্য অবস্থা। সংযম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বিন্দু-সাধনা সম্ভবপর।

'গুহ্যসমাজতন্ত্রে' এবং 'সেকোদ্দেশ-টীকা'য় যোগের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, ক্রমিক উন্নত স্তর হিসাবে যোগকে ছয়টি অঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে 'ষড়ঙ্গ' যোগ বলা হয়। এই ছয় অঙ্গের নাম হইল যথাক্রমে—প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি। যোগের চরম লক্ষ্য হইল নিরাবরণ প্রকাশকে প্রাপ্ত হওয়া। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের সিদ্ধান্ত এই যে সর্বপ্রকার আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রভা-মণ্ডলের উদয় এবং যোগীর সেই প্রভা-মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশের অপেক্ষা রাখে। প্রভা-মণ্ডলে প্রবেশ শুধু সামান্য সাধকের পক্ষেই সম্ভব নয়, পরন্তু উচ্চ কোটির যোগীর পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। যোগমার্গে বিন্দুসাধনার দ্বারা যতদিন 'বজ্রসত্ত্ব' অবস্থার উদয় না হয় ততদিন প্রভা-মণ্ডলে প্রবেশ অসম্ভব। আবার 'বোধিসত্ত্ব' লাভ না হইলে 'বজ্রসত্ত্ব' অবস্থার প্রাপ্তি অসম্ভব। বোধিসত্ত্ব হইতে হইলে পাঁচ 'অভিজ্ঞা'র উদয়ের আবশ্যক। কারণ, অভিজ্ঞা-পঞ্চক বোধিসত্ত্বের লক্ষণ। আর ষড়ভিজ্ঞ বুদ্ধের নামান্তর। মন্ত্র-সিদ্ধির ফল হইল পঞ্চ অভিজ্ঞা বা বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব। এইজন্য তান্ত্রিক যোগী সর্বপ্রথম মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য উদ্যম করে। ষড়ঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ প্রত্যাহার দ্বারা মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। অনন্তর ধ্যানের দ্বারা অভিজ্ঞাসমূহের উদয় হইতে থাকে। প্রাণায়াম হইতে বোধিসত্ত্ব-ভাব এবং ধারণা হইতে বজ্রসত্ত্ব-ভূমির প্রাপ্তি ঘটে। অনুস্মৃতির ফল—প্রভামণ্ডলে প্রবেশ এবং ষষ্ঠ অঙ্গ সমাধির ফল—নিখিল আবরণের ক্ষয় বা বুদ্ধত্ব।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিন্দু-সাধন রস-সাধনারই নামান্তর। সাধনার দ্বারা বিন্দু-সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ বিন্দু-চ্যুতি বা স্খলন হইতে মুক্ত হইয়া ধারণ করিতে সক্ষম হইলে বিন্দু বজ্রের ন্যায় অটলত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার পর বিন্দুর ক্ষোভের প্রয়োজন। কারণ, অটল বিন্দুর ক্ষোভ না হইলে উহা রসে পরিণত হইতে পারে না বা রসসিদ্ধ দেহ লাভ করা যায় না। রসসিদ্ধ দেহের নামান্তর সহজ-অবস্থা লাভ এবং সহজানন্দের স্ফূর্তি। বস্তুতঃ বিন্দুর ক্ষোভ বলিতে বুঝায় 'উপায়' ও 'প্রজ্ঞার' যোগ। উভয়ের যোগে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। ক্ষোভের দ্বারা বিন্দু উৎপন্ন হইলে বজ্রযোগের সাহায্যে উহার স্খলন নিবৃত্ত করিয়া উহাকে নাভিস্থিত নির্মাণচক্রে ধারণ করিতে হয়। তারপর নির্মাণচক্র হইতে বিন্দুকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উষ্ণীষকমল পর্যন্ত লইয়া যাইতে হয়। বিন্দুর উদ্বোধন আর কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ একই কথা। সহজিয়াদের পরিভাষায় নির্মাণ-চক্রে এই জাগরণকে 'চণ্ডালী'র জাগরণ বলে। যেই ক্ষণে চণ্ডালীর জাগরণ হয় সেই ক্ষণ হইতে মস্তকস্থ চন্দ্র-বিন্দু হইতে অমৃত-ক্ষরণ হইতে আরম্ভ হয়। যখন চিত্তকমল অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং সহজানন্দ অর্থাৎ উপায়—উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া সাম্য-লাভ করে তখনই চণ্ডালীর জাগরণ হয়। এই

জাগরণ বা জ্বলন বস্তুতঃ মহাসুখ-রাগের উদয় বুঝায়। এই অনলে ভাব ও অভাব—উভয়ই নির্মূল হইয়া যায়।

পূর্বেই বলিযাছি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পরিভাষায বিন্দুই বোধিচিত্ত। মনোময কোষের সারাংশ মন, প্রাণময়-কোষের সারাংশ প্রাণ বা ওজঃ এবং অন্নময কোষের সারাংশ বীর্য বা শুক্র-ধাতু বা কামধাতু। অজ্ঞানী জীবের মন, প্রাণ ও বীর্য—এই তিনটিই চঞ্চল ও মলিন। মন, প্রাণ ও বীর্যকে অচঞ্চল ও মালিন্যমুক্ত করিতে হইলে বিন্দুসাধনার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিন্দু সাধনা বলিতে বুঝায় বিন্দু-শোধন ও বিন্দু-প্রতিষ্ঠা। বিন্দু পারদের মত সর্বদাই চঞ্চল। যোগবলের দ্বারাই ইহাকে স্থির করিতে হয়। চঞ্চল-বিন্দুই সংবৃত-বোধিচিত্ত। কিন্তু যখন ইহাকে যোগাভ্যাস দ্বারা স্থির করা যায় তখন বোধিচিত্ত সংবৃত না থাকিয়া বিবৃত হইয়া যায়। সংবৃত অর্থে সংকুচিত, বিবৃত অর্থে বিস্তার। বোধিচিত্ত যখন বিবৃত হইয়া যায় তখন উহাই মহাসুখ-রূপে পরিণত হইয়া যায়। অন্নময কোষের সার শুক্র-বিন্দু যেমন আনন্দময়-কোষে গিয়া পরমানন্দ-রূপে পরিণত হইয়া যায়, সংবৃত-বোধিচিত্ত সেইরূপ বিবৃত হইয়া মহাসুখ-রূপে পরিণত হয়। এইজন্য একমাত্র মহাসুখ-চক্রে বা উষ্ণীষ-কমলেই বিন্দুকে স্থির করিতে হয়। তাহা হইলেই সহজানন্দের অভিব্যক্তি হয়। অন্যত্রও বিন্দুর গতি রোধ করা যায়, কিন্তু তাহাতে সহজানন্দের বিকাশ হয় না। উষ্ণীষ-কমলে বিন্দু স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ সিদ্ধ হয়, দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতির উদয় হয় এবং সর্বজ্ঞত্ব ও বিভুত্ব গুণের বিকাশ হয়। ইহাকে একপ্রকার বুদ্ধত্ব-লাভ বলা যাইতে পারে।

পরিভাষা ভিন্ন হইলেও আগমশাস্ত্রের ঐ একই সিদ্ধান্ত। প্রথমে 'প্রাণ' ও 'অপান'—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির খেলা চলিতে থাকে। যোগপ্রভাবে উভয়ের সাম্য হইয়া যায়। তখন 'সমান'-শক্তির উদয় হয়। প্রাণ ও অপান সাম্য লাভ করিলে মধ্য-শক্তি জাগিয়া উঠে। আর মধ্যমার্গের বিকাশ হইতে ঊর্ধ্বগমনশীল 'উদান'-শক্তির স্ফুরণ হয়। আগমে ইহাকেই চিত্তের 'স্রোতাপন্ন' হওয়া বলে। অর্থাৎ স্রোতের মুখে পড়া। ফুল যেমন স্রোতের মুখে পড়িলে আপনিই ভাসিয়া যায় সেইরূপ চিত্ত মধ্যমার্গে ঊর্ধ্বরেতার মুখে পড়িয়া আপনিই ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। যখন চিত্ত যোগপ্রভাবে নির্বাণগামী স্রোতে আপন্ন হইয়া যায়, তখন কোনপ্রকার ভবিষ্যৎ-পতনের আশংকা থাকে না। মার্গের এই প্রকার পরিশীলনের দ্বারা সর্ব ক্লেশ উন্মূলিত হয়। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের 'চিত্তনদী নামোভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ'—এই বাক্যের দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্ত স্রোতাপন্ন হইলে ঊর্ধ্ব-স্রোত উহাকে কল্যাণের দিকেই লইয়া যায়, সংসারের দিকে নহে। মার্গ-চিত্তের পর ফল-চিত্তের উদয়

হয়, তখন লক্ষ্য-প্রাপ্তিতে আর সংশয় থাকে না এবং অকুশল-চিত্তেব পুনরায় আবির্ভাবেরও আশংকা থাকে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাণ ও অপানের সাম্য হইতে মধ্য-শক্তি জাগিয়া যায়। মধ্যশক্তির জাগরণের পূর্বাবস্থা হইল জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি রূপ সংসারের অবস্থা। যখন 'উদান'-শক্তির বিকাশ হয়, তখন তুরীয়-দশার উদয় হয়। মস্তক-স্থিত ঊর্ধ্ব-বিন্দুতে ঊর্ধ্বশক্তির চরম স্থিতি হয়। যখন ইহারও ভেদ হইয়া যায় তখন উহা বিশ্বব্যাপক হয়—ইহা 'ব্যান'-শক্তির ব্যাপার। ইহারই নাম তুরীয়াতীত-অবস্থা। এই সময় বিভুত্ব-সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বুদ্ধত্বের অনুরূপ অবস্থাসমূহের প্রকাশ হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধদের সাধনার লক্ষ্য ছিল সৎ শিষ্য হইয়া শীল (সম্যক্-আচার) ও সমাধির (ধ্যান) দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রাবকরূপে নির্বাণ বা অর্হত্ব প্রাপ্ত হওয়া। এইরূপ নির্বাণের অর্থ হইল সর্বপ্রকার তৃষ্ণার বা বাসনার সমূলে বিনাশ। হীনযানীরা মনে করিতেন, তৃষ্ণাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুঃখের মূল কারণ। অতএব দুঃখ-নিরোধের একমাত্র উপায় তৃষ্ণার বিনাশ। তৃষ্ণা শুধুমাত্র কামধাতু বা জড় জগতেই নহে, মধ্যবর্তী রূপ-ধাতু নামক জ্যোতির্ময় সাকার এবং অরূপ-ধাতু নামক নিরাকার লোকেও পরিব্যাপ্ত। সর্বোচ্চ ভূমির তৃষ্ণার নাম ভব-তৃষ্ণা। কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতু—এই তিন লোকের প্রত্যেকটিতে তৃষ্ণার আশ্রয়-স্বরূপ চিত্ত থাকে। এই চিত্তকে লৌকিক চিত্ত বলে। তৃষ্ণার বিনাশ অর্থে লৌকিক চিত্তের বিনাশের দ্বারা অর্হত্ব লাভই হীনযানীদের কাম্য। এইরূপ অর্হত্ব বা নির্বাণ কৈবল্য মুক্তির সমগোত্র।

কেবলমাত্র সৎ-শিষ্য হওয়া নহে, পরন্তু সদ্‌গুরুর যোগ্যতা অর্জন করাই মহাযানী বৌদ্ধদের সাধনার লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা অর্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া অপরের নির্বাণ-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়াই মহাযানীদের কাম্য। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চিত্তকে ধরিয়া রাখা দরকার, বিনাশ নহে। কিন্তু এই চিত্ত লৌকিক-চিত্ত নহে, লোকোত্তর-চিত্ত। লৌকিকচিত্তকে লোকোত্তব-চিত্তে পরিণত করিতে হইলে অশুদ্ধ বা মলিন বাসনা বা তৃষ্ণার সমূলে বিনাশ নহে, উহার বিশুদ্ধি সাধন করা। তৃষ্ণার বিশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে 'পারমিতানয়ে'র অভ্যাস করিতে হইবে। সুতরাং হীনযানীদের শীল ও সমাধি-জাত প্রজ্ঞা অপেক্ষা মহাযানীদের প্রজ্ঞা-পারমিতা মহত্ত্বপূর্ণ। পারমিতা-নয় হইতে মন্ত্র-নয় অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। মন্ত্র-নয় হইতে সহজ-মার্গ সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ, আবার সর্বাপেক্ষা সরলও বটে—অবশ্য যদি সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। দীক্ষা ব্যতীত মন্ত্র-নয়ে যথার্থ সাক্ষাৎকার বা দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শৈবাগমেও ঐ একই সিদ্ধান্ত। প্রথমে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে যথাবিহিত দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে। দীক্ষার প্রভাবে আণব-মল বা পৌরুষ-অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ইহা সম্পূর্ণ গুরু-কৃপা। ইহার পর সাধনা বা উপাসনাব প্রভাবে শিষ্যের মধ্যে বৌদ্ধজ্ঞানের উন্মেষ এবং বৌদ্ধ-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। ইহা সাধকের আপন উদ্যমের ফল। তান্ত্রিক সাধনার রহস্যই হইল, দীক্ষা বিনা সত্য-জ্ঞানের উদয় হয় না এবং অভিষেক-বিনা ঐ জ্ঞান অপরের মধ্যে সঞ্চার করিবার সামর্থ্য জন্মায় না। এইজন্য যাঁহার যথার্থ পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তিনি গুরুপদে আসীন হইবার যোগ্য হন না। ধর্মচক্র-প্রবর্তনকেই গুরুকৃত্য বলা হয়। অভিষেক-তত্ত্ব গভীর রহস্যপূর্ণ। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, এখানে (লৌকিক জগতে) এই তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন উচিৎও নয় এবং সম্ভবও নয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চঞ্চল অথবা ক্ষরণশীল বিন্দুকে বৌদ্ধ সহজিয়াগণ 'সংবৃতি বোধিচিত্ত' বলিয়া থাকেন। 'বারুণী' শব্দ ইহারই বাচক। প্রধানতঃ অবধূতিমার্গ দ্বারাই বিন্দু সঞ্চালিত হয়। বস্তুতঃ দেহস্থ মুখ্য মুখ্য যাবতীয় নাড়ীই ইহার বাহক। সহজিয়াগণের সাঙ্কেতিক ভাষায় নাডীসকল যোগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ললনা প্রভৃতি নাড়ী যখন আভাসশূন্য হয় অর্থাৎ বাসনাদিমলরহিত হইয়া শোধিত হয়, তখন মধ্যপথ উন্মুক্ত হয়। এই বিশুদ্ধ মধ্য নাড়ী—যাহাকে বহুস্থানে 'নৈরাত্ম্যযোগিনী' বলিযা অভিহিত করা হইযাছে—প্রাণের স্থৈর্যসাধক। ইহাকে আশ্রয় না করা পর্যন্ত প্রাণ ক্ষণেকের জন্যও চঞ্চলতা ত্যাগ করে না। যতক্ষণ আভাস আছে ততক্ষণ দ্বৈত অবশ্যই থাকিবে, ততক্ষণ প্রাণ ও মনের কম্পন এবং বিন্দুর চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। শোধিত মধ্যনাড়ীর মুখ সহজানন্দস্বরূপ। উহাকে স্পর্শ করিলেই ঐ আনন্দ বিরমানন্দরূপে প্রকাশিত হয়। উষ্ণীষকমলের মধুপানই বিরমানন্দের আস্বাদন। ইহার স্বরূপ মহাসুখ অথবা শূন্যতাময় পরমার্থবোধিচিত্ত। গুরু-পরম্পরা ভিন্ন এই অবস্থা লাভের কোনও উপায় নাই বলিয়া ইহা একমাত্র গুরুকৃপা-সাধ্য বলিযাই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সংবৃতি বোধিচিত্ত এই অবস্থায় পরমার্থরূপে বজ্রশিখরের অগ্রদেশে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকারই বৌদ্ধ সহজিয়াদের নিকটে সিদ্ধিরূপে পরিগণিত হয়। শূন্যতা ও করুণার অভেদকে মহামুদ্রা বলে। 'ধর্ম-করণ্ডক', 'বুদ্ধরত্ন-করণ্ডক', 'জিনরত্ন' প্রভৃতি নাম ঐ মহামুদ্রারই পর্যায়। বলা বাহুল্য, তন্ত্রশাস্ত্রে শিব এবং শক্তির যে স্থান কিংবা যে তাৎপর্য, বজ্র ও সহজ যানে শূন্যতা ও করুণা অথবা বজ্র ও কমলেরও অনেকাংশে সেই স্থান ও সেই তাৎপর্য। সুতরাং অপ্রাচিন বৌদ্ধ সাহিত্যে যেখানে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বর্ণিত দেখা যায় অথবা বজ্রের সঙ্গে কমলের সংঘটনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেখানে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তির মিলনই বুঝিতে হইবে। মহামুদ্রার দর্শন হইলে নির্বাণ ও পাঁচ প্রকার কামগুণাত্মক ভবভোগ অর্থাৎ রূপরসাদির আস্বাদনরূপ

সংসার একসঙ্গেই সিদ্ধ হয়। তখন সংসার ও নির্বাণে লেশমাত্রও ভেদ থাকে না—

"জো ভব সো নিবাণ খলু ভেবু না মণ্ণহ পণ্ন।
এক সহাবে বিরহিত্য নির্মল মই পড়িবন্ন॥"
(সহজাম্নায়পঞ্জিকা, পৃঃ ১১৮)

সহজিয়াগণ বলেন যে, যাহাবা বজ্রকমলসংযোগে বোধিচিত্তকে বজ্রপথে অচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছে—শিবশক্তির মিলন ফলে ব্রহ্মনাড়ীতে বিন্দুকে চালিত করিয়া তাহাকে স্থির ও দৃঢ় করিতে পারিযাছে, তাহারাই পরম যোগী তাহারাই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে। বোধিচিত্ত বা বিন্দুই যাবতীয় সিদ্ধির মূল। প্রাণাপানের সমতাবশতঃ যখন অপান নিরুদ্ধ, প্রাণও নিরুদ্ধ হয় তখন অপানের নিরোধবশতঃ বোধিচিত্তের অধোগতি হয় না, প্রাণের নিরোধবশতঃ ঊর্ধ্বগতিও হয় না। বায়ুর প্রবাহ থাকে না বলিয়া বিন্দু স্থির হইয়া অব্যক্ত ভাব ধারণ করে—"অহ ণ গমই উহ ণ যাই, রেণি রহি অ তসু নিচ্চল পাই"।

হঠযোগের সাধন-প্রণালীকে সিদ্ধপথ বলে। হঠযোগিগণ বলেন যে, যখন চিত্ত সমত্ব লাভ করে, বায়ু মধ্যপথে গমন করে, তখন অমরোলী, বজ্রোলী ও সহজোলী আপনিই আয়ত্ত হইয়া পড়ে—

"চিত্তে সমত্বমাপন্নে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে।
তদাঽমরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে॥"

বজ্রোলী ও সহজোলী শব্দ শুনিযা বজ্রযান ও সহজযানের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হয়। বায়ু মধ্যপথে গমন করিলে চিত্ত বৃত্তি-হীন হইয়া শূন্যাকার ধারণ করে। মন ও প্রাণ উভয়েই যখন সুষুম্না আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের অবকাশে নিরুদ্ধ হয় তখন জ্ঞানের উদয় হয। মধ্যপথ উন্মীলিত হইলে কালের বিক্রম আর থাকে না, কারণ ইড়া ও পিঙ্গলাময় কালসঞ্চারের মার্গ তখন অবরুদ্ধ থাকে। এইজন্য হঠযোগিগণ বলেন যে, সুষুম্না কালেব ভোক্ত্রী। মন ও প্রাণ স্থির হইলে বিন্দু স্থির হয়। ইহার নাম বিন্দু-সিদ্ধি। বিন্দু হইতেই যখন দেহের বিকাশ হয় তখন যতদিন বিন্দু চঞ্চল থাকে ততদিন দেহ যে জরা ও মৃত্যুর অধীন থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। বিন্দুর স্থিরতা হইতেই কায়সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। বজ্রকায, সহজকায় প্রভৃতি শব্দ সিদ্ধদেহের বোধক।

একটি কথা প্রসঙ্গতঃ এখানে বলিয়া রাখা দরকার। বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহজ ও বজ্রমার্গে অনুভূতিসম্পন্ন আচার্যগণকে 'সিদ্ধাচার্য' নামে অভিহিত কবা হইত। সিদ্ধমার্গে পবমপদকে 'সহজাবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই 'সহজ' শব্দটি সহজপন্থী অথবা বজ্রপন্থীদিগের একটি পারিভাষিক শব্দবিশেষ।

উভয় মার্গেই এই যোগের প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে, যুগনদ্ধরূপে গুরুর আত্যন্তিক আবশ্যকতা অঙ্গীভূত হইয়াছে এবং দেহসিদ্ধির গৌরব মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বিষয়েই উভয় মতে সাম্য লক্ষিত হয়।"

উপরের বিস্তারিত উদ্ধৃতিটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের "ভারতীয় সাধনার ধারা" বাংলা-গ্রন্থের অন্তর্গত 'সহজযান ও সিদ্ধমার্গ' এবং "ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর সাধনা" হিন্দীগ্রন্থের অন্তর্গত 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনা—(খ)'—এই উভয় প্রবন্ধের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনা—(খ)' প্রবন্ধটি হিন্দীতে রচিত। আমি উহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দিয়াছি মাত্র।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ও সাধন সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্নোত্তর আকারে এখানে অবতারণা করিতেছি। এইগুলি শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় আমাদের নিকট আগম বিশ্লেষণের সময় তুলনামূলকভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেনঃ—

(ক) বোধিচিত্ত কি? এবং বোধিসত্ত্বের আদর্শ কি?

প্রাচীনকালে বুদ্ধের সময় নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ নির্বাণ বৌদ্ধদের জীবনের আদর্শ ছিল। যাঁহারা দুঃখ-নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া ক্লেশ ও বাসনা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধনা করিতেন, তাঁহারা 'শ্রাবকযান' নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা প্রাচীন হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই সকল সাধকদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ভাবে নিজেদের দুঃখ হইতে মুক্তি। তবে কেহ কেহ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিতেন। তবে ইহা শুধু নিজের জন্য। এই সম্প্রদায়কে বলা হইত 'প্রত্যেক-বুদ্ধযান'। এই উভয় সম্প্রদায় কেহই বিশ্বের কল্যাণের জন্য সাধনা করিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাযান নামে এক শাখার উদ্ভব হয়। ইঁহাদের আদর্শ অত্যন্ত উন্নত ছিল। ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল শূন্যত্ব লাভের জন্য পরোপকারের মধ্য দিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিযা বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করা।

এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা ক্রমশঃ বুদ্ধত্বে পর্যবসিত হয়। হীনযানীদের আদর্শ ছিল অর্হৎ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া দেহান্তে নির্বাণ। মহাযানীদের আদর্শ প্রথমে বোধিসত্ত্ব অন্তে বুদ্ধত্ব।

ইঁহারা বলিতেন যে প্রত্যেক জীব সম্যক সম্বুদ্ধ হইবার যোগ্য। বুদ্ধত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ নহে। কিন্তু বুদ্ধ হইতে হইলে প্রথমে বোধিসত্ত্ব হইতে হইবে, তাহার পর দশটি স্তর অর্থাৎ ভূমি ভেদ হইলে বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভবপর হয়। পূর্ণ বুদ্ধত্বের জন্য বোধিচিত্ত প্রথমে আবশ্যক। বোধিচিত্ত পাইতে হইলে শূন্যতা ও করুণা উভয়কে অভিন্ন করিতে হইবে। কারণ, বোধিচিত্ত

হইল শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপ। সহজমার্গে শূন্যতা ও করুণা যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও উপায় পদবাচ্য। প্রজ্ঞা ও উপায়ের যেটি মিলিত অবস্থা উহারই নাম বোধিচিত্ত। শূন্যতার দ্বারা মহাজ্ঞানের পূর্ণত্ব লাভ হয় এবং করুণার দ্বারা বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বোধিচিত্ত লাভ করা আর বোধিসত্ত্বা লাভ করা একই কথা।

(খ) পারমিতা কাহাকে বলে?

মহাযানী বৌদ্ধগণ বলিতেন, ধর্ম ও জ্ঞানের কতকগুলি উচ্চ আদর্শ অনুশীলন করা আবশ্যক। এই আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলে তাহাকে 'পারমিতা' বলা হয় অর্থাৎ পূর্ণত্ব লাভ। মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির পূর্ণ ভাবে অনুশীলন ইহার অঙ্গ। এই মার্গকে 'পারমিতা-নয়' বলা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পারমিতার নাম প্রজ্ঞা-পারমিতা। প্রজ্ঞা-পারমিতা পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ।

ইহার পর 'মন্ত্র-নয়' বা মন্ত্র-মার্গ প্রকাশ হয়। ইহার নাম 'মন্ত্রযান'। এই সময় হইতে নানা প্রকার তান্ত্রিক সাধনার সূচনা হয়। এই সাধনাতে ধারণী, মন্ত্র এবং মুদ্রা প্রধান। যখন ইহার সঙ্গে মণ্ডল ও বিক্ষোভ এবং স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে তন্ত্রাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে তখন হইতে ইহার নাম হয় 'বজ্রযান'।

(গ) তন্ত্র-সাধনার মূল বক্তব্য কি?

মনুষ্যদেহে অসংখ্য নাড়ী আছে, এইগুলি বিভিন্ন প্রকারের। এই সকল নাড়ী সূক্ষ্ম বায়ুকে অবলম্বন করিয়া দেহকে সঞ্জীবিত রাখে। এইগুলি প্রাণশক্তি ও মন-শক্তির সঞ্চরণের মার্গ। এই নাড়ীগুলি স্থূল দৃষ্টিতে বাম ও দক্ষিণ এই দুই মার্গে বিভক্ত। বাম ও দক্ষিণ মার্গের দুই জাতের নাড়ীর মধ্য দিয়া বায়ু চলাচল করে। দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আর একটি সূক্ষ্ম মার্গ আছে—উহা শূন্য মার্গ। উক্ত সূক্ষ্ম মার্গ বা শূন্য মার্গের মধ্যে বায়ুর চলাচল হয না—ইহাকে সুষুম্না নাড়ী বলে। এইটিই সাধারণতঃ বদ্ধ থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ক্রিয়া করে না।

দেহের বামে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাণ ও অপান বায়ু চলিতেছে। মধ্যস্থ নাড়ী সুষুম্না—তাহা বদ্ধ আছে। এই সুষুম্নাকে খুলিযা তাহার মধ্য দিযা বায়ুকে চালনা করিতে হয়, তখন ইড়া ও পিঙ্গলা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। তান্ত্রিক ক্রিয়াতে ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের মিলন। এই মিলন নিজের দেহ মধ্যে যোগক্রিয়া দ্বারা সম্ভব হইতে পাবে, বাহিরে নারী-পুরুষের মিলনের দ্বারাও হইতে পারে। ইহার পূর্ণ পবিণতি অদ্বয অবস্থা লাভ—ইহাকে মিথুন বলে।

তন্ত্র-সাধনাতে কার্যকরী উপায় অবলম্বন আবশ্যক। এই সাধনাব মূলে দুইটি

বস্তু—(১) 'নিবৃত্তি' অথবা পুরুষ অথবা শিব, (২) 'প্রবৃত্তি' অথবা প্রকৃতি অথবা শক্তি। দুইই সত্য। পরমার্থ সত্য বা অদ্বয় এই উভয়ের মিলিত অবস্থা। ইহাতে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিবশক্তির মিলন হয়। ইহা জীবের কাম্য। শুধু প্রকৃতি কোন কার্য করে না, শুধু পুরুষও কোন কার্য করে না। উভয়ের মিলন হইলে কার্য হয়। মুক্তির জন্য জীবের একমাত্র কর্ম শিব অথবা নিবৃত্তির সহিত শক্তি অথবা প্রবৃত্তিকে মিলাইয়া দেওয়া। তান্ত্রিকগণ বলেন, এই দেহের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব আছে। শিব ও শক্তির মিলন এই দেহের মধ্যে হইয়া থাকে। দেহের যেটি মেরুদণ্ড তাহাই মেরু পর্বত। মেরুর দক্ষিণে মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে। ইহা নিদ্রিতা। ইহাকে জাগাইয়া ঊর্ধ্বমুখী করাইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উত্তর মেরুতে অর্থাৎ সহস্রারে শিবের সহিত মিলন করানোই তন্ত্র-সাধনার লক্ষ্য। শক্তির ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধনাতেও উন্নতি হয়।

বাহ্য জগতের জ্ঞান যখন ব্যবহার যোগ্য থাকে, তখন বাম ও দক্ষিণ মার্গস্থ নাড়ীসমূহের মধ্য দিয়া বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে। মধ্য নাড়ীর মুখটি তখন বন্ধ থাকে। বাম ও দক্ষিণ নাড়ী যদি কোন প্রকারে ক্রিয়াহীন হয়, তাহা হইলে মধ্য নাড়ীর মুখ খুলিয়া যায়। ইহাকেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে। মধ্য নাড়ীর মুখ খুলিয়া গেলে বায়ু সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে গমন করিতে থাকে এবং তখন শক্তি নিদ্রাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ স্তর ভেদ করিতে করিতে উপর দিকে উঠিতে থাকে—ইহাকে যোগিগণ ষট্‌চক্র ভেদ বলে।

মনে রাখিতে হইবে, বাম ও দক্ষিণ নাড়ী চলিবার সময় কালের খেলা চলিতে থাকে এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখের উদয় হয় এবং চিত্তও চঞ্চল থাকে।

যখন বাম ও দক্ষিণ এই দুইটি ধারা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নিরুদ্ধ হয়, তখনই শূন্য মার্গ উন্মুক্ত হয়। ইড়া ও পিঙ্গলাকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ 'ধমন' ও 'চমন' বলিয়া থাকেন। মধ্য মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম বায়ু ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে থাকে—এই মার্গটি মহাসুখের মার্গ। এই মার্গে চলিতে চলিতে বাসনা ও সংস্কার প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) যুগনদ্ধ শব্দের তাৎপর্য কি?

শূন্যতা ও করুণার মিলিত সত্তাই অদ্বয়তত্ত্ব। যাহাকে অদ্বয়তত্ত্ব বলা হয় তাহারই অন্য নাম যুগনদ্ধ। ইহাকে সমরস বা সামরস্যও বলা হয়। প্রজ্ঞা ও উপায় এই দুইটি এক সঙ্গে মিলিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাই

যুগনদ্ধ বা সামরস্য। এই যে অদ্বয় অবস্থা, এইটি মহাসুখের অবস্থা। নির্বাণ বৌদ্ধদের লক্ষ্য। এই অবস্থায় দুঃখ মোটেই থাকে না। ইহাই নির্বাণ এবং যুগনদ্ধ অবস্থার স্বরূপ। দেহ-সাধনা বা কায়-সাধনার ফলে এই অবস্থা লাভ হয়। দেহের দক্ষিণ ও বামে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে বায়ু সঞ্চরণ করে তাহাকে মধ্যস্থিত সুষুম্নাব পথে চালিত করিলে উহার ঊর্ধ্বগতি হয়। বৌদ্ধমতে এই দুই পার্শ্বের দুই নাড়ী ললনা, রসনা অথবা ধমন, চমন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। চন্দ্র-সূর্যও ইহাদেব নাম। মধ্য নাড়ীর নাম অবধূতিকা। বোধিচিত্ত এই অবধূতিকার মধ্য দিয়া উঠিতে থাকে---ইহার উদ্ভব হয় নির্মাণ-চক্রে। ক্রমশঃ উঠিতে উঠিতে প্রথমে ধর্মচক্রে যায়, তাহার পর সম্ভোগ-চক্রে যায়। ধর্মচক্র হৃদয়ে, সম্ভোগচক্র কণ্ঠে, তাহার পর মহাসুখ-চক্রে উন্নীত হয। এই চক্রটি মস্তিষ্কে অবস্থিত।

(ঙ) আনন্দের স্বরূপ বর্ণনা—

প্রজ্ঞা ও উপায় উভয়ের যোগে আনন্দেব উদয় হয়। প্রজ্ঞা—প্রকৃতির স্বরূপ এবং উপায়—পুরুষের স্বরূপ। যখন উভযের মিলন নির্মাণচক্রে হয় তখন যে আনন্দ হয়, সে শুধু আনন্দ। বোধিচিত্ত যখন আরও উপরে উঠে, তখন হয় পরমানন্দ। সম্ভোগচক্রে যে আনন্দ হয়, তাহার নাম বিরমানন্দ। মহাসুখচক্রে যে আনন্দ, তার নাম সহজানন্দ। কোন কোন মতে প্রথম আনন্দকে বিচিত্র আনন্দ বলে, দ্বিতীয় আনন্দকে বিপাকা আনন্দ বলে। তৃতীয আনন্দকে বিরমানন্দ এবং চতুর্থকে সহজানন্দ বলে। এই সহজানন্দের নাম মহাসুখ।

(চ) মহাসুখেব অবস্থা কি প্রকার?

মহাসুখের অবস্থাতে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, মন ভিতরে প্রবেশ করে। শারীরিক চেষ্টা থাকে না, দেহটা শান্ত হইয়া যায়, তখন বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকে না। আপন পর ভেদ জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় শূন্যতা বোধ আসে। এই অবস্থার বর্ণনা সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ করিয়াছেন। এই অবস্থায় সহজ-ভাবে প্রবেশ হয়। ইহাকেই বলা হয় সহজরূপ পদ্মবনে প্রবেশ। তখন মহারস পানে চিত্ত উন্মত্ত হয়। পৃথিবীর কোন বস্তুর দিকে লক্ষ্য থাকে না। এই অবস্থার নাম বজ্রসত্ত্ব অবস্থা। এই মতে গুরুর স্থান সর্বোপরি। এই গুরুকে বজ্রগুরু বলে। বৌদ্ধতন্ত্র মতে বজ্র শব্দ শূন্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইটি বজ্রযানের মত। এই সম্প্রদাযে বজ্রসত্ত্বই মূল দেবতা।

(ছ) বুদ্ধের ত্রিকায় কল্পনার স্বরূপ কি?

বুদ্ধেব ত্রিকায় এই: নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায় (সিদ্ধকায়)। বুদ্ধ যখন পরম স্বরূপে অবস্থান করেন সেটি তাঁর ধর্মকায়—যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম।

বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্বদের নিকট ধর্মপ্রচাব করেন তখন তিনি সম্ভোগকায়। যখন তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের উপদেশ দান করেন তখন তিনি নির্মাণকায়ে সঞ্চরণ করেন।

[আচার্য নরেন্দ্রদেব 'বৌদ্ধ ধর্মদর্শন' নামে হিন্দীতে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থটি 'রাষ্ট্র ভাষা পরিষদ' (পাটনা, বিহার) কর্তৃক ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী 'কুইন্‌স কলেজে' এম. এ. পড়িবার সময় আচার্য নরেন্দ্রদেব ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। আচার্য নরেন্দ্রদেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় হিন্দীতে ঐ গ্রন্থের একটি বৃহৎ ভূমিকা লিখিয়া দেন। কবিরাজ মহাশয়ের রচিত ঐ ভূমিকার আধারে এইবার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধনা সম্বন্ধে পুনঃ পর্যালোচনা করা যাইতেছে।]

বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশগুলিতে ইহার প্রসার এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বৌদ্ধধর্মে প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত হয়। একটির আদর্শ ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তি এবং অপরটির আদর্শ সামূহিক দুঃখ-নিবৃত্তি। প্রথম আদর্শটি হইল হীনযানী বৌদ্ধ শ্রাবকদের, আর দ্বিতীয়টি হইল মহাযানী বোধিসত্ত্বের। হীনযানী শ্রাবকগণ চাহিতেন নিজেদের ব্যক্তিগত নির্বাণ, কিন্তু মহাযানীরা চাহিতেন সকলের নির্বাণ এবং তৎসঙ্গে বোধিসত্ত্ব লাভের মধ্য দিয়া নিজেদের বুদ্ধত্বলাভ। শ্রাবকগণ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুল হইতেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ সকল জীবের দুঃখ নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভকেই জীবনের আদর্শ মনে করিতেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেন যেন সকলেই বুদ্ধত্বলাভ করিতে সক্ষম হয়। হীনযানীদের লক্ষ্য ছিল ঐকান্তিক বাসনা-নিবৃত্তি এবং উহার ফলস্বরূপ নির্বাণলাভ। কারণ, মলিন বাসনাই দুঃখের মূল কারণ, ইহাই অজ্ঞান। সর্বপ্রকার বাসনার মূলোচ্ছেদেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং জ্ঞানের উদয়ের সূচনা করে যাহার পরিণাম নির্বাণ। মহাযানীদের লক্ষ্য ছিল বাসনার উচ্ছেদ নয়, বাসনার সংশোধন। ইহাতে শুদ্ধ বাসনার আবির্ভাব হয় এবং দেহশুদ্ধি হয়। শুদ্ধ বাসনা প্রকৃত-পক্ষে পরার্থ বাসনা। শুদ্ধ দেহে মহাযানী বোধিসত্ত্ব সাধক শুদ্ধ বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বকল্যাণ তথা লোককল্যাণ সাধনে রত হন। যতদিন শুদ্ধ বাসনা থাকে ততদিন অক্লিষ্ট অজ্ঞানও থাকে। বোধিসত্ত্ব জীবনে শুদ্ধ বাসনার সঙ্গে জড়িত অক্লিষ্ট অজ্ঞানেরও সার্থকতা আছে। এই অক্লিষ্ট অজ্ঞানকে সেবাধর্মের

প্রেরণার উৎসরূপে গণনা করা হয়। কারণ করুণাতত্ত্বের সহিত ইহার প্রগাঢ় সম্বন্ধ আছে যাহা পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হইবে। অন্তে শুদ্ধ বাসনাও থাকে না, ফলে অক্লিষ্ট অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইয়া পূর্ণত্ব লাভ হয়। ইহাকেই মহাযানী বোধিসত্ত্বগণ প্রকৃত বুদ্ধত্বলাভ বা পরম নির্বাণ বলিয়া অভিহিত করেন। আপেক্ষিক বিচারে ইহাকে আগমের 'পরামুক্তি' বলা যাইতে পারে।

প্রাচীনকালে হীনযান ও মহাযানের মধ্যবর্তী আর এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন যাঁহাদের বলা হইত 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল দুঃখনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বুদ্ধত্ব অর্জন। ইহার অর্থ হইল স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বিশ্বের দুঃখ-নিবৃত্তিতে সহায়তা করা। হীনযানের নির্বাণের সঙ্গে প্রত্যেক-বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের এইখানেই পার্থক্য। হীনযানের নির্বাণে পরার্থ সেবার কোনই স্থান নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধদের দশটি সংযোজন বা পাশ ছিন্ন করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করাই ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য। ইহা একপ্রকার জীবন্মুক্তি অবস্থা। ইহাও একপ্রকার নির্বাণ। যতদিন এই অবস্থায় 'স্কন্ধ' বা দেহ থাকে ততদিন ইহাকে সোপাধিক নির্বাণ বলে। স্কন্ধ-নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ দেহপাত হইলে যে নির্বাণ হয় তাহা নিরূপাধিক নির্বাণ। ইহা সাংখ্যের বিদেহ-কৈবল্যের অনুরূপ। এই মতে ক্লেশই অজ্ঞানের স্বরূপ। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যেমন অবিদ্যাকে মূল ক্লেশরূপে ধরা হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়েও সেইপ্রকার অবিদ্যারূপ ক্লেশের নিবৃত্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন।

বোধিসত্ত্বদের মতে মলিন বাসনারূপ ক্লেশের নিবৃত্তি হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাসনার সর্বাংশে নিবৃত্তি হয় না। কারণ মলিন বাসনা নিবৃত্তির পরও শুদ্ধ বাসনার অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। অবশ্য যাহার মধ্যে শুদ্ধ বাসনা থাকে না তাহার পক্ষে ক্লেশ নিবৃত্তিই চরম লক্ষ্য। তাহাদের কৈবল্যরূপ নির্বাণই একমাত্র গতি। কিন্তু পূর্ণত্ব বা বুদ্ধত্বের আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। বোধিসত্ত্ব না হইলে কেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে না। কারণ, বোধিসত্ত্ব শুদ্ধ বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম করিতে করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া ভূমি ভেদ করিতে করিতে দশ ভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধত্বলাভে অধিকারী হয়।

পরার্থ বাসনাকে শুদ্ধ বাসনা বলা হয়। উহা যত শুদ্ধই হোক, তথাপি উহা ভোগ বা অধিকাররূপ চিত্তেরই ধর্ম। তাই বোধিসত্ত্ব অবস্থাও একপ্রকার অজ্ঞানেরই অবস্থা। তবে উহা ক্লিষ্ট অজ্ঞান নহে, অক্লিষ্ট অজ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন ভূমি ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া বোধিসত্ত্বকে অগ্রসর হইতে হয় এবং এই অগ্রগতির সঙ্গে শুদ্ধ বাসনাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে শেষে নিবৃত্ত

হইয়া যায়। বোধিসত্ত্বের অন্তিম অবস্থায় বুদ্ধত্বের বিকাশ হয়। বোধিসত্ত্বের এইরূপ ক্রমবিকাশের সহিত আগমের আণবমলযুক্ত পশু আত্মার বিকাশের তুলনা করা যাইতে পারে। আগম সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিপাতের প্রভাবে যখন পশু আত্মার আণবমল বিগলিত হয় তখন ঐ আত্মা শুদ্ধ অধ্বাতে সঞ্চরণ করিতে অধিকারী হয়। এই অধ্বা মায়ার অতীত। এই বিশুদ্ধ রাজ্যে শুদ্ধ বাসনার প্রভাবে ভোগ ও মুক্ত অবস্থার অনুভব হয়। এইরূপে শুদ্ধ অবস্থায় সঞ্চরণ করিতে করিতে আত্মা যথাসময়ে শিবভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ বোধিসত্ত্বের অন্তিম অবস্থায় বুদ্ধত্বের বিকাশ হয়। আগম অনুসারে যতক্ষণ চিৎ-রূপা শক্তির অভিব্যক্তি না হয়, ততক্ষণ আত্মায় শিবত্বের আভাস হইলেও শিবত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না। ঠিক এইভাবেই বোধিসত্ত্বের আধ্যাত্মিক প্রগতি দশ-ভূমিতে বিভক্ত। ভূমি-প্রবিষ্ট প্রজ্ঞার বিকাশ হইতে হইতে অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তারপর অন্তিম অবস্থায় 'পূর্ণাভিষেক' প্রাপ্ত হইলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপদে অধিষ্ঠিত হন। বুদ্ধত্ব অদ্বৈত স্থিতির বাচক। 'পুদ্গল-নৈরাত্ম্য' সম্বন্ধে সিদ্ধি অর্জন করিলে ক্লেশ নিবৃত্তি হইয়া যায়, কিন্তু দ্বৈতভাব তখনও বিনষ্ট হয় না। দ্বৈতভাব নিবৃত্তির জন্য 'ধর্মনৈরাত্ম্যে'র জ্ঞান আবশ্যক হয়। শুদ্ধ বাসনা নিবৃত্ত হইলে ধর্মনৈরাত্ম্যও সিদ্ধ হয়। তখন নৈরাত্ম্যদৃষ্টিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সমরস হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণ নৈরাত্ম্য।

বুদ্ধত্বলাভের আদর্শ প্রাচীন যুগেও ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে বুদ্ধ হওয়া অত সহজসাধ্য ছিল না, যতটা সহজ ছিল অর্হৎপদে উন্নীত হইয়া নির্বাণ লাভ করা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দুঃখের উপশম করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। কিন্তু যে আভ্যন্তরীণ সংবেগের তীব্রতাবশতঃ অন্যের দুঃখ নিজের বলিয়া প্রতীতি হয় এবং নিজ সত্তাবোধ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ যখন সমগ্র বিশ্বে আত্মভাব আসে তখন সকলের দুঃখ-নিবৃত্তি আপন দুঃখ-নিবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। ক্লিষ্ট বাসনার উপশমবশতঃ যে নির্বাণ লাভ হয় তাহা যথার্থ নির্বাণ নহে। মহানির্বাণ লাভ করিতে হইলে অক্লিষ্ট বাসনার প্রেরণায় কর্ম করিয়া বৌদ্ধ সাধককে ভূমি-প্রবিষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্ব হইয়া ক্রমশঃ ভূমি সকল অতিক্রম করিতে হয়। এই ক্রমবিকাশরূপ দশভূমির মার্গে কাহারও কাহারও শত শত জন্ম কাটিয়া যাইতে পারে।

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত বিবেকখ্যাতি বা বিবেকজ্ঞান হইতে বিবেকজ-জ্ঞান ভিন্ন। বিবেকখ্যাতি কৈবল্যরূপ মুক্তিতে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু বিবেকজ-জ্ঞান তারকজ্ঞানস্বরূপ, ইহা সর্ববিষয়ক সর্বভাবের প্রকাশক ও অনৌপদেশিক অক্রমজ্ঞান। এই জ্ঞানকে প্রাতিভ জ্ঞান বা স্বয়ংসিদ্ধ মহাজ্ঞান বলা চলে। এই জ্ঞানে সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু ইহাকে কৈবল্যস্থিতি বলা চলে না। বৌদ্ধমতেও এইরূপ হীনযানসম্মত শ্রুতচিন্তা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা হইতে মহাযানসম্মত ভূমিপ্রবিষ্ট

প্রজ্ঞা ভিন্ন। কৈবল্য-প্রাপ্তিরূপ হীনযানসম্মত প্রজ্ঞা লাভ সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা অর্জনের দ্বারা বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপদে আরূঢ় হওয়া সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। জৈনমতেও কেবলজ্ঞান সকলেই লাভ করিতে পারে, কিন্তু তীর্থঙ্করত্ব লাভের যোগ্যতা সকলের নাই। তীর্থঙ্কর গুরু এবং উপদেষ্টা—এই স্তরে ব্যক্তিবিশেষই আরূঢ় হইতে পারে, সকলে পারে না। তীর্থঙ্করত্ব ত্রয়োদশ গুণস্থানে প্রকট হয়, কিন্তু সিদ্ধাবস্থার প্রাপ্তি হয় চতুর্দশভূমিতে। দ্বৈত শৈবাগমেও শুদ্ধ অধ্বাতে প্রবিষ্ট হইলে শুদ্ধ অধিকার-বাসনা এবং শুদ্ধ ভোগ-বাসনার প্রভাবে যোগী শুদ্ধ বিদ্যার অধিষ্ঠাতা হইয়া দুঃখপঙ্কে মগ্ন জগৎবাসীকে জ্ঞানদান করেন এবং জীবসমূহকে শুদ্ধ অধ্বাতে আকর্ষণ করেন। এইজন্য শুদ্ধ অধিকারসম্পন্ন শুদ্ধ বিদ্যায় অধিষ্ঠিত যোগিগণকে 'বিদ্যেশ্বর' বলা হয়। জীবোদ্ধাররূপ বিদ্যেশ্বরগণের কার্যকেই বলা হয় বিশুদ্ধ পরোপকার। যোগীর অধিকার-বাসনা ও ভোগ-বাসনা শুদ্ধ হইলেও উভয়ের নিবৃত্তি আবশ্যক। এই নিবৃত্তি ক্রমশঃ হইতে থাকে যাহার ফলে যোগ ক্রমশঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে সদাশিব তত্ত্বে আরোহণ করেন। যখন শুদ্ধ আনন্দের প্রতিও বৈরাগ্য জন্মায় তখন অন্তর্লীন অবস্থায় শিবত্বের স্ফুরণ হয়। কিন্তু এই শিবত্বে উপাধি থাকে। এরপরে নিরুপাধি শিবত্ব লাভ হয় এবং তখনই মহামায়া হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ হয়। অদ্বৈত শৈবাগমেও ভগবদনুগ্রহের প্রভাবে প্রথমে শুদ্ধমার্গে প্রবেশ হয়, তাহার পর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে পরম শিবত্ব পর্যন্ত স্থিতির বিকাশ হয়। দীক্ষারও যথার্থ তাৎপর্য এইখানেই। দীক্ষায় পাশক্ষয় ও শিবত্ব যোজন উভয়ই সংঘটিত হয়।

প্রাচীনকালে বুদ্ধত্বলাভের লক্ষ্য সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, কিন্তু কোন কোন উচ্চাধিকারীর নিকট বুদ্ধত্বলাভই ছিল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার জন্য তাহাকে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন প্রকার পরিশীলনের দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইত। এই সাধনাকে বলা হয় পারমিতা-সাধন। পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার এই দুই সম্ভার হইতে বুদ্ধত্ব নিষ্পন্ন হয়। পুণ্যসম্ভার কর্মাত্মক, জ্ঞানসম্ভার প্রজ্ঞাত্মক। বুদ্ধত্বের আদর্শ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বুদ্ধবীজ প্রতি মনুষ্যদেহেই নিহিত আছে এবং মনুষ্যদেহেই এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিকশিত হইতে পারে। বিকশিত হইলেই বুদ্ধত্বলাভ স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যে সময়ে বুদ্ধত্বের আদর্শের প্রসার হইল সেই সময হইতেই বোধিসত্ত্বের চর্যা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এবং তখন হইতেই নির্বাণেব প্রচলিত আদর্শ মলিন হইয়া পড়িল। ইহার পরিবর্তে মহানির্বাণ বা মহাপরিনির্বাণের আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যোগীর জীবনে করুণা ও সেবার স্থান—যোগীর জীবনে অন্য ধর্মের

বিকাশের সঙ্গে করুণার বিকাশও আবশ্যক। করুণাই সেবাধর্মের প্রাণস্বরূপ। যাহাদের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না এবং যাহাদের চিত্তে সেবাধর্মের উন্মেষ হয় না, তাহাদের হৃদয়বৃত্তি অবশ্যই সঙ্কীর্ণ। সর্বতোভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই তাহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত, তাহারা শুধু নিজের জন্য ঐহিক বা পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করে। অর্থাৎ তাহারা চায় জাগতিক ঐশ্বর্য, নতুবা পারলৌকিক স্বর্গাদির আনন্দ। ইহা হইতেও কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের অধিকারীর লক্ষ্য নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি। বিশ্বকল্যাণ বা পরার্থসাধন ইহাদের ধ্যেয় নয়। কখনও কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরার্থপরতার আভাস পাওয়া গেলেও উহা প্রকৃতপক্ষে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপেই গৃহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দয়া নামক সাত্ত্বিক বৃত্তির কথা বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি পুণ্যার্থের লোভী হইয়া অপরকে দয়া করেন বা দয়ার ভাবনা করেন, সেই দয়াকর্ম ও ভাবনা হইতে সেই ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানলাভ ও মুক্তির সহায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি অপবের প্রতি এই দয়া-প্রকাশ নিজ কল্যাণেবই সাধনরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগদর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার নিয়মিত অনুশীলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যেও 'ব্রহ্ম-বিহার' নামে চিত্তেব পরিকর্মরূপে ঐ সকল বৃত্তির চর্চাব নির্দেশ আছে। যোগদর্শনে করুণার যেরূপ অনুশীলনেব কথা বলা হইয়াছে তাহা চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে গৃহীত—ইহাতে ব্যক্তিগত মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতে সর্বাংশে ভিন্ন করুণার অন্য আরেকটি রূপ আছে যাহাকে জীবনের সাধ্যরূপে অবলম্বন করিয়া মহাযানী বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম সাধনার মার্গ প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই ধরণের করুণা ব্যক্তিগত মুক্তিব পরিপন্থী—ইহা জীবোদ্ধার কর্মের প্রেরণার উৎস।

উপনিষদের যুগে জীবন্মুক্তিব দশাতেই সাধকের করুণাপ্রকাশের উপযুক্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ ভবদুঃখের নিবৃত্তির উপায়রূপে যথাশক্তি জ্ঞানদান করাই ছিল জীবন্মুক্ত জ্ঞানী তথা যোগীর জীবনের উদ্দেশ্য। করুণাপ্রকাশের ইহাই ছিল মুখ্য সাধন বা প্রণালী। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সংসার তাপে দগ্ধ জীবদের উদ্ধারের একমাত্র অধিকারী। যতদিন ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় না হয় ততদিন জীবন্মুক্ত যোগী দেহে অবস্থিত থাকে। তাই দেহাবস্থানকালে জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত জীবসেবা করিবার মুখ্য অধিকারী। জীবোদ্ধারই প্রকৃত জীবসেবা। বর্তমান জগতে করুণাপ্রকাশের যত রূপই প্রবর্তিত থাকুক, ঐগুলি মুখ্য করুণার নিদর্শন নহে। কিন্তু জীবন্মুক্তের সেবাকালও পরিমিত। কারণ

প্রারব্ধ কর্মের ভোগ শেষ হইলে জীবন্মুক্তের দেহের অবসান ঘটে, তখন আর তাঁহার জীবসেবার সুযোগ থাকে না।

মায়ার দুই শক্তি—এক আবরণ শক্তি, অপর বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তির দ্বারা জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত রাখে আর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চিত্তকে প্রাক্তন সংস্কারের দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া রাখে অর্থাৎ উপাধি থাকে। জীবন্মুক্তিতে অজ্ঞানের আবরণ শক্তি থাকে না বলিযা আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান অনাবৃত হয়, কিন্তু বিক্ষেপ শক্তি থাকে বলিয়া সংস্কারের আভাস বা উপাধি থাকিয়া যায়। তাই একমাত্র এই সময়ে জীব ও জগতের সেবা সম্ভবপর। বলিতে কি, জীবন্মুক্তই জগতে যথার্থ গুরু। একমাত্র এই গুরুই তারকজ্ঞান সঞ্চার করিয়া যথার্থরূপে জীবদুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। তাই গুরুই প্রকৃত সেবাব্রতী। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই সেবার ক্ষেত্র দেশ ও কালের দ্বারা পরিমিত। পরিমিত এই জন্য যে এক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র যত বিশালই হউক তথাপি তাহা সীমাবদ্ধ এবং যতদিন দেহসম্বন্ধ থাকে ততদিনই সেবকের সেবা করার অবসর থাকে। দেহত্যাগের পর কৈবল্যপ্রাপ্ত হইলে তখন আর সেবা করিবার সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সময় জীবন্মুক্ত গুরু পবম্পরাক্রমে সেবাব্রতের ভাব নিজের যোগ্য শিষ্যের উপর অর্পণ করিয়া পরমধামে গমন করেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

সিদ্ধদেহ—যাঁহার চিত্তে পরদুঃখ নিবারণের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, তিনি চেষ্টা করেন যাহাতে শীঘ্র যেন তাঁহার স্কন্ধ-নিবৃত্তি বা দেহপাত না হয়। তাঁহার এই চেষ্টা জীবসেবার অবসর বাড়াইবার জন্য। সকলের চিত্তে এইপ্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাহারো কাহারো চিত্তে এই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। ইহাই তাহার মহত্ত্বের নিদর্শন।

ভক্তিসাধন মার্গেও এই প্রকার বিচার দৃষ্ট হয়। যাহারা মুক্তি লাভেচ্ছু তাহাদের ভক্তি চিরস্থায়ী নয়, কারণ মোক্ষলাভ করার পর ভক্তির অবকাশ থাকে না। এই ভক্তি সাধন বা উপায়-ভক্তি, এইস্থলে উপেয় বা সাধ্য হইল জ্ঞান বা মুক্তি। কিন্তু যাহার মুক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহার চিত্তে নিত্যভক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইহাই বৈশিষ্ট্য। কারণ ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণবধর্ম। ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম। এই ধর্মে ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হইতেছে হৃদয়ের প্রেম। ভগবানে প্রগাঢ় অনুরক্তি বা প্রেমই হইতেছে ভক্তি—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। এইরূপ ভক্তিবাদী চায় নিত্য কৃষ্ণসেবা, নিত্য কৃষ্ণসঙ্গ—তাঁহাদের সাধ্য-সাধনতত্ত্বে মুক্তি বা মোক্ষের কোন স্থান নাই। তাঁহাদের নিকট প্রেমভক্তি সাধন নয়,

সাধ্য—End in itself। এই ভক্তি হইল ফলরূপা ভক্তি। এই ভক্তির স্থান মুক্তির উর্ধ্বে। এইপ্রকার ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থরূপে গণ্য হয়। চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন—
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ,
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।
*　*　*
ভক্তি-সুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥" (চৈঃ চঃ)

অনেক মুক্ত পুরুষ এই জাতীয় ভক্তির জন্য লালায়িত হন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। কৃষ্ণকর্ণামৃতে দেখিতে পাই, ভগবান লীলাশুককে বলিতেছেন, 'তুমি ভক্তি চাহিলে কেন? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুবর্গ ফলের একটিও চাহিলে না, ইহার কারণ কি? উত্তরে লীলাশুক বলিলেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরাযদিস্যা—
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষা॥" (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

—আমি চিরস্থায়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি চাহিয়াছি এইজন্য যে আমার যদি ভক্তি থাকে তবে মুক্তি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আমাকে সেবা করিবে।

কিন্তু কালের অধীন এই পরিণামী ও মলিন দেহে এইপ্রকার মহান আদর্শ লাভ করা অসম্ভব। এইজন্য মর্ত্যদেহকে জরামরনহীন সিদ্ধদেহে পরিণত করা আবশ্যক। বৈষ্ণবসম্মত ভাবদেহ, প্রেমদেহ ও রসদেহ এইপ্রকার সিদ্ধদেহ। ইহা জরা-মৃত্যুর অতীত। ইহাকে 'পার্ষদ তনু' বলে, যাহার দ্বারা নিত্যধামে নিত্য ভক্তির যাজন হয়।

জ্ঞানীদের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। সাধারণতঃ অধ্যাত্ম জ্ঞান অজ্ঞানের আবরণ-অংশ নাশ করে কিন্তু বিক্ষেপ-অংশ নাশ করে না। তাই জ্ঞানের সঞ্চারে প্রারব্ধের নাশ হয় না। কিন্তু এমন বিশেষ জ্ঞানও আছে যাহার ফলে বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। এই ধরণের জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত ঘটে। আবার এক প্রকারের এমন জ্ঞানের বিকাশ আছে যাহার প্রভাবে কর্মজনিত মলিন দেহের নাশ হয না, বরং রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ইহাতে দেহ চিন্ময় হইযা যায়। প্রথমে এই দেহ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয়, তখন জরা-মৃত্যুব নিবৃত্তি হয়। তাহার পর সাক্ষাৎ চিন্ময়ত্ব লাভ হয়। আগমের পরিভাষায় প্রথম দেহের নাম 'বৈন্দবদেহ', দ্বিতীয়ের নাম 'শাক্তদেহ'। শাক্তদেহ চিৎশক্তিময়।

বৈন্দবদেহের নামই সিদ্ধদেহ। বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত সিদ্ধাচার্যগণ এইপ্রকার সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই দেহ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সিদ্ধাচার্যগণ এই দেহে অবস্থিত হইয়া জীবসেবা করিয়া থাকেন। এই দেহ কালগ্রাসে পতিত হয় না অর্থাৎ মৃত্যুভয় থাকে না। তাই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সিদ্ধদেহে থাকিয়া জগতের কল্যাণ করা যায়। কিন্তু সুদীর্ঘকালের পর এই দেহেরও অবসান ঘটে। কিন্তু তখনও দেহপাত হয় না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পর যোগী তখন ঐ দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া পবমধামে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ ইহাকে দিব্যতনু বলিয়া বর্ণনা করেন। নাথ যোগী সম্প্রদায়, রসেশ্বর যোগী সম্প্রদায় ও মহেশ্বর যোগী সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। St. John এর Apocalypse-এও এই বিষয়ে বহু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় যোগিগণের resurrection-দেহ এবং ascension দেহ মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ যোগিগণের আধ্যাত্মিক জীবনে করুণার স্থান—বৌদ্ধ যোগিগণের আধ্যাত্মিক জীবনে করুণার স্থান কোথায় তাহা এইবার বিবেচনা করা যাইতেছে। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধযানে সর্বসত্ত্বের দুঃখ-দর্শনই করুণার মূল উৎস। ইহাকে 'সত্ত্বাবলম্বন করুণা' বলে। মৃদু ও মধ্যকোটির মহাযান মতের সৌত্রান্তিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ের বিবেচনায় জগতের নশ্বরত্ব বা ক্ষণিকত্বই করুণার মূল উৎস। ইহার নাম 'ধর্মাবলম্বন করুণা'। উত্তমকোটির মহাযান অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতে করুণার কোন মূল নাই অর্থাৎ উহার পৃথক্ সত্তা নাই। এই মতে শূন্যতাব সঙ্গে অভিন্ন করুণাই বোধির অঙ্গ। সুতরাং এই মতে শূন্যতা যেমন লোকোত্তর, করুণাও তেমনই লোকোত্তর। ইহাই অহেতুক করুণা।

প্রমাণ-বার্ত্তিককার ধর্মকীর্ত্তি করুণাকে ভগবান্ বুদ্ধের প্রামাণিকতার সাধন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিযাছেন এই করুণা অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয়—

সাধনং করুণাভ্যাসাৎ সা বুদ্ধের্দেহসংশ্রয়াৎ।
অসিদ্ধোঽভ্যাস ইতি চেৎ নাশ্রয়প্রতিষেধতঃ॥

শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধ হইতে বুদ্ধেব ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতির লক্ষণ হইল বাসনা নিবৃত্তি, কিন্তু পরার্থবৃত্তি গ্রহণের জন্য সম্যক সম্বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দয়া সত্ত্বদৃষ্টিমূলক নয়, এই দয়া বস্তুধর্ম। এইজন্য ইহা দোষাবহ নহে। বার্ত্তিককার বলিযাছেন—

দুঃখজ্ঞানেঽবিরুদ্ধস্য পূর্বসংস্কারবাহিনী।
বস্তুধর্মাদয়োৎপত্তির্ণ সা সত্ত্বানুরোধিনী॥

দুঃখজ্ঞান হইলে পূর্বসংস্কার প্রভাবে দয়া স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। পূর্ব সংস্কারের

অর্থ প্রাক্তন অভ্যাসের প্রবৃত্তি। কৃপাবিষয়ীভূত দুঃখের ধর্মই বস্তুধর্মের তাৎপর্য। এখানে টীকাকার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে যাঁহাদের আত্মদৃষ্টি সর্বদা উন্মূলিত, দুঃখের সম্মুখীন হইলেই এমন মহাপুরুষদের দয়া উৎপন্ন হয়। কারণ তাঁহারা দুঃখকে কৃপার বিষয়রূপে গ্রহণের অভ্যাস করিয়াছেন। দুঃখমাত্রেরই মূল কারণ মোহ। বৌদ্ধমতে সত্ত্বগ্রাহ বা আত্মগ্রাহই মোহের মূল কারণ। ইহা উন্মূলিত হইলে কাহারও প্রতি দ্বেষ থাকে না। এইরূপে দেখা যায় যে এই কৃপা দোষের মূলীভূত আত্মগ্রাহের অভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব এই কৃপা দোষণীয় নয়।

পূর্বকর্মের আবেশ ক্ষীণ হইলে এবং দুঃখজনক অন্যান্য কারণের আত্যন্তিক বিনাশ হইলে অবশ্যই মুক্তি হয়। কিন্তু যিনি মহাকৃপাসম্পন্ন, তাঁহার সংস্কারের শক্তি ক্ষীণ হয় না। তাই তিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তিনি আকাশের মতই চিরস্থায়ী। কিন্তু শ্রাবকদের করুণা অত্যন্ত মৃদু (ক্ষীণ), তাই তাঁহাদের স্থিতিকাল সীমাবদ্ধ এবং দেহসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের মহান্ প্রযত্নও নাই। এইজন্য তাঁহারা সর্বকালে অবস্থান করেন না। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলেন ঐ মহামুনি যিনি অপরের উপকার সাধনের জন্যই চিরকাল অবস্থান করেন। তিনি অকারণ স্নেহপ্রবণ এবং প্রকৃতই কৃপাময়। অদ্বয়বজ্র 'তত্ত্বরত্নাবলী'তে বলিয়াছেন, শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধের করুণা সত্ত্বাবলম্বিত। সত্ত্বগণের পরিণাম দুঃখত্বকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের করুণা উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধ সাধনার প্রত্যেকটি বিভাগই প্রজ্ঞা ও করুণার মানদণ্ডেই বিচারযোগ্য।

বৌদ্ধগণের ধার্মিক জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হইল। এক্ষণে উহাই সংক্ষেপে আরও স্পষ্টভাবে বলা যাইতেছে।

তৃষ্ণানিবৃত্তি ও নির্বাণ, লৌকিক ও লোকোত্তর চিত্ত—প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনার ভিত্তি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সম্যক আচার, ধ্যান ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি নির্বাণ লাভের তিনটি সোপানস্বরূপ। প্রাচীন বৌদ্ধগণের লক্ষ্য ছিল নির্বাণ ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি। তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুঃখের মূল। সেইজন্য তৃষ্ণার নাশই দুঃখনিরোধের একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তৃষ্ণা স্বরূপতঃ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত—নিম্নতম কামধাতু অর্থাৎ জড় জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবর্তী রূপধাতু নামক জ্যোতির্ময় সাকার লোকে ও ঊর্ধ্বস্থ অরূপধাতু নামক নিরাকার লোকেও তৃষ্ণা আছে। সর্বোচ্চ ভূমির তৃষ্ণাকে ভবতৃষ্ণা বলে। কামাদি ত্রিধাতুতে তৃষ্ণার আশ্রয়স্বরূপ একটি চিত্ত থাকে, উহাকে লৌকিক চিত্ত বলে। লৌকিক ও লোকোত্তর চিত্তে প্রভেদ আছে। লৌকিক চিত্তের উৎপত্তি হয় বাহ্য বস্তু হইতে অথবা উহার

সংস্কার-প্রভাবিত আলম্বন হইতে। কিন্তু যখন বিবেকজ্ঞান অথবা সন্ন্যাসবশতঃ চিত্ত ঐ বাহ্য আলম্বন ত্যাগ করে এবং উহার পরিবর্তে নির্বাণকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে, তখন ঐ চিত্ত লোকোত্তর চিত্ত নামে বর্ণিত হয়।

পুরাতন সাধন-প্রণালীতে ধ্যান ও চিত্তের একাগ্রতার প্রক্রিয়াই মুখ্য সহায়ক রূপে পরিগণিত হইত। কামধাতুসংবদ্ধ নিম্নতম চিত্ত ধ্যানের অনুকূল নহে। কিছুটা মার্জিত উন্নত চিত্তই লৌকিক বা লোকোত্তর ধ্যান-চিত্তের অন্তর্গত। লৌকিক ও লোকোত্তর চেতনার মুখ্য ভেদ ইহাই যে প্রথমটি 'কুশল-চিত্ত', যাহার জন্য জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা অবাধে চলে। কিন্তু লোকোত্তর চিত্তে এই স্রোত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে শেষে নির্বাণে পরিসমাপ্ত হয়।

কামধাতুর নিম্নতর চিত্ত উপদেশের প্রভাবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে 'উপচার-সমাধি'র মধ্য দিয়া উচ্চতর ধ্যান-চিত্তে পরিণত হইতে পারে। নিম্নতর চিত্তের আলম্বন স্থূল বিষয়। প্রত্যক্ষ ও স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত আলম্বনকে 'পরিকর্ম' বলে। অভ্যাসের পরিপক্ক অবস্থাকে 'উদ্‌গ্রহ' বলা হয়। উহা মানসদৃষ্টির বিষয়। কিন্তু যাহার আধার উত্তম, তাহার 'উপচার-ধ্যান' হইতেই সাধনার শুরু। উপচার-ধ্যান স্থির ও অচঞ্চল প্রতিভা হইতে নিষ্পন্ন হয়। উপচার-ধ্যানে একাগ্রতার ফলে যথাসময়ে একটি শুভ্র প্রকাশ সৃষ্ট হয়। এই প্রকাশ প্রকট হইবার পরে চিত্তের পাঁচ প্রকার 'নীবরণ' বা আবরণ ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার পর সমাধি অবস্থা আসে। ইহার নাম উপচার-সমাধি।

লৌকিক কামচিত্ত হইতে লোকোত্তর চিত্তে পরিণতি ক্রম—লৌকিক কামচিত্ত হইতে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার উপযোগী লোকোত্তর চিত্তে পরিণতি লাভের ক্রম উপরিলিখিত ক্রমের অনুরূপ। এই স্থলেও উপচার-সমাধির মাধ্যমেই অগ্রগতি হইয়া থাকে। ভবাঙ্গ স্রোতের সূত্র ছিন্ন হওয়ার পর কামধাতুর বিশিষ্ট কুশলচিত্ত কয়েকক্ষণের জন্য ক্ষণিক পরিণাম (জবন) অনুভব করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কুশলচিত্ত 'গোত্রভূ' জবন নামক অন্তিমক্ষণ নির্বাণকে আলম্বন করিয়া থাকে। ইহাই চতুর্থ ক্ষণ। ইহার পূর্বে পরিকর্ম, উদ্‌গ্রহ, উপচার এই তিন ক্ষণ বিদ্যমান থাকে। লৌকিক চেতনা হইতে লোকোত্তর চেতনাতে পরিণাম বিশ্লেষণই এই সব ক্ষণের বিচার বিষয়।

গোত্রভূর পরবর্তী ক্ষণের নাম 'অর্পণাক্ষণ'। ইহা চেতনার পরিণতির সূচক। এই সময়ে এক নবীন অধ্যাত্ম চেতনাক্ষেত্রে প্রবেশ হইয়া থাকে। ইহার পর এক লোকোত্তর গোত্রের আবির্ভাব হয়, যাহা পূর্বজীবনের সকল প্রকার সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইহার পরেও ঐ ক্ষণের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে যাহা 'মার্গক্ষণ' নামে কথিত। মার্গক্ষণ নামক এই মহাক্ষণে চারিটি আর্যসত্যের সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ এই মহাক্ষণে সকল ধাতুর ও

সকল প্রকার প্রাণীর সকল প্রকার দুঃখের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের হেতু যে অজ্ঞান তাহাও আনুষঙ্গিক উপসর্গ সহিত লক্ষিত হয়। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি-রূপ নির্বাণ এবং দুঃখনিরোধনামী মার্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। একই সঙ্গে চাবিটি আর্যসত্যের সাক্ষাৎকার হয়। যেমন ক্ষণিক বিদ্যুতের চমকে একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃশ্যের দর্শন হইয়া থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। যখন চিত্ত নির্বাণগামী স্রোতে পতিত হয় তখন কোনপ্রকার অপায়ের বা ভবিষ্য পতনের আশঙ্কা থাকে না। এইপ্রকার 'স্রোত-আপন্নে'র প্রথম অবস্থা উৎপন্ন হয়। মার্গের পরিশীলন দ্বারা ক্লেশসমূহ উন্মূলিত হয়। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে, চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী—এক সংসারের দিকে, অপর কল্যাণের দিকে। এই কথায় এই সত্যই ধ্বনিত হইতেছে যে নির্বাণগামী স্রোতে যিনি পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ঐ স্রোত কল্যাণের দিকে লইয়া যায়, সংসারের দিকে নহে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা যাহা উপায়ের অন্তর্গত তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ পরিভাষাতে 'বোধিপক্ষীয় ধর্ম' নামে প্রসিদ্ধ। মার্গচিত্তের পর ফলচিত্তের উদয় হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে প্রাচীন বৌদ্ধ-সাধনা নির্বাণমার্গের আবিষ্কার ও অনুসরণকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া স্বীকার করিত। এই নির্বাণ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ ও অনর্থ হইতে মুক্তিরূপে পরিগণিত হইত। ইহা উপনিষদ্ ও সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ ছিল।

তিন আদর্শ—প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে মুমুক্ষুদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি আদর্শ প্রচলিত ছিল—শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যক্ বুদ্ধ। প্রথম হইতে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় আদর্শ শ্রেষ্ঠ। শ্রাবকগণ দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই মার্গ বোধির বা জ্ঞানের মার্গ। চাব আর্য-সত্যের উপর এই মার্গ-সত্য প্রতিষ্ঠিত। বোধি বা জ্ঞান শ্রাবকগণ আপনা হইতে স্বতঃই লাভ করিতেন না, ইহার উদয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বুদ্ধাদি শাস্তাগণের (গুরুবর্গের) দেশনা (উপদেশ) গ্রহণ করিতে হইত। এইজন্য ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলে। শ্রাবকরা ছিলেন মুমুক্ষু—লক্ষ্য ছিল নির্বাণের দিকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দুঃখ-নিরোধ হইত পুদ্গল-নৈরাত্ম্যের জ্ঞান হইতে, কাহারও বা প্রতীত্য-সমুৎপাদের জ্ঞান হইতে। ধর্ম-নৈরাত্ম্যের জ্ঞান কোনও শ্রাবকেরই হইত না। এইজন্য উহাদের শ্রেষ্ঠ নির্বাণ লাভ হইত না। কিন্তু ইহা সত্য যে তাঁহারা অধঃপাতের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেন। কারণ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তাঁহাদের ক্লেশ বা অশুদ্ধ বাসনাত্মক-আবরণ দগ্ধ হইয়া যাইত।

এইজন্য ত্রিধাতুতে তাঁহাদের জন্ম লইবাব সম্ভাবনা থাকিত না—জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেন।

প্রত্যেকবুদ্ধের আদর্শ শ্রাবকদের হইতে উন্নত। যদিও ইহাদের সাধন-জীবনের অনুপ্রেরণা ব্যক্তিগত নির্বাণলাভেই নিহিত, তথাপি ইহাদের আধার অধিক শুদ্ধ। অধিক আধারশুদ্ধির কারণে ইহাদের স্বদুঃখনিবৃত্তির উপায় বা জ্ঞানের জন্য অপরের উপদেশ লাভ করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহারা পূর্বশ্রুতাদি অভিসংস্কারের দ্বারা স্বয়ংই বোধি লাভ করেন। বোধির লাভই বুদ্ধত্ব লাভ। যোগশাস্ত্রে যাহাকে অনৌপদেশিক বা প্রাতিভ জ্ঞান বলে, প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞান প্রায় উহারই সমান। এই জ্ঞান বিবেকোত্থিত প্রাতিভ জ্ঞানের একটি রূপ। এই জ্ঞান লৌকিক শব্দ-জ্ঞান নয়। প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের বুদ্ধত্বের জন্য সাধনা করেন, বুদ্ধত্ব লাভও করেন, কিন্তু সকলেব বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ইহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা নাই।

তৃতীয় আদর্শটি সম্যক্-সম্বুদ্ধের। ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সম্যক্-সম্বুদ্ধকেই বুদ্ধ ভগবান বলা হয়। ইনি অনুত্তর সম্যক-সম্বোধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার লক্ষ্য অত্যন্ত উদার। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনাই ইঁহার মূলাধার। শ্রাবকদের ক্লেশাবরণ নিবৃত্ত হয এবং প্রত্যেকবুদ্ধের ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেযাবরণ দুইই নিবৃত্ত হয়। কিন্তু ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত হইলেই প্রকৃত বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। শ্রাবকদের দ্বৈত-বোধ ঘোচে না এবং প্রত্যেকবুদ্ধেরও দ্বৈতবোধ পুরো ঘোচে না, কেবল সম্যক্-সম্বুদ্ধই অদ্বয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত হন। ইহা ঠিক যে জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত না হইলে অদ্বৈতভাবের উদয় হয় না। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'জ্ঞানস্য অনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্'—জ্ঞান অনন্ত হইলে জ্ঞেয় অল্প হয়। সম্যক-সম্বুদ্ধাবস্থা অনন্ত জ্ঞানের অবস্থা। এইজন্য আচার্যগণ এই জ্ঞানকে বোধি না বলিয়া মহাবোধি বলিয়াছেন। এই অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত করুণাও মিশ্রিত থাকে। সত্ত্বার্থক্রিয়া বা পরার্থ সম্পাদনের ভাবই সম্যক্-সম্বুদ্ধগণের বীজ—ইহাই সম্যক-সম্বুদ্ধত্ব লাভের প্রধান কারণ। নির্বাণ বা স্বদুঃখ নিবৃত্তিতে লীন না হইয়া নিরন্তর জীবসেবায় নিরত থাকা বোধিসত্ত্বের জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ লইয়াই বোধিসত্ত্ব সম্যক-সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন।

শ্রাবকযানে মুখ্য মোক্ষ হয় না। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, লঙ্কাবতার ধর্মমেঘসূত্র, নাগার্জুনের উপদেশ প্রভৃতিতে সর্বত্রই এই কথাই বলা হইয়াছে। শ্রাবকদের অবশ্য বিশ্বাস যে বোধি লাভ করিয়া নিবাণ-প্রাপ্তি তাঁহাদের সম্প্রদায়েই হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা নির্বাণ নহে, ত্রিলোক হইতে নির্গমণ মাত্র।

কেবল শুদ্ধ বোধি হইতেই মহাবোধি লাভ হয় না। তাহার সঙ্গে ভগবত্তার

যোগ হওয়া আবশ্যক। যতদিন পারমিতা সম্ভার পূর্ণ না হয় ততদিন ভগবত্তার উদয হইতে পারে না। বোধিসত্ত্ব শেষ জন্মে পারমিতা পূর্ণ করিয়া ভগবত্তা লাভ করেন; কিন্তু বুদ্ধত্ব লাভ করেন না। কেহ কেহ বা ভগবত্তার সঙ্গে বুদ্ধত্বও প্রাপ্ত হন। ইনিই হন ভগবান বুদ্ধ। বোধি ও ভগবত্তা দুইটি পৃথক্ ধারা। বোধির ধারাতে আছে বুদ্ধত্ব, কিন্তু উহা সম্বুদ্ধত্ব নহে। কারণ, অপরের প্রতি করুণা না থাকায ঐ বোধি মহাবোধি নহে। সমগ্র বিশ্বকে আপন ভাবিয়া করুণাবিগলিতভাবে তাহার সেবা করিতে না পারিলে মহাবোধির উদয় হয় না। সেবাকর্মের নাম চর্যা, বোধিভাবের নাম প্রজ্ঞা। একই আধারে এই দুইটি যুগপৎ অবস্থান করিলে বুদ্ধত্ব ও ভগবত্তা অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাই মহাযান বৌদ্ধদের মনে মানব জীবনের চরম আদর্শ, ইহাই বুদ্ধের ভগবত্তা।

ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্য এইখানেই। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাকেই ব্রহ্মত্ব এবং ভগবত্তা বলা হইযাছে—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানমদ্বযম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

অর্থাৎ এক অদ্বয় জ্ঞানাত্মক তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলা হয়। একই তত্ত্বকে জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম, যোগদৃষ্টিতে পরমাত্মা এবং ভক্তিদৃষ্টিতে ভগবান বলে। কাজেই জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি বা ভাব—এই তিনের একের মধ্যে মহাসমন্বয় হইয়াছে। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃশক্তি এবং নিরাকার। পরমাত্মা সগুণ, সশক্তি এবং জ্ঞানাকার। ভগবান সগুণ, সশক্তি এবং সাকার। তিনের মধ্যে এইসব লক্ষণগত ভেদ আছে, কিন্তু তিনটিই একই তত্ত্ব। ভাগবতে যাহা অদ্বয়জ্ঞান নামে উল্লিখিত, তাহার বিববণ বজ্রযান সম্প্রদায়ের 'অদ্বয়বজ্রসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

"যস্য স্বভাবেনোৎপত্তির্বিনাশো নৈব দৃশ্যতে।
তজ্জ্ঞানমদ্বয়ং নাম সর্বসঙ্কল্পবর্জিতম্।।"
("চর্যাচর্যবিনিশ্চয়"-এর সংস্কৃত টীকা থেকে উদ্ধৃত)

ভাগবতে ভক্তির যে স্থান, বৌদ্ধাগমে করুণারও সেই স্থান। প্রজ্ঞার প্রভাবে প্রজ্ঞাপারমিতার একদিকে সকল সাস্রব ধাতুর অতিক্রমণ হয়, অপরদিকে করুণার প্রভাবের জন্য তাঁহার নির্বাণে প্রবেশ হয় না, কিন্তু জগৎকল্যাণের নিমিত্ত অনাস্রব ধাতুতে স্থিতি হয়। ইহাই হইল প্রজ্ঞাপারমিতা ও করুণার সামরস্যের তাৎপর্য।

'প্রজ্ঞয়া ন ভবে স্থানং কৃপয়া ন শমে স্থিতিঃ।'—অর্থাৎ, প্রজ্ঞার জন্য

সংসারে স্থিতি হয় না এবং কৃপার জন্য নির্বাণ হয় না। সত্ত্বার্থক্রিয়াভাবের প্রভাবে বোধিসত্ত্বগণ ভব বা শম (নির্বাণ)—কোথাও অবস্থান করেন না।

পারমিতানয় এবং মন্ত্রনয়ের অবতারণার স্থান ও কাল নির্ণয়—পূর্বে পারমিতানয় এবং মন্ত্রনয়-এব উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধই এই দুই নয়ের প্রবর্তক। উভয় নযেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবুও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মন্ত্রশাস্ত্রেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

মন্ত্রবিজ্ঞান অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের কথা সর্বজন বিদিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্মচক্র প্রবর্তন অধিক প্রসিদ্ধ নয় বলিয়া যে এই দুই ধর্মচক্রের প্রবর্তন প্রমাণ সিদ্ধ নয়, একথা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া মন্ত্রবিজ্ঞানের শক্তি তীব্র ছিল বলিয়া অপব্যবহারের আশঙ্কায় আচার্যগণ মন্ত্রভিত্তিক সাধনা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। ইহার চর্চা গুপ্তভাবেই হইত।

রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধদেব নিজের জিজ্ঞাসু ভক্তদের সমক্ষে পারমিতা-মার্গ প্রকাশিত করেন। এই উপদেশের বিবরণ 'মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা' শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। কথিত আছে, নাগার্জুন এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হয়। কোনও কোনও সংস্করণের কিছু কিছু অংশ ভাষান্তরিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালেই সব দেশে ইহার প্রচার হইয়াছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতা প্রকৃতপক্ষে জগন্মাতা মহাশক্তিরূপা মহামায়া। মহাযান সাহিত্যে শূন্যতা, করুণা, পরার্থসেবা প্রভৃতি বিষয়ে এবং যোগাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাযান ধর্মের বিকাশে শাক্তাগমের পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। মহাশক্তিরূপা প্রজ্ঞা বোধিসত্ত্বগণের জননী তো বটেই, বুদ্ধগণেরও জননী। শিব ও শক্তিতে চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় যেমন অভেদ সম্বন্ধ, বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধও ঠিক সেইপ্রকার। বিশ্বের দুঃখ নিরসন কর্মে বোধিসত্ত্বগণ এই জনয়িত্রীর প্রেরণায় ও সামর্থ্যেই অগ্রসর হন। এই মহাশক্তির অনুগ্রহ ছাড়া সত্ত্বার্থক্রিয়া অর্থাৎ পরার্থ সম্পাদনের কাজ করা যায় না।

পারমিতার লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ, মন্ত্রনয়ের লক্ষ্যও তাই। উভয় নয়ের সাধনার ক্ষেত্রে যোগাচার অর্থাৎ যোগচর্যার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু উভয় নয়ের যোগপ্রক্রিয়ায় পারস্পরিক পার্থক্য আছে। এই দুই যানই বোধিসত্ত্ব-যান। পারমিতা-নযে করুণা, মৈত্রী প্রভৃতির চর্যাই প্রধান। মাধ্যমিক ও যোগাচার—এই দুই সম্প্রদায়েই পারমিতানয়ের সমাদর ছিল। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মত কালের

বিচারে কিছুটা প্রাচীন। যে স্থানকে মন্ত্রনয়ের উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া মানা হয়, সেই স্থানটি মাধ্যমিক মতেরও উদ্ভবক্ষেত্র। এই স্থানটির নাম শ্রীধান্যকটক। ইহা দক্ষিণে অমরাবতীর নিকট অবস্থিত। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, ভগবান বুদ্ধ ধান্যকটকে মন্ত্রনয়ের তৃতীয় ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

নাগার্জুনের কিছু পরে অসঙ্গের কাল। যোগাচার সম্প্রদায়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রবর্তক এই আচার্য অসঙ্গ। ইনি আচার্য বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই যুগের মহাযোগিদের মধ্যে ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার 'মহাযানসূত্রালঙ্কারে' তান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, মৈত্রেযের উপদেশে অসঙ্গের ধার্মিক জীবনে আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল। বর্তমান যুগের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে মৈত্রেয় এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল মৈত্রেয়নাথ। প্রকৃতপক্ষে মহাযানসূত্রালঙ্কারের মূল কারিকা ইঁহারই রচিত। অসঙ্গের ছোট ভাই বসুবন্ধু প্রথমে বৈভাষিক ছিলেন। পরে অসঙ্গের প্রভাবে পূর্ণমাত্রায় যোগাচারী হইয়া উঠেন।

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাব অসঙ্গের পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থের পরিচয় প্রায় সকলেরই আছে। ইহা ছাড়া, সে সময়ে অষ্টাদশ পটলাত্মক 'গুহ্য সমাজ' নামক গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ছিল। পরবর্তী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার বিকাশে গুহ্য সমাজের প্রভাব অতুলনীয়। নাগার্জুন, কৃষ্ণাচার্য, লীলাবজ্র, শান্তিদেব প্রমুখ বিশিষ্ট আচার্যগণ ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পরবর্তী কালের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমার কলশ, জ্ঞানকীর্তি, আনন্দগর্ভ. চন্দ্রকীর্তি মন্ত্রকলশ, জ্ঞানগর্ভ, দীপঙ্কর ভদ্র প্রভৃতি সিদ্ধ এবং বিদ্বান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধমতে পারমিতানয়ের ন্যায় মন্ত্রনয়েরও প্রবর্তক বুদ্ধই ছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মন্ত্র-সাধনা প্রাচীন বাক্‌যোগেরই একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া মাত্র। ক্রমশঃ মন্ত্রমার্গে কিছু কিছু মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ সবগুলিই যে মন্ত্রমার্গের প্রকার ভেদ, সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই।

পারমিতানয়ের প্রায় সমস্ত সাহিত্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত। কিন্তু মন্ত্রনয়ের মূল কোনটা সংস্কৃতে, কোনটা প্রাকৃতে, কোনটা বা অপভ্রংশে রচিত। শাবর আদি ম্লেচ্ছ ভাষাতেও মন্ত্র রহস্যের ব্যাখ্যা করা হয়—একথা 'লঘুতন্ত্ররাজটীকা বিমলপ্রভা'য় বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সবই বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের ভিত্তি। পারমিতানয়কেও তান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যেই ধরা হয়।

পারমিতানয়ের সাধনার নীতি ও চর্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল শুদ্ধির উপর, কিন্তু মন্ত্রনয়ের সাধনা আধ্যাত্মিক যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। পারমিতানয়ের বিশ্লেষণ সৌত্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রনয়ের ব্যাখ্যা যোগাচার এবং মাধ্যমিক মতেই করা সম্ভব।

বজ্রযান ও কালচক্রযানের যোগসাধনায় মন্ত্রের প্রাধান্যকেই স্বীকার করা হয়। কিন্তু সহজযানে মন্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয় না। প্রসিদ্ধি আছে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী দীপঙ্কর বুদ্ধ বজ্রযান-মার্গের আদি উপদেষ্টা। কিন্তু বজ্রমার্গ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায। পরবর্তীকালে বজ্রযোগরূপে এই যান প্রকটিত হয। রাজা সুচন্দ্র ইহার প্রবর্তক ছিলেন। সীতা নদীর তীরে সম্ভল নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। 'কবলতন্ত্রে' ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা সুচন্দ্র বজ্রপানী বুদ্ধের নির্মাণকায় ছিলেন। সুচন্দ্র ঊর্ধ্বলোকে গিয়া সম্বুদ্ধ গৌতমকে অভিষেক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া গৌতম শ্রীধান্যকটকে এক সভা আহ্বান করেন। ইহার পূর্বে গৃধ্রকূটে আহুত সভায মন্ত্রমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দেওযা হইয়াছিল।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগ-সাধনা—মন্ত্রযানের লক্ষ্য বজ্রযোগ-সিদ্ধি। পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য বজ্রযোগই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাধকের আধার বা ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে এই যোগ-সাধনা করা যায় না। বজ্রযোগের চারিটি স্তর। এক-একটি স্তরে পূর্ণ যোগের এক-একটি রূপের আবরণ উন্মোচিত হয়। চারিটি স্তবের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে বজ্রযোগ পূর্ণতা লাভ করে।

প্রত্যেক যোগে এক-একটি শক্তির বিকাশ হয়, অর্থাৎ এক-একটি বজ্রযোগে এক-এক ধরণের শক্তি পূর্ণ হয়। শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে বজ্রভাবের উদয় হয়। স্থূল দৃষ্টিতে আপন সত্তাকে চারভাগে ভাগ করা হয়—কায়, বাক্, চিত্ত এবং জ্ঞান। প্রথম বজ্রযোগে 'কায়বজ্র-ভাবে'র উদয় হয়। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অবস্থার উদয় হইয়া থাকে।

কায়বজ্র যোগের নাম সংস্থান-যোগ। এই যোগের প্রভাবে জাগ্রত অবস্থার ক্ষয় হয় এবং অনন্ত নির্মাণকায়ের স্ফুরণ ঘটে। তখন উপেক্ষারূপ কায়বজ্রের প্রাপ্তি ঘটে। নির্মাণকায় বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই সংস্থান-যোগ। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ইহাকে 'কমলনয়' বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন।

বাক্‌বজ্র যোগের নাম মন্ত্রযোগ। এই যোগের প্রভাবে স্বপ্নেব ক্ষয় হয় এবং ভিতরে অনাহত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ মন্ত্র, অথবা 'সর্বভূতরুত'। ইহার নামান্তর মুদিতা। সর্বভূতরুত কথাটির তাৎপর্য হইল

মন্ত্র দ্বারা সর্বসত্ত্বের মোদন অর্থাৎ সর্বসত্তায় আনন্দের সঞ্চার করা। ইহাই মুদিতার তাৎপর্য। মনের ত্রাণ হওয়ার মধ্যেই মন্ত্রের উপযোগিতা, ইহাকেই বাগ্‌বজ্র বা সম্ভোগকায় বলে। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্য অর্থাৎ সমরসে অভিষিক্ত হওয়াকেই বলে মন্ত্রযোগ। ইহা সূর্যস্বরূপ।

চিত্তবজ্র যোগের নাম ধর্মযোগ। চিত্তবজ্রই জ্ঞানকায় নামে প্রসিদ্ধ। এই যোগের প্রভাবে জ্ঞানের উদয়ে বিকল্প-চিত্ত থাকে না। তখন মৈত্রীরূপ চিত্তের উদয় হয়, যাহা নিত্য-অনিত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে সদা বিমুক্ত। ইহা প্রাপ্ত হইলে সুষুপ্তি দশা ক্ষয় হয়। এইপ্রকার চিত্ত বজ্রধর্মকায় নামে প্রসিদ্ধ। বজ্রচিত্তে জ্ঞানকায় ও ধর্মকায়—এই দুই কায়ের স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ জগতের কল্যাণসাধক নির্বিকল্পকচিত্ত ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। এই যোগও প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সমরসে অভিষিক্ত।

জ্ঞানবজ্র যোগের নাম বিশুদ্ধ যোগ। এই যোগের প্রভাবে শূন্যতা-দর্শন হয়। শূন্যতা বলিতে স্বভাব-শূন্যতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শূন্যতা সিদ্ধ হইলে অতীত ও অনাগত থাকে না। শূন্যতা-দর্শনকে যোগিগণ গম্ভীর ও উদার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতীত ও অনাগত নাই বলিয়া উহা গম্ভীর এবং অতীত ও অনাগত না থাকিলেও উহাদের দর্শন হয় বলিয়া উহা উদার। শূন্যতা-দর্শন লাভ করিলে তুরীয় অবস্থার ক্ষয় হয় এবং অক্ষয় মহাসুখের উদয় হয়। করুণার লক্ষণ জ্ঞানবজ্র। ইহারই নামান্তর সহজকায়, যাহা প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সাম্যাবস্থা। ইহাই বিশুদ্ধ যোগ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে চারিটি যোগের দ্বারা চারিটি অবস্থা অতিক্রম করা আবশ্যক। বজ্রযোগেব ফল পূর্ণ নির্মলতা লাভ করা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারিটি অবস্থাতেই কোন না কোন প্রকার মল থাকিয়াই যায়। যতক্ষণ ঐ সকল মল শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে না। তুরীয়ের মল হইল রাগ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বয়, সুষুপ্তির মল তম, স্বপ্নের মল শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চক এবং সৎ-অসৎ ও অন্যান্য বিকল্প। জাগ্রতের মল হইল সংজ্ঞা বা দেহবোধ।

তান্ত্রিক যোগিদের মতে বৈদিক তুরীয যোগ দ্বারা মলের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রভাবে মল থাকিতে পারে না। এই মতে সকল বস্তুই শূন্য অর্থাৎ নিঃস্বভাব। অতীত নাই, অনাগতও নাই। ইহা জানিয়া ধ্যান করিলে মনোভাব শূন্যাত্মক হয়। এই তত্ত্ব সুগভীর এবং দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এই আধারের উপর যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার প্রভাবে মোহনাশক নির্বিকার আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। বিশ্ব-করুণার সঙ্গে যুক্ত জ্ঞান শুদ্ধ হয়। ইহার নাম সহজকায়, আবার বিশুদ্ধ-কায়ও ইহারই নামান্তর।

গুহ্য সমাজ, বিমলপ্রভাদি গ্রন্থের বিবরণের ভিত্তিতে উপরে চারিটি বজ্রযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। চৈতন্যকে আবরণ হইতে মুক্ত করাই যোগের উদ্দেশ্য। এক একটি বজ্রযোগের অনুষ্ঠানের প্রভাবে চৈতন্য হইতে এক একটি আবরণ অপসারিত হয়, ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বদর্শনের এক একটি দ্বার খুলিয়া যায়। ইহারই পারিভাষিক নাম 'অভিসম্বোধি'। চারিটি যোগের দ্বারা চারি প্রকার অভিসম্বোধির উদয় হয়। তখন পূর্ণতাপ্রাপ্তির অন্তরায় দূর হইয়া যায়।

এই সম্বোধির আলোচনা দুই ভাবে করা যায়, যথা—(১) উৎপত্তি-ক্রম এবং (২) উৎপন্ন-ক্রম। সম্যক্‌প্রকারে বিশ্বদর্শন কবিতে হইলে সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রম অর্থাৎ অবরোহ-ক্রম এবং আরোহ-ক্রম উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। কিন্তু উভয়ে যেমন তত্ত্বদৃষ্টিতে ও কার্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হয়, সেইপ্রকার উৎপত্তিক্রম ও উৎপন্নক্রমেও ভেদ আছে।

উৎপত্তি ক্রম—উৎপত্তি-ক্রমে চারিটি সম্বোধিক্রম বুঝিবার উপায় এইরূপঃ সর্বপ্রথম হইল একক্ষণ অভিসম্বোধি। এই সম্বোধি স্বাভাবিক বা সহজকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। জন্মোন্মুখ আলযবিজ্ঞান যে ক্ষণে মাতৃগর্ভে মাতা ও পিতার সমরসীভূত বিন্দুদ্বয়ের সঙ্গে একত্ব লাভ করে, সে এক মহাক্ষণ। এই ক্ষণে যে সুখ-সংবৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম একক্ষণ-সম্বোধি। ঐ সময় গর্ভস্থ কায়া রোহিত মৎস্যের ন্যায় একাকার থাকে। উহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ থাকে না।

ইহার পর পঞ্চাকার সম্বোধির উদয হয়। প্রথম কায়া সহজকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু এই কায়া ধর্মকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। মাতৃগর্ভে যখন রূপাদি বাসনাত্মক পঞ্চ সংবৃত্তির উদয় হয় তখন ঐ আকার কূর্মবৎ পঞ্চ স্ফোটকবিশিষ্ট হইযা উঠে। এই অবস্থা পঞ্চাকার মহাসম্বোধির অবস্থা।

ইহার পর উক্ত পঞ্চজ্ঞানেব প্রত্যেকটি জ্ঞান পঞ্চ ধাতু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ আয়তনের বাসনাভেদবশতঃ বিশ প্রকার রূপ ধারণ করে। কায়াটিও বিশ অঙ্গুলিতে পরিপূর্ণ হয়। ইহাকে বিংশতি আকার সম্বোধি বলে। ইহার সম্বন্ধ সম্ভোগকায়ের সঙ্গে। এই পর্যন্ত বিকাশ মাতৃগর্ভে ঘটিয়া থাকে।

ইহার পর মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমন হয়। তখন মায়াজালের ন্যায় অনন্ত ভাবেব সংবেদন হয়। পঞ্চ জ্ঞানের বিংশতি ভেদের স্থানে অনন্ত প্রকার ভেদেব স্ফূরণ হয। ইহার নাম মাযাজাল অভিসম্বোধি। এই অভিসম্বোধি নির্মাণকায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

মায়াজালের জ্ঞান উদিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উৎপত্তিক্রম সমাপ্ত হইযাছে। পরমশুদ্ধ সত্তা হইতে মায়ারাজ্যে অবতরণের ইতিহাস ইহাই। কামকলা তত্ত্বের বহস্যও ইহাই। শুক্লবিন্দু ও বক্তবিন্দু নামক দুইটি কারণবিন্দু কার্যবিন্দুরূপে

পরিণত হয়। পূর্ব-বর্ণিত সৃষ্টি এই কার্যবিন্দুরই ক্রমবিকাশমাত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে শুধু আনন্দমাত্রই থাকে। ইহারই নাম কেবল সুখসংবৃত্তি। উপনিষদেও 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'র দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে। মহাক্ষণের স্থিতিই আসলে ইহার মর্ম্মার্থ। সৃষ্টিতে মায়াজালের অনন্ত নাগপাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহার ফলে এই আনন্দ তিরোহিত হয় এবং নানাপ্রকার দুঃখের আবির্ভাব হয়। প্রত্যাবর্তনকালে মায়াকে ছিন্ন করিয়া আর এক মহাক্ষণে ফিরিতে হয়, অর্থাৎ নির্মাণকায় হইতে সহজকায় পর্যন্ত আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনের ধারাতে একক্ষণ সম্বোধির অন্তিম বিকাশ হয় বলিয়া মনে করা হয়। বস্তুতঃ এইক্ষণেই বিশ্বাতীত মহাশক্তি অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। যোগী গর্ভাধান ক্ষণটিকেই উৎপত্তির ক্ষণ বলিয়া মানেন। কিন্তু অযোগীর দৃষ্টিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ ক্ষণ বা নাড়ীচ্ছেদ ক্ষণই উৎপত্তি ক্ষণ। এই ক্ষণেই মায়া অর্থাৎ বৈষ্ণবী মায়াব স্পর্শ ঘটে।

ইহার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। দেহ রচনাব মূলে ক্ষরবিন্দু বা আলয় বিজ্ঞান। ইহা অশুদ্ধ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই জন্ম নেয়। দুইটি কার্যবিন্দু একত্র হইয়া দেহ রচনা করে।

উৎপন্ন ক্রম—উৎপন্ন ক্রম বস্তুতঃ আরোহক্রম। এক দিক থেকে দেখিলে ইহাকে সংহার ক্রমও বলা চলে। অন্যদৃষ্টিতে ইহাকে সৃষ্টিক্রমও বলা চলে। যেমন মায়া হইতে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা একটি ধারা, ঠিক তেমনি ব্রহ্মাবস্থাতেও একটি বিকাশের ব্যাপার রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে পরমাত্মা ও ভগবান পর্যন্ত ভাবের ব্যঞ্জনা ঘটে। বৌদ্ধ চিন্তার রহস্য কতকটা এই দৃষ্টিতে দেখিলে উন্মোচিত হইতে পারে। মায়ার প্রভাবে প্রতিদিন একুশ হাজার ছয়শো শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে। প্রত্যাবর্তনের অবস্থাতেও ঠিক ঐ রকম একক্ষণ অভিসম্বোধির অবস্থা হয়। এই অবস্থাতে প্রাণ বায়ু শান্ত হয়। তখন চিত্ত মহাপ্রাণে স্থির হইয়া যায় এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না। এই অবস্থায় দিব্য ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়। স্থূল দেহাভিমান থাকে না এবং দিব্য দেহের আবির্ভাব হয়। এই সময় একই ক্ষণে বিশ্ব দর্শন হইয়া যায়—"দদর্শ নিখিলং লোকং আদর্শ ইব নির্মলে।" এই জ্ঞানের নাম বজ্রযোগ এবং এই অবস্থা স্বভাবকায়ের অবস্থা।

মুদ্রাতত্ত্ব—তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ যাহাকে মুদ্রা বলেন, তাহা শক্তিরই অভিব্যক্তি বা বাহ্য রূপ। মুদ্রা চারি প্রকার; যথা—কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা এবং সময়মুদ্রা। গুরুকরণের পর শিষ্যকে সাধনার জন্য প্রজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। প্রজ্ঞাই মুদ্রা বা নায়িকা। ইহা একপ্রকার বিবাহের ব্যাপাব। মুদ্রাগ্রহণের পর

হয় অভিষেক ক্রিয়া। তাহার পর সাধক ও মুদ্রা—দুই-ই মণ্ডলে প্রবেশ করে এবং যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। এই সময় আন্তর ও বাহ্য বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য মন্ত্র-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার পর বোধিচিত্তের উৎপাদন আবশ্যক হয়। প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সংযোগে অর্থাৎ সাধক ও মুদ্রার সম্বন্ধ হইতে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষায় শরীরের সারাংশ বিন্দুই বোধিচিত্ত নামে অভিহিত হয়। এই উৎপন্ন বোধিচিত্তকে নির্মাণচক্রে, অর্থাৎ নাভিপ্রদেশে ধারণ করিতে হয়—এই ক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ স্খলন হইলে যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। নাভিতে এই বিন্দুকে ধারণ করিয়া স্থির করিতে না পারিলে সৎ-অসদাত্মক দ্বন্দ্বের বন্ধন অনিবার্য। মনেব চঞ্চলতা এবং প্রাণের চাঞ্চল্য বিন্দুর চঞ্চলতার অধীন। চঞ্চল বিন্দুই সংবৃতি বোধিচিত্ত। বিন্দু স্থির হইলে উহার ঊর্ধ্বগতি সম্ভব হয়। এই ঊর্ধ্বগতির ফলে বিন্দু যখন উষ্ণীষ-কমলে বা সহস্রদল কমলে স্থিত মহাবিন্দুস্থানে যাইতে পারে, তখন মুক্তি বা নিত্য আনন্দের আবির্ভাব হয়। বিন্দুর স্থিরতাই ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের ফল। বিন্দু স্থির হইলে যোগক্রিয়ার দ্বারা সেই স্থির বিন্দুতে ক্ষোভের স্পন্দন জাগানো হয়। বৈদিক সাধনায় ব্রহ্মচর্য সিদ্ধির পর বিবাহোত্তর গৃহস্থ আশ্রমে—"সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রীয় বাক্যের ইহাই অভিপ্রায়। ইহার পব বিন্দুর ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি হয় যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যখন এই ঊর্ধ্বগতিরও নিবৃত্তি হয তখনই মহাসুখের অভিব্যক্তি হয়।

কর্মমুদ্রা প্রারম্ভিক। কর্ম বলিতে কায়, বাক্ ও চিত্তের চিন্তাদিরূপ ক্রিয়া বুঝায়। এই মুদ্রা করাযত্ত হইলে ক্ষণভেদে চারিপ্রকার আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। এই চারিপ্রকার আনন্দের নাম যথাক্রমে (১) আনন্দ, (২) পরমানন্দ, (৩) বিরমানন্দ এবং (৪) সহজানন্দ। আনন্দ, পরমানন্দ ও বিরমানন্দের সাম্যাবস্থাই হইল ষোড়শ কলা। ইহারই নাম সহজানন্দ। পূর্বে ক্ষণভেদের উল্লেখ করা হইযাছে। চারিটি ক্ষণের নাম হইল—বিচিত্র, বিপাক, বিলক্ষণ এবং বিমর্দ।

ধর্মমুদ্রা ধর্মধাতুর স্বরূপ। এই মুদ্রা নিষ্প্রপঞ্চ, নির্বিকল্প, অকৃত্রিম, অনাদি এবং করুণা স্বভাবসম্পন্ন। ধর্মমুদ্রার স্থিতিতে অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তির পূর্ণ নিবৃত্তি হয। সাধারণ যোগসাহিত্যে দেহস্থিত বাম নাড়ী এবং দক্ষিণ নাড়ীকে আবর্তময বলিয়া ধরা হয় বলিয়া সরল মধ্য নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না বা ব্রহ্ম নাড়ীকে যোগ বা জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে মানা হয়। আগমিক বৌদ্ধসাহিত্যে পার্শ্ববর্তী বাম ও দক্ষিণ নাড়ীদ্বয়কে প্রজ্ঞা ও উপায়রূপী 'ললনা' ও 'রসনা' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের পরিভাষাতে মধ্য নাড়ীর নাম 'অবধূতী'। ধর্মমুদ্রা অবধূতীর নামান্তর। 'মধ্যমা প্রতিপদ'ও ইহাই। শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরন্তর

ইহাকে অভ্যাস করিলে নিরোধের সাক্ষাৎকার হয়। এই মধ্যমার্গে জ্ঞানের অন্তবর্তী গ্রাহ্য এবং গ্রাহকরূপ বিকল্পের অবসান ঘটে।

তৃতীয় মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। এই মুদ্রা নিঃস্বভাব এবং যাবতীয় আবরণ হইতে নির্মুক্ত এবং মধ্যাহ্ন গগনের ন্যায় নির্মল ও অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইহাকে একপ্রকার নির্বাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা পূর্ণ নিরালম্ব অবস্থা। কোন কোন যোগী ইহাকে 'অস্মৃত্য মানসীকার' অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত মানসের স্থিতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সময়মুদ্রা বা চতুর্থ মুদ্রা ইহার ফল। এই 'সময়ে'র স্বরূপ অচিন্ত্য। এই অবস্থায় জগতের কল্যাণের জন্য স্বচ্ছ এবং বিশিষ্ট সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় স্বভাব হইয়া বজ্রধররূপের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বকল্যাণকারী রূপকেই তিব্বতী বৌদ্ধেরা 'হেরুক' নামে অভিহিত করেন।

বোধিচিত্তের উৎপত্তি ও বিকাশের স্তর—পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়ের সাধনার পূর্বে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক। সহানুভূতির প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্বাভাবিক করুণা অথবা দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে সাধারণতঃ তিন 'কালে' বিভক্ত করা হয়। এই তিনটি কালকে ক্রমশঃ হেতুকাল, ফলকাল ও সত্ত্বার্থক্রিয়ার কালরূপে বর্ণনা করা হয়। প্রথম কাল হইল সাধকের। যে-জন অধ্যাত্মপথে আরূঢ় হইয়াছে ও যে-জন ক্রমিক সিদ্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার নাম সাধক। সাধক অবস্থা বোধির ক্রমবিকাশের অবস্থা। দ্বিতীয় কাল হইল সিদ্ধের। এই কালে সাধক সম্যক্ ক্লেশনিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বোধি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া অন্তে সিদ্ধাবস্থাতে সম্যক্ সম্বোধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় কাল হইল সিদ্ধগুরুর। এই কালে পূর্বোক্ত সিদ্ধপুরুষ সম্পূর্ণ প্রাণীজগতে সেবা বিষয়ে উদ্যম করিয়া থাকেন।

ষড়ঙ্গ যোগ—এইবার বৌদ্ধ যোগিগণের ষড়ঙ্গ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। গুহ্যসমাজতন্ত্র, মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, কালচক্রোত্তর তন্ত্র, মর্মকলিকা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে নারোপাকৃত সেকোদ্দেশ টীকাতে ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহা বৌদ্ধ যোগ নামে পরিচিত, কিন্তু মনে হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষে এবং সম্ভবতঃ নাথ সম্প্রদায়েও ইহার প্রচলন ছিল। ছয়টি যোগাঙ্গের নাম ক্রমশঃ এইপ্রকার—প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি।

যোগীর চরম লক্ষ্য নিরাবরণ প্রকাশের উপলব্ধি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যগণ ইহাকেই সম্যক্ সম্বোধি, মহাবোধি অথবা বুদ্ধত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাই উত্তম সিদ্ধি। সিদ্ধি দুই প্রকারের—(১) সামান্য বা সাধারণ এবং (২) উত্তম। যৌগিক বিভূতি সামান্য সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। সম্যকসম্বোধি বা বুদ্ধত্ব উত্তম সিদ্ধি। সমাজোত্তর তন্ত্র মতে ষড়ঙ্গ যোগের সাহায্যেই বুদ্ধত্ব বা সম্যকসম্বোধি লাভ করা সম্ভব। আবরণের লেশমাত্র থাকিতে সম্যক সম্বোধির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ণরূপে আবরণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব আবশ্যক এবং উহাতে যোগীর প্রবেশলাভও আবশ্যক। কিন্তু অতি উচ্চ কোটির যোগীর পক্ষেও প্রভামণ্ডলে প্রবেশ অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ যতক্ষণ দীর্ঘকালের সাধনার প্রভাবে বজ্রসত্ত্ব অবস্থার বিকাশ না হয়, ততদিন ইহা কল্পনার অতীত। কিন্তু বজ্রসত্ত্ব অবস্থা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে পাঁচটি অভিজ্ঞান লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভও দুরাশা মাত্র। আচার্যগণ বলেন, মন্ত্রসিদ্ধির উপায় প্রত্যাহার। ইহাই ষডঙ্গ যোগের প্রথম যোগাঙ্গ।'

প্রত্যাহার তত্ত্বটি বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক। দশটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় অর্থাৎ বৃত্তিলাভ করে। ইহার নাম আহরণ। এই সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইয়া যখন আপন স্বরূপমাত্রের অনুবর্তন করে তখন ইহার নাম হয় প্রত্যাহরণ বা প্রত্যাহার। প্রত্যাহরণ কালে বিষয় গ্রহণ হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ভাবাপন্ন হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে পারিলে শুদ্ধ আকাশে ধূম, মরীচি, খাদ্যোত, দীপকলিকা, চন্দ্র, সূর্য অথবা বিন্দুর দর্শন হয়। এইগুলিকে নিমিত্ত বলে। এইপ্রকার দশটি নিমিত্ত আছে। চিত্ত অবধূতি মার্গে প্রবিষ্ট না হইলে ধূমাদি নিমিত্তের প্রতিভাস হয় না। এই সকল নিমিত্তের দর্শন স্থায়ী হইয়া গেলে মন্ত্র সাধকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হয়।

মহা উষ্ণীষ চক্রের সাধনাকে বৌদ্ধতন্ত্র-সাহিত্যে সেবাসাধন বলা হয়। ইহা অশেষ ত্রৈধাতুক বুদ্ধবিম্বের স্বরূপ। আকাশে এই ত্রৈধাতুক বিম্বদর্শন প্রত্যাহারের অঙ্গ। যখন আকাশে যোগীর বিম্বদর্শন সিদ্ধ হয় তখন যোগী সকল মন্ত্রেরই অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। বিম্বদর্শন সিদ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যাহারের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যাহারের পর দ্বিতীয় যোগাঙ্গ ধ্যান শুরু হয়। ধ্যানে পরিপক্বতা লাভ হইলে পাঁচটি অভিজ্ঞা আয়ত্ত হয়। বৌদ্ধগণ বলেন, স্থির ও চর (স্থিতিশীল ও চলমান) যাবতীয় ভাবই পঞ্চ কামরূপ। সকল প্রকার ভাবের মধ্যে পঞ্চবুদ্ধের ভাবনার দ্বারা কল্পনা করিতে হইবে যে সবই বুদ্ধ। বৌদ্ধতন্ত্রমতে ইহাই ধ্যানের স্বরূপ। ধ্যানের প্রভাবে বাহ্যভাব কাটিয়া যায়, চিত্ত দৃঢ় হয় ও বিম্বের সঙ্গে চিত্তের তাদাত্ম্য হইলে দিব্যচক্ষুর উদয় হয়। দিব্য শ্রোত্র প্রভৃতিরও উদয় হয়।

ইহার পর অর্থাৎ অভিজ্ঞান-পঞ্চকের আবির্ভাবের পর যোগের তৃতীয় অঙ্গ প্রাণায়ামের আবশ্যক। এই সময় মনুষ্যের বাম ও দক্ষিণ নাড়ীতে প্রবহনশীল দুইটি শ্বাসপ্রবাহকে নিরুদ্ধ ও একীভূত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিবার অভ্যাস করিতে হয়। মানুষের শ্বাস পঞ্চজ্ঞানময় এবং পঞ্চভূতস্বভাবসম্পন্ন। ইহাকে পিণ্ডরূপে নিশ্চল করিয়া নাসিকার অগ্রদেশে কল্পনা করিতে হয়। এই অবস্থা মহারত্ন নামে প্রসিদ্ধ। অক্ষোভ্য প্রভৃতি পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চজ্ঞানস্বভাব। বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্কন্ধ ইহার স্বরূপ। বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবাহিত শ্বাস একীভূত হইবার পর পিণ্ডাকার হইয়া যায়। এই পিণ্ডকেই নাসাগ্রে স্থির করিতে হয়। নাসাগ্র ও উষ্ণীষ-কমলের বিন্দু সমসূত্র। বজ্রযানী যোগী এই প্রাণায়ামকেই বজ্রজাক বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে দুইটি বিরুদ্ধ শ্বাসধারা সম্মিলিত হইয়া মধ্যনাড়ী পথে উত্থিত হইয়া নাসাগ্রস্থলে স্থিতিলাভ করে। সাধারণ মানুষের প্রাণবায়ু অশুদ্ধ প্রবৃত্তিসমূহের বাহন। সংসারের কারণ ইহাই।

প্রাণায়াম সিদ্ধির ফলে বোধিসত্ত্বভাবের উদয় হয়। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে যোগের চতুর্থ অঙ্গ ধারণা-অভ্যাসে অধিকার জন্মে। যোগদৃষ্টিতে নিজের ইষ্টমন্ত্রই প্রাণ। ইহাকে হৃদয়ে কর্ণিকার মধ্যে ধ্যান করিতে হয়। প্রাণই মন্ত্র, কারণ ইহা মনকে ত্রাণ করে। ইহার পর প্রাণকে ঊর্ধ্বে উত্থাপন করিয়া ললাটে বিন্দুর স্থানে নিরুদ্ধ করিতে হয়। এই সময়ে প্রাণের সঞ্চরণ, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না। প্রাণ একস্থ হইয়া ললাটস্থিত বিন্দুতে প্রবেশ করিয়া স্থির হইলে উহাকে ধারণা বলে। ধারণার ফল বজ্রসত্ত্বে সমাবেশ। এই পর্যন্ত যোগাভ্যাস সম্পন্ন হইলে প্রাণবায়ু স্থিরতা লাভ করে। তখন এই স্থির বায়ু নাভিচক্র হইতে চাণ্ডালী নাম্নী কুণ্ডলিনীশক্তিকে উত্থিত করে। ঐ উত্থিত শক্তি বজ্রমার্গ হইতে মধ্যধারা অবলম্বন করিয়া উষ্ণীষ-কমলের কর্ণিকাতে উপনীত হয়। ধারণাতে সিদ্ধিলাভ হইলে চাণ্ডালী-শক্তি উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং বোধিসত্ত্ব বজ্রসত্ত্ব অবস্থাতে উপনীত হয়। তখন গ্রাহক চিত্ত বা বজ্রসত্ত্ব শূন্যতাবিম্বরূপ গ্রাহ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায়। তখন পঞ্চম যোগাঙ্গের আবির্ভাবের অবসর ঘটে।

যোগের পঞ্চম অঙ্গ—অনুস্মৃতি। প্রত্যাহার এবং ধ্যানের সাহায্যে প্রতিভাসশীল সংবৃতি-সত্যের ভাবনাকে নিশ্চল করা হয়। অনুস্মৃতির উদ্দেশ্য সংবৃতি-সত্যের ভাবনার স্ফুরণ ঘটানো। ইহার প্রভাবে সংবৃতি-সত্যের আকার সমগ্র আকাশব্যাপীরূপে দৃষ্ট হইতে শুরু করে। ইহাতে ত্রিকালস্থ সমগ্র ভুবনের দর্শন হয়। ইহাকেই অনুস্মৃতি বলে। অনুস্মৃতির ফলে বিমল প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব হয় ও তাহাতে যোগীর প্রবেশ ঘটে। ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্যক্ প্রকারে বিকল্পশূন্য হয় এবং যোগীর লোমকূপ হইতে পঞ্চরশ্মির নির্গম হয়। ইহাকে মহারশ্মি বলে। তখন গ্রাহ্য ও গ্রাহক চিত্ত এক হইয়া অক্ষর সুখের আবির্ভাব হয়। তখন নিখিল আবরণের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

ইহাই যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ বা সমাধি। বুদ্ধত্ব ইহারই নামান্তর। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সমাপত্তির দ্বারা প্রথমে সকল ভাবের সমাহার হয়। তখন পিণ্ডযোগে ভাবনাবিশেষের ফলে অকস্মাৎ পরম মহাজ্ঞানের উদয় হয়। তখন সংবৃতি সত্ত্ব ও পরমার্থ সত্ত্বের দ্বিধা ভাব কাটিয়া যায় এবং অদ্বয়রূপে উহাদের প্রকাশ হয়। যুগনদ্ধ বিজ্ঞানের ইহাই রহস্য। ইহাই বুদ্ধ বা আত্মার পরমস্বরূপ।

অভিষেক তত্ত্ব—অভিষেক সম্বন্ধে কিছু না বলিলে যোগ সাধনার বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই এখানে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। তান্ত্রিক সাধনার গুপ্ত উপদেশ ইহাই যে যেমন দীক্ষা ভিন্ন সত্যজ্ঞানের উদয় হয় না তেমনই অভিষেক ব্যতীত ঐ জ্ঞান অন্যত্র সঞ্চার করা যায় না। এইজন্য যাহার যথার্থ পূর্ণ অভিষেক না হয় তাহার পক্ষে গুরুপদে আসীন হইবার যোগ্যতা আসে না। ধর্মচক্র-প্রবর্তনই গুরুকৃত্য।

বজ্রযান মতে অভিষেক সাত প্রকার। যথা—উদকাভিষেক, মুকুটাভিষেক, পট্টাভিষেক, বজ্রকণ্ঠাভিষেক, নাসাভিষেক, অনুজ্ঞাভিষেক ও প্রজ্ঞাভিষেক। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অভিষেক দেহশুদ্ধির জন্য আবশ্যক হয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি বাক্‌শুদ্ধির জন্য এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। সপ্তমটির উদ্দেশ্য জ্ঞানশুদ্ধি। দেহ পঞ্চধাতুময়, উষ্ণীষ হইতে কটিসন্ধি পর্যন্ত পঞ্চম স্থানে যথাবিধি সমন্ত্রক অভিষেক দ্বারা পঞ্চধাতুর শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে কায়াশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ইহারই নাম উদকাভিষেক। মুকুটাভিষেক দ্বারা পঞ্চস্কন্ধের বা পঞ্চতথাগতের শুদ্ধি হয়। এই প্রকারে ধাতু এবং স্কন্ধ নির্মল হওয়ার ফলে দেহশুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অভিষেক দ্বারা দশটি পারমিতার পূর্ণতা হয়। ইহার দ্বারা চন্দ্র সূর্য শুদ্ধ হয়। পঞ্চম অভিষেক দ্বারা রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শোধন হয়। ইহার প্রভাবে প্রাকৃত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ হয় বলিয়া মহামুদ্রা-সাধনে সাহায্য পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অভিষেক দ্বারা রাগদ্বেষের শোধন হয় ও মৈত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মবিহারের পূর্তি ঘটে। ষষ্ঠ অভিষেকের পরবর্তী অবস্থা বজ্রশব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়। সপ্তম অভিষেক ধর্মচক্রপ্রবর্তনের জন্য অথবা বুদ্ধত্বলাভের জন্য। এই সাত প্রকার অভিষেক দ্বারা শিষ্যের কায়াদি চারিটি বজ্র শুদ্ধ হইলে হাতে ধারণ করিবার জন্য বজ্রঘণ্টার উপযোগ আবশ্যক হয়।

সংবৃতি ও পরমার্থ ভেদে অভিষেক দুই প্রকার। লোকসংবৃতি ও যোগী-সংবৃতি ভেদে সংবৃতি আবার দুইপ্রকার। প্রথমটি 'পূর্বসেক' ও দ্বিতীয়টি 'উত্তরসেক'। পূর্বে যে উদকাদি সাতটি অভিষেকের কথা বলা হইল এইগুলি সবই লৌকিক সিদ্ধির সোপান। এইগুলি পূর্বসেক নামে তান্ত্রিক শাস্ত্রে পরিচিত, উত্তরসেক নহে। যোগীসংবৃতিরূপ অভিষেক তিন প্রকার—প্রথমটি কুম্ভাভিষেক বা

কলসাভিষেক, দ্বিতীয়টি গুহ্যাভিষেক ও তৃতীয়টি প্রজ্ঞাভিষেক। এই উত্তরসেক লোকোত্তর সিদ্ধির নিদান। এইগুলি সংবৃতি হইলেও পরমার্থের অনুকূল। পরমার্থসেকই 'অনুত্তরসেক' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বসেকের জন্য মুদ্রা আবশ্যক নহে, কিন্তু উত্তরসেক মুদ্রা ভিন্ন হয় না। অনুত্তবসেক সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। অনুত্তরসেক অত্যন্ত দুর্লভ।

পূর্ববর্ণিত উত্তরসেক ক্ষর, অক্ষর ও স্পন্দ ভেদে তিন প্রকার। অনুত্তর অথবা পারমার্থিকসেক নিস্পন্দ। কুম্ভসেকে চতুর্দশ উষ্ণীষ-কমল হইতে বিন্দু অবতীর্ণ হইয়া ললাটস্থ সহস্রদলের কর্ণিকাতে আগমন করে। ইহার প্রভাবে কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞানে 'আনন্দ' লাভ হয়। গুহ্যসেকে বিন্দু কণ্ঠস্থ দ্বাত্রিংশদল কমল হইতে হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমলের কর্ণিকাতে আগমন করে। ইহার ফলে চারিটি কায়ে 'পরমানন্দ' লাভ হয়। ইহা আনন্দ হইতে অধিকতর তীব্র। প্রজ্ঞাসেকে বিন্দু নাভিস্থ চতুঃষষ্টিদল কমল হইতে দ্বাত্রিংশদল গুহ্যকমলে অবতীর্ণ হয়। এমন কি বজ্রমণির রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ইহার ফলে 'বিরমানন্দ' লাভ হয়। ইহা পরমানন্দ হইতেও উৎকৃষ্ট তৃতীয়ানন্দ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে উত্তরসেক ব্যতীত উষ্ণীষ-কমলে স্থিরীকৃত বিন্দু নীচে নামিয়ে আসিতে পাবে না। প্রথমসেকে বিন্দু কিছুদূর নামিয়া আসে। দ্বিতীয়সেকে আরও কিছুটা নামে। তৃতীয়সেকে বিন্দু নামিতে নামিতে বজ্রমণির অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু তথাপি স্খলিত হয় না। তারপর অনুত্তর-সেকে বিন্দু স্খলিত হইবার আশঙ্কাই থাকে না। যদিও প্রজ্ঞাসেকেও বিন্দুর পতন ঘটে না তথাপি ঐ সময় বিন্দু স্পন্দহীন থাকে না। কিন্তু অনুত্তরসেকে বিন্দু সর্বথা নিস্পন্দ হইয়া যায়। তখন উহার ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি উভয়ই সমাপ্ত হইয়া যায়। তখন আবর্তন পূর্ণ হয়। ইহাই সহজানন্দের অবস্থা।

উষ্ণীষ-কমলে বিন্দুকে স্থির করা যেমন আবশ্যক তেমনি স্থির বিন্দুকে নামাইয়া আনাও আবশ্যক। আরোহ এবং অবরোহ উভয়ই আবশ্যক।

ধর্মচক্রপ্রবর্তন ব্যাপারে গুরুকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানের প্রাকৃত দেহের জনক, তেমনি সদ্গুরুও শিষ্যের অপ্রাকৃত দেহের জনক। এইজন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গুরু পিতৃতুল্য। শুদ্ধ বিন্দুর অবতরণ ব্যতীত শুদ্ধ-দেহের রচনা অথবা দ্বিতীয় জন্ম লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানীগণ এই শুদ্ধদেহকেই জ্ঞানদেহ, বৈন্দবদেহ বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

বাগ্‌যোগ—এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়

যে বৌদ্ধতন্ত্রযোগ বাগ্‌যোগেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে জাগাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় শব্দবীজ। বর্ণমাতৃকা বা কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রতিটি আধারেই সুপ্ত রহিয়াছে। ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে ঐ জাগ্রত শক্তি সাধকের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া বৈচিত্র্য লাভ করে। এইজন্য সাধকের ভিন্নতাবশতঃ মন্ত্রও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার শব্দ-বীজ মূর্ত হইয়া দেব-দেবীর আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মীমাংসা মতে দেবতা মন্ত্রাত্মিকা, কিন্তু বেদান্তমতে দেবতা বিগ্রহরূপা। বস্তুতঃ এই দুই মতই সত্য। বাচক ও বাচ্য অথবা নাম ও রূপ অভিন্ন বলিয়া মন্ত্র ও দিব্য বিগ্রহ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন। নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে দেবতার সাকারতা ও নিরাকারতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করা হইয়াছে।

সর্বত্রই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধকের প্রকৃতির বিচারের আধারের উপরই মন্ত্র-বিচার প্রতিষ্ঠিত। রোগের নির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধ নির্ণয় করা যায় না। পঞ্চস্কন্ধের মূল বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই মূলে পাঁচপ্রকার ভেদই লক্ষিত হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ইহার পারিভাষিক নাম 'কুল'। হেবজ্রতন্ত্রে কুলের বিবরণ আছে। দেবতা প্রকট হইলে তাহাকে আবাহন করিতে হয়। অব্যক্ত অগ্নি হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালান যায় না, তেমনই অপ্রকট দেবতাকেও আবাহন করা যায় না। যে করণ বা সাধন দ্বারা দেবতাকে আবাহন করিতে হয় তাহাকে 'মুদ্রা' বলে। এক এক প্রকার আকর্ষণের জন্য এক এক প্রকার মুদ্রার আবশ্যকতা আছে। দেবতা প্রকট হইয়া এবং পরে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ গুণানুসারে নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। ইহার নাম 'মণ্ডল'। মণ্ডলের কেন্দ্রে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা থাকেন। চারিদিকে বৃত্তাকারে অসংখ্য দেব-দেবী বাস করেন।

বৌদ্ধধর্মে আগমের প্রভাব—বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান, যোগ ও চর্যাদিতে আগমের প্রভাব কখন কিরূপে পড়িতে শুরু করে, তাহা বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন যে তন্ত্রসাধনা অত্যন্ত গুপ্ত সাধনা এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধারারূপে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে মিশর, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার আবির্ভাব সুপ্রাচীনকালেই হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদাদিতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পণ্ডিত তারানাথের মতে, প্রথম প্রকাশের পর তন্ত্র-সাধনা দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুপরম্পরা ক্রমে গুপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। ইহার পর সিদ্ধ বজ্রাচার্যগণ ইহা প্রকাশিত করেন। চুরাশীজন সিদ্ধের নাম এবং তাঁহাদের মত ও অন্যান্য পরিচয়ও

কিছু কিছু পাওয়া যায়। নামের তালিকাতেও মতভেদ আছে। রসসিদ্ধ, মাহেশ্বরসিদ্ধ, নাথসিদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সিদ্ধগণের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধগণের সংখ্যা শুধু যে চুরাশীজন ছিল তাহা নহে, তদপেক্ষা অধিক ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বজ্রযান ও কালচক্রযান মানিতেন, কেহ কেহ সহজযান মানিতেন। ইহাদের প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

তিব্বতে ও চীনে প্রসিদ্ধি আছে যে আচার্য অসঙ্গ তুষিত-স্বর্গ হইতে তন্ত্র অবতরণ করাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মতে তিনি মৈত্রেয়নাথের নিকট হইতে তন্ত্রবিদ্যা অধিগত করিয়াছিলেন। এই মৈত্রেয় ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয় না মৈত্রেয়নাথ নামক কোন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়। অনেকে মৈত্রেয়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনি যে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুনের চর্চাও হইয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাঁহার বাসস্থান শ্রীপর্বত ও ধান্যকটক তান্ত্রিক সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মতে বৌদ্ধ সাহিত্যগুলির মধ্যে গুহ্যসমাজতন্ত্রেই প্রথম শক্তি উপাসনার মূল লক্ষিত হয়। অতএব অসঙ্গেরও পূর্বে শক্তি উপাসনার ধারা সুদৃঢ় হইয়াছিল।

তন্ত্রের অবতরণ—তাত্ত্বিক দিক হইতে এই বিষযে আলোচনা করা যাইতে পারে। 'তন্ত্রালোকে'র টীকাতে জয়রথ বলিয়াছেন যে পরাবাক্ পরম পরামর্শময় বোধরূপা। ইহাতে সব ভাবেরই পূর্ণত্ব রহিয়াছে। ইহাতে অনন্ত শাস্ত্র বা জ্ঞান বিজ্ঞান পর-বোধরূপে বিদ্যমান আছে। পশ্যন্তী অবস্থা পরাবাকের বহির্মুখী অবস্থা। এই অবস্থাতে পূর্বোক্ত পরবোধাত্মক শাস্ত্র 'অহংপরামর্শ' রূপে অন্তরে উদিত হয়। ইহাতে বিমর্শ থাকে না বলিয়া বাচ্য-বাচক ভাব থাকে না। ইহা আন্তর পরামর্শস্বরূপ। এই অবস্থাতে প্রত্যবমর্শক প্রমাতার দ্বারা পরামৃশ্যমান বাচ্যার্থ অহন্তায় আচ্ছাদিত হইয়া স্ফুরিত হয়। ইহাই বস্তুনিরপেক্ষ ব্যক্তিগতবোধের উদ্ভবের প্রণালী। তাই ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়'তে বলিয়াছেন—'ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানম্ তদপ্যাগমহেতুকম্'। অর্থাৎ আর্যজ্ঞান বা প্রাতিভজ্ঞানের মূলেও আগম বিদ্যমান। যাহাকে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়, তাহাও বস্তুতঃ স্বতঃস্ফুর্ত নয়। ইহারও মূলে আগম। মধ্যমাভূমিতে আন্তর পরামর্শ অন্তরেই বিভক্ত হইয়া যায়। তখন ইহা বাচ্য-বাচক স্বভাবে উল্লসিত হইয়া উঠে। এই মধ্যমাভূমিতে পরমেশ্বর চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—নিজের এই পঞ্চমুখ ভাব অভিব্যক্ত করেন এবং সদাশিব ও ঈশ্বরদশা অবলম্বন করিয়া গুরু ও শিষ্যভাবে প্রকট হন। পরমেশ্বরের এই পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চস্রোতময়

নিখিল শাস্ত্রের অবতরণ ঘটিয়া থাকে। অস্ফুটতার দরুণ এই সকল জ্ঞানাত্মক শাস্ত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু বৈখরী ভূমিতে এইগুলি ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং পরিস্ফুটতা লাভ করে।

নাগার্জুন, অসঙ্গ বা অন্য কোন আচার্যের শাস্ত্রের অবতারণার একমাত্র প্রণালী ইহাই। ঋষিদের মন্ত্রসাক্ষাৎকারের প্রণালীও এইরূপ ছিল। এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ধারক পুরুষের ব্যক্তিগত চিত্তের সংস্কার ঐ অবতীর্ণ জ্ঞানশক্তির সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট না হয়। সংশ্লিষ্ট হইলে 'শ্রুতি' আর শ্রুতি থাকে না, 'স্মৃতি'তে পরিণত হয় এবং যাহা প্রত্যক্ষ ছিল তাহা পরোক্ষ হইয়া যায়। তখন অবতীর্ণ জ্ঞানের প্রামাণ্য কম হইয়া যায়।

বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগ বিষয়ক সাহিত্য—অবশেষে বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগ বিষয়ক সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিব্বতে ও চীনে বিদ্যমান আছে এবং কিছু কিছু এদেশেও আছে। সব গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। 'গুহ্যসমাজ' এবং উহার টীকা ও ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্র ও হেবজ্রতন্ত্রের নামও প্রসিদ্ধ। আরও কয়েকটি তন্ত্র-গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) কালচক্র তন্ত্র ও উহার টীকা বিমলপ্রভা।
(২) শ্রীসম্পুট—ইহা যোগিনীতন্ত্র।
(৩) সমাজোত্তর তন্ত্র।
(৪) মূলতন্ত্র।
(৫) নামসঙ্গীতি।
(৬) পঞ্চক্রম।
(৭) সেকোদ্দেশ—তিলোপাকৃত।
(৮) সেকোদ্দেশ টীকা—নারোপাকৃত।
(৯) গুহ্যসিদ্ধি—পদ্মবজ্র অথবা সরোরুহবজ্রকৃত।

প্রসিদ্ধি আছে যে আচার্য সরোরুহবজ্র হেবজ্র-সাধনের প্রবর্তক ছিলেন। সরোরুহবজ্রের শিষ্যের নাম অনঙ্গবজ্র। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয় সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। হেবজ্র সাধন বিষয়েও ইনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রভূতি অনঙ্গবজ্রের শিষ্য ছিলেন। শ্রীসম্পুটের টীকা ইন্দ্রভূতি লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া জ্ঞানসিদ্ধি সহজসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহারই নামে পাওয়া যায়। শুনা যায়, ইন্দ্রভূতি উড্ডীয়ান-সিদ্ধ অবধূত ছিলেন। তাঁহাব কনিষ্ঠা ভগিনী ও

শিষ্যা লক্ষ্মীংকরা অদ্বয়বজ্র তত্ত্বরত্নাবলী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ডাকার্ণব নামে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ আছে—ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের অবসানের একটি অন্যতম কারণ—যোগ-বিজ্ঞানের গভীর রহস্য আগম-সাধনাতেই নিহিত। একসময়ে ভারতবর্ষের এই গুপ্তবিদ্যা চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি বহুদেশে সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। একদিকে যেমন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্র মার্জিত হইত এবং উত্তরোত্তর দিগ্বিজয়ী বিদ্বান ব্যক্তিদের আবির্ভাববশতঃ দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি হইত, অন্যদিকে তেমনই যোগমার্গে বোধির ক্ষেত্রে বড় বড় সিদ্ধপুরুষগণের আবির্ভাব হইত। এই সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণ প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তিপুঞ্জ বশীভূত করিয়া লোকোত্তর সিদ্ধি-সম্পদে নিজেদের মণ্ডিত করিতেন। ইহাতে ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে তান্ত্রিক যোগমার্গে অযোগ্য লোকের প্রবেশ অবারিত হওয়ার ফলে স্বভাবতই নাগার্জুন ও অসঙ্গের মহান আদর্শ সকলে সমভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই অন্যান্য ধার্মিক প্রস্থানের ন্যায় বৌদ্ধ প্রস্থানেও নীতিলঙ্ঘন ও আচারগত শিথিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসানের কারণবর্গের মধ্যে ইহা একটি মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। কারণ, নীতিধর্মের উপরেই জগতের সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া মূল আদর্শের মহত্ত্ব বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নয়।

এই পর্যন্ত যাহা লিখিলাম তাহা আচার্য নরেন্দ্রদেবের 'বৌদ্ধধর্মদর্শন' গ্রন্থের ভূমিকায় ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্তৃক রচিত প্রবন্ধের অনুসরণে রচনা করিলাম। এক্ষণে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া ও উহার সমাধানের কোন উপায় আছে কি না—আলোচনা করিয়া 'বৌদ্ধধর্মের বিভিন্নপ্রকার যান বা মার্গ' বিশ্লেষণের সমাপ্তি ঘটাইব।

প্রশ্নটি হইল এই যে জগৎবাসীকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কঠোর সাধনায় বোধি লাভ করিয়া ধর্মচক্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কি সার্থক হইয়াছে? শুধু বুদ্ধদেব কেন, তাঁহার পরে শঙ্করাচার্যদেব আসিয়া আত্মোপলব্ধি ও ব্রহ্মোপলব্ধির মার্গ ভারতবাসীকে প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরে চৈতন্যদেব আসিয়া নাম-সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়া ভারতবাসীর চিত্তকে কলুষ-মুক্ত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্তে ভাবভক্তির প্লাবন বহাইয়া পতিতোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

এমন কি বর্তমান যুগে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া ধর্মোপদেশের মধ্য দিয়া সকলের ভিতরে চৈতন্যের উদয়ের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। অত্যাধুনিক যুগে ঋষি অরবিন্দ আসিয়া জগৎবাসীর মর্ত জীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিবার সাধনা করিয়া গেলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কত মুনি-ঋষি-আচার্য-সাধুসন্ত-মহাপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া জগৎ-কল্যাণের জন্য সাধনা করিয়া গেলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি কি সমগ্রভাবে ভারতবাসীর চিত্ত কিছুমাত্র মার্জিত হইয়াছে? বরং উহার উল্টাটাই দেখিতে পাই। আজ ভারতবাসীর তথা সমগ্র জগতের চিত্ত দ্বেষ-হিংসায়, কামনা-বাসনায়, ইন্দ্রিয়বর্গের দাসত্বে আরও বেশী করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িয়া জগতে অকল্যাণই ডাকিয়া আনিতেছে। তবে কি ইহার সুরাহা নাই? ঐ সমস্ত মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে? জগৎবাসীর ভাগ্যলিপি কি চিরদিনের মত পঙ্কিল আবর্তে ঘুরিয়া মরিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে?

এই প্রশ্নের উত্তর ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা দিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'জগতে ও জীবে অপূর্ণতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টিমাত্রই অর্থাৎ যে সৃষ্টির সহিত আমরা পরিচিত তাহা অপূর্ণতার নিদর্শন। এই অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা এবং প্রত্যেকটি জীবের পূর্ণত্বলাভের চেষ্টা বস্তুতঃ অভিন্ন। অভাববোধ অপূর্ণতা হইতেই হইয়া থাকে। দুঃখ, শোক, তাপ, কলুষিত বৃত্তি, খণ্ডভাব এবং তাহার যাবতীয় পরিণাম—এসব অপূর্ণতারই ফল। সৃষ্টির পর হইতেই এই অপূর্ণতা একপক্ষে যেমন অনুভবে আসিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনি ইহা দূর করিবার চেষ্টাও আরব্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপাযেব আবিষ্কাব হইয়াছে—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই অপূর্ণতা দূর করিয়া জীব ও জগৎকে শান্তি সুখ এবং পরমা তৃপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক বিচার ও সাধনা, সর্ববিধ লৌকিক প্রয়াস ঐ এক মহান উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে পূর্ণত্বলাভই জীব ও জগতের সকলপ্রকার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য। অনাদিকাল হইতে এই লক্ষ্যেব অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখন পর্যন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হইতেছে ইহার প্রাপ্তি পূর্বেও যেমন সুদূরপরাহত ছিল এখনও তেমনি সুদূরপরাহত রহিয়াছে, কারণ জগতে দুঃখ কষ্ট এবং অভাববোধের উপশম পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি, পরমানন্দপ্রাপ্তি, ব্রহ্মত্বলাভ, মোক্ষ প্রভৃতি যে কোন নামেই সেই মহা উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যাউক্

না কেন তাহার পূর্ণ উপলব্ধি এখন পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ আনন্দ, মুক্তি, দুঃখনিবৃত্তি অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থা লাভ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জগতের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ একেরও অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিরই দুঃখনিবৃত্তি সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না—কারণ সমগ্র সৃষ্টির অতীত সত্তা অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বদ্ধ।

রুচিবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্নপ্রকার মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৈবল্য, নির্বাণ, পরিনির্বাণ, মহাপরিনির্বাণ, শান্ত ব্রহ্মপদ, শিবত্ব, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অথবা পরমেশ্বরত্ব, নির্বিকল্পস্থিতি, নিত্যলীলা ইত্যাদি অনন্তপ্রকারের মুক্ত অবস্থা আছে। মরজগতের শোক-তাপ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যাহার যে প্রকার অধিকার অথবা রুচি সে সেইপ্রকার মুক্ত-অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল আত্মা জগতের হিত ও সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বভাবতঃ করুণাবিশিষ্ট এবং পরোপকার কার্যে রুচিসম্পন্ন তাঁহারা শুধু নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ে প্রাচীন সময়ে ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তি বিশেষরূপে প্রার্থনীয় ছিল। যে জ্ঞানে জগৎকে দুঃখময় বলিয়া চিনিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে, দুঃখের কারণ বুঝিতে পারা যায়, দুঃখনিবৃত্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় এবং উহা প্রাপ্তির উপায় আয়ত্ত করা যায় তাহাই প্রকৃত সম্যগ্জ্ঞান। দুঃখনিবৃত্তি নির্বাণেরই নামান্তর। ইহা শুধু দুঃখনিবৃত্তি নহে, দুঃখের সঙ্গে সমগ্র সত্তারই নিবৃত্তি। এই পথ ব্যক্তিগত দুঃখনিরোধের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকে মাত্র। ইহা দ্বারা অখিল জগতের দুঃখনিবৃত্তির মার্গে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ যাহার দুঃখনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহার পঞ্চ স্কন্ধই নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া সে নিজেই থাকে না—অন্যের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে কে? তাছাড়া অন্যের দুঃখ দূর করিবার বাসনা চিত্তে না থাকিলে সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে নির্বাণে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। অশুদ্ধ বাসনা নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্হৎ অবস্থা উপলব্ধ হয়। তাহার পর যথাসময়ে স্কন্ধ নিবৃত্তি সিদ্ধ হয় যাহার নামান্তর নির্বাণ। ইহা কতকটা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্যের মত। সুতরাং স্থায়ীভাবে পরদুঃখমোচনের চেষ্টা এই পথে চলে না। যে নিজে অর্হৎ-ভাব প্রাপ্ত হয় সে অন্যকে জ্ঞানদান করিয়া শুদ্ধ পথে আসিবার সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু তাহার স্কন্ধ নিবৃত্তি হইয়া গেলে অর্থাৎ দেহত্যাগ হইয়া গেলে তাহার এই পরোপকার ব্রত মধ্যপথেই

খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্তু বহুলোকের দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের দুঃখ লঘু মনে করিয়া বহুলোকের দুঃখকে প্রধান স্থান দেওয়া আবশ্যক। তাদৃশ ক্ষেত্রে স্বদুঃখ মোচনের বাসনা অপেক্ষা পরদুঃখ মোচনের বাসনাই অধিকতর বলবতী হয়। এই ক্ষেত্র যদিও অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তথাপি ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ক্লিষ্ট অজ্ঞান এবং অক্লিষ্ট অজ্ঞান এই উভয়প্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পরহিতাকাঙ্ক্ষী আত্মার ক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকে না, কিন্তু অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকে যাহার জন্যই পরহিত কার্য সম্ভবপর হয়। পরদুঃখমোচনের বাসনাই শুদ্ধ বাসনা। অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত এই শুদ্ধ বাসনা থাকে। এই বাসনা থাকার দরুণ চিত্ত নির্বাণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যতদিন অক্লিষ্ট অজ্ঞান বর্তমান থাকে ততদিন মহাজ্ঞান অর্জনেরও চেষ্টা চলিতে থাকে। এই চিত্ত বোধিচিত্ত অথবা বোধিসত্তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনীভূত এবং বিন্দুরূপে পরিণত চিত্ত। যে পরিমাণে এই চিত্ত উৎকর্ষ লাভ করে সেই পরিমাণে ইহা নিম্নবর্তী ভূমি ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্ববর্তী ভূমিতে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে এক এক ভূমি পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বতর ভূমি লাভ করিতে করিতে দশম ভূমি প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্ণতম আদর্শ। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্বাণরূপ কৈবল্যের ভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। দশমভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়া বুদ্ধ—সম্রাট্‌ বা চক্রবর্তী পদে আরূঢ় হন। বুদ্ধের জীবনের একমাত্র ব্রতই পরোপকার অর্থাৎ জাগতিক জীবের দুঃখভঞ্জন। সংখ্যাতীত বুদ্ধ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যু এবং নির্বাণকে পরিহার করিয়া নিরন্তর এই মহাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ইহা অতি উচ্চাবস্থা। বুদ্ধ উপদেষ্টা বা গুরু। কিন্তু সংখ্যাতীত বুদ্ধ জীবোদ্ধার কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এখনও জগতের অজ্ঞান এবং দুঃখ রহিয়াছে এবং এইভাবে কখনও যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে সে সম্ভাবনাও নাই। জীবের উদ্ধারকার্য অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু ক্রমিকভাবে; এবং যত জীব প্রপঞ্চময় জগতে সমাগত হইতেছে তাহার অনেক কম প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে। সুতরাং সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব নয়, কারণ নিরন্তর নব নব জীবের আবির্ভাব হইয়া চলিয়াছে।

বৈষ্ণব মহাজনগণ শুধু দুঃখনিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন আপন আপন সাধনায় পরমলক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই আনন্দের আস্বাদন রসাস্বাদনরূপে অনন্তপ্রকারে নিত্যধামে হইয়া থাকে। ইহাই নিত্যলীলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নিত্যলীলা বলিয়া ইহার কখনই অবসান নাই। ভক্তজীব বা মহাজনগণ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে শুদ্ধাভক্তির মহিমায় এই লীলারসের

আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। এবং তাঁহাদের কৃপাতে অধিকার ও বাসনা অনুরূপ অন্যান্য ভক্তজীব ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলায় যোগ দিতে অধিকার লাভ করে। কিন্তু এই সমস্ত ভক্ত মহাজনগণও জগতের দুঃখ সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, কারণ সকলেই যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবে এবং কালের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে, কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না।

জীব ও জগতের দুঃখ মহাজনদের হৃদয়কে চিরদিনই ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে সম্যক্ প্রকারে এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন সম্ভবপর হয না। মহাজনদের মধ্যে যাঁহাতে যে পরিমাণ শুদ্ধ বাসনার বিকাশ থাকে তিনি সেই পরিমাণে অন্যের দুঃখমোচনে তৎপর এবং সমর্থ হইয়া থাকেন। তারপর ঐ বাসনা নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনি পরামুক্তি লাভ করেন। তখন আর এই জীবোদ্ধার ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহার সমধর্মা অন্য কেহ ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ মহাকার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনিও পরবৈরাগ্য লাভ করিয়া জগদ্ব্যাপারের অন্তরাল হন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য এই জীবোদ্ধার ব্যাপার নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে এই জীবোদ্ধার কার্য এইরূপ গুরুমণ্ডলের দ্বারা অবিশ্রান্তভাবে সম্পাদিত হইলেও এখনও জীব ও জগৎ দুঃখপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং দুঃখের মাত্রা এবং দুঃখী জীবের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিতই হইয়াছে। সর্বজগতের এবং সর্ব জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শুধু শাখা সংস্কাব করিলেই চলিবে না—মূল সংস্কার করা আবশ্যক। মূল সংস্কার মানে কালের নিবৃত্তি। অর্থাৎ যে কালের অধীন হইয়া জীব অভাব ও যন্ত্রণা বোধ করিতেছে সেই কালকে নিবৃত্ত বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে শুধু ব্যষ্টিভাবে জীবকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জীবমাত্রের উদ্ধার সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ণভাবে গুরু স্বকার্য তখনই সাধন করিতে সমর্থ হইবেন যখন কাল আবদ্ধ হইবে অর্থাৎ তাঁহার কার্যপথে যখন কাল বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে যখনই হউক না কেন ইহা অবশ্যই সম্ভবপর। কারণ যে দৃষ্টিতে কালের এবং কালজনিত সৃষ্টির আদি আছে, সেই দৃষ্টিতে কালের নিরোধ ও তজ্জনিত সৃষ্টিরও নিরোধ অবশ্যই আছে। সকলেই স্বীয় ভোগকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। তদ্রূপ কালেরও শাসনকাল বা অধিকারকাল সমাপ্তপ্রায় হইলে উহা স্বভাবতঃই নিবৃত্ত্যুন্মুখ হয়।

উহার প্রবল প্রভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কালকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করার সময় উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহা গুরুর কার্য। কালের যেমন শাসনকাল আছে তেমনি গুরুরও শাসনকাল আছে। কালের শাসনকালে গুরুকে এক হিসাবে কালের অধীন হইয়াই অর্থাৎ তাহার নীতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয়। কালকে লঙ্ঘন করা, উপেক্ষা করা অথবা কালজনিত নিয়মকে অনাদর করা কালের রাজ্যে সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা করিতে গেলে গুরুর স্বকার্য ব্যাহত হইয়া যায়। সেইপ্রকার গুরুর শাসনকালেও কালের প্রকোপ থাকিবে না বটে, কিন্তু গুরুর আয়ত্তাধীন থাকিয়া কাল অবশ্যই কার্য করিবে। অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া তখন কালকে চলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? গুরুরাজ্য স্থাপনের পূর্বে অর্থাৎ অখণ্ড-গুরু জগতে প্রকট হওয়ার পূর্বে ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু গুরুরাজ্য স্থাপন হইলে ইহা সম্ভবপর, **শুধু সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী**। সেদিন জগতের যাবতীয় জীব গুরুরাজ্য স্থাপনের পর ক্রমশঃ তৃপ্তি, পূর্ণতা এবং পরমানন্দ লাভ করিয়া গুরুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে। তখন এক অখণ্ড-গুরু অনন্ত খণ্ডবৎ বিভক্ত সত্তা স্বকায়াতে ধারণ করিয়া সকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইবেন। তখন প্রত্যেকেই নিজে পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণতার উপলব্ধি করিবেন এবং অনন্ত বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড নিজসত্তারই আনন্দময় অনন্ত বিলাসরূপে অনুভব করিবেন। তখন এবং একমাত্র তখনই গুরুর মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। জগতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহের কোণদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও যতক্ষণ ক্লেশ ও তাপের এবং অভাবের লেশমাত্র অনুভব করিবে ততদিন এই মহাবস্থার উদয় হইয়াছে বলা চলিতে পারে না।'

(দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্র সং—৭৩)

এখানেও প্রশ্ন হইল, এমন দিন কি কোনও দিন আসিবে যেদিন অখণ্ড গুরু জগতে প্রকট হইয়া কালের প্রকোপ খর্ব করিয়া অখণ্ড গুরুরাজ্য স্থাপন করিয়া জগতের প্রতিটি জীবকে এক ও অখণ্ড আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবে? এবং সর্বজীব একই সঙ্গে একই সময়ে 'লভিবে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ'?

এই প্রশ্নের উত্তরও শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত তাঁহার অন্য একটি গ্রন্থে অনুসন্ধান করা যাইতেছে—

"অবশ্য গুরু অখণ্ড নিজ-স্বরূপে অলক্ষ্যরূপী। তাহার অভিব্যক্ত স্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আনন্দরূপে এবং জ্যোতিঃরূপে পরিণত

হইলেই তাহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে হয়। ইহা একাধারে গুরু এবং মা উভয়ই। এই আনন্দই ইষ্ট। এই আনন্দই মা এবং শক্তি নামে যোগীর নিকট পরিচিত। ভাবের উদয় হইতেই সর্বপ্রথম মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মনে রাখিতে হইবে ভাব হইতে পরমাপ্রকৃতি পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় ভূমি হইতে সপ্তম ভূমি পর্যন্ত যোগী প্রায় সর্বত্রই মাকে তৎতৎ বেশে এবং তৎতৎ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং সপ্তম এই কয়টি ভূমিই মাতৃভূমি—মাতৃরাজ্য। ষষ্ঠ ভূমিতে মার দর্শন পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ ভূমি সকলের জন্য নহে। পঞ্চম ভূমির অগ্রে বিশেষ অধিকারীর নাভিচক্র জাগ্রত হইলে ষষ্ঠ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল বা মহা সবিতা ভেদ তাঁহারাই করিতে পারেন যাঁহারা পঞ্চম ভূমির পর নাভি জাগরণের ফলে ষষ্ঠ ভূমিতে উন্নীত হইতে সমর্থ হন। সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সপ্তম ভূমিতে গেলে ঐখানে আবদ্ধ হইয়া থাকার আশঙ্কা থাকে না, কারণ তখন ব্রহ্মসত্তার পূর্বাভাস যোগীর মধ্যে ভাসিয়া উঠে এবং সেই আকর্ষণে যোগী সপ্তম ভূমি ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হন। সপ্তম ভূমি ভেদ করিয়া গেলে ব্রহ্মাবস্থা দেহাবস্থান কালেই প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন মহামায়া এবং ব্রহ্মের অন্তরালবর্তী অনাদিকালের ব্যবধান কাটিযা যায়। এই অবস্থা সৃষ্টির পর হইতে এখন পর্যন্ত ঘটে নাই।...মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া কোন যোগী নাভিমার্গে যদি মহাজ্ঞান লাভ করিয়া পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের দিকে গতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে স্থিতিলাভ হয়। ইহাই অন্তর্মুখী গতির চরম সার্থকতা। পরমাপ্রকৃতির রাজ্য উদ্‌ঘাটনের ভার নাভিচক্রভেদী মহাখণ্ড যোগীর উপর নির্ভর করে। মরদেহে থাকিয়া কর্মপ্রভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এখন পর্যন্ত পরমাপ্রকৃতির স্থানে কেহ গমন করিতে পারেন নাই।...

বহির্জগৎ হইতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকে একাগ্র করিয়া লক্ষ্য উন্মেষের ফলে যখন অন্তর্জগৎ বা হৃদয়রাজ্য উন্মীলিত হয় অর্থাৎ হৃদয় পুন্ডরীক বিকশিত হয় তখন ক্রমশঃ হৃদয়ে কেন্দ্রের দিকে গতির বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরমাপ্রকৃতি পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্য বা আনন্দের যাহা পরম স্বরূপ, যাহা ইষ্টের অন্তরতম রূপ তাহাকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী গতির অবসান হইয়া যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যোগী হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বের অন্তরাত্মাও সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্মের অবসান এবং তাহার অন্তর্মুখী গতিরও অবসান হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহা ব্রহ্ম তাহা ইহার পর। কারণ, ব্রহ্ম সৃষ্টির অতীত, বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ উভয়ের অতীত, মোহমায়া, মহামায়া এবং মহা মহামায়ারও অতীত অনন্ত পরম সত্তা। উহা

অসঙ্গরূপে, অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ উহা সকলের অতীত এবং এক হিসাবে বলা যায় উহা বস্তুতঃ কোথাও নাই। কর্মদ্বারা উহার উপলব্ধি হয় না, মহালক্ষ্মীরূপী যে সম্যক্ জ্ঞান তাহা দ্বারা উহার উপলব্ধি হয় না, ভক্তি ঐ স্থানে পৌঁছে না। কোন উপায়েই উহাকে আয়ত্ত করা যায় না। জীবের পুরুষকার উহাকে আপন করিতে পারে না এবং পরমাত্মার কৃপাদ্বারাও উহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। উহা একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ, অথচ উভয়েরই অতীত। উহা যে কি তাহা বলা যায় না এবং উহা যে কি নয় তাহাও বলা যায় না। এই ব্রহ্মবস্তুকে বোধের সঙ্গে আয়ত্ত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আমরা পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে যে অচিন্ত্য, অনন্ত, অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান প্রাপ্ত হই তাহাও ব্রহ্মবস্তুর সমৃদ্ধি ও মহিমার তুলনায়, মহাসিন্ধুর তুলনায়, বিন্দুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র। এখন পর্যন্ত কোন যোগীই দেহাবস্থানকালে অর্থাৎ চেতনাসত্তা লইয়া ঐ বস্তুকে ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। উহা সুদূর স্বপ্নের ন্যায় পরমপদরূপে মহাযোগী এবং মহর্ষিগণের গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর পরমপদ যাহা দিব্যসূরীগণ নিরন্তর নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন তাহা বস্তুতঃ ঐ ব্রহ্মপদ ভিন্ন অপর কিছু নহে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্য হইতেও উহার ব্যবধান অনন্ত। উহা যে কতদূর তাহা নির্ণয় করা যায় না, অথচ উহা সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অন্তর্গতির পর্য্যবসান হৃদয়ের মধ্যবিন্দুতে হইয়া থাকে। তাহার পর আর অন্তর্গতি থাকে না। ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাহ্যজগতের নিরোধ হইয়া যায় তেমনি পরমাপ্রকৃতি ভেদ করার পর আন্তরজ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভিতর ও বাহির এক হইয়া বা সমান হইয়া প্রকাশমান না হইলে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। মায়ারাজ্যে অথবা মহামায়া রাজ্যে গতি আছে তাই যোগীর পক্ষে এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে অগ্রগতি সম্ভবপর। কিন্তু যখন অন্তর্জগৎ ভেদ করিতে সামর্থ্য জন্মে তখন আর গতি থাকে না। অন্তর্জগৎ ভেদ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, কারণ এখন পর্যন্ত কেহই তাহাতে সফলকাম হন নাই। কিন্তু যোগীর আদর্শ ত তাহাই। বহির্জগৎ ভেদ করিতে না পারিলে যেমন লক্ষ্য উন্মেষ হয় না এবং অন্তর্জগতে প্রবেশ হয় না, তেমনি অন্তর্জগৎ ভেদ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। প্রকৃত সত্য তাহাই যাহাতে ভিতরে বাহিরের ভেদ নাই, যাহাতে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ থাকিতে পারে না, যাহাতে অতীত ও অনাগত নিত্য বর্তমানে সাম্য লাভ করে, যাহাতে আমি ও তুমির ব্যবধান চির অস্তমিত হয়। দেহাবস্থায় অন্তর্জগৎ

ভেদ করিতে না পারিলে আর ভেদ করিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ অন্তর্জগতের মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ হইয়া গেলে পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের দলমধ্যে স্থান লাভ হয় এবং পরমাপ্রকৃতির রাজ্য দেহাবস্থাতে মহাযোগী ভিন্ন কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু অতিক্রম করিলেও কাল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহান্তের সম্ভাবনা থাকে এবং দেহান্ত হইলে স্বযং পরমাপ্রকৃতিরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাবস্থার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে দেহাবস্থায় শুধু অন্তর্জগৎ ভেদ করিলেও কালের বিক্রম সর্বপ্রকারে অপনীত হয় না। পরমাপ্রকৃতি রাজ্য যেমন কালরাজ্যের অন্তর্গত তেমনি পরমাপ্রকৃতির বাহিরে সন্ধিভূমিতেও কালের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মাই কালাতীত। অতএব শুধু অন্তর্জগৎ ভেদ করিলেও মহাযোগীর কার্যসিদ্ধি হয় না। তাহার পর মরদেহে থাকিতে থাকিতেই কর্মহীন কর্ম অর্থাৎ আত্মকর্ম বা স্বকর্ম সম্যক প্রকারে সুসিদ্ধ হইলে ভাব ও গুণের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া ও ব্রহ্মসত্তার মিলন হইয়া যায়। অন্তর্জগৎ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর গতি বা কর্ম থাকে না ইহা বলা হইয়াছে। থাকে না ইহা সত্য কিন্তু তবু আছে। এই গতিহীন গতি অথবা কর্মহীন কর্মই মহামায়া ও ব্রহ্মকে অভেদ সূত্রে গ্রথিত করে। দেহান্তে ইহা সম্ভবপর হয় না বলিয়া পরমাপ্রকৃতি রাজ্য ভেদ করার পরও দেহে থাকিতে ইহা সম্পন্ন হওযা আবশ্যক। তখন ঐ যে চারিদিকে অখণ্ড জ্যোতিঃ বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা পরমাপ্রকৃতির রাজ্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যও দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন যোগী নিজ ভূমিই ব্রহ্ম-ভূমিরূপে চিনিতে পারে। তখন কালের রাজ্য বা মায়ার রাজ্য বলিয়া কিছু থাকে না এবং ব্রহ্ম বলিয়াও পৃথক্ কিছু থাকে না। কারণ তখন যোগীই ব্রহ্ম। মহামায়া তাঁহারই আশ্রিত। এই অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সূত্রপাত হয়।" (দ্রঃ অখণ্ড মহাযোগের পথে, পৃঃ ৫০—৫৮)

উপরের উদ্ধৃতিটি মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে আজ পর্যন্ত কোনো যোগী মরদেহে অর্থাৎ মর্ত জগতে জীবিত থাকিয়া কর্ম বা সাধনার দ্বারা 'নাভিচক্র' ভেদ করিয়া পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই—"মরদেহে থাকিয়া কর্মপ্রভাবে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এখন পর্যন্ত পরমাপ্রকৃতির স্থানে কেহ গমন করিতে পারেন নাই।" পরমাপ্রকৃতির রাজ্য ভেদ করিয়া মরদেহে থাকিতে থাকিতেই ব্রহ্মাবস্থা লাভ করা তো বহু দূরের কথা। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, "পরমাপ্রকৃতির রাজ্য দেহাবস্থাতে মহাযোগী ভিন্ন কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না।" যদি

কোন দিন কোন যোগ্য মহাযোগী ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নাভিচক্র ভেদ করিয়া পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাইয়া উহাকেও ভেদ করিয়া মরদেহে থাকিতে থাকিতেই কর্মহীন কর্ম অর্থাৎ স্বকর্ম সম্যকপ্রকারে সুসিদ্ধ করিয়া ভাব ও গুণের মিলনের দ্বারা মহামায়া ও ব্রহ্মসত্তার মিলন নিজ মর্তদেহে সম্যকপ্রকারে সাধন করিতে পারেন, তখন সেই যোগীই হইবেন ব্রহ্ম এবং মহামায়া হইবেন তাঁহার আশ্রিত। মর্তভূমিই পরিণত হইবে ব্রহ্মভূমিরূপে। মায়া, মহামায়া, পরমাপ্রকৃতি প্রভৃতি তখন সব একাকার হইয়া অভেদে সেই ব্রহ্মরূপী অখণ্ড যোগীর চিন্ময় দেহে এক হইয়া যাইবে। কাল সেই অখণ্ড ব্রহ্মগুরুর ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিবে। এইরূপে ধরাধামে এক অখণ্ড গুরুরাজ্য স্থাপিত হইলে "জগতের যাবতীয় জীব ক্রমশঃ তৃপ্তি, পূর্ণতা এবং পরমানন্দ লাভ করিয়া গুরুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে। তখন এক অখণ্ড গুরু অনন্ত খণ্ডবৎ বিভক্ত সত্তা স্বকায়াতে ধারণ করিয়া সকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইবেন। তখন প্রত্যেকেই নিজে পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণতার উপলব্ধি করিবেন এবং অনন্ত বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড নিজসত্তারই আনন্দময় অনন্ত বিলাসরূপে অনুভব করিবেন।" এইরূপে যখন সর্বজীব একই সঙ্গে একই সময়ে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করিবে তখনই বুঝিতে হইবে 'পরমগুরুর মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে'।

কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভবপর? শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত—**"ইহা শুধু সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।"**

বৈষ্ণবাগম ঃ

বৈষ্ণবধর্ম ও উহার সহিত আগমের সম্পর্ক

এই পর্বে ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্‌ভব ও বিকাশ, আগমের সহিত উহার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের অনুসরণে পর্যালোচনা করা যাইতেছে।

বৈষ্ণবধর্মের উদ্‌ভব ও বিকাশের ধারা—বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। ঋগ্বেদেই বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ আছে। ত্রিপাদ-বিক্রম বিষ্ণুর ত্রিলোকব্যাপ্ত ঐশ্বর্য-রূপটির সন্ধান পাই ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তে—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" (ঋগ্বেদ, ১.২২.১৭)। এই ঋগ্বেদেই (১.২১.১৫৪) বিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"উরুগায়", অর্থাৎ তিনি বহুজন গেয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হয় তাঁহার নাম বহু লোকের দ্বারা গীত হইত, অথবা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বজন-বিদিত ছিলেন। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তই বিষ্ণু বিষয়ক। আর একটি সূক্তের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল—

"তমু স্তোতারঃ পূর্বং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"

সায়নাচার্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। তাঁহার নামই সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময়। সেই নামকে সকল প্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় জানিয়া উহারই উচ্চারণ করিতে থাক। হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিবার সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।"

এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রী জীবগোস্বামী 'শ্রীভগবৎ' সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন, "হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ, সেইহেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ। সেই নামের মহিমা ঈষৎ জানিয়া বা না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।"

ঋগ্বেদে বিষ্ণুই পরতত্ত্ব এবং সূর্য, ঊষা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের সৃষ্টিকর্তা

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ পরমব্রহ্মকেই বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন, ইহা ঋগ্বেদের বশিষ্ঠমণ্ডলে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। আত্মদর্শী বশিষ্টদেব বলিতেছেন—

"ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।"

অর্থাৎ, হে দেব, হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এরূপ কেহই নাই, যে আপনার সর্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারে।

অন্যত্র—

"উরং যজ্ঞায় চক্রথরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমুষাসমগ্নিম্"।

অর্থাৎ, হে বিষ্ণো! আপনাব যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনি সূর্যকে, উষাকে ও অগ্নিকে জন্ম দিয়াছেন।"

ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে 'ঋতস্য গর্ভং' বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির রচনার সময় তিনি যজ্ঞেশ্বর। বিষ্ণুর প্রাধান্য লাভ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়, আরণ্যক ও শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটি হইল এই যে দেবতাগণ ঐশ্বর্য, বীর্য ও আহার্য লাভের জন্য একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রস্তাব করেন যে তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে যজ্ঞ সাধনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইবেন। বিষ্ণু সকলের পূর্বে পৌঁছাইলেন। তদবধি দেবতারা তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন।

বিষ্ণুর অলৌকিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে আর একটি আখ্যায়িকা আছে। একদা যজ্ঞকালে কাহাদের জন্য কতদূর স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে ইহা লইয়া দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে তর্ক বাধে। অসুরগণ দেবতাদিগের জন্য মাত্র এক বামনেব পরিমিত স্থান ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। দেবতারা অগত্যা তাহাতেই রাজী হন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ আদিত্য বিষ্ণুর দেহের পরিমিত ভূমি অসুরগণ দেবতাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন স্থির হয়। বিষ্ণু মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর বিস্তৃত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া গেল। দেবতারা পৃথিবী পাইলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐরূপ একটি গল্পের উল্লেখ আছে। তথায় বলা হইয়াছে, দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগের প্রশ্ন উঠিলে ইন্দ্র প্রস্তাব করেন যে বিষ্ণু যতটুকু স্থান ত্রিপাদ বিক্ষেপে পরিক্রম করিতে পারিবেন ততটুকুই দেবগণের প্রাপ্য হইবে, অবশিষ্ট অসুরগণ পাইবে। অসুরগণ তাহাতে রাজী হয়। তখন বিষ্ণু তিন পদবিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করেন। পুরাণে কথিত আছে, দানবীর বামন স্বীয় মস্তকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ ধারণ করিয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক সাহিত্যে

বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে সর্বোপরি আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ঋষি আদিত্যের প্রতি "দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ আদিত্যের কিরণকে গমনশীল সুপর্ণপক্ষ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। আদিত্যের যে "সুপর্ণো গরুত্মান্" বিশেষণ, তাহা বিষ্ণুর বাহন হইয়াছেন।

ঋগ্বেদে এইরূপে বৈষ্ণবধর্মের যে আভাস পাওয়া যায়, পরবর্তীযুগে তাহাই উত্তরোত্তর পল্লবিত হইয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, মহাভারতে, আগম শাস্ত্রে, পুরাণে ও ধর্ম-সংহিতায় তাহার নানামুখী গতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূল শ্রুতিরূপ উৎস-শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে ইহার একটি দুর্জয়, বেগময় ও ক্রমবিস্তারশীল অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অবিরাম গতিতে বৈষ্ণবধর্মের সারভূত বিশ্বজনীন ভগবৎ-প্রীতিরূপ রসামৃতসিন্ধুর দিকে পরিণতি লাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

পাণিনি সূত্র (৪.৩.৯৮) মহাভাষ্য এবং ঘোষুণ্ডি, নানাঘাট ও বেসনগর প্রভৃতির শিলালিপি (লুডার্স-সম্পাদিত ব্রাহ্মী প্রস্তর লিপির তালিকায় ৬,৬৬৯ এবং ১১১২ সংখ্যক প্রস্তরলিপির বিবরণ দ্রষ্টব্য) প্রাচীনকালে প্রচলিত ভগবন্ বাসুদেবের পূজার বহু প্রমাণ দেয়।

'নারদ পাঞ্চরাত্র' বৈষ্ণবাগম শাস্ত্র। পাঞ্চরাত্র বলিতে ভাগবতসম্প্রদায়ও বুঝিতে হইবে। কারণ, পাঞ্চরাত্রে সাত্ত্বতধর্মের যে বিবরণ আছে তাহা ভাগবতধর্ম বলিয়া অভিহিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে, মোক্ষধর্মপর্বে, নারায়ণীয়খণ্ডে (অধ্যায় ৩৫০) পাঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ আছে। মহাভারতের নারায়ণীয় মতে পাঞ্চরাত্র সাত্ত্বতগণের ধর্ম, তাই ইহা কখনও কখনও সাত্ত্বতধর্ম নামেও বর্ণিত হইয়া থাকে। পাঞ্চরাত্র মতের বক্তা নারায়ণ, শ্রোতা নারদ। পাশুপত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতির ন্যায় ইহা অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু রামানুজের বিশ্বাস ছিল যে, পাঞ্চরাত্র মত অবৈদিক নহে। যামুনাচার্যও তাঁহার পূর্বে "আগমপ্রামাণ্য" রচনা করিয়া পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের বৈদিকত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ 'সংহিতা' অথবা 'তন্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ আগম-সাহিত্য। সাধারণতঃ ১০৮টি পাঞ্চরাত্র সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাগবতসম্প্রদায় বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের কাল নিরূপণ করা সুকঠিন। তবে ইহা নবীন গ্রন্থ নহে বা বোপদেবের রচিতও নহে। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের সিদ্ধান্ত, কাশী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতীভবনে বোপদেবের জন্মেরও বহুপূর্বের হস্তলিখিত একখানা শ্রীমদ্ভাগবতের পুঁথি আছে। লিপি বিচারে এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী বলিয়াই মনে হয়।"

পাঞ্চরাত্র কিংবা ভাগবত ধর্ম ভক্তিপ্রধান। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির চর্চা অতি বিরল। যদিও বৈদিক উপাসনাকে অনেকে ভক্তির স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহা কিছু পরিমাণে সত্য হইলেও ভক্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বৈদিক কর্ম কিম্বা জ্ঞান বা উপাসনা কাণ্ডে পাওয়া যায় না। প্রকৃত ভক্তিকে চিত্তের ভাবময় প্রকাশ বলিয়াই মানিতে হয়। বৈদিক সাধনপদ্ধতিতে ভাবের কোন স্থান নাই। বৈরাগ্যমূলক জ্ঞানকাণ্ডেও ইহার স্থান নাই। কাণ্ডদ্বয় জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রধান।

শাণ্ডিল্য ও নারদ ভক্তি-সূত্রের রচয়িতা। উভয়ের সহিতই পাঞ্চরাত্র মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্যসংহিতা নামক একখানি পাঞ্চরাত্র সংহিতার উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতের নারায়ণীয়োপাখ্যান ও নারদ-পাঞ্চরাত্রাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, নারদও পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী ছিলেন।

কর্মবাদিগণ যেমন কর্ম হইতে, জ্ঞানবাদিগণ সেইরূপ জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় বলিয়া থাকেন। ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানপ্রধান। তাই ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রেও ভাবের আলোচনা উপেক্ষিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান না হইলে যে মুক্তি হয় না তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ভক্তিশাস্ত্র প্রধানতঃ ভক্তির মাহাত্ম্যখ্যাপক। শাণ্ডিল্য ও নারদ কৃত সংহিতাতে স্বভাবতঃ ভক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। কোন স্থলে ভক্তিকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে, কোথাও বা ভক্তিকে পরাভক্তির সাধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, মুক্তিকে অবান্তর ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের টীকাতে এবং স্বরচিত 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক নিবন্ধে ভাগবত মতের আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও পাঞ্চরাত্র মতের সহিত ভাগবতের সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

কবিরাজজীর মতে কাশ্মীরাগমের ন্যায় পাঞ্চরাত্র আগমেও অদ্বৈতবাদ স্বীকৃত। তবে ঐ উভয় আগমের অদ্বৈতবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রচারিত নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্। কাশ্মীর 'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে' ও 'স্পন্দকারিকা'য় অদ্বৈত বা অদ্বয় বলিতে শিব-শক্তির সামরস্য বুঝায়। শিব-শক্তির বৈষম্যই ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক দ্বৈত, এবং উভয়ের সাম্যভাব অদ্বৈত। পাঞ্চরাত্র মতও প্রায় সেইরূপ। যখন পরাশক্তি বা লক্ষ্মী পরমেশ্বরে বিলীন থাকেন তখন প্রলয়াবস্থা—ইহা শক্তির নিষ্ক্রিয় দশা। ইহাকেই অদ্বয়াবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের মতে শক্তির বাস্তব সত্তা নাই; সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে শক্তি তুচ্ছ, বিচার দৃষ্টিতে অনির্বচনীয় বা মিথ্যা। পরমার্থিক সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই আছে; সুতরাং শঙ্কর-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদে শক্তির স্থান নাই। শক্তির পারমার্থিকতা অস্বীকার

করার ফলে শঙ্কর-বেদান্তে জীব ও জগৎ উভয়ই মিথ্যারূপে উপেক্ষিত হইয়াছে; কর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির সার্থকতা শূন্য হইয়াছে, সম্বন্ধ ও সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান মায়িক বলিয়া অনাদৃত হইয়াছে।

কিন্তু ভক্তিমার্গে শক্তির সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ, শক্তির বিশুদ্ধ ও নির্মল স্বরূপ স্বীকার না করিলে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সমস্তই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া হেয় হইয়া পড়ে; ভক্তি, করুণা, কর্ম প্রভৃতির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়। শৈব, বৈষ্ণব কিংবা শাক্ত আগমে যে অদ্বৈতবাদ আছে তাহা ভক্তিসাধনার কিংবা রসাস্বাদনের পরিপন্থী নয়, কারণ তাহা শক্তিত্যাগমূলক নয়, শক্তিগ্রহণমূলক। মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েও এই জন্য প্রজ্ঞাপারমিতার সত্তা অঙ্গীকার করিয়া বোধিসত্ত্ববাদের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ শক্তি ও শক্তিমানের সমন্বয়মূলক। শক্তি ও শক্তিমানের অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগণ অব্যক্ত অবস্থাতেও শক্তির সত্তা মানিয়া লইয়াছে।

ভগবানের সঙ্কল্পবশতঃ তাঁহাতে বিলীন মহাশক্তি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় উন্মেষ লাভ করে। সঙ্কল্প নিবন্ধন যে প্রসুপ্তা মহাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় তাহা ভগবানের অনির্বচনীয় স্বাতন্ত্র্য, তাহা তাঁহার স্বভাব। জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ ধর্ম। অবাধিত ইচ্ছার নাম ইচ্ছাশক্তি। ভগবদিচ্ছার প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, তাই তিনি ঐশ্বর্যবাণ্ বা ঈশ্বর। জগতের প্রকৃতিকে বা উপাদানকে শক্তি বলে। কিন্তু ভগবৎ-সৃষ্টি বাহ্য উপাদানসাপেক্ষ নহে। ভগবান্ জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান একাধারে উভয়ই। প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া পরিণাম লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবৎ-সামর্থ্য অচিন্ত্য—তিনি জগৎ প্রসব করিয়াও নির্বিকারভাবেই বর্তমান থাকেন।

ষাড়্গুণ্যযুক্ত অথচ শক্তি হইতে পৃথগ্‌ভূত ভগবানই বাসুদেব। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদি তিনটি ব্যূহের ক্রমশঃ আবির্ভাব হয়। একটি প্রদীপ হইতে অপর একটি প্রদীপ যে প্রকারে প্রজ্বলিত হয়, একটি ব্যূহ হইতে অপর একটি ব্যূহও সেই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বল সঙ্কর্ষণে, ঐশ্বর্য ও বীর্য প্রদ্যুম্নে, শক্তি ও তেজঃ অনিরুদ্ধে প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গুণ গৌণভাবে থাকে। সঙ্কর্ষণ হইতে অনিরুদ্ধ পর্যন্ত ব্যূহের আবির্ভাবকালকে শুদ্ধ সৃষ্টির কাল বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

সঙ্কর্ষণ হইতে সমস্ত বিশ্ব প্রকটিত হয়। ইনি অনন্ত ভুবনসমূহের আধার বলদেবের স্বরূপ। প্রদ্যুম্ন হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ অভিব্যক্ত হয়। সমষ্টি পুরুষ, মূলা প্রকৃতি এবং সূক্ষ্ম কাল এই ব্যূহ হইতেই প্রকাশিত হয়। অনিরুদ্ধ হইতে বাহ্যজগৎ, স্থূল কাল এবং মিশ্র সৃষ্টি উদ্ভূত হয়। তিনি আপন শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ও তদন্তর্গত বিষয়রাজি নিয়মিত করেন।

ভগবানের পরমরূপের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী বা শ্রী। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' প্রভৃতি কোন কোন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে পরাশক্তির এই একরূপই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে শ্রী এবং ভূ এই দুই শক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। 'পরমেশ্বরসংহিতা' প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। 'বিহগেন্দ্রসংহিতা' প্রভৃতি সংহিতানুসারে শক্তি ত্রিবিধ—শ্রী, ভূ ও লীলা (বা নীলা)। শক্তিত্রয়বাদিগণ বলেন যে, 'শ্রী' কল্যাণবাচক এবং ইচ্ছাশক্তিস্বরূপা, 'ভূ' প্রভাবদ্যোতক ও ক্রিয়াশক্তিরূপা এবং 'লীলা' চন্দ্রসূর্যাগ্নিময়ী সাক্ষাৎ শক্তিরূপা।

ভারতবর্ষে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারিটি পৃথক্ ধারায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করিয়া আসিতেছে। চারিটি সম্প্রদায়ই পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে। প্রথমটি 'শ্রীসম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার আদি প্রবর্তক শ্রী বা লক্ষ্মী এবং দার্শনিক মত 'বিশিষ্টাদ্বৈত'। শ্রীরামানুজাচার্য ইহার প্রধান প্রচারক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়, সনকাদি প্রবর্তিত বলিয়া 'হংসসম্প্রদায়' নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত 'দ্বৈতাদ্বৈত' এবং ইহার প্রধান প্রচারক শ্রীনিম্বার্কাচার্য। তৃতীয়টি, ব্রহ্ম-প্রবর্তিত 'দ্বৈতমতাবলম্বী ব্রহ্মসম্প্রদায়'। শ্রীমন্মধ্বাচার্য এই মতের প্রধান আচার্য ছিলেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের নামান্তর 'রুদ্রসম্প্রদায়'। ইহার আদিগুরু 'রুদ্রদেব', সিদ্ধান্ত 'শুদ্ধাদ্বৈত' এবং প্রধান প্রচারক বিষ্ণুস্বামী, পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চৈতন্যদেবের নামানুসারে কোন স্বতন্ত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায় নাই। চৈতন্যানুবর্তী বৈষ্ণবসমাজকে বলা হয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়'। সাধারণতঃ মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে গণনা করা হইয়া থাকে। গুরুপরম্পরা আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপাদিত হয়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এবং সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী উভয়ে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মাধবাচার্যের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই। এমন কি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসনা-প্রণালী ও আদর্শগত ভেদও বহুপ্রকারে পরিলক্ষিত হয়।

গৌড়ীয় মতের মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র, শাক্ততন্ত্র এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনপ্রণালী হইতে বহু তত্ত্ব গৌড়ীয়গণ স্বকীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলভাবে গ্রহণ কবিয়াছেন। এই সমস্তই আগমের অন্তর্গত। সুতরাং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মূলে যে আগমের প্রাধান্য রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগম ও বেদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্বন্ধ কি সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া এ ক্ষেত্রে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গৌড়ীয় আচার্যগণ অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় আপন মতকে বৈদিক বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত বলিয়াই অনেক স্থলে প্রচার করিয়াছেন এবং উপনিষদ্ ও পুরাণাদি বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সহায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, স্মার্তগণ বৈষ্ণব মতকে শৈবমতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া সাধারণতঃ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে পাঞ্চরাত্র-মতভুক্ত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে পাঞ্চরাত্র বলিতে ভাগবত-সম্প্রদায়ও বুঝায় এবং ভাগবতসম্প্রদায় বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'শ্রী' ও 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায় শক্তি ও শক্তিমানকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'নিম্বার্ক' সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের উপাসক এবং বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ও তাই। শ্রীচৈতন্যদেব যদিও মাধ্বীয় গুরুর শিষ্য ছিলেন, তথাপি তিনি রাধাকৃষ্ণেরই প্রাধান্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রে সাধারণতঃ বিষ্ণু-লক্ষ্মীর উপাসনাই কীর্তিত হইয়াছে। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য কিংবা বৃন্দাবন-লীলার মহত্ত্ব যে একেবারেই নাই তাহা বলা যায় না। নারদ-পাঞ্চরাত্রে রাধার কথা পাওয়া যায়। যদিও ডাঃ ভাণ্ডারকর এবং ডঃ শ্রেডার নারদ-পাঞ্চরাত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের অভিমতে "উক্ত গ্রন্থ (নারদ-পাঞ্চরাত্র) যে অত্যন্ত অপ্রাচীন তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই।" চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা যে প্রাচীন ও প্রামানিক গ্রন্থ তাহা নিঃসংশয়। তাহাতেও বৃন্দাবন-তত্ত্বই প্রধানরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কাশী সংস্কৃত কলেজেব লাইব্রেরীতে সনৎকুমার সংহিতার যে পুঁথি আছে তাহা পাঞ্চরাত্রসংহিতা হইলেও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রতিপাদক। সুতরাং পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ে যে রাধাকৃষ্ণের স্থান নাই তাহা সর্বথা বলা যায় না। ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বিশ্বাস, 'প্রাচীনকালে ভাগবতসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের মহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত করিয়াছিলেন।'

নারদ-পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবাগম শাস্ত্র। পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবাগমে নারায়ণ বা বাসুদেবের ব্যূহমূর্তি উপাসনার নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রবিধি মতে বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অনন্যা ভক্তির উদয় হয়; এইজন্য ইহা 'ঐকান্তিক ধর্ম' নামেও অভিহিত। পাঞ্চরাত্র-প্রসিদ্ধ ঐকান্তিক ধর্মে শান্ত ও দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য। কালক্রমে এই ভাগবতধর্ম গীতায় এক অভিনব রূপ ধারণ করে। গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। জন্ম হইতেই মনুষ্য কর্মের অধীন। জল ছাড়া মাছ যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, কর্মহীন মানুষেরও তেমনি জগতে টিকিয়া থাকা অসম্ভব। অতএব কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু কৃত-কর্মের ফলাফলের বিষয়ে অভিলাষশূন্যচিত্ত হইতে হইবে। সমস্ত ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া নিঃস্পৃহ চিত্তে কর্ম করিবার উপদেশ গীতায় দিয়াছে যাহাতে শ্রীভগবানে কর্মার্পণ মানবের চিত্তে ভক্তিরূপে ফলিয়া উঠে।

অতএব গীতার প্রথম কথা 'কর্ম-শুদ্ধি', উহার ফল 'চিত্ত-শুদ্ধি'। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে জীব ও ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিলে জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভক্তির দ্বারা, সেবার দ্বাবা আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীকৃষ্ণে এই অনন্যা শরণাগতি গীতায ভক্তিধর্মের শেষ কথা। বৈষ্ণবাগম-আগত ঐকান্তিক ধর্মেব ভাব-রূপটি গীতায় মহত্তর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপটিই প্রকট হইয়া উঠিযাছে। শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জুন তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির মহিমা দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল ভয়ভীত চিত্তে প্রার্থনা জানাইযাছেন—

"অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা ভযেন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

(গীতা, ১১/৪৫)

অর্থাৎ হে দেব! তোমার যে রূপ দেখিলাম পূর্বে কখনও তাহা দর্শন করি নাই। তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনের ফলে আমার শরীর রোমাঞ্চিত, ভয়ে আমার মন ব্যাকুলিত। তোমার সৌম্যরূপ প্রদর্শন করিয়া আমার ব্যথিত চিত্তকে শান্ত কর।

এখানে পরম আত্মীয়-জ্ঞানে ভগবানের সহিত নিবিড প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সখ্য-ভাবের চরমোৎকর্ষতা স্ফূর্তি লাভ করে নাই। প্রেমভক্তি-পথের প্রধান অন্তরায হইয়াছে অর্জুনের ঐশ্বর্য-জ্ঞান।

ব্রজ-লীলাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণেব রসঘন মাধুর্যের অনবদ্য প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলার স্থল নিত্য বৃন্দাবনভূমি। তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তা হইতে নির্মিত ব্রজধাম। তাঁহাবই স্বরূপশক্তিরূপা যোগমায়ার দ্বারা ব্রজলীলা-রঙ্গভূমি রচিত। যোগমায়া-আবৃত এই চিন্ময় ভূমিতে নিতুই নব অভিনয়রঙ্গে ভক্তবাঞ্ছিত প্রেমরসের অফুরন্ত ধারা উৎসারিত। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মিশ্রণে গঠিত ব্রজধামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ভক্তিধর্মের এক নবাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান দিলেন বৃন্দাবনলীলা-কাব্যকার ঋষি বাদরায়ণ। দাক্ষিণাত্যে আলোয়ারবৃন্দের আচরিত ধর্মেও মধুর্য-বসের হিল্লোল-স্পর্শ আছে। পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-ধর্মে যে ভাব-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিলেন তাহাতেই বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য রসের চরমোৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাহার সূচনা, মহাপ্রভুর জীবনাচরণে ও দিব্যোন্মাদনায় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য রূপটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধ্য ও সাধনায় একমাত্র অবলম্বন ও লক্ষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্য ও দর্শন মূলতঃ এই রসতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিযাছে।

কার্য-কারণ-জ্ঞানরহিত ভীতি-বিহ্বল বিস্ময় হইতে মানবের আদিম অবস্থায় ধর্মের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়ে ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা। ইহারও অনেক পরে চিন্তা-প্রধান তত্ত্বের আবির্ভাব। ঈশ্বর, মানব ও জগৎ—পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিচার-বিশ্লেষণই উহার অঙ্গ। অতএব ধর্মের স্ফুরণ প্রথমে, এবং ধর্মের অনুবর্তনকারীরূপে দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব পরে। তাই ধর্মেতিহাসের ন্যায় ধর্মতত্ত্বেরও একটা ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, বেদবেদ্য পরমতত্ত্বের আলোচনায় নানা দার্শনিক মতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবিধ মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যুক্তি-বিচারের অবতারণার দ্বারা তথ্যপূর্ণ আলোচনা-ধারার সূত্রপাত করিলেন আচার্য শঙ্কর। বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রয়োগে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপনা করিলেন। নির্গুণ ব্রহ্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিযা আচর্য শঙ্কর মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন। মায়ার প্রভাবে জীব ও জগৎ নিত্য পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। অতএব জীব ও জগৎ সত্য নয়। আবার এই যে অবিরাম পরির্তনের ধারা, উহা অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত; অতএব মায়ার প্রভাবকে অস্বীকারও করা যায় না। তাই শঙ্করাচার্য সিদ্ধান্ত করিলেন—মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, উহা অনির্বচনীয়। কিন্তু একমাত্র সত্যস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মের অতিরিক্ত এই মায়ার পৃথক্ অস্তিত্বের স্বীকৃতি সাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। আচার্য শঙ্কর এ-প্রশ্নের প্রত্যক্ষ সমাধান না করিয়া মায়াকে অনির্বচনীয় আখ্যা দিয়া দার্শনিক জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাই অপরাপর বৈদান্তিকগণের অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীগণের মতে "জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস"। আচার্য শঙ্কর প্রদর্শিত কেবল-জ্ঞানের অনুশীলনে 'আমি ইহা নহি, ইহা নহি'—এইরূপ 'নেতি নেতি' দ্বারা সর্ব বিষয় পরিহার করিয়া বিমুক্ত অবস্থায় জীব বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। তত্ত্বতঃ এরূপ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান উপাস্য-উপাসকের ভাবের বিরোধিতা ঘটায়। ভগবনের সহিত প্রেমনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া মধুর রস আস্বাদন করিবার যে নিগূঢ় অভিলাষ ভক্ত-হৃদয়ে জাগরুক থাকে, শুষ্ক জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে উহার অবকাশ কোথায়? তাই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণ আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ নিরসন করতঃ নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়া কালক্রমে চারিটি প্রস্থান গড়িয়া তোলেন। তাঁহারা শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত রামানুজাচার্য তাঁহার রচিত 'শ্রীভাষ্য', 'বেদান্তসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া

নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে জীব ও মায়া—এই দুইটি ঈশ্বরের আশ্রিত হইয়াও ঈশ্বর স্বরূপের অতিরিক্ত। ইহাই রামানুজ প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মধ্বাচার্য, অপর নাম আনন্দতীর্থ, তাঁহার 'সূত্র ভাষ্য', 'অনুভাষ্য' ও তত্ত্বসংখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতমত স্থাপন করেন। ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন—ইহাই তাঁহার অভিমত।

রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বামী। 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচারের দ্বারা বল্লভাচার্যই প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁহার মতে পাশবদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইলে শুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত জীব ও ব্রহ্ম অভেদাত্মক হইয়া যায়।

নিম্বার্কাচার্য হইতে যে সম্প্রদায়ের সূত্রপাত, উহাই সনক-সম্প্রদায় নামে অভিহিত। নিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্তগ্রন্থে তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রবর্তন করেন। এই মতে চিৎ-স্বরূপা জীব ও অচিৎ-রূপা জগৎ—উভয়ই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

রামানুজ ও মধ্বাচার্য চতুর্ভুজ নারায়ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু বল্লভাচার্য ও নিম্বাকাচার্যের মতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শেষোক্ত মতকেই গ্রহণ করিযাছেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মের পূর্ণতম প্রকাশ—"কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান।" চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের এক বিশেষ অভিব্যক্তিমাত্র।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্বালোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয় বৃন্দাবনে ষট্ গোস্বামীদের মধ্যে সনাতন, রূপ এবং বিশেষ করিয়া জীব গোস্বামীর দ্বারা। জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্ প্রবন্ধে পরতত্ত্ব কি—উহার সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধই বা কিরূপ, ভক্তির স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত কবিয়াছেন। তাঁহার বচনাবলী সুগভীর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনবাসী পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার পূর্বসূরী বৈষ্ণব গোস্বামীদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-রত্নরাজি আহরণ করিয়া মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় ভক্তিধর্মের তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতত্ত্ব। জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি, মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। জগৎ মায়াশক্তিরই পরিণাম। অতএব জীব ও জগৎ পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ। জীব ও জগৎ তাঁহাতেই বিধৃত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার বহির্ভূত কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা নাই। অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে জীব ও জগতের সহিত পরব্রহ্মের অভেদত্ব স্বীকৃত। অদ্বয় ব্রহ্মবাদীর সহিত গৌড়ীয় মতের এই অংশে মিল থাকিলেও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। আচার্য শঙ্কর একমাত্র ব্রহ্মকেই

পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আর সব কিছুকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের সিদ্ধান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যেমন সত্য, তাঁহার শক্তিসম্ভূত জীব ও জগৎ তেমনি সত্য। শঙ্করাচার্য মায়াকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া উহাকে 'অনির্বচনীয়' আখ্যা দিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মায়াকে শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তিরূপে তাঁহারই শক্তি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সূর্য ও উহার কিরণমালার যে সম্বন্ধ চিৎ-স্বরূপ পরমব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রকাশরূপী জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়া শক্তির সেই সম্বন্ধ—পরব্রহ্মের সহিত উহাদের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি—এই তিন শক্তি স্বীকৃত। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির অধীন; যেমন, পাটরানী ও চাকরাণী। দুজনেই রানী তথাপি পাটরানী রাজার অন্তরঙ্গা সঙ্গী আর চাকরাণী বহির্মহলে থাকিয়া পাটরাণীর আদেশ পালন করে, সেইরূপ অন্তরঙ্গার সহিত বহিরঙ্গা শক্তির সম্বন্ধ। অন্যদিকে যেমন সূর্য ও সূর্য-কিরণে গুণগত অভেদ, আবার কিরণমালার সমষ্টি সূর্য নহে, সূর্য তদ্-অতিরিক্ত। অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদও রহিয়াছে। সেইরূপ জীব ও পরব্রহ্মের সহিত শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক। ভেদ ও অভেদের ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম কিরূপে একত্রে থাকিতে পারে, তাহা চিন্তার অনধিগম্য। আগমমতে একমাত্র পরব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলেই উহা সম্ভব। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বাতন্ত্র্যশক্তির অসাধারণত্ব মানবের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। তাই জীবগোস্বামী ঐরূপ সম্বন্ধকে অচিন্ত্য আখ্যা দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নামক দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জীব বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যভেদে তিন প্রকার। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির তটে অর্থাৎ উভয় শক্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া জীবের সহিত ভগবানের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, চৈতন্যময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই একই সম্বন্ধ। স্বয়ম্ভূ, স্বয়ং-প্রকাশ, সর্বব্যাপক ভূমা পরমাত্মার অণু-অংশ এই জীবাত্মা। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গে যেমন গুণগত অভেদ, সেইরূপ চিদ্ধর্মে জীব ও পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভেদ। আবার অণু-অংশ বিধায় জীব ও পরব্রহ্মে অংশাংশি-সম্বন্ধ। অংশ কখন অংশীর সমান হইতে পারে না। এই হেতু জীব পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে তাই "জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস।" সেবকরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবের পরম গতি। এই সেব্য-সেবক ভাবই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পূর্বোদ্ধৃত চারিটি বৈষ্ণব-বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্যগণ নিজ নিজ মতানুসারে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধের কথাই শুধু আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগণ তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধের আলোচনার অতিরিক্ত এক অভিনব তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মের পূর্ণতম প্রকাশ এবং একাধারে পূর্ণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত। ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ সত্তা হইতে গঠিত এবং তাঁহারই স্বরূপশক্তি যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত চিন্ময় গোলোকধামে তাঁহারই আনন্দাংশে উদ্ভূত হ্লাদিনীশক্তির সহিত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস এবং এই বিলাস-বৈচিত্র্য হইতে উদ্ভূত রসোল্লাসের আস্বাদনের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ এক অপরিজ্ঞাত তথ্যের রহস্যোন্মোচন ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক অবিস্মরণীয় অবদান। অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির নির্যাসরূপে মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধাকে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা বা আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। শ্রীরাধা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিই গৌডীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপই শক্তি ও শক্তিমানের সামরস্য জনিত অভেদাত্মক পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বিকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল প্রোথিত শ্রীমদ্ভাগবতে। ভাগবতে শ্রীরাধার উল্লেখ স্পষ্টভাবে কোথাও দৃষ্ট হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার উল্লেখ থাকিলেও উহার ভাবমূর্তি কাব্য-সাহিত্যের অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ধর্মের প্রাণকেন্দ্ররূপে ভক্ত-হৃদয়ে প্রথম স্ফুরিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার রাধা-ভাববিলসিত জীবনাচরণের মধ্য দিয়া প্রথম শ্রীরাধাকে ভক্তিধর্মের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। হ্লাদিনীর সার মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীবৃন্দের সহিত ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসকে অবলম্বন করিয়া মধুর রসের স্ফুরণ প্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কান্তাভাবে ভজনাই যে প্রেমভক্তির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সাধনা, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ব্রজলীলার সহায়করূপে শ্রীকৃষ্ণেরই বিশুদ্ধ সত্তা হইতে উৎপন্ন ব্রজের নিত্যপরিকরবৃন্দকে আশ্রয় করিয়া মধুর রসের চর্চা ছাড়া আরও চারিটি রসের অনুশীলনের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বলা হইয়াছে। উহারা যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থলে তটস্থারূপে বিরাজ করে চিৎ-কণ-রূপী জীব। কিন্তু জীব অনাদি বহির্মুখী বৃত্তি বশতঃ বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কবলিত হইয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। আবার জীব যখন অন্তর্মুখী হয়, তখন মায়ার প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিমণ্ডলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। মর্তবাসী জীবের সহিত গোলোকধামের সংযোগ সাধিত হয় মঞ্জরীরূপ বৈষ্ণব গুরুর মাধ্যমে। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পঞ্চভাবের যে কোন একটি ভাবকে অবলম্বন করিয়া গুরুর আনুগত্যে রসঘন

শ্রীগোবিন্দের ভজনাই জীবের ভগবৎ-সেবারূপ ভক্তিধর্মের মর্ম কথা। কান্তাভাবে ভজনা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে স্বীকৃত হইলেও উহা অপেক্ষা দাস্যভাবে ভজনাই মর্তবাসী জীবের পক্ষে যে প্রশস্ততর পন্থা, তাহাই এই ধর্মে বিশেষভাবে নির্দেশিত হইয়াছে।

"পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের উল্লেখ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই। এই রাগমার্গে ভজনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরাধিকার ও ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে এক নূতন সংযোজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিধর্মে ভাববন্যার প্লাবন আনিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী ষট্ গোস্বামী তাঁহাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণ পদাবলী রচনা করিয়া উহাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছেন। এইরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া ভক্তিধর্মের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের ইতিবৃত্ত ও সিদ্ধান্ত

আলোয়ার

প্রাচীনকালে দক্ষিণদেশে এক জাতীয় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বলিত। তামিল ভাষায় 'আলোয়ারে'র অর্থ হইল, যে মহাত্মা ঈশ্বরীয় জ্ঞান এবং ঈশ্বরীয় প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করিয়া নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তিনিই আলোয়ার। এইরূপ বারো জন আলোয়ারের সন্ধান ও পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইঁহারা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তামিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জন্মস্থান এবং কর্মক্ষেত্র বর্তমান মাদ্রাজ নগরের দক্ষিণভাগ কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরম্ হইতে সুদূর তিন্নেবলী এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ক্বিলন বন্দরগাহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহাদের কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ক্রম ছিল না। ইঁহারা বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী হইলেও ইঁহাদের আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি প্রায় একই প্রকার ছিল এবং একই ভক্তি-ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া তামিল ভাষায় পদ রচনা করিয়া ভক্তিপূর্ণভাবে সেই পদ গাহিয়া ভগবদারাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মবিকাশের ধারায় আলোয়ারদের অবদান অসীম মহত্ত্বপূর্ণ। একপ্রকার ইঁহারাই সর্বপ্রথম ভক্তিধর্মের এমন এক বিশিষ্ট রূপ দান করিলেন যাহা পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্মের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (দ্রঃ-ডঃ ভাণ্ডারকর : Vaisnavism, Saibaism and minor Religious systems)। পরবর্তীকালে আচার্য নাথমুনি, যিনি ৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, আলোয়ারদের রচিত চারি সহস্র পদ সংগ্রহ করেন। কথিত আছে, আরও পরবর্তীকালে রামানুজাচার্য তাঁহার শিষ্য পিল্লনকে নম্ম অর্থাৎ শতকোপ আলোয়ারের সহস্র পদের উপর টীকা রচনার ভার অর্পণ করেন। টীকা রচনাব কালে পিল্লন একটি সংস্কৃত শ্লোকে সমস্ত আলোয়ারদের নাম উল্লেখ করিয়া বন্দনা করেন। শ্লোকটি এইরূপ—

"ভূতম্ সরশ্চ মহদাহ্বয় ভট্টনাথ,
শ্রী ভক্তিসার কুলশেখর যোগিবাহন্।
ভক্তাংঘ্রিরেণু পরকাল যতীন্দুমিশ্রান্
শ্রীমৎপরাঙ্কুশ মুনিম্ প্রণতোঽস্মিনিত্যম্।।

(See, Dr. Krishna Swami Ayangar: Early History of Vaisnavism in South India, P 19, পদটিপ্পনী)

শ্লোকে উদ্ধৃত আলোয়ারদের নাম যথাক্রমে ভূতত্তার অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ভূতযোগী, সরযোগী, মহদ্‌যোগী, ভট্টনাথ বা বিষ্ণুচিত্ত, ভক্তিসার, কুলশেখর, যোগিবাহ, ভক্তাংঘ্রিরেণু, পরকাল, যতীন্দ্র মিশ্র বা মধুরকবি এবং পরাঙ্কুশ মুনি বা নম্ম বা শতকোপ আলোয়ার। এখানে এগার জন আলোযারের নাম পাওয়া যাইতেছে। অন্য এক আলোযার আণ্ডাল বা গোদার (বিষ্ণুচিত্তের কন্যা) নাম ইহাতে যুক্ত হয় নাই।

শ্লোকে উদ্ধৃত আলোয়ারদের নাম ক্রম পরম্পরা অনুসারে সজ্জিত নহে বলিয়াই সাধারণ বিশ্বাস। ডঃ ভাণ্ডারকর তাঁহার 'Vaisnavism, Saivaism and minor Religious systems' গ্রন্থে বারজন আলোয়ারদের আবির্ভাব-কালকে প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও অন্তিম—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করিযাছেন। ডঃ ভাণ্ডারকরের মতানুসারে নিম্নে আলোয়ারদের শ্রেণী বিভাগ করা হইল। অতি প্রাচীন সময়ে যে চারজন জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম এইরূপঃ

তামিল নাম		সংস্কৃত নাম
১। প্পায়গয়ী	আলোয়ার	১। সরযোগী
২। ভূতত্তার	,,	২। ভূতযোগী
৩। পে	,,	৩। মহদ্‌যোগী
৪। তিরুমলিসই	,,	৪। ভক্তিসার

মধ্যযুগে পাঁচ জন সিদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

তামিল নাম		সংস্কৃত নাম
৫। নম্ম	আলোয়ার	৫। শতকোপ
৬। মধুরকবি	,,	৬। মধুরকবি
৭। কুলশেখর	,,	৭। কুলশেখর
৮। পেরী	,,	৮। বিষ্ণুচিত্ত
৯। আণ্ডাল বা গোদা	,,	৯। গোদা

অন্তিমকালে বাকী তিনজনের নাম যথাক্রমে—

১০। তোডর ডিপ্পোডী	আলোয়ার	১০। ভক্তাংঘ্রিরেণু
১১। তিরুপ্পন	,,	১১। যোগিবাহ
১২। তিরুমংগই	,,	১২। পরকাল

(১)

প্রাচীন আলোয়ারদের আবির্ভাব রহস্যাচ্ছন্ন। ডঃ আয়েঙ্গার তামিল ভাষায়

রচিত একটি 'পিঙ্গল' অর্থাৎ ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত প্বায়গোয়র নামক কবির পদসমূহ বিচার করিয়া ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে এই প্বায়গোয়র প্বায়গই আলোয়ার বা সরযোগী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, যিনি জীবিতকালেই দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। প্রসিদ্ধি আছে যে প্বায়গই বা সরযোগী কাঞ্চী নগরে অবস্থিত বিষ্ণু মন্দিরের নিকটবর্তী কোন এক পুষ্করিণীতে প্রস্ফুটিত কমলফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পে আলোয়ার বা মহদ্‌যোগীর জন্মও ঐ প্রকার মাইলাপুরের এক কূপের মধ্যে লাল কমল হইতে সরযোগীর জন্মের পরদিনই হইয়াছিল—এইরূপ প্রচলিত আছে। মাইলাপুর হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণদিকে অবস্থিত মহাবলিপুরম্‌-এর আশে পাশে কোন এক পুষ্প হইতে ভূতত্তার বা ভূতযোগী আলোযারের প্রকট হইবার কাহিনীও প্রসিদ্ধ। প্রচলিত কাহিনীসমূহ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত তিনজন আলোয়ার সমসাময়িক কালের ছিলেন। তিরুমলিসই বা ভক্তিসার আলোয়ারের জন্মবিবরণও ঐরূপ বিচিত্র। পূর্ববর্তী তিন আলোযারের জন্মের তিন মাস পরে তিনি পূনমল্লীর নিকটবর্তী স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(২)

প্রাচীন শ্রেণীর আলোয়ারদের পর যে সমস্ত আলোয়ারদের মধ্যবর্তী শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, ক্রম অনুসারে নম্ম বা শতকোপ আলোয়ারের নাম সর্বপ্রথম। বারজন আলোয়ারের মধ্যে শতকোপই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধেই সমধিক আলোচনা হইয়াছে, তথাপি ইঁহার আবির্ভাব কাল আজও পর্যন্ত সঠিক নির্ণীত হয় নাই। ডঃ আয়েঙ্গারের মতে ইঁহার জন্মসময় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইবে। জনশ্রুতি অনুসারে ইঁহার জন্ম তিন্নেবলী জিলার অন্তর্গত কুরুকাকপা নামক নগরে এক শূদ্রকুলে হইয়াছিল। কাশী সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে রামানুজীয় গুরুপরম্পরা নামক একখানি হস্তলিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। উহাতে শ্রীনিবাসরচিত দিব্যসূরিচরিত্র নামক গ্রন্থ হইতে শতকোপের জন্ম এবং পূর্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে আছে যে, পূর্ব সমুদ্রের পশ্চিম তটে পাণ্ড্যবংশীয় রাজার রাজ্য মধ্যে কুরুকাকপা নামে এক নগরী ছিল। ঐ নগরে পল্লী নামক একজন শূদ্র বাস করিত। শতকোপ তাহারই বংশধর। পল্লীর পুত্র ধর্মধর, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রত্নদাস; রত্নদাসের পুত্র পাটললোচন, তৎপুত্র পার্কারি, পার্কারির পুত্র কারি। শতকোপ এই কারির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজকৃত 'দিব্যসূরিপ্রভাবদীপিকাতে'ও শতকোপ সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কারির পুত্র ছিল বলিয়া বহু গ্রন্থে ইঁহাকে কারিসূনু বলিয়া

অভিহিত হইতে দেখা যায়। পরাঙ্কুশ, শঠারি প্রভৃতি নামেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। প্রবাদ এই যে জন্মাবধি ইনি কখনও ভোজন অথবা ক্রন্দন করেন নাই। অল্প বয়সেই পিতামাতা ইঁহাকে এক শূন্য মন্দিরে ত্যাগ করিয়া যান। সেখানে মন্দির-সন্নিহিত একটি তেঁতুল বৃক্ষের নীচে ইনি ষোড়শ বৎসর যাবৎ অখণ্ড যোগমুদ্রায় আসীন ছিলেন, পরে ক্রমশঃ ঐশ্বরিক কৃপা লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

নম্ম আলোয়ার বা শতকোপ বা পরাঙ্কুশের এক শিষ্য মধুরকবি আলোয়ার নামে প্রসিদ্ধ। তৃণবল্লী জিলার অন্তর্গত তিরোক্কুলুর নামক গ্রামে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শতকোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা সম্বন্ধে এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হইল এই যে, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মধুরকবি আপন অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া তীর্থযাত্রাব্যপদেশে অযোধ্যায় গমন করেন। কথিত আছে, একদিন সায়ংকালে সেখান হইতে স্বদেশের দিকে নিরীক্ষণ করিতেই একটি বিরাট জ্যোতিঃস্তম্ভ তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। উহার অনুসরণ করিয়া আসিতে আসিতে তিনি পূর্বোক্ত তেঁতুল গাছের নীচে সমাসীন শতকোপের দর্শন লাভ করেন এবং যথাসময়ে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শতকোপের যাবতীয় তত্ত্বোপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন—এই লিপিবদ্ধ তত্ত্বোপদেশগুলির নাম 'তিরুবায়মোলি' অথবা মুখনিঃসৃত বাণী। এইগুলি দক্ষিণদেশে 'দ্রবিড়বেদ' বা 'তামিলবেদ' নামে প্রসিদ্ধ। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "শতকোপ বা পরাঙ্কুশপ্রোক্ত চতুঃসহস্র সংখ্যক প্রবন্ধচতুষ্টয় দ্রবিড়বেদ নামে বিখ্যাত। এতৎসম্বন্ধে পরকাল নামক সিদ্ধ আলোয়ার যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই দ্রবিড় বেদের ষড়ঙ্গ বলিয়া পরিচিত। অন্যান্য সূরিদিগের বিরচিত চতুর্দশটি প্রবন্ধ উহার উপাঙ্গভূত। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই দ্রবিড় বেদ সম্বন্ধেই নিম্নলিখিত উক্তিটি পাওয়া যায়—'সংস্কৃতশ্রুতয়ো যদ্বদ্দ্রাবিড়শ্রুতয়স্তথা। নিত্যাস্তদ্বৎ প্রণীয়ন্তে মুনিভিশ্চ কলৌ যুগে॥' এই প্রবন্ধ চতুষ্টয়কে বেদ বলিবার তাৎপর্য এই যে, এগুলি অপৌরুষেয় রচনা, শতকোপ ইহাদের রচয়িতা নহেন। আর্যজ্ঞান এবং দিব্যজ্ঞান—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই অলৌকিক বটে। কিন্তু আর্যজ্ঞানে বক্তার দোষ, ভ্রমপ্রমাদাদি থাকিবার সম্ভাবনা আছে, দিব্যজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ। ইহার কারণ এই যে, আর্যজ্ঞান যোগ হইতে অভিব্যক্ত হয়, দৃষ্টান্ত পরাশর। দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য যোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত কোন প্রকার চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা নাই। ইহা অহেতুক ভগবৎপ্রসাদ হইতে আবির্ভূত, দৃষ্টান্ত শতকোপ। দিব্যজ্ঞানের মাহাত্ম্য যে যোগজজ্ঞান অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য।" (দ্রঃ ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃঃ ২০)।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, মধুরকবি আলোয়ার মাত্র দশটি পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই দশটি পদই গুরুর বন্দনামূলক।

মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্গত তৃতীয় আলোয়ারের নাম কুলশেখর যিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। ডঃ আয়েঙ্গার ইঁহার আবির্ভাবকালও খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। (See, Early History of Vaisnavism in South India, P. 37)। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত 'কোল্লী' অথবা ''ক্লিলন' নামক গ্রামে রাজবংশে তাঁহার জন্ম। কুলশেখর বাল্যকালে সংস্কৃত এবং তামিল ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কিছুকাল রাজ্য শাসন করিবার পর তাঁহার মন উচাটন হইয়া উঠে। তিনি একদিন সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে ভগবন্ রঙ্গনাথজীর শরণাগত হইয়া অবস্থান করেন এবং সেখানে থাকিবার কালে সংস্কৃতে 'মুকুন্দমালা' নামক একটি গ্রন্থ এবং তামিল ভাষায় পদ রচনা করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি রঙ্গনাথজীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেখান হইতে কাঞ্চী, তিরুপতি ধাম ও অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া অবশেষে আরকট জিলার কোন এক নগরে আসিয়া অবস্থান করেন এবং সেখানে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পদগুলির মধ্যে দাস্যভাবমূলক পদগুলিই বিশেষরূপে উল্লেখনীয়।

মধ্যবর্তী শ্রেণীর বাকী দুই আলোয়ার পেরী বা বিষ্ণুচিত্ত এবং আণ্ডাল বা গোদা নামে প্রসিদ্ধ। আণ্ডাল পেরীর পালিতা কন্যা। ডঃ আয়েঙ্গার বিচারপূর্বক উহাদের কাল নির্ণয় করিয়াছেন খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে। পেরী আলোয়ার জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার জন্ম মাদুরা জেলার শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক এক গ্রামে হইয়াছিল। তিনি স্থানীয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বাল মুকুন্দের উপাসনা করিতেন। কথিত আছে যে একদিন রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্নে আদেন দেন যে সে যেন মদুরায় পাণ্ড্যবংশীয় রাজা বল্লভদেবের দরবারে যাইয়া শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করে। যদিও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অল্প ছিল, তথাপি ঠাকুরের আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তথায় যান এবং ঠাকুরের অনুগ্রহে তিনি সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতবর্গকে তর্কে পরাভূত করেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা দ্রব্যাদি উপঢৌকন দেন এবং তাঁহাকে 'ভট্টনাথ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অপার করুণা মনে করিয়া তিনি প্রাপ্ত ধনাদি ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গ করেন এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রেমে মগ্ন হইয়া 'তিরুপল্লাঁড়ু' নামক বিষ্ণুর এক প্রসিদ্ধ স্তুতি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণনা করিয়া অনেক পদ রচনা করেন যাহা

'তিরুমোলী'-পদাবলী নামে পরিচিত। পেরীর রচিত পদাবলীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তাঁহার বাৎসল্য রসাশ্রিত পদগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

আণ্ডাল বা গোদা আলোয়ারের জন্ম রহস্যাবৃত। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে একদিন পেরী আলোয়ার তাঁহার ফুলবাগিচায় একটি তুলসী গাছের নীচে আণ্ডালকে কুড়াইয়া পান এবং তদবধি তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় লালন-পালন করেন। রাজস্থানের প্রসিদ্ধ সাধিকা মীবাবাঈ-এর জীবনধর্মেব সহিত আণ্ডালের জীবনধর্মের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পিতার সহিত একত্রে বাল-মুকুন্দের সেবা করিতে করিতে ও পদ গাহিয়া স্তুতি করিতে করিতে আণ্ডালের বালিকা-হৃদয়ে ভক্তির প্রভাব পড়ে। কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া ভক্তিভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিশেষে উহা প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমে পরিণতি লাভ করে। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেমভাবের এমনই সঞ্চার হইয়াছিল যে তিনি নিজেকে কৃষ্ণপ্রেমী কোন গোপীর সমতুল ভাবিতে লাগিলেন। বিবাহযোগ্যা হইলে তিনি গুরুজনদের স্পষ্টই জানাইযা দেন যে শ্রীরঙ্গমের ভগবান শ্রী রঙ্গনাথজী ব্যতীত অন্য কাহাকেও জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন না। পেরী আলোয়ারও ঐরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ায় তিনি আণ্ডালকে সঙ্গে করিযা শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসেন এবং আণ্ডালকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত আণ্ডাল মন্দিরের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যান। মীরাবাঈ-এর সাধন-সঙ্গীতগুলির ন্যায় আণ্ডালের রচিত পদগুলিও প্রেমভাবে পূর্ণ। মীবার ভজনের ন্যায় তাঁহার পদগুলিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

(৩)

আণ্ডালের সময়কাল হইতে প্রায় একশত বৎসর পরে তৃতীয় অর্থাৎ অন্তিম শ্রেণীব আলোয়ারদের যুগ আরম্ভ হয়। অন্তিম শ্রেণীব আলোযারগণ সংখ্যায় মাত্র তিনজন। এই শ্রেণীর প্রথম আলোয়ার তোডরডিপ্পোডী অর্থাৎ ভক্তাংঘ্রিরেণু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মাণ্ডাগুডী নামক এক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তাঁহার গার্হস্থ্য নাম বিপ্রনারায়ণ। তাঁহার মাত্র দুইটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইটি রচনায় বিষ্ণু-ভক্তির সমর্থনের সাথে সাথে বৌদ্ধ, জৈন ও শৈবধর্মের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর দ্বিতীয় আলোয়ার তিরুপ্পন বা যোগিবাহন সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ত্রিচিন্নাপল্লী জেলার উরৈপুর বা বোরীডর নামক গ্রামের এক ধানজমিতে একজন পারিয়া বা চণ্ডাল জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর নিঃসন্তান ব্যক্তি

তাঁহাকে কুড়াইয়া পায়। নিম্ন শ্রেণীর সমাজে লালিত-পালিত হওয়ায় হীন জাতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ভক্তির ভাব অঙ্কুরিত হয়। অস্পৃশ্যতার দরুণ শ্রীরঙ্গমের দ্বীপে অবস্থিত রঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার তাঁহার ছিল না। তাই তিনি প্রত্যহ প্রাতে কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া উহার তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভগবানের স্তব-স্তুতি করিতেন। স্তব-স্তুতি করিতে করিতে মাঝে মাঝে এমন আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন যে বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। একদিন যখন এইরূপ ভজনে তন্ময় হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, তখন ভগবন্ রঙ্গনাথের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য মন্দিরের পূজারী মহামুনি লোকসংজ্ঞা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রেমভাবে মগ্ন তিরুপ্পন বা যোগিবাহন পথরুদ্ধ করিয়া এমনভাবে পড়িয়া আছে যে তাঁহার স্পর্শ বাঁচাইয়া জল আনা অসম্ভব। পূজারী তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু কোন কথাই তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তখন পূজারী তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। পাথরের আঘাতে সচকিত ও লজ্জিত যোগিবাহন বিনম্রভাবে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ান। মহামুনি জল লইয়া আসিলে শ্রীরঙ্গনাথজী তাহা গ্রহণ করিলেন না। দৈববাণী হইল, 'যাহাকে অপবিত্র স্থানে আঘাত করিয়াছ, সেই তিরুপ্পনকে তুমি শীঘ্র স্কন্ধে বহন করিয়া আনো'। দৈববাণী শুনিয়া মহামুনি তিরুপ্পনকে স্কন্ধে বহন করিয়া মন্দিরে আনিলেন। ইহাতে তিরুপ্পন ভক্তিতে আরও বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং শ্রীরঙ্গনাথজীর উদ্দেশ্যে কয়েকটি ভক্তিপূর্ণ পদ রচনা করেন। (দ্রষ্টব্য—Contributions of Southern India to Indian Culture, by S. K Aiyangar, PP. 267–268)

তিরুমংগই বা পরকাল আলোয়ারদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর অপরার্দ্ধ হইতে নবম শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্ধারিত হয়। তাঞ্জোর জিলার তিরুক্কুরিমালুর নামক নগরে কোন এক শূদ্র কুলে ইঁহার জন্ম। বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল নীল। ইঁহার পিতা তৎকালীন চোলরাজার সেনাপতি ছিলেন। যথাসময়ে ইনিও মহারাজার সেনাপতি পদে বৃত হন। ইনি সেনাপতি হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, দেশের শাসনভার অধিকাব করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে মহারাজা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। ফলে ইনি সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং লুট-তরাজকেই জীবিকার্জনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন। কথিত আছে, কুমুদবল্লী নামক এক অপূর্ব সুন্দরী-কন্যাকে ইনি বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কন্যা একটি শর্তে তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন। সেই শর্ত হইল, তিরুমংগই এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন ১০০৮ জন বৈষ্ণবকে ভোজন

করাইবেন। তিরুমংগাই সেই শর্ত পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি আরও নৃশংস হইয়া উঠিলেন। এইরূপ নৃশংসতার মাঝে একদিন তিনি ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণকে পাকড়াইয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব লুঠ করেন। লুণ্ঠনের ফলে অগাধ ধনরাশি পাইলেন, কিন্তু তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা তাঁহার লুপ্ত হইল। এইরূপ সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন তিনি কখনও হন নাই। বিভ্রান্ত ও ভীত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহাব জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ তীর্থ ভ্রমণকালে একবার তিনি সিদ্ধালী বা শিয়ালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার প্রসিদ্ধ শৈব-পণ্ডিত সম্বন্ধরকে শাস্ত্রালোচনায় পরাস্ত করিয়া 'পরকাল' অর্থাৎ 'বিরোধীদের বিনাশক' উপাধি প্রাপ্ত হন।

পরকাল-রচিত ১১০২টি পদ পাওয়া গিয়াছে। পদের সংখ্যার বিচারে শতকোপের পরই তাঁহার স্থান। কিন্তু শতকোপের ন্যায় তাঁহার পদসমূহ প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আলোয়ারদের রচিত যে সমস্ত পদের সংখ্যা উল্লেখ করা হইল, সেই সমস্ত পদ 'নাডায়ির প্রবন্ধম্' নামক একটি প্রাচীন সংগৃহিত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। (দ্রষ্টব্য—J S. M Hupar, Hymns of the Ālowars, P. 13)

পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর আলোয়ারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় তাঁহাদের জীবন মহত্ত্বপূর্ণ ছিল। কেবল শেষ আলোয়ার পবকালের জীবন-চরিৎ উহাদের হইতে ভিন্ন। তাঁহার মধ্যে ঐকান্তিক ভক্তির বীজ রোপিত ছিল ঠিকই, কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কারজনিত ক্রূর মনোবৃত্তি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশকে বিলম্বিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসম্প্রদায়ঃ

নাথমুনি—পূর্বোক্ত দ্বাদশজন আলোযারের পর যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচাব-ভার গ্রহণ করেন তাঁহাবা 'আচার্য' নামে বিখ্যাত। আচার্যগণ পণ্ডিত ছিলেন এবং নানাপ্রকার বিচার করিয়া ভাগবতোক্ত ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। 'নাথমুনি'ই আচার্য পরম্পরার মধ্যে সর্বপ্রথম। ইঁহার অপর নাম রঙ্গনাথ আচার্য, কিন্তু নাথমুনি নামেই ইনি সমধিক পরিচিত। ইঁহার নিবাস গ্রাম বীরনারায়ণপুর। কথিত আছে, একদিন তিনি 'মানারগদি' বিষ্ণু মন্দিরে

দক্ষিণ হইতে আগত বৈষ্ণবদের মুখে তান লয় সহকারে তামিল ভাষায় দেবতার স্তুতি বন্দনা করিতে শুনিতে পান। স্তোত্রগুলির ভক্তিরসাপ্লুত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। প্রত্যেক স্তোত্র দশচরণ বিশিষ্ট। তিনি যাহা শুনিলেন তাহা শতকোপের রচিত সহস্রচরণ স্তোত্রের শেষ দশচরণ। নাথমুনি সেই সময় হইতে শতকোপের অন্যান্য স্তোত্রগুলির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে শতকোপের রচিত স্তোত্র-প্রবন্ধাবলীকে 'তিরুবায়মোলি' (Tiruvoymale) "Word of thc mouth" বলা হয়। শতকোপের মুখ দিয়া নিঃসৃত স্তোত্রগুলি ভগবদ্ বাক্য, সাধারণের এই বিশ্বাস। নাথমুনি হইতে আচার্যদিগের ধারা গণনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ শতকোপা হইতে আচার্যধারা গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শতকোপের বিদেহী আত্মা সমাধি অবস্থায় নাথমুনিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে নাথমুনি মধুরকবির শিষ্য পরাঙ্কুশপূর্ণের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, একান্তভাবে শতকোপের ধ্যান করিয়া নিয়মপূর্বক একাসনে তাঁহার প্রবন্ধ দ্বাদশসহস্রবার চিন্তা করিলে শতকোপ প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া তিনি যথানিয়মে উপাসনা করিলে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ মূর্তিতে শতকোপের দর্শন লাভ করেন। তখন তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শতকোপ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করেন, চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর তত্ত্বের রহস্য বুঝাইয়া দেন, যাবতীয় দর্শনসমূহের তাৎপর্য প্রদর্শন করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের গুহ্য রহস্য শিক্ষা দেন, এবং স্বপ্নযোগে নাথমুনির ভাবী গুরুমূর্তিও দেখাইয়া দেন।

নাথমুনি যে একজন বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। 'ন্যায়তত্ত্ব' ও 'যোগরহস্য' নামক দুইখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ন্যায়তত্ত্বে শতকোপার স্তোত্র-প্রবন্ধগুলির সার তত্ত্ব কি তাহার আলোচনা রহিয়াছে। নাথমুনি হইতেই এক হিসাবে বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন প্রণালীর সূত্রপাত ধরিয়া লওয়া যায়। নাথমুনির আট জন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে পুণ্ডরিকাখ্য তাঁহার স্থানে আচার্য পদে অভিষিক্ত হন, পুণ্ডরিকের পরবর্তী আচার্য রামমিশ্র।

যামুনাচার্য—নাথমুনির পুত্র ঈশ্বর মুনি। ঈশ্বরমুনির পুত্র যামুন মুনি মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য রামমিশ্রের উপদেশানুসারে ঈশ্বরমুনি পুত্র যামুনের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যে শিক্ষকের হস্তে যামুনের শিক্ষাভার প্রদান করা হয়, তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে মহাভাষ্যভট্ট বলা হইত, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের তেমন কোন খ্যাতি ছিল না। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে চোল রাজা 'রাজরাজ' প্রবল প্রতাপশালী নরপতি

ছিলেন। তিনি উত্তরদিকে উড়িষ্যা, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ ও রাষ্ট্রকুট রাজ্য নিজের অধীনে আনয়ন করেন এবং নিজে সম্রাট নামে অভিহিত হন। ৯৮৫ হইতে ১০১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। তাঁহার সভাপণ্ডিত আক্কি আল্‌বান্ সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে গণ্য ছিলেন। আক্কি আল্‌বান্ তাঁহার অপরাজেয়ত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর অন্যান্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও যামুনের গুরুর নিকট শুল্ক আদায়ের জন্য অনুচর আসে। গুরুকে এবিষযে কিছু না জানাইয়া যামুন আক্কি আলবানকে বিচারে আহ্বান করেন। মহাভাষ্যভট্ট ইহা জানিতে পারিযা ভয় ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়েন। যামুনের বযস তখন অল্প এবং অভিজ্ঞতাও কম, তথাপি যামুন গুরুকে অভয় দিয়া বিচারের জন্য রাজসভায় গমন করেন। আক্কি আলবানের পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল, এবং এযাবৎ কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচার করিতে সাহসী হয় নাই। আর এক যুবক তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে আসিতেছে এই খবরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাজাও উৎসুকনেত্রে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিচারে যামুনের জয় হইল। বিচারের বিষয় ছিল বেদান্ত। "Vaishnavite Reforms of India" গ্রন্থের বচয়িতা T. Rajagopalachariar এই বিচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"A Vedantic disputation commenced on which we are told Jamuna gained a complete victory and Akki Alwan had to accept the public defeat." রাজা যামুনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহাকে রাজ্যের এক অংশ দান করেন।

ইহার পর যামুন বিবাহ করেন। ক্রমে তাঁহার চার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি রাজদত্ত সম্পত্তি লাভ করিযা আত্মবিস্মৃত হইযা পড়েন এবং বিশাল প্রাসাদে অসংখ্য দাসদাসী দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐশ্বর্যমদে বিভোর হন। নাথমুনি যামুনকে ভবিষ্যৎ আচার্য মনোনয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। যাহাতে গুরুর অভিলাষ পূর্ণ হয়, সেইজন্য রাম মিশ্র যামুনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিযাছিলেন। কিন্তু যামুন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া মর্মবেদনায় কাল কাটাইতেছিলেন। বহু চেষ্টার পর তিনি যামুনের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন এবং তাঁহাকে বলেন, তাঁহার পিতামহ নাথমুনি তাঁহার জন্য অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি এ যাবৎ সেই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এখন তিনি তাহা যামুনের হস্তে অর্পণ করিতে চান। যামুন তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন রাম মিশ্র তাঁহাকে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া বলিলেন—এই বিগ্রহ সেই অমূল্য নিধি, যাহা নাথমুনি তাঁহার পৌত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণে ও বিগ্রহ দর্শনে যামুনের নিকট এক নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত

হইয়া গেল। তিনি এযাবৎ যে বিলাসিতার স্রোতে দেহ-মনকে ভাসাইয়া দিয়া অমূল্য জীবনের অপচয় করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতাপ-দগ্ধ-হৃদয়ে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও শ্রীরঙ্গম মন্দিরে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া কঠিন বৈরাগ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তদবধি শ্রীরঙ্গম বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থানে পরিণত হয়।

শতকোপা ও অন্যান্য আলোয়ারদের রচিত প্রবন্ধাবলির উপর নাথমুনি যে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, যামুনাচার্য বিবিধ গ্রন্থ রচনার দ্বারা তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী বলিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন মত। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ হইতেও ইহা প্রাচীন। এই বাদের প্রথম প্রবর্তক বৌধায়ন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের সর্বপ্রথম বৃত্তি রচনা করেন। আচার্য টঙ্ক ইহাব উপর ব্যাখ্যা লেখেন। তামিলদেশবাসী দ্রমিড়াচার্যও ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীবৎসাঙ্ক দ্রমিড ভাষ্যের এক বর্ত্তিকা লেখেন। যামুনাচার্যের পূর্বে গুহদেব নামক আরও একজন আচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত আচার্যদের কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। যামুনাচার্য সিদ্ধিত্রয় (আত্মসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি ও সম্বিৎসিদ্ধি), আগমপ্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, মহাপুরুষনির্ণয়, কাশ্মীরাগমপ্রামাণ্য, স্তোত্ররত্ন প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। রামানুজ বহুস্থানে যামুনাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—যামুনের বিদ্যাবৈভব ও প্রতিভার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

'সিদ্ধিত্রয়' গ্রন্থে যামুনাচার্য প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করিয়া শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ নিরসন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'আগমপ্রামাণ্য' গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুযায়ী যুক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাসকল খণ্ডন করিয়া পাঞ্চরাত্রসম্মত ভগবৎ ধর্ম যে ব্রহ্মসূত্র বিরোধী নহে তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল মত তাঁহার পরবর্তী আচার্য রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য টীকায় বিশদ ব্যাখা দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন।

· যামুনাচার্য রচিত অপর গ্রন্থ হইল 'গীতার্থ সারসংগ্রহ'। অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ৩০ (ত্রিশ) সংখ্যক শ্লোকে ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-তত্ত্বমূলক তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উত্তরকালে রামানুজ রচিত 'গীতাভাষ্য'তে ঐ সকল শ্লোকগুলিরই সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

তাঁহার অপর গ্রন্থ 'মহাপুরুষ নির্ণয়'। বর্তমানে এই গ্রন্থটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত শেষ গ্রন্থ 'স্তোত্ররত্নে' বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ৭৫টি স্তোত্র আছে।

টি. রাজাগোপালাচারিয়ার এই সকল স্তোত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন---

"Having regard to this work of Jamuna, we may say of him that he combined in himself the characteristics of a poet and a philosopher, in a more real sense than we can do so of any other sanskrit writer who claims such a distinction."

অনুমান ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে যামুনাচার্যের মৃত্যু হয়। তিনি অধিকাংশ সময়ই শ্রীরঙ্গমে সাধন-ভজন ও তাঁহার পাঞ্চরাত্রসম্মত বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রামানুজ: জীবনী[1] (১০১৭—১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)---মাদ্রাজ শহর হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে শ্রীপেরেমবুদুর নামক গ্রামে কেশব দীক্ষিত নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই সময়ে পরম বৈষ্ণব শ্রীশৈলপূর্ণ তিরুপতি-মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাব দুই ভগিনী ছিল, তন্মধ্যে একজনের নাম কান্তিমতী। কান্তিমতীর সহিত সদ্‌ব্রাহ্মণ কেশব দীক্ষিতের বিবাহ হয়। অনুমান ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে কান্তিমতীর গর্ভে বামানুজের জন্ম হয়। উপনয়নের পর, পণ্ডিত কেশব নিজেই রামানুজকে বেদ ও বেদাঙ্গ পড়াইতে লাগিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে রামানুজের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প কাল পরে তাঁহার পিতা কেশবের সহসা মৃত্যু ঘটে। মাতা কান্তিমতী পেরেমবুদুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া কাঞ্চীনগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যাদব প্রকাশ নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী কাঞ্চীনগরে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। 'প্রকাশ' উপনামটি দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে গোবর্ধন মঠের ব্রহ্মচারীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রামানুজ যাদব প্রকাশের নিকট উপনিষদ পড়িতে আবম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দ আসিয়া যাদব প্রকাশের টোলে ভর্তি হইলেন। গোবিন্দ রামানুজকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

যাদব প্রকাশ কাঞ্চীপুরে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রামানুজ উৎসাহের সহিত তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সযত্নে গুরুর সেবা করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষকের এই প্রীতির সম্পর্কে কালক্রমে এক মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল।

তৎকালে লোকসমাজে ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়ামি ছিল। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে দক্ষিণভারতে দ্বেষাদ্বেষীভাব তখন চরমে উঠিয়াছিল। রামানুজ যখন যাদবের

---

[1] দ্রষ্টব্যঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ কৃত রামানুজ চরিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

টোলে পড়িতেছিলেন, তখন কাঞ্চীতে শৈবগণ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী যাদব প্রকাশের অধীনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সেখানে বৈষ্ণবগণ সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতেন। আবার, শ্রীরঙ্গমে মহাপণ্ডিত ও ত্যাগী সিদ্ধপুরুষ যামুনাচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবগণ প্রতাপান্বিত ও শৈবগণ দুর্বল ছিলেন।

রামানুজ ছিলেন ভক্তিপ্রবণ ও বুদ্ধিমান, আর যাদব ছিলেন ভক্তিহীন ও তার্কিক। তাই তিনি রামানুজের ভগবদ্‌ভক্তি নিতান্ত বোকামি মনে করিতেন এবং তাহাকে শুষ্ক জ্ঞান বিচারের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ভক্তি ছাড়িয়া শাস্ত্রের কথা নিয়া কেবল চুল-চেরা বিচার রামানুজের মোটেই ভাল লাগিত না। ইহা ছাড়া, যাদবের উপনিষদের অনেক ব্যাখ্যাই রামানুজের মনঃপূত হইত না। ব্যাখ্যা লইয়া গুরু শিষ্যের মধ্যে কখন কখন বাদানুবাদ উপস্থিত হইত। একদিন রামানুজ যাদবের গায়ে তৈল মাখাইতেছিলেন, সেই সময়ে যাদব একটি শিষ্যকে উপনিষদের একটি বাক্য বুঝাইতেছিলেন। ঐ বাক্যে বলা হইয়াছে, নারায়ণের চোখ দুইটি পদ্মের ন্যায়, আর ঐ পদ্ম 'কপ্যাসে'র ন্যায়—

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" অর্থাৎ কপ্যাসং পুণ্ডরীকং যথা, তস্য অক্ষিণী। কপ্যাস অর্থাৎ লোহিতবর্ণ পদ্ম যেমন, সেইরূপ তাঁহার চক্ষু দুইটি। যাদব ইহার কদর্থ করিয়া বলিলেন, কপি+আস = কপ্যাস অর্থাৎ কপি শব্দে বানর বুঝায় এবং আস শব্দের অর্থ নিতম্ব। সুতরাং কপ্যাস শব্দের অর্থ বানরের পশ্চাদ্ ভাগ। নারায়ণের চক্ষু দুইটি বুঝাইবার জন্য জগতের সুন্দর সুন্দর বস্তু ছাড়িয়া বানরের নিতম্বের উপমা দেওয়াতে রামানুজ বড়ই ব্যথিত হইলেন। রামানুজ বলিলেন, "আচার্যদেব! ইচ্ছা করিলে ইহার সদর্থও করিতে পারিতেন।" এই কথায় যাদব রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ইহা যদি কদর্থ, তবে সদর্থটা কি হইতে পারে তুমিই বল।" রামানুজ বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে ইহার সুন্দর অর্থও হইতে পারে। ক অর্থ জল, তাহা যিনি পান বা শোষণ করেন তিনি কপি অর্থাৎ সূর্য। আস শব্দ বিকশিতও বুঝায়। সুতরাং কপ্যাস শব্দের অর্থ সূর্য দ্বারা বিকশিত।"

তাঁহার ব্যাখ্যার নিন্দা করিয়া নূতনভাবে এমন সুন্দর অর্থ করাতে হৃদয়হীন যাদব রামানুজের প্রতি খুসী হইতে পারিলেন না, বরং আরও বিরক্ত হইয়া পড়িলেন।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় রামানুজের প্রতিভা দিন দিন যতই বিকশিত হইতে লাগিল, যাদবের সঙ্গে তাঁহার মতভেদও ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহাতে রামানুজের অস্তিত্ব যাদবের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহা ছাড়া, রামানুজ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার জন্য কাঞ্চীনগরে ক্রমশঃই

বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছিলেন। রামানুজকে হত্যা করা ছাড়া যাদব তাঁহার মত ও সিদ্ধান্ত রক্ষার অন্য কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি রামানুজকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অনেক গবেষণার পর স্থির করিলেন, তিনি শিষ্যসমভিব্যহারে তীর্থদর্শনে বাহির হইবেন এবং পথে সুযোগ বুঝিয়া রামানুজকে হত্যা করা হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে যাদব মাঘ মাসে প্রযাগে 'কল্পবাস' করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। অনুগত শিষ্যগণ তীর্থযাত্রায় গুরুর অনুগমন করিলেন। রামানুজ ও তাঁহার মাসতুত ভাই গোবিন্দও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন।

তখনকার দিনে পায়ে হাঁটিয়া তীর্থে যাইতে হইত। কয়েকদিন চলিবার পর যাত্রীদল বিন্ধ্য পর্বতের নিকট গোণ্ডারণ্য নামক ভীষণ বনে প্রবেশ করিল। গোবিন্দ একদিন শুনিতে পাইল, সতীর্থগণ রামানুজকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিতেছে। কোনও সুযোগে সে রামানুজকে এই কথা জানাইল। আর কোন উপায় নাই দেখিয়া রামানুজ অগত্যা খুব নিবিড় বনের ভিতর পলায়ন করিলেন। একা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলিতে চলিতে তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, নির্গমনের পথ খুঁজিয়া পান না। এইরূপ চলিতে চলিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইযা যখন তিনি হতাশ হইযা পড়িয়াছেন, তখন তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন, এক ব্যাধ সেই গভীর অরণ্যে শিকার খুঁজিযা বেড়াইতেছে। রামানুজের দুর্দশা দেখিয়া ব্যাধের মনে দয়া হইল। সে এক অতি সংক্ষিপ্ত বন্যপথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া কাঞ্চীপুরে পৌঁছাইয়া দিল।

এই ঘটনার পর রামানুজ যামুনাচার্যের শূদ্র শিষ্য কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গেলেন এবং তাঁহার সহিত কাঞ্চীতে বাস করিতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র জাতীয় হইলেও ভগবৎ-শক্তিতে অসীম শক্তিমান ছিলেন এবং পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও ছিল। কাঞ্চীপূর্ণের পূত-সংসর্গে রামানুজের চিত্তের সকল গ্লানি দূর হইয়া গেল। তিনি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিকোমল হৃদয়ে ভগবানের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বেদান্তদেশিক (১২৬৮—১৩১৩) রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য। রামানুজের পর তিনিই ঐ সম্প্রদায়ের আচার্যকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁহার 'রহস্যত্রয়সার' গ্রন্থে যামুনাচার্যের ১৫ জন শিষ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, শৈলপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর, তিরুবরাঙ্গ এবং ররঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামানুজ যামুনাচার্যের শিষ্য শৈলপূর্ণের ভাগিনেয় ছিলেন। এইবার কাঞ্চীপূর্ণের অনুগত এবং সর্বতোভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আবার অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্নও ছিলেন।

একবার যামুনাচার্য বিষ্ণু দেবতা শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিবার জন্য কাঞ্চীতে গিয়াছিলেন। তথায় রামানুজকে দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন রামানুজ যাদব প্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেইদিন হইতে রামানুজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। যামুনাচার্য ভাবিয়াছিলেন, একদিন না একদিন রামানুজ তাঁহার নিকটে আসিবেই। কিন্তু সহসা তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে রামানুজ কাঞ্চীতে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত বাস করিতেছিলেন। যামুনাচার্য রামানুজকে কাঞ্চীপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আসিতে শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন। শ্রীবরদরাজের মন্দিরে মহাপূর্ণ রামানুজের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাঁহাকে যামুন মুনির অভিপ্রায় জানাইলেন।

মাতুল শৈলপূর্ণের গুরু সিদ্ধ মহাপুরুষ যামুন মুনির বিষয় রামানুজ ভাল রূপেই জানিতেন। কিন্তু শাস্ত্রপাঠের আগ্রহ হেতু সময় করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে পারেন নাই। যাদবের সঙ্গ পরিত্যক্ত হওয়ার পর তিনি কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ অনুসারে বিষ্ণু-মূর্তি শ্রীবরদরাজের সম্মুখে সাধন-ভজন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যামুনমুনি অসুস্থ এবং তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রামানুজ মহাপূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। শ্রীরঙ্গমে পৌঁছাইয়া তাঁহারা শুনিলেন, যামুনাচার্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সংকারের জন্য তাঁহার দেহ কাবেরী নদীর তীরে আনা হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় যাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য রামানুজের হয় নাই, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁহার শব দর্শনেব জন্য কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, শবের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। রামানুজ ইহার কারণ জানিতে চাহিলে সমাগত বৈষ্ণবগণ বলিলেন, গুরুজী মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনটি কামনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তিন কামনার এক একটি উল্লেখ করিয়া এক একটি অঙ্গুলি এইভাবে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিলেন। কামনা তিনটি হইল—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা, সহস্রনামের ভাষ্য রচনা এবং শতকোপের সহস্র-গীতিকার ভাষ্য রচনা। এই কথা শুনিয়া রামানুজের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যামুনাচার্যের এই তিন ইচ্ছাই তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সুসম্পন্ন করিবেন—এরূপ অভিপ্রায় জনতার সম্মুখে ব্যক্ত করিলেন। তখন পরম বিস্ময়সহকারে সকলে দেখিতে পাইলেন মৃতদেহের বদ্ধ অঙ্গুলিগুলি খুলিয়া গিয়াছে। ইহাতে রামানুজ যে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য চিহ্নিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ রহিল না।

রামানুজ দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় অধীর হইয়া কাঞ্চীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি এতদিন বৃথায় সময় কাটাইয়াছেন, যামুন মুনির ন্যায় মহাপুরুষের সেবা করিলে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানভক্তি লাভ হইত। এইরূপ চিন্তায় ও অনুশোচনায় রামানুজের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে গুরুরূপে বরণ করিবার মনস্থ করেন, কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র বলিয়া রামানুজকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দীক্ষা ব্যতীত সাধনা যথার্থ পূর্ণ হয় না। তাই কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে যামুনাচার্যের ব্রাহ্মণ-শিষ্য মহাপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে উপদেশ দিলেন। অবিলম্বে দীক্ষিত হইবার জন্য রামানুজ শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

যামুনাচার্য রামানুজকে বৈষ্ণব সমাজের নেতা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবগণও তাহা জানিতেন। তাই তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া রামানুজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিবার জন্য পণ্ডিত মহাপূর্ণকে কাঞ্চী যাইতে অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ কাঞ্চী যাত্রা করিলেন। অপর দিক হইতে দীক্ষা লইবার জন্য রামানুজও শ্রীরঙ্গমের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে মাদুরন্তকম্ স্থানে উভয়ে মিলিত হইলেন। রামানুজ সেই স্থানেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। রামানুজ গুরুকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলেন। দীক্ষার পর মহাপূর্ণ কিছুকাল রামানুজের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি নিজ গ্রাম পেবেমবুদুরে গিয়া আদি-কেশবের মন্দিরে ঠাকুরের সম্মুখে কৌপীন, গৈরিক বস্ত্র, দণ্ড ও কমণ্ডুল ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। গার্হস্থ জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি কাঞ্চীনগরে ফিরিয়া আসিয়া কাঞ্চী-মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সন্ন্যাসধর্মের নিয়ম সকল যথাযথরূপে পালনপূর্বক কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

মহৎ চরিত্র, প্রতিভা ও কঠোর সাধনা হেতু রামানুজ কাঞ্চীপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি শ্রীবরদরাজের সেবা, সাধন-ভজন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া নগরে একটি প্রবল বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করিলেন। এই সময়ে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন; তন্মধ্যে ভাগিনা দাশরথি, সঙ্গতিশালী পণ্ডিত কুরেশ ও তাঁহার ভূতপূর্ব অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতমত পরিত্যাগ পূর্বক রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গোবিন্দযতি নাম ধারণ করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে যামুনাচার্যের তপঃপ্রভাবে সেই সময় শ্রীরঙ্গম ছিল

বৈষ্ণবদের প্রধান কেন্দ্র। আচার্যের তিরোধানে আচার্যের শিষ্যগণ এইবার রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে লইযা আসিয়া আচার্যের শূন্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্য স্থির করিলেন। সেই অনুসারে তাঁহারা আচার্য-শিষ্য বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরে প্রেরণ করিলেন। গুরু মহাপূর্ণ ও গুরুস্থানীয় অন্যান্য মহাপুরুষদের অভিপ্রায় জানিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণব সমাজ তাঁহার হাতে শ্রীরঙ্গনাথের সেবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে রামানুজের শিষ্য কুরেশ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য দরিদ্রদিগকে বিতবণ করিয়া পত্নীসহ একবস্ত্রে শ্রীরঙ্গমে রামানুজের অনুবর্তন করিলেন এবং তদবধি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রামানুজের সহপাঠী ও মাসতুত ভাই গোবিন্দভট্টও যামুনাচার্যের শিষ্য শৈলপূর্ণের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। সে সময়ে যজ্ঞমূর্তি নামক একজন অদ্বৈতবাদীর পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামানুজের নিকট তিনি বিচারে পরাজিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেবরাজমুনি নাম গ্রহণ করেন। যজ্ঞামূর্তির এই মত পরিবর্তনে চারিদিকে রামানুজের খ্যাতি বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করে।

এইরূপে বৈষ্ণবসমাজের উপর একাধিপত্য লাভ করিয়া তিনি নিজের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। এই ধর্মের আচার, নীতি ও গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি যামুনাচার্যের প্রধান শিষ্যদিগের নিকট পরম নিষ্ঠার সহিত ধর্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণ গুরু যামুনাচার্যের নিকট হইতে রহস্যতত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রামানুজকে যথাসময়ে তাহা প্রদান করিতে হইবে—গুরুর এইরূপ আদেশ ছিল। রামানুজের ইহা গ্রহণের উপযুক্ত নিষ্ঠা, শক্তি ও ধৈর্য আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁহাকে একাদিক্রমে ১৮ বার প্রত্যাখ্যান করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণও অবিচল, রামানুজও অধ্যবসায়ে অটুট। অষ্টাদশ বার শ্রীরঙ্গম হইতে মাদুরা আসা-যাওয়া করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেও তিনি আবার গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। এইবার গোষ্ঠীপূর্ণের মন গলিল। তিনি রামানুজের ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা দর্শনে তাঁহার রহস্য বিদ্যালাভের শক্তি অর্জিত হইয়াছে মনে করিযা তাঁহাকে সেই পরম গোপনীয় তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সযত্নে এই বিদ্যা রক্ষা করিতে বলিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়া দিলেন, অনধিকারীকে এই বিদ্যা দিলে বিদ্যাদাতার ঘোর নরক-ভোগ হইবে।

এই রহস্যবিদ্যা গুরুপরম্পরাগত শক্তি সঞ্চারিত কোন সিদ্ধ মন্ত্র কি না বলা কঠিন, কিন্তু রামানুজ ইহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট দ্বিধাশূন্য অন্তরে তাহা প্রকাশ করিলেন এবং

তাঁহারাও ইহার মহিমা উপলব্ধি করিলেন। ইহাতে গোষ্ঠীপূর্ণের ক্ষোভ ও ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি রামানুজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার এরূপ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। উত্তরে রামানুজ বলিলেন, এই অপরাধের জন্য যদি তাঁহার নরক গমন হয় তাহাতেও দুঃখ নাই। এই রহস্যমন্ত্র মানবের আত্মার পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহার আত্মার অধোগতি হইয়াও যদি জনসাধারণ পরিত্রাণ পায়, তবে তাহা তিনি অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। ইহা শুনিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের হৃদয় গলিয়া গেল, ক্রোধের স্থলে তাঁহার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি রামানুজকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ নিজ পুত্র সৌম্যকে রামানুজের শিষ্য করিয়া দিয়া মহত্ত্বের পূজা করিলেন।

অতঃপর রামানুজ খুব শ্রদ্ধার সহিত মালাধর ও বররঙ্গের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া ইঁহারাও রামানুজকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেন। মালাধর নিজ পুত্রকে এবং বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন।

যামুনাচার্যের শিষ্যগণের সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিযা রামানুজের শিক্ষা পূর্ণ হইল।

পরম্পরাগত অধ্যাত্ম জ্ঞান রক্ষার তিনটি প্রধান উপায়—সাধনা, গ্রন্থরচনা ও প্রচার। তন্মধ্যে সাধনাই জ্ঞান রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সাধনা না করিলে কোন প্রকার জ্ঞানই লাভ করা যায় না। একমাত্র সাধনার দ্বাবাই পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। সাধনা করিয়া সত্য প্রত্যক্ষ না করিলে কোনও জ্ঞানই কাজে লাগে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিজে সাধনা করিযা সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তাঁহাদের শিষ্যদিগকে অনুভব করাইয়া দেন।

আচার্যপরম্পরাগত সাধন-সিদ্ধ জ্ঞান রক্ষার জন্য রামানুজ একটি সাধক-সম্প্রদায় গঠন করেন। মঠ-আশ্রমে এবং শ্রীরঙ্গম ও কাঞ্চী প্রভৃতি দেবস্থানে শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থা করিয়া রামানুজাচার্য যে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া যান, তাহা সহস্র বৎসর যাবৎ অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

নিজে সর্বত্র যাইয়া, তর্ক বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়া নিজের মত স্থাপন করিলে শীঘ্রই তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেইজন্য আচার্য শঙ্করের ন্যায় আচার্য রামানুজও ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র স্বীয় মত প্রচার করা কর্তব্য মনে করিলেন। তিনি শ্রুতিধর কুরেশ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দাশরথি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথকে, কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজকে এবং পেরেমবুদুরে আদি-কেশবকে দর্শন

করিয়া দক্ষিণ দিকে রামেশ্বর পর্যন্ত গমন করিলেন এবং সর্বত্র পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ মত লওয়াইলেন এবং সর্বসাধারণকে ভক্তি দানে কৃতার্থ করিলেন।

আচার্য রামানুজ সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তর মুখে তীর্থ-পরিক্রমা ও ধর্মপ্রচার করিতে করিতে হিমালয়ে বদরীনারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। এইরূপে উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরীতে বৈষ্ণবমত প্রচার করিয়া পুরীধাম হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।

আচার্য শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়া চিন্তাশীল পণ্ডিত নৈয়ায়িকদের জন্য বৈদিক জ্ঞানযোগ ও সর্বসাধারণের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচার করিলেন। জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবার অধিকারী সংসারে দুর্লভ। কারণ, জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করা অত্যন্তই কঠিন। তাই সেই কঠিন পথে কেহ প্রায় চলিতে চাহিত না; কেবল কতকগুলি মত জানিয়াই নিজেকে জ্ঞানী মনে করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইত। তাহারা সংসারে সম্মান, প্রতিপত্তি লাভের জন্য জ্ঞানযোগীর ভান করিয়া লোকের নিকট প্রচার করিত যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই জগৎ একান্ত মিথ্যা। এই সময়ে আচার্য রামানুজ জ্ঞান ও কর্মের সহিত ভক্তি মিশাইয়া সর্ব মানবের উপযোগী এক ধর্মমত প্রচার করিলেন।

আচার্য রামানুজ প্রচার করিলেন, ভগবান্ পরম করুণাময়, সর্বব্যাপী ও সকল গুণেব আধার। জীব তাঁহার অংশ। ভগবৎ-বিরোধী কর্ম কয়াতে জীবের স্বরূপ জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। ভক্তির সহিত উপাসনা করিলে জীব নিজের ও ঈশ্বরের স্বরূপ এবং পরস্পর সেব্য-সেবক সম্বন্ধ জানিতে পারে। তখন জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া সে পরয়ানন্দে চিরকাল নারাযণেব নিকট অবস্থান করে। এই ধর্মে ব্রাহ্মর-শূদ্র নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। তবে খুব পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিতে হয় এবং আহার-বিহারে শাস্ত্রের নিয়ম সর্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হয়। রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যগণ নিজেদের মহৎ চরিত্র, ত্যাগ ও তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষে এক সর্বব্যাপী ভক্তির আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আচার্য রামানুজ প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে ভগবান্ নারায়ণ রূপে উপাসিত। নারায়ণের শক্তি 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর নামে এই সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায় নামে পরিচিত। সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরাশর, বেদব্যাস ও পূর্ণাচার্য প্রভৃতি তরুণগণকে আচার্যদেব নিজে শিক্ষা দিয়া সঙ্ঘ পরিচালনে উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের মধ্যে পরাশরকে বিপুল বৈষ্ণব

সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণে সমর্থ বিবেচনা করিয়া সম্প্রদায়ের নায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে (শকাব্দ ১০৫৯) মাঘ মাসের শুক্লা দশমীর মধ্যাহ্ন কালে ১২০ বৎসর বয়সে আচার্য রামানুজ মহাসমাধি অবলম্বন করিলেন।

গ্রন্থরচনা—পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে যামুন মুনি অলৌকিকভাবে রামানুজকে তিনটি কার্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম, বৈষ্ণবমতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা, দ্বিতীয়, সহস্রনামের ভাষ্য রচনা এবং তৃতীয, শতকোপের সহস্রগীতিকার ভাষ্য রচনা। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রামানুজ নিজেই রচনা কবেন এবং শ্রীভাষ্য নামে প্রকাশিত করেন। তিনি আপন শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্টের দ্বারা সহস্রনামের ভাষ্য রচনা করান। এই গ্রন্থ ভগবদ্-গুণদর্পণ নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় ভাষ্য রচনার জন্য তিনি আপন মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র কুরুকেশকে নিয়োজিত করেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া ষট্‌সহস্র শ্লোকাত্মক আকার ধারণ করে। শ্রীভাষ্য ব্যতীত রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সমর্থনে বেদান্তসার ও বেদান্তদীপ নামক ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, গীতাভাষ্য, বেদার্থসংগ্রহ, নিত্যারাধনবিধি এবং গদ্যত্রয় (শরণাগত গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য এবং শ্রীবৈকুণ্ঠগদ্য)—এই কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে শঙ্করাচার্য-স্থাপিত অদ্বৈত মত ভিন্ন ভাস্কর ও যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ মতও প্রচলন ছিল। রামানুজ 'বেদার্থসংগ্রহ' রচনা করিয়া অদ্বৈত মায়াবাদ ও ভেদাভেদবাদ মত খণ্ডনপূর্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করেন।

রামানুজের সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবাদের প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে 'ব্রহ্মসূত্র' ন্যায় বা তর্কপ্রস্থান। যুক্তি ও বিচার দ্বারা ইহাতে শ্রুতিবাক্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। শ্রুতিগুলির মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ একটি প্রাচীন ও প্রধান শ্রুতি। আমরা দেখিতে পাই, গীতার অনেক তত্ত্ব এই উপনিষদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। জীব জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা শ্রুতিগুলির প্রধান বক্তব্য বিষয়, এবং জীবের বন্ধনমুক্তি অর্থাৎ সংসারে পুনরাবর্তন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতেছে পরমপুরষার্থ। এইজন্য যে সাধনার প্রয়োজন, গীতাতে সেই সমস্ত সাধন-প্রণালীর বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহান্তে কি কি ক্ষমতালাভ হয়, ব্রহ্মসূত্রের শেষ অধ্যায়ের শেষ (চতুর্থ) পাদে তাহার 'বিচার' আছে। এই 'বিচারে' ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যগুলি প্রধান অবলম্বন। এই পাদের শেষ অধিকরণের ছয়টি সূত্রে (১৭–২২) সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ চেতনাচেতন সমস্ত জগতের স্থিতি ও

কার্যের নিয়ামক শক্তি ভিন্ন ঈশ্বরের আর সমুদয় শক্তি মুক্ত পুরুষের লাভ হয়। ইহা হইতে প্রশ্ন আসে, বন্ধনমুক্ত জীবের যখন এত সব ঐশী শক্তি লাভ হয়, তখন জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি?

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'শারীরিকভাষ্য' রচনা করিয়া পূর্ণাদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি মহাবাক্য, যথা—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "একমেবাদ্বিতীয়ং", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি। এই সমস্ত মহাবাক্য পারমার্থিক তত্ত্ব নির্দেশ করে। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন সত্তা নাই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, ইহা "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং"। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। ব্রহ্ম যখন একমাত্র অনন্ত জ্ঞানময় সত্য সত্তা, তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কোনও সত্তার অস্তিত্বের আর সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হয় ব্রহ্মেরই বিকার, না হয় মিথ্যা।

শঙ্কর এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞাতা ব্রহ্মের জ্ঞেয় জড়ত্বে বিকৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত যখন অপর কোন সত্তাই নাই তখন কিসের দ্বারা ব্রহ্ম বিকৃত হইবে। সুতরাং যখন ব্রহ্মের পক্ষে জগতাকারে বিকৃত হওযা অযৌক্তিক তখন স্বীকার করিতেই হইবে জগৎ মিথ্যা। তবে যে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাহা ভ্রমাত্মক জ্ঞান, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। এই জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে অবিদ্যা। প্রশ্ন উঠিতে পারে, জগৎ যেন মিথ্যা হইল, কিন্তু এই অবিদ্যা কাহার? না, ইহা 'আমি' পদবাচ্য জীবাত্মার। কিন্তু 'আমি' যদি মিথ্যা হয় তবে এই অবিদ্যা কাহার হইবে? সেই 'আমি' বা জীবাত্মা কে? শঙ্কর বলিলেন, আমি বা জীবাত্মা হয় ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন চিন্ময় সত্তা, না হয় ব্রহ্ম, কিংবা ব্রহ্মের অংশ—এই তিনটির মধ্যে কোন একটিতে 'আমি'কে পড়িতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি যখন বলে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন 'আমি' বা জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু হইতে পারে না। আবার ব্রহ্ম যখন দেশ-কালের অতীত অসীম বস্তু তখন তাঁহার অংশ কল্পনা করা চলে না। বিশেষতঃ অংশ কল্পনা করিতে গেলে ঐদিক দিয়া তাঁহাকে সসীমের গণ্ডিতে আনিতে হয়। সুতরাং জীবাত্মা যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মের অংশও হইতে পারে না, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমি ব্রহ্মই—"ব্রহ্মোঽস্মি"। এইরূপ যুক্তিপরম্পরার দ্বারা তিনি পূর্ণাদ্বৈতমত স্থাপন করেন।

আমরা দেখিয়াছি, শঙ্করাচার্য ভক্তিপ্রধান পাঞ্চরাত্র সম্মত চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বমূলক ঐকান্তিক ধর্মকে বেদবহির্ভূত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবং যামুনাচার্য তাঁহার যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমতের সমর্থনে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য রচনাদ্বারা নিজের মতকে স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই। সেই ভার রামানুজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাষ্য রচনাদ্বারা তিনি যামুনাচার্যের মনোভিলাষ সর্বাংশে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীভাষ্য রচনায় তিনি শ্রুতিবাক্যগুলির যথার্থ অর্থ নিরূপণ করিয়া তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যে অদ্বৈতবাদের ন্যায় ভাস্করের ভেদাভেদবাদকেও খণ্ডনের প্রয়াস রহিয়াছে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদও যে অযৌক্তিক রামানুজ তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বৌধায়ন রচিত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্যের বহু পূর্বের রচনা। যামুনাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে গিয়া এই গ্রন্থ হইতে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ তখন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। রামানুজ কুরেশ ও অপব কয়েক জন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া এই গ্রন্থের খোঁজে কাশ্মীর গমন করেন। তথায় গ্রন্থের সন্ধান পান এবং বহু অনুনয় বিনয়ের পর ইহা পাঠ করিবার অনুমতি লাভ করেন, কিন্তু ইহা নকল করিবার অনুমতি পাইলেন না। কুরেশের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, তিনি গ্রন্থের প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় অংশগুলি মুখস্ত করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বামানুজ কুরেশের সহায়তায় শ্রীভাষ্য রচনা করিলেন।

শ্রীভাষ্যে রামানুজের তীক্ষ্ণ প্রতিভার সঙ্গে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা বলিয়া মনে হয়। শ্রীরঙ্গমে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকে উচিতরূপে পরিচালিত করিবার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি দুইটি পুস্তিকা রচনা করেন। তারপর শঙ্করাচার্যের ন্যায় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থান সকল দর্শনান্তে পশ্চিম দিকে সমুদ্রোপকূলে গিরনার ও দ্বারকায় গমন করেন। তথা হইতে মুথরায় আসেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থান সকল দর্শন করিয়া উত্তরে বদ্রীনাথ গমন করেন এবং তথা হইতে কাশ্মীরে আগমন করেন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্য উভয়ই অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। শৈব সম্প্রদায় যেরূপ শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া গণ্য করেন, সেইরূপ বৈষ্ণবগণও রামানুজকে নারায়ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। শঙ্করাচার্য বেদান্তদর্শনের প্রথম ভাষ্য রচনা করেন। ইহার নাম শারীরক ভাষ্য। এই ভাষ্যে তিনি অসাধারণ যুক্তি ও বিচার প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ব্রহ্মের 'নির্বিশেষ'

অদ্বৈত তত্ত্বই (absolute monism) পারমার্থিক সত্য। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অদ্বৈত শ্রুতিসকল তাঁহার এই মতই সমর্থন করে। দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্মপ্রকাশক শ্রুতিসকল তাঁহার এই মতই সমর্থন করে। দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্মপ্রকাশক শ্রুতিসকল মাত্র ব্যবহারিকভাবে সত্য, অর্থাৎ যতদিন অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন ইহারা সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে। অবিদ্যার নিবারণ হইলে রজ্জুতে সর্পভ্রম নিরসনের ন্যায় ইহারাও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তখন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ইহা জ্ঞানের বিষয় হইবে এবং তাহা হইলে মুক্তি। শঙ্করাচার্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি প্রসিদ্ধ মঠ এবং স্থানে স্থানে আরো অসংখ্য মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার মত প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দূরদর্শিতা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তিন শত বৎসরের অধিককাল তাঁহার মত বৌদ্ধমতকে প্রতিহত করিয়া অপ্রতিহতভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। বেদান্তদর্শন বলিতে শারীরিক ভাষ্যে স্থাপিত অদ্বৈতমতকেই বুঝাইত। শঙ্করাচার্যের তিরোধানের ৩৩০ বৎসর পর রামানুজ প্রাদুর্ভূত হন। তাহার পূর্বে যামুনাচার্য অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমতই যে ঠিক তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়া ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, রামানুজ শ্রীভাষ্যে ইহারাই পারমার্থিক সত্য এবং দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বেই যে শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীভাষ্যে তিনি যে গভীর জ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বড়ই বিস্ময়কর।

উপনিষদ্গুলিতে জড় ও জীব জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া কোন কোন স্থলে পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিন-চারিটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

১। ছান্দোগ্য শ্রুতি—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি", অর্থাৎ এই যাহা কিছু সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ইহাদের উৎপত্তি, ব্রহ্মতেই স্থিতি, ব্রহ্মতেই লয়।

২। মুণ্ডক—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব জাতে", অর্থাৎ, দুইটি সুপর্ণ পক্ষী (ব্রহ্ম ও জীব) পরস্পর সখারূপে একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবস্থান করে।

৩। শ্বেতাশ্বতর—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা", অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা প্রকৃতি—ইহারা সকলই অজ।

৪। বৃহদারণ্যক—যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্‌যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যে-বমেবাস্মদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি"। অর্থাৎ, ঊর্ণনাভ হইতে যেরূপ তন্তু নির্গত হয়, সুদীপ্ত পাবক হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেব, সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদমূলক অনেক শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে কোন কোনটি জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্বন্ধে অদ্বৈত, আবার কোন কোনটি দ্বৈত এবং কোন কোনটি দ্বৈতাদ্বৈত ভাব প্রকাশক।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈত মতমূলক শ্রুতিবাক্যগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য ইহাদিগকে ব্যবহারিক সত্তা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রামানুজ শ্রীভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইহারা পারমার্থিক তত্ত্বের প্রকাশক। রামানুজ-মতে ব্রহ্মের অদ্বৈত তত্ত্ব স্বীকৃত। ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় সত্তা, কিন্তু তাঁহাতে 'বিশেষ' গুণধর্ম (attributes) বর্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্", 'বিশেষ'গুলি তাঁহার প্রকাশ। ইহারা চিৎ ও অচিৎ ধর্মী জীব ও জড় প্রকৃতি। শঙ্করাচার্য মতে এই প্রকাশগুলির কোন বাস্তব সত্তা নাই, ইহারা অবিদ্যার বিজৃম্ভণ মাত্র। রামানুজ মতে ইহারা স্থায়ী বাস্তব সত্তা। ইহাদের প্রকার ও ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন (modifications and evolutions) ব্রহ্মের বিশেষ শক্তির অধীন। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের অস্তিত্ব নাই। জীব ও জড় রূপ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের দেহ। এই দেহবিশিষ্ট ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব। প্রলয়ে এই জীব-জগৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে। ইহাদের স্থূলভাবে অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট ব্রহ্ম 'কারণব্রহ্ম', স্থূল দেহরূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম 'কার্যব্রহ্ম'। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তিনি জ্ঞাতাও বটে। জ্ঞাতা হইতে হইলে জ্ঞানের বিষয় কিছু থাকা চাই, কিন্তু শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ অদ্বৈত মতে তাহা সম্ভবপর হয় না। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তাঁহাতে কোন বিকার বা প্রকার ভেদ নাই—এই অর্থে জীব ও জগৎ অসৎ। যেহেতু মায়া-কবলিত জীবের প্রকার ভেদ আছে এবং তাহার স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত, সেইহেতু জীবকে অসৎ বলা হয়। কিন্তু স্বরূপে জীব ও ব্রহ্ম এক। স্বরূপ-জ্ঞানী জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন এবং সেখানে জীবের কোন পরিবর্তন নাই। কারণ, স্বরূপ-জ্ঞানী জীব মায়ার অতীত, সুতরাং কালেরও অতীত এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু জড়ের বিষয় অন্যরূপ। সৃষ্টি ব্যাপারে জড়ের পরিবর্তন সমানেই ঘটিতেছে। এই পরিবর্তনের নাম পরিণামবাদ। কাল-কবলিত জীব ও জড়ের প্রকার ভেদ ও পরিবর্তন ব্রহ্মকে কোনরূপ স্পর্শ করে না। এখানে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক মত।

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জড়ের যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিতেছি তাহা বাস্তবিকই ঘটিতেছে। অদ্বৈতবাদ মতে এই পরিবর্তন যে প্রতীতির বিষয় হয় তাহা আমাদের অজ্ঞানতা নিবন্ধন। বাস্তবিক এরূপ কিছুই হইতেছে না। তাঁহারা এই পরিণামকে (evolution) বিবর্তন (apparent variation) বলেন।

শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বিষয়ী ও বিষয়) বলিয়া পারমার্থিক সত্য কিছু নাই। সুতরাং এই দর্শনে উপাস্য ও উপাসকের বা উপাসনার স্থান নাই। জীব মাত্রই ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মাস্মি)—এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সাধনার দ্বারা যে ভূমি লাভ করা প্রয়োজন, যাহাদের তাহা লাভ হয় নাই অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম পূর্বক উন্নততর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য ব্যবহারিক সত্তার কল্পনা।

পারমার্থিকভাবে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং কেবল জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ব্যবহারিকভাবে তিনি সগুণ, সক্রিয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা ঈশ্বর। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল বিবেক, বৈরাগ্য, শম ও দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধা ও অভ্যাস। বিবেক বলিতে নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বুঝিবার বিচার শক্তি বুঝায়। বৈরাগ্য বলিতে অনাত্ম বিষয়ে অনাসক্তি; শম ও দম বলিতে বাহ্যাভ্যন্তর ইন্দ্রিয় সংযম; তিতিক্ষা বলিতে সুখ-দুঃখ সহিষ্ণুতা, উপরতি—অনাত্ম বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া রাখা; সমাধি—যাহা সত্য বলিয়া জানা যায় তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন; শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অভ্যাস এবং এই সকলের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন।

সাধনাকে নৈতিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সমস্ত উপদেশ অনবদ্য। দার্শনিক মতের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের (theology) সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আচার্য শঙ্কর অবিদ্যা ও মায়াবাদের কল্পনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিযাছেন, অদ্বৈততত্ত্বমূলক যে সকল শ্রুতিবাক্য, যথা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি—ইহারাই পারমার্থিক সত্য। অপরাপর শ্রুতিবাক্যগুলি যাহারা ব্রহ্মের দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রতিপন্ন করে, উহারা অবিদ্যার কবল হইতে যাহারা বিমুক্ত হইতে পারে নাই তাহাদের জন্য ব্যবহারিক ভাবে সত্য মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম স্বরূপে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। জীব ও জড় জগৎরূপে ব্রহ্মাণ্ডও ব্রহ্মের দেহ—এই অর্থে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

রামানুজ শঙ্কর-অর্থে অবিদ্যা বা মায়াবাদ স্বীকার করেন না। এই অবিদ্যার উৎপত্তি কোথা হইতে? ইহা কি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন কিছু অথবা

ব্রহ্মের সহিত অভেদ। ইহার কোনটাই শঙ্করের অদ্বৈত মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। শঙ্কব নিজেও ইহা যে বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। তিনি এই অবিদ্যা বা মায়াকে 'সদসদনির্বচনীয়' সংজ্ঞা দিয়াছেন। অবিদ্যা সম্বন্ধে শঙ্করের এই মতের বিরুদ্ধে রামানুজ কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়াছেন, যথা—

তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাতে কোন অবস্থাতেই অবিদ্যা সম্ভবে না। ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি, সুতরাং ব্রহ্মের উপর অবিদ্যাব কোন আবরণ থাকিতে পারে না। শঙ্করাচার্য অবিদ্যাকে যে সদসদনির্বচনীয় বলিয়াছেন তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, সৎ ও অসতের এক সঙ্গে স্থিতি মানুষের জ্ঞানের অগম্য। ইহা ছাড়া, অবিদ্যার স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা সম্বন্ধে শ্রুতি বা স্মৃতিতে কোন প্রমাণ দেখা যায় না। শঙ্কর মতে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে অবিদ্যার নিরসন হয়; রামানুজ বলেন, ইহা অসম্ভব। কারণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম অপ্রামাণ্য। তিনি আর একটি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাস্তবিক অবিদ্যা থাকিলে তাহা অপরিহার্য। ভগবৎ-বিমুখ কর্ম হইতে অবিদ্যার জন্ম। একমাত্র সৎকর্মানুষ্ঠান, সদাচার, সৎসঙ্গে জীবনযাপন, ভগবৎ-আরাধনা প্রভৃতি হইতে অবিদ্যা দূর হয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম আরাধনার বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে জানা যাইবে কি করিয়া? জীব ও জগৎ মিথ্যা হইলে মিথ্যা জগতে মিথ্যা জীবের ভগবৎ-ভক্তি ও আরাধনা এবং ভগবৎ-কৃপা সবই মিথ্যা হইয়া যায়। তিনি এইরূপ আরও অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।

বেদার্থ সংগ্রহে রামানুজ পরস্পর বিরোধী শ্রুতিবাক্য সকলের এইরূপে ঐক্যসাধন করিয়াছেন

যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্যের মুখ্য অর্থ হইল, ব্রহ্মে কোনরূপ রূপান্তর, বিকার বা পরিবর্তন নাই। যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নানাত্ব নিষেধ হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য এই যে, সমুদায় চেতনাচেতন বস্তু ব্রহ্মের শরীর। ইহারা তাঁহার 'বিশেষ' বা 'প্রকার' মাত্র, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে এক। সকলের তিনি যখন আত্মা, তখন তিনিই সর্বপ্রকার। সকলই ব্রহ্মশরীর, তিনি সকল 'প্রকার' (mode)। সুতরাং তিনিই সকল হইয়া রহিয়াছেন, এই অর্থে তাঁহাব অভেদভাব। নানাবিধ চিৎ-অচিৎ বস্তু বিভিন্ন প্রকারে ভিন্নবৎ একই ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং ভেদাভেদভাব। অচিদ্বস্তু, চিদ্বস্তু এবং ঈশ্বর—ইহাদের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য থাকাতে বিমিশ্রতা হয় না, এজন্য ভেদভাব (দ্রঃ বেদার্থ সংগ্রহ, ৩০ সূ)।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ২৩-২৫ সূত্রে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—এরূপ বলা হইয়াছে। রামানুজ ইহার সমর্থনে বলেন, ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে জড় ও জীব জগৎকে অবিভক্ত (undeveloped)

অবস্থায় আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া কূটস্থ অবস্থায় থাকেন। সৃষ্টিতে জীব ও জগৎ পূর্ণাবয়বাবস্থায় তাঁহার দেহ এবং এই দেহের নিয়ামক অন্তর্যামী স্বরূপে দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তিনি প্রকাশিত হন। রামানুজ তাহার এই যুক্তির সমর্থনে ঋগ্বেদ হইতে দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রের ঋষি কবষ এবং দেবতা বিশ্বদেব—

"কিস্বিদ্বনঃ ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥
বৃক্ষ বনং ব্রহ্মসবৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥"

—জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল? যাহা হইতে দ্যাবা পৃথিবী (বিশ্বচরাচর) উদ্ভূত হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত জগৎ ধারণকরতঃ তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—হে সুধীগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি যে ব্রহ্মই বন (কার্য) এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদান স্বরূপ) ছিলেন, যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মিত হইয়াছে। সৃষ্টির যিনি কারণ (supreme self) ইহাকে ধারণার্থে তিনি ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ, ইহাতে বলা হইল, ব্রহ্মের দেহরূপে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য। কিন্তু এই সত্যতা ব্রহ্মের নিয়ামক শক্তির অধীন। এই শক্তিকে অতিক্রম করিয়া ইহাদের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিতরূপে অবস্থিত থাকিয়া যিনি ইহাকে নিয়মিত করেন, তিনি ঈশ্বর। জীব ব্রহ্মেব দেহস্থানীয় হইলেও ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার আভাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রের (জন্মাদস্য যতঃ) ব্যাখ্যায় দিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ মতে স্বরূপে জীব ও ব্রহ্ম এক হওয়ায় উপাস্য উপাসকের তথা ভক্তি ও কৃপার স্থান নাই। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভক্তি ও কৃপার সম্বন্ধকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামানুজ যামুনাচার্যের ইচ্ছানুসারে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার জন্য ব্রহ্ম সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতের সহিত কোথায় উহার অনৈক্য তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রধানতঃ নারদ পাঞ্চরাত্র সংহিতাব উপর স্থাপিত। নারায়ণ দ্বারকায় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্রের মধ্য দিয়া চতুর্বূহতত্ত্ব প্রকটন করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে তিনি ভগবান্। তাঁহার লীলা-সকল বৈষ্ণবদের আরাধনার বিষয়। যথাযথ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে

তাঁহার মূর্তি স্থাপিত হইলে তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতারূপে তাহাতে অবস্থান করেন। বিগ্রহের পূজা এই ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ।

নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকারে নারায়ণ প্রকাশিত হন—

১। সর্বোচ্চ অবস্থায় নারায়ণের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ। এই অবস্থায় তাঁহাকে পরব্রহ্ম এবং পরবাসুদেব বলা হয়। তথায় তিনি শেষনাগরূপ আসনে উপবেশন করেন। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া বিরাজ করেন। তাঁহার মস্তকে চূড়া ও কর্ণে কুণ্ডল এবং অন্যান্য ভূষণে তাঁহার দেহ সুশোভিত। শ্রী, ভূ ও লীলা তাঁহার পরিচর্যা করেন। অনন্ত গরুঢ় বিশ্বকসেন প্রভৃতি দেবতাসকল ও মুক্ত আত্মাগুলি তথায় অবস্থান করেন।

২। উপাসকদের সুবিধা এবং সৃষ্টিপ্রকাশ ও উহার স্থিতি প্রভৃতির জন্য তিনি বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে প্রকাশিত হন।

৩। বিভবরূপে তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি দশ অবতার-রূপ গ্রহণ করেন। এবং অন্তর্যামীরূপে তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বাস করেন।

আলোয়ারদের রচিত প্রবন্ধাবলীতে ভাব ও উচ্ছ্বাসময় ভক্তির বিশেষ প্রাবল্য ছিল। শ্রীভাষ্যে ভক্তির যে লক্ষণ ব্যক্ত হইযাছে তাহাতে উচ্ছ্বাসের বিশেষ স্থান নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে, ভক্তি শব্দ উপাসনারই পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একার্থবোধক—'উপাসনা পর্যায়ত্যাদ্ভক্তি শব্দস্য'। ভক্তি একপ্রকার ধ্রুবানুস্মৃতি। এই ধ্রুবাস্মৃতি যখন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, তখন তাহা ধ্যান। স্মৃতিতে তৈলধারার ন্যায় প্রবহমান বলা হইয়াছে। এই স্মৃতি-প্রবাহ ভগবানের গুণাবলির স্মরণপ্রবাহ। ইহার মধ্যে অপর কোন চিন্তার স্থান থাকিবে না।

রামানুজ রচিত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যের উপর বৈষ্ণবধর্ম প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এইজন্য তাঁহাকে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয। তাঁহার সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনতম শাখা। এই মতে বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা নির্বাহে 'শরণাগতি' সাধনার এক প্রধান অঙ্গ।

এস্থলে যামুনাচার্যের পরম অনুরক্ত ভক্ত কুরেশের পুত্র পরাশরভট্টের উল্লেখ প্রয়োজন। ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজের মৃত্যুর পর অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারের জন্য যাঁহারা দণ্ডায়মান হন, পরাশরভট্ট তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। সেই সময় মহীশূরে কোন এক সঙ্গতিসম্পন্ন অদ্বৈত মতাবলম্বী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, 'বেদান্তী' নামে তাঁহার পরিচয় ছিল। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে শত শত ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা ছিল। পরাশরভট্ট একদিন আহারের সময় বেদান্তীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। বেদান্তী পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্বক আহারের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইলে পরাশর বলিলেন,

"ভোজনের ভিক্ষা নহে, আমি বিচারের ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।" উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। দশ দিন বিচারের পর অবশেষে বেদান্তী পরাভব স্বীকার করিয়া পরাশরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পর বেদান্তী তাঁহার সর্বস্ব পরাশরকে দান করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। পরাশর তাঁহার 'নাঞ্জিয়ার' (nanjiar) নাম রাখেন। ইহার অর্থ 'আমাদের সন্ন্যাসী'।

কুরেশ 'বৈকুণ্ঠস্তব' ও 'অতিমানুষ স্তব' নামক দুই গ্রন্থ রচনা করেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই দুই গ্রন্থের বিশেষ আদর হয়। পরাশরভট্ট লক্ষ্মী ও শ্রীরঙ্গম দেবতার উদ্দেশ্যে দুই স্তোত্র রচনা করেন। নারায়ণের পরই বৈকুণ্ঠে তাঁহার অন্তরঙ্গা-শক্তি লক্ষ্মীর স্থান। শ্রীরঙ্গম দেবতা সাক্ষাৎ নারায়ণ। নাঞ্জিয়ার তামিল ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। শতকোপার প্রবন্ধাবলীও এইসময় বিশেষভাবে আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। নাঞ্জিয়ারের শিষ্য 'নামপিলই'। ইনি তামিল ভাষায় রচিত আলোয়ারদের প্রবন্ধাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থসকলের সার সঙ্কলন করেন। অপর শিষ্য পেরিয়া বচনপিলই। ইনি প্রাচীন দুরূহ প্রবন্ধাবলীর ব্যাখ্যা সহকারে অনেক গ্রন্থ লিখেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যে উত্তর অঞ্চলের বৈদান্তিক আচার্যদিগেব সহিত তামিলদেশবাসীদিগের আচার্যদের মধ্যে মতানৈক্য হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তাঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তর অঞ্চলের আচার্যগণ 'বড়গলই' (Vadagalais) ও দক্ষিণ অঞ্চলের আচার্যগণ 'টেঙ্গলই' (Tangalais) সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

টেঙ্গলই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য 'লোকাচার্য'। তিনি নামপিলইর শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় মিশ্রিত অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'শ্রীবচনভূষণ' ও 'তত্ত্বত্রয়' প্রধান। তত্ত্বত্রয়ে জগতের বিকাশ এবং ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক বিশিষ্টাদ্বৈতমতের দার্শনিক তত্ত্বের বিশদ আলোচনা আছে।

'বচনভূষণ' পরম রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ। কাশী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে এই গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একটি গুহ্যতত্ত্বপ্রতিপাদক গ্রন্থ। উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা ভিন্ন ইহার বিষয় কাহারও জানিবার শক্তি হয় না। টেঙ্গলই সম্প্রদায়ের নিকট ইহা অতি পবিত্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থমতে আচার্য বা গুরুর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন। ইহাতে জাতিবৈষম্যের তীব্র নিন্দা রহিয়াছে।

বড়গলইদের প্রধান আচার্য 'বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক' (বা বেদান্তাচার্য) আবির্ভূত হইয়া দার্শনিক সাহিত্যের সবিশেষ পুষ্টি সাধন কবেন। লোকাচার্য ও বেঙ্কটনাথের জন্মকাল যথাক্রমে ১২১৩ এবং ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বড়গলইদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ-বৈষম্য ক্রমেই প্রাধান্যলাভ করিতে থাকে। উচ্চবর্ণগণ যে সকল অধিকার ভোগ করিত, হীনবর্ণগণ সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত। এমন কি জপমন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়"-র 'ওঁ' উচ্চারণ তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের জপের মন্ত্র "নমো নারায়ণায়"। বড়গলইদের সঙ্গে টেঙ্গলইদের মতানৈক্যের ইহাও একটি প্রধান কারণ। টেঙ্গলইদের মতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই পূর্ণায়ব মন্ত্র জপের অধিকার আছে।

বড়গলই আচার্যগণ সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর ছিলেন এবং তাঁহারা রামানুজের মতকে যথাযথ অনুসরণ করিতেন। রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার মত স্থাপন করিয়া যান। উপনিষদসঙ্গত ব্রহ্মোপাসনায় ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান নাই। রামানুজ ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যে সকল উপায়ের বিধান আছে, অনেক পরিমাণে উহাদের অনুরূপ। অপর পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলবাসী টেঙ্গলইদের মধ্যে সে সময়ে তামিল সাহিত্যের, বিশেষভাবে আলোয়ারদের রচিত প্রবন্ধাবলীর চর্চ্চার বিশেষ প্রচলন ছিল। ইহার ফলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবপ্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভ করে।

এই সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ে দুইটি প্রধান ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই দুইটি শাখা টেঙ্গলই (দক্ষিণ পথ) এবং বড়গলই (উত্তরপথ) নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। বড়গলই শাখা অপেক্ষা টেঙ্গলই শাখায় কৃপা অথবা প্রপত্তির প্রাধান্য বেশী। বড়গলইদিগের মতে ভগবৎ-কৃপালাভে কর্ম্মাদির সাপেক্ষতা আছে। ইঁহারা বলেন যে কর্ম ও জ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে, শুধু ভক্তির অঙ্গরূপে ইহাদিগের উপযোগিতা আছে। ভগবান্ সাক্ষাৎভাবে একমাত্র ভক্তিলভ্য। টেঙ্গলইগণ বলেন যে ভগবৎকৃপা অহেতুক—ইহা যে কেন হয়, কখন হয়, কেহ বলিতে পারে না। ইঁহাদের মতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি যে-কোন উপায়ে মোক্ষলাভ হইতে পারে, কাহারও প্রাধান্য মানিয়া কাহারও গৌণত্ব মানিবার কোন হেতু নাই। বড়গলইদের মতে প্রপত্তি ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বিশেষ, কিন্তু টেঙ্গলইদের বিশ্বাস এই যে ইহাই একমাত্র উপায়। প্রপত্তির সঙ্গে অন্য কোন উপায়ের তুলনাই হয় না। টেঙ্গলইগণ মনে করেন যে, জীবমাত্রকেই পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অন্য কোন উপায়ই ফল প্রসব করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ প্রপত্তিই শ্রেষ্ঠোপায়।

বড়গলইগণের মতে কৈবল্যমুক্তি স্থায়ী নহে, টেঙ্গলইগণের সিদ্ধান্তানুসারে

কৈবল্য নিত্যাবস্থা। কৈবল্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ ধারণাই দুই সম্প্রদায়ের মত বৈষম্যের হেতু। বড়গলইগণ যাহাকে কৈবল্য বলেন তাহা একপ্রকার প্রকৃতিলীন অথবা প্রাকৃতভাবে লীন অবস্থা। তাহাতে অচিৎ সম্বন্ধ তিরোহিত হয় না। সুতরাং সে অবস্থা হইতে ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু টেঙ্গলইগণ বলেন যে, কৈবল্য ভগবদ্‌ধামস্থিতি না হইলেও প্রকৃতি-বিযুক্তভাবে আত্মার স্বরূপবস্থিতি। তাই সেখান হইতে যেমন ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়, তেমনই অধোগতি বা স্বরূপ-বিচ্যুতিও রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ এই অবস্থা হইতে যেমন জড়জগতে পতনের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই ভগবদ্ধামে যাইবারও কোনও উপায় নাই।

মোক্ষাবস্থায় যে ভগবদানন্দের বিকাশ হয় সে সম্বন্ধেও উভয় শাখায় কিছু কিছু মতানৈক্য দৃষ্ট হয। বড়গলইগণ মুক্ত আত্মার আনন্দোপলব্ধিতে বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না। টেঙ্গলইগণ বলেন যে, যদিও ভগবদানন্দে ন্যূনাধিক্য নাই তথাপি জীবমাত্রেরই স্বভাবগত বৈচিত্র্যানুরূপ সেবাভেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ভগবদানন্দের আস্বাদন সকল জীবের পক্ষে একপ্রকার হয় না।

শ্রী অথবা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও উভয় শাখাতে মতভেদ আছে। বড়গলইগণ বলেন যে, নারায়ণের ন্যায শ্রীরও মোক্ষদানে সামর্থ্য আছে, টেঙ্গলইগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে শ্রী শুধু মধ্যবর্তিনী হইয়া জীবকে ভগবানের কৃপামাত্র হইতে সাহায্য করেন।"

(ভারতীয় সাধনার ধারা, শ্রী সম্প্রদায়, পৃ ২৩—২৫)

পিলই লোকাচার্যের পর শ্রীশৈলেশের শিষ্য বরবর মুনি বা রম্যজামাতৃমুনি বা মনবল মহামুনি টেঙ্গলই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী আচার্য। ইনি ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭৩ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীবচনভূষণের ও তত্ত্বত্রয়ের টীকা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি বিংশতি শ্লোকে 'যতিরাজবিংশতি' নামে রামানুজের একখানি প্রশস্তি রচনা করেন। সংস্কৃত ও তামিল উভয় ভাষায় ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তামিল ভাষায় ইনি 'উপদেশ রত্নমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে আলোয়ার ও অন্যান্য অনেক তামিল আচার্যদিগের জীবনের কাহিনীসকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

(দ্রঃ ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ কৃত ভারতীয় সাধনার ধারা গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত')

ব্রহ্মসম্প্রদায় ঃ

মধ্বাচার্য—রামানুজের পর ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইতে আরও যে কয়েকটি বৈষ্ণবমত স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমৎ মধ্বাচার্য কর্তৃক স্থাপিত

মতের নাম 'দ্বৈতমত'। তাঁহার ভাষ্যের নাম 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন'। কালের গণনা হিসাবে রামানুজের পরবর্তী আচার্য মধ্ব। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

মধ্বাচার্যের পিতৃদত্ত নাম বাসুদেব, কিন্তু 'আনন্দতীর্থ' এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামেই সমধিক পরিচিত। মধ্যগেহ নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং বেদবতী বা বেদবিদ্যা বা দেবতানাম্নী জননীর গর্ভে, দক্ষিণ কানাড়া দেশস্থ উডীপী জেলার অন্তর্ভুক্ত বিশ্বগ্রামে শ্রীমান্ মধ্বাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান প্রসিদ্ধ শাঙ্কর মঠ শৃঙ্গেরী হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

মধ্বাচার্য লোকোত্তর অধ্যাত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধবশতঃ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া উডীপীর পীঠপুরের অনন্তেশ্বর মন্দিরে সন্ন্যাসী অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষায় দীক্ষিত হন। তখন হইতেই তিনি 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ঘটনা তাঁহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন (দ্রঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রণীত "Sri Madhva and Madhvaism", পৃঃ ২১-২২)। পরে আচার্যাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া 'আনন্দতীর্থ' নাম গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি দিগ্‌বিজয় করিবার জন্য বহির্গত হন। ত্রিবান্দ্রামে তৎকালীন শৃঙ্গেরী মঠাধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্করের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাশঙ্কর ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে মঠাধীশের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—সম্ভবতঃ ইহার কিছু পরেই এই বিচার সংঘটিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, বিচারে মধ্বাচার্য পরাভূত হইয়াছিলেন। এই পরাজয়-স্মৃতি মধ্বাচার্যের মনে চিরদিন জাগরূক ছিল। রামেশ্বরেও শাস্ত্রার্থ হইয়াছিল। আচার্য রামেশ্বর হইতে শ্রীরঙ্গম্ হইয়া উডীপীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার আর্যাবর্ত পরিভ্রমণ ইহার পরবর্তী ঘটনা। তখন দেশ বনাকীর্ণ ছিল—বহুস্থানে দস্যু ও বন্যজন্তুর উপদ্রব ছিল। এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও অনেক বিরুদ্ধমতাবলম্বী রাজগণকে প্রবোধিত করিয়া আচার্য হরিদ্বারে উপস্থিত হন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ব্যাসাসনের উদ্দেশ্যে উত্তরাখণ্ডের কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করেন। কথিত আছে, বদরিকাশ্রম বা তৎসন্নিহিত কোন রমণীয় স্থানে কিছুদিন তপশ্চর্যা করিবাব পর ব্যাসদেব তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হন। তাঁহার আদেশে তিনি হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনায় এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনায় ব্যাপৃত হন।

মধ্বাচার্যের পরে তাঁহার আসন শোভনভট্ট 'পদ্মনাভতীর্থ' নাম গ্রহণ পূর্বক

অধিকার করেন। পদ্মনাভতীর্থের শিষ্যপরম্পরা যথাক্রমে এইরূপ—নরহরিতীর্থ'—'মাধবতীর্থ'—'অক্ষোভ্যতীর্থ'—'জয়তীর্থ'—'বিদ্যাধিরাজতীর্থ'—রাজেন্দ্রতীর্থ'—'বিজয়ধ্বজতীর্থ' ইত্যাদি। ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর মতে বিজয়ধ্বজের সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন আচার্য 'ব্যাসরাজ স্বামী' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভেদোজ্জীবন, ভন্যায়ামৃত', তর্কতাণ্ডব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র দার্শনিক সাহিত্যে দ্বৈতসিদ্ধান্তের পরিপোষক বিচার গ্রন্থের মধ্যে ন্যায়ামৃতের স্থান অতি ঊর্ধ্বে। শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদে যত প্রকার দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে তাহার প্রত্যেকটি যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়া ব্যাসরাজ স্বামী দ্বৈতদর্শনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গোপীনাথ কবিরাজজীর মতে এক সময়ে এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতীকে অদ্বৈতবাদের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' ইহারই পরিণত ফলস্বরূপ।

দ্বৈতসিদ্ধান্ত—শঙ্করাচার্য যেরূপ তাঁহার অদ্বৈতবাদ হইতে যাবতীয় দ্বৈতাভাস বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, মধ্বাচার্য সেইরূপ তাঁহার প্রচারিত দ্বৈতসিদ্ধান্তকে সকল প্রকার অদ্বৈতবাদ হইতে বিনির্মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মে স্বগত ভেদ পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ভেদমাত্রই মায়াকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা—পারমার্থিক নহে। মধ্বসিদ্ধান্ত ইহারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। মধ্বমতে ভেদ নিত্য এবং পারমার্থিক। মধ্বাচার্য বায়ুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন, বিষ্ণুপ্রাধান্য প্রচার ও দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মসূত্র মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই। রামানুজ জীব ও জগত্কে ঈশ্বরের দেহস্থানীয়রূপে কল্পনা করিয়া শ্রুতিবাক্যের সঙ্গে তাঁহার মতের সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন। মধ্বাচার্য রামানুজের মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জগৎকে ঈশ্বরের উপাদানরূপে গ্রহণ দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করা হয়। মধ্বাচার্য মনে করেন, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতভাব প্রকাশক শ্রুতিসকল মুক্ত-আত্মার প্রশংসাসূচক অর্থবাদ মাত্র। মধ্বাচার্য ছিলেন কট্টর দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এবং জীব, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি, জীব এবং জীব, জীব এবং জড়, জড় ও জড় ইহাদের মধ্যে চিরন্তন পার্থক্য রহিয়াছে। এই মতে বিষ্ণু সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী এবং জীব ও জড়-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার দেহ সর্বপ্রকার জীব ও জড়

নিরপেক্ষ সচ্চিদানন্দময় কোষবিশিষ্ট। লক্ষ্মী তাঁহার নিত্য সহচরী হইলেও তাঁহা হইতে পৃথক। তাঁহার ন্যায় লক্ষ্মীও নিত্য এবং সদামুক্ত। লক্ষ্মীরও সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ। এই মতে ব্যূহের কোন স্থান নাই, বাসুদেবেরও উল্লেখ নাই। এই মতে বিষ্ণু পরমাত্মা এবং বিষ্ণুব অবতার রাম, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা রূপে উল্লেখিত হইলেও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ রাধা ও গোপীদিগের কোথাও উল্লেখ নাই। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনলীলাব কোন স্থান নাই। (দ্রঃ ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত ভারতীয় সাধনার ধারা, দ্বৈতসিদ্ধান্ত)।

হংসসম্প্রদায়ঃ

কথিত আছে যে সনকাদি মহর্ষিদিগকে নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ 'হংসরূপে' অবতীর্ণ হন। 'নারদ' হংসরূপী ভগবানের অনুচর। 'নিম্বার্ক' নারদের শিষ্য। এইজন্য নিম্বার্ক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম 'হংসসম্প্রদায়'। ইহাকে 'সনকসম্প্রদায়'ও বলা হইয়া থাকে। এই মতে 'সনক' হইতে এই ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

নিম্বার্ক দক্ষিণদেশীয় তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ। বেলেরি জিলায় নিম্ব নামক গ্রামে অরুণি মুনির ঔরসে জয়ন্তী দেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি নিম্বগ্রামের অর্ক-আদিত্য, এইজন্য তাঁহাকে নিম্বার্ক, নিম্বাদিত্য বলা হয। ইহা ছাড়া নিম্বভাস্কর, নিয়মানন্দ প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। তবে 'নিম্বার্ক' নামই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদ অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। নিম্বার্কের পূর্বে 'ভাস্করাচার্য' এই মতের সমর্থক ছিলেন। ভাস্করাচার্যের ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন দেখিতে পাওযা যায়। প্রবাদ এই যে নিম্বার্কের প্রথম নাম ভাস্কর ছিল। সেইজন্য অনেকে নিম্বার্ক ও প্রাচীন ভাষ্যকার ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীর অভিমতে "এইরূপ কল্পনার কোন মূল নাই। ভাষ্যকর্তা ভাস্কর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি রামানুজের পূর্ববর্তী, কারণ শ্রীভাষ্যাদি বহু গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ন্যায়াচার্য উদয়ন স্বরচিত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে (দ্বিতীয় স্তবক) ভাস্করের সমুল্লেখপূর্বক সমালোচনা করিয়াছেন— "ব্রহ্মপরিণ তেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।" উদয়নের আবির্ভাবকাল ৯০৬ শকাব্দ বা ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। শঙ্করমতবিমর্দক ভাস্করাচার্য শঙ্করের পরবর্তী এবং উদয়নাচার্যের পূর্ববর্তী।"

হংসসম্প্রদায়ের মূল প্রামাণিক গ্রন্থ নিম্বার্করচিত 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক বেদান্তভাষ্য। ইহা ছাড়া 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামক দশ শ্লোকী গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। নিম্বার্কের এই দশশ্লোকীতে সংক্ষিপ্তভাবে জ্ঞেয় পঞ্চবিধ পদার্থের নিরূপণ আছে। উপাস্যের স্বরূপ, উপাসকের স্বরূপ, কৃপা ফল, ভক্তিরস এবং প্রাপ্তির বিরোধীর স্বরূপ—এই অর্থপঞ্চক অতি সুন্দর ও সহজভাবে দশটি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। নিম্বার্কের আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ, রাধা এবং রাধার সহচরী সহস্র গোপী।

রামানুজের সম্প্রদায় উত্তরকালে বড়দলই ও টেঙ্গলই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। বড়দলইগণ রামানুজের প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ অনুসরণ করিতে থাকে, কিন্তু টেঙ্গলই সম্প্রদায় নৃত্যগীতাদি সহকারে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নিবন্ধন আত্মবিস্মৃত ভাবকে ভক্তিসংজ্ঞা দেয়। নিম্বার্কের সাধনায় যে ভক্তি, তাহা এই টেঙ্গলই সম্প্রদায়ের ভক্তি। তিনি বৃন্দাবনে জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করেন। বর্তমান কালেও বৃন্দাবন ও মথুরা অঞ্চলে, রাজপুতানা এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। সন্তদাস বাবাজী এই সম্প্রদায়ের শেষ মহন্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী।

নিম্বার্কের শিষ্য 'শ্রীনিবাস'। ইনি নিম্বার্কের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভে'র উপর 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামে উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। গুরুপরম্পরাক্রমে 'দেবাচার্য' শ্রীনিবাস হইতে অধস্তন। ইনি 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' নামক ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যার রচয়িতা। ইঁহার পরে 'সুন্দরভট্ট' সিদ্ধান্তজাহ্নবীর উপরে 'সেতু' নামক একখানি উৎকৃষ্ট টীকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুন্দরভট্টের পরে প্রধান আচার্যের নাম 'কাশ্মীর কেশব ভট্ট' ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার গুরুনাম 'মুকুন্দ'। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ বেদান্তকৌস্তুভের টীকা 'কৌস্তুভ-প্রভা'।

('দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' সম্পর্কে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার 'ভারতীয় সাধনার ধারা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

রুদ্রসম্প্রদায়ঃ

ব্রহ্মসূত্রকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া যে সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের পরবর্তী সম্প্রদায় বল্লভাচার্য কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়কে রুদ্রসম্প্রদায় বলে। বল্লভাচার্যের মতকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মতের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা 'বিষ্ণুস্বামী'। বিষ্ণুস্বামী নামক প্রাচীন আচার্য এই মত প্রবর্তন করিয়াছিলেন, পববর্তীকালে বল্লভাচার্য

তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে বিষ্ণুস্বামী দিল্লী-সম্রাটের অধীনস্থ একজন দ্রাবিড়দেশীয় রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণীত হয় নাই তবে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী যুক্তিপ্রয়োগে নির্ণয় করিয়াছেন যে, "বিষ্ণুস্বামীর সময় ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" নাভাজি রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর পরে জ্ঞানদেব, নামদেব, ত্রিলোচন ও পরিশেষে বল্লভাচার্য তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লভাচার্য ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য রচনা দ্বারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। "জগৎ ব্রহ্মের দেহ (রামানুজের মত) বা শক্তির বিকাশ (নিম্বার্কের মত) এই কথা ঠিক নহে। ব্রহ্ম সৎ চিৎ এবং আনন্দ। তিনি তাঁহার যে অংশে চিৎ এবং আনন্দ অপ্রকট রাখেন তাহা জড়, এবং যে অংশে কেবল আনন্দ অপ্রকট রাখেন তাহা জীব। এই প্রকট অপ্রকট অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা তিনি করেন কেন? ইহা তাঁহার লীলা। এই মতের নাম শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।"

(প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ প্রণীত 'হিন্দুপ্রমাবিজ্ঞান' বা 'ন্যায় সোপান' হইতে উদ্ধৃত।)

বল্লভাচার্য লক্ষ্মণ ভট্ট নামক একজন কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম এলমাগার। লক্ষ্মণ ভট্ট সস্ত্রীক তীর্থযাত্রাব্যপদেশে কাশীধামে রওনা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তানই পরে বল্লভাচার্য নামে খ্যাতি লাভ করে। বল্লভের আবির্ভাবকাল ১৫৩৫ বিক্রমাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন। বল্লভাচার্য বৃন্দাবন এবং মথুরাতে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে গোবর্ধন পর্বতে দেবদমন বা শ্রীনাথ নামক গোপালকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দান করেন। কথিত আছে যে, ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া স্বকীয় মন্দির নির্মাণ ও পুষ্টিমার্গ প্রচারের জন্য আদেশ করেন।

বল্লভাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যই শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ের উপজীব্য প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতটীকা সুবোধিনী, গীতা টীকা, তত্ত্বদীপনিবন্ধ অথবা তত্ত্বার্থদীপ, নিবন্ধপ্রকাশ, পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদাভেদ, কৃষ্ণপ্রেমামৃত, সিদ্ধান্তরহস্য, সেবাফলবিবৃতি, ভক্তিবর্ধিনী প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ এখনও তাঁহার সম্প্রদায়ে পরম আদরের সহিত অধীত ও আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহার পুত্র বিট্ঠলনাথ অথবা বিট্ঠলেশ্বর দীক্ষিতও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমামৃত টীকা, রত্নবিবরণ, ভক্তিহংস, বল্লভাষ্টক, পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদাভেদটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণবদর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। নামরূপে প্রকাশিত জগৎকে

যে আমরা নানারূপে দেখি এবং ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা যে আমরা জানিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের অবিদ্যা। জীব ব্রহ্মেরই অংশ, স্বরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও অণুস্বভাব। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল উত্থিত হয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে তদ্রূপ স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। যে স্ফুলিঙ্গে সত্ত্বের আধিক্য আনন্দের অপ্রকাশ তাহা জীব। জীবাত্মা মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন পরমাত্মার কোন রূপান্তরিত আত্মা নহে। পরমাত্মা যাহা, স্বরূপে জীবাত্মাও তাহা, তবে তাহাতে আনন্দ অংশ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অদ্বৈত। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মধ্যে যখন আনন্দ অংশ প্রকাশিত হয় তখন জীবও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়।

জীবাত্মাসকল দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী জন্ম-মৃত্যুর অধীন—তাহারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। এই অজ্ঞান হইতে যত দুঃখ। সংসার দুঃখের আগার, ইহা সম্যকরূপে অবগত হইয়া ঈশ্বরের দিকে যখন তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তখন ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণের আকাঙক্ষা মনে জাগ্রত হয়। ভগবানের চিন্তা ও তাঁহার সেবার প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাঁহার ধ্যান ও সেবা তখন জীবনের প্রধান কর্ম হয়। এই অবস্থা প্রাপ্তি হইতে ভগবৎপ্রসাদে তাহাদের মোক্ষ লাভ হয়।

অপর শ্রেণীর জীবাত্মা জীবন্মুক্ত। মুক্ত জীব তিন প্রকার। এক প্রকার মুক্ত জীব পূর্বজন্মের সুকৃতিফলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করে। সনক সনাতন প্রভৃতি এই শ্রেণীর মুক্তজীব। দ্বিতীয় প্রকার মুক্তজীব বিষ্ণুলোকে নারায়ণের সালোক্য লাভ করিয়া তথায় অবস্থান করে। তৃতীয় প্রকার জীবেরা স্বতঃই সত্ত্বপ্রধান। তাঁহারা সর্বদা ভগবদ্‌ভক্তদের সঙ্গে বাস করে ও ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ভগবদারাধনায় অনুরক্ত হয়। ভক্তির গাঢ়তা হইতে ইহা যখন অহৈতুকী ভক্তিতে পরিণত হয় তখন তাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলায় তাঁহার পার্ষদের অংশ গ্রহণের অধিকার লাভ করেন।

বদ্ধজীবদিগের মধ্যে যাহাদের অন্তঃকরণ তমোগুণপ্রধান তাহারা ভগবদ্ভাব বিবর্জিত হইয়া জন্মমৃত্যুর অনুবর্তন করে।

যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য তাঁহারা দুই শ্রেণীর—মর্যাদা জীব ও পুষ্টিজীব। মর্যাদা জীবগণ ভগবদ্‌ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার সহিত নৈতিক বিধি ও আচার সকল পালন করেন। পুষ্টিমার্গের জীব ভগবানের অনুগ্রহ ও প্রসাদের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন।

তাঁহারা সকলেই পরিণামে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু মর্যাদামার্গী ও পুষ্টিমার্গীর মুক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। মর্যাদামার্গের জীবের মুক্তি বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ, পুষ্টিমার্গের ভক্ত সাযুজ্য চাহে না। তাহারা চিনি হইতে চাহে না, চিনি আস্বাদনের অভিলাষী হইয়া ভগবানের লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে চাহে।

বল্লভাচার্যের মতে জগতের পালন কর্তা বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ যে বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন তাহার উপর আর এক ব্যাপী বৈকুণ্ঠ আছে। এই ব্যাপী বৈকুণ্ঠে পুরুষোত্তমের স্থান। তথায় তিনি ভক্ত পার্ষদদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিত্য বিহার করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষোত্তম, তিনি পরমব্রহ্ম। তাঁহার হস্তপদাদি অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দঘন। তরুলতাদি পরিশোভিত বৃন্দাবন ব্যাপী বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত। ইহা কৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র। তিনি সকল আনন্দের শ্রেষ্ঠ আনন্দ—পরমানন্দ। তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সৎ অংশকে আনন্দ অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বয়ং অক্ষরব্রহ্মরূপে সকল কারণের কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এবং এই সকলের নিয়ামক হইয়া অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণের অর্থাৎ পুরুষোত্তমের চিন্ময় সত্ত্বগুণ বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করে।

পুষ্টি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ হইতে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মে। পুষ্টিভক্তি চারি প্রকার—(১) প্রবাহ পুষ্টিভক্তি ; (২) মর্যাদা পুষ্টিভক্তি ; (৩) পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি ; (৪) শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। প্রবাহ পুষ্টিভক্তিতে জীবন প্রবাহে আমি ও আমার জ্ঞান বর্তমান থাকে, কিন্তু সদাচারনিষ্ঠ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। ইহার লক্ষ্য, পরিণামে ভগবৎ সামীপ্য লাভ। মর্যাদা পুষ্টিভক্তির লক্ষণ, সংসারের সর্বপ্রকার ভোগ বিলাস হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখিয়া ভগবানের নাম কীর্তন ও তাঁহার প্রসঙ্গকে জীবনের সম্বল করা।

পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি—যাঁহারা পূর্ব হইতে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর বিশেষ করুণার অবতরণ বা শক্তিপাত হয় যাহা হইতে ভগবান্ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। এই বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সাধনমার্গ সকল নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন। এই পথে ভগবৎপ্রসাদের সঙ্গে পুরুষকারেরও স্থান রহিয়াছে।

শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি—ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের করুণা ও অনুগ্রহ সাপেক্ষ। ভক্তের নিজের চেষ্টাতে তাহা জন্মে না। ভক্ত নিজের দেহ, মন, চিন্তা, ভাবনা সকলই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উন্মাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভক্তগণ পুরুষোত্তমের (কৃষ্ণের) নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণের অধিকারী হয়। তাহারা গাভী এবং অপরাপর পশু, পক্ষী, তরু, লতা, নদী ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়া পুরুষোত্তমের সহচররূপে অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। কোন কোন ভক্ত পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত নিত্য বৃন্দাবনে গোপ ও গোপীরূপে এই লীলার অংশী হন।

মর্যাদা ভক্ত সাযুজ্য মুক্তি কামনা করে। শুদ্ধ পুষ্টিমার্গের ভক্ত আরাধ্য

দেবতা সহ একত্বরূপ মুক্তির অভিলাষী না হইয়া কৃষ্ণরসামৃতপানে বিভোর থাকিতে চায়।

ব্রজ ও বৃন্দাবনে রাখাল বেশে কৃষ্ণের লীলা। তথাকার অধিবাসী স্ত্রী, পুরুষ, অপরাপর জীবজন্তু, তরু-লতা, যমুনা ইত্যাদি যাহা কিছু এই সকলকে লইয়া গোপাল কৃষ্ণ যে-সকল লীলা করিয়া থাকেন, বল্লভাচার্য স্থাপিত বৈষ্ণবধর্মে ইহারাই প্রধান বিষয়।

নিম্বার্কের স্থাপিত মতে বৃষভানুর কন্যার আরাধনার কথা আছে। তথায় বলা হইয়াছে, তিনি সহস্র সহস্র সহচরীদ্বারা সেবিতা হইয়া কৃষ্ণের বামদেশে বিরাজ করেন এবং ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। বল্লভাচার্যের মতে রাধার স্থান আরও উপরে। বিষ্ণু বা নারায়ণ যে-বৈকুণ্ঠে বাস করেন তাহার উপরে গোলোকধামে লীলারসময় কৃষ্ণ ও রাধিকার নিত্য লীলা চলিতেছে। ঐ লীলা দর্শন ও তাহাতে অংশ গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন করা এই মতে চরম লক্ষ্য।

রামানুজ ও মধ্বাচার্য স্থাপিত বৈষ্ণবধর্মদ্বয়ে বৃন্দাবন লীলার কোন স্থান নাই। ইহাদের কোথাও কৃষ্ণ বা গোপীদিগের কোন উল্লেখ নাই। নিম্বার্কাচার্য স্থাপিত মতে উহারা প্রধান আরাধ্য দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, বল্লভাচার্যসম্প্রদায় বহুল পরিমাণে তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

এইবার ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল—

জীবের স্বরূপ—বল্লভমতে জীবাত্মা অণুপরিমাণ, ব্রহ্মাংশ এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কারণাত্মক অক্ষরব্রহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দাত্মক অণু অংশ, বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায়, নিঃসৃত হয়। অক্ষরব্রহ্ম বা ভগবানের স্বাভাবিক ধর্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বও এই ভাবে খণ্ডিত হইয়া অণু পরিমাণে প্রতি অংশের সহিত যুক্ত থাকে। মূল হইতে অংশ নিঃসৃত হইলে ভগবদিচ্ছায় প্রতি অংশেই সত্ত্বাংশ প্রবল হয় এবং আনন্দাংশ তিরোহিত হয়। এই চিৎপ্রধান, লুপ্তানন্দ, নিরুপাধিক ব্রহ্মাণুই জীবশব্দবাচ্য। ভগবানের চিদংশই জীব। সৃষ্টিকালেই জীব হইতে ভগবানের আনন্দাংশ তিরোহিত হয়—ঐশ্বর্যাদির তিরোভাব তারপরে হয়। জীব অণু বটে, কিন্তু ভগবদাবিষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ আনন্দাংশের অভিব্যক্তি কালে ব্যাপকতা প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম তাহাতে প্রকটিত হয়। আনন্দাংশের সম্বন্ধবশতঃ চিদংশে ব্যাপকতা প্রকাশিত হয়।

'শুদ্ধ', 'বদ্ধ' বা সংসারী এবং 'মুক্ত' ভেদে জীব ত্রিবিধ। ব্রহ্ম হইতে অণু নির্গত হওয়ার পরে আনন্দাংশ তিরোহিত হইলে যে অবস্থার বিকাশ হয় তাহাকে 'শুদ্ধ জীবভাব' বলে। ইহা শুদ্ধ চিদ্‌ভাব মাত্র। ইহার পরে

অবিদ্যাসম্বন্ধ সংঘটিত হইলে জীব 'বদ্ধ' বা সংসারী হয়। তখন তাহার ঐশ্বর্যাদি গুণ তিরোভূত হয়। এই বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ দৈবভাবাপন্ন, কেহ বা আসুরভাবাপন্ন। ভগবান্ যাহাদিগের সহিত লীলা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে 'মুক্তি'র যোগ্যতাসাধক দৈবত্ব প্রদান করেন। আসুরজীব ভগবান্‌কে পায় না, কারণ তাহাতে মায়াজনিত মোহবশতঃ জ্ঞান ভক্তিরূপ ভগবৎ-শক্তিদ্বয়ের কার্য হয় না বলিয়া সাযুজ্য হইতে পারে না। প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট অসুরগণ আনন্দের লেশও পায় না।

মুক্ত জীব দ্বিবিধ—জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত। অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা চলে। সনকাদি মুনিগণ জীবন্মুক্ত। যাঁহারা ব্যাপক বৈকুণ্ঠ বা পরমব্যোম ব্যতীত অন্যান্য ভগবল্লোকে বাস করেন তাঁহারা মুক্ত। তারপর ভগবানের বিশিষ্ট কৃপার ফলে পরব্যোমে প্রবেশ হইলে পরামুক্তি বা বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব ঘটিয়া থাকে।

পরব্রহ্মের স্বরূপ—বল্লভীয়গণ পরব্রহ্মকে নিত্যানন্দস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। ইনি পুরুষোত্তমশব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত সকল ধর্মই তাঁহাতে সর্বদা প্রকটিত, তাঁহার সকল লীলাই নিত্য। যখন পরব্রহ্মে বহু হইবার ইচ্ছা উদিত হয় তখন রূপান্তরের আবির্ভাব হয়। এইরূপ সর্ব কারণের কারণ অক্ষরব্রহ্ম। এই অবস্থায় সত্ত্বের প্রাধান্যে আনন্দাংশ তিরোহিতপ্রায় থাকে। অক্ষরব্রহ্ম ভক্ত ও জ্ঞানীর নিকট ভিন্নভাবে প্রতীত হন। ভক্ত দেখেন তিনি ব্যাপিবৈকুণ্ঠাদি লোকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। জ্ঞানীর নিকট অক্ষরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, দেশ ও কালের অতীত, স্বপ্রকাশ, গুণাতীতরূপে ভাসমান হন। এইভাবে প্রকাশমান ব্রহ্মে যাবতীয় ধর্মের তিরোভাব হয়। এইজন্য অক্ষরব্রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া বর্ণিত হয়। দুঃখাদি মায়িক ধর্ম; ব্রহ্মে দুঃখাদি নাই বলিলে দুঃখাদির মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়।

পুরুষোত্তমের একরূপ 'অন্তর্যামী'। ইহাই মুখ্য অন্তর্যামী। ইঁহারই নামান্তর পুরুষ বা নারায়ণ। পুরুষ হইতেই মৎস্যাদি লীলাবতার আবির্ভূত হইয়া থাকে। অক্ষর হইতে যে সকল অন্তর্যামী নির্গত হয় তাহারা এই মুখ্য অন্তর্যামীর অংশ। তাঁহারা জীবের প্রতি শরীরে বিভিন্ন রূপে অবস্থান করেন এবং সেই সেই জীবের নিয়ামক হন। সুতরাং জড় ও জীবের অন্তর্যামীসমূহে মুখ্য অন্তর্যামীর এক এক অংশ মাত্র প্রকট হয়।

বল্লভীয়গণ বলেন যে, ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক বিগ্রহের নাম বিষ্ণু। এই প্রকার ভগবান্ অপ্রাকৃত রজোবিগ্রহে আবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা এবং অপ্রাকৃত তমোবিগ্রহে আবিষ্ট হইলে শিব আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা তিনটিই গুণাবতার। ইঁহারা অপ্রাকৃত বিগ্রহ হইলেও প্রাকৃত তিন গুণের নিয়ামক বলিয়া 'সগুণ'।

অংশী কৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। যদিও গুণাবতার, তথাপি বিষ্ণুই উৎকৃষ্ট।

মুক্তির স্বরূপ—মুক্তি সগুণা ও নির্গুণা ভেদে দ্বিবিধ। যে-কোন দেবতার উপাসনা করা যায় তার মুখ্য ফল তাহার সহিত সাযুজ্য। তবে দেবতা সগুণ হইলে সে সাযুজ্য সগুণা মুক্তি। অন্যত্র নির্গুণা মুক্তি। ভগবান্ ব্যতীত সবই সগুণ। তাই কৃষ্ণসাযুজ্যই নির্গুণ মুক্তি।

জ্ঞানমার্গে নির্গুণ মুক্তি হয় না। জ্ঞানমার্গের মুক্তি কৈবল্য বা জীবন্মুক্তি। কৈবল্য "সাত্ত্বিক জ্ঞান"—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্।" ইহা সাত্ত্বিক মুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। জ্ঞানী সংসারে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সগুণ ভাব। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীবন্মুক্তি হয়—তখন অধ্যাস বা আসক্তি থাকে না। জীবন্মুক্তি সগুণ—কারণ তখন বিদ্যা ও অবিদ্যার বশীভূত জীবভাব থাকে। ব্রহ্মভাবের পরে ভক্তির উদয় হয়—গুণাতীতে প্রবেশ হয়। ভক্তি না হইলে কেবল জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে হয়—উহা সনকাদির ন্যায় সগুণভাব মাত্র। জীবন্মুক্তি পর্যন্ত সগুণভাব, পরে ভক্তিলাভে নির্গুণতা। প্রথমটি কেবল জ্ঞান, দ্বিতীয়টি জ্ঞানভক্তি। প্রথম ভাবের দৃষ্টান্ত সনকাদি, দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত শুকদেবাদি। ভগবানের শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্য। বল্লভীয় মতে ভগবানের এই মাহাত্ম্যজ্ঞান না হইলে ভক্তির উদয় হয় না। ভক্তি দ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া দর্শন দেন। ভগবানের প্রসাদ ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অন্য কোন উপায় নাই। অতএব ভক্তিই পরামুক্তির হেতু। এইরূপ মুক্তির মূল কারণ ভগবৎপ্রসাদ। ইহাই প্রকৃত মুক্তির স্বরূপ। গীতা ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবানের যে স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা ভক্তির বিষয় বলিয়া জ্ঞানক্রিয়াবিশিষ্ট সাকার এবং অনন্ত গুণপূর্ণ। ইহাই কৃষ্ণ বা পুরুষোত্তমপদবাচ্য। পরাভক্তির ফলে ভগবানের এই সাকার রূপই প্রকট হইয়া থাকে।

মার্গের স্বরূপ—বল্লভাচার্যপ্রদর্শিত মার্গের নামান্তর 'পুষ্টিমার্গ'। ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপাকে পুষ্টি বলা হয়। পুষ্টি হইতে চতুর্বিধ ফলই লাভ হইতে পারে। যে পুষ্টি হইতে চতুর্বর্গফল লাভ হয় তাহা সামান্য পুষ্টি। বিশিষ্ট পুষ্টি হইতে ভগবৎস্বরূপ-প্রকটকারী ভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার পুষ্টি হইতে উৎপাদ্য ভক্তির নাম পুষ্টিভক্তি। একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহই পুষ্টিভক্তি লাভের উপায়।

ভক্তিমাত্রই ভগবানের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। সামান্য অনুগ্রহ হইতে যে ভক্তির উদয় হয় তাহা মর্যাদাভক্তি। বিশিষ্ট কৃপা হইতে যে ভক্তি জন্মে তাহার

পারিভাষিক নাম পুষ্টিভক্তি। পুষ্টিভক্তিতে একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তিই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। মোক্ষ পুষ্টিভক্তের নিকট তুচ্ছ। পুষ্টিভক্তি চারি প্রকার—

১। 'প্রবাহপুষ্টিভক্তি'। ইহাতে ভগবদুপযোগী ক্রিয়াপ্রবৃত্তি থাকে।

২। 'মর্যাদাপুষ্টিভক্তি'। এই জাতীয় ভক্তিতে বিষয়াসক্তি রহিত হয় ও ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

৩। 'পুষ্টিপুষ্টিভক্তি'। এই প্রকার ভক্ত সর্বজ্ঞতা লাভ কবে। ইহাবা ভগবানকে, তাঁহার পরিকর, লীলা, প্রপঞ্চ প্রভৃতি সবকিছুকে জানে।

৪। 'শুদ্ধপুষ্টিভক্তি'। এই জাতীয় ভক্ত প্রেমপ্রধান। এইপ্রকাব ভক্তি অতি দুর্লভ। এই মার্গে ভগবৎপ্রাপ্তিই ফল, কিন্তু তাহার জন্য সাধনার অপেক্ষা নাই। সিদ্ধিলাভ শুধু অনুগ্রহ সাপেক্ষ, যত্ন সাপেক্ষ নহে। এই মার্গে ভগবান্ জীবকে স্বেচ্ছায় অহেতুক বরণ করেন।

শুদ্ধাদ্বৈত মতে জীব ব্রহ্মরূপ বটে, কিন্তু অংশাত্মক রূপ। এই অংশাত্মক রূপ অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং স্বাভাবিক অংশকে পুনবায় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং অবিদ্যাদোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য ভজন করিতে হয়। ঐশ্বর্যাদি বিভূতি এবং অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই ভগবদ্রূপত্ব লাভ হয়। মুখ্য ভক্তগণ ভগবৎ-সাম্য লাভ করিলেও সেখানে তারতম্য থাকে। কারণ, বৈচিত্র্য ভিন্ন সম্যক্প্রকার রমণ হয় না বলিয়া তারতম্য থাকে।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অধিকার ভেদে প্রত্যেকটি মার্গই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তবে তাহাতে নিষ্ঠা থাকা চাই—নিষ্ঠার অভাবে ফললাভের আশা সুদূরপরাহত। **নিষ্ঠার মূল সাধন। সাধন ব্যতিরেকে কোন মার্গেই ফল পাওয়া যায় না।** জ্ঞানে নিষ্ঠা হইলে সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। কমনিষ্ঠার ফল চিত্তশুদ্ধি এবং ভক্তিনিষ্ঠার ফল ভগবৎপ্রসাদ। কালধর্মে বর্তমান সময়ে সকল অধিকারই একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছে। সাধনার দ্বারা অধিকার অর্জন এখন আর তত সুখসাধ্য নহে। এখন ভক্তিপূর্বক, শুধু বিধিপূর্বক নহে, ভগবৎ-সেবা ভিন্ন ফললাভের আশা নাই। জীবের অধিকার না থাকিলেও ভক্তি-সম্পদ্ থাকিলে ভগবৎ-কৃপাবলে ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কলিযুগ ভক্তিযোগের সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল সময়।

প্রপঞ্চের স্বরূপ—বল্লভ মতে প্রপঞ্চ মিথ্যা নয়—ইহা ভগবৎ স্বরূপাত্মক, সুতরাং সত্য। বল্লভাচার্য মায়াকে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া মনে করেন। এই শক্তির প্রভাবে ভগবান্ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিরপেক্ষভাবে সর্বাকার ধারণ করিতে পারেন। যাহাকে আমরা প্রপঞ্চ বলি তাহা ভগবানেরই আত্মরূপ, শুধু মায়াশক্তির প্রভাবে প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হয়। মায়ার ন্যায় অবিদ্যাও

ভগবানের শক্তি। এই শক্তির বশীভূত হইয়াই জীব সংসারদশা ভোগ করিয়া থাকে। প্রপঞ্চ ও সংসার এক পদার্থ নহে। 'আমি', 'আমার'—ইহাই সংসারেব রূপ। অজ্ঞান, ভ্রম প্রভৃতি শব্দ সংসারবাচক, প্রপঞ্চবাচক নহে। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক, তাহা কখনও অজ্ঞানকল্পিত বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে "স বৈ ন রেমে" "তস্মাৎ একাকী ন রমতে" "স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"—ইহা হইতে জানা যায় যে ভগবান্ রমণ বা আনন্দাস্বাদনের জন্যই প্রপঞ্চরূপে আবির্ভূত হন। প্রপঞ্চান্তর্গত সবই ভগবানের রূপ।

এই সংসাবে আমরা নিজেকে কর্তা বা ফল-ভোক্তা মনে করি, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, 'আমি', 'আমার'—ইহাই সংসারের রূপ। অবিদ্যাবশতঃ এই ভ্রমের উদয় হয়। যখন তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়, যখন সবই ভগবানের রূপ বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ ভ্রম বা সংসার নিবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয না। প্রপঞ্চ সত্য, তবে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইটি অবস্থা আছে। মুক্তি—অর্থাৎ জীবন্মুক্তি কালে সংসারের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয না। সহস্র সহস্র জীব মুক্ত হইয়া গেলেও প্রপঞ্চের লোপ হয় না। তবে যখন ভগবান্ আত্মরমণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন প্রপঞ্চেব রূপ তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায। অতএব ভগবানের ইচ্ছাই প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ। অবিদ্যা জীবের সংসার ভ্রমণের কারণ। বিদ্যার উদযে অবিদ্যারই নিবৃত্তি হয়, প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় না।

অবিদ্যার বিনাশ হইলে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয বটে, কিন্তু তাহা সম্যগ্ বিনাশ নহে। বিদ্যার ফল অবিদ্যার অভিভব মাত্র, যথার্থ বিনাশ নহে। সেই জন্য অবিদ্যা-নিবৃত্তি জন্য যে মুক্তি তাহা যথার্থ মুক্তি নহে। অবিদ্যা হইতে যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অধ্যাস উদিত হয়, বিদ্যা দ্বারা শুধু তাহাই উপমর্দিত হয়; সুতরাং জন্ম ও মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। ইহাও এক প্রকার মোক্ষ বটে—ইহার নামান্তর বন্ধ-নিবৃত্তি। বিশ্বমায়ানিবৃত্তিই যথার্থ মুক্তি, তাহা বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওযা যায় না। অতএব সংসার কাটিয়া গেলেও প্রপঞ্চের সত্তা বাধিত হয় না।

ব্রহ্ম বিভু বস্তু। কিন্তু প্রলয়কালীন আত্মরমণের অনন্তর যখন সৃষ্টির প্রারম্ভকাল উপস্থিত হয তখন তাঁহার বিভুত্ব তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়। তাঁহার প্রথম কার্য ইচ্ছাশক্তির ও তদনন্তর ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্মরূপা মায়াশক্তির প্রকাশ। এই মায়া দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ হন অর্থাৎ তাঁহার ব্যাপকতা বা অসীমতা তিরোহিতপ্রায় হয়। তখন দেশ প্রকটিত হয, মাযাবলে অংশসমূহ পবিচ্ছিন্ন হয় এবং এই পবিচ্ছিন্ন অংশ দ্বারা তিনি ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। মায়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন শক্তি। শাঙ্কব সম্প্রদায়ের অভিমত সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ

অনির্বচনীয় মায়া বল্লভাচার্য স্বীকার করেন না। ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছাই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ—এই সৃষ্টির বা প্রপঞ্চের উদ্ভব তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়।

আনন্দই ভগবানের আকার। তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ তাঁহা হইতে তাঁহারই স্বরূপভূত অসংখ্য চিদংশ প্রথম সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়। এই সকল চিদংশ ভগবানের আনন্দেরও অংশ বলিয়া সাকার। সাকাররূপে আবির্ভূত হইলেও ভগবৎ-ইচ্ছায় আনন্দের লোপবশতঃ নিরাকার হইয়াই জন্মে। ইহাদিগকে শাস্ত্রে জীব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল জীবের স্বরূপ ও ধর্ম উভয়ই চৈতন্য। ব্রহ্মের সদংশ হইতে জড়সৃষ্টি ও আনন্দাংশরূপে অন্তর্যামী সকলের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। জীব যেমন অসংখ্য, তেমনি অন্তর্যামীও অসংখ্য। প্রতি হৃদয়েই হংসরূপে জীব ও অন্তর্যামী উভয়ের স্থিতি আছে। অতএব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সদংশ জড, চিদংশ জীব এবং আনন্দাংশ অন্তর্যামী বা অন্তরাত্মা। জড়ে চৈতন্য ও আনন্দ তিরোহিত থাকে, জীবে আনন্দ তিরোহিত থাকে। অতএব জীব চিৎপ্রধান ব্রহ্মাংশ, আনন্দাংশ তাহাতে তিরোহিত। এই তিরোহিত আনন্দাংশ আবির্ভূত হইলেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দভাব জীবে প্রকটিত হয় এবং ব্যাপকত্বাদি ধর্মের আবির্ভাব হয়। ইহাই ব্রহ্মসাম্য বা ব্রহ্মভাব। তখন ব্রহ্মভূত জীবের দেহেও ব্রহ্মানন্দের ন্যায় জীব মধ্যস্থ চিদানন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তখন আর দেহের জড়ত্ব থাকে না, উহার ত্রিগুণাত্মকতা কাটিয়া যায় ও ব্রহ্মরূপতা আবির্ভূত হয়। দেহী জীবও তখন আর ভোক্তা থাকে না, ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। জীবে তিরোহিত আনন্দের পুনঃ আবির্ভাবও একমাত্র ভগবানের ইচ্ছামূলক।

ব্রহ্মের রূপ আছে কিনা—এই প্রকার প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হয়। বল্লভাচার্য বলেন যে, ব্রহ্মের রূপ আছে এবং সে রূপ ব্রহ্মাত্মক,—ব্রহ্ম হইতে রূপের কোনও ভেদ নাই। সেইজন্যই "আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি" প্রভৃতি শাস্ত্রবচনে ভগবান্ ও ভগবদ্দেহের চিদানন্দময়তা সমভাবে অঙ্গীকার করা হয়। এই চিদানন্দই রসপদার্থ—জীবের হৃদয়াকাশে ইহার অভিব্যক্তি হয়। অনন্যভক্তি ব্যতিরেকে এই প্রকার রসের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে।

আর এক কথা। ভগবান যেমন রসস্বরূপ, তেমনই তিনি সর্বরসের ভোক্তা। তিনি রস হইয়াও রসবান্। রসগণনায় শৃঙ্গার রসের স্থানই প্রধান। শৃঙ্গাররস রতি নামক স্থায়ী ভাবময়। সুতরাং ভগবান্ স্বরূপতঃ রতি হইয়াও রতিমান্। রতির যাহা আলম্বনবিভাব (যেমন ব্রজগোপী) তাহার ভাবানুসারে ভগবান্ শৃঙ্গাররসাত্মক। আলম্বন যে প্রকার, তাহার প্রতি ভগবানের ভাবও সেইপ্রকার। মনে রাখিতে হইবে ভাবও ভগবৎস্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নহে। ভগবান্ নিজেই রতি এবং নিজেই তাহার আস্বাদনকর্তা। যাঁহারা মনে করেন

লীলা অনুকরণমাত্র এবং প্রিয়াবিরহ ও তজ্জন্য ক্লেশাদি পূর্ণপ্রজ্ঞ পরমানন্দঘন সর্বব্যাপক ভগবানে সম্ভবপর নহে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিৎ যে লীলাগত বিরহ ভগবানের পূর্ণত্বের বাধক নহে। আর লীলা যে শুধুই অনুকরণ, ইহাও ঠিক নহে। ভগবান্ শৃঙ্গার রসস্বরূপ, এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রিয়াবিরহ ও মিলন এবং তৎকার্যাদি তাঁহাতে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন হেতু নাই। আর তাতে ব্রহ্মত্বের হানিও হয় না। কারণ, ব্রহ্মবস্তুতে যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ আছে। শ্রুতি তাহাই বলেন এবং সিদ্ধ ভক্তগণও তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার অচিন্ত্য মহিমা সর্ববাদিসিদ্ধ।

ভগবানের ধর্মও নিত্য ও সচ্চিদানন্দরূপ। যেসকল ভক্তকে তিনি স্বকীয় ঐশ্বর্যাদি ধর্ম দান করেন, যতদিন তাঁহার ইচ্ছা ততদিন তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ সকল ধর্ম অবস্থান করে। এই জন্যই বৈষ্ণবাচার্যগণ লীলাকেও নিত্য ও চিন্ময়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনায়াসে ক্রিয়মান কর্মকে 'লীলা' বলা হয়। ভগবানের 'নাম'ও লীলার ন্যায় নিত্য। ভগবানের প্রতিকৃতিতে ভজন ও স্মরণের ব্যবস্থা আছে। যেহেতু রূপ নিত্য এবং ভগবদাত্মক, সেইহেতু প্রতিকৃতিতে ভজন করিয়া যে ভগবৎপ্রসাদ লাভ করা যায় তাহা সত্য কথা। রূপ হইলেই নামেরও আবশ্যকতা আছে—নামও গুণকর্মানুরূপ ও নিত্য। বস্তুতঃ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম সবই নিত্য ও চিন্ময়।

(দ্রঃ ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত 'ভারতীয় সাধনার ধারা', 'বল্লভসিদ্ধান্ত')

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ঃ

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে তাহার নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ১৪০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। বাংলাদেশে সেই সময়ে শাক্তধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্তধর্মের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল এবং অনাচারেব বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে দাম্ভিকতা, সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অন্ত্যজ সম্প্রদায় উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত হইতেছিল। এ হেন সময়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে এবং তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্মের কূলপ্লাবিনী শক্তিতে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দু, মুসলমান, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন। জীবে দয়া, হরিভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য হরিনাম সংকীর্তন

প্রভৃতির উপর শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে তাঁহার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করিলেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, বাংলাদেশে তিনিই তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সার্বজনীন প্রেম ও ভালবাসার ফলে একদিকে বাঙ্গালী মানস প্রেমভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল, অপরদিকে সমাজ ও জীবনের বহিরঙ্গেও বৃহৎ মানবতার আদর্শ বিস্তার লাভ করিয়া বাঙ্গালী সমাজ ও মানসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে কবি জয়দেব অনুমান ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অননুকরণীয় মধুর ভাষায় গীতগোবিন্দ গ্রন্থে এবং তাঁহার পর পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তাঁহাদের রচিত পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে লীলার কীর্তন করিয়াছেন, সে-সকলই আধ্যাত্মিক রাজ্যে অপ্রাকৃত দেহে সংঘটিত লীলা। ভাষার লালিত্যে ও ভাবের মাধুর্যে ইঁহাদের তিন জনেরই রচনা জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার সমান মর্যাদা লাভের উপযুক্ত। চৈতন্যদেব যে ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই তিন জন মহাজনদের প্রভাব রহিয়াছে।

একদা মাধ্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধক মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া বাংলাদেশে আগমন করেন। দেখা যায়, তিনি সে সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশে তিনি কয়েকজনকে দীক্ষিত করেন, তন্মধ্যে হালিসহর নিবাসী ঈশ্বর পুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক বাইশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব যখন গয়ায় পিতৃদেবের পিণ্ডদান করিতে যান, তখন সেখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার চৈতন্যদেবের জীবনে এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। তার্কিক নিমাই পণ্ডিত হরিনামামৃতপানে একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন। অনেক ভক্ত-শিষ্য আসিয়া জুটিল। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, গদাধর, যবন হরিদাস, নিত্যানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুরারি গুপ্ত, দামোদর প্রভৃতি ভক্তদলের সমাবেশে নিমাইকে ঘিরিয়া নবদ্বীপে একটি বৈষ্ণব-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল।

জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজী-দলন প্রভৃতি কার্যে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের মহিমার প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অবৈষ্ণবগণের বিরোধিতাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নিমাই দেখিলেন, শুধু কীর্তনের দ্বারা সাধারণের মধ্যে হরিনাম

প্রচারিত হইবে না। জীব উদ্ধার করিতে হইলে ভারতের ধর্মগুরুদের চিরাচরিত আদর্শ অনুসারে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না—গৃহস্থের নিকট কেহ ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিবে না। তাই জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময়ে কাটোয়াতে কেশব ভারতী নামে শঙ্করাচার্য-সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। নিমাই এক রজনীতে গৃহ ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন নিমাই-এর বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। দীক্ষান্তে কেশব ভারতী তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। তদবধি তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, মাতা আদর করিয়া তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার দেহ গৌরবর্ণ, মুখমণ্ডল অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত ছিল, এজন্য লোকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত।

নবদ্বীপের ক্ষুদ্র গণ্ডী তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। জননীর অপরিসীম স্নেহের ডোর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সাধ্বী স্বামীগতপ্রাণা পত্নীর আবেগপূর্ণ প্রার্থনা ও সকরুণ দৃষ্টি সকলই ব্যর্থ হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের পথে ছুটিয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে লইয়া আসিলেন। মাতা শচীদেবী নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়া পুত্রের সহিত দেখা করিলেন। অদ্বৈত-গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে নিত্যানন্দ, গদাধর, দামোদর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণসহ পুরী যাত্রা করিলেন।

পুরীতে ১৮ দিন অতিবাহিত করিয়া পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমকে তাঁহাব অনুগত্য স্বীকার করাইয়া শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত পর্যটনে বাহির হইলেন। বিদ্যানগরের শাসনকর্তা রায় রামানন্দের সহিত গোদাবরী নদীর তীরে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রায় রামানন্দ পবম ভাগবত ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রামানন্দ যে ভক্তি মার্গের রহস্যময় তত্ত্বসকল গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এই আলোচনা হইতে স্পষ্টীকৃত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব চৈতন্যদেব রামানন্দের মুখ দিয়া প্রকাশ করাইয়া লইলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গমক্ষেত্র নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কটভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। বেঙ্কটভট্ট রামানুজের শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তিনি বাধাকৃষ্ণের উপাসক হইলেন। দক্ষিণ ভারত পর্যটনকালে শ্রীচৈতন্য পয়স্বিনী নদীতীরস্থ আদিকেশব মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থ এবং কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরভূমি হইতে বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। এইভাবে প্রায বৎসরাধিককাল দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তিনি নীলাচলে ফিরিয়া কাশী মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন পরিক্রমার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়া প্রথমে গৌড়ে আসিলেন। সেখান হইতে পানিহাটি হইয়া ঈশ্বর পুরীব জন্মস্থান হালিসহরে আসেন এবং তথা হইতে রামকেলি গ্রামে গমন কবেন। বামকেলিতে তখন দুই ভাই সনাতন ও রূপ নবাব হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। নবাব এই দুই ভাইয়ের কাযে সন্তুষ্ট হইয়া 'সাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস' উপাধি দান কবিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই ভাই মহাপণ্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন।

অসংখ্য জনসংঘট্টের ফলে সেবার বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত করিয়া শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইয়া পুরী যাত্রা কবিলেন। সেইবারে শান্তিপুরে সপ্তগ্রামের রাজার পুত্র রঘুনাথ দাসের সহিত মিলন ঘটে। এই রঘুনাথ দাস পববর্তীকালে বাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শেষ পনেরো বৎসর তাঁহার অনুগত শিষ্য ও সেবক হিসাবে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইয়া তাঁহার শেষ জীবনের দিব্যলীলার সাক্ষী রহিলেন।

পুরীতে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরে চৈতন্যদেব ঝাড়খণ্ডেব অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া কাশীতে উপনীত হইলেন। সেখানে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তদের সান্নিধ্যে কিছুকাল থাকিয়া প্রয়াগ গমন করিলেন। প্রয়াগ হইতে মথুরা-বৃন্দাবনে গিয়া লুপ্ততীর্থের উদ্ধারের কাজে এবং বাধাকৃষ্ণেব মূর্তিস্থাপনে কিছুকাল অতিবাহিত কবিলেন।

এদিকে রূপ নবাবের কার্য পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপকে সঙ্গে লইয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবনেব পথে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন কবিয়া শ্রীচৈতন্য সেখানে রূপেব সহিত মিলিত হইলেন। রূপের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া এবং কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দান করিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে অবস্থান করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রূপ নবাবের কার্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সনাতনের প্রতি নবাবের মনে সন্দেহ জাগে। পাছে সনাতনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় এই ভয়ে নবাব সনাতনকে কারারুদ্ধ করিলেন। বৃন্দাবনে যাত্রার পূর্বে রূপ কারামুক্তির উপায় নির্দেশ কবিয়া সনাতনকে গোপনে একটি চিঠি পাঠাইয়া দিলেন। 'চৈতন্যচারিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

আমি দুই ভাই চলিলাঙ তাঁহার মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহা হইতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তাহা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদ)

মুদির নিকট রক্ষিত দশ সহস্র মুদ্রার উৎকোচে কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া সনাতন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে একটিমাত্র ভোটকম্বল গায়ে দিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য প্রয়াগ হইতে কাশী আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় সনাতন শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপের ন্যায় শ্রীসনাতনকেও নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

কাশীতে অবস্থানকালে বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত শ্রীচৈতন্যের বিচার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকাশানন্দ সরস্বতী শেষপর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করেন। এইরূপে গৌড়দেশ, নীলাচল, দাক্ষিণাত্য, পশ্চিম ভারত, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও কাশী পরিক্রমায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইহার পর জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি নীলাচলেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই আঠারো বৎসর কাল শ্রীচৈতন্য কাশী মিশ্রের আশ্রমে দিব্যভাবাবেশে বিভোর হইয়া দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, রঘুনাথ দাস, যবন হরিদাস, পরমানন্দ পুরী—ইঁহারা সকলে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার সঙ্গী হইয়া দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই যবন হরিদাস দেহরক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং নিজ হস্তে সমুদ্রতীরে এই যবন ভক্তটির শেষকৃত্য সমাধা করিয়া তাহার উপর একটি সমাধি-বেদী নির্মাণ করেন। শেষ বার বৎসর শ্রীচৈতন্যের বাহ্য চেতনা দিব্যানুভূতিতে প্রায়ই বিলুপ্ত হইত। তিনি মর্ত্যেই দিব্য-বৃন্দাবনকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, চটক পাহাড়কে গিরিগোবর্ধন ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন, যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। এইরূপে কৃষ্ণ-বিরহের ব্যথায় তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িত। যখন তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল তখন তাঁহার গৌরতনু দিব্যপ্রেমের আর্তি আর সহ্য করিতে পারিল না। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসের এক রজনীতে শ্রীচৈতন্য অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁহার এই অকস্মাৎ অন্তর্ধান সম্পর্কে বৈষ্ণব-সমাজে সুবিখ্যাত দুইজন শ্রীচৈতন্য-চরিত কাব্যকার বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীরব থাকিয়া গিয়াছেন। একমাত্র জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'কাব্যে শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রথযাত্রার দিন রথের অগ্রভাগে কীর্তন করিতে করিতে চলিবার সময় ইঁটের আঘাতে শ্রীচৈতন্যের পা কাটিয়া যায় এবং তাহাই বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটায়। তথাপি একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যদি ইঁটের আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র কোথায় গেল? যবন হরিদাসের সমাধি আজও পুরীতে আছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের নাই কেন? তাঁহার পরম অনুরাগী ভক্তগণ কি তাঁহাদের

কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছিলেন? একপ হওয়া কি সম্ভব? শ্রীচৈতন্যের তিরোধান আজও রহস্যাচ্ছাদিত রহিয়া গিয়াছে। সেই রহস্যের আবরণ কখনও উন্মোচিত হইবে কিনা কে জানে!

চৈতন্যদেব মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর এদেশে তাঁহার ন্যায় আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার লোকোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার দিব্য জীবনাচরণকে ভিত্তি করিয়া, রূপ-সনাতনের প্রতি তাঁহার উপদিষ্ট বাণী অবলম্বন করিয়া এবং রায় রামানন্দ বিশ্লেষিত সাধ্য-সাধন তত্ত্বের নির্যাস লইয়া তাঁহার তিরোভাবের পর একটি মতবাদ গড়িয়া উঠে। এই মতবাদের উপর শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের অসীম প্রভাব পড়িয়াছে। বৈষ্ণবধর্মের অন্য চারিটি সম্প্রদায়ের (রামানুজাচার্য প্রবর্তিত 'শ্রী' সম্প্রদায়, মধ্বাচার্য প্রবর্তিত 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায়, নিম্বার্কাচার্য প্রবর্তিত 'হংস' সম্প্রদায় ও বল্লভাচার্য প্রবর্তিত 'রুদ্র' সম্প্রদায়) প্রবর্তকগণ ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর তাঁহাদের নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই বা 'শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি শ্লোকের মৌখিক রচনা ভিন্ন অন্য কোন রচনা করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার রচিত 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে প্রথম এই মতের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' নাম দিয়াছেন। এই মতের অনুগামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

রাগানুগামার্গে ভক্তি সাধনাতে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হইয়াছে, যথা—ভক্তিসাধনার স্বরূপ কি, সাধ্যসাধনতত্ত্ব কি, সম্বন্ধ-অভিধেয় এবং প্রয়োজনতত্ত্ব কি। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধন বিষয়ক যে সকল আলোচনা হয় সেগুলি হইল—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, সখিতত্ত্ব, রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য, প্রেম বিবর্তবিলাস, গোপীভাব প্রাপ্তির সাধনা প্রভৃতি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য মধ্যে প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত প্রেমভক্তি-বিশ্লেষণের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের অন্তরঙ্গ লীলা-সহচর রঘুনাথ দাসের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব লীলামাধুর্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদিগের সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থনিচয় ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থের সার নিষ্কাসন করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধন প্রভৃতি রহস্যময় দুরূহ বিষয়সকলের অভূতপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে এই গ্রন্থে। ইহা ছাড়া, শ্রীসনাতন গোস্বামীর রচিত 'সটীক বৃহৎ ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তি বিলাস' ও ইহার 'দিগ্‌দর্শিনী' নামক টীকা, 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' নামক ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা প্রভৃতি;

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'লঘু ভাগবতামৃত', 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ', 'স্তবমালা', 'লঘুগণোদ্দেশ দীপিকা', 'বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা', 'দানকেলীকৌমুদী', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'গোবিন্দ বিরুদাবলী' প্রভৃতি; রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত 'রাধাষ্টক', 'নামাষ্টক', 'শ্রীগৌরাঙ্গশতক' ও 'বিলাসকুসুমাঞ্জলি' এবং শ্রীজীব গোস্বামী কৃত 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ', 'কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা', 'গোপাল বিরুদাবলী', 'শ্রীমাধব মহোৎসব', 'গোপাল তাপনীর টীকা', 'ব্রহ্মসংহিতার টীকা', 'রসামৃত সিন্ধুর টীকা', 'উজ্জ্বলনীলমণির টীকা', 'গোপাল চম্পূ', ষট্সন্দর্ভ—যথা, তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভ এবং 'সর্বসংবাদিনী' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের সৌধ নির্মাণ করিয়াছে।

সিদ্ধান্ত

[এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া এবং আমার চিন্তা ও মননের দ্বারা পুষ্ট করিয়া বিভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছিলাম। প্রবন্ধগুলি এক্ষণে একটির পর একটি সজ্জিত করিয়া দিলাম। বিভিন্ন সময়ের রচনা বলিয়া পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে, তবে তাহা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীদ্বয়কে প্রেমভক্তি ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের উপদেশ দান করিয়া তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে যাইয়া উহার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিধর্মগ্রন্থ প্রণয়ণের ভার অর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহারা বৈরাগী সন্ন্যাসী রূপে বৃন্দাবনে বাস করিয়া নানা গ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও তথ্য নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকা—এই দুই গ্রন্থে সনাতন গোস্বামী প্রেমভক্তিলভ্য উপাস্য তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ হিসাবে 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করিযা তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবার উপযোগী বৈধীভক্তি উপাসনার রীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের মতে 'হরিভক্তিবিলাস' গোস্বামীপাদ শ্রীগোপাল ভট্টের রচনা।

রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থদ্বয়ে ভক্তির চরম অবস্থায় উহার রসে পরিণতির কথা বলিয়াছেন। প্রেমভক্তি কিরূপে ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের দ্বারা ক্রম পরিণতি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়া নিত্য বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মাধুর্যরস আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জন করে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সেই নিগূঢ় রহস্য তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার 'লঘুভাগবতামৃতে' ঐশ্বর্যের প্রকাশরূপে ধামতত্ত্ব এবং প্রকট ও অপ্রকট লীলা-তত্ত্বের

বর্ণনা দিয়াছেন। 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নাটকদ্বয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের হৃদয়গ্রাহী রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তকে যাঁহারা দার্শনিক ভিত্তিব উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামীই সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও মনীষা সুগভীর সংবেদনশীলতার সহিত চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমভক্তি ধর্মের তত্ত্ব-সমীক্ষায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও উহার অনুব্যাখ্যা 'সর্বসংবাদিনী' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সিদ্ধান্তের রত্নখনি সদৃশ। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বাদরায়ণ প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। শ্রীজীব তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভ' রচনায় শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভকে 'ভাগবতসন্দর্ভ'ও বলা হয়। তত্ত্ব, শ্রীভগবৎ, পরমাত্ম, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি নামে এই ছয়টি সন্দর্ভে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'তত্ত্ব' 'শ্রীভগবৎ' 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারিটি সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব, 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয় তত্ত্ব এবং 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজন তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

প্রথম চারিটি সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। এ বিষয়ে প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবৎ।

'ভগবৎসন্দর্ভে' অদ্বয় তত্ত্বের আলোচনায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ভগবানের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। কারণ, ব্রহ্মে ভগবানের কর্তৃত্ব শক্তির অভাব। পরমাত্মস্বরূপে তাঁহার আংশিক শক্তির বিকাশ। একমাত্র শ্রীভগবানেই ভগবৎ-স্বরূপের পূর্ণতম প্রকাশ। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—পূর্ণ ভগবানের এই ত্রিবিধ শক্তির তারতম্যও এই প্রবন্ধে নির্ধারিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তির দ্বারা প্রেমভক্তিলভ্য তাহাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

'পরমাত্মাসন্দর্ভে' পরমাত্মার ও জীবাত্মার স্বরূপ ও ভেদ বিশ্লেষিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ আলোচনায় এই সন্দর্ভে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ-তত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা এবং তাঁহার স্বরূপ ও পরমব্রহ্মত্ব, তাঁহার নিত্যতা এবং প্রকট ও অপ্রকট লীলাবিলাস বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পরিকরবৃন্দের স্বরূপ, ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্য, শ্রীরাধার স্বরূপ ও উৎকর্ষ এবং শ্রীরাধামাধমের যুগল-মাধুরী প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাই আলোচিত সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে সম্বন্ধ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

'ভক্তিসন্দর্ভে' জীবগোস্বামী ভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা শাস্ত্র-বিধেয় তাহাই অভিধেয় ; এবং ভক্তিই সেই শাস্ত্রানুমোদিত

অভিধেয়। প্রথমে সন্দর্ভচতুষ্টয়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবানত্ব প্রতিপাদিত করিয়া 'ভক্তিসন্দর্ভে' একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে তিনি সেব্য এবং ভক্তিই যে জীবের স্বরূপ উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন ও সাধন, তাহা দেখাইয়াছেন। জ্ঞানমার্গের তুলনায় ভক্তিমার্গের প্রাধান্য স্থাপনাও সন্দর্ভটির অন্যতম উদ্দেশ্য। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে জীবের আচরিত ভক্তি দ্বিবিধ। অধিকারীভেদে উহাদের অনুষ্ঠানের পার্থক্য ও মাহাত্ম্য এই প্রবন্ধে বিশদ আলোচিত হইয়াছে।

সর্বশেষ 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজন-তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। ভক্তিধর্ম অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি, ভক্তি-আচরণের দ্বারা জীবের কি অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে—প্রীতিসন্দর্ভে তাহাই নির্ণীত হইযাছে। আত্যন্তিক দুঃখের অবসান এবং আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তিই জীবের অভিষ্ট লক্ষ্য। সূর্যরশ্মিকণার ন্যায় চিৎ-জ্যোতির্ময় ভগবানের চিৎ-কণ হইল জীব। অতএব জীব স্বরূপে চিন্ময এবং স্বভাবে আনন্দময়। কিন্তু জীব স্বভাব হইতে বিচ্যুত, তাই সে বিকৃত। জীবের স্বভাব বিচ্যুতির মূল কারণ হইল তাহার ভগবৎ-বিমুখতা বা বহির্মুখীনতা। বহির্মুখীনতা বশতঃ জীবের মায়া-সম্বন্ধ হয়, ফলে সংসার গতি, অহং-অভিমান, দেহাত্মবোধ ও বিকল্প জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। স্খলন হইতে আত্মসত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চিন্ময় আনন্দরস আস্বাদন করাই জীবের অভিষ্ট ফল লাভ। মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তিই স্খলন হইতে নিবৃত্তি এবং সংসার-নাশ। উপায় হইল একমাত্র ভগবৎ উন্মুখীনতা। ভগবান চিন্ময়, আনন্দময় এবং সৎ বা একমাত্র নিত্য বস্তু। সচ্চিদানন্দঘন পরমব্রহ্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করিয়া একমাত্র তিনিই পুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ও ভক্তি-সেবার দ্বারা জীবের ভগবন্মুখীনতার উন্মেষ সাধিত হয়। এবং অনন্যা ভক্তি-অনুরাগের দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি উৎপন্ন হয়। ভগবৎ-প্রীতি লাভই জীবের পরম প্রয়োজন। ভগবানের প্রীতি বিধানেই জীবের সেই স্ব-ভাবগত চিন্ময় আনন্দানুভূতি। উহাই পরম পুরুষার্থ। আনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আবার রসস্বরূপ, তিনি 'রসানাং রসতমঃ'। রাগানুগা ভক্তির আকর্ষণে তাঁহার মধ্যে রসের উল্লাস হয়। সেই অপার্থিব রস আস্বাদন করিয়া জীব আনন্দিত হয়—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৭.১.২.৩২গ)। এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা দ্বৈতভাবেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সাধন ভক্তি হইতে যে রতি জন্মে, তাহা ক্রমশঃ ভাবভক্তি হইতে প্রেমভক্তিতে পর্যবসিত হইলে প্রেম-মার্জিত অন্তঃকরণের স্বচ্ছ দর্পণে শ্রীভগবানের পরমানন্দ-মূর্তি স্ফুরিত হয়। ভক্ত চিন্ময় ভাবতনু প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে নিত্য পরিকর রূপে গৃহীত হয়। এইরূপে উপাস্য-উপাসকের দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে স্বরূপগত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন উভয়ের আকর্ষণে ও সংযোগে যে প্রীতি-রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিভাবাদি ভাবসংযোগে অভিব্যক্ত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি রতিভেদে রসাস্বাদনের

তারতম্য ঘটে। এইরূপে পরমপুরুষার্থ-সাধক ভগবৎপ্রীতিদায়ক বিশেষ বিশেষ রসসমূহ ও লীলাতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে 'প্রীতিসন্দর্ভে'।

ভক্তিসন্দর্ভে ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—ভক্তিবাদ লইয়াই ভক্তিধর্ম,—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তি। ভক্তিই পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট সাধন। পরতত্ত্ব বলিতে ভগবানকেই বোঝায়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে নির্দেশ করে না। কারণ, ব্রহ্ম শুধুমাত্র ভগবানের অখণ্ড জ্যোতিঃপ্রকাশ, আর পরমাত্মা তাঁহার শক্ত্যংশ বিশেষ। স্বাতন্ত্র্যশক্তি সমন্বিত শ্রীভগবানেই পরতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ। ভগবৎ-সাম্মুখ্য ও প্রেমানন্দ লাভের সাধন হইল ভক্তি। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি হইয়াও অনাদি বহির্মুখ। অনাদিকাল হইতে মায়া-সংস্পর্শজনিত জীব আত্মবিস্মৃত। ভক্তি-অবনত চিত্তে শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইবামাত্র তাহার মায়াবন্ধন শিথিল হইতে থাকে। ভেদাভেদ সম্বন্ধবশতঃ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। উভয়ের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে ভক্তি। অতএব ভক্তিই উপাস্য-উপাসকের (জীব ও ভগবানের) সংযোগ সেতু। ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ গ্রাহ্য—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"।

ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরই অঙ্গ। ভক্তিপূর্ণ সেবার দ্বারাই শ্রীভগবানে প্রীতি উৎপন্ন হয়। এই প্রীতিই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিরূপে স্ফুরিত হয়। দীপের ধর্ম যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশিত করে, সেইরূপ হ্লাদিনী-শক্তির স্বভাবই হইল নিজেকে ও অপরকে আনন্দ দান করা। ভগবান্ আত্মারাম—তিনি সদানন্দে পূর্ণ; তাঁহার কামনা করিবারও কিছু নাই, অভাবও নাই। তথাপি আত্মক্রীড়া-ধর্ম বশে তাঁহার মধ্যে নিত্যানন্দের অফুরন্ত বৈচিত্র্যময় লীলা বিদ্যমান। প্রেমময় ভগবান্ প্রেমের বিষয়রূপে তিনি একাধারে আস্বাদ্য, আবার লীলাভিনয়ের দ্বারা প্রেমরস আস্বাদকও। রস আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তিরূপা হ্লাদিনী শক্তিকে ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া রসিকশেখররূপে নরলীলা প্রকটিত করেন।

এখানে আত্মক্রীড়া ও আত্মরমন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরব্রহ্ম বা ভগবান্ বিরাজিত। তিনি একই সময়ে বিভু ও অণু। অণু অংশে জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত। সাধনার দ্বারা মায়ার আবরণ উন্মোচিত হইলে বা মল দূরীভূত হইলে জীবের মধ্যে আত্মা স্বপ্রকাশিত হয়। এরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থায় অণুআত্মা সম্প্রসারিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে। নিজেকে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিতে পায়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ইহাই 'সোহং' অবস্থা—তুমিই আমি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার এরূপ অবস্থাতেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে চায় না। তাহাদের মতে 'জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস'। ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার 'তৎ' অর্থাৎ সেই বা তুমি

এবং ভক্তরূপে আমি সম্বন্ধ। প্রতিটি ভক্তিসিদ্ধ জীব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিগত রুচি অনুসারে শ্রীভগবানের আনন্দধাম বা গোলোকধামে প্রবেশ করিয়া নিত্য লীলায় অংশগ্রহণ পূর্বক ভগবানের সেবা করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করে অর্থাৎ বরিষ্ঠ সাধক প্রেমসিদ্ধ অবস্থায় আত্মাতে ক্রীড়া, আত্মাতে রমন করেন—"আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবনেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"—(মণ্ডুকোপনিষদ্) আত্মক্রীড ও আত্মরমন পদ্ধতিকে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় সহজে ধারণা করার জন্য কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া নিজ হস্তে এই চিত্রটি আঁকিয়া আমাকে দিয়াছিলেন—

এটা শূন্য অবস্থা। সৎও নয়, অসৎও নয়, জ্ঞাতা নয়, জ্ঞেয় নয়, জ্ঞানও নয়, অথচ সৎও বটে অসৎও বটে, জ্ঞাতাও বটে, জ্ঞেয়ও বটে, জ্ঞানও বটে। একেবারে নির্বিশেষ অবস্থা—'যতো বাচা মনসাসহ নিবর্ত্তন্তে' এরূপ অবস্থা।

ব্রহ্মের 'একং সৎ' অবস্থা বা অদ্বয় অবস্থা এবং ঈক্ষণ।

একের মধ্যেই দুইটি ভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মের একই আধারে দুইটি ভাগ। ইহা অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থা।

একই আধার বিভক্ত হইয়া দুইটি আধারে পরিণত অথচ পরস্পর সংনদ্ধ। বৈষ্ণবমতে ইহা যুগলতত্ত্ব, শাক্তমতে যামল, বৌদ্ধমতে যুগনদ্ধ।

↓ ↓
শিব শক্তি
(পুরুষ) (প্রকৃতি)

এখানে শিব ও শক্তি পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। দেহভাণ্ডে সহস্রারে শিব এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বমুখে পরিচালিত করিয়া সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহিত যুক্ত করিতে পারে যে সাধক, সেই সাধক আত্মাতে ক্রীড়া ও আত্মাতে রমন করিতে সক্ষম হয়।

পার্থিব প্রেম সাধনা—পুত্রের মধ্যে আত্মা অবস্থিত—এরূপ ভাবনার দ্বারা যুক্ত থাকিয়া পুত্রের প্রতি যে ভালবাসা ও সেবা করা হয়, সেই ভালবাসা ও সেবা পরব্রহ্মে গিয়া অর্পিত হয়। কারণ, পুত্রেব প্রতি ভালবাসা ও সেবা রূপ ক্রিয়া পরমাত্মার ভাবনার সহিত যুক্ত থাকায় পার্থিব ভা

আবিলতা, সঙ্কীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা বা মোহ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না বা অশুদ্ধ অহং-ভাবেও বিজড়িত হয় না। পার্থিব বা জৈবিক ভালবাসায় এই যোগ-দৃষ্টি থাকে না। মায়ার মোহে সেই যোগদৃষ্টি আবৃত থাকে। আমিই ভালবাসিতেছি—আমিই কর্তা—এই অহংভাব জাগ্রত হইয়া জীবকে মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলে। জীবের যে কোন ভালবাসার সম্বন্ধের সহিত যদি পরমাত্মার ভাবনা যুক্ত থাকে, তবে সেই ভালবাসার মধ্যেই জীব পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করে। মানবাঙ্কুরের আধারে পরমাত্মার প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগই সাধনা। এরূপ যোগমুক্ত ভালবাসার গভীরতায় যে সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, নিজ আত্মা সে-অবস্থায় এক সুগভীর প্রশান্তি অনুভব করে, এক অনাবিল আনন্দ-রসে চিত্ত ভরিয়া যায়। এইরূপে পার্থিব ভালবাসা অপার্থিব ভালবাসায় পরিণত হইয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির আকারে প্রকাশিত হয় বলিয়াই 'পুত্র প্রিয় ভবতি'। রবীন্দ্রনাথও 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে ঘিরিয়া মা যখন হৃদয়ের পরতে পরতে ভাঁজে ভাঁজে খুলিযাও নিজেকে নিঃশেষিত কবিতে পারে না, তখনই পুত্রের মধ্যে নিজের দেবতাকে উপাসনা করিয়াছে"। অর্থাৎ সীমার মধ্য দিয়া অসীমেরই ভজনা করিযাছে। মা যশোদা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী বলিয়াছেন—"মায়িক জগতে প্রত্যেকটি ভাবেব একটি নিত্য আকার আছে। তাহাকে আশ্রয় কবিয়াই জীব সকল মায়ার খেলা খেলিতেছে।" (দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ, পৃ—১২৭)। মায়িক জগতে 'ভাবের নিত্য আকারটি' আবৃত আছে, যদি কোনও প্রকারে আবরণটি উন্মোচিত হয় তবে ভাবের নিত্য আকারটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। কারণ, কবিরাজ জী আরও বলিয়াছেন, "মায়িক জগতেব যে নিয়ম চিদানন্দময় লীলা জগতেরও ঠিক সে নিয়ম" (ঐ)।

নিত্য পরিকর ও জীব—সৃষ্ট্যোন্মুখ হইবার পূর্বে পরমেশ্বরেব পরমতত্ত্ব অবর্ণনীয়। সৃষ্ট্যোন্মুখ হইবার কালে পরমেশ্বর নিজেকেই নিজে দেখেন—ইহাই ইক্ষণ। এখানে পরমেশ্বরের দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান। ইহার পূর্বে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য কিছুই ছিল না—সে অবস্থা অকল্পনীয, এক অজ্ঞাত রহস্যের আবরণে আবৃত। অতএব পরমেশ্বরের দ্রষ্টা অবস্থা পূর্ব অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইক্ষণ হইতে নিজেই দুটি তত্ত্বে বিভক্ত হইলেন। দুটি তত্ত্বই সমান চিন্ময় এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। ইহাই শিব-তত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব—উভয়েই যামল, যুগল বা যুগনদ্ধ রূপে অন্বিত। এই শক্তিতত্ত্বই স্বাতন্ত্র্যশক্তি বা পরাশক্তি বা সামান্য স্পন্দ নামে অভিহিত। এই শক্তিই যখন বহির্মুখ হয়, তখন এই স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া শিব বহু শিবে পরিণত হয়। ইহাই

সদাশিব তত্ত্ব। যে পরিধির মধ্যে শিব ও শক্তির যুগ্মরূপে অবস্থান, উহা 'শিবলোক'। ঠিক অনুরূপ ভাবেই 'বিষ্ণুলোক' তৈরী হয়। স্বাতন্ত্র্যশক্তিই হইল 'যোগমায়া'। এই যে শিবলোক, বিষ্ণুলোক প্রভৃতি 'লোকে'র অবতারণা, উহারা একই বস্তু হইলেও যোগীভক্তের সম্ভোগ-বৃত্তির পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রকার। শিবলোকে বা বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিলে যে-কোন যোগীভক্ত ইচ্ছা করিলে শিবলোক হইতে বিষ্ণুলোকে এবং বিষ্ণুলোক হইতে শিবলোকে যাইতে পারে। প্রত্যেক 'লোকে'র নিজস্ব 'তনু' আছে, যেমন শিবলোকে 'শিবতনু', বিষ্ণুলোকে 'বিষ্ণুতনু' ইত্যাদি। এমনি অসংখ্য 'ভুবন' আছে এবং প্রত্যেক ভুবনের নিজস্ব ভুবনজ শরীর আছে। আমাদের লৌকিক জগতে স্থূল দেহ আছে। এই সমস্ত তনু বা শরীরকে ভোগায়তন দেহ বলে। অতএব সর্বত্র ভোগায়তন শরীর আছে, তবে যেমন যেমন ক্ষেত্র, তেমন তেমন উপাদানে শরীর গঠিত হয়। শরীর না থাকিলে ভূলোকের, ব্রহ্মলোকের, শিবলোকের বা বিষ্ণুলোকের ভোগ হইবে কি দিয়া? অতএব শরীর সর্বত্রই আছে, তবে ভোগের তারতম্যের জন্য শরীরের উপাদান বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার। যে যোগীভক্ত শিবলোকে যাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সে পার্থিব স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরে শিবলোকের সীমান্তে উপনীত হইলে শিবলোকে প্রবেশের উপযুক্ত তনু পায়। এই তনু শিবলোকের উপাদানে নির্মিত। সেই উপাদান হইল 'আলো'। 'লোক' বলিতে আলো বুঝায়। শিবলোক বলিতে ঐ ধামের যে পরিধি উহা প্রকাশময় শুভ্র আলো বা জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত ও বেষ্টিত। ইহাই জ্যোতির্মণ্ডল। শিবলোক অর্থে ঐ জ্যোতির্মণ্ডলই নির্দেশ করে। ঐরূপ বিষ্ণুলোকও বুঝিতে হইবে। এখন যে কেহ শিবলোকে প্রবেশ কবিতে যায় তো ঐ আলোকমণ্ডল হইতে আলো নির্গত হইয়া শিবলোকের উপযোগী তাহার শরীর গঠিত করে এবং তখনই সে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করে। ঠিক যেমন Convocation-এ যোগ দিতে হইলে convocation-এর পোষাক পরিধান করিতে হয়, আদালতে যাইতে হইলে উকিলকে আদালতের পোষাকে ভূষিত হইতে হয় বা রাজদরবারে যাইতে হইলে তদুপযোগী পোষাক ধারণ করিতে হয়। আবার শিবলোক হইতে যখন বিষ্ণুলোকে যাইবার ইচ্ছা হয়, তখন শিবলোক হইতে বাহির হইবার সময় তাহার শিবতনু ঐ শিবধামের জ্যোতির্মণ্ডলে মিলাইয়া যায় এবং কেবল সূক্ষ্মশরীরটা থাকে। এখন শিবলোক হইতে বিষ্ণুলোকে বাহিত হইবার জন্য একটা 'যানে'র প্রয়োজন, যেমন এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য যানবাহনের দরকার হয়। সেই 'যান'টি হইল 'আতিবাহিক' শরীর। ইহা তাহাকে শিবলোক হইতে বিষ্ণুলোকের সীমান্তে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সঙ্গে

সঙ্গে আতিবাহিক শরীর মিলাইয়া যায়। তখন বিষ্ণুলোকের যে আলোকমণ্ডল তাহার দ্বারা তাহার বিষ্ণুলোকের উপযোগী শরীর গঠিত হয়। কারণ শিবলোকের শরীর লইয়া বিষ্ণুলোকের সম্ভোগ হয় না, যেমন বিষ্ণুলোকের শরীব লইয়া শিবলোকের সম্ভোগ হয় না। প্রত্যেক 'লোকে'র উপভোগ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই লোকের বিশিষ্ট শরীর ব্যতীত উহার সম্ভোগ হইতে পারে না।

পূর্বে যাহা বলিতেছিলাম, স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বাবা শিবের বহু শিব হওয়া বা ব্রহ্মের বহু ব্রহ্ম হওয়া বা বিষ্ণুর বহু বিষ্ণু হওয়া। যখন শিব বা ব্রহ্ম বা বিষ্ণু একক অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশ-স্বরূপেই থাকেন। শিব যখন বহু হন, তখন তাঁহার প্রকাশস্বরূপে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ঘটে অর্থাৎ 'ইদন্তা'র আভাস দেখা দেয়। ইঁহারা সকলেই শিবরূপী এবং শিবের প্রকাশমণ্ডলে বা শিবলোকে অবস্থান করেন। কিন্তু বহির্মুখ হইলে ইঁহারা ইদন্তারূপী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্বরূপবিস্মৃত হইয়া শিবই জীব বনিয়া যায়। বৈষ্ণব মতে বহু বিষ্ণু বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন এবং ভগবান্ তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা দেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভগবনোন্মুখও হইতে পারেন অথবা ভগবৎ-বহির্মুখও হইতে পারেন। সূর্যের আলোয় যেমন মানুষের ছায়া পড়ে, ঠিক তেমনি বিষ্ণুমণ্ডলের অধিবাসী বহু বিষ্ণুর পশ্চাতে ছায়া থাকে। ছায়াটাই মায়া। যাঁহারা ভগবানের দিকে সর্বদা মুখ ফিরাইয়া থাকেন, তাঁহারা ছায়াটাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং মায়া তাঁহাদের কখনই বদ্ধ করিতে পারে না বা কাল তাঁহাদেব স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা ভগবানের নিত্যধামে নিত্য পরিকর হইয়া বিরাজ করেন। আর যাঁহারা ভগবানের দিক হইতে বিমুখ হইয়া বহির্মুখ হন, তাঁহারা ছায়াটাকেই দেখেন এবং ছায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া স্বরূপ ভুলিয়া জীবে পরিণত হন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস
কৃষ্ণ বহির্মুখ জীব তাহা ভুলি গেলা।"

স্বরূপ কি? স্বরূপ অনুযায়ী ধর্মের বৈচিত্র্যই বা কিরূপ?—দৈহিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতির বোধ হয় কার? না, আমার অর্থাৎ অহং বোধের। সুতরাং সুখ-দুঃখের সঙ্গে অহং-চেতনার যোগ রয়েছে। আমিত্বের জ্ঞান আসছে বোধ থেকে। আমিত্বের সঙ্গে বোধ অবিনাভাবে সম্পৃক্ত। বোধের সম্প্রসারণ ঘটলে অর্থাৎ চিন্ময় ভূমিতে উত্তরণ হলে আমিত্ব সর্বভূতাত্মক আত্মার সহিত যুক্ত হয়ে যায়। তখন সর্বভূত বা বিশ্ব আমার মধ্যে এবং আমি সর্বভূতের মধ্যে বিরাজিত—ইহা

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। এরূপ অবস্থায় আমিত্ব পার্থিব দেহ হতে অলগ্ হয়ে যায়। তখন সমগ্র বিশ্বই আমিত্বের আধার হয়। 'অহং' হল শিব, 'বোধ' হল শক্তি। 'বোধ' সম্পৃক্ত 'অহং' হল প্রকাশ বা স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ শিবের সঙ্গে শক্তি বা শক্তির সঙ্গে শিব অবিনাভাবে যুক্ত। যেখানে শক্তির প্রাধান্য, সেখানে শক্ত্যাশ্রিত শিব; আর যেখানে শিবের প্রাধান্য, সেখানে শিবাশ্রিত শক্তি। যেখানে 'অহং' আছে, 'বোধ' নাই, সেখানে শিব শব। যেখানে শুধু 'বোধ' আছে, 'অহং' নাই সেখানে বোধ নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টিক্ষমতা রহিত। যেখানে শিব ও শক্তি সমতুল, সেখানে সামরস্য এবং সামরস্য জনিত এমন এক অদ্বয় সত্তা যাহা অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়।

আমিত্ব-চেতনা যখন দেহ হতে অলগ্ হয়ে যায়, তখন আমিত্ব-চেতনা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসাবিত হয়, সমগ্র বিশ্বে আমাকেই দেখতে পাই। যখন দেহের মধ্যে আমিত্ব-চেতনা আবদ্ধ, তখনই ভেদ-জ্ঞান, দ্বৈত বা পৃথক্ চেতনা। দেহেব বন্ধন হতে চেতনা মুক্ত হলে অর্থাৎ পার্থিব চেতনার চিন্ময চেতনায় উৎক্রমণ ঘটলে তখন আর ভেদ জ্ঞান থাকে না, অদ্বৈত চৈতন্যের উন্মেষ হয়। কারণ দেহবদ্ধ জীবের যে চেতনা, সে ব্যাষ্টি চেতনা, আর বিশ্বময পরিব্যাপ্ত চেতনা হল সমষ্টি চেতনা। এরও পরে যখন জীব-চৈতন্যেব ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে, তখন সে এক মহাশূন্য লোকে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছে দেখে একটি বিশ্ব নহে, ঐরূপ অসংখ্য বিশ্ব সেই ব্যোমলোকে বিধৃত। যে বিশ্বকে সে অতিক্রম করে এসেছে, সে বিশ্বও এখন বহু দূরে সরে গিয়েছে, সম্মুখে বিরাজ করছে এক মহাশূন্যতা। সেখানেই তার অদ্বৈত-স্বরূপের মধ্যে প্রকৃত প্রবেশ ঘটল। এই মহাশূন্য লোক নৈঃশব্দে, নিস্পন্দতায়, অতল গহীনতায় নিস্তব্ধ। সমুদ্রের তলদেশের ন্যায এক গভীর প্রশান্তি বিরাজিত। 'অহং' এবং 'বোধে'র—শিব ও শক্তির সামরস্য অবস্থা এটা। এখানে সমস্ত বৈষম্যের সমাপ্তি, এক পরম সাম্যভাব বিরাজমান। সমস্ত অশান্তির পরিনির্বাণ। জীবের সকল চাওযা শান্তির পরম-প্রাপ্তিতে পর্যবসান। ইহা চাওয়া এবং পাওয়ার নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায উত্তীর্ণ হওয়া। সমস্ত বৃত্তি এবং উপাধির এখানে বিলুপ্তি। এই লোককে বলা হয় ব্রহ্মলোক।

কিন্তু এখানেই উপাধিরহিত জীব-চৈতন্যের আধ্যাত্মিক পরিক্রমণের চবম অবস্থা নয়। কারণ, এখনও সে অদ্বৈতস্বরূপের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায় নি। তার পরিক্রমণের পথ এখনও সম্মুখে প্রসারিত। কিন্তু সে পথে চল্‌বার নিশানা সে জানে না। তার চাওযা শেষ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু পাওয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ, সে জানে না সে-পাওয়া কি! তাই সে চাইতেও জানে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সে তখন অবোধ শিশুর মত। মায়ের প্রতি শিশুর ন্যায় সে এক পরম করুণাময়ী শক্তির উপর নির্ভরশীল। মা যেমন আপনা থেকেই শিশুর মঙ্গল বিধান করে,

সেই পরমা শক্তির অসীম করুণাধারা সেইরূপ তখন তার উপর বর্ষিত হয়। আপন শিশুস্বভাবেই তখন সে চলতে থাকে। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় 'ওঁ'কার ধ্বনি অর্থাৎ 'প্রণব'। কারণ, প্রণব বা ধ্বনির উপর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ধ্বনির বিস্ফুরণেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। অনাহত শব্দকে অনুসরণ করে সে এসে পৌঁছায় ব্রজধামে। এই অনাহত শব্দই হল কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি। আমাদের অবচেতন মনে এই ধ্বনি নিত্য উত্থিত হচ্ছে, কিন্তু জড়ের আকর্ষণে মুগ্ধ থাকায় শুনতে পাই না বা শুনতে চাই না। অনাত্মায় আত্মবোধ হেতু আমরা স্বরূপ-ভ্রষ্ট। আবার আত্মায় যখন আত্মবোধ জাগ্রত হবে, তখন সেই ধ্বনি আমাদের কাছে স্পষ্ট শ্রুত হবে। আমরা তখন ভগবানকে চাইব, আর তাঁর করুণাধারাও একই সময়ে আমাদের উপর বর্ষিত হবে। আমরা যতক্ষণ তাঁকে না চাইব, তাঁর কৃপাও আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। জীব প্রার্থনা করলেই যে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হবে এরূপ নহে। সাধনার যে স্তরে জীবের প্রার্থনা এবং ভগবানের করুণা একই সময়ে সংঘটিত হয়, সেই স্তরে ভগবানকে জীব চাইলেই ভগবানও সেই জীবকে চাইবে—ঠিক reciprocal। ভগবান প্রাপ্তির প্রথম ধাপ হল চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হলেই যে ভগবানকে পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই। চিত্তশুদ্ধিতে কৈবল্য প্রাপ্তি হতে পারে, মায়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব লাভ করতে হলে বা ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে মূলাধারে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে মায়াকে জয় করে মায়াধীশ হতে হবে। শুধু চিত্তশুদ্ধি নহে, একাগ্রভূমির অর্থাৎ স্থায়ীভাবের সংযোগ সাধনও দরকার। একাগ্র বৃত্তির সহিত স্থায়ীভাবের যুক্ত অবস্থায় ক্রম উত্তরণ দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের মিলন সংঘটিত হয়।

ব্রজ অর্থাৎ চলা। গতিই ব্রজধামের বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মলোকের পরম নৈঃশব্দের পর ব্রজধামে আবার নিত্য স্পন্দনের লীলা চলছে। এ স্পন্দন মর্তধামের স্পন্দন নয়। মর্তধামের স্পন্দন জড়াত্মক—এটা অবিদ্যা বা মায়ার ধর্ম। মায়ার আবরণে স্বরূপ আবৃত। বহির্মুখী জীব-চেতনার অবিদ্যা কল্পিত জগতকে সত্যভ্রম জনিত মোহমুগ্ধ জীবের স্পন্দন। পার্থিব স্পন্দন জনিত যে সুখ-দুঃখ বোধ, তা খণ্ডিত, অতএব অশুদ্ধ। ব্রজধামে লীলার যে চিন্ময় স্পন্দন নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দ-রস সঞ্চার করে, তা অখণ্ড পরিপূর্ণ অতএব বিশুদ্ধ চিন্ময়। এখানে আর 'অহং' বা আমিত্বের কোন লেশ নাই। আমি আছি, কিন্তু আমিত্ব বা আমির 'ইচ্ছা' নাই। আমার ইচ্ছার সমস্ত বিলোপ হয়েছে, অথচ ইচ্ছা আছে। আমি ইচ্ছা করি না, অথচ ইচ্ছার উদয় হয়। এই ইচ্ছার উদয় হয় কোথা থেকে? সমগ্র ব্রজলোককে অর্থাৎ ব্রজলোকের অধিবাসী,

জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, নদ-নদী, পর্বত-অরণ্য, ব্রজলীলা—সমস্তকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন 'যোগমায়া'। এখানে যোগের পালা—ভক্ত ও ভগবানের সহিত যোগ, বিয়োগের কোন সম্ভাবনা বা অবকাশ নাই। ভক্ত জীবের মধ্যে যে ইচ্ছার উদয় হয়, তাহা যোগমায়ারই ইচ্ছা। ব্রজধাম কোন একটা সুদূর লোক নয়, পার্থিব জীবেরই একটা উন্নত বিশেষ অবস্থান বা স্থিতি। ব্রজধামে ইচ্ছাময়ী মা যোগমায়ার ইচ্ছায় ভক্ত জীবের মধ্যে যে ইচ্ছার উদয় হয়, সে ইচ্ছা আত্মসুখানুসারিণী নয়। কারণ, সেখানে আমিত্ব বলে কিছু নাই, সবই তুমি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত ইচ্ছার পর্যবসান শ্রীকৃষ্ণের সুখের বা আনন্দের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গকারী সেবায়। এখানে শুধুই সমর্থা রতি। সমঞ্জসা বা সাধারণী রতির এখানে স্থান নাই। এখানে ইচ্ছা আত্ম-অনুগামিনীও নহে কিংবা কর্তব্য বা ধর্ম অনুগামিনীও নহে। এখানে সকলের সকল ইচ্ছা কৃষ্ণানুগামিনী। সকলের দৃষ্টি একমাত্র কৃষ্ণের দিকেই নিবদ্ধ। এমন কি, গোষ্ঠের গাভীগুলির দৃষ্টিও কৃষ্ণের দিকে নিবদ্ধ। সকলে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেহ বা সখা, কেহ বা সখী, কেহ বা মাতা বা পিতা প্রভৃতি স্বভাববৈশিষ্ট্যে নিজ নিজ ভূমিতে স্থিত থেকে কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনে রত। এইজন্য ব্রজধামের অধিবাসীদের বলা হয় ক্রীড়া-পরিকর। কৃষ্ণের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার করে তাঁকে তৃপ্ত দেখে নিজেরাও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, অপার নির্মল স্বার্থলেশহীন পূর্ণ আনন্দ-সুখে নিমজ্জিত হয়; যেমন মা পুত্রের তৃপ্ত আহারে নিজেই পরিতৃপ্তি অনুভব করেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ রসরাজ—'রসানাং রসতমঃ'—রসের বিগ্রহ মূর্তি। সকল প্রকার রসের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে। ব্রজবাসী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে নিজ নিজ ভাবের চরম পূর্ণতা অনুভব করে।

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেন। বাঁশি থেকে একই সুর নির্গত হয়। সেই একই সুর অনন্ত্য বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়। একই সুরে অনন্ত বৈচিত্র্যময় জীব-জগতের প্রত্যেককে, প্রতিটি বস্তুকে, প্রতিটি বৃক্ষলতাকে, নদ-নদীকে তিনি আহ্বান করেন, তাঁর দিকে অহরহ আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসী নিজ নিজ ভাব অনুসারে তাদের ভাবের অনুকূল আকুল আহ্বান কৃষ্ণের একই বংশীধ্বনি থেকে শুনতে পায়। সেই সুরে মা যশোদা শুনতে পায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা পেয়েছে, তিনি ক্ষীর ননী নিয়ে তাঁর তৃপ্ত্যর্থে অপেক্ষা করেন। সুবল, সুদামা প্রভৃতি সখাগণ তাঁর সাথী হয়ে খেলা করে তাঁকে আনন্দ দেবার আহ্বান শোনে। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের কাছে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনের সহায়তা করবার জন্য আহ্বান আসে সেই একই সুর থেকে। আর সেই একই সুরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আহ্বান শুনে ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে অভিসারের ব্যাকুলতায় ব্যগ্র হয়ে পড়ে। তাঁরই

বাঁশির সুর শুনে তাঁর মিলনকুঞ্জ বচনায কদম্ব বৃক্ষ পুলকিত হরষে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। যমুনা কলকল তানে প্রবাহিত হয।

শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্ত্যর্থে ব্রজবাসীরা স্বভাব-অনুসারে যে যে ভাবেব সাধনা করে, তার মধ্যে মাধুর্য-ভাবের সাধনাই সর্বোৎকৃষ্ট। মাধুর্যভাবের মধ্যে সমস্ত ভাবের সমাবেশ। তাই মাধুর্যভাবের পরিপক্কতায 'মহাভাব'। আব মহাভাব-স্বরূপিনী হলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সম্বিদ্, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তির একত্র সমাবেশ শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবাধা একই সত্তায় যুক্ত ছিলেন। মাধুর্য-রসের আস্বাদনেব নিমিত্ত প্রেমের আশ্রয় ও আশ্রিত রূপে দ্বিধা বিভক্ত হলেন। পৃথক্ হয়ে পুনরায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলনে উন্মুখ। মিলনের পূর্ণতা সাধন কবতে হলে উভযের মধ্যে পার্থক্যের যে ফাঁকটুকু তাকে ভরাট করতে হবে। যোগ-সাধনের ফাঁকটুকু ভরাট করবার জন্য সহাযতা করবে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধার অষ্ট অন্তবঙ্গ সখীবৃন্দ।

এখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার, শ্রীরাধার সহিত সখীদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখীদের ও জীবের সম্পর্কটা কিসের? না, প্রেমের। প্রেমেব আশায শ্রীরাধা এবং বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয, শ্রীবাধা বিষয়। প্রেম পরস্পর সাপেক্ষ। এক পক্ষ নিরপেক্ষ থাকলে বা শুধু গ্রাহকের ভূমিকা নিলে, অপর পক্ষের যতই গভীরতা, ব্যাকুলতা থাকুন না কেন, গ্রাহক ও গ্রহীতার মিলনে অপূর্ণতা থেকে যায়। গ্রাহক গ্রহীতার ভূমিকায় নেমে এবং গ্রহীতা গ্রাহকের ভূমিকায় নেমে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় না হলে অর্থাৎ বিষযের মধ্যে আশ্রয় এবং আশ্রয়েব মধ্যে বিষযের একই সময়ে অনুপ্রবেশ না ঘটলে প্রেমের পূর্ণতা সাধিত হয না। প্রেমের উদার ক্ষেত্রে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর ভাব-বিনিময়ে যে মিলন, সে মিলন মহাভাবে পর্যবসিত হয়। সচ্চিদানন্দেরই আপন স্বরূপ শক্তির সহিত মিলনেই মহাভাবের উদয়। এই মিলনজাত লীলা-বিলাসে যে বিশুদ্ধ আনন্দরস উদ্গত হয, তার আস্বাদনই জীবের পরম পুরুষার্থ। এই পরম মিলনের সহায়তা করে অষ্ট সখী। রাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জ লীলায় শ্রীরাধার অঙ্গে সখীরা মিলিয়ে গিয়ে পরোক্ষে মিলনানন্দ ভোগ করে। সেইজন্য অষ্ট সখীকে বলা হয় শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। সখীদের ভাবরাজি মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধাতেই সমাবেশিত হয়। মহাভাবই সকল ভাবের কেন্দ্রিভূত বিন্দু। মহাভাব হইতেই সমস্ত ভাবরাজি উৎসারিত।

ব্রজের 'মঞ্জরী' জীবের গুরুস্থানীয়। মঞ্জরীবা সখীদের অনুগত। মঞ্জরীরা জীবের অনুগমন-আদর্শ, সখীরা অনুগামীর আদর্শ।

ব্রজে কিন্তু সকলের প্রবেশাধিকার নেই। যার যে স্বভাব-প্রবণতা, তার সেই পথ ধরে চলাই সংগত। স্বভাব-বিরুদ্ধ পথে চললেই পতনের আশঙ্কা।

সব পথের লক্ষ্য এক, যেমন সব নদীর গতি এক সাগরাভিমুখী। তবে প্রত্যেকের চলার পথ বিশিষ্ট। আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমণ যে যার স্বভাবধর্ম অনুসারে পৃথক্।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

"ব্রহ্মলোক যেমন প্রণবের ঝঙ্কারে নিত্য মুখরিত, বৈকুণ্ঠধাম যেমন মহাশঙ্খের ধ্বনিতে নিত্য ধ্বনিময়ী, গোলোকধামও সেই প্রকার নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এইজন্য এই ধামে বংশীধ্বনি প্রিয় সখীরূপে ধামবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট পরিচিত। সখী যেমন দূতীরূপে প্রেমিককে প্রেমাস্পদের সন্ধান দেয়, ঠিক সেই প্রকার মুরলী-নিঃস্বন হইতেই গোলোকবাসী ভক্তগণ ভগবানের সন্ধান পাইয়া থাকেন এবং প্রেমভক্তির উৎকর্ষ অনুসারে এই বংশীধ্বনি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

(শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃ—৯২)

"ভগবদ্ধামের বহির্মণ্ডল ও অন্তর্মণ্ডলে প্রধান পার্থক্য এই, যে সকল ভক্ত বহির্মণ্ডলে অবস্থিত তাহারা কখনই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। কারণ অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ ব্যতিরেকে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না। তবে অধিকার অনুসারে কেহ কেহ ভাগ্য বশে দর্শনের আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহা সত্য। কারণ এই আভাস প্রাপ্ত না হইলে ভাব হইতে প্রেমে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কিন্তু দর্শন না পাইলেও তাঁহারা সকলেই তৎ তৎ ধামের অনুরূপ কোন না কোন ধ্বনি শুনিতে পান। এই ধ্বনি আশ্রয় করিয়াই দর্শন-আভাসের সাহায্যে তাঁহারা প্রেমলাভে সমর্থ হন এবং অন্তর্মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমিকরূপে ভগবদ্ দর্শনের অধিকার লাভ করেন। এই শব্দ শব্দব্রহ্মরূপী শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই পরব্রহ্মরূপী ভগবানেব সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়। শ্রীবৃন্দাবনে এই শব্দ সুমধুর বংশীধ্বনিরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এমনি মধুর যে ত্রিভুবনের যে কোন প্রাণীর কর্ণকুহরে ঐ ধ্বনি প্রবিষ্ট হইলে তাহার মন তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া ভগবচ্চরণে ধাবমান হয়। (ঐ, পৃ--৩৯৯/৪০৫)

"রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্বের দুইটি দিক। এই জন্যই এইটিকে যুগল তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এক ও বহু, ইহার মধ্যবর্তী অবস্থাই দুই। দুইকে আশ্রয় না করিয়া এক বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। একই তত্ত্ব অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে অবশ্য একই বলা হয়, তথাপি তাহা এক হইয়াও দুই। প্রকারান্তরে তাহা ঠিক দুইও

নহে, তাহা দুই হইযাও এক। যেখানে শুধু এক সত্তা, সেখানে ঐ এক নিজেকেও নিজে দেখিতে পায না। ইহা বোধহীন জড়ত্বের অবস্থা। এই এক সত্তা প্রকাশাত্মক চিৎস্বরূপ হইলেও ইহাকে চেতন বলা যায না। কারণ ইহা নিজের স্বরূপ নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি নাই সেখানে আনন্দের আস্বাদন কোথায়? এই জন্যই মহাচৈতন্যে এক সত্তা দুই সত্তায় পরিণত হয়। অর্থাৎ এক সত্তার মধ্যেই দ্বিতীয় সত্তার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই অবস্থায়ই আনন্দের আস্বাদন সম্ভবপর।

"উপনিষদে আছে—'স একাকী নারমত স আত্মানং দ্বিধা করোৎ অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ অর্দ্ধেন নারী'—ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রতীত হয় যেটি একাকী অর্থাৎ একলা অবস্থা তাহাতে আনন্দের অনুভূতি প্রকট থাকে না। আনন্দের আস্বাদনের জন্য মূল এক সত্তা নিজেকে ভাগ করিযা দুই সত্তায পরিণত হয়। এই দুইটি সত্তার একটি পরমপুরুষ এবং অপরটি পরমাপ্রকৃতি। বস্তুতঃ পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি একই স্বরূপের দুইটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই দুইটি অঙ্গ পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু বিরুদ্ধ হইলেও একটি অপরটির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। নতুবা কোনটিই পূর্ণ হইতে পারে না। পরমপুরুষ নিজ আত্মার পূর্ণতার জন্যই পরমাপ্রকৃতিকে এবং পরমাপ্রকৃতিও নিজের পূর্ণতার জন্য পরমপুরুষকে প্রার্থনা করে। এই যে পরমপুরুষের স্বীয তৃপ্তি বা পূর্ণতার জন্য পরমাপ্রকৃতির দিকে ঈক্ষণ অথবা পরমাপ্রকৃতির স্বকীয তৃপ্তির জন্য পরমপুরুষের দিকে ঈক্ষণ—ইহাকেই কাম বলে। ইহাই সৃষ্টির মূল। এই কাম ত্রিগুণাতীত মাযাতীত অত্যন্ত শুদ্ধ দিব্য প্রেমস্বরূপ, নামান্তরে অপ্রাকৃত কাম। অপ্রাকৃত কামই ভাবরাজ্যের সারবস্তু। প্রাকৃতিক কাম বর্জন করিতে না পারিলে অপ্রাকৃত কামের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের ইহাই স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কাম এবং শ্রীরাধা অপ্রাকৃত রতি।

"কামতত্ত্বের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্বৈত বিন্দু দুই রূপে পরিণত হইল এবং এই একের সহিত দুইয়ের আকর্ষক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। একবার এক বিন্দু হইতে বিন্দুদ্বয়ের নির্গম হইতে লাগিল। ইহাই বিন্দু বিসর্গের খেলা। বিন্দু চিৎ, বিসর্গ আনন্দ। বিন্দু শিব বা প্রকাশ, বিসর্গ শক্তি বা বিমর্শ। বিন্দু বিসর্গের খেলাই কামকলা বিলাস। কামকলার যাহা বিশ্বাস তাহাই রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার-ক্রীড়া। এই ক্রীড়া হইতেই প্রতি নিয়ত আনন্দরস নির্গত হইতেছে। এবং উহা যোগ্য আধারকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে।

(ঐ, পৃঃ ২১৩—২১৭)

"শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটি যুগনদ্ধ অবস্থার দ্যোতক। ইহাকে সাধারণতঃ যুগলভাব বলা হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধা এই উভয় অংশ সম্মিলিত ভাবে একটি পরমতত্ত্ব

রূপে প্রকাশিত হয়। যুগলতত্ত্ব অবিনাভাব সম্বন্ধ ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয না। যদিও মহাচৈতন্য হসতে যুগলতত্ত্বটিকে কিঞ্চিৎ নিম্নকোটির বলিয়া ধরিয়া লওযা হইয়াছে তথাপি ইহা সত্য যে উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে উচ্চ-নীচ ভাব নাই। শুধু তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও পরিস্ফুটতার জন্য একটি কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া মহাচৈতন্য হইতে পৃথক্‌ভাবে যুগলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের যেটি অদ্বৈত অবস্থা, যে অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না, তাহাই অদ্বয় ব্রহ্ম। আর যে অবস্থায় অদ্বয় ব্রহ্মে ক্ষোভ না থাকিলেও ক্ষোভের বিকাশ হয় তাহাই রাধাকৃষ্ণ যুগলতত্ত্ব। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয়ে কোন ভেদ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যিনি মহাচৈতন্য রূপে পরমাদ্বৈত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত তিনি রাধাকৃষ্ণ বা শিবশক্তি যুগল রূপেও সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন।

"মহাচৈতন্যই অনুত্তর চিৎস্বরূপ এবং যুগলতত্ত্বটি আনন্দস্বরূপ। বস্তুতঃ একই ব্রহ্মবস্তু যুগপৎ চিদ্‌রূপে ও আনন্দরূপে প্রকাশমান। চিৎপ্রকাশে দুইয়ের কোন স্ফুরণ থাকে না, কিন্তু আনন্দ দুই ভাব না হইলে হইতেই পারে না। দুই বলিতে এখানে ভেদজ্ঞানজনিত দ্বৈত নহে। ইহা অভেদ অবস্থারই একটি দিক—যখন দুইটি জিনিষের একটি ছাড়িয়া আর একটি প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহাই যুগলতত্ত্ব। (ঐ, পৃঃ ২৯১—২৯৩)

"লক্ষ্মী ও নারায়ণ পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মরূপে অদ্বৈত চিদানন্দময় মহাসত্তারূপে, প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহাসত্তাতে যে মহাশক্তি অভিন্নরূপে খেলা করে এবং অদ্বৈতরূপে যাহা নিত্য মিলিত থাকে তাহাই সপ্তদশী কলা। বস্তুতঃ অমাকলা ইহারই স্বরূপ। ইহাকেই ভক্তগণ রাধাতত্ত্বরূপে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের মহাভাবরূপা নিজ শক্তি রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গোলোকাখ্য অদ্বৈত মহাসত্তা এক ও অনন্ত। তথাপি মহাশক্তি নিত্য লীলাময়ী বলিয়া এই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার বক্ষঃস্থলে নিরন্তর লীলা-বিলাস চলিতেছে। এই লীলাই রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা। রাধা বলিতে আধা বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ আধা কৃষ্ণ আধা রাধা। উভয়ের সম্মিলনে একটি অখণ্ড রসময় তত্ত্ব বিগ্রহরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণ বস্তুতঃ এক হইলেও লীলার জন্য পরস্পর পৃথক্-বৎ প্রতিভাসমান হন। অর্থাৎ জাগতিক ভাষায় বলিতে গেলে যাহাকে অদ্বৈত রসতত্ত্ব বলা হয় তাহা একপক্ষে রাধাকৃষ্ণের সুষুপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় রাধার স্ফুর্তি নাই এবং কৃষ্ণেরও স্ফুর্তি নাই। উভয়ে যাবতীয় বিশেষ পরিহার করিয়া মহাসুষুপ্তিতে নিমগ্ন। যখন এই সুষুপ্তি ভঙ্গ হয, যখন গোবিন্দের অঙ্গ হইতে রাধা বিশ্লিষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠেন এবং যখন রাধার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ গোবিন্দও প্রবুদ্ধ হন, তখন অনন্ত

লীলাময়, বিচিত্র মাধুর্যময়, সংখ্যাতীত বিলাসময়, অনন্ত ভাবময় এবং অনন্ত রসের অনন্ত প্রকার আস্বাদময় ব্রজধাম ফুটিয়া উঠে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৈভবরূপী গোলোকধামও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, সমগ্র গোকুল, বৃন্দাবন, এমন কি গোলোকধাম এই দৃষ্টিতে রাধার আত্মপ্রসারণ হইতে সমুদ্ভূত। ব্রজের প্রতি বস্তুই রাধা উপাদানে গঠিত। বস্তুতঃ রাধা-স্বরূপের পরিণামরূপে ব্রজভূমির আবির্ভাব হয়। এই পরিণাম রাধার অঙ্গীভূত যোগমায়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যোগমায়া লীলাভূমির রচনার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। রাধাঙ্গের সদংশ হইতে অন্তরঙ্গ ধাম সকল এবং লীলাস্থল সকল প্রকটিত হইয়া থাকে। আনন্দাংশ কায়ব্যূহ দ্বারা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

"বস্তুতঃ সন্ধিনী, সংবিদ ও হ্লাদিনী এই তিন শক্তির সমষ্টিভূত স্বরূপ শক্তি অমাকলা বা রাধা। এই সকল শক্তিমধ্যে হ্লাদিনীর প্রাধান্য বলিয়া এবং অন্যান্য শক্তি তাহার অঙ্গীভূত বলিয়া কেহ কেহ হ্লাদিনী রূপেই শ্রীরাধাকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই শক্তিপুঞ্জই শ্রীরাধানামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। অনন্ত স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধার বিগ্রহ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে মহাসুষুপ্তি ভঙ্গের সময় শ্রীরাধার অঙ্গ পৃথক্‌ভাবে নিঃসৃত হইয়া থাকে, শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নিঃসৃত হয় না। (ঐ, পৃঃ ১১৫–১১৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গোলোক এবং তাঁহার বৈভব গোকুল অথবা দিব্য বৃন্দাবন কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে—

"নিরাকার, নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় জ্ঞানযোগ। ঠিক সেই প্রকার অন্তর্যামী পরমাত্মা বা পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইবার উপায় ধ্যানযোগ। এইভাবেই সাকার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সম্পন্ন রসস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় ভক্তিযোগ।

"চিত্তের বৃত্তিরূপে ভক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে ইহা সত্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপতঃ ভক্তি চিত্তের বৃত্তি নহে। ইহা সাক্ষাৎ চিৎশক্তির বিলাস এবং অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে মানব হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে।

"ভগবৎ স্বরূপ বহির্ভূত কোন শক্তির দ্বারা ভগবৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। ভগবৎ স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। যে শক্তি দ্বারা ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি হয় তাহাও সচ্চিদানন্দময়ী, ইহা বলাই বাহুল্য। সচ্চিদানন্দময়ের স্বরূপভূতা এই সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিই স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী ইহারই তিনটি বৃত্তির নাম। ভগবৎ স্বরূপের আনন্দাংশের সহিত

হ্লাদিনী শক্তির সম্বন্ধ। হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তি ব্যতিরেকে পরমানন্দময় ভগবৎ স্বরূপের আস্বাদনের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। হ্লাদিনী শক্তির অনন্তপ্রকার খেলা আনন্দ রাজ্যে নিত্যলীলারূপে নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু ঐ খেলায় যোগদান করা অথবা উহার রস আস্বাদন করা মায়াচ্ছন্ন জীবের পক্ষে এমন কি কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের পক্ষেও, অসম্ভব। কারণ যতক্ষণ জীব হৃদয়ে পূর্বলিখিত স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ কোন শক্তির প্রাদুর্ভাব এবং বিকাশ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ ঐ জীবের পক্ষে তাহার প্রাকৃত শক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের অভাবনীয় অচিন্ত্য অননুভূতপূর্ব রস বিলাসের ধারণা করা সম্ভবপর নহে।

"এই যে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপ শক্তি বিশেষের কথা বলা হইল ইহাই ভক্তি। ইহা প্রাকৃতিক জগতের বস্তু নহে। বহু ভাগ্য ক্রমে জীব ইহা প্রাপ্ত হইলে ইহারই আকর্ষণে সে চিদানন্দময় ভাবদেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভগবৎ প্রসাদরূপে আপনা আপনিই অহেতুক ভাবে জীব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় অথবা জীবের সাধন বলে তাহার হৃদয়ে প্রকটিত হয়। অর্থাৎ কোন কোন স্থলে জীবের দীর্ঘকালীন সাধনার ফলে সে এই ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে অন্যান্য স্থলে বিশেষ সাধনা ব্যতিরেকেও স্বয়ং ভগবানের অথবা ভক্ত বিশেষের কৃপা প্রভাবে ইহা জীব হৃদয়ে সমুদিত হয়। ইহার নাম ভাবভক্তি। ইহা একদিকে যেমন সাধন ভক্তি হইতে পৃথক অপরদিকে তেমনি প্রেমভক্তি হইতেও পৃথক্। বস্তুতঃ প্রেমভক্তি ভাবভক্তিরই পরিপক্ব পরিণাম বিশেষ। ভাব বীজ স্বরূপ, প্রেম ভাব-বৃক্ষের সুগন্ধ ফল। ভাব না হইলে প্রেমের উদয় হইতে পারে না। যাহাকে সাধনভক্তি বলা হয় তাহা ভাবের উদ্ভবের কারণ স্বরূপ। সাধনা যথাবিধি এবং আন্তরিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা ভাব উৎপাদন করিয়া ভক্তিরূপে পরিণত হয়।

"ভাবরাজ্যে প্রবেশের সূত্রই ভাবভক্তি। যতক্ষণ জীব-হৃদয়ে ভাবের উদয় না হয় ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভাবরাজ্যরূপ নিত্যধামে প্রবেশ সুদূর পরাহত, কারণ ভাবরাজ্য স্বভাবের রাজ্য। যতক্ষণ জীব কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া স্বভাবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিবে অর্থাৎ যতক্ষণ জীব অহন্তা ও মমতা রূপে স্বত্ব ও স্বামিত্ব বোধ, অর্থাৎ শাখাপল্লবযুক্ত অভিমান, পরিত্যাগ করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করা হইতে পারে না।

(ঐ, পৃঃ ৩১৬–৩১৯)

"সন্ধিনী, সংবিদ্ এবং হ্লাদিনী এই তিনটি ভগবানের অনন্ত স্বরূপশক্তির মধ্যে প্রধান রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এই তিনটিই তাঁহার

সত্তাগত অনন্তাংশেব অন্তর্গত যথাক্রমে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি প্রধান অংশের সহিত সম্বন্ধ। ইহাব মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিরই প্রাধান্য, যদিও অঙ্গরূপে অন্যান্য শক্তি ইহারই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আনন্দবাজ্যের রচনায় হ্লাদিনী শক্তির প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। যখন গোবিন্দের আলিঙ্গন হইতে রাধারাণী বহির্মুখ হন, তখন তাঁহা হইতে যে স্ফুরণ নিরন্তর হইতে থাকে তাহা স্বভাবতঃ শুধু যে আনন্দাত্মক হয় তাহা নহে, তাহা আনন্দেব আশ্রয় রূপেও পরিগণিত হয়। যদি হ্লাদিনী শক্তিকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকে পরাভক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ঐ শক্তি হইতে নির্গত প্রত্যেকটা কণাই যে ভক্তিরূপ এবং ভক্তির আশ্রয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিরূপা ভক্তিদেবী হইতে ভক্তমণ্ডলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল ভক্ত স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তির অংশ এবং তাহা শুধুই যে হ্লাদিনী শক্তিরূপ তাহা নহে, হ্লাদিনী শক্তির আশ্রয় ভাবও তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত। শ্রীরাধা যেমন হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ হইয়াও হ্লাদিনী শক্তিসম্পন্ন—তাঁহা হইতে নিঃসৃত প্রতি ভক্তও ঠিক সেই প্রকার। অধ্যাত্ম জগতের ইহা অতি গভীব রহস্য।

"স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি হইযাও তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তিবিশিষ্ট। অর্থাৎ তাঁহারা একাধারে ভক্তি এবং ভক্ত উভযই! ব্রজধামের অথবা গোলোকধামের নিত্য ভক্তমণ্ডলের সৃষ্টি হ্লাদিনী শক্তি হইতে এই ভাবেই হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাব মধ্যে ক্রম আছে, প্রকারভেদ আছে এবং ভক্তির আস্বাদগত বৈলক্ষণ্য আছে। তদনুসারে কান্তাবর্গ, সখীবর্গ, পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন, সখা, নর্মসখা, প্রিয় নর্মসখা প্রভৃতি সখাগণ এবং বিভিন্ন প্রকারেব সেবাতে নিরত দাসগণ আবির্ভূত হইযা থাকেন।

"যখন হ্লাদিনী শক্তি হইতে স্বাংশরূপে অনন্ত ভক্তমণ্ডলের আবির্ভাব হয় তখন ঐ সকল ভক্ত শুধু হ্লাদিনী শক্তির অংশরূপে নিত্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, ঐ সকল অংশের আশ্রয়রূপেও তাহারা নিত্য। অথচ উভয়েই এক এবং অভিন্ন। ভাবটিও নিত্য এবং ভাবের আশ্রয়টিও নিত্য। যে সকল জীব মায়া রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে যখন গোবিন্দের কৃপায় তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহারাও পূর্বোক্ত কোন না কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ঐ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ঐ ভাবটিই তাহাদের স্বভাব বা আপন ভাব। ঐ ভাবটি নিত্য। মায়াবদ্ধ জীব মায়ামুক্ত হইয়া ভগবৎ কৃপায় অথবা ভক্ত কৃপায় প্রাপ্ত ভক্তির প্রভাবে ঐ ধামে স্থান প্রাপ্ত হয়। এই ভক্তিই ভাব রূপা ভক্তি। ইহাই উক্ত জীবের স্বভাব। কোনও জীব ব্রজধামে স্বকীয় ভাবকে প্রাপ্ত হইলে তাহার ঐ স্বভাবই তাহার আনন্দ লীলার নিয়ামক হয়। শিশু যেমন গর্ভধারিণী জননীকে স্নেহ করে স্বভাবে,

জননীও তেমনি আপন শিশুকে স্নেহ করেন স্বভাবে। উভয়ত্র স্বভাবই নিয়ামক। বিধি নিষেধের কোন শাসন এই স্বভাবের উপর কার্য করিতে পারে না। (ঐ, পৃঃ ১২৩—১২৮)

"মর্ত্ত্যলোকের জীব আগন্তুক রূপেই ভাবজগতে প্রবেশ করে। ব্রজধামে আগন্তুক এই সকল ভক্তদেরই জন্য নিত্য লীলা। ইহারা ভাব অবস্থা হইতে প্রেমের অবস্থা পর্যন্ত উন্নীত হইলে ইহাদের নিকট সাক্ষাৎভাবে ভগবানের প্রাকট্য হয়। কারণ প্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্-দর্শন হয় না। তখন এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশই সাধনার পরিসমাপ্তি। ইহা সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায অর্থাৎ লীলানুভূতির ক্রম বিকাশে প্রেমভক্তি রস রূপে পরিণতি লাভ করে। প্রেমভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাভাব। যিনি মহাভাবরূপা তিনিই ভক্তকুলের চূড়ামণি। তিনিই হ্লাদিনী সারভূতা স্বয়ং শ্রীরাধা। এইজন্য প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া অর্থাৎ রাধাভাব প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দের সহিত অন্তর্লীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য জন্মে। প্রেমভক্তির পূর্ণতা সিদ্ধ হইলেই কুঞ্জলীলার অবসান হয়। তখন রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অত্যন্ত গুপ্ত ভাবে, এমন কি সখীগণেরও অগোচরে, অনুষ্ঠিত হয়।

"ভগবানের নিত্য লীলা শুধু নিত্য নহে, প্রতিনিয়ত অভিনব এবং প্রতিক্ষণে নব নব রূপে আস্বাদ্যমান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে লীলা অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া নিত্য হইলেও, রাধা এবং গোবিন্দ উভয়েই নিত্য হইলেও, রাধার অংশভূত আনন্দস্বরূপ ভাবময় অনন্ত ও বিচিত্র ভক্তবৃন্দ নিত্য হইলেও, যাহার জন্য এই লীলার অনুষ্ঠান সেই জীব, মাযা মুক্ত ভগবদ্ভক্ত রূপে অপ্রাকৃত ভাবময দেহ সম্পন্ন নিত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত সেই জীব, চিরদিনই যে এই লীলায় আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ব্রজভূমিতেও ভক্তগণেব ক্রম বিকাশ রহিয়াছে। কারণ যাহারা সাধক তাহারা ক্রমশঃ ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিযা থাকে। যে কোন ভক্ত যখন মহাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন তখন তিনি রাধা তত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন। তারপর নিকুঞ্জলীলার অবসানে তিনি রস নিষ্পত্তি রূপে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহাকৃপার ফলে যুগলের নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অনাদি মহাসুষুপ্তি ভেদ করিতে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃত মহাজাগরণ বা বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা। ইহাই অদ্বৈত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার। (ঐ, পৃষ্ঠাঃ ১৩২—১৩৪)

"যদিও আপন আপন ভূমিতে প্রত্যেকটি ভাবই শ্রেষ্ঠ এবং কোন বিশিষ্ট ভাব হইতে অন্য কোন বিশিষ্ট ভাবের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই, তথাপি তটস্থ দৃষ্টিতে ভাবের মধ্যেও একটি ক্রমিক উৎকর্ষের

ধারা অবশ্যই আছে বলিতে হইবে। তাহা না হইলে ভাবজগতেব ক্রম বিকাশের কোন অর্থ থাকিত না।

“যাহার যে ভাব তাহার নিকট তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐ ভাবেব বিকাশ হইতেই সে রসতত্ত্ব পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে। যদি ঐভাব তাহার প্রকৃতির অনুকূল হয় তবে তাহার পক্ষে উহাই রস সাধনার ধাবা। অন্যের ধারা তাহার ধারা হইতে পৃথক্ বলিয়া উহার যে কোন মর্যাদা নাই এমন নহে।

“এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে যে-ভাবে সাধনা করে তাহার পক্ষে সেই ভাব ব্যতিরেকে অন্য ভাবের সাধনা অর্থহীন। প্রত্যেকটি ভাব স্বতঃ পূর্ণ বলিয়া এবং প্রত্যেকটি ভাব হইতেই মহাভাবে যাইবার সরল মার্গ রহিয়াছে বলিয়া ভাব হইতে ভাবান্তরে সঞ্চারের কোন প্রসঙ্গই উঠে না। কিন্তু যে জীব সাধন বলে ও ভগবৎ কৃপায় ভাবজগতে অর্থাৎ নিত্য বৃন্দাবনে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এ নিয়ম নহে। এক হিসাবে সে স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী ভাবে নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। শুধু তাহাই নহে, ঐ নির্দিষ্ট ভাবে থাকিয়াই সে নিজ রস আস্বাদন করিতে বাধ্য। উহাই তাহার নিয়তি নির্দিষ্ট ধারা। কিন্তু অন্যদিকে ক্রমবিকাশের ধারা ধরিয়া স্তরবিন্যাস অনুসারে জীবকে নিম্নতম ভাব হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্বতর ভাবে আরোহণ করিয়া আত্মকলার বিকাশ সাধন করিতে হয়। ভাবজগতের স্বভাবসিদ্ধ ক্রম এবং এই ক্রমের অনুরূপ মার্গ ইহারই নিকট প্রকাশিত হয়।

“ভাবরাজ্যে নিত্য সিদ্ধ ভক্ত অনাদিকাল হইতেই ভাবরাজ্যে বিদ্যমান আছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা সকলেই ভাবরাজ্যের অংশস্বরূপ। এই সকল নিত্যভক্ত বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে স্ব স্ব প্রকৃতি ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রকার যূথ অথবা গণ বা সংঘ আকারে বর্তমান। কিন্তু ভাবরাজ্য শুধু এই সকল নিত্যভক্তের দ্বারা গঠিত নয়। ভাব রাজ্যের বাহির হইতে অসংখ্য জীবরূপী সুকৃতিসম্পন্ন চিদনু মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সময় সময় নিত্য সিদ্ধ ভাবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহারা ভাবরাজ্যে আগন্তুক অতিথি। এই সকল জীব যে-ভাব অর্থাৎ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করে, চিরকাল তাহাতে নিবদ্ধ থাকিতে পারে, অথবা ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে আপন আপন ভাবে পূর্ণতা লাভ করিলে স্বভাবতঃই ইহার পরবর্তী অর্থাৎ উর্ধ্বদেশবর্তী ভাবে সঞ্চার লাভ করে। ইহাই ইহাদের ভাবগত ক্রমিক উৎকর্ষ। ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ মুক্ত পথ ধরিয়াই আগন্তুক জীব মাত্র ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করে।

“কিন্তু সকলেই যে মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছিবে এমন কোন কথা নাই। কারণ মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছিবার স্বরূপ-যোগ্যতা প্রত্যেকটি ভাবে নিহিত আছে

ইহা সত্য হইলেও কার্যক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় দৃষ্ট হয় না। যাহার যে প্রকার রতি তাহার গতি ও স্থিতিও ঠিক তাহারই অনুরূপ। কোনও ভাব প্রেম পর্যন্ত রূপান্তর লাভ করে এবং ঐখানেই স্থিত হইয়া স্বীয় যোগ্যতানুসারে রসের আস্বাদন করে। কোন ভাব স্নেহ পর্যন্ত, কোনটি প্রণয়, কোনটি অনুরাগ এবং মহাভাব পর্যন্ত উত্থিত হইতে সমর্থ হয়। ভাবের প্রকৃতি-নিহিত সামর্থ্য হইতেই এইরূপ ঊর্ধ্বগতি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। (ঐ, পৃঃ ১৬৩–১৬৭)

"পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রতি ভাব হইতেই রসাস্বাদনের উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ প্রত্যেকটি ভাব, উহা যে স্তরেই হউক না কেন, পূর্ণ হইলে মহাভাবেরই অঙ্গ রূপে স্থিতি লাভ করে। সুতরাং স্বীয় ভাবানুরূপ রসের আস্বাদন সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই রসাস্বাদনকে রসরাজের পূর্ণতম আস্বাদন বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ভাবের বিকাশ পূর্ণ হইলেও তাহা কোন বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের বিকাশ বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সম্পন্ন ভাবান্তরের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তখনও থাকিয়া যায়। চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেই যে সব হইল এমন নহে। পঞ্চম শ্রেণীর জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা তখনও থাকে। ঠিক এই প্রকার ভাব-সাধক একটি ভাব হইতে আর একটি ভাবে উন্নীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ভাব জগতের প্রত্যেকটি স্তর অতিক্রান্ত হইলে সাধক স্বয়ং মহাভাব রূপে পরিণত হয়। তখন ভাবরাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় রসরাজের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করা চলে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে এক একটি ভাব-সাধনা পূর্ণ হইলে অখণ্ড মহাভাবের এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রচিত হয় এবং অভিব্যক্ত হয়। যখন সকল ভাবের সাধনাই সম্পূর্ণ হইয়া যায় তখন সর্বাঙ্গ সম্পন্ন মহাভাবের আকার আবির্ভূত হয়। এইখানেই ভাব রাজ্যের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত সম্পন্ন হইলে ভাবরাজ্যের লীলার পুনরাবর্তন পূর্বোক্ত সাধক জীবের পক্ষে আবশ্যক হয় না। তখন তাহার নিকুঞ্জ লীলায় প্রবেশ হয়। সমগ্র ভাব জগৎ রাধাতত্ত্বে অধিষ্ঠিত ঐ সাধকের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়া থাকে। (ঐ, পৃঃ ১৭২/১৭৩)

ভাবরাজ্যের গঠন—"মহাভাব যেন একটি বিন্দু। এই বিন্দুটি নিরন্তর স্পন্দিত হওয়ার দরুণ একটি নিত্য প্রভামণ্ডল ইহার চারিদিকে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রভামণ্ডলই ভাবরাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ। যে উপাদান হইতে ভাবরাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন ভাবদেহ ও দৃশ্যাবলী রচিত হয় তাহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। বিক্ষুব্ধ হওয়ার পূর্বাবস্থায় ইহা মহাভাবরূপী মহাবিন্দুর সহিত অভিন্নরূপেই বর্তমান থাকে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবজগতের বিভিন্ন

দৃশ্যরূপে পরিণত হয়। মায়িক জগতে যাহা কিছু আছে ভাবজগতে তাহার সবই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে বলা যায় প্রাকৃতিক সকল তত্ত্বই অপ্রাকৃত জগতে নিত্য বিদ্যমান। ভেদ শুধু ইহাই যে প্রাকৃত তত্ত্ব সকল মলিন এবং রজস্তমোগুণবিশিষ্ট, কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সর্বাংশে প্রাকৃতিক তত্ত্বের অনুরূপ হইলেও রজস্তমোগুণহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ও নির্মল।

"ভাবরাজ্যে ভাবও নিত্য, ভাবরাজ্যের উপাদানও নিত্য। উভয়ের সম্বন্ধ হইতে লীলা বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যোগমায়া। অনন্ত ভাব মহাভাবে নিত্য বর্তমান। শুদ্ধ সত্ত্বও ঐ মহাভাবের সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান। কিন্তু যতক্ষণ মহাভাব ক্ষুব্ধ না হয় ততক্ষণ ভাবের সহিত শুদ্ধ সত্ত্বময় উপাদানের সংঘর্ষ হয় না, এবং এই সংঘর্ষ ব্যতিরেকে ভাবরাজ্যের রচনা অসম্ভব। ঊর্ণনাভ যেমন নিজেকে কেন্দ্র স্থানে রক্ষা করিয়া চারিদিকে জাল বিস্তার করে, মহাভাবও তেমনি নিজেকে কেন্দ্রস্থ বিন্দুরূপে রক্ষা করিয়া চারিদিকে স্তরে স্তরে ভাবময় সৃষ্টির আবির্ভাব করে।

"মহাভাব হইতে ভাবরাজ্যের উন্মেষের সময় সর্বপ্রথম যে ভাবের স্ফূর্তি হয় তাহাই মধুর ভাব। তদনন্তর ক্রমবদ্ধ ভাবে বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য এবং শান্ত ভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাই ভাবের আবির্ভাবের ধারা। যেটি মহাভাবের অধিরূঢ় অবস্থার অন্তর্গত 'মাদন ভাব' তাহাই ভাবরাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান থাকে। তাহার বাহিরে পর পর 'মোদনভাব' (অধিরূঢ়) এবং রূঢ় মহাভাব প্রকাশিত হয়। ইহার বাহিরে অনুরাগ, তারপর রাগ, মান, স্নেহ, প্রণয়, প্রেম এবং রতি। এইযে মধুর ভাবের অন্তরঙ্গ মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হইল ইহার মধ্যেও মহাভাবের বহির্মুখ আবির্ভাবের দিক হইতে এক একটি ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সখী বর্গের শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভাবকে বেষ্টন করিয়া পর পর পাঁচটি মণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পাঁচটি মণ্ডল পঞ্চবিধ সখীর নামে পরিচিত। মহাভাবের অব্যবহিত নিকটতম মণ্ডলে যে আটজন সখী প্রকটিত হন তাঁহারা পরম শ্রেষ্ঠ সখী নামে অভিহিত। ইঁহারা সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। ইঁহারাই শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অষ্টসখী। ইঁহাদের নাম ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। পরম শ্রেষ্ঠ সখীর বাহ্য প্রদেশে যে সকল সখীর স্থিতি তাঁহাদের নাম প্রিয় সখী। প্রিয় সখীর বাহ্য প্রদেশে পর পর প্রাণ সখী নিত্য সখী এবং সখী মণ্ডলের সন্নিবেশ জানিতে হইবে। (ঐ, পৃঃ ১৭৭—১৮০)

"ভাব এক হইলেও স্তর ভেদে বিভিন্ন প্রকার ভেদ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভেদ ভাবের স্বরূপগত নহে, কিন্তু বিকাশের যোগ্যতাগত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে শান্ত ভাব ভাবই থাকিয়া যায়, ভাবের পর

প্রেম প্রভৃতি উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু দাস্য ভাব প্রেম স্নেহ, এমন কি রাগ পর্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্য ভাবও ঠিক তাহাই। সখ্যভাব এই সকল ব্যতিরেকে প্রণয় নামক অবস্থাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে কোন ভাবই ভাবের পরম বিকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভাবের পরম বিকাশ মহাভাব। তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে পূর্ব বর্ণিত চতুর্বিধ অবস্থা ছাড়াও মান, রাগ ও অনুরাগ এই তিনটি অবস্থার বিকাশ আবশ্যক। এই প্রকার পূর্ণ বিকাশ একমাত্র মধুর ভাবেই সম্ভবপর। কিন্তু তাহাও সর্বত্র নহে। কারণ সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা এই ত্রিবিধ রতির পার্থক্য আছে। সাধারণী রতি যদিও ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্তিরূপা তাহাতে সন্দেহ নাই তথাপি উহাতে নিজের ভোগ্য আনন্দেব দিকে অনেকটা লক্ষ্য থাকে বলিয়া এবং ভগবৎ প্রীতি অপেক্ষাকৃত গৌণ থাকে বলিয়া উহার ঊর্ধ্বগতি একপ্রকার হয় না বলিলেও চলে। মধুর ভাব হওয়া সত্ত্বেও প্রেমের ঊর্ধ্বে সাধারণী রতি উঠিতে পারে না। কিন্তু সমঞ্জসা রতি স্বার্থহীন বলিয়া যদিও তাহাতে উদ্দেশ্য রূপে ভগবৎ প্রীতির প্রাধান্যভাব না থাকুক এবং কর্তব্যের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ থাকুক তথাপি উহা অনুরাগ পর্যন্ত ফুটিয়া উঠে। কিন্তু অনুরাগের পরবর্তী বিকাশ অর্থাৎ মহাভাব পর্যন্ত উৎকর্ষ লাভ একমাত্র গোপীজনসুলভ সমর্থা রতিরই হইতে পারে। কিন্তু সমর্থারতিও সকল আধারে সমান নহে। এইজন্য মহাভাবের মধ্যেও ক্রমবিকাশের অবসর রহিয়াছে। মহাভাবের যেটি পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ মদনভাব তাহাই হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ রাধাতত্ত্ব। এই অবস্থায় ভগবানের সহিত বিচ্ছেদ চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায় এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নিত্য লীলার বিকাশ হইয়া থাকে। অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের সহিত অখণ্ড রাধাভাবের মিলন এই মাদন অবস্থাতে সম্ভবপর। এই অবস্থায় ভাবজগৎ সংকুচিত হইয়া মধ্যবিন্দুরূপে রাধাতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। আপন স্বরূপের বিস্তার পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইয়া রাধা তখন সম্যক্ প্রকারে পুষ্টি লাভ করেন এবং নিকুঞ্জ লীলায় ক্রমশঃ আত্মবিসর্জন করিয়া বিশুদ্ধ মহারস তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। (ঐ, পৃঃ ১৮৪—১৮৬)

"ভাবরাজ্যের ক্রমবিকাশের পথে প্রথমতঃ পশুভাব কাটিয়া যায়। অর্থাৎ সকল দৃশ্য পদার্থ মাত্রেই যে ইদংরূপে ভান ছিল তাহা অপগত হয়। অর্থাৎ চারিদিক্‌কার পদার্থকে তখন 'ইহা' বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। উহাতে 'আমি' রূপে প্রতীতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া 'আমি' ভাবের অতীত অনুত্তর সত্তাতে স্থিতিলাভ হয়। সকল বস্তুই আত্মার ধর্মরূপে প্রতীতিগোচব হয়। এই অবস্থাটি অতিক্রান্ত হইলে বিশুদ্ধ অহংভাবের সূত্রপাত হইয়া তাহার পূর্ণতা ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। সর্বাত্মভাব বলিতে বৈষ্ণবাচার্যগণ এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সর্বত্র নিজেরই স্ফূর্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আত্মস্ফূর্তি যথার্থ আত্মস্বরূপ নহে—ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার পর অনুত্তরধামে প্রবিষ্ট হইলে সর্বাত্মভাবের অতীত আত্মার পরম স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। সর্বত্র আমি আমি ভাবের প্রকাশই সর্বাত্মভাব। এই অবস্থায় ভক্তের দৃষ্টিতে সর্বত্রই আত্মভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিজেকেই অনন্ত আমি রূপে উপলব্ধি করা যায়। বাহ্য উপলব্ধির ইহাই চরম সীমা। এই অবস্থার অবসানে বহু আমি এক আমিতে পরিণত হয়।

"এই যে সর্বাত্মভাবের কথা বলা হইল ইহা আবির্ভূত হইলে সর্বত্রই পুরুষোত্তম স্বরূপ দর্শন হয়। ইহার পরই ভিতরে এবং বাহিরে সমরূপে অখণ্ডভাবে পুরুষোত্তমভাব প্রকট হইয়া থাকে। যাহার ফল অলৌকিক সামর্থ্য অথবা নিত্য লীলায় প্রবেশ।

"সুতরাং বুঝিতে হইবে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে সর্বত্র আত্মভাবের স্ফূর্তি হওয়া আবশ্যক। এখন প্রশ্ন এই সর্বাত্মভাবের অভিব্যক্তির মূল কারণ কি? এই সম্বন্ধে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আচার্য বলিয়া থাকেন যে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা হইতেই সর্বাত্মভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমভক্তির পাক অনুসারে তিনটি অবস্থা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম প্রেম—দ্বিতীয়টির নাম আসক্তি এবং তৃতীয়টির নাম ব্যসন। ইহার পরই সাধনার সমাপ্তি হইয়া সর্বাত্মভাবরূপ ফলের উদয় হয়। প্রেম রুচি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন কোন বিশিষ্ট মনুষ্যে ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হয় তখন উহাকে শ্রবণাদি সাধন ভক্তি দ্বারা পরিশীলন করিলে উহা চরম অবস্থায় প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু যাহার চিত্তে রুচি উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে শ্রবণাদি দ্বারা প্রেমভক্তির বিকাশ সম্ভবপর নহে। এইভাবে বুঝিতে পারা যায় যে জীব মাত্রই আপাততঃ প্রেমভক্তির যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কোন কোন বিশিষ্ট জীবে ভগবদিচ্ছায় ভাবের বীজ নিহিত থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল জীব আসুরিক জীব হইতে বিলক্ষণ দৈব জীবের অন্তর্গত। সৎসঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের প্রভাবে এই সূক্ষ্ম ভাববীজ রুচি রূপে ফুটিয়া উঠে। ইহার পর সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেম পরিষ্কৃত হইয়া প্রথমে আসক্তি এবং তাহার পর ব্যসনরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহার পর সর্বত্র আত্মভাবের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। তখন সর্বত্র সমরূপে ভগবৎ স্ফূর্তি হওয়ার দরুণ নিত্যলীলায় প্রবেশ হইয়া থাকে।

"নিত্যলীলায় যে সকল জীবের প্রবেশাধিকার জন্মে তাহারা সকলেই যে একই প্রকার অবস্থা লাভ করে এমন নহে। কারণ ভাবরাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহার যেটি আপন প্রকৃতি সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"জীব সকলের মধ্যে যেমন একটি মৌলিক সাম্য আছে তেমনি প্রত্যেক জীবেব একটি বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বৈশিষ্ট্যটি সাংসারিক অবস্থায় ফোটে না। ইহা জীবেব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া সংসারেব কৃত্রিম আববণ কাটিয়া গেলে ইহা আপনি জাগিয়া উঠে। এই হিসাবে প্রত্যেকটি জীবেরই ব্যক্তিগত বিলক্ষণতা রহিয়াছে। এইজন্যই দার্শনিকগণ মুক্ত অবস্থাতেও 'বিশেষ' স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশেষ স্বরূপগত, আকৃতিগত, গুণগত, ধর্মগত, ক্রিয়াগত এবং সম্বন্ধগত। সুতরাং একটি জীবের সহিত অন্য একটি জীবের কোন অংশেই সমানতা পরিদৃষ্ট হয় না (যদিও সকল জীবই মূলতঃ এক ও অভিন্ন)।

"এই জীবগত বিশেষের সার্থকতা ভাবরাজ্যে উপলব্ধি গোচর হয। কারণ ভাবরাজ্যে বিধি নিষেধের প্রেরণা থাকে না বলিযা অন্তর্নিহিত ভাব অথবা স্বভাবই লীলাগত বৈশিষ্ট্যের এবং রসাস্বাদনের নিয়ামক হইয়া থাকে। (ঐ, পৃঃ ২৫১–২৫৪)

অন্যত্র—

"সর্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে অহন্তা ও মমতারূপ সংসার নিবৃত্ত হয়। সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারা যায়। এবং তাহার ফলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে যাবতীয প্রাকৃত ধর্ম তিরোহিত হয়। তখন শুদ্ধি পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইলে ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার স্বরূপযোগ্যতা জন্মে। কিন্তু কেবলমাত্র স্বরূপযোগ্যতা হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয না। তাহার জন্য সহকারী যোগ্যতাও আবশ্যক। এই সহকারী যোগ্যতা জীবনিষ্ঠ ভক্তিভাব। কিন্তু এই ভক্তিভাব প্রতি জীবেই থাকে না। যে সকল জীবকে ভগবান আপনরূপে বরণ করেন শুধু তাহাদের মধ্যেই ভক্তিভাবের বিকাশ হয়, অন্যত্র নহে। সুতরাং স্বরূপযোগ্যতা এবং সহকারী যোগ্যতা উভযের প্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিযা থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিবন্ধকরূপিণী অবিদ্যা বর্তমান থাকিতে ভগবৎপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে অবিদ্যা মাযাজনিত বলিয়া মায়া অপগত হইলে অবিদ্যা আপনি কাটিয়া যায। ভক্তের পক্ষে অর্থাৎ ভগবান পুরুষোত্তমকে সর্বোৎকৃষ্ট জানিযা তাঁহার নিকট যে শবণাগত বা প্রপন্ন হয় তাঁহার পক্ষে অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞান সহজে উপস্থিত হয়। এইজন্য ভক্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতির দ্বারাই অবিদ্যা-সাগর পার হইতে সমর্থ হয়। ইহার পর অবিদ্যাবর্জিত শুদ্ধ জীব অক্ষরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয় বা লীন হয। এই অক্ষরব্রহ্ম ভগবানের পরম ধাম যাহা প্রাপ্ত হইলে আর ফিবিয়া আসিতে হয় না। ভক্তগণ ভগবদ্ধামরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ভক্ত ও জ্ঞানীর স্বভাবগত ভেদ অনুসারে এইরূপ হইয়া থাকে। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপী ধামের যিনি অধিষ্ঠাতা তিনিই ভগবান পুরুষোত্তম। পবমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের অতীত। অর্থাৎ জীব ও অন্তর্য্যামী উভয়ের অতীত। অক্ষরব্রহ্ম হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি যে উপায়ে সিদ্ধ হয় তাহা অত্যন্ত রহস্যময়। কারণ ভক্তি ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে সকল ভক্ত অক্ষরব্রহ্মে পূর্বোক্ত প্রণালীতে লীন হয় অর্থাৎ যাহারা সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভজন অভ্যাসের প্রভাবে ভক্তিলাভ করে এবং ভগবৎলীলায় প্রবেশ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে ভগবান বিশিষ্ট অনুগ্রহবশতঃ যত্নপূর্বক উদ্ধার করিয়া ভজনানন্দে যুক্ত করেন। কারণ এই সকল ভক্তকে তিনি আপনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবৎ কর্তৃক উদ্ধার সম্পন্ন না হইলে ঐ সকল জীব ব্রহ্ম সত্তায় অভিন্নরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই যে উদ্ধার ইহা লীলারসের অনুভবের জন্য। ব্রহ্ম সাযুজ্য অবস্থায় জীবের যে স্থিতি তাহা নিরাকার। কিন্তু প্রাদুর্ভাব অবস্থায় সাকার স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু এই সাকার ভাব নিত্য, ইহার বিকাশ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তজনকে ব্রহ্মানন্দ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই সময়ে জীবের বিরহভাব আত্যন্তিক তীব্রতা লাভ করিয়া তীব্র অনলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। এই তীব্র বিরহের অবস্থায় ভগবান ভক্তের আপন অধিকার অনুসারে তাহাকে আপন ভাবের উপযোগী পরমানন্দ লীলা অনুভব করাইয়া বিরহের উপশম করাইয়া দেন।

"উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, জীবের ব্রহ্মরূপে যে স্থিতি তাহা নিরাকার। শুধু নিরাকার নহে, ইহা সর্বাংশে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য ভাবাপন্ন বলিয়া ইহাতে স্বভাবের বিকাশ থাকে না। অবশ্য জীব মাত্রেরই স্বভাব বা স্বরূপ ব্রহ্মই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের দুইটি দিক আছে। একটি সামান্য এবং অপরটি বিশেষ, একটি নিরাকার এবং অপরটি সাকার, একটি চিদাত্মক—অপরটি চিদানন্দময়। জীব যতদিন মায়ার অধীনে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া মলিন ভাবে বিদ্যমান থাকে ততদিন সে তাহার প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবেরই একটি আপন স্বভাব আছে। কিন্তু অশুদ্ধ অবস্থায় তাহার অনুভব হয় না। অশুদ্ধি পরিহার করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করাই স্বীয় স্বীয় স্বভাব প্রাপ্তি। এই অশুদ্ধি পরিহার এবং শুদ্ধতা লাভ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশে ব্রহ্মাবস্থায় সুসম্পন্ন হয়। এই ব্রহ্ম অক্ষর ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। যে জীব জ্ঞান পথের সাধক সে যখন অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় তখন ঐ ব্রহ্মের সহিত সর্বথা ঐক্য লাভ করে। নিজের বিশিষ্ট সত্তার অভিব্যক্তি তাহার থাকে না। যে কোন জীব ব্রহ্ম সমুদ্রে মগ্ন হইলে এক অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্ম সমুদ্রে জ্ঞানী সাধক যেমন প্রবেশ করে তেমনি ভক্ত সাধকও প্রবেশ করিয়া

থাকে; কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। ভক্ত ব্রহ্মে জ্ঞানীবৎ লীন হইলেও ভক্তির প্রভাবে পুনর্বার তাহা হইতে উত্থিত হয়। ভক্তের পক্ষে ব্রহ্মে চিরস্থিতি সম্ভবপর নহে। ভক্ত ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। এইজন্য তাহাকে উদ্ধার করিবার ভার স্বয়ং ভগবানেই ন্যস্ত থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ করিলেও ভগবৎ শক্তিতে পৃথক্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এই পৃথক্ করণ বাস্তবিক পৃথক্ করণ নহে, লীলারসের আস্বাদনের জন্য আপন আপন স্বভাবের বিকাশ মাত্র। প্রতি জীবের আকৃতি প্রকৃতি ভাব গুণ ক্রিয়া পৃথক্। ইহারা সবই নিত্য এবং মায়াতীত। পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের স্বভাবও যেমন নিত্য ও অচিন্ত্য, প্রতি জীবের স্বভাবও ঠিক সেইরূপ। এই উভয় স্বভাবের খেলা লইয়াই অনন্ত ভগবল্লীলার অপরিসীম মাধুর্য। কিন্তু ব্রহ্মাবস্থায় এই স্বভাব আচ্ছন্ন থাকে। স্বভাবের উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত লীলায় প্রবেশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উন্মেষ তখনই সম্ভবপর যখন জীব অব্যক্ত ব্রহ্মরূপা-মহাসত্তা হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই উদ্ধার ব্যাপার জীবের স্বীয় কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ ইহা তাহার নিজের চেষ্টার অতীত। বস্তুতঃ চেষ্টা তো দূরের কথা, এই অবস্থায় জীবে ইচ্ছার বা জ্ঞানের বিকাশও থাকে না। এইজন্য ভগবান পুরুষোত্তম স্বতঃ প্রেরিত হইয়াই এই সকল ভক্ত জীবকে উদ্ধার করেন, কিন্তু জ্ঞানী জীবকে উদ্ধার করেন না। জ্ঞানীর সহিত তাঁহার লীলারস সম্ভোগ সম্ভবে না। জ্ঞানী তাঁহার আত্মারূপে—স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে—প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভক্ত তাঁহার প্রিয় বলিয়া তাহাকে তিনি উদ্ধার করেন।” (ঐ, পৃঃ ৩৫২–৩৫৬)।

এমন অনেক উদ্ধৃতি “শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ” গ্রন্থ থেকে দেওয়া যায়, কিন্তু ‘অলং বিস্তারেণ’—আর বাড়াতে চাই না। অনুসন্ধিৎসু যাঁরা, তাঁরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এবার আমি আমার পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসি।

ব্রজলোকে যে স্পন্দন ওঠে, তা রসের স্পন্দন বা রসের উচ্ছ্বাস। এ-রস বিশুদ্ধ চিন্ময় রস—‘রসানাং রসতমে’র রস। এ রস অনন্ত, রসের উচ্ছ্বাসও অনন্ত; সুতরাং রসের আস্বাদও অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোন্ জীব এ রসের আস্বাদনের অধিকারী? যে জীবের মায়াব আবরণ উন্মোচিত হয়ে স্বরূপ সত্তার বা স্বভাবের প্রকাশ ঘটেছে, সেই জীব ব্রজ-রসের আস্বাদনের অধিকারী হয়। স্বরূপ সত্তার প্রকাশের অর্থই হল জীবের সন্ধিনী ও সম্বিদ্ শক্তির যুগপৎ প্রকাশ। এরূপ স্বরূপ সত্তায প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ ভাবদেহপ্রাপ্ত জীবই ব্রজলোকের অধিবাসী। এখানে অবিদ্যার আবরণ মুক্ত বিশুদ্ধ ‘অহং’ বোধ বা আমিত্বের বিলোপ হয়েছে; অর্থাৎ বিশুদ্ধ ‘অহং’ আছে, কিন্তু উহার বোধ লুপ্ত, কাজেকাজেই ইচ্ছাও নাই অথচ ইচ্ছা আছে। অর্থাৎ জীব ইচ্ছা

করে না, ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছার উদয় হয় যোগমায়ার ইচ্ছায়। এই ইচ্ছার যে-ক্রিয়া, তাহা কৃষ্ণ-সুখ বৃদ্ধি হেতু সেবায় পর্যবসিত হয়। আত্মবিলোপকারী সেবায় কৃষ্ণের আনন্দ সম্পাদনই উহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহাই হল প্রকৃত রতি—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। রতির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। এই আত্মবিলোপকারী প্রেমোন্মাদ অবস্থাই হল সমর্থা রতি। ব্রজের রাধা এবং তাঁহার অনুগামী প্রিয় সখীরাই এরূপ রতির অধিকারী। ব্রজ ছাড়া এ-রতির প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই। এ রতির কাছে আত্মসুখাভিলাষ অতি তুচ্ছ। ধর্ম বা কর্ত্তব্য জ্ঞানও এ রতিতে নাই। একমাত্র কৃষ্ণের কিসে সুখ হবে তারই চিন্তায় বিভোর। ভাব থেকে এ রতির উদ্ভব। ভাবের পরাকাষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা। তাই শ্রীরাধার মধ্যেই সমর্থা রতির পূর্ণ বিকাশ।

ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্য হল রস। বেদান্তের সচ্চিদানন্দের আনন্দ আর ব্রজের রস এক বস্তু নহে। রসের আলম্বন ভাব। ভাব গাঢ় হয়ে প্রেম এবং প্রেম গাঢ় হয়ে রতিতে পরিণত না হলে রসের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু সচ্চিদানন্দের যে আনন্দ, তাহা ভাবের স্ফুরণ নহে। সচ্চিদানন্দ লাভের পথ ভাবের পথ নহে, যদিও সচ্চিদানন্দ ও ভাব-রস এক, একই মূলাধার থেকে উৎসারিত। তথাপি উভয়ের মধ্যে গুণ-বৈষম্য আছে। সচ্চিদানন্দের স্বরূপ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। দুঃখের আত্যন্তিক অভাবই হল আনন্দ, আর আনন্দের অভাবই হল দুঃখ। সুতরাং সচ্চিদানন্দের বিপরীত হল দুঃখ। অতএব দুঃখের নিবৃত্তিই হল সচ্চিদানন্দ। কিন্তু ভাবরাজ্যে দুঃখ রসের পরিপন্থী তো নহেই, বরং অনুকূল। দুঃখের আগুণে রসের পরিপাক। ব্রজের আনন্দ-রসকে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে ধারণ করবার জন্য পর্যায়ক্রমে দুঃখ, বিরহ-বেদনা এসে আধারকে প্রসারিত করে। দুঃখকে নিঙড়ে যে নির্যাস, তাহাই রস। দুঃখের মাধ্যমেই রসের ক্রমাভিব্যক্তি। এদিক থেকে বিচারে সচ্চিদানন্দের আনন্দ আর ভাবলোকের বা ব্রজলোকের রসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

দ্বিতীয়তঃ জাগতিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা যখন জীব জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তখন জীবের অসীম ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দসমুদ্র নিথর নিস্পন্দ। স্পন্দনজাত আনন্দের যে ক্রমপ্রসারণশীল নব নব বৈচিত্র্যায়ন ও উল্লাস —সেই আনন্দের যে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম, মধুর হতে মধুরতর মধুরতম আস্বাদন, ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধিতে তার অবকাশ নেই। বেদান্তে অবিদ্যার অপসারণে জীবের যে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি তাহা এক এবং অদ্বয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-সত্তায় একাকার হয়ে যাওয়া—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া। জীব এখানে পূর্ণ—পূর্ণানন্দে নিমগ্ন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—'সোঽহং' অবস্থায় স্থিতি। এই অবস্থানে পূর্ণানন্দের বোধ

আছে। কিন্তু আনন্দের যে উল্লাস এবং তজ্জাত আস্বাদন, তা এখানে নেই। ব্রজলোকে জীব অণু-চৈতন্য। অণু-চৈতন্য বিধায় অনন্ত রসের একসঙ্গে অনুভব ও আস্বাদন জীবের সহ্য শক্তির অতীত। জীব সীমাবদ্ধ—সীমা থেকেই তার অসীমের পানে যাত্রা। সীমিত আধারেই জীবের অসীমের সঙ্গে মিলন। মিলনের পরই বিরহ। বিরহের পর আবার মিলন। আবার বিরহ, আবার মিলন...। এইরূপ মিলন বিরহ পুনর্মিলনের অনন্ত লীলার মধ্য দিয়াই সংঘটিত হয়ে চলে ক্রমপ্রসারমান্ অনন্ত রসের উল্লাস ও আস্বাদন। বিরহ মানেই দুঃখ। পূর্বেই বলেছি, দুঃখ এখানে রসের প্রতিকূল নয়, রসের অবস্থান্তর। দুঃখ জীবের শক্তির আধারকে প্রসারিত করে দেয় আরও রসের উল্লাসকে ধারণ করবার জন্য। বৈষ্ণবধর্মে প্রথমে পূর্বরাগ, তারপর মিলন, তারপর বিরহ, বিরহের পর পুনর্মিলন। ভক্তের প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি রতি বা আসক্তি জন্মায়, রতি গাঢ় হইলে ভাব, ভাবের গাঢ়তায় প্রেমৈক-রস। মান, প্রণয, স্নেহ প্রভৃতির পর্যায়ক্রমে রসের বিচিত্র স্বাদ। ভগবানের প্রতি জীবের রতি প্রেমে পরিণত হলে ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়। এরূপ মিলনানন্দের পর বিরহ। প্রথম মিলনে যে রসের আস্বাদ, সে রস রসরাজ কৃষ্ণের অনন্ত রসের সমধর্মী, কিন্তু পরিমাণে অল্প। বিরহে মিলনের উৎকণ্ঠা। বিরহে আনন্দ-রসেরই তীব্র অনুভব। ইহা দুঃখ-বেদনার তীব্র অভিঘাতে অশ্রুজলে বিধৌত হয়ে এক অনির্বচনীয় প্রশান্ত গভীর আনন্দের অনুভব করায়। আনন্দ অন্তরস্থ বেদনার রসে অভিষিক্ত হয়ে আরও উজ্জ্বল, মধুর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মিলনের মধ্যে এই গভীরতা প্রশান্ততা নেই। তাই মিলনের পর বিরহ এসে পুনর্মিলনের রসোল্লাসকে আরও ব্যাপক ও দ্বিগুণ ভাবে আস্বাদন করবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে। গৃহ-প্রত্যাগত প্রবাসীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলনের দ্বিগুণিত আনন্দের ন্যায় বিরহ মিলন পর্যায়ক্রমে এসে জীবের অনন্ত রসকে ধারণ ও আস্বাদন করবার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। তাই নিত্য ব্রজধামে প্রেমসিদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসের পূর্ণ আস্বাদনের জন্য বিরহ ব্রজলীলার অপরিহার্য্য অঙ্গ। অণু-চৈতন্য বিরহ-বেদনার অভিসিঞ্চনে ক্রমোন্নত হয়ে বিভু-চৈতন্যের অনন্ত রসের ধারক ও গ্রাহক হয়। প্রেমসিদ্ধ জীবের অনন্ত রসোল্লাসের আস্বাদনের মাত্রা কিরূপে বর্দ্ধিত হয় বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যাক্। ধরা যাক্, অনন্ত রস হল একটি বৃত্ত। বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ। ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী। প্রতিটি কোণ ৬০ ডিগ্রী। বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজটি চতুর্ভুজ করা হলে কোণের ডিগ্রী বর্দ্ধিত হয়। পঞ্চভুজ করা হলে কোণের ডিগ্রী আরও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে ভুজের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে কোণের ডিগ্রীরও বৃদ্ধি। কিন্তু ভুজের

যতই সংখ্যা বাড়ুক কোন ভুজের কোণ কখন ১৮০ ডিগ্রীতে পৌঁছাবে না। সেইরূপ ভুজের ন্যায় বিরহের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে ভক্ত ও ভগবানের মিলনজাত রসোল্লাসের মাত্রাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে, তথাপি ভক্ত রসের সীমা খুঁজে পাবে না। কারণ, সচ্চিদানন্দময়ের আনন্দ তো সমুদ্রের ন্যায় অসীম, অনন্ত। এই অনন্ত আনন্দসমুদ্রে শক্তির লীলায় যে উল্লাস ওঠে, তাহাই রস। অতএব রস অনন্ত, তার আস্বাদনের ক্রমও অনন্ত। বৈষ্ণবদের কুঞ্জলীলার তাৎপর্য এখানে। রস এক হলেও রসের আস্বাদন অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৈষ্ণবধর্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য ভেদে রসের পঞ্চ বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের রসের আস্বাদনও অনন্ত প্রকার। কৃষ্ণের সঙ্গে সুবলের যে সখ্যরসের লীলা, তার প্রকৃতি ও ধর্মের সহিত সুদামার সখ্য-রস আস্বাদনের প্রকৃতি ও ভাবধারা অন্য। একরূপ বিভিন্ন সখার সখ্যরস বিচিত্র ও অনন্ত। বিভিন্ন সখীর রসের ধারাও বিভিন্ন প্রকার ও অনন্ত। বাৎসল্য রসের প্রকৃতিও বৈচিত্র্যময়। দাস্য রসের তো কথাই নেই। রস এক, প্রকাশ বিভিন্ন রকম, আস্বাদনও অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ আদিতে এক অদ্বয় ব্রহ্মের নির্বিশেষ অবস্থান। নির্বিশেষের মধ্যে জাগল 'অস্তি'—আমি আছি জ্ঞান, তখন তিনি হলেন 'একং সৎ'। এই একং সৎ ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব। এই ইচ্ছাই হল শক্তি—ইচ্ছাময়ী শক্তি, শাক্তে যাঁকে বলা হয় 'ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'। বৈষ্ণবধর্মে ইনিই যোগমায়া। ব্রজভূমে যোগমায়ার ইচ্ছায় সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়। ইচ্ছার উদয়ে ক্রিয়ার আরম্ভ। মায়ার মধ্যে ক্রিয়ার কার্যে যে-পরিণাম সংঘটিত হয় তাহা নাম-রূপাত্মক জড় জগতের উদ্ভব করে। শক্তিতত্ত্বে ব্রহ্ম-শক্তির দুই রূপ—এক শুদ্ধ মায়া, অপরটি অশুদ্ধ মায়া। শুদ্ধ মায়া হলেন মহামায়া, অশুদ্ধ মায়া হলেন অবিদ্যা। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি মায়ার মধ্যে ক্রিয়া করায় ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। আদিতে এক ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই ছিল না। অতএব ব্রহ্ম মায়াধীশ হয়েও স্বেচ্ছায় মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে নিজেকে সংকোচ করলেন এবং তাঁর থেকেই মায়ার দ্বারা স্বরূপ আবৃত নামরূপাত্মক দেশ ও কালাবচ্ছিন্ন জীব ও জড় জগতের উৎপত্তি। অতএব ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান দুই-ই। বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জীবও স্বরূপে ব্রহ্ম। মায়োপহত জীব নিজের স্বরূপ হতে ভ্রষ্ট। জগৎ-সংসার মিথ্যা। ইহা মরুভূমিতে মরিচিকার ন্যায়, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্ত জীবের মানসিক বিকার মাত্র। অবিদ্যার আবরণে জীবের বিকল্পাত্মক মনে জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত মনই জগদাকারে ভাসমান। মন থেকে যখন অবিদ্যার আবরণ খসে যাবে, জীব যখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ ফিরে পাবে, তখনই

তার ভ্রান্তি ঘুচে গিয়ে সত্য জ্ঞানের উদয় হবে। প্রকৃত জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতির্ময় প্রকাশে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হবে। বেদান্তের পথ জ্ঞানের পথ। একমাত্র প্রজ্ঞা বা বুদ্ধত্বের উপর উহার লক্ষ্য নিবদ্ধ। এখানে মায়া বা অবিদ্যা বিদ্যা বা জ্ঞানের অন্ধকারময় দিক।

বৈষ্ণবধর্মে স্বয়ং ভগবানের তিনটি শক্তির কথা স্বীকৃত। অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তি হল স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের চিৎ-শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি হল মায়া যার রূপায়ন হল বিশ্বজগৎ। আর জীব হল তটস্থা শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির তটদেশে অবস্থিত। বৈষ্ণব মতে তটস্থ জীবই হল অণু-চৈতন্য, ভগবান হলেন বিভু-চৈতন্য। স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্ম এক, কিন্তু অণু-বিধায় জীব ভগবানের নিত্য দাস। অসীম ব্রহ্মের মধ্যে এক হয়ে গিয়ে ব্রহ্ম-স্বরূপে স্থিত হয়ে আমিই ব্রহ্ম হবার আকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবদের নাই। জীব স্বরূপ-ধর্মে ভগবানের সহিত এক হলেও সে নিত্য স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে ভগবানের সহিত মিলনে নিজের আধারে অনন্ত রসের আস্বাদনের অভিলাষী। স্বরূপে জীব ভগবানের সহিত অভেদ হলেও বহির্মুখী শক্তির প্রভাবে পড়ে, অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। আবার জীব ইচ্ছা করলে বহির্শক্তির প্রভাব কাটিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিত্য সিদ্ধ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অবরোহের ক্রম ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, পরমব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তিই মায়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল হলে ব্রহ্ম নিজেই স্বেচ্ছায় স্বরূপ সঙ্কুচিত করে মায়াশ্রিত হয়। মায়াই হল সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণবিশিষ্ট প্রকৃতি। প্রকৃতির সাম্য অবস্থায় মায়া নিষ্ক্রিয়। ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মায়া যখন বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বৈষম্য ঘটে। বৈষম্য বা স্পন্দন হেতু জীবাঙ্কুরের উদ্ভিন্ন অবস্থা। জীবের জন্মমুহূর্ত্ত দেশ ও কালের কবলিত এবং মায়ার দ্বারা উপহত উপাধিবিশিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে কারণ-শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর এবং সর্বশেষে পঞ্চভূতে গঠিত স্থূল শরীর। জড় জগৎও পঞ্চভূতাত্মক। জড়ের ধর্ম অনুসারে স্থূলশরীরবিশিষ্ট জীব ও জগৎ এক অর্থাৎ একই ধর্মী। স্থূল জগতের আবেদন স্থূল ইন্দ্রিয়ের নিকট। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে শরীরী জীবের সহিত জগতের গ্রাহ্য-গ্রাহক ভোগ্য-ভোগ্যার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মনকে বলা হয় একাদশ ইন্দ্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সে রাজা। মনেই ভোগাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক এক। দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিত হয়ে জাগতিক রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি মনই ভোগ করে। অতএব অবিদ্যাবশতঃ মনই জগতাকারে ভাসমান। ইন্দ্রিয়ের সবগুলি দ্বার রুদ্ধ হলে মনের বহির্মুখী ভাব থাকে না। মনের বহির্মুখী বিক্ষিপ্ত গতি সংহৃত হলে জীবের নিকট স্থূল জগতের অস্তিত্ব থাকে না।

আবার যতক্ষণ মন বহির্মুখী থাকে, ততক্ষণ আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমিই কর্তা, আমিই ভোক্তা এরূপ অহংকার জন্মাইয়া ভেদ জ্ঞানের উদ্রেক করে। বস্তুতঃ ভ্রান্তি বশতঃই জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে স্থূল শরীরে অহং-জ্ঞান আরোপ করে এবং তার মধ্যে ভেদ জ্ঞানের সঞ্চার হয়। স্বরূপতঃ আমি রূপ যে আত্মা, সে জীবশরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করেও নির্লিপ্ত। অহং-অভিমানী জীবের বহির্মুখী ক্রিয়া-কলাপের সে সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। আত্মা স্বরূপে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের চিন্ময় অংশ। ব্রহ্ম সর্বভূতাত্মক। স্বরূপ-ধর্মে ব্রহ্ম ও আত্মা এক। অবিদ্যার আবরণে জীবের আত্ম-জ্ঞান লুপ্ত। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচিত হয়ে একবার চিৎ-সত্তার প্রকাশ হলেই জীবের ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হবে। সর্বত্র একই আত্মার অবস্থান দেখতে পাবে। অর্থাৎ নিজেকেই সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে অবস্থিত—এই সত্যের উপলব্ধি ঘটবে—একই অদ্বয় তত্ত্বের সন্ধান পাবে।

ব্রহ্ম থেকে জীব পর্যন্ত অবরোহ ক্রম ধরেই জীবকে আবার ঊর্ধ্ব স্বরূপের দিকে আরোহণ করতে হবে। আরোহণের ক্রম সুরু হবে মনকে অবলম্বন করে। মন, চিত্ত প্রভৃতি জীবের সূক্ষ্ম শরীর। চিত্তের যখন তামসিক, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা, তখন মন বহির্মুখী, চিত্ত যখন একাগ্র ভূমিতে আরূঢ় হয়, তখন একাগ্র বৃত্তিবশতঃ মন অন্তর্মুখী হয়। অন্তরাবিষ্ট মনোভূমিতে একাগ্র চিত্ত যখন নিজ লক্ষ্যে স্থিরবদ্ধ, তখন জীবের সত্য দৃষ্টি খুলে যায়। সে নিজেকে দেখতে পায়, অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে চিনতে পারে। বৃত্তির একাগ্র ভূমিতে তন্ময় হয়ে জ্ঞানযোগী ব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থেকে অগ্রসর হতে থাকলে চিৎ-সত্তার প্রকাশ হয়। জীবের চিৎ-সত্তা খুলে গেলেই জীব চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সৎ ও চিৎরূপ নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব চিন্ময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেই সমস্ত বৈষম্যের খণ্ডতার ও অশান্তির অবসান ঘটে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অতীত পরম সাম্য অবস্থায় এক অনির্বচনীয় পরমা শান্তির অনুভব হয়। চিন্ময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠাই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধত্ব লাভ। চিন্ময় স্বরূপে যে-লোকে জীবের উত্তরণ, সে-লোক পরম ব্যোম যা এক মহাশূন্যতায় পরিব্যাপ্ত। এই লোকে উত্তীর্ণ হয়ে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু 'স্বভাব' লাভ হয় না। পরমব্যোম থেকে যাত্রা করে যখন ব্রহ্মলোকে গিয়ে পৌঁছায়, তখন অদ্বয় ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়—যে ব্রহ্ম সৎও নয়, অসৎও নয়, সদাসতের অতীত এক পরম চিৎপ্রকাশ যাঁর স্বভাব হল অনন্ত আনন্দ। এরূপ পরিনির্বাণ স্থিতিতে জীবের যে অসীম ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয় তাহাই তাহার স্বভাব; কারণ, চিন্ময় আনন্দই জীবের স্বভাব। অসীমের মধ্যে মিশে গিয়ে অসীম হয়ে পরমানন্দের যে উপলব্ধি,

সেখানে আনন্দের উপলব্ধি রইল বটে, কিন্তু স্ব-শক্তির আধারে তার আস্বাদ নেই। কারণ আস্বাদনের ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে সুপ্ত।

আত্মায অনাত্মবোধ হতে জীবের স্বরূপ-চ্যুতি, আত্মায় আত্মবোধ হতে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। শাক্তমতে আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত করে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে বর্হিমুখী চেতনাকে পাঞ্চভৌতিক জগৎ থেকে গুটিয়ে এনে মনোময় লোকে অন্তর্মুখী করে স্থিত হওয়া আধ্যাত্মিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। শাক্তধর্মে চেতন-শক্তি সদা জাগরুক। মানসলোকে চেতনাকে কেন্দ্রিভূত ও সদা জাগ্রত রেখে সাধনার দ্বারা চেতন-শক্তিকে উর্ধ্বে চালিত করতে হয়। এইরূপ ভাবে সাধনার দ্বারা যে-মায়াশক্তির দ্বারা সে আচ্ছাদিত ছিল, নিজ সাধন শক্তির বলে সেই মায়াকে কবলিত করে আরও উর্ধ্বলোকে যাত্রা করে জীব চিন্ময়ধামে পৌঁছিয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তার চিৎ-শক্তি আপনা হতে খুলে যায় এবং ব্রহ্ম-শক্তির সহিত এক হয়ে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়—ইহাই হল শিব-শক্তির মিলন ও সামরস্য। এরূপ সমরস জনিত যে অমৃত ক্ষরিত হয় তাহা পান করে জীব আনন্দময় অমৃতময় হয়ে যায়।

বৈষ্ণরধর্মেও ব্রজলোকের নিত্য লীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য জীবের প্রচেষ্টা হল আত্মায় আত্মবোধ জাগ্রত করে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হয়ে বিক্ষিপ্ত বহির্মুখী চিত্তকে একাগ্রভূমিতে অন্তর্মুখী করা। বেদান্তের ধর্মও যোগ সাধনা, শাক্ত বা শৈবধর্মও যোগ সাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মও যোগ সাধনা। সব সাধনাই যোগ সাধনা; তবে দৃষ্টির পার্থক্য হেতু সাধন পথেরও তারতম্য ঘটেছে। বৈষ্ণবধর্মে শুধু বৃত্তির একাগ্রতা হলেই চলবে না, প্রকৃত জ্ঞানীভক্ত হতে হলে একাগ্র বৃত্তির সহিত একাগ্র 'ভূমি'র যোগ হওয়া চাই। একাগ্র ভূমি হল 'স্থায়ী ভাব'। বৈষ্ণব সাধক একাগ্র চিত্তে তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ও বৃন্দাবন লীলার অনুধ্যান করবে। মানসলোকে ভাবের ভাবী হয়ে বৃন্দাবন লীলার যে সম্ভোগ—ইহাই মানস-বৃন্দাবন। এখানে সাধকের সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত। অতএব মানসলোকে সাধকের চেতনার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তিরও স্ফুরণ হয়। সাধনায় অগ্রসর হতে হতে সাধক চিন্ময় শরীরে রূপান্তবিত হয়। তার চিৎ সত্তা খুলে যায়। এরূপ অবস্থায় সে যেখানে এসে উপস্থিত হয় তাহা পরমব্যোম লোক। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই পরমব্যোমই গোলোক। এখানে সকল বৈষম্যের অবসান। চাওয়া ও পাওয়ার অতীত এক পরম শান্তির মধ্যে স্থিতি। এখানে সাধকের সমস্ত ইচ্ছার সমাপ্তি; আছে শুধু ইষ্ট দেবতার প্রতি পরম নির্ভরতা। এখান থেকে বেরুবার পথও সে জানে না। মাকে পাবার জন্য অসহায় শিশুর ন্যায় কেবল আকুল ক্রন্দন। এখানে আকুল ক্রন্দনই সাধনা। ভাবের পথের পথিকের এখান থেকেই প্রকৃত সাধনার সুরু। বিরহজাত ক্রন্দনের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি

পাবে ইষ্টদেবতার করুণার ধারা ততই তার উপর ঝরে পড়বে। বিরহের ব্যথা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করবে, তখনই সে শুনতে পাবে সুমধুর বংশীর ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি। এই ধ্বনিই হল 'ওঁ'-কার। জীবের মধ্যে প্রণবের সুর সর্বদাই ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু অবিদ্যার ভ্রান্তি বশতঃ চিত্ত অশুদ্ধ থাকায় জীব সে সুর শুনতে পায় না বা শুনতে চায় না। জীবের মধ্যে চিৎ-সত্তার যখন বিকাশ হয়, সে সুর তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অনন্ত রস-স্বরূপের সহিত মিলিত হবার দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। সাধক চিন্ময় অবস্থায় ভাবদেহে সেই শব্দকে ধরেই গোলোক থেকে ব্রজলোকে উপস্থিত হয়। ভক্ত সাধক ব্রজলোকে নিত্য সিদ্ধ দেহ লাভ করে ব্রজের নিত্য লীলায় যোগ দিয়ে রসের পুষ্টির সহায়তা করে। ব্রজলোকে নিত্য সিদ্ধ দেহ-প্রাপ্ত ভক্ত রসিকের নিজের কোন ইচ্ছা নেই, যোগমায়ার ইচ্ছায় তার ইচ্ছার উদয় হয়। সে ইচ্ছা প্রধাবিত হয় কৃষ্ণের সেবায়, তাঁর সুখ উৎপাদনে। সখীদের অনুগামী হয়ে আত্মোৎসর্গীকৃত সেবায় শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করে। ভগবানের নিত্য দাস থেকে নিজ স্বভাববৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত থেকে অনন্ত রসের আস্বাদন করে।

এখন প্রশ্ন হল রস কি? বাস্তব জগতে দেখতে পাই, রামসীতার অভিনয় দেখে সীতার দুঃখে বিগলিত হয়ে দর্শকবৃন্দকে অশ্রু বিসর্জন করতে। দর্শক সীতা নয়, যে অভিনয় করে সেও সীতা নয়। তথাপি অভিনেতা সীতার চরিত্রে এমনভাবে মিশে যায় যে তার অভিনয় দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করে। সহৃদয়ধর্মী দর্শক সীতার দুঃখে এত অভিভুত হয়ে পড়ে যে সেটা নিজেরই দুঃখ বলে মনে হয় এবং দুঃখবোধের ব্যথায় অশ্রু ঝরে পড়ে। এই অশ্রুর মধ্যে যে করুণ রসের আস্বাদ, সেই রসানুভূতিকে বলা হয় 'ব্রহ্মানন্দ সহোদরা'। ব্রজলোকে অভিনয় করে কে? অভিনয় করে প্রকৃতি। কাকে নিয়ে অভিনয় করে? পুরুষকে নিয়ে। যোগমায়া ব্রজলোকে এই অভিনয়ের ক্ষেত্র রচনা করে। যোগমায়ার মায়ায় নিত্য ব্রজলোকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তিরূপা মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে মিলন-বিরহের অভিনয় করে, নিত্য ও সিদ্ধ ভক্ত জীব সেই লীলার দ্রষ্টা হয়ে সহৃদয়ের সহিত কখন মিলনানন্দ কখন বা বিরহানল পর্যায়ক্রমে অনুভব করে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ রস আস্বাদন করে। ব্রজলোক বলতে জীবনের পরপারে কোন এক লোক নয়, এই জীবনেই সাধনার দ্বারা জীবের উত্তরণের ফলে অধ্যাত্মলোকে একটা বিশেষ স্থিতি।

সব ধর্মেই আমরা দেখতে পাই, জীবনের তিনটি স্তর। প্রথম পাঞ্চভৌতিক জড় জগৎ-এর স্তর। দ্বিতীয় মনোলোকের স্তর। তৃতীয় চিন্ময়লোকের স্তর।

চিন্ময় লোকের স্তর থেকেই সাধনার প্রকৃত আরম্ভ হয় এবং এখান থেকেই সাধনভেদে পূর্ণতার দিকে অগ্রগতির ভিন্নতা সাধিত হয়। পথ ভিন্ন হলেও যে যার সাধনার পূর্ণতাব লক্ষ্য হল এক এবং তার তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও সত্য।

রাসতত্ত্ব ও লীলাপুষ্টি—পরমপুরুষ চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি চিৎ ও আনন্দ—অখণ্ড প্রকাশ ও রসবস্তু -চিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিত। নিরাকার ও সাকার তাঁহার স্বরূপ—উভয় আকারের বা স্বরূপের পর্যাযক্রমে আবর্ত্তন। আত্মজ্ঞানেই সম্বিদের স্ফুর্ত্তি। সম্বিদের পূর্ণ পূর্ত্তিই আনন্দ। আনন্দের স্ফুরণ প্রেমে। প্রেম বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অতএব আনন্দের আস্বাদও নানা ও বৈচিত্র্যময। আনন্দের সমূহ বা একত্র সমাবেশই হ্লাদিনী শক্তি। বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধাই হ্লাদিনী শক্তি সর্বোত্তম প্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপিনী। পরমপুরুষ রসস্বরূপ—"রসঃ বৈ সঃ"। "রসাণাং সমূহ রাসঃ"। রস-লীলার সমূহই 'রাস'। বৈষ্ণবধর্মমতে লীলা দুই প্রকার—অষ্টকালীন কুঞ্জ লীলা ও নিকুঞ্জ লীলা। লীলার আরম্ভ হইতে অষ্টপ্রহর লীলার পর বিশ্রামকালকে বলা হয় নিকুঞ্জ। কুঞ্জলীলার নিকুঞ্জে বিশ্রাম, কিন্তু নিকুঞ্জেও একপ্রকার লীলা চলে, তাহাকে বলা হয় নিকুঞ্জলীলা। নিকুঞ্জলীলার ভঙ্গের পর আবার কুঞ্জলীলার সুরু। কুঞ্জলীলার পুনরায় নিকুঞ্জলীলার মধ্যে বিরাম। এইরূপ পর্যায়ক্রমে চলে কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ লীলায় অবিশ্রাম প্রবহমান ক্রমবর্দ্ধমান রসের ধারা।

পরমপুরুষ যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থায় অর্থাৎ এক ও অদ্বয় অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি একাকী রমণ করিতে পারিতেন না। রস আপেক্ষিক বস্তু। সুতরাং রস আস্বাদন করিতে দুই-এর প্রয়োজন। তিনি রসস্বরূপ ঠিকই। কিন্তু "একাকী নৈব রেমে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ"। তিনি আনন্দময়। আনন্দ তাঁহার স্বরূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনীশক্তির পরাকাষ্ঠা হইলেন শ্রীরাধা। অতএব হ্লাদিনী-স্বরূপিণী শ্রীবাধা তাঁহার স্বরূপ শক্তি। সুতরাং স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাকেই কেন্দ্র করিয়া রস-স্বরূপের অষ্টকালীন কুঞ্জ লীলা—রসের উচ্ছলন ও আস্বাদন। অষ্টকালীন লীলা করিতে করিতে ভাবের পরিপাক হেতু স্বরূপশক্তিরূপিণী শ্রীবাধা যখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া রসস্বরূপ পরমপুরুষের মধ্যে লীন হইয়া যান, তখন শ্রীরাধা তো থাকেনই না পরন্তু স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে পুরুষ লীলা করিতেছিলেন তিনিও নিরালম্ব হইয়া শূন্য হইয়া যান। শ্রীরাধার মধ্যে যখন কিঞ্চিৎ মাত্র অংশ অর্থাৎ সপ্তদশ কলার নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। অমাকলায় অর্থাৎ শ্রীরাধার শূন্যতায় তিনিও শূন্য হইয়া যান। অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ মিলনে

শক্তিও থাকেন না, শক্তিমানও থাকেন না; উভয়ের মিলনে একৈক রসে পর্যবসিত হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ মিলনে অর্থাৎ সামরস্যে এই যে এক রসে পরিণতি, এখানেও এক প্রকার রসের লীলা চলিতে থাকে। এ লীলার রূপ কি এবং তজ্জাত মাধুর্যের আস্বাদনই বা কিরূপ তাহা অবর্ণনীয় অর্থাৎ অরূপ প্রেমের লীলা 'ভাষার অতীত তীরে'। এ লীলাকে বৈষ্ণবেরা নাম দিয়াছেন নিকুঞ্জলীলা। নিকুঞ্জলীলায় আবার বিরহের উদয় হয়, পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার অভাব অনুভূত হয়। অভাব-উপলব্ধি হেতুই অনুসন্ধান-স্পৃহা জাগে—নিকুঞ্জলীলাকে ভঙ্গ করে আবার অষ্টকালীন কুঞ্জলীলার অবতারণা হয়। আবার ভাবের পরিপাকে নিকুঞ্জলীলা। আবার পরিপূর্ণতার অভাববোধ। অভাবজাত অনুসন্ধান স্পৃহায় নিকুঞ্জলীলা হইতে ব্যুত্থান। এইরূপে কুঞ্জলীলা ও নিকুঞ্জলীলার পালাক্রমে আবর্ত্তন। এই আবর্ত্তনজাত রসসমূহের সমষ্টিই 'রাস'।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিবারেই কি কুঞ্জলীলার একই অভিনয় হইতে থাকে? যদি হয়, তাহা হইলে তো পুনরাবৃত্তি হেতু রসাভাস ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে? না, তাহা হয় না। অভিনয় নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে সত্য এবং নিত্যকাল ধরিয়া চলিবে ইহাও সত্য কিন্তু কোন কালে কোনও সময়ে এক তিল রসাভাস ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই কারণ, রস যে অনন্ত—উহার অন্ত নাই। বরঞ্চ উহাতে রসের ক্রম পুষ্টতাই সাধিত হয়। কিন্তু কিরূপে? একটি উদাহরণের সাহায্যে এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করা যাক। প্রকৃতিতে দেখিতে পাই পর্যায়ক্রমে ঋতুর বদল হইতেছে। একই ঋতু প্রতি বৎসর একই সময়ে আসিয়া উহার কার্য করিয়া চলিয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রম হয় না। একই বৃক্ষ শীতকালে পত্রহীন হইয়া যায়, আবার বসন্তের আগমনে নব পল্লবে ভূষিত হয়—ইহার কোন পরিবর্তন হয়না। কিন্তু এই অপরিবর্তনের অন্তরালেই বৎসরান্তরক্রমে বৃক্ষটির পরমায়ু পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সেইরূপ পর্যায়ক্রমে কুঞ্জলীলার অভিনয় চলে বটে, কিন্তু প্রতি লীলায় রসের গভীরতা ও পুষ্টতা বৃদ্ধি হয়। কারণ, অসীমকে পরিপূর্ণ রূপে না পাওয়ার অভাব এবং তজ্জাত যে বিরহ, প্রতিবারে এই বিরহই আধারকে তৈরি করে অনন্ত প্রেমস্বরূপের অনন্ত প্রেমকে ক্রমশঃ গভীরতর রূপে পাইবার জন্য। এই রসিকচূড়ামণি প্রেমিক পুরুষটির স্বরূপ যেমন অনন্ত, অসীম, পারাবারহীন তেমনি তাঁহার প্রেমও অপার, তার কোন হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই শ্রীরাধার মধ্যে কৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার অভাব-বোধেই 'বিরহ' জাগিয়া উঠে। বিরহে তাঁহার আধার আরও গভীরভাবে রসস্বরূপের রসাস্বাদনের জন্য প্রসারিত হয়, তথাপি কোনদিন উহার কিনারা পায় না—'লাখ লাখ যুগ

হিয়ে হিয়ে রাখিনু, তবু হিয়ে জুড়োন না গেল'। শ্রীরাধিকা যদি পরমপুরুষের প্রেমের কোন ঠিকানা করিতে পারিত, যদি বলিতে পারিত—এই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছি, তবে তো তিনি সসীম হইয়া যাইতেন, সীমার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন, গুণ-বিশেষে জড়িত হইয়া সগুণ পুরুষই থাকিতেন। তাঁর স্বরূপ তো শুধু সগুণ নয়, নির্গুণও বটে। তাঁর সগুণাত্মক রূপ আমাদের বোধের মধ্যে আসে বলিয়াই তিনি সগুণ হইয়াছেন। সগুণ হইয়াছেন বলিয়াই গুণের মধ্যে তাঁব স্বরূপের পরিণাম নয়, গুণাতীত আর একটা অরূপও তাঁর একই সময়ে বিরাজমান থাকে। তিনি সসীম হইয়াছেন, সগুণ হইযাছেন আমাদের জন্য। সসীমের মধ্য দিয়াই আমাদের বোদ্ধাকে তিনি অসীমের দিকে চালিত করিবেন বলিয়াই। তাই সেই পরমপুরুষ পর্যায়ক্রমে মিলন-বিরহের যুগ্ম ক্রিয়ার দ্বারাই শ্রীরাধাকে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রেমের গভীরতম প্রদেশে আকর্ষণ করিয়া আনেন; কিন্তু লৌকিক জগতের বৃক্ষের পরমায়ুর মত সে অমর প্রেমের কোন পরিণতি নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

রাগানুগা তত্ত্ব—শক্তি বহু। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। শক্তি শক্তিমানের আশ্রিত অর্থাৎ কৃষ্ণের আশ্রিত। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইল অন্তরঙ্গা শক্তি; মায়া হইল তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীব হইল তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তি কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, অতএব অভেদ সম্বন্ধ। অন্তরঙ্গা শক্তি তাঁহার সহিত অবিনাভাবে যুক্ত। বহিরঙ্গা শক্তি যদিও কৃষ্ণেরই শক্তি এবং তাঁহারই আশ্রিত, তথাপি ঐ শক্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন, অতএব ভেদ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্য আলোর রাজ্য। তাঁহার বহিরঙ্গা বা মায়ার রাজ্য অন্ধকারের রাজ্য। এই আলো এবং আঁধারের সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ উভয়ের তটদেশে জীব অবস্থান করে। সুতরাং জীব ভগবানের সহিত ভেদাভেদ রূপে যুক্ত। জীবকে ভগবান্ স্বাধীনতা দিয়াছেন। জীব ইচ্ছা করিলে ভগবৎ-মুখীও হইতে পারে, আবার ইচ্ছা হইলে মায়াভিমুখীও হইতে পারে। জীব ভগবৎ-মুখী হইলে তাহার ভগবৎ-ধামে প্রবেশে কোন বাধা নাই। কয়েকটি জীব তটস্থ অবস্থায় ভগবৎ-মুখীই থাকে। তাহাদের 'নিত্য জীব' বলা হয় এবং তাহারা ভগবৎ-ধামে যে যার যোগ্যতা অনুসারে স্থান পাইয়া থাকে। আবার জীব মায়ামুখী হইলে মায়ার রাজ্যে প্রবেশেও ভগবান কোন বাধা দেন না। বলা বাহুল্য অধিকাংশ জীবই মায়ামুখী। মায়ার অন্ধকারময় রাজ্যে নানা বৈচিত্র্যময় রঙ্গিন রং-এর খেলা। মায়ার প্রলুব্ধকারী

রঙ্গের খেলার প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া জীব মুগ্ধ হয় এবং উহার আকর্ষণ শক্তির পরিধির মধ্যে পড়িয়া নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জীবের স্বভাব হইতে এই আত্মকৃত স্খলনের জন্য কিন্তু মায়া দোষী নয়। মায়াশক্তির স্বভাবধর্ম অনুযায়ী উহার রাজ্যে নানা লোভ, কামনা, প্রবৃত্তি প্রভৃতিব লীলা চলিতেছে। জীব কেন উহার প্রতি প্রলুব্ধ হইবে?

অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি উভযেই শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি এবং উভয়েই শক্তিমানেরই অধীন। তথাপি উভয় শক্তির মর্যাদা সমান নয়। বহিরঙ্গা শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তিরও অধীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পাটরানী ও চাকরানী। উভয়েই রানী এবং উভয়েই রাজার অধীন। তথাপি মর্যাদায় এক নহে। পাটরানীর রাজার সমীপে যাইবার এবং একাসনে বসিবারও ক্ষমতা এবং অধিকার আছে। পাটরানী রাজার অন্তরঙ্গা। কিন্তু চাকরানীর কাজ বাহিরেব কাজ। রাজার নিকটে যাইবার তার কোন অধিকার নাই।

স্বরূপশক্তি আবার গুণানুযাযী তিন প্রকার। সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তিব পূর্ণতা মহাভাবে। মহাভাব-স্বরূপিনী হইলেন শ্রীরাধা।

ব্রজধামে পরিকর সমভিব্যাহারে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলা চলিতেছে। কৃষ্ণ নিত্য, রাধা নিত্য, সুবল-সুদাম প্রভৃতি সখাগণ নিত্য, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ নিত্য, নন্দ-যশোদা নিত্য, ধেনু নিত্য, জীবজন্তু গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, যমুনা, কদম্ব বৃক্ষ, গোবর্দ্ধন পর্বত অর্থাৎ ব্রজধামের যাবতীয় প্রাণী এবং বস্তু নিত্য। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিত্য। বৈষ্ণবদের মতে এ লীলা অষ্টকালীন কুঞ্জলীলা। নিকুঞ্জ ভঙ্গ হইতে লীলার আরম্ভ হয। প্রভাত, সকাল, দ্বিপ্রহর, বৈকালীন, সন্ধ্যাকালীন ও রাত্রিকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ও বৈচিত্র্যে লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া মহানিশায় ভগবান নিদ্রামগ্ন হন। ভগবানের নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেও এক পর্যায়ের লীলা চলিতেছে—ইহা নিকুঞ্জ লীলা। লীলার বিরাম নাই। নিকুঞ্জলীলা ভঙ্গ হইতে আবার কুঞ্জলীলার আরম্ভ হয়। কিন্তু বিগত কালের লীলার পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রতিদিন লীলার নিত্য নব রূপ—'নিতুই নব'। নিত্য নূতন লীলার নিত্য নূতন বৈচিত্র্যময় আস্বাদ। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবৃন্দ নিত্য লীলায় স্ব স্ব কর্মে লিপ্ত থাকিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়া লীলারস আস্বাদন করে। প্রত্যেক পরিকরের নির্দিষ্ট কর্ম—তাহা যে প্রকারেই হউক না কেন—রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্যের পুষ্টি সম্পাদনে সমান মূল্য বহন করে। রাধা কৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করিলেও কখন কৃষ্ণ হইয়া যাইতে চাহে না। নিজ স্বভাবে থাকিয়া রস আস্বাদন করিতে চায়। সেইরূপ সখিগণ কখন রাধা হইতে চাহে না। নিজ নিজ স্বভাবে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ম দ্বারা

লীলা-রস বৃদ্ধির সহায়তা করে। যদি কোন সখী মহাভাবে আরূঢ় হয়, তবে সে শ্রীরাধার মধ্যে থেকেই মহাভাবজাত আনন্দরস পান করে, তথাপি নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধায় পর্যবসিত হয় না। চিন্ময় গোলোকধামে শ্রীরাধা হইতে মঞ্জরী পর্যন্ত সর্ব পরিকরের ঐরূপ রাগমার্গের সাধনাকে 'রাগাত্মিকা' সাধনা বলে।

ব্রজধাম ও জীবজগতের সংযোগ সেতু হইল মঞ্জরী। মঞ্জরীর অনুগা হইয়া জীব ব্রজধামে প্রবেশ করে। মঞ্জবীর সহায়তা ভিন্ন জীব কখন ব্রজে প্রবেশ করিতে পারে না। মঞ্জরীর অনুগা হইয়া জীবের রাগমার্গের সাধনাকে 'রাগানুগা' বলা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে রাগাত্মিকা সাধনা একমাত্র ব্রজেই সম্ভব; জীবের মধ্যে রাগাত্মিকা সাধনা কখনই হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইল, ভগবান লীলা করেন কেন? কিসের জন্য লীলার অবতারণা? ভগবান তো আনন্দময়, তাঁর তো কোন প্রয়োজন ছিল না? তিনি লীলা করেন জীবের আস্বাদনের জন্য। কিন্তু ব্রজে প্রবেশের এবং আনন্দ আস্বাদনের অধিকার কার? না, প্রেমসিদ্ধ জীবের। প্রেমসিদ্ধ হইয়া এই শরীরে জীবিত থাকিতেই ব্রজে প্রবেশ করিতে হইবে, মৃত্যুর পরে নয়। কিন্তু কামে উৎপন্ন পঞ্চভূতে গঠিত এই অশুদ্ধ শরীর লইয়া সেখানে যাইতে পারা যায় না। লক্ষ-কোটি জন্মের বিবর্তনের পরেও যাওয়া যায় না। অথচ একটি জন্মকালের মধ্যেই এই মর্ত্ত শরীরে থাকিযাই জীব সেখানে প্রবেশ করিতে ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। সেখানে প্রবেশাধিকার পাইতে হইলে কলুষিত তমোময় শরীরকে চিন্ময়ত্বে পরিণত করিয়া ভাব-শরীর লাভ করিতে হইবে। চিন্ময় শরীর লাভ করিবার প্রথম ধাপ হইল গুরু-দীক্ষা। গুরু যে মন্ত্রদীক্ষা দেন, সেই মন্ত্র বা নাম জপের দ্বারা শরীর ক্রমশঃ বাসনা-কামনাশূন্য কলুষরহিত হইয়া আপন স্বভাব ফিরিয়া পায় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চিৎ-স্বরূপ প্রাপ্তিযোগে সাধক চিন্ময় ভাব-তনু লাভ করে।

সাধক যখন চিন্ময় ভাব-তনু প্রাপ্ত হয, তখন সে নিত্য ব্রজধামে প্রবেশ করে এবং আপন স্বভাব অনুযায়ী স্থান লাভ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলার সাক্ষী হইয়া ব্রজের নির্মল আনন্দ লাভ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। 'জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস', সুতরাং তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! ইহাই জীবের সাধ্য (end in itself)। সত্য কথা, এই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ লাভ করা জীবের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এই আনন্দধামে আনন্দে মগ্ন থাকাই জীবের সর্বস্ব নাও হইতে পারে। এই আনন্দধাম হইতে সে বাহিবেও আসিতে পারে, সে স্বাধীনতা জীবের আছে। যদি বাহিরে আসিতে না পারিত তবে তাহাও তো একপ্রকার বন্ধন—তাহা

যতই আনন্দদায়ক হউক না কেন। সাধক লীলা-চক্রের বাহিরে আসিলেও নিত্য লীলার প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, সেখানে কোন ছেদ পড়ে না। ব্যবহারিক উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, কোন দর্শক যাত্রা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলে যাত্রা সে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যাত্রা সমস্ত রাত ধরিযাই চলিতে থাকে। এখন যে সাধক লীলা-মণ্ডল হইতে বাহিরে আসিল সে অদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া মহাশূন্যের অনন্ত জ্যোতিঃ এবং নিঃসীম আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে। কারণ, ভগবানের যখন অদ্বয় অবস্থা রূপ আর একটা অবস্থা রহিয়াছে, সে অবস্থাটা কি তাহা ভক্ত জানিতে চাহিতে পারে। তাহা যদি না হইত তবে বৈষ্ণবধর্মে নিকুঞ্জ-লীলার অবতারণা থাকিত না। এই নিকুঞ্জ লীলার তাৎপর্য কি? কৃষ্ণের দুই লীলা---এক কুঞ্জ লীলা, আর এক নিকুঞ্জ লীলা। নিকুঞ্জ ভঙ্গ হইতে কুঞ্জলীলার আরম্ভ হয় এবং মহানিশায় উহার সমাপ্তি ঘটিয়া ভগবান নিকুঞ্জ লীলায় প্রবেশ করেন অর্থাৎ লৌকিক অর্থে নিদ্রায় মগ্ন হন। নিদ্রা-মগ্ন অবস্থাটা কি? ইহা হইল অদ্বয় অবস্থা। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপে এক হইয়া অদ্বয় অবস্থায় বিরাজ করেন। অদ্বয় অবস্থায় যে লীলা, সেই নিকুঞ্জলীলার রস উপলব্ধি করিতে ভক্তের বাঞ্ছা হইতে পারে। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমধুসূদন ভক্তের সে বাঞ্ছা পূরণ করেন।

সচ্চিদানন্দ—পরব্রহ্মকে বলা হয় তিনিই একমাত্র সত্য (সৎ), চিন্ময় (চিৎ) এবং আনন্দময় (আনন্দ)। জীব স্বরূপে চিন্ময় হইলেও উহার চিৎ-স্বরূপ অবিদ্যার আবরণে ঢাকা পড়িয়া থাকে। অবিদ্যা-প্রসূত দেহাত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া অশুদ্ধ অহং-অভিমানে কর্ম করে। অশুদ্ধ অহং-জ্ঞানে কৃতকর্ম হইতে সঞ্জাত কর্মফল জীবকেই ভোগ করিতে হয। এইরূপ উর্ণনাভের ন্যায় কর্মজালে জড়িত হইয়া কর্মদেহ বা ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সংসার চক্রে চক্রবৎ পরিবর্তিত ক্ষণিক সুখ-দুঃখের আবর্তনে ঘূর্ণিত হয়। সেইজন্যই বৌদ্ধধর্মে বলা হয় জীবন দুঃখের আগার। ইহা হইতে মুক্তি বা অব্যাহতি লাভের উপায় হইল বোধি বা জ্ঞান লাভ করা। আগমে বলা হয়, অশুদ্ধ অহংকে বলি দিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট অহং-এ বা আপন চিন্ময় স্বরূপে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হইল, মাযাভিভূত অবিদ্যাগ্রস্থ অশুদ্ধ ভৌতিক দেহবিশিষ্ট বহির্মুখী জীব সদা চঞ্চল চিত্ত লইয়া কিরূপে জ্যোতির্ময় আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে? শাস্ত্রের বিধান হইল, মায়াতীত হইয়া চিন্ময় আত্মস্বরূপে অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে প্রথমে করিতে হইবে ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি। এই ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিই হইল অধ্যাত্ম জীবনের পথে যাত্রা করিবার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি। কোন দূরগামী যাত্রী

যেমন যাত্রা করিবার পূর্বে প্রস্তুত হয়, ইহাও সেইরূপ। অপবিত্র চিন্তা, কার্য ও বাক্য হইতে বিরত হইয়া, অসৎ পথে পদচারণা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মিথ্যাচরণ দূরে পরিহার করিয়া, পার্থিব আপাতঃ রমনীয় ও লোভনীয় ভোগসুখ, ধনসম্পদের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত মনকে ধৈর্য ও সংযমের সহিত সংবরণ করিয়া, পবিত্র চিন্তায় ও ভাবে সদা মগ্ন থাকিয়া, সৎ-গ্রন্থ পাঠ ও সাধুসঙ্গ করিযা বা উন্নত চরিত্র-মনুষ্যের সান্নিধ্যে যাইয়া, সাংসারিক জীবনের কর্ম নিরাসক্ত, নির্লিপ্তভাবে সম্পন্ন করিয়া, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ বা দুঃখ ভোগের ভিতরে অবিচলিত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে ভূতশুদ্ধি হয়। ইহার সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, সর্বকর্ম-ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য চিত্তে কর্ম সম্পন্ন পূর্বক কর্মফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া, চিত্তকে বিষয়াভিমুখী হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধ্যান, ধারণা বা নামজপ বা নাম-সংকীর্ত্তনাদি পরিকর্মের দ্বারা অন্তর্মুখী করিলে চিত্ত হইতে চাঞ্চল্য, অসন্তুষ্টি, বিষাদ, অবসাদ, বিমর্ষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মনঃক্ষুণ্নতা, জাগতিক দুঃখ বা আনন্দানুভব প্রভৃতি যাবতীয় অসৎ বৃত্তি বা বিক্ষোভ ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত ও দূরীভূত হইয়া চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হইতে থাকে এবং প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উর্ধ্বে উঠিয়া এক অধ্যাত্ম ভাব-মণ্ডলের স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে চিত্ত পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাই চিত্তেব বিশুদ্ধি-করণ। এইরূপে চিত্ত নির্লিপ্ত উদাসীন থাকিয়া কর্মনিষ্ঠ হইলে এবং ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে চিত্ত-ক্ষেত্র ধর্মকে ধারণ করিবার উপযোগী হয়। তখন কৃপাময় ভগবান প্রত্যক্ষরূপে বা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তাহার নিকট আসিয়া মন্ত্র-দীক্ষা দেন অর্থাৎ বীজ মন্ত্রের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দময়ের সৎ অংশকে অর্থাৎ শুদ্ধ সত্তাকে বপন করেন। এইরূপে দীক্ষিত করিয়া জীবকে ঈশ্বর আপনার সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে জীবের মধ্যে সৎ বা সত্যেব প্রতিষ্ঠা হয়।

জীবের হৃদয়ে মন্ত্রবীজ রোপিত হইলে জীবকে মালি হইয়া সেই বীজকে অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে বৃক্ষ, পুষ্প, ফল ও রসে পরিণত করিবার সাধনা করিতে হয়। সাধনার দ্বারা শব্দবীজ অর্থাকারে অর্থাৎ জ্যোতিঃরূপে প্রস্ফুটিত হইলে জীব চিৎ-স্বরূপে বা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইষ্টদেব অন্তরাকাশে সদাকালের জন্য উদিত হইয়া অনির্বাণ থাকে। এইরূপে জীবের মধ্যে সচ্চিদানন্দের চিৎ-সত্তার বিকাশ হয। এই সময় সাধক দেশকালের অতীত হইয়া নিত্য বর্তমান ও বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্বরূপ মধ্য বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিৎ-স্বরূপের ইহাই সবটা নয়। কাবণ, অন্তরাকাশে উদিত ইষ্টদেবতাকে বহিরাকাশেও চাক্ষুস করিতে হইবে। যখন সাধক অন্তরাকাশের ইষ্টদেবতাকে বহিরাকাশে চাক্ষুস করিতে সক্ষম হয়, তখন তাঁহার চিন্ময় পরিণতি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

স্ব-স্বরূপে বা আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব যখন সাধকের করতলগত হয়, তখন সাধকের মধ্যে শুদ্ধ অহং-এর বিকাশ হয়। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পায়। সাধক তখন উপলব্ধি করে আমি রূপ শুদ্ধ চিন্ময় আত্মাই এই বিশ্ব ও বিশ্বের অন্তর্গত সব কিছুই হইয়াছি এবং বিশ্ব ও উহার অন্তর্ভুক্ত সবকিছু আমিই। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। সমগ্র বিশ্বরূপী আমির এই যে অহংবোধ—ইহাই পূর্ণাহন্তা অবস্থা বা 'সোঽহং' রূপে অদ্বিতীয় অবস্থা।

যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অন্তরাকাশও থাকে। অন্তরাকাশ হইল দেহাবরণের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বহিরাকাশ। সাধক দেহে অবস্থান করিয়া অন্তরাকাশ ও বহিরাকাশের সন্ধিস্থলে ইষ্টদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিৎ-স্বরূপে জীবের শুদ্ধ-সত্ত্ববিশিষ্ট চিত্ত বা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব বিশিষ্ট জীব-চিত্ত আনন্দপিপাসু। আনন্দ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট জীব-চিত্ত চঞ্চল থাকে। কিন্তু আনন্দের আস্বাদন কিরূপে হইতে পারে? অন্তরাকাশের ও বহিরাকাশের সন্ধিস্থলে বা পীঠে অবস্থিত ইষ্টদেবতা নিষ্কল, অবিকম্প। ইহাই কূটস্থ ব্রহ্ম। এই নিষ্কল ইষ্টদেবতায় যদি চিন্ময়প্রাপ্ত সাধকাত্মা লীন হইয়া যায়, তবে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপে এক হইয়া গিয়া সাধকাত্মাও আনন্দময় হইয়া যায়—ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখানে আনন্দের অনুভব থাকিলেও সাধকাত্মার আনন্দ-রসের আস্বাদন হয় না। আনন্দ-মগ্নতা এক জিনিস, আনন্দের আস্বাদন বা সম্ভোগ আর এক জিনিষ। সুতরাং আনন্দের সম্ভোগ করিতে হইলে নিষ্কল ব্রহ্মে নিমগ্ন হইলে চলিবে না। সাধনার দ্বারা নিষ্কল ব্রহ্মকে সকল সগুণ করিতে হইবে। ইহা কিরূপে হইবে? ইহার পন্থা হইল অন্তর ও বাহির আকাশের সন্ধিপীঠে অবস্থিত নিষ্কল ইষ্টদেবকে বা লক্ষ্যকে আত্মারূপ তীর দিয়া 'ওঁ'কার রূপ ধনুকের ছিলা আকর্ষণপূর্বক বিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে নিষ্কল ইষ্টদেবতাকে বিদ্ধ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলে নিষ্কল ইষ্টদেবতা চঞ্চল হইয়া উঠিবেন এবং সাধকাত্মা নিশ্চল হইবে। তখন সাধকাত্মার ও ইষ্টদেবতার মধ্যে পরস্পর প্রেমের বিনিময় হইতে থাকিবে। এই পরস্পর বিনিময়ের মধ্যে যখন সাধকাত্মা চঞ্চল থাকিবে তখন ইষ্টদেবতা অচঞ্চল। আবার ইষ্টদেবতা যখন চঞ্চল তখন সাধকাত্মা অচঞ্চল। এইরূপ বিনিময় হইতে হইতে উভয়েই এক বস্তু হইয়া যাইবে, বা সাযুজ্য লাভ করিবে বা সমরসতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে তখন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। এইরূপে এক হইয়া গিয়া উভয় আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলেও যে-আত্মা কৃপা লাভ করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে আর যে নিত্য পূর্ণ আত্মা কৃপা করিয়াছে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকিবেই। যে সেতুর দ্বারা পূর্ব ভেদ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা প্রেমভক্তির সেতু। অভেদের

মধ্যে এখন যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহা নিত্য তুমি ও নিত্য আমি রূপে একই পরতত্ত্বের মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের ভেদের প্রতীতি ব্যতীত উহা প্রকৃত কোন ভেদ নহে। কারণ, ভেদের এই প্রতীতি ব্যতীত রস আস্বাদন হয় না। বিলাসের দ্বারাই রস আস্বাদন একমাত্র সম্ভব। বিলাস-লীলা দুই-এর অপেক্ষা রাখে। তাই একের মধ্যেই দুই-এর এই ভেদের প্রতীতি। ইহাই প্রকৃত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব।

রসময় তনু—অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসুর মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়—ইহাই প্রাথমিক ভগবনোন্মুখী অবস্থা। সকলের এ অবস্থা প্রাপ্তি হয় না। কারণ, অধিকাংশের মন বিক্ষিপ্ত মায়াভিভূত—পার্থিব বিষয়ের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি সব সময়ে ধাবিত। অর্থার্থীর মন বিক্ষিপ্ত হইলেও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবানের দিকে উন্মুখ হওয়াটাও ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপা না পাইলে ভগবানের প্রতি জীবের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস জাগে না। ভগবৎ-কৃপায যাহার ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়াছে, ভগবানের নামে তাহার রুচি জন্মায়। ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে তাহার হৃদয় বিগলিত হইতে থাকে, বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আর আনন্দ ও শান্তি খুঁজিয়া পায় না। তাহার মনের গতি ক্রমশঃ বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখী হয। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়। কি যেন একটা অভাবের বেদনায় মথিত হৃদয়ে ভগবানের দর্শন লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে। তখন সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপী গুরু তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহার স্বভাব বা স্বরূপ-প্রকৃতির উপযোগী মন্ত্র দান করেন। অর্থাৎ গুরু তাঁহার প্রজ্ঞালোকে শিষ্যের অন্তর্স্বরূপ বা স্বভাব লক্ষ্য করিযা তাহার স্বরূপ বিকাশের উপযোগী মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তাহার নব-জীবনের সূত্রপাত করেন—ইহাকেই বলে দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয জন্ম। অন্যভাবে বলা যায় যে, গুরু শিষ্যের অন্তর-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া ক্ষণিকের জন্য শিষ্যকে তাহার ইষ্টদেবতার সহিত যোগযুক্ত করিয়া দেন—ইহাকেই প্রকৃত 'যোগ' বলে, যদিও সে-যোগ ক্ষণকালের বেশী স্থায়ী হয় না। কারণ, শিষ্যের মনের মালিন্যের জন্য বা আধার প্রস্তুত না থাকায় বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তার সহিত যুক্ত থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ চিন্ময় ইষ্টসত্তাই যেন ঠেলিয়া তাহাকে সরাইয়া দেয়। তথাপি চিন্ময় সত্তার সহিত ক্ষণিক যোগ হইলেও উহার স্পর্শ সোনার কাঠির স্পর্শের ন্যায় তাহার মনে এক অভূতপূর্ব প্রভাব পড়ে। হারানিধি খুঁজিযা পাইবার জন্য মনে মনে তীব্র অনুসন্ধান চলে। এইখানেই প্রকৃত বিরহ জাগিযা উঠে। একবার যোগ না হইলে বিরহবোধ আসিবে কোথা হইতে? অনূঢ়া বালিকার বিরহবোধ নাই, কিন্তু বিবাহিত হইবার পর একবার

স্বামীসঙ্গ লাভ করিয়া বিচ্ছেদ ঘটিলে তখনই বিরহবোধ জাগে। মন্ত্রদীক্ষার পূর্বে যে অভাব বোধ, তাহা প্রকৃত অভাববোধ নয়; দীক্ষার পরেই প্রকৃত অভাববোধ শুরু হয়। দীক্ষা গুরুর নিকট হইতেও পাওয়া যাইতে পারে, আবার নিজের অন্তর হইতেও দীক্ষা লাভ করা যায়। প্রকৃত আকুলতা জাগিলে কখন কখন অন্তরদেবতাই কোন সময়ে তাহার দেহাভিমান ক্ষণিকের জন্য ভুলাইয়া দিয়া তাহার বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপের জাগরণ ঘটাইয়া তাহাকে উপদেশ দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হইবার সন্ধান দেন। যেভাবেই হউক, দীক্ষা লাভের পর বিরহজাত তীব্র ব্যাকুলতার সহিত একাগ্রভাবে জপ-সাধনা করিতে করিতে এক সময়ে ভাবের বিকাশ হয়। ঐরূপ প্রকৃত দীক্ষার পর মনের আর বহির্মুখী গতি থাকে না, একেবারে এক লক্ষ্যের দিকে অন্তর্মুখী গতি হয়। লৌকিক জীবনে যেখানে মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রজঃ তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, উহারা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া সত্ত্বগুণের প্রাবল্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। একবার ভাবের বিকাশ হইলে তাহা আর অন্তর্হিত হয় না। ভাবের বিকাশ অর্থে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর জাগরণ বুঝায়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটিলে বা ভাবের বিকাশ হইলে তখন যোগী স্রোতের মুখে পড়িয়া তাহারই টানে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন আর জপতপের প্রয়োজন হয় না—সমস্ত বৈধী ভক্তি আচরণের অবসান হয়। ভাবের বিকাশে দুইটি জিনিষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে— আশ্রয় ও বিষয়। এইখানেই ভাব-সাধনার প্রকৃত আরম্ভ। ভাবের বিকাশ অর্থে ভক্ত যোগীর ভাব-প্রকৃতির স্বরূপ খুলিয়া যায়। প্রত্যেক জীবের আপন প্রকৃতিগত নিজস্ব ভাবদেহ আছে—ইহাই প্রত্যেক জীবের বিশেষত্ব (individuality)। যত জীব তত আত্মা যাহাকে বৈষ্ণবধর্মে বলা হয় চিদণু। প্রত্যেক আত্মা যদিও একই চিন্ময় স্বরূপ, তথাপি জীবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যেক আত্মা অপর আত্মা হইতে পৃথক। ভাবের বিকাশে প্রত্যেক আত্মাই নিজস্ব বিশিষ্ট ভাবানুযায়ী ভাবদেহ প্রাপ্ত হয়। এবং যে যার নিজের ভাবানুযায়ী সাধনা করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অসংখ্য ভাবসমূহকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। ভাব-সাধনা সাপেক্ষ (relative), নিরপেক্ষ নহে। তাই ভাব-সাধনায় আশ্রয়-বিষয় বা আশ্রয়-আশ্রয়ী উভয়ের প্রয়োজন। দাস-ভাবনায় ভক্ত যোগী দাস্যভাবের আশ্রয়, প্রভুরূপে ঈশ্বর উহার বিষয়; সখ্যভাবনায় ভক্ত সখ্যভাবের আশ্রয়, সখারূপে ভগবান উহার বিষয়; বাৎসল্য ভাবনায় ভক্ত বাৎসল্য ভাবের আশ্রয়, শিশুরূপী কৃষ্ণ উহার বিষয়। বাৎসল্য ভাবনায় আবার আশ্রয়ই বিষয় এবং বিষয় আশ্রয় হইয়া যায়। সেখানে যোগী বাল-ভাবের আশ্রয়, জগৎ-মাতা বা জগৎ-পিতা

উহার বিষয়। মধুর ভাবনায় ভক্ত মাধুর্যভাবের আশ্রয় এবং প্রেমিক চূড়ামণি কৃষ্ণ উহার বিষয়। শাক্ত-সম্প্রদায় বাৎসল্য ভাবের বিপরীত রূপটাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে যোগীর বাল-ভাব। যোগী নিজের ভাবদেহকে নিজেই দেখিতে পায়—দেখিতে পায় সে ৪/৫ বছরের শিশু। যখন যোগী ভাবদেহের প্রতি অভিনিবেশ করে তখন স্থূলদেহের প্রতি সম্পূর্ণ অচেতন থাকে। কারণ, স্থূল দেহ সম্বন্ধে সজাগ থাকিলে ভাবদেহে প্রবেশ করা যায় না। স্থূলদেহের ন্যায় ভাবদেহও খাঁটি সত্য—কল্পনা নয়। যে যোগীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি নিজের ও অপরের ভাবদেহ বাস্তব প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে পান। যোগী ভাবদেহ হইতে যখনই ইচ্ছা করেন স্থূলদেহের প্রতি অভিনিবেশ করিয়া স্থূলদেহে ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ স্থূল চেতনায় ফিরিয়া আসেন। বস্তু জগতের ন্যায় ভাব জগৎও সত্য; কিন্তু সে সত্য ভাবজগতের প্রবেশাধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ ধারণাই করিতে পারে না। বালভাবে যোগী মা-কে পাইবার জন্য মা মা রবে ক্রন্দন করিতে থাকে। কারণ, মা-এর বিরহ সে সহ্য করিতে পারে না। মা-কে পাইবার জন্য আকুল হইয়া রোদনই তখন একমাত্র সাধনা—ইহাই প্রকৃত ভাব-সাধনা। যার যেরূপ ভাব, সে স্বরূপ ভাবেই এখানে সাধনা করে। ভাবজগতে প্রবেশ ভিন্ন নিজের স্বরূপ চেনা ও দেখা যায় না। আর নিজ স্বরূপ না চিনিলে ভাব-সাধনার আরম্ভই হয় না। ভাবের প্রকাশ ঘটিযা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া সাধনার প্রকৃত সুরু হয়। এ-সাধনা বিধিপূর্বক আনুষ্ঠানিক মার্গে চলে না, একমাত্র ভাবই এরূপ সাধনার একমাত্র অবলম্বন। তবে কি বলিতে হইবে ভাবের প্রকাশ ঘটার পূর্ব পর্যন্ত যে-সাধনা, তাহা সাধনাই নহে? না, তাহাও একপ্রকার সাধনা। সাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই নিজস্ব মূল্য আছে। ভাব-সাধনার পশ্চাৎপটে (background) থাকে গুরু-দত্ত মন্ত্র-সাধনার বৈধ অনুষ্ঠান এবং বৈধী ভক্তি সাধনার পশ্চাৎপটে থাকে ভগবানের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যাহার ফল ভগবানের দিকে সব সময় উন্মুখ থাকা বা কায়মনবাক্যে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। 'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ লৌকিক সমস্ত ধর্মকর্ম যাহা লৌকিক বা পারলৌকিক ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত হয, তাহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণ লও, আমাতেই কর্মফল অর্পণ কব, 'অহং ত্বম্ সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি'—আমি তোমাকে সর্ব পাপ, সর্ব গ্লানি, সর্ব মালিন্য হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে আমার কবিযা লইব। অর্থাৎ এক কথায় ভাবজগতের প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান সাধনা তাহা মহত্ত্বের ভাব-সাধনার অধিকারী হইবার জন্য আধারের প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য। অতএব এই দিক দিয়া ইহাদের বিশেষ অর্থ আছে। ইহারা নিরর্থক, নিষ্ফল নয়। পুষ্পকে

প্রস্ফুটিত করিবার পশ্চাতে বৃক্ষের যে সাধনা অন্তর্লীন, ভাবকে প্রস্ফুটিত করিবার পশ্চাতে ঐ সমস্ত সাধনার সেই একই অর্থকারিতা আছে। আধারের প্রস্তুতি ভিন্ন ভাবের বিকাশই হইতে পাবে না। বিশুদ্ধ চিন্ময় ভাবের বিপুল প্রাবল্যকে ধারণ করিবার সেইরূপ পাত্র তো চাই! মায়াব মালিন্যে ভরা পাত্র দিয়া দিব্য বস্তুকে ধরা যায় না।

ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভাবের ভাবি হইয়া শিশু যোগী মাকে পাইবার জন্য আকুল ক্রন্দন করে। যোগী ক্রন্দন করিলেই যে মা সাডা দেয তাহা নহে। মা এত সহজে ধরা দেয় না। যোগী ক্রন্দন করিতে কবিতে যখন ক্রন্দন করিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলে, বিরহেব ব্যথায় আকুলি বিকুলি করিতে করিতে যখন বিরহ তীব্র হইয়া সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে, বিরহ অসহ্য হইয়া যখন যোগী চৈতন্য হারায, তখন মা আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিযা লন। মা যে কৃপাময়ী, তাঁহার অনন্ত কৃপাকে সহ্য কবিবার জন্য অসহ্য বিরহের দাবদাহে দগ্ধ করিয়া সন্তানকে তৈবী করিযা নেন। ভূগর্ভে সোনা থাকে। বহু প্রযত্নে ভূগর্ভ হইতে সোনা তুলিলেই খাঁটি সোনা মেলে না, অনেক ময়লা তাহাতে মিশ্রিত থাকে। আগুনে পোড়াইযা তবল করিয়া ময়লা হইতে সোনাকে পৃথক করিলে তবেই খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায। বিরহ হইল আগুন। আগুনে পুড়িয়া যেটুকু ময়লা তখনও যোগীর মধ্যে থাকে তাহা ছাই হইয়া যায়। তখন চিন্ময় বিশুদ্ধ সত্তাই মাত্র থাকে। অতএব বিরহের দুঃখ আধার বা পাত্রকে বৃহৎ করিয়া দেয়। যতই বিবহ, ততই আধারের প্রসারণ। যোগী একবাব কাঁদিলেই যদি মা কৃপা করেন, তবে মায়ের অনন্ত কৃপার এক কণা মাত্র পাইলেই যোগীর পাত্র ভরিয়া যায়। কত অসংখ্য জন্মের পর্যায় অতিক্রম করিয়া, কত সাধ্যসাধনা করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়া মাত্র এইটুকু পাইয়াই কি যোগীর আনন্দেব পবিতৃপ্তি ঘটিবে? তাহা হইতে পারে না। মা-এর অপার করুণার বৃহৎ অংশ ধারণ করিয়া বিপুল আনন্দের আস্বাদন করিলেই অনেকটা পরিতৃপ্তি আসে। কারণ তখনও পরিপূর্ণ পবিতৃপ্তির অবস্থা লাভ করিতে বিলম্ব আছে। যাহাই হউক, অনেকখানি পরিতৃপ্ত করাইবার জন্যই মা যোগীর অদর্শনে থাকিয়া সন্তানেব বিরহের গভীরতা সম্পাদন করেন। মা যখন মনে করেন সময হইয়াছে তখন আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লন। মা আর সন্তানেব এই যে যোগ—-ইহার আর বিচ্ছেদ হয় না। এইবার মা ও সন্তান উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিগলিত হইতে থাকেন—ইহাকে বলে 'দ্রুতি'। মা ও সন্তান বিগলিত হইয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়া এক রসে পরিণত হয়। তখন কেই বা মাতা, কেই বা সন্তান। তখন কেবলমাত্র 'এক' অভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকে। ইহাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থা।

ইহারই নাম রসময় তনু। ইনিই রসস্বরূপ ভগবান। চিৎ আর আনন্দের মিশ্রণেই রসের উৎপত্তি। রস যখন ঘনীভূত হয় তখনই হন রসঘন ভগবান—আশ্রয় ও বিষয়ের মিলিত এক সত্তা। আবার এই রস আস্বাদন করিবার জন্য সেই 'এক'-ই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আশ্রয় ও বিষয়ে পরিণত হন। তাঁহারই চিন্ময় হ্লাদিনী শক্তির সত্তা হইতে নিত্য দিব্য ধাম রচনা করেন এবং নিজেই নিজে প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া নিত্য লীলার অভিনয় করেন। মধুরভাবে যে ভক্ত যোগী সাধনা করেন, ঐরূপ প্রক্রিয়ায় সেই ভক্ত ও ভগবান এক রসে পরিণত হইয়া পুনরায় উভয়ে রসময় তনু লাভ করিয়া নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য লীলার অভিনয় করিতে থাকেন। ইহাই জীবের পরিপূর্ণ আনন্দ-সম্ভোগ। ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ অচিন্তনীয় সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়াই চৈতন্য সম্প্রদায় 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। এবং চৈতন্যদেব নিজের শেষ জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া ভাব-যোগীর অসহনীয় বিরহের রূপটি পরিস্ফুট করিযা দেখাইয়াছেন।

রাগমার্গে সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা—রাগমার্গে সাধক যখন চিন্ময় ভাবদেহ লাভ করে তখন সে হইয়া যায় শিশু। তখন তার মধ্যে যে উপলব্ধি ঘটে, সেই উপলব্ধির দ্বারা তখন তার মনে হয় সবই তো সহজ। এই সহজ উপলব্ধি তাহাকে শিশুর সারল্যে উপনীত করে। এই সহজ উপলব্ধি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ নানা মতান্তর, পথান্তর, ধর্মান্তর, সাধনান্তব। সহজ উপলব্ধির জন্য নানা সাধনা, তপস্যা, যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতির আয়োজন। একবার সহজ উপলব্ধি হইলে আর এ-সবের কোন অর্থ তাহার কাছে থাকে না। সবই মূল্যহীন, অনর্থক, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। সহজ অতি সহজ বলিয়াই সবচেয়ে কঠিন। সহজের উপলব্ধির জন্য কন্টকাকীর্ণ পথের আয়াস-সাধ্য সাধন-প্রচেষ্টা।

সহজ সহজ বারবার বলিতেছি, কিন্তু সহজ বস্তুটি কি? সহজ বস্তুটি হইল স্বরূপ-প্রাপ্তি। আমরা জানি, পরব্রহ্মের তিনটি বিভাগ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। 'সৎ' অর্থাৎ তিনি আছেন এবং সব কিছু তাঁহাতেই বিধৃত। 'চিৎ' অর্থে তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটির একত্র সমাবেশ। 'আনন্দ' অর্থে তিনি আনন্দস্বরূপ এবং আস্বাদ্য।

সৃষ্টির পূর্বে 'একমেবাদ্বিতীযম্' অবস্থায় জীব ব্রহ্মের মধ্যে অন্তর্লীন ছিল। যখন অদ্বয় ব্রহ্মের মধ্যে 'সিসৃক্ষা'র উদয় হইল তখন তাঁহার মধ্যে স্পন্দনের সৃষ্টি হইল এবং সৃষ্টিক্রমে জীবের উদ্ভব হইল। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিটি জীব লক্ষ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তনের মধ্য দিয়া আবার তাহার উৎস-স্থানে

ফিরিয়া যাইবে—ইহাই তাহার বিধিলিপি। যদি জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার ব্রহ্মেই ফিরিয়া যাইবে, তবে এই অসংখ্য জন্মের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা ভোগের প্রয়োজন কি ছিল? ভ্রান্তির মধ্যেই বা জীব পড়ে কেন? মায়া-সৃষ্ট মোহের প্রলোভনে পড়িয়া স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজেকে কলুষিত করে কেন? উত্তরে বলা যায় যে জীবের এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে। জীব যখন ব্রহ্মের মধ্যে লীন ছিল, তখন তাহার অস্তিত্ব ছিল কিন্তু বোধ ছিল না। সে যে চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এ উপলব্ধি ছিল না। এই বোধ-শক্তি অর্থাৎ জীবের চেতন সত্তাকে জাগরিত করিবার জন্যই জীবকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া বিমূঢ় হয় অর্থাৎ আপন স্বভাব বা স্বরূপকে হারায়। আবার গুরুদীক্ষায় এবং আপন সাধন-শক্তি বলে মায়ার কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া জীব যখন চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয় এবং আপন স্বভাবকে চিনিতে পারে তখন ব্রহ্মের সহিত পুনর্মিলনে জীব চিন্ময় বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করে। অধ্যাত্ম লোকের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়া জীব নিজেকে ও ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে এবং তাঁহার সহিত মিলন হওয়ায় আনন্দের আস্বাদন করে। পার্থিব জগতের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে যে বহুক্ষণ অদর্শনের পর শিশু মাকে দর্শন করিলে শিশুর মধ্যে যে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয় অথবা দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর প্রবাসী-স্বামীর সহিত বিরহকাতরা স্ত্রীর মিলন হইলে স্ত্রীর অন্তরে যে আনন্দের প্রবাহ উঠিতে থাকে, তাহার সহিত জীবের ব্রহ্মানন্দ আস্বাদের কিঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। জীবের আপন স্বরূপ-চেতনার উদ্রেকের এবং তজ্জাত চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের জন্যই জীবের ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হইয়াছিল।

মানুষ যে শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই ভৌতিক শরীরে তত্ত্ব-জ্ঞান বা সহজ উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না, হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এই ভৌতিক শরীরের অভ্যন্তরে বাসনা-কামনায় কলুষিত অন্তরে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইতে পারে না। অন্তরস্থ তমঃ ও রজঃ গুণের নিরসন না হওয়া পর্যন্ত এবং সত্ত্ব গুণের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত চিৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যময় আপন সত্তার সাক্ষাৎ লাভই হইল আত্মজ্ঞান লাভ করা। ভৌতিক শরীরে যদি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব নয়, তবে কিসে তাহা সম্ভব হইবে? গুরুদত্ত মন্ত্রে। সদগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে হইবে। গুরু ভূত-শুদ্ধি অর্থাৎ পঞ্চভূতে গঠিত শরীরে শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করেন। এ কাজ সাধারণ গুরুর দ্বারা সম্ভব নয়। বাহ্য জগতে সাধারণ অক্ষর পরিচয় করাইতেই গুরুকে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে

হয়। সেখানে সহজেই অনুমিত হয় যে শিষ্যের সমস্ত অভ্যন্তর পরিবর্তন করিতে হইলে কিরূপ শক্তিমান গুরুর প্রয়োজন। গুরু আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রথম অক্ষর পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর শিষ্য নিজ চেষ্টায় সাধন-ভজনের দ্বারা আত্মচৈতন্য লাভের বা আপন সত্তার পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হয়। মন্ত্রজপ বা নাম-সাধনের দ্বারা শিষ্যের স্বভাবের উপর আবরণ অর্থাৎ মায়া-মোহের আবরণ উন্মোচিত হইতে থাকে, বাসনা-কামনার কুলষতা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হইতে থাকে। খাদ্য যেমন স্বভাবধর্মে পরিপাক হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে, সেইরূপ একই স্বভাব-প্রক্রিয়ায় মন্ত্রজপ বা নাম-সাধনার দ্বারা শরীর চিন্ময়ত্বে পরিণত হইতে থাকে। এইরূপে যখন চিন্ময় ভাবতনুতে উত্তরণ হয়, তখন সে মাতৃরূপ ইষ্টদেবতার নিকট নিজেকে শিশুরূপে দেখিতে পায়। অথবা ইষ্টদেবতার সহিত কান্ত-কান্তা ভাবে মিলিত হইতে দেখিতে পায। যে উহা দেখে, সে আমারই চিৎ-সত্তা। এই অবস্থা লাভ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ভাবতনুকে প্রবিষ্ট হওয়া পর্যন্ত ভক্ত সাধক-অবস্থাতেই থাকে। তখনও সে সিদ্ধি লাভ করে নাই। ভাবের যখন পরিপক্কতা আসিবে অর্থাৎ ব্যকুলতা বা অন্তর-ক্রন্দন যখন সুতীব্র মর্মভেদী হইয়া অন্তর-বেদনা গাঢ়তায় নিবিড় হইবে, তখনই সাধক সিদ্ধ হইবে।

এই প্রসঙ্গে 'ক্ষেপা সাধু' ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজীকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এবং কবিরাজজী যাহা লিপিবদ্ধ করিযা গিয়াছেন, তাহা আমি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"জগতে সর্বত্র ভক্তিনামে যে বস্তুর প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভক্তি নহে। উহাকে আমি ভূতভক্তি বা ভৌতিকভক্তি বলি। কারণ অজ্ঞান অবস্থা কাটিয়া না গেলে ভৌতিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারা যায় না। এবং প্রকৃত ভক্তিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায না। মন ও প্রাণের সহিত 'আমি' নামক সত্তাটিকে লইয়া যদি একভাবে ভগবানে গতি ও স্থিতি করান যায় তাহা হইলেই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। বস্তুতঃ অনন্তকালের সাধনা ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। ভগবৎ প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সর্বপ্রথম স্বভাব-প্রকৃতির কর্তব্য কার্যগুলি সমাধান করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে জ্ঞান লাভ করা ঘটিবে না। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি অর্জন করিতে হইবে। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিবে। তাহার পূর্বে ভক্তির প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। শুদ্ধ ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এই শুদ্ধভক্তি অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে পাওয়া যাইতে পারে না। ভগবানের সৃষ্টিকার্যের রহস্য ও অনন্ত শক্তির পরিচয় না পাইলে আমিত্বের নাশ হয না। আমিত্বের নাশ না হইলে শুদ্ধ ভক্তি কোথা হইতে আসিবে?

শুদ্ধ ভক্তির পর বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, তখন ভগবৎ সত্তার উপলব্ধি আপনি হইয়া থাকে।" (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪/৯৫)

এই একই প্রসঙ্গে পশুজীবন হইতে দিব্যজীবন ও ভাগবত জীবনে পরিণতি লাভ সম্বন্ধে করিরাজজী শ্রীমান্ সদানন্দ ব্রহ্মচারীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"মানুষ পঞ্চ কোশ বিশিষ্ট জীব। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের বিকাশ, এবং মনোময় কোশের পূর্বাভাস, মানুষের চৌরাশী লক্ষ পূর্বতন যোনিতে পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু মনোময় কোশের বিকাশ মনুষ্যদেহ হইতেই আরম্ভ হয়। মনুষ্য দেহের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোময় কোশের বিকাশ সম্পন্ন হয়। বিবেক জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি, সদসদ্ বিবেচন মনুষ্য দেহ লাভের পূর্বে হয না। কর্তৃত্বাভিমানের অভিব্যক্তি মনুষ্য দেহের বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও প্রকৃতিতে পশুভাব দীর্ঘকাল থাকিয়া যায়। তাহার পর সদসদ্ বিবেকের পরিস্ফুট অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয। এই নৈতিক জীবনের মহত্বই পশুজীবন হইতে মনুষ্য জীবনকে উৎকর্ষ দান করে। যদি শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হয তাহা হইলে এই নৈতিক জীবন বিশিষ্ট মনুষ্যের আধারেই পূর্ণতার বীজ নিহিত হয। সর্বপ্রথম মনুষ্যের জীবন এমন ভাবে গঠিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও সংকোচভাব দূর হইয়া ব্যাপক ও উদারভাব বিকশিত হইতে পারে। যাহার ফলে মনুষ্য একদিকে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা অন্তর্মুখ গতিতে অগ্রসর হইতে সমথ হয় ও অপরদিকে বাহ্য ব্যাপকসত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হইতে পারে। ইহার জন্য শ্রীভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান মুখ্য সোপান। কর্তব্য বোধে সুচারুভাবে কর্ম সম্পাদন করিয়া কর্মফল ভগবানকে অর্পন করা। কর্মফলে অনাসক্ত থাকিলে চিত্তশুদ্ধি অনিবার্য এবং কর্মের অনুষ্ঠানও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ইহারই নাম যোগস্থ কর্ম। কর্ম নিজে করিতে হইবে, কিন্তু সেই কর্মের প্রাপ্যফল সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিতে হইবে; স্বকৃত কর্মফলের উপর দাবী না রাখা ইহাই ঊর্ধ্বগতির প্রথম সোপান। এই স্থলে সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্যমূল্য হইয়া যায়। তাহার প্রভাবে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়। কর্ম নিরূপণ গুরু অথবা উপদেষ্টার অধীন।

এইভাবে দীর্ঘকাল কর্মে ব্রতী থাকিলে, একপক্ষে বাহ্য জগতের সঙ্গে নিজের যোগ অক্ষুন্ন থাকে এবং অপর পক্ষে নিষ্কামতাবশতঃ চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া সহজভাবে জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান শাস্ত্র হইতে উপলব্ধ জ্ঞান নহে, ইহা নিজের উপলব্ধি-জন্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয়ে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ যতবড় কর্মীই হউক না কেন, বস্তুত নিজে কিছুই

করে না। সে স্পষ্ট দেখিতে পায় ত্রিগুণা-প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন হয়। সে নিজে শুধু অহংকার বিমূঢ় হইয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করে—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সবশঃ। অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতি মন্যতে।।' এই অবস্থাটি জ্ঞানের সূচনা করে—যখন নিজের অহংকার দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বুঝিতে পারা যায় অহংকারের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয় না, কর্ম সম্পন্ন হয় প্রকৃতির গুণের দ্বারা। নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা পুরুষ শুধু অভিমান করে আমি কর্ত্তা। বস্তুতঃ সে তখন বুঝিতে পারে সে কিছুই করে না এবং করিতে পারেও না।

এইভাবে মানুষ কর্মের স্তর হইতে জ্ঞানের স্তরে আপনা আপনি উন্নীত হয়। এই জ্ঞানের স্তরে কিছুকাল সঞ্চরণ করিতে করিতে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, প্রকৃতির দ্বারাই সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু পৃষ্ঠভূমি হইতে পরমাত্মার সঞ্চালন না থাকিলে শুধু প্রকৃতি নিজে নিজে কিছু করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতি জড়, তাই ভগবান বলিয়াছেন 'ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' আমিই প্রকৃতি সঞ্চালন করিয়া জীবের সকল কর্ম সম্পাদন করি, প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াতে আমিই অধিষ্ঠাতা।

এইবার সকল কর্মের পৃষ্ঠভাগে পরমাত্মার অঙ্গুলি সঞ্চালন দেখিতে পাওয়া গেল। এই সময় হইতেই মানুষের ভক্তির স্তর আরম্ভ হয়। পরমাত্মাকে দর্শন না করা পর্যন্ত ভক্তির উদয় হইতে পারে না। তাই মহাজনগণ বলেন প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় জ্ঞানের পর। ভগবানের সাক্ষাৎকার না হইলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় সম্ভবপর হয় না। এইবার মানুষ কর্মের পর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের পর ভক্তিতে অধিকারী হইল। পরমাত্মা আত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মাকে তত্তৎকার্যে মায়াশক্তি দ্বাবা নিয়োজিত করেন। তাই ভগবান বলেন 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' এইবার মানুষ নিজের হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল, সে বুঝিতে পারিল ঈশ্বর মায়ার অধিষ্ঠাতা, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থিত থাকিয়া মাযাদ্বারা প্রত্যেককে তত্তৎকর্মে নিয়োজিত করেন। মানুষের যাবতীয় কর্মের মূল কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহার—মানুষের নহে। তখন মানুষ সেই হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং এই প্রার্থনা করে যে তিনি যেন তাহাকে অসৎ হইতে সতে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে, মৃত্যু হইতে অমৃতে বহন করিয়া নিয়া যান। এই আত্মসমর্পণ শাস্ত্রে প্রপত্তিনামে অভিহিত হয়। ইহারই নামান্তর শরণাগতি। এই প্রকারে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নিজের অধিষ্ঠাতা হৃদয়স্থিত পরমপুরুষকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা। ইহাই মানুষের চরম কর্তব্য। ইহার পর মানুষের আর কিছু করিবার থাকে না। তখন একটি

মাত্র কর্তব্য তাহার থাকে তাহা এই হৃদয়স্থ প্রভুকে ধরিয়া থাকা—নিষ্ঠা। ইহাতেও মানুষ প্রথম প্রথম স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন মহাকারুণিক পরমপিতা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, 'মানুষ, এবাব তুমি শিশু হইয়া আমার কোলে বস, তোমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে। এবাব আমার কর্তব্য আবম্ভ হইল। এখন তুমি আমার আশ্রিত, তোমাকে শুদ্ধ করা, পূর্ণ করা, ইহা আমার কাজ, তোমার নহে'—মনুষ্য জীবনের ইহাই হইল দ্বিতীয়ার্দ্ধ। অর্থাৎ মনুষ্য যতক্ষণ অহংকার বিশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কর্মে ব্রতী হইয়া ভগবানকে পাওয়ার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই পথে চলিতে চলিতে কর্ম জ্ঞানে পরিণত হয়, জ্ঞান ভক্তিতে পরিণত হয়, —ভক্তি শরণাগতিতে সার্থকতা লাভ করে এবং ভগবান্ স্বয়ং মানুষের সকল ভার গ্রহণ করেন। ইহাই মানুষের জীবনের প্রথমার্দ্ধ। এখনও জীবনের পূর্ণতা বা fulfilment হয নাই,—এই পূর্ণতা শ্রীভগবানের হাতে। এই বাকী অর্দ্ধমার্গে প্রাকৃত মনুষ্যজীবন অপ্রাকৃত দিব্যজীবনে পরিণত হয়। এবং এই পরিণাম-ক্রিযার মূল শিল্পী স্বয়ং ভগবান্।

পঞ্চ কোশের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঊর্ধ্বগতিতে বিজ্ঞানময় কোশ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার পর আনন্দময় কোশ বাকী থাকে। আনন্দময় কোশ অমৃত স্বরূপ। মানুষ প্রপন্ন হওযার পবে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি কৃপারূপে অবতীর্ণ হইয়া, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্য দিয়া মানুষের পূর্ণ শোধন-ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই পূর্ণ শোধন ক্রিয়াতে সর্বপ্রথম মানুষ ভগবানের কৃপায কাল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইহারই নাম অমরত্ব লাভ। পঞ্চকোশের শোধন হইয়া গেলে এই কায়শুদ্ধি কায়াসিদ্ধিরূপে পবিণত হয়। তখন সেই সিদ্ধ-কায়া হইতে জরা-মৃত্যু সরিয়া যায় এবং অমরত্ব লাভ হয়।

কিন্তু ইহাতেও মানুষের পূর্ণত্বলাভ হয় না। ইহার পর পরম প্রেমের অভিব্যক্তি হয় যাহা সিদ্ধ পুরুষেরও অনধিগম্য। তখন মানুষ, মানুষ থাকিলেও ভগবৎ স্বরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহা তাহার নিত্য প্রেমময় ভাগবত জীবন। এইখানে গিয়াই মানুষের দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ হইল। প্রথমার্দ্ধে মানুষ কর্তা, ভগবান তাহাব অন্তরস্থিত সাক্ষিস্বরূপ, দ্বিতীযার্দ্ধে ভগবান কর্তা, এবং মানুষ তখন তাহার শ্রীচরণে অথবা কোলে বিশ্রাম করিতে করিতে তাঁহার অনন্তলীলা দর্শন করে। তারপর আর কেহই কর্তা থাকে না—নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই মানুষের জীবনের সার্থকতা এবং পূর্ণতা। মানুষ ভগবত্তা লাভ করিয়াও মানুষই থাকে, নতুবা তাঁহার লীলার পূর্ণতার আস্বাদন হইবে কি প্রকারে?

ইহার পরেও যে গতি আছে তাহা স্থিতিব সহিত অভিন্ন—তখন স্থিতিও গতি, গতিও স্থিতি, শিবই শক্তি, শক্তিই শিব—ইহাই অদ্বয়তত্ত্ব।" (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৬৪—৬৮)।

যুগল তত্ত্ব—বৈষ্ণবধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যুগল তত্ত্ব অন্যতম। পরব্রহ্মের অদ্বয় অবস্থা হইতে যুগল তত্ত্বে অবরোহের ক্রমটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে আঁকিয়া আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অঙ্কনটি এইরূপঃ
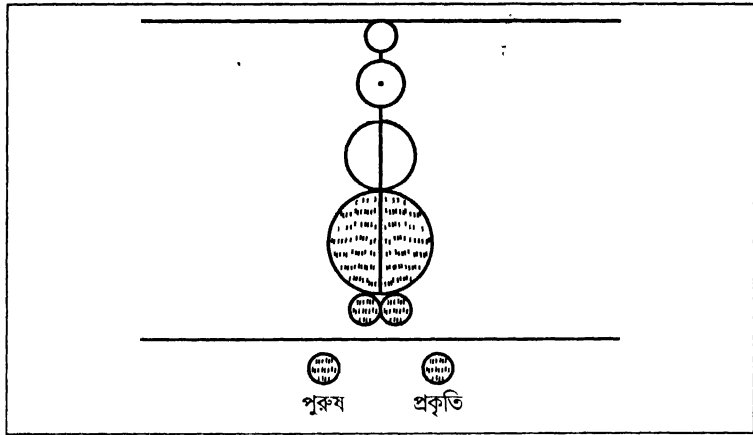
প্রথম স্তরে ব্রহ্ম বা ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় স্তরে তাঁর ঈক্ষণ। তৃতীয় স্তরে একের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি—একাংশে পুরুষ, অপরাংশে প্রকৃতি। চতুর্থ স্তরে একের মধ্যেই পুরুষাংশের বহু বিভাগ এবং প্রকৃত্যাংশের বহু বিভাগ। পঞ্চম স্তরে তাঁর দুইটি স্পষ্ট বিভাগ, কিন্তু পরস্পর সংলগ্ন। এই পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম হইতে পঞ্চম স্তর পর্যন্ত একের মধ্যেই দ্বিত্ব, কিন্তু পরস্পর পৃথক নহে। এখানে দুই সত্তা অবিনাভাবে যুক্ত (relative)। ইহার পরের অবস্থায় 'এক'-এর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে দুই বিচ্ছিন্ন পৃথক সত্তায় পরিণতি। একের এই দ্বিধা বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি সত্তায় পুরুষাংশে পুরুষ-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান এবং প্রকৃত্যাংশে প্রকৃতিভাব পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। এই পুরুষাংশ হইতে বিশ্বে অসংখ্য কোটি পুরুষের এবং প্রকৃত্যাংশে অসংখ্য কোটি প্রকৃতির বা নারীর উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষাংশ ভাগের অসংখ্য পুরুষদের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য আছে এবং অনুরূপভাবে প্রকৃত্যাংশ ভাগের নারীদের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। পুরুষাংশ-জাত এবম্প্রকার সমস্ত পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির বা নারীর ভাগও আছে, আবার প্রকৃত্যাংশ-জাত সমস্ত নারীদের মধ্যে পুরুষের ভাগ আছে। এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমস্ত পুরুষের মধ্যে পুরুষ-ভাব ও প্রকৃতি-ভাব উভয় ভাবেরই কম-বেশী হিসাবে তারতম্যের সমাবেশ আছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক নারীর মধ্যেও নারীভাব ও পুরুষভাবের কম-বেশী পবিমাণে যুগ্ম-সমাবেশ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেখানে

পুরুষের মধ্যে পুরুষ সত্তা পনেরো আনা, নারী-সত্তা এক আনা; কাহারও মধ্যে পুরুষ-সত্তা চৌদ্দ আনা, নারী সত্তা দুই আনা; এইরূপ ক্রমানুসারে পুরুষ-সত্তা ও নারী-সত্তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। এইরূপে হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে হইতে এমন পুরুষও আছে যাহার মধ্যে পুরুষ সত্তা এক আনা, নারী সত্তা পনেরো আনা। এইরূপ ভাবে নারীর মধ্যেও অনুরূপ নারী সত্তা ও পুরুষ সত্তার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে বিভাজিত পুরুষ ও নারী অগণিত ভাবে সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে। অতএব এই পৃথিবীতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তাহাদের নিজ নিজ সত্তায় অপূর্ণ। আধ্যাত্মিকতার সর্ব নিম্ন স্তরের পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পুরুষ ও নারীর মিলন প্রয়োজন। এই প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা হইল যোগ্যে যোগ্যে মিলন-সাধন। অর্থাৎ যে পুরুষের মধ্যে যতখানি নারীসত্তা ও পুরুষ সত্তার অভাব, সেই অভাব মিটাইবার জন্য সেই পরিমাণ নারী সত্তা ও পুরুষ সত্তা বিশিষ্ট নারীকে সেই পুরুষের সাথে মিলন-সাধনের প্রয়োজন। ঐরূপ পুরুষ ও নারীর মিলন-সাধনের দ্বারাই উভয়ের পূর্ণতাসাধন সম্ভবপর, অন্যথায় নহে। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। একটি টাকাকে ক্রমপর্যায়ে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছে। একটি ভাগে ক্রমানুসারে রাখা আছে ৯ আনা, ১০ আনা, ১১ আনা, ১২ আনা, ১৩ আনা, ১৪ আনা ও ১৫ আনা; অপর ভাগে ঐরূপ ক্রমানুসারে রাখা আছে ৭ আনা, ৬ আনা, ৫ আনা, ৪ আনা, ৩ আনা, ২ আনা ও ১ আনা। এখন ৯ আনা ভাগের সহিত ৭ আনা ভাগের মিল হইলেই টাকাটি পুরো হয়, কিন্তু অন্য ৬ আনা, ৫ আনা প্রভৃতি ভাগের যে কোন একটি ভাগ মিলাইলে পুরো হয় না---কিছু অভাব থাকিয়া যায়। সেইরূপ যে পুরুষের মধ্যে পুরুষ সত্তার ও প্রকৃতি সত্তার যে পরিমাণ অভাব আছে, সেই পরিমাণ পুরুষ সত্তা ও প্রকৃতি সত্তা বিশিষ্ট নারীর সঙ্গে পূর্ণতা-লাভের জন্য মিলন প্রয়োজন। অসংখ্য প্রকার ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও নারী সারা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। এই বিপুলা পৃথিবীতে উভয়ের আপেক্ষিক পরিমাণ সত্তাবিশিষ্ট পুরুষ ও নারীকে খুঁজিয়া মেলা অসাধ্য। তাই সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারীর অসমান মিল হয়। ফলে উভয়েই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। নারী ও পুরুষের মিলনের অর্থই হইল স্ব স্ব সত্তার আদান-প্রদানের দ্বারা পরস্পরের এক হইয়া যাওয়া—অর্থাৎ যুগল মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হওয়া। তখনই সত্যকারের নিত্য দিব্য প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ সম্ভব হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনাই প্রায় নাই। তবে পূর্ণতা লাভের উপায়? উপায়

আছে। উপায় না থাকিলে যুগল-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই কোন দিন হইত না, এমন কি উহার কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না।

প্রত্যেক মানব-মানবীর মধ্যে যে যে সত্ত্বার যে পরিমাণ অভাব আছে, সেই পরিমাণ সত্তা সারা বিশ্বে নানা জনের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। অপূর্ণ সত্তার অভাব পূরণ করিবার জন্য শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সদ্‌গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র দেন তাহা চুম্বক শক্তির (Magnetic power) কাজ করে। গুরু প্রদত্ত মন্ত্র ক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন শিষ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া করে। যে যার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে মন্ত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মন্ত্রশক্তির পরিধি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে উহার আকর্ষণ শক্তিও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে জপের দ্বারা মন্ত্রশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন এক সময় আসে যখন মন্ত্রশক্তি সারা বহির্বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করে বহির্বিশ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুরুষ ও প্রকৃতি সত্তাসমূহকে আকর্ষণ করিয়া শিষ্যের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট করিয়া শিষ্যের আপন অপূর্ণ সত্তার পূর্ণতা সাধন করে এবং শিষ্যের মধ্যে অপরের যে সমস্ত সত্তায় পূর্ণ থাকে তাহা শিষ্যের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া শিষ্যের আপন সত্তার পূর্ণতা সাধনের নিমিত্ত স্থান করিয়া দেয়। এইরূপে সাধকের মধ্যে যখন আপন সমগ্র সত্তা মিলিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে তখন এক বিস্ফোরণ ঘটে—এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় বিস্ফোরণ। সেই জ্যোতির্ময় ধামে সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে পায়। সেই ইষ্টদেবতা আর কেহ নয়, তাহারই পূর্ণ সত্তার প্রতিফলন (Projection)। তখন সমগ্র বিশ্বে সেই আমি আর তুমি, তুমি আর আমি—আর কেহ নাই। পার্থিব ব্যবহারের ন্যায় তখন তাহার সহিত মান, অভিমান, রাগ, প্রণয়, স্নেহ, ভালবাসা, বিরহ, মিলন প্রভৃতি প্রেমের যাবতীয় বৈচিত্র্যময় আনন্দময় আদান-প্রদান চলিতে থাকে। এ সমস্তই তখন অনুষ্ঠিত হয় চিন্ময়-জগতে। কারণ, মন্ত্র বা নাম-জপের দ্বারা আপন সত্তার পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের শরীরও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক অদ্বয় ব্রহ্ম বা ভগবানের দ্বিধা বিভক্তির ক্রম-ধারানুসারে যেখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া যায়। কারণ, এক এবং বহুর মধ্যবর্তী হইল দুই। অতএব দুই—এক এবং বহুর সংযোগ সেতু। ইহাই হইল যুগল তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যুগলতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। রাধা ও কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না, কিম্বা কৃষ্ণ এবং রাধার উল্লেখ কোন্ সময় হইতে পরিলক্ষিত হয় অথবা রাধা-কৃষ্ণ cult কোন্ শতাব্দী হইতে প্রচলিত—এই সমস্ত বিচার বাহ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব আধ্যাত্মিক

সত্য। উপরি উদ্ধৃত যুগল তত্ত্বের সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলার প্রকৃতি ও অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলে যুগল তত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংশয় থাকিবে না।

দুই প্রকার সাধনা—এক প্রকার সাধনার লক্ষ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। মানুষের চিৎ-স্বরূপ অচিৎ মায়া দ্বারা আবৃত। নিজ স্বরূপের অভাবকে অর্থাৎ মায়া-মলকে চিৎ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। এই পৃথকীকরণ হইবে কিসের দ্বারা? ইহা হইবে স্ব-চেতনার (self conscious) দ্বারা। তিনটি বস্তু-- প্রকাশ (চিৎ), অপ্রকাশ (অচিৎ) এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্বপ্রকাশ বা স্altবিবেক। প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে স্বপ্রকাশ দ্বারা। স্বপ্রকাশের সহায়তায় যখন প্রকাশকে অপ্রকাশ হইতে পৃথক্ করা যাইবে, তখনই অভাব অর্থাৎ ময়লা দূরীভূত হইবে। কর্দমাক্ত লৌহকে চুম্বক আকর্ষণ করিতে পারে না, কর্দমশূন্য হইলে চুম্বক যেমন সহজে উহাকে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ মায়ামল মুক্ত হইলেই চিৎ বা চেতন সত্তা মহা চিৎ সত্তার আকর্ষণে তাহাতে লীন হইয়া যায়। ইহা বিবেকের পথ, শুদ্ধ জ্ঞানমার্গে যোগ-সাধনার পথ। স্ববিবেক বা স্বপ্রকাশের দ্বারা বিমুক্ত, উন্মোচিত জাগ্রত অণুচিৎ-এর মহাচিৎ-এর মধ্যে লয়কে মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ, কৈবল্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের সাধনা হইল ভাব-সাধনা। ইহা হৃদয়োদ্ভূত আবেগ ব্যাকুলতাময় ক্রন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-ব্যাকুলতা যার যত গভীর, উচ্ছ্বসিত ও আত্মনিবিষ্ট, আধ্যাত্মিক ভাব-সাধনার স্তরে সে ততই উন্নত। এই সাধন-পথের তিনটি অঙ্গ—প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। প্রবর্তক অবস্থায় নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয়; সাধক অবস্থায় ভাবাশ্রয়; সিদ্ধ অবস্থায় ভাবের পরিপক্ব প্রেমাশ্রয়। নামাশ্রয়ে চিত্ত-শুদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ মায়ার আবরণ-রূপ ময়লা দূরীভূত হইয়া নির্মল হয়। এরূপ শুচি-শুভ্র অবস্থায় সাধক শিশুত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ শিশুর ন্যায় সারল্যে ইষ্টদেবতায় পরম নির্ভরতা আসে। অবোধ শিশুর ন্যায় সাধক তখন তাঁর অন্তর-দেবতাকে কি ভাবে ডাকিতে হয়, কি ভাবে জপ-তপ করিতে হয়, কিছুই জানে না। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অন্তর দেবতাকে ব্যাকুলভাবে হৃদয়-বেদনা জানায়। অন্তর-মথিত ব্যাকুলতায় যখন সাধক তার নিরুচ্চার ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিতে থাকে তখন তার আত্মিক অভিব্যাক্ত অভিপ্রায় অনুসারে ভগবান গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন। ইহাই হইল প্রকৃত গুরুবাদ। আমরা ভগবান হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। আমাদের ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। ভগবানের নিকট উপনীত হইব

কি প্রকারে? শুধুমাত্র সাধকের ভগবানের সমীপবর্তী হইবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলেই চলিবে না, ভগবানের অনুগ্রহও (grace) প্রয়োজন। ভগবান করুণাময়। তাই তিনি করুণারজ্জু ভক্তের নিকট নিক্ষেপ করেন। তিনি স্বয়ং গুরুরূপে আসিয়া সেই রজ্জু ধরাইয়া দেন। ভক্ত সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে এইরূপ দশাকে 'প্রথম কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

নামাশ্রয়ের দ্বারা চিত্ত পবিশুদ্ধ হইলে সাধক ভাবাশ্রয়ে উপনীত হয়। এই সময়ে সাধক চিত্তে অভূতপূর্ব আলো দর্শন করে। সেই আলোয় সে নিজেকেও দর্শন করে। সেই চিত্তালোকে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অন্তরাকাশে পরিদৃষ্ট হয়, অথচ সেখানে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, গ্রহ-তারকাও নাই। ইহা চিন্ময় আলোক। সেখানে যাবতীয় দৃষ্ট বস্তু চিন্ময়। ইহাই চিন্ময় বৃন্দাবন। এখানে থাকিয়া ভক্ত বৃন্দাবনের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে—ইহা ভাব-সত্য। এরূপ দশাকে বলা হয় 'তারুণ্যামৃত ধাবায় স্নান'।

নামাশ্রয়ের দ্বারা অ-ভাব দূরীভূত হইলে অর্থাৎ মালিন্যের বিঘ্ন অপসারিত হইলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ভক্তের অন্তর্জীবন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা অন্ন গ্রহণ করি। সেই অন্ন প্রাকৃতিক নিয়মে হজম হইয়া মেদ-মজ্জা-রক্তে পরিণত হইয়া স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য-লাবণ্য বৃদ্ধি করে। হজম শক্তির কর্তৃত্ব আমাদের নাই, আমরা কেবল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিই মাত্র। প্রকৃতির স্বভাবদত্ত নিয়মে পরিপাক হয়। সেইরূপ ভক্ত নাম গ্রহণের দ্বারা পথ পরিষ্কার করে মাত্র। তখন প্রকৃতির আপন স্বভাবের প্রক্রিয়ায় ভক্তদেহ ভাবদেহে পরিণত হয়। মাযা প্রভাবিত পার্থিব জীব এই প্রকৃত সত্য চিন্তা করিতে পারে না, অবাস্তব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয় অথবা মালিন্য হৃদয়ে বিকৃত রুচি অনুসারে কল্পনা করে। কিন্তু সহজিয়া ভক্তের নিকট ইহাই প্রত্যক্ষ সত্য। ভাব-সাধনার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ভক্তগণ ভগবানকে ও তাঁহার লীলা-মাধুর্যকে বিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও আস্বাদন করে।

ভাবের ঘনীভূত অবস্থাতে সাধক সিদ্ধ হইয়া প্রেমাশ্রয় গ্রহণ করে। ভাবের মধ্যে প্রেম অঙ্কুর অবস্থায থাকে। ভাব পরিপক্ক হইলেই প্রেমের উদয় হয়। ফুলের যখন কুঁড়ি অবস্থা তখন সৌগন্ধ কুঁড়ির মধ্যে আবৃত থাকে, প্রস্ফুটিত হইলেই উহার সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ প্রকাশিত হয়; সেইরূপ ভাবের মধ্যে অস্ফুট প্রেম ভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে ফুলের ন্যায় সমস্ত মাধুর্য লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে। ভক্ত মহাভাবে সমাহিত অবস্থায় অনির্বচনীয় প্রেম-মাধুর্য আস্বাদন করিতে থাকে। সাধকের এই ভাবের চরম অবস্থায় উপনীত হওয়াকেই পরম পুরুষার্থ বলে। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এইরূপ অবস্থাকে 'লাবণ্যামৃত ধারায় স্নান'

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা শুষ্ক জ্ঞানযোগীর সিদ্ধ অবস্থার self negation নহে। ইহা তাহা হইতে পৃথক। প্রেমমার্গের সাধকগণ বলেন, যদি অণু চৈতন্য মহা চিৎ সত্তায় লীন হইয়া যায় তবে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রহিল কোথায়? তাঁহারা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ভগবানের সহিত মিলিত হইতে চান। তা সে ভগবান God the Father, God the Mother বা God the Child—যাই হোক।

প্রেমাশ্রয়ী প্রেমসিদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া বা ভগবানের ক্রোড়ে বা প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না; সে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। তখন ভক্তের আগ্রহে পরস্পরের দুর্নিবার আকর্ষণে ভক্তের প্রেমময় দেহ দ্রব হইতে থাকে এবং ভগবৎ-তনুও দ্রব হইতে থাকে—ইহাকে 'দ্রুতি' বলে। উভয়ের বিগলিত সত্তা এক সত্তায় মিলিয়া যায়। আবার এই এক সত্তা আনন্দ-রস আস্বাদনের জন্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া লীলা করে। উপনিষদে আছে ব্রহ্ম যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থায় ছিলেন, তখন 'নৈব রেমে' অর্থাৎ নিজের আনন্দকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে আশ্রয় ও বিষয়ের ভিন্নভাব প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি 'দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ'—নিজেকে নারী ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহা হইতে বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি হইল। তিনিই একমাত্র পুরুষ এবং ভক্ত হইল নারী। ভক্ত হইলেন তাঁহার প্রেমের আশ্রয় এবং তিনি হইলেন বিষয়। তিনি প্রেমের বিষয়ীভূত হইয়া ভক্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, ভক্ত আত্ম-বিলুপ্ত প্রেমে নিমজ্জিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি চুম্বকের ন্যায় আকর্ষিত হইতেছেন। পরস্পরের প্রেমাকর্ষণের বিচিত্র লীলায় রসস্বরূপ ভগবান আপন আনন্দ-রস পান করিতেছেন, আর ভক্ত ভগবানের আনন্দতৃপ্ত প্রফুল্ল আনন সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া অপার মাধুর্য-রস আস্বাদন করিয়া আপন অজ্ঞাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। সহজিয়া ধর্মে প্রতিটি ভক্ত জীবই নারী। সুতরাং সহজিয়া ধর্মে মাধুর্যভাবের সাধনা ছাড়া অন্যান্য ভাবের সাধনার স্থান নাই। মীরাবাঈ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কথিত আছে সাধিকা মীরাবাঈ রাজস্থান হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শনপ্রার্থী হইলেন। স্ত্রীলোক বলিয়া রূপ গোস্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলে মীরাবাঈ বলিয়া পাঠান, 'বিশ্বে একমাত্র পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ, আর সব প্রকৃতি। সুতরাং রূপ গোস্বামীর পুরুষাভিমান আসে কোথা হইতে? তাহলে কি বিশ্বে দ্বিতীয় পুরুষেরও অস্তিত্ব আছে?' ইহা শুনিয়া রূপ গোস্বামী নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং মীরাবাঈ যে একজন উচ্চ স্তরের ভক্ত-সাধিকা তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতি-তত্ত্বের রহস্য কি? ইহার রহস্য নিহিত রহিয়াছে

ভগবান ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্যে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান ; অতএব তিনি হইলেন অংশী। আব ভগবানের তটস্থ শক্তি বিধায় জীব হইল অংশ। অংশ ও অংশী সম্পর্কের ফলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইলেন একমাত্র পুরুষ এবং তাঁহার অংশজাত সব জীব তাঁহার অধীন, সুতরাং প্রকৃতি। অতএব তটস্থ জীবমাত্রই প্রকৃতি।

বৈষ্ণব সহজিয়া সিদ্ধান্ত

সহজ ভাব—-সহজ ভাবটা কি? জীবের স্বভাব স্ফুরণের অবস্থাই জীবের সহজ অবস্থা বা সহজ ভাব। স্বভাব অর্থে স্ব-ভাব (আপন প্রকৃতি বা nature)। পৃথিবীর যাবতীয় জীব আপন আপন স্বভাবে পৃথক। কাহারো সহিত কাহারো মিল বা সমতা নাই। বিশ্বলোকের মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনই এক জীবের সহিত অপর জীবের অসমতার কারণ। পরম ব্রহ্মের সাম্যাবস্থা স্পন্দনহীন। সৃষ্টি-ইচ্ছায় সাম্য হইতে অসাম্য অবস্থায় উপনীত হইবার কালে তাঁহার মধ্যে স্পন্দনের প্রবাহ উত্থিত হইল। স্পন্দনের ধারা হইতে বিশ্ব-সৃষ্টি ও জীব-সৃষ্টি। বিশ্ব-সৃষ্টির ক্ষণ হইতে নিমিষে নিমিষে বিশ্বপ্রকৃতি আবর্তিত ও পরিবর্তিত হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে জীব-উৎপত্তির ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছে। প্রতিটি জীবের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তির ক্ষণে সদা পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রকৃতির সেই ক্ষণটিতে যে পরিবেশ থাকে, সেই পরিবেশের সম্পূর্ণ প্রভাব জীবের সেই আদি জন্ম-লগ্নে তাহার উপর পড়ে এবং তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি (nature) সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়—তাহার জীবন-ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। ইহাকেই লৌকিক অর্থে বলা হয় বিধি-লিপি। এইরূপে প্রতিটি জীবের আদি জন্ম-লগ্নে অবিরত পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রকৃতির প্রভাব পড়ায় প্রতিটি জীব স্বভাব-বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে পরস্পর হইতে ভিন্ন। কিন্তু আদি সৃষ্টিকাল হইতে জীব মায়ার বশীভূত হইয়া তাহার আপন স্বভাব-ধর্মকে বিস্মৃত হয। মায়ার আবরণে জীবের স্বভাব-ধর্ম আবৃত হইলে জীব মোহবশতঃ যে সমস্ত কার্য করে সেই কর্ম-বন্ধনের মধ্যে জড়িত হইয়া সে জন্ম-জন্মান্তরের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কর্মফল ভোগ করিতে থাকে। মোহ-পাশবদ্ধ এবং নিজ কর্মজালে জড়িত জীবের অন্তরে যে ইচ্ছা জাগে বা যে ইচ্ছা জাগে না—উভয়ই অসৎ। গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ চালনা করিয়া পাণ্ডব ও কৌরব সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলে জ্ঞাতিবর্গকে দেখিয়া অর্জুনের মনে বৈক্লব্য উপস্থিত হওয়ায় জ্ঞাতিবর্গকে নিধন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ

পূর্ব হইতেই নিহত হইয়া রহিয়াছে, উহাই তাহাদের বিধিলিপি। আর এই কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্জুন তাঁহার আদি জন্মলগ্নে সুনির্দিষ্ট হইয়া আছেন। এখন তাঁহার মধ্যে যে অনিচ্ছাব প্রকাশ হইয়াছে, ইহা মাযার দ্বাবা আবৃত তাঁহার স্বভাবের বিলুপ্তির ফলেই এরূপ হইযাছে। এ অনিচ্ছা সত্য নয, ইহা অসৎ।

বহু জন্ম সাধনার বলে মায়ার আবরণ স্খলিত হইয়া জীব মাযামলমুক্ত হইলে ভূত-তন্মাত্রে গঠিত শরীর চিন্ময়ত্বে পরিণত হয এবং জীব পুনরায আপন স্বভাবে ফিরিয়া আসে। আপন স্বভাব ফিরিয়া পাইলেই জীব স্বাভাবিক হয় অর্থাৎ সহজ হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সহজ কথাটি হইল স্ব-ভাবে আনন্দের সম্ভোগ। এই আনন্দের স্বরূপ কি? বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইদমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং"। অর্থাৎ পূর্বে ব্রহ্ম ভেদশূন্য কেবল এক অখণ্ড 'সৎ' ও 'চিৎ' রূপেই বিদ্যমান ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আনন্দময় ছিলেন, কিন্তু আনন্দের সম্ভোগ ছিল না। কারণ একাকী আনন্দের আস্বাদন হয় না। সেইজন্য তিনি দ্বিতীয় হইতে অভিলাষ করিলেন। ইহাই ক্ষোভ। এই ক্ষোভের ফলে তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইলেনঃ এক ভাগ হইল পতি, অপর ভাগ পত্নী; অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতিতে বা শিব ও শক্তিতে পরিণত হইলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, তিনি পূর্বে ছিলেন 'সৎ' ও 'চিৎ' এবং আনন্দ সম্ভোগের জন্য তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উভয় ভাগের মধ্যে অপূর্ণতার সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণতার জন্য এক ভাগ অপর ভাগের অভাব বোধ করিতে লাগিল। এই অভাব বোধ হইতেই মিলনানন্দের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। অপরদিকে দ্বিধা বিভক্ত হইতেই polarisation-এর সূত্রপাত হইল। North pole ও South pole-এর সৃষ্টি। North pole এ পুরুষ এবং South pole এ প্রকৃতি—'অহং' ও 'ইদং'এর দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ। উভয়ে উভয়ের প্রতি মিলনোন্মুখ।

যাহা বলিতেছিলাম, অভাব বোধ হইতেই মিলনানন্দের আকাঙ্ক্ষা। তৃষ্ণা জাগিলে তবে তো জলপান করিয়া আনন্দ লাভ! তৃষ্ণাই যেখানে নাই সেখানে আনন্দের আস্বাদনের অবকাশ কোথায়! ব্রহ্ম যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থায় ছিলেন সেখানে তিনি পূর্ণ; তাঁহার কোন অভাব বোধ বা বেদনা বোধই নাই। সুতরাং তিনি যে আনন্দস্বরূপ সে-বোধই তাঁহার ছিল না। বেদান্তের মতে ব্রহ্ম 'সচ্চিদানন্দ' স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দের একটা compact body। স্বরূপে এই সচ্চিদানন্দময় হইয়া যাওয়াই বৈদান্তিক সাধনার চরম লক্ষ্য

ও প্রাপ্তি। বৈদান্তিকের নিকট উহাই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু সহজিয়া তথা শৈব ও শাক্ত মতে সৎ-চিৎ ও আনন্দ এই তিনের সম্মিলনই ব্রহ্ম। অতএব ইহারা এক ব্রহ্মেরই মধ্যে তিনটি ক্রম। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম 'সৎ' ও 'চিৎ'—এ পর্যন্ত ব্রহ্মের অন্তর্মুখী ভাব অর্থাৎ নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ। ইহার পরের ক্রম 'আনন্দ'। এখানে তাঁহার বহির্মুখ ভাব। এ-অবস্থায় তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে অপূর্ণতার সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণতা-লাভের জন্য উভয়ের মধ্যে সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক। এই আকাঙ্ক্ষা বা পূর্ণানন্দের অভাব বোধ হইতেই এবং এই অভাব বা বিচ্ছেদের শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্যই নিত্যধামে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ নিত্য লীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই লীলাই চিদানন্দের সম্ভোগ। বেদান্তের সচ্চিদানন্দের আদর্শে অপার .আনন্দ সত্তার মধ্যে নিজ সত্তার বিলোপ বা মগ্নতাই লক্ষ্য। আনন্দময়তার ফলে সেখানে আনন্দের অনুভব আছে বটে, কিন্তু আনন্দের চমৎকারিত্বের আস্বাদন নাই। আনন্দ সম্ভোগের চরম পরিপূর্ণতা লাভ অর্থাৎ মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধার অবস্থা প্রাপ্তিই জীবের সহজ অবস্থা বা স্বভাব-প্রাপ্তি বুঝায়—ইহাই সহজিয়া মত। এই মতে মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধা অধ্যাত্মকোটির সর্বোত্তম অবস্থা যাহা একমাত্র রসসিদ্ধ জীবেরই অধিগম্য। ইহারও অতীত অবস্থা হইল উভয়ের সংযোগে 'এক' হইয়া যাওয়া। ইহাই ভক্তযোগীর প্রকৃত চিন্ময় জাগরণ। এখানে একই এক, দুই নাই বা দুই-এর আভাসও নাই। এই বিষয়টিকে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজজী একটি পত্রে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

'ভগবৎ তত্ত্ব বস্তুতঃ রস-স্বরূপ। কি ভাবে এই রস উদিত হয় এবং আস্বাদিত হয তাহাই জানিবাব বিষয। রসের বিকাশ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জীব ইহাকে ধরিয়া ইহারই প্রভাবে রসতত্ত্বে প্রবেশ করে। সৃষ্টির মূলে যাহা আছে তাহাকে অব্যক্ত বলা যাইতে পারে। অব্যক্ত হইতে প্রথম যে ধারাটি নির্গত হয় তাহাই সত্তার ধারা ইহা সৎ হইয়াও অসৎ, যেহেতু তখনও সৃষ্টির উন্মেষ হয় নাই। এই অসৎ হইতে একটি ধাবা সৎ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সৎকে চিহ্ন দিতেছে। অর্থাৎ সৎ তখন সৎরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। ইহাকেই চিৎ বলে। অর্থাৎ স্বপ্রকাশ সৎ-ই চিৎ। চিৎ হইতে একটি ধারা বহির্মুখে অর্থাৎ অচিতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে চিৎ অবস্থায় সৎ ভাবটি স্বপ্রকাশ ছিল, কিন্তু চিৎ ভাবটি প্রকাশমান ছিল না। এখন অচিৎ হইতে একটি ধারা উলটো দিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়া সৎকে স্পর্শ করাতে সৎ-এর মধ্যে অপ্রকাশ চিৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়। ইহারই নাম আনন্দ। যাহাকে আমরা ভগবান্ বলি তাহা বস্তুতঃ এই স্বপ্রকাশ

আনন্দেরই রসময় মূর্তি। বস্তুতঃ ব্রহ্মভাব এবং পরমাত্মভাবে স্বপ্রকাশ আনন্দ আছে। কিন্তু ঐ আনন্দ ব্রহ্মানুভূতি ও পরমাত্মানুভূতিতে রসরূপে আস্বাদিত হয় না। ভগবৎ অনুভূতিই চরম অবস্থায় পূর্ণ রসানুভূতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার কারণ এই স্বপ্রকাশ আনন্দ যতক্ষণ পর্যন্ত খেলিতে না পায় ততক্ষণ আপনাতে আপনি স্তব্ধভাবে বর্তমান থাকে। খেলিতে পাইলেই উহা নিজেই অনন্ত বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া অনন্ত প্রকার রসের আস্বাদনের সূত্রপাত করে। স্বপ্রকাশ আনন্দে এই যে লীলার বা ক্রীড়ার উন্মুখতা, ইহা হইতেই ঐ আনন্দ নিজে যেমন আছে তেমন অবস্থায় থাকিয়াও নিজে হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্বপ্রকাশ আনন্দটি একটি অভাবের আবরণে ঢাকা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আনন্দটি থাকে 'পাই' হইয়া এবং যেটি বাহির হয় সেটি থাকে 'চাই' হইয়া। এই যে বাহির হওয়া অভাবের আবরণে ঢাকা পড়া আনন্দের 'চাই চাই' ভাব, ইহারই নাম রতি বা ভাব। ইহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু। কারণ এই নিত্য সিদ্ধ রতি বা ভাব ফিরিয়া গিয়া 'পাই'কে আস্বাদনরূপে পরিণত করিবে। এই 'চাই' যতক্ষণ 'চাই' থাকে ততক্ষণ উহা রতি পদবাচ্য। ইহা অত্যন্ত তীব্র হইলে 'পাই'কে ফুটাইয়া তুলে। এই যে 'পাই'কে ফুটাইয়া তোলা ইহারই নাম ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। এবং এই যে 'চাই'-এর তীব্রতা ইহারই নাম প্রেম। অর্থাৎ রতির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। প্রেমের তরল অবস্থাই রতি। রতি অবস্থায় ভগবৎ দর্শন হয় না। তখন ভগবানের অভাববোধই তীব্র থাকে। প্রেম অবস্থায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে অভাব স্ব-ভাবে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায়। যতক্ষণ প্রেমের উদয় না হয় ততক্ষণ বিলাস কোথায়? বিলাসই লীলা। অতএব লীলারম্ভের পূর্বে ভগবৎ-প্রাপ্তি অত্যাবশ্যক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রেমই একমাত্র উপায়। প্রেম রতিরই পরিপক্ক অবস্থা। রতি অনাদিকাল হইতে নিত্যধামে স্বপ্রকাশ আনন্দ হইতে 'চাই'রূপে নিঃসৃত হইতেছে। উদ্দেশ্য পরিণত অবস্থায় রসের আস্বাদন। সাধনার দ্বারা এই 'চাই'কে পাওয়া যায় না। তবে জীবের স্বরূপ দেহের অন্তঃস্থলে নিত্যসিদ্ধরূপে 'চাই' বর্তমান আছে। সাধনা উহাকেই ফুটাইয়া তোলে। মায়ার আবরণে 'চাই' আবৃত থাকে। সাধনা শুধু ঐ আবরণটিকে সরাইয়া দেয়। কখনও কখনও ভগবৎ কৃপা হইতেও সাক্ষাৎভাবে এই আবরণটি সরিয়া যায় বলিয়া জীব হৃদয়ে 'চাই'-এর উদয় হয়। যে কোন ভাবেই হউক নিজের অন্তর্নিহিত 'চাই'কে (স্ব-ভাবকে) না ফুটাইতে পারিলে 'পাই'-এর সন্ধান পাওয়া যায় না। 'পাই'-এর সঙ্গে যোগ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বিলাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?' (দ্রঃ পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পত্র সংখ্যা—১৯)।

আনন্দ—ব্রহ্মের তিনটি অবস্থা—(১) 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ অদ্বয় অবস্থায় শুধুই সৎ। (২) 'একাকী নৈব রেমে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ'—অদ্বয় অবস্থায় নিজের আনন্দস্বরূপকে জানা যায় না। আনন্দ আস্বাদ করিতে দ্বিতীয়ের প্রয়োজন অর্থাৎ আধার ও আধেয় উভয়ের আবশ্যক। সুতরাং তিনি নিজেকে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ এবং বামাঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্টি করিলেন। (৩) আবার এমন একটা অবস্থা আছে যেখানে একও নেই, দুইও নেই; সৎও নেই, আনন্দও নেই; সমস্ত কিছুর অতীত এক অনন্ত জ্যোতির্ময় চৈতন্যলোক যেন আপনাতে আপনি মগ্ন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের একটি শ্লোকে আছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি (৩/৬)। অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম এবং আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। তিনি নিজ আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত দ্বিধা বিভক্ত হইলেন এবং এই আনন্দ হইতেই জীব-জগতের উৎপত্তি। সুতরাং আনন্দের মধ্যে জীবের জন্ম। আনন্দই জীবের স্বভাব। মায়ার আবরণে আবৃত থাকায় জীব আপন স্বভাব বিস্মৃত। এই স্বভাব বা আনন্দকে ফিরিয়া পাওয়াই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। মায়ায় প্রলুব্ধ হওয়ায জীব কলুষিত অর্থাৎ তাহার চৈতন্য মায়ামল যুক্ত হওয়ায় সে নিত্য চিন্ময় আনন্দধাম হইতে বিচ্যুত। আবার সাধনার দ্বারা জীব মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত নির্মল চিন্ময় ভাবদেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দধামে প্রবেশাধিকার লাভ করে। ইহাই জীবের সহজ অবস্থা বা স্বভাব প্রাপ্তি বুঝায়। অতএব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইযা আনন্দের মধ্যে পুনর্গমন করাই জীব-জন্মের পরম সার্থকতা।

প্রেমভক্তি—প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির একটি বিশেষবৃত্তি। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ হইতে জাত সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী শক্তির মিলিত রূপই ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। আত্মার সম্পর্কে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সৃষ্টির পূর্বে জীবাত্মা ব্রহ্মের মধ্যে এক হইয়া ছিল। সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্ম হইতে অণুরূপে জীবাত্মার প্রক্ষেপ। অতএব জীবাত্মা সৎ এবং অনাদি—জন্মমৃত্যুর অতীত। আবার জীব ব্রহ্মের চিদংশ। অতএব জীব চৈতন্যস্বরূপ। মায়াব আবরণে চৈতন্য আবৃত থাকায় জীব আত্মবিস্মৃত। সাধনার দ্বারা মায়ার আবরণ স্খলিত হইলে জীবের মধ্যে চৈতন্য জাগিয়া উঠে। তখন মায়ামলমুক্ত অণু-চিৎ চুম্বকের ন্যায় মহা-চিতের আকর্ষণ অনুভব করে এবং কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবকে কখন ব্রহ্মের আনন্দাংশ বলা হয় না। জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সচ্চিদ্ গুণ থাকিলেও আনন্দ গুণের অভাব। কিন্তু যেহেতু জীব চৈতন্যময়, জীবের সেইহেতু ব্রহ্মানন্দ

অনুভব করিবার শক্তি আছে। ব্রহ্মের চিন্ময় আনন্দ জীবের অণু চেতনায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে। জীব-চেতনা (consciousness) দর্পণ স্বরূপ। সাধনার দ্বারা উহা যতই মার্জিত হইয়া উজ্জ্বল হইবে, ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ততই জীবের চৈতন্যগ্রাহ্য হইবে। চৈতন্যগ্রাহ্য হইলেই আনন্দের আস্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইবে। অতএব বুঝা যায়, জীবের ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকার আছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেও বিনা চেষ্টায় কোন জিনিস পাওয়া যায় না। জীবকে আনন্দ অর্জন করিতে হইবে। অধিকার যখন আছে, তখন অর্জন করিবার পন্থাও আছে। সেই পন্থা হইল প্রেমভক্তি। ব্রহ্মের আনন্দাংশে হ্লাদিনী-শক্তি। হ্লাদিনীর সারভূত হইল মহাভাব। শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিনী। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি। রাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত যুগল-বিলাস হইতে চিন্ময় আনন্দের বৈচিত্র্যের ধারা নিত্যকাল ধরিয়া নিত্য নব রূপে প্রবাহিত হইতেছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার রাগাত্মিকা প্রেম। রাধা নিত্য, কৃষ্ণ নিত্য; অতএব প্রেমভক্তিও নিত্য সিদ্ধ। জীব রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা হইয়া আনন্দলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ ও নিত্যানন্দের সম্ভোগ করিবার অধিকারী হয়।

পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে চৈতন্যোদয় বা অধ্যাত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলেই তবে প্রকৃত রাগভক্তির বা প্রেমভক্তির উদয় হয়। এইরূপ রাগমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যাহা তাঁহার পত্রাবলী ১ম খণ্ডের ২৫ সংখ্যক পত্রে বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল—

'জ্ঞানের উদয় হইলে জগতে একমাত্র আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না। এক এবং অখণ্ড চৈতন্যরূপে আত্মাই তখন বিদ্যমান থাকেন। তখন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তু থাকেই না। তাছাড়া এমন কি দ্বিতীয় ভাবও থাকে না। এই অবস্থা ভাবাতীত অর্থাৎ আমি ও তুমি ভাবের বা দ্বৈতভাবের অতীত। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিণতিতে এই অবস্থাতে স্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ভগবানের অথবা ভগবৎ ভক্তের অনুগ্রহ বশতঃ অখণ্ড চৈতন্যরূপ আত্মাতে ভক্তির বীজ বপন হয় অর্থাৎ ভক্তিভাবের সঞ্চার হয় তখন এই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা আপনাতে আপনি দুলিতে থাকে। ইহাই ভাবাবেশ, যাহার পূর্ণ উৎকর্ষ হইতে মহাভাবের বিকাশ পর্যন্ত হইতে পারে। এই আন্দোলনের ফলে যে ভাবের উদয় হয় তাহা ভগবৎ কৃপালব্ধ ভক্তিবীজের অঙ্কুর। এই সময় ভাবাতীত সত্তা ভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে কোন প্রকার খণ্ড ভাবে অর্থাৎ মাতৃভাব বা পিতৃভাব বা প্রভুভাব বা সখ্যভাব বা বাৎসল্যভাব বা মাধুর্যভাবে প্রকাশিত হইয়া সর্বপ্রথম একটি অখণ্ডভাব উত্থিত হয়। এই অখণ্ড ভাব আশ্রয় এবং বিষয়রূপে দুইটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এই ভাবের যে আশ্রয় সে আমি এবং এই ভাবের যে বিষয় সে তুমি। পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে যে অখণ্ড চৈতন্যরূপ মহাসত্তাতে পূর্বে আমি এবং তুমি কোন ভাবই ছিল না। সেই মহাসত্তাই ভগবৎ কৃপার প্রভাবে ভাবাবেশের ফলে আমি এবং তুমি রূপে পরস্পর অভিমুখ হইয়া প্রকটিত হয়। আমি = ভাবের আশ্রয় অর্থাৎ ভক্ত, তুমি = ভাবের বিষয়, পাত্র অর্থাৎ ইষ্ট।

সর্বপ্রথম এই ইষ্ট, ভাবের বিষয়রূপে এক হইযাও অনন্তরূপে প্রতিভাসমান হন। এই অখণ্ড ব্যাপক ইষ্টভাবই তুমি পদের বাচ্যার্থ। ইনি এক হইয়াও অনন্ত, এইজন্যই মাতৃভাব পিতৃভাব সখ্যভাব গুরুভাব প্রভুভাব প্রভৃতি যাবতীয ভাব এই এক বিরাট ভাবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। জগতে যত প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর সকল ভাবেতে সমন্বয় এই তুমিতেই হইয়া থাকে।'

কবিরাজজীর উক্ত বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে তিনি যে ভক্তির কথা বলিযাছেন তাহা অবিমিশ্রা শুদ্ধা ভক্তি নহে, ইহাতে জ্ঞানের মিশ্রণ রহিয়াছে। এই জ্ঞানমিশ্রা উত্তম ভক্তিই 'পরাভক্তি'র নামান্তর। ভক্তি দুই প্রকারঃ অপরা ও পরা। পবাভক্তির উদয ভক্তযোগীর কোন্ অবস্থায হয় এবং উহার প্রভাবে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ ও শক্তি কিরূপে সেই পরমভক্তের গোচরে আসে তাহাই পত্রাবলীর ১ম খণ্ডেব ৪৯ নম্বর পত্রে কবিরাজজী গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটির অবলম্বনে আলোচনা করিয়াছেন—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮/৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮/৫৫

এই শ্লোক দুইটিতে ব্রহ্মাবস্থা হইতে পরমপদ পর্যন্ত সমগ্র ক্রমটি সংক্ষেপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে ব্রহ্মাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হওযা যায় না। ভেদজ্ঞান মায়ার কার্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়া অতিক্রম না করা পর্যন্ত পরমপদের মার্গে পদার্পণ করা যায় না। শোক, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্য দর্শন, এই সকল মায়ার কার্য। যতক্ষণ মায়া বিদ্যমান রহিযাছে ততক্ষণ জীব যতই আনন্দের অধিকারী হউক্ না কেন, কোন না কোন প্রকারে দুঃখ হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির তিনটি গুণ পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিযা যেখানে সত্ত্বগুণেব কার্য আনন্দ আছে, সেখানে অল্পমাত্রায় হইলেও রজোগুণের কার্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ত্রিগুণের অতীত না হওয়া পর্যন্ত শোক অথবা দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কোন আশা নাই। ঠিক এই প্রকারে প্রাকৃতিক বস্তুর অভাববোধ

অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্যেই হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্য হইতে উৎপন্নই হয় না। সুতরাং যতক্ষণ মায়া ভেদ করিয়া ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি না হইয়াছে ততক্ষণ প্রাকৃতিক অভাব বিদ্যমান থাকিবেই। এই অভাব বোধই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আপ্তকাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হয় বলিয়া সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুতে বৈষম্য প্রতীত হয়। শুধু বস্তুতে নহে, যে বস্তুর দ্রষ্টা তাতেও বৈষম্য লক্ষিত হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতের মায়াভিভূত জীবের মধ্যে সর্বভূতে সাম্য দর্শন এবং ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে মায়া ভেদ করার পর সাধকের যে অবস্থা উদিত হয় তাহা ব্রহ্মভাব। এই অবস্থায় শোক দুঃখ থাকে না, জাগতিক অভাববোধ থাকে না বলিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ ইহা আপ্তকাম অবস্থা। সর্বভূতে সাম্যদর্শন বা সাম্যজ্ঞানের প্রভাবে সর্বভূতে বৈষম্য বোধ নিবৃত্ত হইয়া সাম্যরূপে স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। যে দিকে দৃষ্টি পতিত হয় সেদিকেই এক অখণ্ড নারায়ণ সত্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। 'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু' বলিয়া এই স্থিতিই নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা সিদ্ধাবস্থা হইলেও প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে। দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা এবং ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ এই ব্রহ্মাবস্থাকে সিদ্ধাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন যে ইহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে, তবে ইহা অতি উচ্চাবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হয়। যতক্ষণ জীব মায়ারাজ্যে অবস্থান করে ততক্ষণ সে পরাভক্তির আস্বাদ লাভ করিতে পারে না। কারণ জাগতিক সুখ-দুঃখে বিচলিত হইলে, জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধীন থাকিলে এবং পরস্পরের পৃথক্ জ্ঞান তিরোহিত না হইলে ভগবানের প্রতি যথার্থ ভক্তির উদয়ই হয় না। সুতরাং পূর্ববর্ণিত ব্রহ্মাবস্থা হইতেই পরাভক্তির সূচনা। যতক্ষণ সর্বত্র আত্মভাবের উদয় না হয়, যতক্ষণ অন্তর ও বাহিরে প্রতি বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন না হয় ততক্ষণ পরাভক্তির সম্ভাবনা কোথায়? আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভক্তি বলি তাহা অপরা ভক্তি। তাহা নিম্নস্তরের ভক্তি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। কারণ ভগবানের স্বরূপ দর্শন না পাইলে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবানের স্বরূপ দর্শন পাইতে হইলে দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যবর্জিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় অর্থাৎ মায়া অতিক্রম করিতে হয়।

পরাভক্তি উদিত হইয়া স্বভাবতঃই স্বকার্য সাধন করিয়া থাকে। এই স্বকার্যটি কি? ইহা ভগবানের সহিত সর্বতোভাবে পরিচিত হওয়া অর্থাৎ ভগবানকে পূর্ণভাবে চিনিতে পারা। যে জ্ঞানের প্রভাবে মায়া নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে চিনিতে পারা যায় না। তাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে কিন্তু ভগবদ্ বিষয়ক অভিজ্ঞান নহে। কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্' অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। অতএব ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠারূপী আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে জানা হয় না। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ভগবৎ পরিচয় এই উভয়ের অন্তরালে পরাভক্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যেমন পরাভক্তি জন্মে না, ঠিক সেই প্রকার পরাভক্তি ব্যতিরেকে ভগবানেরও পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে ভগবানের তাত্ত্বিক স্বরূপ এবং তাঁহার অখণ্ড বিভূতি সবই জানিতে হয় 'যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ ভগবান্ স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ যাহা তাহা জানিতে হয় এবং তিনি শক্তিরূপে যাহা তাহা জানিতে হয়। ভগবান্ যে কত বড় তাহা না জানিলে ভগবানকে জানা হয় না, আবার তাহা জানিলেও ভগবানকে জানা হয় না যদি তাঁহার স্বরূপের সন্ধান না পাওয়া যায়। অতএব পরাভক্তির দ্বারা নিগূঢ় ভগবৎস্বরূপ এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দুইই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সবিশেষ জ্ঞান। পূর্বে যে ব্রহ্মভূত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে—যাহা মায়াতীত সুখ-দুঃখের অতীত তৃষ্ণাশূন্য এবং ভেদবর্জিত, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা। নির্বিশেষ জ্ঞানের দ্বারাই মায়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। মায়ানিবৃত্তির পর অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপী ভগবানকে জানিতে হইলে পরা-ভক্তির প্রয়োজন হয়। পরাভক্তির প্রভাবে ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপ ও শক্তি পরমভক্তের গোচর হইয়া থাকে—ইহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। ইহার পর পরমপদে প্রবেশ আপনিই হইয়া থাকে—যাহা বর্ণনার অতীত (বিশতে তদনন্তরম্)'।

অলৌকিক ব্রহ্ম রসবেত্তা ও আস্বাদক—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। ব্রহ্মের চিৎ-সত্তা হইল জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দ-সত্তা রসস্বরূপ—'রসঃ বৈ সঃ'। মিলিত উভয় সত্ত্বা হইল সৎ। অবিমিশ্র জ্ঞানসাধনায় সাধক ব্রহ্মের নির্বিশেষ অদ্বয় জ্ঞানের সহিত এক হইয়া যান। অদ্বয় জ্ঞান সত্ত্বায় ডুবিয়া গিয়াই সাধক স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান। কিন্তু রসসাধক ভক্ত ব্রহ্ম-সত্ত্বায় বিলীন হইয়া লুপ্ত হইতে চান না। ভগবানের রসসত্তায় মিলিত হইয়াও ভক্ত আপন বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব বজায় রাখেন। তাহা না হইলে পরমানন্দ-রসের আস্বাদন হয় না।

'রসঃ বৈ সঃ'। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দি ভবতি'। সেই পরম রসস্বরূপের রস আস্বাদন করিয়া অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ লাভ করিতে হইলে প্রথমে ভাব-সাধনা করিতে হইবে। ভাবের ভাবুক না হইলে রস আস্বাদন করা যায় না। আর ভাব সাধনা না হইলে প্রেমসাধনা হয় না এবং প্রেমসাধনা না হইলে রস-পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না বা রসাস্বাদনেরও অধিকারী হওয়া যায় না।

মূল হইল ভাব। ভাব কখন আসে এবং ভাবের স্বরূপই বা কি? ভাবই পর্যায়ক্রমে প্রেম ও রসে পরিণত হয়। সহৃদয় ব্যক্তি না হইলে ভাবের উদয় হয় না। ভাব থাকিলে দুঃখকেও আমরা করুণ রসে পরিণত করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রামলীলা অভিনয় দর্শন করিতে করিতে সীতার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দর্শকের মনে যে করুণ ভাবের উদয় হয় তাহার ফলে দর্শক অশ্রুজল বিসর্জন করেন অর্থাৎ তখন তিনি নির্মল রস অন্তরে উপলব্ধি করেন। কিন্তু ভাবুক না হইলে, হৃদয়বান্ না হইলে করুণতম দৃশ্য দেখিয়াও তাহার সে অপূর্ব নির্মল রস আস্বাদন হয় না। অতএব 'রসঃ বৈ সঃ' বা 'রসানাং রসতমঃ'-এর পরম রস পান করিতে হইলে সর্বপ্রথমে ভক্তকে ভাবুক হইতে হইবে। সকলের মধ্যে ভাব থাকে না বা থাকিতে পারে না। পূর্ব জনমের সুকৃতির ফলে যদি কাহারও মনে ভাব জাগরিত হয় তবেই তিনি প্রেমসাধনার দ্বারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারেন। নচেৎ নহে।

ভক্তি তিন প্রকার—বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি। বিধিবদ্ধ প্রণালীতে ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তের মনে কিঞ্চিৎ ভাবোদয় হয় এবং গুরুকৃপা লাভ করিয়া সাধন-বলে ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে ভাব স্ফুরিত হয় এবং ইষ্টদেবে অনির্বাণ ভাব-তন্ময়তা লাভ করিলে সাধনার উচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে পারেন। সুতরাং এখানে ভক্তের পুরুষকার ও গুরুরূপে ভগবানের কৃপা লাভ উভয় সাপেক্ষ।

বৈধী ভক্তিরও শ্রেষ্ঠ হইল রাগানুগা ভক্তি। জন্মাবধি ইহা ভক্তের অন্তরে বীজরূপে অবস্থিত থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উহা আপন স্বভাব-ধর্মেই বর্দ্ধিত হয়। এখানে সুকৃতিপূর্ণ রাগানুগা ভক্তের বৈধিভক্তি-অনুশীলনরূপ পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না, ইহা একান্তই ভগবানের কৃপা। ভগবানের কৃপাধন্য রাগানুগা ভক্তের অন্তরে নিজ স্বভাবধর্মেই ভগবানের নামগানে রুচি বা ভগবানের প্রতি অনুরক্তির ভাব নির্মল ভাস্বরতায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইরূপে ভগবানে রতি উৎপন্ন হইলে রতির গাঢ়তায় প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমময়ী স্বভাবে প্রেম সাধনাই হইল রাগাত্মিকা-ভক্তি।

সঞ্চারী ও স্থায়ী ভাব। সঞ্চারী (অস্থায়ী) ভাবে ইষ্টদেবের সহিত যোগ

ক্ষণভঙ্গুর। যেমন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে দর্পণে মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, আবার সরিয়া গেলে দর্পণ হইতে মূর্ত্তি অপসারিত হয়, সেইরূপ চিত্ত-ফলকে ইষ্ট দেবতার যে ছায়া পড়ে, ভাব-ভঙ্গেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা চিত্ত হইতে অপসারিত হয়। বৈধী ভক্তি-সাধনার অভ্যাসের দ্বারা যখন ভক্তের হৃদযে ইষ্টদেবতার যোগ অনির্বাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভক্তের মধ্যে ভাব স্থায়ীরূপ ধারণ করে। এইরূপে ভাব যখন পরিপক্কতা লাভ করে তখন প্রেমের উদ্ভব হয়। উদ্দীপন প্রভৃতি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া প্রেম যখন পরিপক্ক হয় তখন হয় রসের উদয়। রস-সিদ্ধ ভক্তই রসঘন মহা আনন্দময় পুরুষের লীলায় প্রবেশের অধিকার পায়। লৌকিক জগতে যেমন নট-নটী অভিনয করে, সেইরূপ পরমধামে লীলা, লীলার বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন রাধা ও কৃষ্ণ। লৌকিক জগতে নট বা নটী যে চরিত্রের অভিনয় করে, সেই চরিত্রগত ভাবে তন্ময হইলে যেমন তাহার অভিনয় দর্শকের ভাবোদ্রেক করে, সেইরূপ আনন্দময় পুরুষের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি মহাভাবে তন্ময হইয়া যে লীলা করেন, রসিক ভক্ত সাধকগণ সেই অনাদি ও অনন্ত বৈচিত্র্যময লীলায় স্ব স্ব স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতুলনীয় চিন্ময় আনন্দরস পান কবিতে থাকেন। এই আনন্দরস পান করাই মানবজীবনের চরম চরিতার্থতা, পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মতে যে-সকল জীব আপন আপন স্বভাবকে আশ্রয করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করে সেই সকল জীব চিরকাল আপন আপন ভাবে নিবদ্ধ থাকিতে পারে অথবা আপন আপন ভাবের পূর্ণতা সাধন করিয়া ঊর্ধ্ববর্তী ভাবে সঞ্চরণ করিতে পারে—ইহাই ভাবগত ক্রমিক উৎকর্ষ। ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের পথ বিস্তৃত আছে। ঐ মুক্তপথ ধবিয়াই ভাবসিদ্ধ ভক্তজীব ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। সহজিয়াদের এই মতের সমর্থন রহিয়াছে ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখায। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে রাগাত্মিকা এবং রাগানুগা ভক্তির বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, "রাগাত্মিকা ভক্তি রাগ স্বরূপ। ইহা স্বভাব সিদ্ধ বস্তুতঃ ইহাই স্বভাব। ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না অথবা শিখাইতেও হয় না—ইহার প্রবৃত্তি আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তি ইহাব প্রতিবিম্ব। জীব তটস্থ শক্তি হইতে প্রকট হয় বলিয়া এবং তটস্থ শক্তি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বগ্রাহী বলিয়া জীব ভগবদুন্মুখ হইলেই এই স্বভাব ভূতা রাগাত্মিকা ভক্তি স্বচ্ছ জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বই স্বচ্ছ জীবহৃদয়ে আবির্ভূত রাগানুগা ভক্তি। ইহা কিন্তু ভাব নহে। যতদিন জীব মায়িক জগতে মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে ততদিন এই রাগানুগা ভক্তি তাহার একমাত্র অবলম্বন।

রাগানুগা ভক্তির সাধনা করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই স্বভাব বা আপন ভাব। ইহা রাগাত্মিকা ভক্তিরই অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধিকারই শ্রীঅঙ্গ নিঃসৃত একটি কিরণ। এই ভাবকে প্রাপ্ত হইলে জীব ভাবরূপা অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধাভক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহার দেহ তখন ভাবদেহরূপে পরিণত হয়। এই দেহ ব্রজের দেহ। ভাবদেহ ভাবরাজ্যের বস্তু, মায়ারাজ্যের বস্তু নহে। কিন্তু মায়ারাজ্যে থাকিলেও ইহার উদ্ভব এবং বিকাশ হইতে পারে।

বস্তুতঃ এই ভাবদেহের অভিব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত ভাব জগতে প্রবেশের অধিকার হয় না এবং প্রকৃত ভগবৎ সাধনার আরম্ভই হয় না। অশুদ্ধ মায়িক দেহে ভগবৎ সাধনা হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রবর্তক অবস্থার পরিসমাপ্তি এবং সাধক অবস্থার উদয় এই ভাবের বিকাশের দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে।

ভাবদেহের আকার এবং প্রকার স্বভাবেরই অনুরূপ। ইহা চিদানন্দময় দেহ। ইহাতে পুরুষ প্রকৃতি কোন ভেদ নাই। কিন্তু লীলারসের আস্বাদনের জন্য ইহার মধ্যে রসাস্বাদনের উপযোগী সকল বৈচিত্র্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহাতে ভাব ক্ষুণ্ন হয় না। ব্রজভূমিতে বা তাহার বিভূতি স্বরূপ গোলোকধামে বা ঐশ্বর্যময় পরব্যোমে ভক্তমাত্রেরই স্বরূপ ভাবময়। এই ভাব নিত্যসিদ্ধ এবং ভাবাশ্রয় ভক্তও নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু যে সকল ভক্ত এই ভাবের অনুগত হইয়া রাগানুগা ভক্তির প্রভাবে ভাবদেহ লাভ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্ত ব্রজধামে আগন্তুক। বস্তুতঃ ইহাদেরই জন্য নিত্যলীলা। ইহারা ভাব অবস্থা হইতে প্রেমের অবস্থা পর্যন্ত উন্নীত হইলে ইহাদের নিকট সাক্ষাৎভাবে ভগবানের প্রাকট্য হয়। কারণ প্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎ দর্শন হয় না। তখন এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশই সাধনার পরিসমাপ্তি। এই সকল প্রেমভক্ত ভগবৎদর্শনের অধিকারী হইয়া ভগবানের নিত্য লীলায় যোগদান করেন। ইহা সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় অর্থাৎ লীলানুভূতির ক্রম বিকাশে প্রেম-ভক্তি রস রূপে পরিণতি লাভ করে। প্রেমভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাভাব। যিনি মহাভাবরূপা তিনিই ভক্তকুলের চূড়ামণি। তিনিই হ্লাদিনী সারভূতা স্বয়ং শ্রীরাধা। এইজন্য প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া অর্থাৎ রাধাভাব প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দের সহিত অন্তর্লীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য জন্মে। প্রেমভক্তির পূর্ণতা সিদ্ধ হইলেই কুঞ্জলীলার অবসান হয়।...

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ভগবানের নিত্য লীলা বাস্তবিকই নিত্য। শুধু নিত্য নহে, প্রতিনিয়ত অভিনব এবং প্রতিক্ষণে নব নবরূপে আস্বাদ্যমান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে লীলা অনাদি এবং অনন্ত

বলিয়া নিত্য হইলেও, রাধা এবং গোবিন্দ উভয়েই নিত্য হইলেও, রাধার অংশভূত আনন্দস্বরূপ ভাবময় অনন্ত ও বিচিত্র ভক্তবৃন্দ নিত্য হইলেও, যাহার জন্য এই লীলার অনুষ্ঠান সেই জীব, মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্তরূপে অপ্রাকৃত ভাবময় দেহ সম্পন্ন নিত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত সেই জীব, চিরদিনই যে এই লীলায় আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ব্রজভূমিতেও ভক্তগণের ক্রম বিকাশ রহিয়াছে। কারণ যাহারা সাধক তাহারা ক্রমশঃ ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। যে কোন ভক্ত যখন মহাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন তখন তিনি রাধাতত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন।"

(শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৩১–১৩৪)

ব্রহ্ম জ্ঞানবেদ্য, ঈশ্বরে ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা, আর ভক্তের ভগবান্। সুতরাং এই তিনের মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বহু দূরের বস্তু। কারণ সেখানে উপাসক ও উপাসিতের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। সেখানে বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জ্ঞান ও ভয়ভাব বিজড়িত হইয়া উপাসক ও উপাসিতের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় অন্তরালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ মধুর ও নিকটতম আত্মীয়ের সম্বন্ধ। এখানে ভগবান ভক্তের সুহৃদ্ সারথী ও যোগক্ষেম বহনকারী হন এবং আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া প্রিয়তমের স্থান গ্রহণ করেন। এখানে ভগবান ভক্তের সান্নিধ্য লাভের জন্য ভক্তের নিকট নামিয়া আসেন। গীতায় উক্ত আছে যে তাঁহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া অনন্যা ভক্তির সহিত যে-ভক্ত সদা তাঁহার সহিত যুক্ত থাকে, তিনি সেই ভক্তের অধীন। কারণ ভগবান যে প্রেমিক চূড়ামণি। প্রেমের আশ্রয় হল ভক্ত আর তিনি হলেন বিষয়। তাই তিনি ভক্তের নিকট প্রেমে বাঁধা। তাই প্রেম ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান বিগলিত হইযা এক হইয়া যান এবং পরে উভয়ের মিলনানন্দ সম্ভোগের জন্য সেই মিলিত এক-রস হইতে পৃথক্ হইয়া লীলা করিতে থাকেন। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সিদ্ধ ভক্তগণ যখন প্রেমবিগলিত সত্তায় এক হইয়া গিযা পুনরায় রসতনু লাভ করিয়া চিন্ময় ব্রজধামে লীলা করিতে থাকেন তখন প্রতি ভক্ত স্ব স্ব স্বভাব বৈশিষ্ট্যে লীলায় অংশগ্রহণ করিয়া রসের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ, সুবল, সুদাম প্রভৃতি সখাগণ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুসারে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া লীলারস আস্বাদন করেন এবং প্রত্যেকেরই আস্বাদনের মধ্যে চরম পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়; কিন্তু ললিতা বিশাখা হইতে বা সুবল সুদামা হইতে চাহে না। সকলেই যদি হ্লাদিনীস্বরূপা শ্রীরাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহে, তবে রসের পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধন হইতে পারে না। রসের বৈচিত্র্য ও পুষ্টি সাধনের জন্যই প্রত্যেকের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এই

পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবধর্ম অনুসারে ভক্ত জীবগণ যে যেরূপ ভাবে ভজনা করেন, ভগবান সেইরূপভাবে তাহার নিকট প্রতিভাত হন। প্রাকৃত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে কত অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্ব। বৃক্ষ, লতা, পাতা, জীব-জন্তু, মানুষ প্রভৃতি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট হইতে ভিন্ন। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদে প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য থাকিবেই। প্রাকৃত জগৎ তো সেই চিন্ময় অপ্রাকৃত জগতের প্রতিচ্ছায়া। সুতরাং প্রাকৃত জগতে এই অনন্ত ভেদ দৃষ্টে অপ্রাকৃত জগতের ভেদও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যে ভগবান্ ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তিনিই হলেন সহজ মানুষ (বাউলের 'মনের মানুষ')। ভক্ত বিশুদ্ধ অন্তরে না হয় সহজ মানুষকে উপলব্ধি করিল, কিন্তু মনও তাঁহাকে পাইতে চায়। মনও যখন শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া তাঁহাকে পাইল তখন তিনি 'মনের মানুষ' হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়গণও তাঁহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে চায়। ভগবান্ মানুষকে যে দশেন্দ্রিয় দান করিয়াছেন, তাহা শুধু পঞ্চভৌতিক বিষয় ভোগের জন্য দান করেন নাই। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধ্যাত্ম বা পারমার্থিক সার্থকতা আছে এবং সেই সার্থকতা লাভই হইল জীবের পরম কাম্য।

আমরা জানি পঞ্চ ভূতের পঞ্চ গুণ। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব শব্দ সকলের মধ্যে অনুস্যূত। এই শব্দের মূল হইল মহানাদ—এই নাদ ধ্বনিত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যয়গত অর্থ হইল আকর্ষণ। তিনি বংশীধ্বনির দ্বারা বিশ্বের সমস্ত কিছু ও মানবের চিত্তকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছেন। যে সাধকের শ্রবণেন্দ্রিয় বাহ্য শব্দ-শ্রবণ-সুখে মুগ্ধ নয়, যাঁর ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইয়াছে, তিনিই শুধু সেই মধুর পরম রমনীয় বংশীধ্বনি শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। পরম পুরুষের অবর্ণনীয় স্পর্শ-সুখ তিনি উপলব্ধি করেন। সেই পরম-পুরুষের অঙ্গে কোটি সূর্যের দ্যুতি। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্; তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। অর্জুনকে তিনি তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যরূপকে দেখাইয়াছিলেন যাহা দেখিয়া অর্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াও সহ্য করিতে পারেন নাই। ভগবান্ ভক্তের নিকট তাঁর ঐশ্বর্যরূপকে সংহৃত করিয়া বিশ্বরূপ ভোলান ভুবন ভোলান মোহন রূপে প্রতিভাত হন। পার্থিব জগতে কামদেবের রূপই নাকি আদর্শ রূপ বলা হয়। কামদেবের আর এক নাম মদন। সেই মদনকেও মোহিত করিবার মত রূপবান সেই মহাপুরুষ, তাই তিনি মদন-মোহন। তাঁহার মধ্যেই সমস্ত বিশ্বরূপের

পর্যাবসান। তাই তিনি পূর্ণ রূপবান। সে রূপ একবার দৃষ্টিগোচরে আসিলে অন্য কোন রূপই আর ভাল লাগিবে না। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করাই জীবের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিৎ। 'রসঃ বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি'। তিনিই পরম রস—'রসানাং রসতমঃ'। অর্থাৎ তাঁর মধ্যেই রসের পরাকাষ্ঠা। সেই নির্মল চিন্ময় রস-সুধা পান করিয়া অমৃতময় হওযাই জীবনের পরম প্রাপ্তি। আর তাঁর অঙ্গ-গন্ধ সহস্র কস্তুরি ও পদ্মের একত্র গন্ধ হইতেও কোটি গুণ সুগন্ধযুক্ত। তাঁর সৌরভময অঙ্গ গন্ধের আঘ্রান লওয়াই নাসারিন্দ্রিযের পরম সার্থকতা। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের অঙ্গ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। গোবিন্দ দাসের কড়চায় দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন রাত্রিকালে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লন। রাত্রিকালে সমাগত জন-মণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত্ত হইযা যখন তিনি নাম-কীর্তনে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার শরীর হইতে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় মাঝে মাঝে জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছিল। বাড়ীর গৃহিনীর উহা দৃষ্টিগোচরে আসে। তিনি চৈতন্যদেবের কৃপাধন্য হন। ঘটনাটি উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইল যাঁরা পরমপুরুষের সঙ্গে যোগ-যুক্ত থাকেন তাঁদের শরীরের মধ্যে জ্যোতির স্ফুরণ ও সৌরভ নির্গত হয। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শ্রদ্ধেয ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের গুরুদেব পরমযোগী শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের গাত্র হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। সেইজন্য তাঁহাকে বলা হইত 'গন্ধবাবা'।

পৃথিবীই হইল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অর্থাৎ পঞ্চ গুণের আধার। তাই ভগবান পঞ্চগুণবিশিষ্ট পরিপূর্ণ মূর্তিতে পৃথিবীতে ভক্তের নিকট নামিয়া আসেন এবং ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে দেখিতে ইচ্ছা করে তিনি সেই মূর্তিতে তাহাকে দেখা দেন এবং অন্য ভক্ত তার মনোগত মূর্তিতে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে তিনি একই সময়ে সেই মূর্তিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের মনোবাঞ্ছা অনুসারে একই সময়ে সহস্র সহস্র মূর্তিতে প্রত্যেকের নিকট প্রকাশিত হইযা ভক্তের মনোবাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটান। কাহারও কাছেই তাঁহার আংশিক প্রকাশ নয়, প্রত্যেকের নিকট তিনি একই সমযে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হন এবং তাঁহার মধ্যে প্রতিটি ভক্তের ইচ্ছা একই সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। কারণ জগতের সব কিছুই তো তিনি। যে অনন্ত বিচিত্র রূপের প্রবাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর বহিযা চলিয়াছে, সে সমস্তই তো তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে—'ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্'। জগতে একমাত্র তিনিই তো পূর্ণ। তবে তিনি যে প্রত্যেক ভক্তের নিকট পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হন সেটা আর আশ্চর্য কিসের। তিনি তো

প্রেমের বিষয়, ভক্তই আশ্রয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে ভাবের বা প্রেমের সম্বন্ধ, আশ্রয় ভেদে তাহা নানা রূপ, রং ও রস পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আপন মনের মাধুরি মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'। ভক্ত তাঁদের স্ব স্ব বিশিষ্ট স্বভাব অনুসারে আপন মনের মাধুর্য মিশাইয়া যে প্রেমের মূর্তি রচনা করেন, ভগবান সেই সেই মূর্তিতে ভক্তগণের নিকট ধরা দেন। তাই প্রত্যেক ভক্তই আপন প্রেমের বৈশিষ্ট্যে ভগবানের মধ্যে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। রাসলীলায় সহস্র সহস্র গোপিনী চক্রাকারে দণ্ডায়মানা, আর প্রত্যেক গোপিনীই দেখিতেছে তাহার পাশে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। শুধু দণ্ডায়মান নয়, দেখিতেছে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শুধু তাহারই দিকে নিবদ্ধ আর কোনও দিকে নয়। গোপিনীগণ হইলেন ভক্ত এবং প্রত্যেক ভক্তই আপন আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-সুধা পান করিতেছে। প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত আপনার বলিয়া বোধ হইতেছে এবং তাঁহার মধ্যে তাহাদের আপন আপন মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে।

তাহা হইলে, ভক্তের ভগবানই হইলেন সহজ মানুষ, মনের মানুষ। কিন্তু পার্থিব কামভাবের কণামাত্র থাকিলে এই সহজ মানুষকে চিনিতে পারা যায় না বা তাঁর রূপ দৃষ্ট হয় না। আবার এও সত্য যে একবার সে রূপ দর্শন করিলে আর কামভাবের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন--

মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে
মানুষ জেনেছে কে?

কোটির মধ্যে একজন মাত্র সেই মানুষকে জানিতে পারে।

প্রবর্ত্তক-সাধক-সিদ্ধ—জগতের সর্বধর্মেই আছে যে পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত শরীরের দ্বারা কখন অধ্যাত্মসাধনার উন্নত মার্গে বিচরণ করা যায় না। কারণ ইহা স্থূল ভোগায়তন শরীর। ব্রহ্ম বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নাম রূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত। সাধারণ মানুষ প্রথমে তাহার রুচি অনুসারে নাম জপ করতে থাকে। শুধু প্রথা অনুসারে নাম-জপ নয়, তাহার সহিত অন্তরের ব্যাকুলতার যোগ হওয়া চাই। ব্যকুলতা ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে যখন তীব্রতম অবস্থায় পৌঁছায় তখন আবেগজাত প্রার্থনায় উচ্ছ্বসিত নাম শব্দের তরঙ্গ পরম দেবতাকে গিয়ে আঘাত করে। সাধকের ব্যাকুলতার গভীরতা লক্ষ্য করে পরমদেবতা যে কোন রূপ ধারণ করে গুরু-রূপে তাহার নিকট উপস্থিত হয়ে তাহাকে দীক্ষা দেন অর্থাৎ মন্ত্রবীজ প্রদান করেন। প্রবর্তকের স্ব-ভাব অনুসারে পরমপিতা তাহার মধ্যে স্ব-ভাবের অনুকূল মন্ত্র-বীজ বপন করেন। মন্ত্রের শক্তি অসীম। মন্ত্র-শক্তি আপনা হতেই তখন সাধকের অন্তঃকরণে ক্রিয়া করিতে থাকে।

প্রবর্ত-সাধক গুরু-উপদিষ্ট মন্ত্র জপের দ্বারা মন্ত্রশক্তির ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এইরূপে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হতে হতে একসময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। তখন প্রবর্তক চিন্ময় ভাব শরীর লাভ করে সাধকত্বে উন্নীত হয়। তখন সাধকের কারণ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বা স্থূল শরীর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ এতদিন ধরে প্রবর্তকের আত্মার চতুর্দিকে যে তমসাবৃত মায়ার আবরণ ছিল তাহা অপসারিত হয়ে আত্মার চারপার্শ্বে জ্যোতির্মণ্ডল রচিত হয়। এ-পর্যন্ত প্রবর্তক অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছিল, এইবার ভাব শরীর লাভ করে তাহার ঠিক পথের সন্ধান পাইল।

ভৌতিক বা প্রাকৃত শরীর যেমন পিতামাতার নিকট হতে পাওয়া হয়, সেইরূপ ভাবতনু লাভ হয় পরমপিতা ও পরমমাতার নিকট হতে। সেই পরমপিতা হলেন পরমব্রহ্ম যিনি গুরু রূপে সাধকের নিকট নিজ হ'তে আবির্ভূত হন। ইনি সাধারণ গুরু নহেন—সদ্‌গুরু। সাধক যখন আবেগাকুল অন্তরে পথের সন্ধান করে এবং তার মধ্যে যখন পথের নিশানা লাভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে, তখনই পরমপিতা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তাহার নিকট প্রকাশিত হয়ে মন্ত্রবীজ দান করেন। এই মন্ত্র-শক্তি হল পরম মাতা। এই মন্ত্রশক্তি সাধককে ধারণ করে, পালন করে ও পুষ্ট করে। এইরূপে পরম পিতা ও মাতা হতে যে চিন্ময় ভাব শরীর উৎপন্ন হয়, সেই ভাব শরীরে সাধক আপন ইষ্টদেবতাকে চিনতে পারে এবং তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হয়। চিন্ময় ভাব শরীর ছাড়া কোন মানুষই তার কারণ, সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীরের দ্বারায় রাগ-সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে না। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে—হিন্দুধর্মে যেমন দীক্ষা গ্রহণ, খ্রীষ্টান ধর্মে তেমনি Baptism এবং মুসলমান ধর্মে কল্‌মা-পঠন।

যখন সাধক চিন্ময় ভাবতনু লাভ করে তখন সে নিজেকে শিশুরূপে দেখতে পায়। তখন সে দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। সে তখন ভৌতিক শরীরে যত বয়ঃবৃদ্ধই হোক না কেন তথাপি সেই চিন্ময় দিব্যলোকে সে নিজেকে শিশুরূপেই দেখে। এ-দৃষ্টি চিন্ময় দৃষ্টি। সাক্ষীরূপে ভৌতিক শরীরের এবং চিন্ময় জগতে ভাব-শরীরের ক্রিয়া-কলাপ সমস্তই পর্যবেক্ষণ করে। সাধক তখন বিজ্ঞানময়। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্রই হল প্রকৃত বিজ্ঞান। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল শরীরের যে জ্ঞান বা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরের যে জ্ঞান কিম্বা পুস্তক পাঠে যে জ্ঞান আহরণ হয়, সে সমস্তই যথার্থ জ্ঞান নয়, বাহ্য জ্ঞান।

মন্ত্রই হল প্রকৃত বিজ্ঞান এবং মন্ত্রের সাধনার দ্বারাই প্রকৃত বিজ্ঞ হওয়া যায়। মন্ত্রের স্ফুরণে প্রবর্তক যখন দিব্য ভাব তনু লাভ করে তখন পার্থিব জগৎ থেকে অনন্ত বিস্তৃত চিন্ময় দিব্যধামে উপনীত হয়। এখানেই প্রবর্ত-অবস্থার অবসান এবং সাধক অবস্থার আরম্ভ।

দিব্য ভাবতনু লাভ করে চিন্ময় দিব্যধামে পৌঁছে সাধক দেখে সেই অনন্ত বিস্তৃত দিব্যধামে সে একা। এই অবস্থায় সাধক ভাবাবেগে তার ইষ্ট দেবতাকে ডাকতে থাকে। এই ডাক ইষ্টদেবতার কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তিনি ভক্তের ভাবের পরিপক্কতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ততকাল ভক্ত ইষ্টদেবতার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এই যন্ত্রণা যখন সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে যায় তখন সাধকের বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থাকে ভাবাবস্থা বলে। ভাব পরিপক্কতা লাভ করলে ইষ্ট দেবতা এসে বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত ভক্তকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। ইষ্টদেবতা যদি মাতা হন, তিনি মাতৃরূপে শিশুর ন্যায় ভক্তকে কোলে নেন। কিম্বা ভর্তৃ হলে ভক্তকে আলিঙ্গন দান করেন। মাতৃ কোলে শায়িত কিম্বা ভর্তৃর আলিঙ্গনাবস্থায় যখন সাধকের জ্ঞান ফিরে আসে তখন দিব্যানন্দের অনুভব হয়। তখন বিষয় অর্থাৎ ভগবান ও আশ্রয় ভক্তের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। এই অবস্থার নাম হল প্রেমাবস্থা। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থাতেও ভক্তের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। সে ইষ্ট দেবতার সহিত এক হয়ে যেতে চায়। তখন ভক্ত ও ইষ্টদেবতা পরস্পরের নিবিড় আকর্ষণে বিগলিত হতে থাকে এবং উভয়ের বিগলিত সত্ত্বাব মিলনে রস সৃষ্টি হয়। তখন ভক্তও থাকে না, ইষ্ট দেবতাও থাকে না—উভয়ে এক রসে পরিণত হয়। এখানেই সাধক অবস্থার পরিসমাপ্তি এবং সিদ্ধ অবস্থার উৎপত্তি।

অতএব আমরা দেখতে পাই, সাধনার প্রথম স্তরে ব্যাকুলতার সাথে নাম সাধনা ও মন্ত্রজপ, তাহার পরে ভাব-সাধনা, ভাবের পরিপক্ক অবস্থায় প্রেম এবং প্রেমের রসে পর্য্যবসান।

সহজিয়া মতে জ্ঞানের উদয়ের পর ভাবদেহে রাগ সাধনার সূত্রপাত হয়। এই জ্ঞানোদয়ের পন্থাটি সকল ধর্মেই প্রায় সমান। জীব ও জড় জগতের সৃষ্টির মূলে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ যাহা সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে বর্ণিত হয়। পুরুষ নিমিত্ত আর প্রকৃতি উপাদান। পুরুষের ইচ্ছা প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে। প্রকৃতি-মধ্যস্থ স্পন্দন থেকেই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। বিষয়টির অবগতির জন্য আরও পরিস্ফুটরূপে আলোচনা করা যাক্। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বিশিষ্ট প্রকৃতির যখন সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতি অব্যক্তা। কিন্তু যখন প্রকৃতির মধ্যে স্পন্দন আরম্ভ হয়, তখন সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের বিকারের ফলে জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি। সুতরাং জগতের যাবতীয় সৃষ্টি প্রকৃতির অধীন। এবং এই প্রকৃতি মূলে অব্যক্তা। ইহাকে মানুষ দৃষ্টিগোচর করতে পারে না। মন, বুদ্ধি ও চিত্ত দিয়েও এই অব্যক্তা প্রকৃতিকে গোচরীভূত করা যায় না। অসম্প্রজ্ঞাত এবং সম্প্রজ্ঞাত যোগীও ইহাকে দেখতে পায় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগীর চিত্ত নিরোধ থাকে, সুতরাং অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় তো দূরের

কথা, এমন কি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও যখন যোগীর চিত্ত সচেতন থাকে তখনও এই অব্যক্তা প্রকৃতি তাহাব দৃষ্টিগোচর হয না। কারণ, তখনও তিনি প্রকৃতির অধীন। মানুষ চক্ষু দ্বারা সব কিছুই দেখতে পায কিন্তু নিজের চক্ষুকে দেখতে পায় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত যোগীর ক্ষেত্রেও সেইরূপ। কিন্তু যোগী যখন বিবেক-জ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতি থেকে বের হয়ে আসতে পারে তখন সে প্রকৃতিকে দেখতে পায়। কারণ তখন যোগী ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা। এই সময়ে ভক্ত যোগী চক্ষু উন্মীলন করলেই দেখতে পান তাঁহার সম্মুখে কোটি সূর্যের আলোক সমন্বিত এক জ্যোতিঃ চক্রাকারে ঘুরছে। কোটি সূর্যের আলোক সমন্বিত হলেও সে জ্যোতিঃ অত্যন্ত স্নিগ্ধ। এই জ্যোতিঃকে ভক্ত-সাধক সর্বদাই দেখতে পান। যখন সাধক প্রকৃতিকে দেখতে পান তখন প্রকৃতি সাধকের ইচ্ছানুসারে কাজ করে। অর্থাৎ সাধক তখন বিশ্ব সৃষ্টি করবার শক্তি অর্জন করেন। সাধক তাঁহার সম্মুখে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান জ্যোতির দিকে চেয়ে যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃষ্টি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, সাধক সেই জ্যোতির দিকে চেযে যদি ইচ্ছা করেন একটি গোলাপ ফুল পেতে, তখনই সেই জ্যোতির মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে একটি গোলাপ ফুল সৃষ্টি হযে ওঠে। কারণ দ্রষ্টাস্বরূপ যোগীর ইচ্ছা জ্যোতিঃস্বরূপা প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া করে। গীতায় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনি মায়াধীশ। মায়ার দ্বারাই তিনি যাবতীয় সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহাকে কিছুই স্পর্শ করে না, তিনি অপরিণামী।

কিন্তু এখানেই অর্থাৎ ঐশ্বর্যের ভোক্তা হয়ে ভক্ত সাধক সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, আরও উন্নত অবস্থায় পৌঁছিতে সচেষ্ট হন। কারণ, জীবেব স্বভাব বা স্বরূপ হল আনন্দ। দিব্য নিত্যানন্দ লাভের জন্য তিনি তখন মহাপ্রকৃতির বা পরাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখনই আরম্ভ হয় ভাব-সাধনা, প্রেমসাধনা এবং সর্বশেষে রস-সাধনা।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণের আচরিত ভক্তি-রহস্যের আলোচনার সুবিধার জন্য সহজিয়াগণ তাঁহাদের সাধন-মার্গকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগের নাম প্রবর্তক-অবস্থা, দ্বিতীয ভাগের নাম সাধক-অবস্থা এবং তৃতীয় ভাগের নাম সিদ্ধাবস্থা। প্রবর্তক-অবস্থায় প্রথম সাধনা হইল নাম-সাধন। বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থে যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ, সেইরূপ নাম ও নামীর মধ্যে নিত্য অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। বৃক্ষের বীজের সঙ্গে বৃক্ষফলের যে সম্বন্ধ, ভগবানের নামের সঙ্গে ভগবৎ-স্বরূপেরও সেই সম্বন্ধ। ভগবৎ-নাম অপ্রাকৃত বস্তু এবং অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্ন। ভগবান্ যেরূপ চিদানন্দময়, তাঁহার নামও সেইরূপ চিদানন্দময়! পরন্তু নাম চিদানন্দময় হইলেও প্রথমে উহার অভিব্যক্তি থাকে না, সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ নামে চিদানন্দময় গুণ অভিব্যক্ত

হয়। সদ্‌গুরু বা জাগ্রৎ মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত নামের অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত নিজের সাধন-শক্তি যুক্ত হইলেই আবরণমুক্ত হইয়া নাম উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠে। আবরণমুক্ত নামই চৈতন্যময়। ইহা তখন আপনা আপনিই অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

দীর্ঘকাল নিয়মিতভাবে নামসাধনা করিতে থাকিলে ভগবান্‌ স্বয়ং করুণায় বিগলিত হইয়া নাম-সাধক ভক্তের নিকট গুরুরূপে পথপ্রদর্শন করিবার জন্য আবির্ভূত হন। আন্তরিক নাম-সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং দেহশুদ্ধি যথাসম্ভব হয় ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ভক্ত গুরুদত্ত বীজ প্রাপ্ত হইয়া অশুদ্ধবীজ নির্মিত নিজ দেহকে শুদ্ধ কায়ায় পরিণত করিতে না পারে, ততদিন প্রকৃতপক্ষে সাধনার সূত্রপাতই হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ, প্রাকৃত শরীরে ভগবৎ-সাধনা হইতে পারে না। প্রাকৃত শরীর জাগতিক বিকারের অধীন, ইহার দ্বারা অপ্রাকৃত এবং নির্বিকার ভগবত্তত্ত্বের সাধনা কখন সম্ভব নয়।

গুরুদত্ত বীজ সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ বীজের অভিব্যক্তি ঘটে এবং উহার প্রভাবে মলিন সত্তা দূর হইয়া যায়। পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্মিত আমাদের যে অশুদ্ধ শরীর, যতদিন উহার সংস্কার না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত সাধনমার্গে প্রবেশ করা দুষ্কর। গুরুদত্ত বীজের সাধনার ফলস্বরূপ ভূতদেহ ও চিত্ত শুদ্ধ অবস্থা ধারণ করে এবং আপন আপন ভাব অনুসারে শরীরাভ্যন্তরে অভিনব শরীরের আবির্ভাব হয়। ইহাই স্ব-ভাবের শরীর, ইহারই পারিভাষিক নাম 'ভাবদেহ'। এই দেহ নির্মল, অজর, অমর এবং ক্ষুধা-পিপাসা, কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ধর্ম বিবর্জিত। এই ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত প্রবর্তক-অবস্থা হইতে সাধক-অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। সাধারণতঃ জগতে যাহাকে সাধনা বলা হয়, উহা বাস্তবিক সাধনা নয়। স্থূলদেহে অভিনিবেশ বা তাদাত্ম্যবোধ থাকিতে যে কোন সাধনা যতই করা যাউক, উহা অকৃত্রিম স্বাভাবিক সাধনারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ভাবদেহে সাধনাই যথার্থ সাধনা। ভাবশূন্য প্রাকৃতিক শরীরে প্রকৃত ভাবের সাধনা কখনই হইতে পারে না। অতএব প্রবর্তক-অবস্থায় অ-ভাবের শরীরকে ভাব-শরীরে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে নাম ও পরে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র প্রবর্তকের উক্ত প্রারম্ভিক চেষ্টার সহায়ক।

যিনিই ভক্তিতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে ক্রিয়ারূপা ভক্তি ক্রমশঃ ফলরূপা ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। ক্রিয়ারূপা ভক্তিকে কেহ কেহ সাধন-ভক্তি বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা যথার্থ সাধন-ভক্তি নহে। কারণ প্রাকৃত-দেহাভিমান থাকিতে প্রকৃত সাধন-ভক্তির উদয় হইতে পারে না। ভক্তসম্প্রদায় যে নবধা ভক্তিকে সাধন-ভক্তিরূপে দেখেন, উহাও বস্তুতঃ প্রবর্তক অবস্থারই ব্যাপার। ভাবের উদয় কি প্রকারে হয়—ইহার আলোচনায় আচার্যগণ

বলিয়া থাকেন যে ভাবের প্রথম আবির্ভাব কর্ম অথবা কৃপা হইতে হয়। স্থূল শরীরে কর্ম অর্থাৎ কৃত্রিম সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে (অবশ্য আন্তরিকভাবে) সাধন-ভক্তি ভাব-ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু কোথাও কোথাও সাধন-ভক্তি ব্যতিরেকেও ভাবভক্তির উদয় হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্থলে কৃপাই মূল কারণ বলিয়া মানিতে হইবে। এই কৃপা সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতেও হইতে পারে বা সিদ্ধ ভগবৎ-ভক্ত হইতেও বর্ষিত হইতে পারে।

ভক্তি হ্লাদিনী শক্তিরই এক বিশেষ বৃত্তি। হ্লাদিনী শক্তি মহাভাবস্বরূপা। অতএব শুদ্ধাভক্তি স্বরূপতঃ মহাভাবের অংশ। অতএব ভাবরূপা ভক্তি, তাহা সাধনপূর্বকই হউক বা কৃপাপূর্বকই হউক, বস্তুতঃ মহাভাব হইতেই স্ফুরিত হয়। এই প্রকার ভাবের উদয় ভাব-জগতের প্রেরণা হইতেই হয়। মায়িক শরীর মহাভাব হইতে স্ফুরিত ভাব গ্রহণের উপযোগী আধার নয়। অতএব মায়িক দেহে ভাবের আবির্ভাব হয় না। ভাবধারণ করিবার যোগ্য আধারেই ভাবের আবির্ভাব হয়। এই আধার শুদ্ধ দেহ বা ভাবদেহ নামে পরিচিত। সাধনার প্রভাবে অশুদ্ধ দেহ শুদ্ধদেহে পরিণত হইয়া শেষে ভাবদেহ রূপে প্রকটিত হয়।

যে সময়ে প্রাকৃতদেহে কৃত্রিম সাধনা চলিতে থাকে সে সময় ভাবের বিকাস হয় না। সেইজন্য এই অবস্থায় শাস্ত্র-বাক্য, গুরু-বাক্য, মহাপুরুষদের উপদেশ এবং তন্মূলক বিধি-নিষেধ প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হয। কিন্তু স্বভাব বিকাসের পর প্রবর্তক হইতে সাধক-অবস্থায় উপনীত হইলে বাহির হইতে কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যাহার যেরূপ স্বভাব সে সেইরূপ স্বভাব অনুসারে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সে সময় স্ব-ভাবই তাহার মধ্যে প্রেরণা যোগায়। ঐ সময় স্বভাবই গুরু, স্বভাবই শাস্ত্র এবং স্বভাবের নির্দেশই বিধি-নিষেধ। বাহির হইতে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। অন্তর্যামীরূপে এক শক্তি ভিতর হইতে তাহাকে পরিচালিত করে। ইহাকেই স্বভাব বলে।

বাহ্য দেহের অনুরূপ ভাবদেহ নহে। বাহির হইতে যাঁহাকে বৃদ্ধ দেখায়, যাঁহার চুল পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়া গিযাছে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি তাঁহার ভাবদেহে ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার ভাবদেহ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, কিশোরবযস্ক, সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মাধুর্যময় হয়। বাহ্যদেহের সহিত ভাবদেহের কোন যোগ থাকে না। ভক্ত যদি শুদ্ধ বাৎসল্যভাবের সাধক হন অথবা সখ্য, দাস্য বা উজ্জ্বলভাবের সাধক হন, তবে তাঁহার ভাবদেহও তদনুরূপ হইবে। স্বভাবসিদ্ধ দেহের স্বভাবের আশ্রয় লইয়া স্বভাবের সাধনা চলে। যদি কেহ মাতৃভাবের সাধক হয় তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার ভাবদেহ ঠিক শিশুর আকারের ন্যায়। তাহার প্রকৃতিও আকৃতির অনুরূপ

হয় এবং সেই সাধক শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া ক্রন্দন করে। তাহার বাহ্য শরীর জরা-জীর্ণ হইলেও সে ভাবদেহে শিশুই থাকে। ভাবদেহী শিশুভক্তকে মাতৃভক্তি শিখাইতে হয় না, স্ব ভাবই তাহাকে পরিচালিত করে। তাহার ভজন তাহার স্বভাবেরই ভজন। এইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তিতে বাহ্য শাস্ত্র বা বাহ্য নিয়মাবলী মানিয়া চলিবার আবশ্যক হয় না। ভাব সাধকের গুরুর আজ্ঞা পালনের আবশ্যক হয় না। উহার অন্তঃস্থিত ভাবের প্রেরণাই উহাকে সাধন পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভাবের বিকাশই প্রেম। ভাব সাধনা করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। যতদিন না প্রেমের উদয় হয়, ততদিন ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া যায় না। কারণ, ভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আশ্রয় তত্ত্বে'র অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু প্রেমের উদয় না হওয়া পর্যন্ত 'বিষয় তত্ত্বে'র আবির্ভাব হয় না। যদিও ভাব অথবা প্রেম একই বস্তু, তথাপি অপক্ক ও পক্ক ভেদে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাব-জগতে প্রবেশের সাথে সাথে নিজের বিশিষ্ট স্বরূপ পাওয়া যায়। উহার পর ভাবদেহে সাধনা করিতে করিতে ভাবের অধিক বিকাশ হইবার পর ভক্তির বিষয়ভূত ভগবৎ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। মহাভাব এক হইলেও খণ্ডভাব অনন্ত। ভাব যেরূপ অনন্ত, সেইরূপ ভগবৎ-স্বরূপও অনন্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের অভিব্যক্তি না হয় ততক্ষণ ইষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব হয় না। প্রবর্তক-অবস্থার শেষে ভক্ত নিজ ভাবদেহে জাগিয়া উঠিবার পরই 'ইষ্ট' বস্তুকে প্রাপ্ত হয় না। ভাবের বিকাশ হইতেই ইষ্টের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ আরম্ভ হয়। চিৎ-সত্তার আবরণ কাটিয়া যাইবার পর ইষ্টের প্রাপ্তি হয় ও অন্বেষণের সমাপ্তি ঘটে। ইহাই প্রেমের অবস্থা। ভাবের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের জগৎ হইতে জ্যোতির্ময় ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইবার পর ভক্ত নিজ ভাব অনুসারে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। তাহার পর ঐ ভূমি হইতে ইষ্ট বস্তুর অন্বেষণ চলিতে থাকে। এইরূপে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর গুহ্যস্থান প্রাপ্ত হইতে হইতে চরম অবস্থায় অন্তরতম বিন্দুতে প্রবেশ লাভ করে। তখন ইষ্টের স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং ভক্তের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয়। অন্তর্জগতে প্রবেশের পর ঐ জগতের অন্তিম বিন্দু পর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ভাব সাধনার দ্বারা অগ্রসর হইতে হয়। ইহার নাম সাধনার ক্রমবিকাশ। মধ্য বিন্দুতে স্থিতি লাভ করিবার পর বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এর ভেদ দূর হইয়া যায়। তখন সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহার নাম 'রসে'র উদয়। ইহাকে সহজিয়া ভক্ত মহাজনগণ 'সিদ্ধাবস্থা' বলিয়া নির্দেশ করেন।

ধামতত্ত্ব—প্রবর্তক অবস্থায় ধামে প্রবেশ লাভ হয় না। কারণ, ভাবের

বিকাশ না হইলে ধামতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় না। ধামে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে শুদ্ধ ভাবদেহের আবশ্যক। মায়িক দেহে বা অজ্ঞানময় দেহে ভগবদধামে প্রবেশের অধিকার নাই। মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চিৎ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও ধামে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। কারণ মায়িক দেহ নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ চিৎ হইলে যে স্থিতি লাভ হয় তাহা কৈবল্যের অবস্থা। কৈবল্য অবস্থায় ভগবদ্ধামে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ইহা বিদেহ স্থিতি। কেবলী জীব ভগবদ্ধামের বাহিরে বিশাল প্রান্তরে সুপ্তবৎ বিদ্যমান থাকে। ইহা মায়াতীত অবস্থা হইলেও ভগবদ্ধামে প্রবেশের অধিকার পায় না। একমাত্র ভগবৎ-অনুগৃহীত জীব বিশুদ্ধ ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ধামে প্রবেশ করিতে পারে, অন্যে নহে।

ভগবদ্ধাম এক হইলেও ভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে অনন্ত প্রকার। বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ধামকে 'ব্যাপী বৈকুণ্ঠ' বলে। ইহা প্রাকৃতিক রজঃ, তমঃ এবং মলিন সত্ত্বের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ সত্ত্বের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা গঠিত। জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ সত্ত্বই ভগবদ্ধামের উপাদান। এই ধামে লীলার উপকরণসমূহ, অনন্ত ভোগ্য বস্তু, ভক্ত ও ভগবানের লীলাবিগ্রহ—সবই বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা রচিত। আগম শাস্ত্রে ইহাই বিন্দুর স্বরূপ। তাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে গঠিত ব্যাপী বৈকুণ্ঠের আগম-সম্মত নাম 'বৈন্দব জগৎ'। প্রাকৃতিক জগতের পরিণাম সাধনকারী যে কাল, সেই কালের ক্রিয়া এখানে নাই। তথাপি ভগবদ্ধামে এক প্রকার কাল আছে, তাহা কালাতীত কাল। এই কাল ভগবানের লীলা-সহচর, ইহা ভগবৎ-ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া কার্য করে।

অষ্টদল কমল ও মহাভাব—স্থায়ী ভাবই স্বভাব। যার যা স্থায়ী ভাব, তার তাহাই স্বভাব। স্থায়ী ভাব হইতেই রসাস্বাদনের সম্ভাবনা জাগে। স্থায়ী ভাব বস্তুতঃ ভাবদেহেরই নামান্তর। ভাবের বিকাশের সাথে হৃদযকমলে প্রবেশ লাভ হয়। এই হৃদয়কমল অষ্ট দলে বিভূষিত, এইজন্য স্থায়ী ভাবও মূল অষ্টভাবে বিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই অষ্টদল কমলকে আগমে 'গুপ্ত কমল' বলা হয়। ষট্‌চক্রের অন্তর্গত যে দ্বাদশদলরূপী হৃদয়কমল আছে উহা হইতে উক্ত অষ্টদল কমল পৃথক। কারণ, দ্বাদশদল ভেদ করিবার অনেক পরে আজ্ঞাচক্র ভেদ করিতে হয় এবং আজ্ঞাচক্র ভেদের পরে অন্তর্লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে-পর্যন্ত অন্তর্লক্ষ্যের উন্মেষ না হয় সেই পর্যন্ত অষ্টদলে প্রবেশ হয় না। বস্তুতঃ অষ্টদলই ভাবরাজ্য এবং দ্বাদশদল ভাবের আভাস মাত্র। অন্তর্লক্ষ্য উন্মেষের পর ভাগ্যবান্ ভক্ত অষ্টদলকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রকৃত ভক্তির উদয় অন্তর্লক্ষ্যরূপ জ্ঞানের পর হয়—ইহাই গীতোক্ত 'বিশিষ্ট

ভক্তি'।[১] ভক্তি দুই প্রকার—অপরা ও পরা ভক্তি অথবা সাধন ও সাধ্য ভক্তি। সাধন-ভক্তি অপরা ভক্তি বা ভাবাভাস এবং সাধ্যভক্তি পরাভক্তি, উহা জ্ঞানের পর উদয় হয়। যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে অষ্টদল কমলের এক একটি দল এক এক ভাবের স্বরূপ। ভাবে প্রবিষ্ট হইবার পর উহাকে 'মহাভাবে' পরিণত করিতে হয়। ইহাই ভাবসাধনার রহস্য। বস্তুতঃ মহাভাবই ভাবসাধনার লক্ষ্য। প্রত্যেক ভক্তকে এই অষ্টভাবকে এক এক করিয়া জাগাইতে হয়, তাহা না হইলে কোন ভাবকে উহার চরম বিকাশের অবস্থা পর্যন্ত অভিব্যক্ত করা যাইবে না। নীচে রস এবং উপরে রবি কিরণ—এই উভয়ের সংযোগে যেমন কমল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ভাবরূপী অষ্টদল কমলের বিকাশের জন্য একদিকে লক্ষ্যোন্মেষরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চিদাকাশে-স্থিত সূর্যমণ্ডলের আবশ্যক হয় এবং অপরদিকে রসোদ্গমের মূল কারণ স্থায়ী ভাবের প্রয়োজন হয়।

ভাবের বিকাশের পূর্বে তদুপযোগী ক্ষেত্র নির্মিত হয়। নাম-সাধনার পর এবং মন্ত্র-সাধনার সমাপ্তির পূর্বে ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্র তৈরী হইতে থাকে। এই ক্ষেত্রই বস্তুতঃ এক কুণ্ড বা সরোবর। যতদিন লক্ষ্যোন্মেষ না হয়, ততদিন খেচরীভাণ্ড বা অমৃতভাণ্ড হইতে অমৃত ক্ষরণ হয় না। লক্ষ্যোন্মেষের সাথে সাথে অমৃত-ক্ষরণ আরম্ভ হইয়া যায় এবং পূর্বোক্ত শুদ্ধ কুণ্ড সলিলপূর্ণ সরোবররূপে শোভায়মান হয়। রহস্যবিদ্ সহজিয়া ভক্তগণ ইহাকে 'কাম-সরোবর'[২] বলিয়া থাকেন। এখানে 'কাম' শব্দের অর্থ শুদ্ধ প্রেম। উপর্যুক্ত লক্ষ্যোন্মেষই হইল কামসূর্যের উদয়। কামকলাতত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত। ভাবসরোবরে প্রথমে ভাব-কলিকা প্রকট হয়। পরে সূর্যের কিরণে উহা প্রেমকমলরূপে বিকশিত হয়। যখন ভাবের বিকাশ হয় অর্থাৎ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া যায় তখন উহা সরোবরের উপর ভাসিতে থাকে, পরে ভাসিতেও থাকে না, উপরে উঠিয়া যায়—কেবল এক মৃণালের দ্বারা সরোবরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। যখন এই মৃণালও ছিন্ন হইয়া যায় তখনই বস্তুতঃ ভাবে প্রবেশ ঘটে। ভাবে প্রবেশের পূর্বে যা কিছু হইয়াছে উহা সবই আভাস-মাত্র। অন্তর্জগতে প্রবেশের পর আভাস পরিত্যক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত অষ্টদলের প্রাপ্তি হয়। এই অষ্টদলের কর্ণিকারূপে যে

১ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ অহং স চ মম প্রিয়ঃ।।
(গীতা, ৭ম অঃ, ১৭ শ্লোক)

২ মৎপ্রণীত 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

বিন্দু থাকে, উহাই অষ্টদলের সারভাগ, উহার অপর নাম 'মহাভাব'। বস্তুতঃ ঐ অষ্টদল মহাভাবেরই অষ্টধা বিভক্ত স্বরূপমাত্র। ইহাকে মহাভাবের কায়ব্যূহও বলা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাভাব যদি বিন্দু হয় তবে অষ্টদলরূপ অষ্টভাবের সহিত উহার সম্বন্ধ কি হইবে? ইহার উত্তর এই যে উক্ত আটভাব মহাভাবের স্বগত আট অঙ্গমাত্র। এই আট অবয়বের সমষ্টি মহাভাবের স্বরূপ। প্রত্যেক ভাব মহাভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ উহাই মহাভাব। ভাব হইতে মহাভাবের দিকে যাইবার দুইটি প্রধান মার্গ আছেঃ এক আবর্ত্তক্রম দ্বারা আর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তথা সরল রূপ দ্বারা। আবর্ত্তমার্গ অবলম্বন করিলে ভাব হইতে ভাবান্তর প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা করিয়া চলিতে চলিতে ক্রমশঃ মহাভাবে পৌঁছাইতে হয়। এই মার্গ ধরিয়া মহাভাবে উপস্থিত হইলে মহাভাবের পূর্ণস্বরূপ লাভ করা যায়। আবর্ত্ত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সরল গুপ্ত মার্গ দিয়া যাইলেও মহাভাবে পৌঁছান যায়। কিন্তু এই মার্গ অবলম্বন করিলে মহাভাবের পূর্ণ স্বরূপ অধিগত হয় না। কারণ এই মার্গে বিন্দুর সঙ্গে কেবল একটি বিশিষ্ট দলেরই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, অন্য দলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা হয় না।

ভক্তের বৈশিষ্ট্য (Individuality)—প্রচলিত ভক্তি-শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—এই পাঁচ মুখ্য ভক্তি ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভাবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভক্তেরও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। ভক্তের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাবের পরিপক্ক অবস্থায় সেই ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত ভগবানেরও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। শান্ত ভক্তের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁহার সামনে প্রকটিত ভগবৎ-স্বরূপও সেইরূপ হয়। এইরূপ অন্য ভাবাদির ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। সর্বত্রই ব্যক্তিগত ভেদের স্থান আছে। তথাপি শান্ত ভাব অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং সম্পূর্ণ হইলেও শান্ত ভাবকে মহাভাবে পরিণতি লাভ করিতে হইলে উহার ভাবান্তরেরও প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শিশুরূপে শিশু নিরপেক্ষ পূর্ণ; তথাপি শিশুর ক্রমপরিণাম আছে যাহার ফলে শিশু বালকরূপে, কিশোররূপে, যুবকরূপে পরিণত হয়। ঐরূপ শান্তভাব আপনাতে আপনি পূর্ণ হইয়াও শান্তভাবের পরিণতিতে দাস্যভাবের বিকাশ, দাস্যভাবের পরিণতিতে সখ্যভাবের বিকাশ ইত্যাদি ভাবের ক্রমবিকাশ অস্বীকার করা যায় না। এক এক ভাবের বিকাশে এক এক গুণের অভিব্যক্তি হয়। যেমন—শান্তভাবে নিষ্ঠাগুণ; দাস্যভাবে সেবা ও নিষ্ঠা; সখ্যভাবে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবা; বাৎসল্যভাবে মমতা, নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাস; মাধুর্যভাবে আত্মসমর্পণ, মমতা, নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাস। এইভাবে মহাভাবে উপনীত হইলে সবই সম্ভাব্য গুণের পূর্ণ অভিব্যক্তি

হয়। তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে প্রতি ভক্তের ব্যক্তিত্ব এই সমস্ত বিকাশের মধ্যেও অক্ষত থাকে। ব্যক্তিত্বের মহিমা অতুলনীয়। লীলায় রসবৈচিত্র্যের ইহাই কারণ। প্রতি ভক্ত নিজস্ব মহিমায় লীলারস আস্বাদন করে। তাই ভগবৎ লীলার অনন্ত বৈচিত্র্যময় রস।

ধরা যাক, 'ক' ও 'খ' দুই ব্যক্তি। উভয়েই শান্তভাবের ভক্ত। তথাপি ব্যক্তিভেদে ক ও খ-এর শান্তভাব এক পর্যায়ের হইলেও উভয়ের ভাব পরস্পর পৃথক। এই যে পার্থক্য, ইহা চিরকাল অক্ষুন্নরূপে থাকে। অর্থাৎ শান্ত ভক্তির পরে ক ও খ উভয়েই যদি দাস্যভক্তির স্তরে পৌঁছায় তবে ঐ স্তরেও উভয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এইরূপ মাধুর্য পর্যন্ত ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিলেও 'ক' 'ক'-ই থাকে, 'খ' বা অন্য কিছু হয় না। এবং 'খ' 'খ'ই থাকে, 'ক' বা অন্য কেহ হয় না। শুধু ইহাই নহে, মাধুর্যভাবকে ভেদ করিয়া মহাভাবে প্রবেশ করিলেও সেখানে এই ব্যক্তিগত পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায় না। বুঝিতে হইবে যে, বৃত্তের অন্তর্গত প্রত্যেক বিন্দু কেন্দ্ররূপী মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সহিত অভিন্ন হইবার পরও আপন-আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এইরূপ না হইলে লীলাস্বাদনের মাধুর্য থাকিত না। এক যিনি, তিনি যেমন এক রূপে সত্য, ঐরূপ তিনি অনন্ত রূপেও সত্যি। কারণ ওখানে তো এক-ই অনন্ত রূপে খেলা করিতেছেন---এক অনন্ত রূপে এবং অনন্তের মধ্যে একই খেলা করিতেছেন---ইহাই লীলার রহস্য।

ইহা সকলেই জানেন যে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষের নাম ভাব। ইহাই ভক্তির স্বরূপ। পরিপক্ব অবস্থায় ইহার নাম প্রেম। ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তির আশ্রয় তটস্থা-শক্তিরূপী জীব। অর্থাৎ জীবরূপী-অণু 'ভাবে'র আশ্রয়। কিন্তু দেহের সম্বন্ধকালে জীব অন্তঃকরণের সহিত বিজড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, সাংসারিক অবস্থায় জীব এবং অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে। অতএব জীবের মধ্যে ভাবের অবতরণ হইবার পর প্রথম অবস্থায় উহা অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অন্তঃকরণের বৃত্তি নয়। অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া উহা সমস্ত দেহকে অনুপ্রাণিত করে। লৌকিক 'ভাবে'র ইহাই নিয়ম। কিন্তু প্রবর্তক অবস্থায় দেহ ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পরে যখন স্বভাবের বিকাশ হইয়া যায়, তখন এই প্রকার স্থূল দেহের সহিত সম্পর্ক থাকে না। কারণ তখন ভাব স্থূল দেহ হইতে পৃথক্ ভাবদেহরূপে অভিব্যক্ত হয়।

ভাবভক্তি-সাধনার চরম পরিণতিতে একদিকে রসের অভিব্যক্তি হয়, অপর দিকে মহাভাবের বিকাশ হয়। মহাভাবের বিকাশ বিনা রসের যাহা বিশুদ্ধতম ও পূর্ণতম স্বরূপ তাহা প্রাপ্ত হওয়া বা উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। এবং

মহাভাবের বিকাশ ভাবের বিশিষ্ট অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাবের নানা প্রকার বৈচিত্র্য আছে এবং প্রত্যেক ভাব স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ। সৃষ্টিকালীন জীবের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই প্রকার ভেদ হয়।

অষ্টদল কমলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার বাহ্য ও অন্তর দুই প্রকার ভেদ আছে। আভ্যন্তরীণ কমল হইল 'বিন্দু'-স্বরূপ আর বাহ্য কমল হইল উক্ত বিন্দুব আট দিকেব আট দলের সমষ্টি। এই বাহ্য কমলকে 'ভাবরাজ্য' বুঝিতে হইবে। ইহাতে নিরন্তর আট ভাবের খেলা চলিতেছে। বস্তুতঃ এই মৌলিক অষ্টভাবই অষ্টকালীন লীলার আটটি বিভাগ। এই আট দলের পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া লইবার পর মধ্য বিন্দুতে প্রবেশ হয়। মধ্যবিন্দু মাধুর্যময়। মধ্যবিন্দুকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহাও আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগের প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুর অবয়ব—ইহাদের 'কলা' বলে। এই আট কলার নামই হইল 'অষ্টসখী'। এই অষ্টভাবের নিষ্কর্ষ বা নির্যাসই যথার্থ মহাবিন্দু অর্থাৎ মহাভাব। উৎকর্ষের তারতম্য ভেদে মহাভাবেরও বিকাশ আছে। এই বিকাশের যাহা চরম পরিণতি তাহাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ মহাপুরুষদের অনুভূতিতে 'শ্রীরাধা-তত্ত্ব' নামে বর্ণিত হইয়াছে। ভাব-সাধনার ফলস্বরূপ জীব বাহ্য অষ্টদলের প্রথম দল হইতে আবর্তিত হইতে হইতে ক্রমশঃ মহাভাবের চরম বিকাশ পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম। ঐ সময় পূর্ণতম রসের উপলব্ধিতে পূর্ণতম মিলন এবং সামরস্য হয়।"

(উদ্ধৃত প্রবন্ধটি ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত 'ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর সাধনা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ভক্তি-রহস্য' হিন্দী-নিবন্ধের ভাবানুবাদ।)

অন্যত্র কবিরাজজী বলিয়াছেন, "প্রাচীনকালে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেমন বলিয়াছেন ঠিক সেই প্রকার যোগমার্গেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় সর্বপ্রথম ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগী ভাবদেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ যোগীর স্বরূপ। শিব হইয়া যেমন শিবের উপাসনা করিতে হয় তেমনি নিজে চিদানন্দময়ী প্রকৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়া জরা-মরণবর্জিত অখণ্ড তারুণ্যময় অনন্ত উল্লাসে উল্লাসময়ী প্রকৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়া নিজেরই পরমস্বরূপ বা পরমাপ্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, অংশ যেমন অংশীকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করে ঠিক সেই প্রকার ভাবরাজ্যে নিজে অগ্রসর হইতে থাকে। এই গতির অবসান যে বিন্দুতে হয সেইটি মহাভাব অথবা পরমাপ্রকৃতি যাহাই হউক না কেন বস্তুতঃ ইষ্টস্বরূপ অর্থাৎ নিজেরই পরমস্বরূপ অর্থাৎ অংশের যাহা অংশী তাহাই এইখানেই লক্ষ্যের অবসান। প্রথমে আশ্রয়তত্ত্ব এবং অন্তে বিষয়তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পরাবস্থায় আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের মিলনে যে সাম্যরসের উদয়

হয় তাহার প্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। প্রচলিত বৈষ্ণব পরিভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় আশ্রয় ভক্ত বা যোগী স্বয়ং এবং বিষয় ভগবান স্বয়ং। উভয়ের মিলন সিদ্ধ হইলে ভক্ত ভগবানের পৃথক্ ভাব থাকে না। উভয়ের পৃথক সত্তা বিগলিত হইয়া একটি অখণ্ড রসময় সত্তায় পর্য্যবসিত হয়।

ভক্তের সহিত ভগবানের যে নিত্যলীলার কথা মহাজনদিগের বাণীতে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এই পরমাপ্রকৃতির রাজ্যেই ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মাবস্থা নহে, কারণ ব্রহ্ম লীলাতীত। বৈষ্ণবগণও যোগমায়ারূপা মাতৃশক্তির দ্বারাই লীলা ব্যাখা করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রী বা ভূ শক্তির ন্যায় লীলাশক্তি নামে একটি পৃথক্ শক্তিই স্বীকার করিয়াছেন। মোটের উপর পরমাপ্রকৃতিকে বাদ দিয়া লীলা হইতে পারে না।"

(ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, অখণ্ড মহাযোগের পথে, পৃঃ ৫৮/৫৯)।